গণতন্ত্রের মানসপুত্র

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

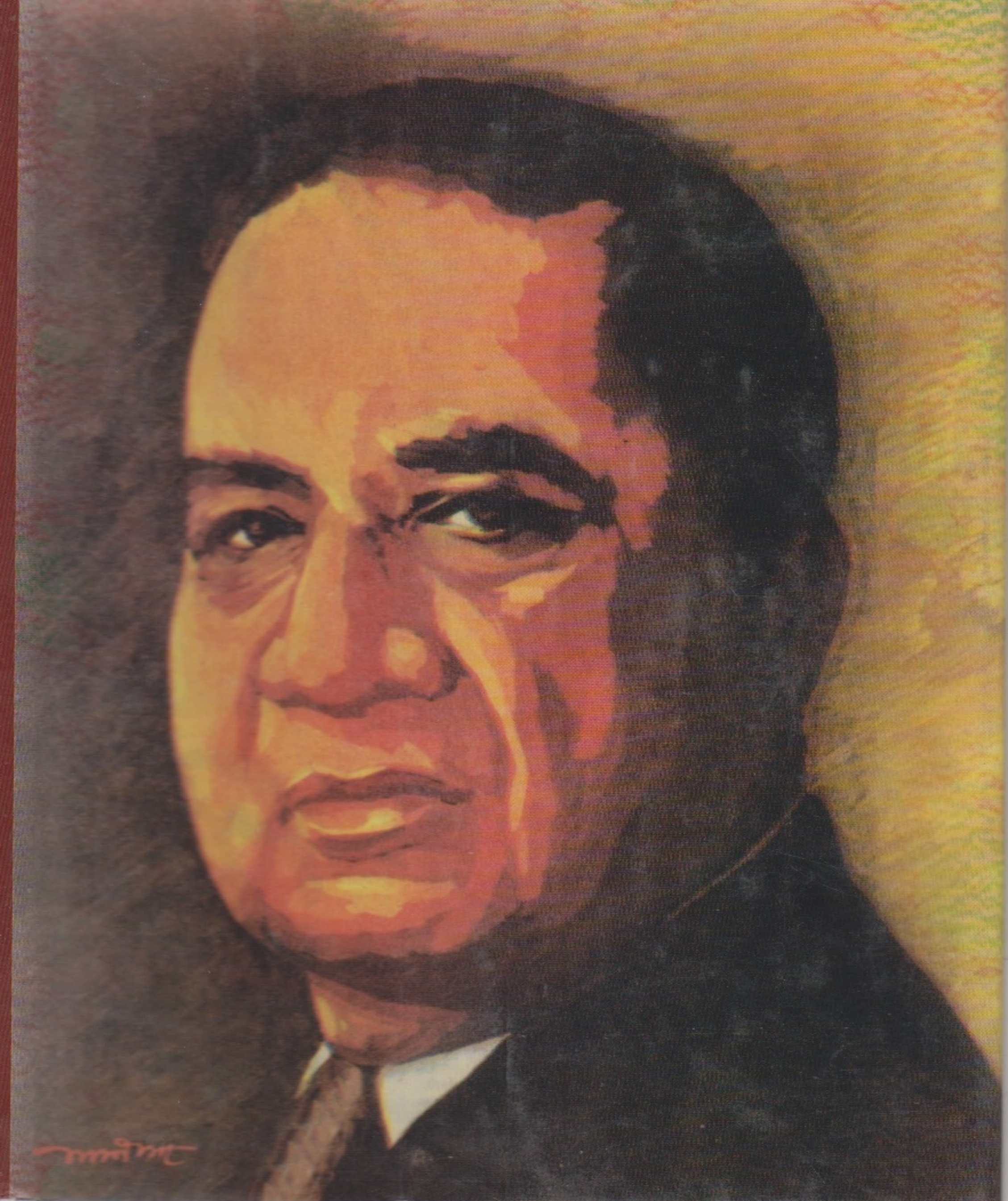

গণতন্ত্রের মানসপুত্র
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

সম্পাদনা
সৈয়দ তোশারফ আলী

সিটি পাবলিশিং হাউস
৯০, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের মানসপুত্র
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

ISBN 984-31-0329-7

মূল্য ঃ ৩০০ টাকা মাত্র

প্রকাশক ঃ মইনুল হোসেন ॥ সম্পাদনা ঃ সৈয়দ তোশারফ আলী ॥ প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ ॥ গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত ॥ কম্পোজ ঃ কম্পিউটার বিভাগ, দৈনিক ইত্তেফাক ॥ প্রচ্ছদ ঃ মানিক দে ও মোহাম্মদ মনোয়ারুজ্জামান ॥ অঙ্গসজ্জা ঃ ফরিদ হোসেন ॥ মুদ্রণ ও প্রকাশনায় ঃ সিটি পাবলিশিং হাউজ, ৯০, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ ॥

www.pathagar.com

জন্ম ঃ ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ মৃত্যু ঃ ৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী লোকান্তরিত হইবার অব্যবহিত পর তাঁহার কর্মবহুল জীবন, সংগ্রামী আদর্শ ও সেবাধর্মী চরিত্রকে দেশবাসীর সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্য দৈনিক ইত্তেফাক 'সোহরাওয়ার্দী সংখ্যা' নামে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। ১৯৬৪ সালের মার্চে প্রকাশিত সংখ্যাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হইয়া যায়। বিপুল চাহিদার মুখে ঐ বৎসর আগষ্টে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এরপর আর কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই।

সময়ের ব্যবধান যত বাড়িতে থাকে সংখ্যাটি ততই দুর্লভ হইয়া পড়ে। সংখ্যাটির মাধ্যমে শহীদ সাহেবকে জানিবার সুযোগ হইতে নতুন প্রজন্ম বঞ্চিত হইতে থাকে। বিষয়টি অনেকের মত আমাকেও পীড়িত করে।

শহীদ সাহেবের মৃত্যুবার্ষিকী আসিলেই সুধী সমাজের পক্ষ হইতে ইত্তেফাকের 'সোহরাওয়ার্দী সংখ্যাটি'কে গ্রন্থাকারে প্রকাশের দাবী ওঠে। কিন্তু বিচিত্র ধরনের ব্যস্ততার কারণে সুধী সমাজের সেই দাবী পূরণ করিতে অনেক বিলম্ব হইলেও শেষ পর্যন্ত নিজ উদ্যোগে সংখ্যাটি গ্রন্থাকারে পাঠকদের হাতে তুলিয়া দিতে পারায় আমি আনন্দিত।

ইত্তেফাকের সোহরাওয়ার্দী সংখ্যাটিকে গ্রন্থরূপ দিতে গিয়া বিষয়সূচীতে কোন পরিবর্তন আনা হয় নাই। কারণ, ইহা শুধু শহীদ সাহেবের জীবন ইতিহাসেরই নয়, আমাদের জাতীয় ইতিহাসেরও একটি অতি নির্ভরযোগ্য দলিল। যাঁহাদের রচনা সম্ভারে সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হইয়াছিল আজ তাঁহাদের অনেকেই বাঁচিয়া নাই। তাঁহাদের অনেকেই ছিলেন শহীদ সাহেবের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। তাই তাঁহাদের দেওয়া তথ্য ও অভিমত শহীদ চরিত্র বিচার-বিশ্লেষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইবার দাবী রাখে। ইহার বাহিরে রহিয়াছে শহীদ সাহেবের নিজস্ব নিবন্ধ ও বক্তৃতা-বিবৃতি যাহার গুরুত্ব ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। শহীদ সাহেবের উপর গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে গিয়া অনেকেই ইহার সাহায্য নিয়াছেন। আশাকরি আগামীতেও গবেষকরা ইহাকে শহীদ চরিত্র মূল্যায়নে সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করিবেন।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘটনাবহুল জীবনকে চিত্রে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ইত্তেফাকের বিশেষ সংখ্যাটিতে অনেক ছবি ব্যবহার করা হইয়াছিল। কিন্তু কালের স্রোতে সেই ছবির বেশির ভাগই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাই গ্রন্থরূপ দেওয়ার সময় ছবি ব্যবহারে অনেকটা সংযম দেখাইতে হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক গোলাম সারওয়ার, ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক ও রোববার সম্পাদক সৈয়দ তোশারফ আলী, ইত্তেফাকের সিনিয়র সহ-সম্পাদক সৈয়দ শাহজাহান, ইত্তেফাক রেফারেন্স বিভাগের নোমানুল হক, সংশোধনী বিভাগের আবুল কালাম, মকরুন্নেসা ও আহমাদ কাফিল, কম্পিউটার বিভাগের মোহাম্মদ আবু কাওসার, সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার আ. ন. ম. ওয়াহিদুজ্জামান, রোববার-এর নির্বাহী সম্পাদক মাহাবুবুল হাসান নীরু, সিনিয়র সহ-সম্পাদক গোলাম আম্বিয়া এবং নওরোজ সাহিত্য সম্ভারের এনায়েত রসুলসহ অনেকের নিরলস চেষ্টায় ও সযত্ন পরিচর্যায় সোহরাওয়ার্দী সংখ্যাটি গ্রন্থরূপ পাইয়াছে।তাঁহাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। প্রকাশনাকে নির্ভুল করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহার পরও অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তিকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখিলে বাধিত হইব।

বইটি পাঠকমহলে সমাদৃত হইলে এবং শহীদ সাহেবের মৃত্যুঞ্জয়ী গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শের প্রতি অনুরক্ত হইতে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করিলে সকলের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

মইনুল হোসেন

১৭ নভেম্বর ১৯৯৮

www.pathagar.com

সূচীপত্র

জীবন নয়, ইতিহাস	মাওলানা রাগিব আহ্‌সান	১
কানে বাজে আজো	—	
নেতা যে ভাষায় তাঁর দেশবাসীর সঙ্গে কথা বলতেন...	—	২৩
আমার মৃত্যুর পর দেশবাসী যেন বলতে পারে যে...	—	৩৫
আমার দেশের দরিদ্র জনসাধারণই আমার একমাত্র ভরসা...	—	৩৯
ব্যক্তির খেয়াল নয়, জনগণের ইচ্ছাই সরকারী নীতির ভিত্তি হতে হবে...	—	৪৭
পাকিস্তানে গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা	হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী	৫৭
স্বদেশ ভূমিতে অপরের হামলা বরদাশ্‌ত করবো না....	—	৬৯
ন্যায্য অধিকার আদায়ে জনগণকে যদি উদ্বুদ্ধ করতে পেরে থাকি...	—	৯১
আমি অধীর আগ্রহে সেই বাঞ্ছিত দিনটির প্রতীক্ষা করছি, যেদিন....	—	১০৭
'৪৬-এর ঐতিহাসিক দিল্লী সম্মেলনে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী	—	১২১
বিহারের বিপন্ন মুসলমানদের রক্ষায় সোহ্‌রাওয়ার্দী সরকারের ভূমিকা	—	১২৭
আমি এমন একটি শাসনতন্ত্র চেয়েছিলাম, যা....	—	১৩৭
যুক্ত নির্বাচনের 'কি' ও 'কেন'?	—	১৭৯
দেশ আজ কোন পথে?	হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী	১৮৯
প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে একটি মানবদরদী		
মহৎ প্রাণের সংগ্রাম-কাহিনী	সিরাজুদ্দীন হোসেন	২০৯
কারামুক্ত নেতার ঢাকা আগমণ উপলক্ষে বিমানবন্দরে সৃষ্ট ইতিহাস	—	২২১
৪ঠা জুনের (১৯৪৮) দৈনিক আজাদ থেকে	—	২২৫
সদ্য কারামুক্ত নেতা	—	২৩৩
শেষ প্রহরের স্বাক্ষর	কে, এ তালেব	২৩৫
খবর এলো তিনি আসছেন....	রেজাউল মুস্তাফা / মুহম্মদ আসফদ্দৌলা	২৪১
কবিতাগুচ্ছ		
অন্তিম শয়ানে	ফররুখ আহ্‌মেদ	২৫২
পাহাড় গিয়েছে ভেঙ্গে	সিকান্দার আবু জাফর	
যখন তিনি এলেন	মাহবুব তালুকদার	
তুমি এক সোনার তপন	সিরাজুল ইসলাম	
তাঁর নাম	শাহ্‌রিয়ার	
সে ছিল	মীর নূরুল ইসলাম	
সমাধি তীর্থে	মোজাফফর হোসেন	
আমাদের পথের মশাল	দিলওয়ার	
আপন চোখে দেখা–		
সোহ্‌রাওয়ার্দী ঃ একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য	এ. কে. ব্রোহী	২৫৯
সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রসঙ্গে	আবুল ফজল	২৬৫

www.pathagar.com

সমুদ্রের পরিমাপ যেমন সম্ভব নয়	তফাজ্জল হোসেন	২৭৩
আমার দৃষ্টিতে মরহুম সোহরাওয়ার্দী	আবুল হাশিম	২৮৫
যে মহান নেতা হারাইলাম	আবুল মনসুর আহমদ	২৮৯
শহীদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য	আতাউর রহমান খান	২৯৭
চিরঞ্জীব	আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ	৩০২
নেতাকে যেমন দেখিয়াছি	শেখ মুজিবুর রহমান	৩০৩
একটি নক্ষত্রের পতন	মোস্তাফা কামাল বার-এট-ল	৩১৫
বাংলার জাতীয় জাগরণ ও সোহরাওয়ার্দী	কামরুদ্দীন আহমদ	৩১৯
নির্ভীকতাই তাঁহার আমানত	ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৩২৭
সোহরাওয়ার্দীর তিরোধানে	এম এ খুরো	৩২৯
সোহরাওয়ার্দী স্মরণে	বেগম রোকাইয়া আনোয়ার	৩৩০
সোহরাওয়ার্দী ও পাকিস্তান	মালিক সরফরাজ	৩৩৩
সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে	এম. মসিয়ুর রহমান	৩৪৩
সোহরাওয়ার্দীকে যেমন দেখেছি	মাহমুদ নূরুল হুদা	৩৪৯
আমাদের ইতিহাসের যোগ্যতম প্রতিনিধি		
মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দী	নূরুদ্দীন আহমদ	৩৫৫
শহীদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান সফর	এম. আর. আখতার মুকুল	৩৬১
কর্মীরা শহীদকে পিতার মতোই জানিত	জসীমউদ্দিন আহ্‌মদ	৩৬৭
সোহরাওয়ার্দীকে যেমন দেখেছি	চৌধুরী শামসুর রহ্‌মান	৩৭৩
জনদরদী শহীদ সোহরাওয়ার্দী	মতিন উদ্‌দীন আহমদ	৩৭৭
হিমালয়ের পাদদেশে	নূরুল ইসলাম	৩৮০
আজো মনে পড়ে	আজিজুর রহমান	৩৮৯
হায় কারাগার !	আবদুল হামিদ মজুমদার	৩৯৭
সোহরাওয়ার্দী প্রসঙ্গ	মোহাম্মদ আবু সিদ্দিক	৩৯৯
শুকতারা তিনি	বদিউস সালাম	৪০৩
সোহরাওয়ার্দী স্মরণে	মোহাম্মদ কাসেম	৪০৫
দিনাজপুরের মাটিতে সোহরাওয়ার্দী	মেহরাব আলী	৪০৭
সোহরাওয়ার্দী ও এদেশের তরুণেরা	আলতাপ হোসাইন	৪১১
মরহুম সোহরাওয়ার্দী স্মরণে	আসাদুজ্জামান খান	৪১৫
মৃত্যু নয়, নবজাগরণ	জাফর আহমদ	৪১৯
অশ্রু দিয়ে গাঁথা		৪২১
জাতীয় পরিষদের শ্রদ্ধাঞ্জলি	—	৪২৯
তাঁর স্মৃতির সুরভি চিরকাল আমাদের আমোদিত রাখিবে	—	৪৩৭
পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের শ্রদ্ধা	—	৪৩৯
মনের কোণে হাজারো স্মৃতির ভিড়	—	৪৪১
পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদের শোক	—	৪৪৭
দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি	—	৪৪৯
আমাদের কথা (প্রথম সংস্করণের ভূমিকা)	—	৪৬১

www.pathagar.com

শিল্পী মোস্তাফা আজিজের দৃষ্টিতে 'বক্তৃতামঞ্চে সোহরাওয়ার্দী'

জীবন নয়, ইতিহাস

মওলানা রাগিব আহ্সান

[দেশবাসীর প্রিয় নেতা, শত সঙ্কটের বীর সেনানী জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আজ আর ইহধামে নেই। রমনার সবুজ অঙ্গনে আমরা তাঁকে সমাহিত করেছি। স্বাস্থ্যোদ্ধার-মানসে বিদেশে অবস্থানরত জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর আশু নিরাময় আমরা কামনা করেছিলাম, কামনা করেছিলাম সুস্থ দেহে তিনি দেশের বুকে ফিরে আসবেন। ফিরে তিনি এসেছিলেন, দেশমাতৃকার ডাক তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। তবে ফিরে এসেছিলেন তিনি আমাদের মধ্যে থাকবার উদ্দেশ্যে নয়, আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করবার জন্যে। অঝোর অশ্রুধারায় আমরা তাঁকে বিদায় দিয়েছি। বিদায় কি আমরা সত্যি দিয়েছি?

কখনো নয়। জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নশ্বর দেহ আমাদের মধ্যে না থাকলেও তাঁর স্মৃতি রয়েছে আমাদের মানসপটে। মানুষের মনের মন্দিরে তাঁর স্মৃতি কখনো ম্লান হবে না। তাঁর অমর স্মৃতিকে মনে করতে গিয়ে আমরা মনে করবো আমাদের গণতান্ত্রিক জীবনের কামনাকে; আমাদের গণতান্ত্রিক আদর্শের কথা বলতে গিয়ে স্মরণ করবো তাঁর স্মৃতিকে। কেনো না, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সমগ্র জীবন ছিলো জনগণের জীবনের সঙ্গে একত্রে গ্রথিত। 'রূপোর চামচ' মুখে দিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সাধারণ মানুষের দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে নিজের জীবনকে তিনি নিঃশেষে জড়িত করেছিলেন। জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করার জন্যে, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে এবং দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে আজীবন তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। সে সংগ্রাম আজো সফল হয়নি। তবু সংগ্রাম তাঁর মিথ্যে নয়। আমরা এই মহান জীবনের উদাহরণ থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা গ্রহণ করবো; তাঁর আরব্ধ সংগ্রামকে আমরা সাফল্যের দ্বারে উপনীত করবোই।]

এক অসাধারণ ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতার নাম হজরত শেখ শাহাবউদ্দিন ওমর-বিন-মোহাম্মদ-উস্-সোহ্‌রাওয়ার্দী। শেখ শাহাবউদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন হজরত বড় পীর সৈয়দ শেখ আবদুল কাদের জিলানীর প্রধান শিষ্য। শেখ শাহাবউদ্দিন স্বয়ং অসামান্য পণ্ডিত ও দার্শনিক ছিলেন। 'আওয়ারেফুল মা'রীফ' নামে তিনি এক পুস্তক রচনা করেন। শেখ শাহাবউদ্দিনই সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা। শেখ শাহাবউদ্দিনের সারাজীবন নিয়োজিত ছিলো ইসলামের সেবায়। দিকে দিকে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়াই ছিলো তাঁর সারা জীবনের সাধনা। তিনি তাঁর পুত্র ও খলিফাগণকে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইরান, তুরান, তুর্কীস্তান, সিন্ধু, হিন্দুস্থান ও বাংলাদেশে প্রেরণ করেন।

শেখ শাহাবউদ্দিন ওমর-বিন-মোহাম্মদ-উস্-সোহ্‌রাওয়ার্দীর পূর্বপুরুষদের ইতিহাস অধিকতর ঐতিহ্যপূর্ণ। পিতার দিক থেকে শেখ শাহাবউদ্দিন ছিলেন হজরত রসুলে করিম (দঃ) প্রথম খলিফা হজরত সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর এবং মাতার দিক থেকে

www.pathagar.com

ছিলেন হজরত ফাতেমা(রাঃ) ও হজরত আলী (রাঃ)-এর বংশধর। সুতরাং সোহরাওয়ার্দী পরিবার একই সঙ্গে সৈয়দ ও সিদ্দিকী উভয়েরই বংশধর।

সোহরাওয়ার্দীদের আগমন

ভারত উপমহাদেশে সোহরাওয়ার্দীদের আগমন ঘটেছিলো চিশ্‌তীদেরও আগে। দিল্লির নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগা কমিটির সভাপতি শামসুল উলেমা খাজা হাসান নিজামী চিশ্‌তী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ 'ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে চিশ্‌তী-শেখদের ভারতে আগমনের পূর্বেই সোহরাওয়ার্দী-শেখদের আগমন ঘটেছিলো।'

সোহরাওয়ার্দী সিলসিলার অন্যতম প্রধান নেতা হজরত বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী সারা ভারতে ইসলাম প্রচারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন। কথিত আছে যে, হজরত জাকারিয়া মুলতানীর পৌত্র মওলানা রুকুনউদ্দিন সোহরাওয়ার্দীকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী তাঁর অমাত্য ও পারিষদ সমভিব্যহারে দিল্লির প্রবেশদ্বারে হাজির হয়েছিলেন এবং সোহরাওয়ার্দী-শেখ সেখানে উপস্থিত হলে পর সম্রাট তাঁর রাজকীয় অশ্ব-শকট থেকে নেমে এসে তাঁর পদচুম্বন করেছিলেন। খাজা হাসান নিজামী চিশতীর লেখা থেকে আরো জানা যায় যে, শেখ শাহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর দুই তনয়া বিহিনূর ও বিহি হুরকে দিল্লীর চিশ্‌তী বস্তিতে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁদের সমাধির ওপর যে দরগা নির্মিত হয়, এখনো তা বিহিনূর-কা-দরগা নামে পরিচিত। সোহরাওয়ার্দী সিলসিলার অপর একজন কৃতী সন্তান আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী দিল্লির সুলতান বাহলুল লোধীর কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। এছাড়া শেখ শাহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর অপর এক পুত্র মওলানা শামসুল আরেফিন, ওরফে তুর্কমান শাহ্‌ দিল্লিতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তুর্কমান-গেটের কাছে তাঁর সমাধি রয়েছে। তাঁর নামানুসারেই এই গেটের নামকরণ হয় 'তুর্কমান-গেট'। এছাড়া মানের শরিফ, বিহার শরিফ, গৌর ও পাভুয়ার সুফি বংশরাও সোহরাওয়ার্দীয়া সিলসিলার অন্তর্গত। শেখ শরফুদ্দীন বিহারী ঢাকার অদূরে সোনারগাঁওয়ে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও ছিলেন সোহরাওয়ার্দী বংশেরই সন্তান। মিস্টার এইচ.ই. স্টেপলটোন, আই-ই-এস তাঁর 'গৌর ও পাভুয়ার স্মৃতিকথা' গ্রন্থে লিখেছেন যে, সিলেটের শাহজালালও সোহরাওয়ার্দী বংশ থেকেই উদ্ভূত। কথিত আছে যে, শেখ শাহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশক্রমে শাহ্‌জালাল ৩৬০ জন সুফি ও সাধু নিয়ে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং তাঁরা গৌর, পাভুয়া, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট ও অন্যান্য স্থানে ইসলাম প্রচার করেন। কিংবদন্তী আছে যে, শেখ শাহাবউদ্দিন স্বয়ং একবার বাংলাদেশ সফর করেন এবং সেই সফর শেষে বাগদাদে পৌঁছে দেহরক্ষা করেন। শেখ শাহাবউদ্দিন বাগদাদে সমাহিত রয়েছেন।

ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজে শেখ শাহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর কি অসামান্য অবদান রয়েছে, তার কিঞ্চিৎ উদাহরণ প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য এই প্রবন্ধ লেখকের হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে আমি সোভিয়েট ইউনিয়ন সফরে যাই। সেখানে তুর্কীস্তানের বিভিন্ন জায়গায় সোহরাওয়ার্দী-শেখদের বাগান, দরগা, খানকা, মসজিদ ও স্মৃতিস্তম্ভ দেখেছি। সেগুলোর মধ্যে চিলাঘার গার্ডেন-মসজিদ এবং উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দের ঠিক বাইরেই শেখ জয়েনউদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর খানকা রয়েছে। আমি সেখানে ফাতেহা আদায়

www.pathagar.com

করেছিলাম। তাছাড়া দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ রাজ্যে নিজাম বংশের প্রতিষ্ঠাতা (১৭২৪) নিজামউল-মুলক আসফ জা-ও শেখ শাহাবউদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দীর বংশধর ছিলেন।

মেদিনীপুরের সোহ্‌রাওয়ার্দী পরিবার

আধুনিক যুগে ইসলামী সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের অগ্রনায়ক ছিলেন মেদিনীপুরের সোহ্‌রাওয়ার্দী পরিবার। মওলানা আমিনউদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দীর দুই পুত্র মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা মুবারক আলী সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন কৃতীপুরুষ। মওলানা ওবায়দুল্লাহ আল-ওবায়দি-উস-সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং বহু ভাষাবিদ। তাঁর সময়ে তাঁর চেয়ে বড় পণ্ডিত সারা ভারতে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁর রচিত গদ্য ও পদ্যগ্রন্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই পাণ্ডিত্যের জন্যে তাঁর নাম হয়েছিল 'বাহ্‌রুল-উলুম' বা 'বিদ্যাসাগর'। তাঁর অন্যতম শিষ্য ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলী। মওলানা ওবায়দি মোহসেনিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের (কবি নজরুল সরকারি কলেজ) ভবনেই ছিলো সেই মাদ্রাসা। মওলানা ওবায়দিও এই বাড়িতেই বসবাস করতেন এবং এখানেই জন্ম হয় তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দীর।

মওলানা ওবায়দি ছিলেন জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নানা। ঢাকায় নামাজ আদায়কালে সিজ্‌দায়রত থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁকে লালবাগের শাহী জুমা মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়।

জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নানা মওলানা ওবায়দুল্লাহ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং দাদা মওলানা মুবারক আলী সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন আপন সহোদর ভ্রাতা। তাঁদের আব্বা ছিলেন মওলানা আমিনুদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দী। মওলানা মুবারক আলী সোহ্‌রাওয়ার্দী বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরের বিখ্যাত আইনজীবী ও সদর-ই-আলা ছিলেন।

পিতা-মাতা

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর আব্বার নাম জনাব জাহিদুর রহিম জাহিদ এম.এ. এল.এল.বি; ব্যারিস্টার। তিনি জাহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দী নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। জনাব জাহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। জনাব জাহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর চাচাত বোন বেগম খুজিস্তা আখতার বানু, ওরফে সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া বেগমের। বেগম খুজিস্তা ছিলেন মওলানা ওবায়দির জ্যেষ্ঠা কন্যা। পিতার কাছে তিনি আরবী, পার্শী, উর্দু ও ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। সারা ভারতে তিনিই ছিলেন প্রথম মুসলিম মহিলা যিনি সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করেছিলেন। এছাড়া ভারতীয় এগ্‌জামিনেশন্স বোর্ড থেকে তিনি অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দুশাস্ত্রের এম.এ. পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়া তাঁর কাব্য-প্রতিভা ছিলো। তিনি উর্দু ও পার্শী ভাষার ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর রচিত কতিপয় পুস্তক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

বেগম খুজিস্তা পর্দানশীন মহিলা হলেও তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী এবং সংস্কারক। তিনি কলকাতায় সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০৯

www.pathagar.com

সালে এ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় এবং এ বিদ্যালয় উদ্বোধন করেন তদানীন্তন ভারতীয় ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর পত্নী লেডী মিন্টো।

দরিদ্র জনসাধারণের জন্যে বেগম খুজিস্তার সহানুভূতির অন্ত ছিলো না। বস্তি এলাকায় ঘুরে ঘুরে তিনি দরিদ্র জনসাধারণকে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন, তাদের জন্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়াস পেতেন। এমনি কাজে নিয়োজিত থাকার সময়ে একবার তিনি গুরুতর ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন এবং সেই ইনফ্লুয়েঞ্জাতেই ১৯১৯ সালের ১২ই জানুয়ারি ইন্তিকাল করেন।

শহীদ সাহেবের মাতুল

বেগম খুজিস্তার চার ভাই (শহীদ সাহেবের মামা) ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন ঃ মোহাম্মদ মামুন সোহরাওয়ার্দী, আবদুল্লাহ আল মামুস্ সোহরাওয়ার্দী, হাসান সোহরাওয়ার্দী এবং মাহমুদ সোহরাওয়ার্দী।

জনাব মোহাম্মদ মামুন সোহরাওয়ার্দী বি.এ পাস করার পর অপরিণত বয়সে মারা যান। শহীদ সাহেবের অপর তিন মামা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও জনসেবায় সারা ভারতে খ্যাতি লাভ করেন। শহীদ সাহেবের দ্বিতীয় মামা ডক্টর স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী এম.এ; পিএইচডি; এলএলডি; ডি-লিট; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রের 'ঠাকুর প্রফেসর' (Tagore-Professor) নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে লন্ডনে তিনি প্যান-ইসলামিক সোসাইটি স্থাপন করেন। তাছাড়া ১৯১১ সালে কলকাতায় রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি স্থাপন করে তিনি ত্রিপলী ও বলকান যুদ্ধে তুর্কীদের সাহায্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি মুসলিম জাহান ব্যাপকভাবে সফর করেন। তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন এবং ইরানের শাহ তাঁকে 'ইফতেখারউল মিল্লাত' বা 'মুসলিম জাতির গৌরব' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বৃটিশ ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অনুরোধক্রমে তিনি গাম্বিয়া ও ফিলিপাইনের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যে আইনগত বিধান রচনা করে দিয়েছিলেন। মুসলমানদের অধিকার আদায়ের জন্যে তিনি অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করে গেছেন।

স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী মহীশুরের অধিপতি টিপু সুলতানের পরিবারে বিয়ে করেন। তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি ছিলো না। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে তিনি আপন সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। স্যার আবদুল্লাহ্ তাঁর বড় বোনকে (শহীদ সাহেবের জননীকে) এত শ্রদ্ধা করতেন যে, কখনো বিনা অনুমতিতে তিনি তাঁর সামনে আসন গ্রহণ করতেন না। তাঁর রচিত কতিপয় পুস্তকে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

শহীদ সাহেবের তৃতীয় মামা লেফটেন্যান্ট-কর্নেল ডক্টর স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী ডি-এস-সি, এল-এল-ডি, এফ-আর-সি-এস; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম মুসলমান ভাইস চ্যান্সেলর। স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী তদানীন্তন ভারত সচিবের উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছিলেন। লন্ডনে তিনি মুসলিম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও রিজেন্ট পার্কে মসজিদ স্থাপন করেন। স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ঢাকার বিখ্যাত নওয়াব সৈয়দ মোহাম্মদ আজাদের কন্যাকে বিয়ে করেন। নওয়াব আজাদের অপর এক কন্যার সাথে বিয়ে হয় শেরেবাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হকের। এমনিভাবে স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দীর কন্যা

www.pathagar.com

বেগম শায়েস্তা সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং জনাব ফজলুল হকের একমাত্র কন্যা রাইসি বেগম, ওরফে হোসনে আরা খালাত বোন। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'নিউ অরিয়েন্ট' এবং এলাহাবাদের 'ইন্‌ডিপেন্ডেন্ট' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক সৈয়দ হোসেন এঁদের মামা। একটি পারিবারিক ছবিতে দেখা যায় ঃ উপবিষ্ট রয়েছেন ঃ স্যার হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দী, জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হক, স্যার আবদুল্লাহ সোহ্‌রাওয়ার্দী, স্যার জাহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও সৈয়দ হোসেন; আর এঁদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন ঃ জনাব শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, জনাব মাসুদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দীর পুত্র) ও শাহাব সোহ্‌রাওয়ার্দী (জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর পুত্র, তিনি অকালে মারা যান)।

জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর চতুর্থ মামা জনাব মাহমুদ সোহ্‌রাওয়ার্দীও কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি কাউন্সিল অব স্টেটের সদস্য নিযুক্ত হন।

শহীদ সাহেবের পারিবারিক জীবন

জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৯১৯ সালে স্যার আবদুর রহিমের কন্যা বেগম নিয়াজ ফাতেমাকে বিয়ে করেন। স্যার আবদুর রহিম ছিলেন কলকাতা হাই কোর্টের একজন বিচারপতি, গর্ভনরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য এবং ভারতীয় আইন পরিষদের (দিল্লি) সভাপতি। বেগম নিয়াজ ফাতেমার সাথে শহীদ সাহেবের বিবাহিত জীবনের বয়স ছিলো মাত্র তিন বছর। ১৯২২ সালে বেগম নিয়াজের মৃত্যু হয়।

বেগম আখতার জাহান সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া ওরফে বেগম আখতার সোলায়মানই জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর একমাত্র কন্যা। তাঁর জন্মের দুই মাস পরেই তাঁর মাতার মৃত্যু ঘটে। বেগম আখতার সোলায়মানের পূর্বে জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিলো শাহাব সোহ্‌রাওয়ার্দী। লন্ডনে ছাত্রাবস্থায় মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৪১ সালে।

জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৯৪০ সালে কলকাতায় এক রুশিয় মহিলাকে বিয়ে করেন। সেই বিয়ের কাবিননামায় মরহুম তমিজউদ্দিন খানের দস্তখত রয়েছে। রুশিয় পত্নীর গর্ভে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের পুত্র রাশেদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর জন্ম হয়। শহীদ সাহেব কিছুকাল পরে তাঁর দ্বিতীয় পত্নীকে পরিত্যাগ করেন।

১৯৪২ সালে শহীদ সাহেবের কন্যা বেগম আখতার জাহানের বিয়ে হয় জনাব শাহ্ আহমদ সোলায়মানের সাথে। শাহ্ আহমদ সোলায়মান স্যার শাহ্ সোলায়মানের পুত্র। শাহ্ সোলায়মান ছিলেন এলাহাবাদ হাই কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর এবং ভারতীয় ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি। তিনি একজন খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ ছিলেন।

বেগম আখতার সোলায়মানের একমাত্র কন্যা শাহেদা, ওরফে মুন্নি। মুন্নি জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর পরম স্নেহের পাত্রী ছিলেন।

অধ্যাপক শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দী

শহীদ সাহেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা অধ্যাপক হাসান শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অনার্স গ্র্যাজুয়েট এবং পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট ভাষাবিদ। প্রায় তিরিশটি ভাষায় তিনি দক্ষ ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা

www.pathagar.com

শাস্ত্রের বাগেশ্রী অধ্যাপক ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন। তিনি স্পেন ও পর্তুগালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন।

অধ্যাপক শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দী দীর্ঘকাল যাবৎ তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়নে ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ সরকার ভারতে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। ১৯৩০ সালে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে মওলানা মোহাম্মদ আলীর জোর দাবির ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। অধ্যাপক শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দী 'চৈনিক কবিতা' এবং নাটকের ওপর দুইটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেই গ্রন্থ দুটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল যে, ওই দুই বিষয়ে ওর চেয়ে উৎকৃষ্ট রচনা আর হতে পারে না। হায়দরাবাদের নওয়াব স্যার সালার জঙ তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়েছিলেন নওয়াব প্রাসাদের চিত্র সম্ভারের শ্রেণী বিভক্তিকরণের জন্য।

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর শিক্ষা-জীবন

১৮৯৩ সালে মেদিনীপুরে জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ছেলেবেলায় মা এবং মামা স্যার আবদুল্লাহ সোহ্‌রাওয়ার্দীর কাছে শিক্ষা লাভ করেন। পরে তাঁর শিক্ষা-জীবন অতিবাহিত হয় মাদ্রাসায়ে আলীয়া ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে অনার্সসহ বি,এসসি পাস করার পর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আরবিতে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯১১ সালে সোহ্‌রাওয়ার্দী বৃটেন গমন করেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অনার্সসহ বি.এসসি এবং বি.সি-এল ডিগ্রী গ্রহণ করেন। অতঃপর এম.এ.তে ভর্তি হন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ইংরেজি ভাষায় এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন।

জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৯২০ সালে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর রাজনৈতিক-জীবন শুরু হয়। তিনি খিলাফত ও স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করেন। তবে মওলানা মোহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলীকে তিনি 'গুরু' হিসেবে গ্রহণ করেন।

দেশে ফিরে আসার মাত্র এক বছর পর ১৯২১ সালে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য হিসেবে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সান্নিধ্য লাভ করেন। দেশবন্ধু এই তরুণ মুসলিম যুবকের গুণে আকৃষ্ট হন। অন্যদিকে শহীদ সাহেবও তাঁকে এ কথা বোঝাতে সক্ষম হন যে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্যে বাস্তব কাজ আবশ্যক—শুধু ভাবপ্রবণ শ্লোগানে সেই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে না।

১৯২৩ সালের চুক্তি

এ সময়ে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এই সঙ্কটকালে জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান করেন। একদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও অন্যদিকে জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর চেষ্টায় ১৯২৩ সালে হিন্দু-মুসলিম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বীকৃতি লাভ করে। তাছাড়া পৃথক নির্বাচন এবং মুসলমানদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের শর্তও তদ্দ্বারা স্বীকৃত হয়। আরো স্থির হয়

www.pathagar.com

যে, মুসলমানদের সম্মতি ব্যতীত মুসলমানদের ওপর যুক্ত নির্বাচন প্রথা চাপিয়ে দেয়া হবে না। হিন্দু কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই চুক্তি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে অনুমোদন করান।

১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় মওলানা মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে। মওলানা মোহাম্মদ আলী এই চুক্তি সমর্থন করলেও কংগ্রেসের এক বিরাট অংশ এর প্রবল বিরোধিতা করে। যা হোক, চিত্তরঞ্জন দাশই শেষ পর্যন্ত জয়ী হন এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনেও চুক্তিটি অনুমোদিত হয়। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ওপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের এতোই ভালো ধারণা জন্মেছিল যে, তিনি স্বরাজ্য পার্টির কোয়ালিশনে সোহরাওয়ার্দীকে ডেপুটি লীডার মনোনীত করেন এবং কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়রের পদে নির্বাচিত করেন। ইতিপূর্বে আর কোনো মুসলমান কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়রের পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেননি। ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর জনাব সোহরাওয়ার্দী কর্পোরেশনে সম্প্রদায় বিশেষের একচেটিয়া আধিপত্য নষ্ট করার প্রয়াস পান এবং বহুলাংশে সফলও হন।

দেশবন্ধুর মৃত্যু

অসুস্থ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৭ সালে দার্জিলিংয়ে দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এই সময়ে নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ সময় ঝড়ের গতিতে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে ঘুরে মুসলমানদের ধন-প্রাণ রক্ষা করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের ভেতরে ও বাইরে তিনি অক্লান্তভাবে সংগ্রাম চালান মুসলিম স্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। এই সময়ে তাঁর কর্মতৎপরতায় সারা দেশ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হয়।

শিমলা কনফারেন্স, ১৯২৭ ঃ জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে সংঘাত

সাম্প্রদায়িক হানাহানির সুরাহা করার উদ্দেশ্যে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শিমলায় ১৯২৭ সালে। মওলানা মোহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলীর সবল সমর্থনপুষ্ট জনাব সোহরাওয়ার্দী সেই সম্মেলনে মুসলিম স্বার্থের পক্ষে প্রবলভাবে সংগ্রাম করেন। সেই সম্মেলনে জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একজন জাতীয়তাবাদী নেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং যুক্ত-নির্বাচনের ভিত্তিতে আপোষের চেষ্টা করেন। কিন্তু জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁর বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত এই সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এভাবে শিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পর জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একটি ফর্মুলা উদ্ভাবন করেন। সেই ফর্মুলা 'দিল্লি প্রস্তাব' নামে পরিচিত। তাতে বলা হয় যে, বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বীকৃতি, কেন্দ্রে এক-তৃতীয়াংশ মুসলিম প্রতিনিধিত্ব এবং সীমান্ত প্রদেশে সংস্কারমূলক কর্মসূচি কার্যকরী করা হলে মুসলমানগণ পৃথক নির্বাচনের দাবি পরিত্যাগ করতে পারে। কিন্তু জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহ্ সাহেবের সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। আল্লামা ইকবাল সোহরাওয়ার্দী সাহেবদের সমর্থন করেন। ফলে জিন্নাহ্ সাহেবের আপোষ-ফর্মুলা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বেঙ্গল মুসলিম কনফারেন্স, ১৯২৮

১৯২৪ সালে স্যার আবদুর রহিম আলীগড়ে ভারতীয় মুসলিম লীগ অধিবেশনে যে বক্তৃতা করেন, তাতে এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু অত্যন্ত আহত হয়। সেই থেকে স্যার

www.pathagar.com

আবদুর রহিমের বক্তৃতা তাদের অন্যতম আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। ১৯২৮ সালে তাঁর জামাতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতায় প্রথম নিখিল বঙ্গ মুসলিম কনফারেন্সের আয়োজন করেন। তাতে সভাপতি করা হয় স্যার আবদুর রহিমকে। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী নির্বাচিত হন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী সেই সম্মেলনে এক লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। শহীদ সাহেবের রাজনৈতিক-জীবনের সেটি ছিলো প্রথম লিখিত বক্তৃতা এবং সেই বক্তৃতা এতোই সুলিখিত ও যুক্তিপূর্ণ ছিলো যে, মূল সভাপতি স্যার আবদুর রহিম শহীদকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেনঃ 'শহীদ, তুমি আমাকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। আমার আলীগড়ের বক্তৃতার চেয়ে তোমার কলকাতার বক্তৃতা বহুগুণে উৎকৃষ্ট।

নেহরু রিপোর্ট ও মুসলিম নেতৃবর্গ

ভারতের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে মতিলাল নেহরুর রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে। এই রিপোর্টই 'নেহরু রিপোর্ট' নামে প্রসিদ্ধ। নেহরু রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী তার বিরোধিতা করেন। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম নেতা নেহরু রিপোর্টকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে কংগ্রেসে যোগদান করেন। সে সময়ে যাঁরা কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বজনাব মওলানা আবুল কালাম আজাদ, চৌধুরী খালিকুজ্জামান, মওলানা আকরাম খান, ডাক্তার এম.এ. আনসারী, জনাব আসফ আলী, রফি আহমদ কিদওয়াই, মওলানা জাফর আলী খান, টি.এ. শেরওয়ানী এবং স্যার আলী ইমামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আহরার পার্টির নেতারাও তখন বিনাশর্তে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন।

সে বছর কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন ও ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটিতে সভাপতিত্ব করেন মতিলাল নেহরু এবং দ্বিতীয়টিতে সভাপতিত্ব করেন ডাক্তার এম.এ. আনসারী। একই সপ্তাহে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতায় নিখিল ভারত খিলাফত সম্মেলনের আয়োজন করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মওলানা মোহাম্মদ আলী।

নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্স, দিল্লি, ১৯২৮

এই সময়ে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ছিলো জিন্নাহ লীগ ও শফি লীগ—এই দুই ভাগে বিভক্ত। ১৯২৮ সালের শেষ সপ্তাহে ও ১৯২৯ সালের প্রথম সপ্তাহে সর্বদলীয় মুসলিম নেতাদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দিল্লিতে। এই দিল্লি সম্মেলনে পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। দিল্লির সেই মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় স্যার সুলতান মোহাম্মদ শাহ ও জনাব আগা খানের সভাপতিত্বে। সেই সম্মেলনে আলী-ভ্রাতৃদ্বয় এবং জনাব সোহরাওয়ার্দীও যোগদান করেন। জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দিল্লী-সম্মেলনে যোগদান করেননি; তবে তিনি তখন যে 'চৌদ্দ দফা' ঘোষণা করেন, তার সঙ্গে দিল্লি সম্মেলনের তেমন কিছু পার্থক্য ছিলো না।

আলী-ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি অনুরক্তি

আলী-ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুরক্তি ছিলো অসীম। মওলানা মোহম্মদ আলীর ভাষায় জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন বাংলাদেশে তাঁর সেনাপতি।

www.pathagar.com

মওলানা মোহাম্মদ আলী কলকাতায় এলে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অতিথি হিসেবে তাঁর বাসভবনে অবস্থান করতেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী বিনীত ভক্তের মতো মওলানা সাহেবের সেবা করতেন। মওলানা মোহাম্মদ আলী যখন ১৯৩১ সালে লন্ডনে মারা যান, জনাব সোহরাওয়ার্দী তখন শিশুর মতো কেঁদেছিলেন। অতঃপর মওলানা শওকত আলীর মৃত্যুর পর তাঁর শোকসভাতেও জনাব সোহরাওয়ার্দী সভাপতিত্ব করেছিলেন।

তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক

১৯৩১ সালে বোম্বেতে নিখিল ভারত মুসলিম স্বেচ্ছাসেবক কনফারেন্স এবং ১৯৩২ সালে কলকাতায় নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটিতে জনাব সোহরাওয়ার্দী সভাপতিত্ব করেন এবং দ্বিতীয়টিতে তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। অতঃপর ১৯৩৩ সালে লন্ডনে তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে তিনি মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

১৯৩৫ ও ১৯৩৬ এই দুই বছর সোহরাওয়ার্দী অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যে কাটান। ১৯৩৫ সালে খিলাফত কনফারেন্স, তবলিগ ও সিরাত কনফারেন্স, স্বেচ্ছাসেবক কনফারেন্স, আখারা ফিজিক্যাল কনফারেন্স প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন এবং অন্যদিকে কলকাতা কর্পোরেশন বর্জনের আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৩৬ সালে জনাব সোহরাওয়ার্দী বেঙ্গল মুসলিম ইউনাইটেড পার্টি গঠন করেন এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রস্তুতি চালান।

মুসলিম লীগে যোগদান

জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৩৬ সালে কলকাতা আগমন করেন। ইতিপূর্বে জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হক জিন্নাহ সাহেবের লীগ দল পরিত্যাগ করে কৃষক-প্রজা পার্টি গঠনে নিয়োজিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের লীগের কিছুমাত্র ভবিষ্যৎ ছিলো না। তাই সকলে জিন্নাহ সাহেবকে পরামর্শ দেন যে, শহীদ সাহেবকে দলে ভিড়াতে না পারলে বাংলাদেশে লীগ কিছুই করতে পারবে না।

জিন্নাহ সাহেব এই পরামর্শের সারবত্তা উপলব্ধি করে খাজা নাজিমউদ্দিন, খাজা নূরুদ্দিন, জনাব আবুল হাসান ইস্পাহানী ও জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকীকে শহীদ সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন তাঁকে লীগে যোগদানে রাজি করাবার জন্যে। তাঁরা জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে পর তিনি জিন্নাহ সাহেবের নিকট থেকে নিশ্চয়তা দাবি করেন। কেননা, ইতিপূর্বে শিমলা কনফারেন্স, দিল্লি প্রস্তাব ও অন্যান্য নানা কারণে জিন্নাহ সাহেব সম্পর্কে তিনি স্বভাবতই সন্দিগ্ধ ছিলেন। জিন্নাহ সাহেব প্রতিশ্রুতি দিলে পর জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

১৯৩৬ সালের নির্বাচন

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর ১৯৩৬ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনে মুসলিম আসনসমূহের অধিকাংশ মুসলিম লীগ দখল করে। অতঃপর ১৯৩৭ সালে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টির কোয়ালিশনে। জনাব ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। সেই নির্বাচনে খাজা নাজিমউদ্দিন পটুয়াখালীতে জনাব ফজলুল হকের নিকট পরাজিত হন ২৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে। খাজা নাজিমউদ্দিনের এই পরাজয় ছিলো মর্মান্তিক। শহীদ সাহেব দুইটি আসন

www.pathagar.com

থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি খাজা সাহেবের অবস্থা দেখে উত্তর কলকাতা কেন্দ্রের আসনটিতে পদত্যাগ করেন। পরে সেই আসনে খাজা সাহেব নির্বাচিত হন জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রভাবে।

১৯৩৭-৪১-এর মন্ত্রিসভায় জনাব সোহরাওয়ার্দীও একজন সদস্য ছিলেন। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে সে আমলে বহুসংখ্যক জনকল্যাণধর্মী আইন প্রণীত হয়।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৯

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চে লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই অধিবেশনে জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হক পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সময় বিচিত্র রাজনৈতিক উত্থান-পতন, আন্দোলন ও সঙ্কটে পরিপূর্ণ। আর সেই সঙ্কটের মধ্যেই দীপ্ত হয়ে ওঠে জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা ও বিচক্ষণতা।

কিন্তু ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনের কিছুকাল পরেই জনাব ফজলুল হক মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' করেন। তিনি লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। অতঃপর ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কোনোরকম সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ফলে ১৯৪৩ সালে 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং খাজা নাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী খাদ্য দফতরের ভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অক্লান্ত কর্মক্ষমতার গুণেই পঞ্চাশের মন্বন্তর আরো ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারেনি। সারা প্রদেশে তিনি লঙ্গরখানা খুলে দিয়েছিলেন এবং তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষা পেয়েছিল।

১৯৪৫ সালে আমি নিখিল ভারত জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করি। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন আমার প্রধান সহায়ক।

১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান ইস্যুর ওপর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় অন্যান্য লীগ নেতার অনুপস্থিতিতে শহীদ সাহেব তখন একক হস্তে নির্বাচন-যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে লীগ যে ঐতিহাসিক বিজয়ের অধিকারী হয়েছিল, তার প্রায় সবটুকুই জনাব সোহরাওয়ার্দীর অবদান। তারপর ১৯৪৬ সালে তিনি মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সারা উপমহাদেশে একমাত্র তিনিই তা করতে পেরেছিলেন।

অতঃপর ১৯৪৬ সালের ৭, ৮ ও ৯ই এপ্রিলে দিল্লিতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ পরিষদ-সদস্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ওতে সভাপতিত্ব করেন কায়েদে আজম। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী পরিষদ সদস্যদের নিয়ে এক স্পেশাল ট্রেনে বাংলাদেশ থেকে দিল্লিতে উপস্থিত হন। পথিমধ্যে জনতা তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানায়। দিল্লির সেই সম্মেলনে পাকিস্তানের সুস্পষ্ট রূপরেখা সম্বলিত মূল প্রস্তাবের উত্থাপক হিসেবে জনাব সোহরাওয়ার্দী যে বক্তৃতা করেন তার নিকট অন্য সবার বক্তৃতা ম্লান হয়ে যায়।

১৯৪৬ সালে হায়দরাবাদের নিজাম শহীদ সাহেবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁর রাজ্যে গমন করবার জন্যে। নিজাম শহীদ সাহেবকে পেতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। কিন্তু শহীদ সাহেব সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

www.pathagar.com

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

বৃটিশ সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করে ভারত শাসনের ক্ষমতা কংগ্রেস দলের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের হাতে সমর্পণ করেন। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এতে ক্রুদ্ধ হন। তিনি লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে সমস্ত আলোচনা বাতিল করে দিল্লি পরিত্যাগ করেন।

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষিত হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী উক্ত দিবসকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রতিপক্ষের চক্রান্তে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' উপলক্ষে কলকাতায় যে ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হয়, তাতে বৃটিশ সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পঁচিশে আগস্টে লর্ড ওয়াভেল কলকাতা আগমন করেন এবং কলকাতার দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত ও শিহরিত হন। জনাব সোহরাওয়ার্দী লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরিষ্কার ভাষায় জানান যে, সেই মর্মন্তুদ দৃশ্য বৃটিশ-সরকারের অনুসৃত নীতিরই প্রতিফল। বৃটিশ সরকার নীতি পরিবর্তন না-করলে কলকাতার দৃশ্যের অবতারণা সারা ভারতে ঘটতে বাধ্য।

কলকাতার দৃশ্য এবং সোহরাওয়ার্দী সাহেবের যুক্তি লর্ড ওয়াভেলের নিকট একথা সন্দেহাতীতরূপে প্রতিপন্ন করে যে, অখণ্ড ভারত সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার সঙ্গে লর্ড ওয়াভেলের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যায়। জনাব সোহরাওয়ার্দী এই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মাধ্যমে জিন্নাহ-ওয়াভেল আলাপ-আলোচনা পরিচালিত হয়। ১৯৪৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর কায়েদে আজম জিন্না বোম্বে থেকে দিল্লিতে আগমন করেন। ১৬ই সেপ্টেম্বরে তিনি লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে পর ওয়াভেল সাহেব তাঁকে জানান যে, তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবি মেনে নিতে রাজি আছেন। ১৯৪৬ সালের ১৫ই অক্টোবরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কায়েদে আজম এই সময়ে বলেছিলেন ঃ 'শহীদ সাহেব, আপনি শেষ রক্ষা করেছেন।'

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দী বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভক্তিকরণ রোধের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগের একটি উপদল সাত তাড়াতাড়ি কলকাতা ছেড়ে ঢাকা চলে আসায় সে চেষ্টা সফল হয়নি। সোহরাওয়ার্দী সাহেব এ সময়ে সম্ভাব্য ক্ষতি সম্পর্কে যে সতর্কবাণী করেছিলেন, বলা বাহুল্য, পরবর্তীকালে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর সংকট

দেশ বিভাগের পরপরই আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বলে ওঠে। বিশেষ করে 'শহীদিয়া পুলিশ বাহিনী' (যাদেরকে শহীদ সাহেবই পাঞ্জাব থেকে কলকাতায় পুলিশে ভর্তি করেছিলেন) অপশন দিয়ে ঢাকায় চলে আসায় কলকাতার মুসলমানরা একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। স্বভাবতই মুসলমানদের এই অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে তিনি ঐ সময়ই পাকিস্তানে পাড়ি জমাতে চাননি। বরং ভারতে থেকে সেখানকার বিপন্ন মুসলমানদের আগলে রাখাই তিনি তাঁর ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলেন।

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরের দাঙ্গায় নোয়াখালীর ক্ষয়ক্ষতি স্বচক্ষে পরিদর্শনের জন্যে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের প্রথম পক্ষে মহাত্মা গান্ধী কলকাতা পৌঁছেন। কলকাতা সিটি

www.pathagar.com

মুসলিম লীগের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক ও কলকাতার মেয়র জনাব এস.এম. ওসমান গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বুঝান যে, অতীতের দাঙ্গা উপদ্রুত নোয়াখালী সফরের চাইতে সর্বাগ্রে কলকাতার হাল আমলের দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বস্তি এলাকাগুলো সফর করা প্রয়োজন। তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে গান্ধীজীও স্বীকার করেন যে, কলকাতায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারলে পাকিস্তান ও ভারত উভয় রাষ্ট্রেই শান্তি ফিরে আসবে। তিনি অতঃপর জনাব ওসমানকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার উপদ্রুত এলাকা সফর করে বেদনায় মুষ্‌ড়ে পড়েন। জনাব ওসমান এই সময় গান্ধীজীর কাছে প্রস্তাব করেন তিনি যেন শহীদ সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে শান্তির সপক্ষে প্রচার অভিযানে বের হন।

জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন পাকিস্তান গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদানের পর সবে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। জনাব ওসমান তাঁকে শান্তি মিশনের প্রসঙ্গে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয়েছে তা জানান। শহীদ সাহেব সোদপুর আশ্রমে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, ভারতে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার বন্ধ না হলে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে এবং সে অবস্থায় দুই দেশই ধ্বংসের মুখে চলে যাবে। তাছাড়া, সে হানাহানিতে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দু'দেশের লক্ষ লক্ষ নিরীহ হিন্দু-মুসলমান মারা পড়বে। এর পরই তিনি জিজ্ঞাসার সুরে বলেনঃ তাহলে কি এই হবে আমাদের স্বাধীনতার অর্থ? তাছাড়া, দুই দেশ যদি শান্তিতে বসবাস করতে না পারে তাহলে বিদেশী শক্তি কি সেই অজুহাতেই আবার এই সারা উপমহাদেশ গ্রাস করে বস্‌বে না?

শহীদ সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েন এবং সেইদিন থেকেই তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও দুই দেশের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন। বলা বাহুল্য, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শহীদ সাহেবের সঙ্গে হাতে হাত ধরে তিনি পরম নিষ্ঠার সংগেই ব্রত পালন করে গিয়েছেন। এমনকি, এই কাজেই তিনি জীবন দিয়ে গিয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, শান্তি মিশনে বের হওয়ার ঝুঁকি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন; তাই শহীদ সাহেবের উদ্দেশে তিনি সেদিন বলেছিলেনঃ 'শান্তি মিশনের কাজে আমাদের দু'জনকেই পুরাপুরি আত্মনিয়োগ করতে হবে। 'ফকিরদের' মতো নিষ্ঠার সংগে জীবন দিয়ে হলেও এ কাজ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার এ গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদের জীবন যাওয়াও বিচিত্র নয়। তাই একাজে নামার আগে তুমি তোমার আব্বা ও মেয়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কর্তব্য স্থির করো।'

শান্তি মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ

জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী সে সময় সত্যিই একজন ফকিরের মতো শান্তি মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সে সময় করাচী থেকে বার বার তাঁর কাছে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রস্তাব আসছিল। কিন্তু তিনি তখন অন্তরে একটি লক্ষ্যকে স্থিরভাবে নিয়েছিলেন যে, ভারতের নিরীহ মুসলমানদের জীবন রক্ষা করাই বড় কর্তব্য। এই বিষয়ে তিনি জনাব ওসমান ও কলকাতা মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক জনাব এম.এম. তৌফিকের সঙ্গে একমত ছিলেন যে, করাচী যাত্রা স্থগিত রেখে গান্ধীজীর সঙ্গে একযোগে ভারতের মুসলমানদের রক্ষা

www.pathagar.com

করা ও পাক-ভারত সম্পর্ক দৃঢ় করাই হবে তাঁর প্রধান কাজ। এজন্য তিনি কায়েদে আজমের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে জানিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানের কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করা থেকে আপাতত তাঁকে যেন অব্যাহতি দেওয়া হয়, যাতে তিনি কলকাতায় থেকে পাক-ভারত শান্তি অক্ষুণ্ন রাখতে ও মুসলমানদের রক্ষা করতে পারেন। এভাবে করাচীতে গিয়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে বা অন্য কোনো দায়িত্বে বহাল হয়ে সুখ ও ক্ষমতার প্রাচুর্যময় জীবন যাপনের চাইতে বিপদ-সংকুল কলকাতা, দিল্লি, অমৃতসর প্রভৃতি শহরের অসহায় মুসলমানদের পাশে গিয়ে তাদের রক্ষার কঠোর কাজে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মুসলিম লীগ নেতাই সে সময় অসহায় ভারতীয় মুসলমানদের দরদী হিসেবে তাদের একবার চোখের দেখাও দেখতে আসেননি! বলা বহুল্য, মহাত্মা গান্ধী ও জনাব সোহরাওয়ার্দী একযোগে ভারতে শক্তিশালী জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অবশ্যই বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছা রক্ষা করতে হবে এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি উভয় রাষ্ট্রেই অটুট রাখতে হবে। শ্রী রাজাগোপালাচারী, ডঃ পি.সি ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও গভর্নর এবং আরো অনেকেই এই মহান আদর্শের জন্যে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তবে সরদার প্যাটেল ও শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ উগ্রপন্থী হিন্দু নেতা গান্ধী-শহীদের এই শান্তি মিশন পছন্দ করেননি।

মহাত্মা গান্ধীর আমরণ অনশন

এক পর্যায়ে উগ্রপন্থীরা কলকাতায় পুনরায় শান্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। মহাত্মা গান্ধী এই 'বিশ্বাসঘাতকতার' তীব্র নিন্দা করেন এবং এর প্রতিবাদে আমরণ অনশনের সংকল্প ঘোষণা করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষার আহবান জানান। মহাত্মা গান্ধী ও জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ঐ সময় যুক্তভাবে বিরাট বিরাট শান্তি সভায় বক্তৃতা করেন। ঐসব জনসভায় কংগ্রেস ও লীগের পতাকা তখন পাশাপাশি উড়তো। মহাত্মা গান্ধী ঐ দুই পতাকাকেই সালাম জানিয়ে ঘোষণা করতেন যে, তিনি পাকিস্তান ও ভারত উভয় রাষ্ট্রেরই মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

শান্তির এই মহান বাণী মহাত্মা গান্ধী ও সোহ্‌রাওয়ার্দী একত্রে দিল্লি, পাঞ্জাব প্রভৃতি দাঙ্গা-উপদ্রুত অঞ্চলে বহন করে নিয়ে যান।

নিখিল ভারত লীগ কনভেনশন

১৯৪৭ সালের নবেম্বর মাসে জনাব সোহরাওয়ার্দী কলকাতায় তাঁর নিজের বাসভবনে নিখিল ভারত লীগ কনভেনশন আহবান করেন। সারা ভারতের লীগ নেতারাই এই কনভেনশনে আসেন ও বক্তৃতা করেন। সেই কনভেনশনে শান্তির কাজে সকলের সহযোগিতা কামনা করে তিনি অভিযোগ করেন যে, পূর্ব পাঞ্জাবের দাঙ্গা-উপদ্রুত অঞ্চলে তিনি যখন রিলিফের কাজে গিয়েছেন, সে সময় কোনো লীগ নেতাই তাঁর পাশে এসে দাঁড়াননি।

এই কনভেনশনে ভারতীয় মুসলমানদের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার পর বলিষ্ঠ ভাষায় তাঁদের পক্ষ থেকে বহুবিধ দাবি-দাওয়া উত্থাপন করা হয়।

নিখিল ভারত লীগ কাউন্সিল

ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসে জনাব সোহরাওয়ার্দী করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে শেষবারের মতো যোগদান করেন। কায়েদে আজম এই

www.pathagar.com

অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী মুসলিম লীগের পরিবর্তে একটি জাতীয় দল গঠনের পরামর্শ দেন। কিন্তু তাঁর সে প্রস্তাবে সেদিন তেমন গুরুত্ব পয়নি।

সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মহাত্মা গান্ধীকে ত্যার ষড়যন্ত্র

ভারতীয় মুসলমানদের উচ্ছেদ ও পাকিস্তানকে জন্মেই ঘায়েল করার অশুভ চক্রান্ত এইভাবে যখন জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রচেষ্টার ফলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছিল, তখন এক অশুভ শক্তি মহাত্মা গান্ধী ও জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গোয়ালিয়রে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কেননা, এই দুই মহান নেতাই ভারতের মুসলমানদের রক্ষা করছিলেন। সেই অশুভ শক্তির কথা ছিলো যে, যে পর্যন্ত শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী জীবিত আছেন সে পর্যন্ত গান্ধীজীকে তথাকথিত 'শান্তি মিশন' থেকে ফেরাবার উপায় নেই এবং শান্তি মিশন চল্‌তে থাকলে ভারতীয় মুসলমান ও পাকিস্তানের প্রতি তাদের জাতক্রোধ মিটাবার উপায় নেই। এ কারণেই জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর জীবনের ওপর একাধিকবার হামলার চেষ্টা চালান হয়। কিন্তু প্রতিবারই খোদার অশেষ মেহেরবানীতে তিনি রক্ষা পান। নাথুরাম গডসে পিস্তল হাতে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে গিয়েও চালায়নি, এক চক্ষু মুদে চিন্তারত সোহ্‌রাওয়ার্দী সত্যিই সোহ্‌রাওয়ার্দী কিনা এই সন্দেহে। গান্ধী হত্যা মামলায় গডসে নিজেই এ কথা স্বীকার করে। এতসব সত্ত্বেও মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে রক্ষার কাজে অবিচল থাকেন। একমাত্র মহাত্মা গান্ধী ছাড়া সম-সাময়িককালে অন্য কোনো রাজনীতিকই এভাবে আর আত্মত্যাগের নজির স্থাপন করতে পারেননি।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে জানা গেলো যে, প্যাটেল ও তাঁর দলবল গোপনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নতুন এক চক্রান্ত এঁটেছেন। ভাগ-বাঁটোয়ারার পর পাকিস্তানের নগদ যে ৫৫ কোটি টাকা পাওনা হয়, কাশ্মীর যুদ্ধের অজুহাতে তা দেওয়ার ব্যাপারে তারা ঘোরতর আপত্তি তুলে বসেন। এই অবস্থায় জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর হস্তক্ষেপে মহাত্মা গান্ধী দিল্লিতে আমরণ অনশন শুরু করেন। পাকিস্তানের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ ছাড়াও ভারতে মুসলমানদের রক্ষা ও মস্‌জিদসমূহ রক্ষার দাবিও মহাত্মা গান্ধী জানান। শেষ পর্যন্ত প্যাটেলের কাছ থেকে লিখিত একটি প্রতিশ্রুতি-পত্র পাওয়ার পর গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন। পাকিস্তানের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করা হয়।

মহাত্মা গান্ধী হত্যা

এ ঘটনায় রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ খুবই ক্ষুব্ধ হয়। নাথুরাম বিনায়ক গডসে প্রথমত সোহরাওয়ার্দীকে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু দৃষ্টি-বিভ্রমে তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সে সময় দিল্লীতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী বিড়লা ভবনে অবস্থান করছিলেন।

১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারি বিড়লা পার্কে মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভায় রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ একটি বোমা নিক্ষেপ করে; কিন্তু বোমাটি লক্ষ্যচ্যুত হয়। তারপর ৩০শে জানুয়ারি। এই তারিখে নাথুরাম গড্‌সে একটি পিস্তলের গুলীতে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করে। সৌভাগ্যক্রমে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী সেদিন বম্বেতে ছিলেন। এই ভয়াবহ ঘটনার পরে উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় জনমত সৃষ্টি হওয়ায় ভারতে কিছুটা শান্তি ফিরে আসে। রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়।

www.pathagar.com

সোহ্‌রাওয়ার্দীর পূর্ব বাংলায় প্রবেশে বাধা

মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পরে কলকাতায় জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর ওপর অন্যায়ভাবে বিরাট অঙ্কের আয়কর সংক্রান্ত মামলা চাপিয়ে তার অজুহাতে তাঁর সব সম্পত্তি দখল করে নেয়া হয়। ১৯৪৯ সালে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর অসুস্থ আব্বা স্যার জাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ইন্তিকাল করেন।

এসব ঘটনায় জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী কলকাতা ত্যাগ করে করাচীতে চলে যাবার জন্যে মনস্থির করেন। এর আগে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ৩রা জুন পূর্ববঙ্গের নাজিমউদ্দিন সরকার জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে ঢাকা থেকে বহিষ্কার করেন এবং তাঁর পূর্ববঙ্গ প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। মূলত জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর জনপ্রিয়তার জন্যেই নাজিমউদ্দিন সরকার ঐ সময় অহেতুকভাবে তাঁর শান্তি মিশনের ওপরই নিষেধাজ্ঞা জারি করে বসেন। ফলে, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী এবার ঢাকায় না এসে করাচীতে যেতে বাধ্য হন।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী তখন নিঃস্ব। কলকাতা থেকে করাচী যাবার রাহা খরচা পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিলো না। এ অবস্থায় তিনি কয়েকজন বন্ধুর থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়ে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে করাচীতে আসেন এবং তাঁর শ্বশুর মরহুম স্যার আবদুর রহিমের বাসায় উঠেন। ঐ সময় তাঁর গণপরিষদের সদস্য পদটিও খামখেয়ালীভাবে বাতিল করা হয়। অথচ বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনিই ছিলেন এই গণপরিষদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। পাকিস্তান আগমনের প্রাক্কালে এই ঘটনায় তিনি অত্যন্ত ব্যথা পান। সে সময় এক চিঠিতে তিনি আমাকে লিখেছিলেন, 'আমি বড়ই ব্যথা পেয়েছি যে, অন্য কেউ নয় স্বয়ং গণপরিষদের প্রেসিডেন্টই তাঁর প্রভুদের নির্দেশে এই কাজ করলেন।'

কোনো ব্যাপারে ব্যথা পাওয়া বা মনঃক্ষুণ্ন হওয়া জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর পক্ষে সাময়িক ব্যাপার মাত্র। পরক্ষণে সবই মন থেকে মুছে ফেলাই ছিলো তাঁর ধর্ম। স্বভাবসুলভভাবেই এই ঘটনাও তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই ভুলে গেলেন। তাঁর গণপরিষদের সদস্যপদটি কেড়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে যারা সেদিন গোড়াতেই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেছিলেন তাদের তিনি ক্ষমার চোখেই দেখেছেন।

পাকিস্তানে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব

১৯৪৯ সালে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী যখন স্থায়ীভাবে পাকিস্তানে চলে আসলেন ততদিনে পাকিস্তানের শাসন কাঠামো কায়েমী স্বার্থের রজ্জুতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছে। যে মহাশক্তিশালী মুসলিম লীগের দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ খতম হয়ে পাকিস্তান কায়েম হয়েছিল, প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের হাতে পড়ে সে মুসলিম লীগের তখন মৃত্যু ঘটেছিল। এক রাষ্ট্র—এক দল—এক সরকার শাসকচক্রের এই আজগুবি দর্শন ওপর হতে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রকাশ্যেই তখন ঘোষণা করা হচ্ছিল যে, কোনো রকম বিরোধিতাই সহ্য করা হবে না। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা উচ্চারণ করা তো দূরের কথা, মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলতেও তখন কিছু ছিলো না। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, সাধারণ নির্বাচনের নামোচ্চারণও ছিলো মহাপাপ। প্রকৃত সংগ্রামী মুসলিম লীগাররা কালো তালিকাভুক্ত। তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থারও অভাব ছিলো না। মেরুদণ্ডহীন 'যো হুজুরের' দলের সমর্থনেই তখন দেশ শাসন চল্‌ছিলো। এই পরিবেশের মধ্যে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী এদেশে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার কঠিন কাজে হাত

www.pathagar.com

দিলেন। প্রতিপক্ষের ভ্রূকুটি আর হুমকি তাঁর কর্ম প্রতিভাকে যেন আরও বলিষ্ঠতা এনে দিলো। এ সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, অনেকেই জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর অমঙ্গল চিন্তায় প্রমাদ গুণ্‌লেন।

ঐ সময় জনৈক বিশ্বস্ত কর্মী করাচীতে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আপাতত পাকিস্তান ত্যাগ করে ইউরোপ বা অন্য কোনো দেশে চলে যাবার অনুরোধ জানান যাতে তাঁর জীবনের ওপর কোনো বিপদ না আসতে পারে।

এই অনুরোধের জবাবে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী সেদিন বাঘের মতো গর্জন করে বলেছিলেনঃ 'কখ্‌খনো না। যাও, ওদের গিয়ে বলো পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে আমি তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম।'

এর পরই জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁর সংগ্রামী অভিযান জোরদার করেন এবং এক এক করে করাচী পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘুরে জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের নিভৃত পল্লীর জনসাধারণ সেদিন জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মধ্যে এমন এক জননেতার সন্ধান পায়, তাঁকে তারা পূর্ব পাকিস্তানীদের মতোই নিজেদের নেতা বলেই বরণ করে নেয়। সেদিন থেকেই জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী জনসাধারণের কাছে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে একমাত্র বন্ধনরজ্জু বলে স্বীকৃতি পান।

আওয়ামী লীগের জন্ম

দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করার জন্যে গোড়া থেকেই জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী একটি রাজনৈতিক দল গঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন। ঐ সময় মামদোতের নওয়াব ইফ্‌তিখার খানের নেতৃত্বে জিন্নাহ মুসলিম লীগ ও মান্‌কীর পীর সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ বলে দুটো রাজনৈতিক দল ছিলো। শহীদ সাহেব প্রথমে এঁদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার প্রয়াস পান; কিন্তু পরে তিনি নিজেই জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি দল গঠনে যত্নবান হন। এদিকে ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অত্র লেখকের সভাপতিত্বে ঢাকার টিকাটুলির রোজ গার্ডেনে মুসলিম লীগ কর্মীদের এক কনভেনশন হয়। ঐ কনভেনশনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি ও জনাব শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠিত হয়। জনাব শেখ মুজিবুর রহমান (তখন জেলে) যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। অচিরেই জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক একটি দল গঠনের পরিকল্পনানুসারে ১৯৫০ সালে পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। তিনি নিজে তার সভাপতি ও জনাব মাহমুদুল হক ওসমানী এই দলের সাধারণ সম্পাদক হন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন

পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী দেশের দুই অংশে ব্যাপক সফর করে দেশবাসীকে গণতন্ত্রমনা করে তোলেন। ক্রমে ক্রমে ঘনিয়ে আসে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। ঐ সময় জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী, শেরেবাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক ও মওলানা ভাসানীর ত্রয়ী নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে নির্বাচনী সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে ২১-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সে নির্বাচনী সফরেরও প্রধান সিপাহসালার ছিলেন জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী।

www.pathagar.com

১৯৪৬ সালে পাকিস্তান ইস্যুর নির্বাচনে দেশবাসী জনাব সোহরাওয়ার্দীকে যেভাবে চারণের বেশে সমগ্র প্রদেশ চষে বেড়াতে দেখেছিল, এবারকার নির্বাচনেও তাঁকে সেই একই ভূমিকায় দেখ্‌তে পায়। জনাব সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেশবাসীর মনের বা দেশবাসীর সঙ্গে জনাব সোহরাওয়ার্দীর মনের পরিচয় যে কত ঘনিষ্ঠ ছিলো, তা বুঝতে মাত্র এক মাসের সময় লাগে। যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী মনোনয়ন শেষ করে নির্বাচনী অভিযানের প্রথম পর্বে যশোরের প্রকাশ্য জনসভায় তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল মাত্র ৯টি সিটে জয়ী হবে, বাকিগুলোতে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীই জয়যুক্ত হবে। সেদিন তাঁর এ ঘোষণায় অনেকেই হেসেছিলেন। এমনকি জনৈক বিদেশী কূটনীতিক ক্ষমতাসীন দলের নিরঙ্কুশ জয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে সারা দেশ অবাক বিস্ময়ে দেখতে পায়, জনাব সোহরাওয়ার্দীর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং ক্ষমতাসীন দল মাত্র ৯টি আসনেই জয়ী হয়েছে—বাকি সব আসনে তাদের ভরাডুবি হয়েছে। একেই বলে জনগণের নেতা।

শাসন সঙ্কট

নির্বাচনী অভিযানজনিত অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে জনাব সোহরাওয়ার্দী অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ঐ বছরই জুন মাসে চিকিৎসার জন্যে জুরিখ যান। দেহে কয়েকবার অস্ত্রোপচার শেষে দীর্ঘ ৬ মাস পর ১২ই ডিসেম্বর (১৯৫৪) তিনি দেশে ফিরে আসেন। ইত্যবসরে, তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল জনাব গোলাম মোহাম্মদ ২৪শে অক্টোবর (১৯৫৪) গণপরিষদ ভেঙ্গে দিলে দেশে গুরুতর রকমের শাসন-সঙ্কটের উদ্ভব হয়। জনাব মোহাম্মদ আলী বগুড়ার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা হিসেবে কাজ চালাতে থাকে। জনাব সোহরাওয়ার্দী দেশে প্রত্যাবর্তনের পর দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েমের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতিতে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল জনাব গোলাম মোহাম্মদ জনাব সোহরাওয়ার্দীকে মোহাম্মদ আলী-মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী হিসেবে যোগদানের অনুরোধ জানান। সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে তিনি সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন; কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিদানকারিগণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় দেশের শাসনব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না; তবে নয়া গণপরিষদ গঠনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় তরণীকে তিনি একটা পথে এনে দাঁড় করতে সক্ষম হন। আর একটি কাজ তিনি করেছিলেন, যার অভাবে ১৯৫৬ সালেও শাসনতন্ত্র প্রণীত হতো কিনা, সন্দেহ।

১৯৫০ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে মূলনীতি কমিটির যে রিপোর্ট পেশ করেন, পূর্ব পাকিস্তান তা একবাক্যে প্রত্যাখ্যান করে। পর বছর জনাব খাজা নাজিমউদ্দিন দ্বিতীয় মূলনীতি কমিটির যে রিপোর্ট পেশ করেন এবং যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের সব ক'টি ইউনিট বজায় রেখে ছোট ইউনিটগুলোকে পাঞ্জাবের অংশ থেকে কিছু ভাগ দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়, পাঞ্জাব তা প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি, এ নিয়ে পরিস্থিতি এমন অশান্ত হয়ে ওঠে যে, পাঞ্জাবে সামরিক শাসন জারি, দওলতানা-মন্ত্রিসভা বাতিল এবং শেষ পর্যন্ত নাজিম-মন্ত্রিসভাও বাতিল হয়ে যায়।

বলা বাহুল্য, এ সমস্যা দেখা দেয় দেশের দুই অংশের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে। গণতন্ত্রসম্মত সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তান ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠতার

www.pathagar.com

অধিকারী। এ অধিকার ত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তানকে সংখ্যাসাম্যের ফর্মুলা গ্রহণ করানো সহজ ব্যাপার ছিলো না। অথচ, এ প্রশ্নের মীমাংসা ব্যতীত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কোনোক্রমেই সম্ভব ছিলো না। স্বভাবত পূর্ব পাকিস্তানকে দিয়ে সংখ্যাসাম্যের ফর্মুলা গ্রহণ করানো কারো পক্ষেই সম্ভব হলো না। সম্ভব হয়েছিল কেবল জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর হস্তক্ষেপে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বিভিন্ন প্রশ্নে ভারসাম্য সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তিনি উদারচিত্তে সংখ্যাসাম্য মানিয়ে নিতে সক্ষম হন।

তিনি ১৯৫৫ সালে মারীর উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনে পাকিস্তানে মোট দুটো প্রদেশ (পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমাঞ্চলের সকল প্রদেশ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান), পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, উভয়াঞ্চলে সংখ্যাসাম্য, যুক্ত নির্বাচন এবং বাংলা ও উর্দু রাষ্ট্রভাষা—এই পাঁচ দফা সম্বলিত মারী চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হন। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন জনাব মোহাম্মদ আলী বগুড়া (তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী), চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, জনাব এম.এ. গুরমানী, জনাব ফজলুল হক, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ও জনাব আতাউর রহমান খান।

৭ই জুলাই (১৯৫৫) মারীতে পার্লামেন্ট হিসেবে নয়া গণপরিষদের অধিবেশন বসে। ঐ অধিবেশনে 'শেরেবাংলা' ও তাঁর দলের সমর্থনে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পরিষদের নয়া নেতা নির্বাচিত হয়ে নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিত্বের আমলেই ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি গণপরিষদে নয়া শাসনতন্ত্র পাস হয়। শাসনতন্ত্র বিলের ওপর তিনি ঐ সময় যে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন, উত্তরকালে তা তাঁর একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতা হিসেবেই স্বীকৃতি পায়।

প্যালেস ক্লিক

নয়া শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার শুরু থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে 'প্যালেস ক্লিক' মাথাচাড়া দেয়। সেই ক্লিকেরই শিকার হয়ে ১৯৫৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন। তদানীন্তন প্রেসিডেন্টের রিপাবলিকান দলের সমর্থনে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জনাব সোহারাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের ছয় দিন আগে পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর দল ক্ষমতাসীন হয় এবং জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন সরকার জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে পূর্ব ঘোষিত নীতি অনুসারে সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দিয়ে দেশবাসীর অশেষ শ্রদ্ধাভাজন হন। শাসনভার গ্রহণের পরক্ষণেই জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী মোট তিনটি ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এগিয়ে যেতে থাকেন। প্রথমটি, দেশে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি, দ্বিতীয়টি, বিদেশে পাকিস্তানের গৌরব বৃদ্ধি ও তৃতীয়টি, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সুসম ব্যবহার। আর এসবেরই প্রস্তুতি হিসেবে কার্যভার গ্রহণের এক মাসের মধ্যে ঢাকায় পার্লামেন্টের রাতব্যাপী অধিবেশন চালিয়ে বহু বিতর্কিত নির্বাচন-পদ্ধতির সমাধান করেন। সেদিনকার সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতার গভীর যুক্তিজালে পৃথক নির্বাচনের অতি বড় সমর্থককেও তিনি যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে এনে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির প্রতিই পার্লামেন্টের অনুমোদন আদায়ে সক্ষম হয়েছিলেন।

এ প্রশ্নের মীমাংসার পরই তিনি দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করেন, আর তারই পাশাপাশি একের পর এক ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে ব্যাপকভাবে সফর করে বিশেষ করে কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানের পক্ষে এমন

www.pathagar.com

জনমত সৃষ্টি করেন যে, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান আসন্ন বলেই সর্বমহলে ধারণার সঞ্চার হয়। যে চীনের নাম করাও পাকিস্তানে এক সময় পাপ বলে গণ্য হতো, সেই মহাচীনের প্রধানমন্ত্রীকে পাকিস্তানে আমন্ত্রণ করে ও নিজে চীন সফরে গিয়ে তিনি চীনের সংগে সর্বপ্রথম পাকিস্তানের সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকায় চীনা প্রধানমন্ত্রীর সম্বর্ধনা একটি রীতিমত ইতিহাস। বিরূপ সমালোচনার ভয়ে চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের মৈত্রী প্রতিষ্ঠার 'দুঃসাহস' এর আগে পাকিস্তানের আর কোনো সরকারের হয়নি। এ কথার উল্লেখ করে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁর সরকারের নীতি বিশ্লেষণ করে পল্টনের এক জনসভায় বলেছিলেন ঃ

'এই কাজ (চীনের সঙ্গে মৈত্রী) আমিই প্রথম আরম্ভ করি। এতদিন পর্যন্ত কারো সাহস হলো না যে, এইসব কাজ করেন। আমার আগে আরও সব যাঁরা ছিলেন তাঁরা বললেন, বাবা, এইসব কাজ করতে ভয় করে। ভয়ের কি আছে এর মধ্যে? যদি আমার মন সৎ থাকে, যদি আমার মনের মধ্যে মহব্বত থাকে, যদি আমার মনের মধ্যে হিংসা না থাকে তাহলে ভয়ের কারণ কি আছে? আমি আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করি না।'

বস্তুত পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি তখন এক বৈপ্লবিক খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। সমগ্র জাতির জীবনে নয়া স্পন্দন শুরু হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের এক বলিষ্ঠ ভূমিকা মূর্ত হয়ে ওঠে। দেশে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি জোরেশোরে চলতে থাকায় কায়েমী স্বার্থ নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আঁৎকে ওঠে। ফলে, মাত্র এক বছরের মাথায় গিয়ে ছলে-বলে-কৌশলে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। ১১ই অক্টোবর (১৯৫৭) জনাব সোহরাওয়ার্দী প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মীর্জার 'অভিপ্রায় অনুসারে' পদত্যাগ করেন। সোহরাওয়ার্দীর এই বাধ্যতামূলক পদত্যাগের প্রতিবাদে সারা দেশে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

জনাব সোহরাওয়ার্দীকে পার্লামেন্টে আস্থাভোট অর্জনের সুযোগটুকু পর্যন্ত না দিয়ে সেদিন যাঁরা জনাব চুন্দ্রীগড়ের নেতৃত্বে নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করান, তাঁদেরই কারসাজিতে আবার দু'মাস না যেতেই চুন্দ্রীগড়-মন্ত্রিসভায় পতন ঘটে। ফলে, ১৯৫৯ সালের ১৫ই ফ্রেব্রুয়ারি দেশব্যাপী অবাধ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের শর্তে জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ দলের সমর্থনপুষ্ট হয়ে ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৫৭) জনাব ফিরোজ খান নুন নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সমঝোতাক্রমে নুন-মন্ত্রিসভা দেশের সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতির কাজ আরো কিছুটা এগিয়ে নিতেই ৭ই অক্টোবর (১৯৫৮) প্রেসিডেন্ট মীর্জা অকস্মাৎ শাসনতন্ত্র বাতিল করে পার্লামেন্ট ও কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার ভেঙ্গে দিয়ে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন এবং সকল ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তারপর সংস্কারের নামে দীর্ঘ চার বছর যাবৎ দেশের বুকে সামরিক শাসনের যে জগদ্দল পাথর চাপিয়ে রাখা হয়, তার সঙ্গে দেশবাসীর প্রত্যেকেরই পরিচয় আছে।

এবডোর যাঁতাকল

দেশের জনপ্রিয় রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে তথাকথিত 'এবডো'র যাঁতাকলে ফেলে একের পর এক তাঁদেরকে দীর্ঘ ছয় বছরের জন্যে রাজনৈতিক জীবন থেকে নির্বাসিত করা হয়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যিনি জীবনে কারও প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ পোষণ করেননি, দেশ ও দেশবাসীর মঙ্গল চিন্তাই ছিলো যাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত, দেশের

www.pathagar.com

দুই অংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন একমাত্র নেতা হিসেবে দেশবাসীর মনে যিনি স্থায়ী আসন অর্জন করেছিলেন, সেই জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে 'এবডো' ঘোষণা করে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরবর্তী ছয় বছরের জন্য রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়। ঘটনার সেখানেই শেষ হয় না। 'এবডো' ঘোষিত হয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দী যখন আইন ব্যবসায় নিয়ে ব্যস্ত, তখন আইয়ুব শাসনতন্ত্র ঘোষণার প্রাক্কালে ১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। সামরিক শাসন আমলের সরকারের চার বছরের আয়ুষ্কালে সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারই সবচেয়ে নির্বুদ্ধিতার কাজ বলে পরিগণিত হয়। কেননা, জনগণের নেতাকে জনগণের কাছ থেকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রতিবাদে সারাদেশ সেদিন গর্জে ওঠে। সে গর্জনে কুমারিকা থেকে সুদূর তোরখাম পর্যন্ত প্রকম্পিত হয়। সরকারি বিধিনিষেধের ফলে সে গর্জন সেদিন বিদেশে শ্রুত হয়নি সত্য; কিন্তু পাকিস্তানের শিরায় তার প্রচণ্ড কাঁপুনি জেগেছিল। ফলে অবস্থার চাপে দীর্ঘ ছয় মাস বিশ দিন পর কারাগার থেকে সরকার তাঁকে মুক্তি দিলে সারাদেশে আনন্দের শিহরণ জাগে।

গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন

চাপা রোগ নিয়ে ভগ্নদেহে জনাব সোহরাওয়ার্দী করাচীর জিন্নাহ হাসপাতালে স্থান নেন। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর তিনি প্রথম সুযোগেই ঢাকা আগমন করেন। ঐদিন ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৬২) ঢাকার বিমানবন্দরে নেতা-সম্বর্ধনার নয়া ইতিহাস সৃষ্টি হয়। বৃষ্টির দরুন ২১শে সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানের জনসভা পরিত্যক্ত হলে ঐ রাতেই তিনি করাচী ফিরে যান এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর লাহোরে তাঁকে ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা জানানো হয়। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি তিনি বিভিন্নস্থানে জনসভায় বক্তৃতার সংকল্প করেন; কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতেই ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদল কর্তৃক তাঁর জনসভা বানচাল করা হয়। শেষ পর্যন্ত ২৮শে সেপ্টেম্বর গুজরানওয়ালায় গেলে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় জনৈক কর্মী আহত হন। এই অবস্থার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি মনোভাব পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আর কোনো জনসভা না করার সংকল্প করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে বিরোধী দলে নেতাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করার এই ধরনের ঘৃণ্য প্রচেষ্টার প্রতিবাদে তিনি লায়ালপুর, লাহোরা ও করাচীর সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। লাহোর থেকে করাচীতে ফিরে এলে স্টেশনে তাঁকে যে ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা জানানো হয়, তার ওপরও ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের দিয়ে আক্রমণ চালানো হয়। একের পর এক ঘটনায় পশ্চিম পাকিস্তান তথা সমগ্র পাকিস্তানের গণতন্ত্রমনা মানুষমাত্রেই স্তম্ভিত হয়।

৫ই অক্টোবর জনাব সোহরাওয়ার্দী শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রায়ন ও দেশবাসীর হৃত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালানোর জন্য উভয় অংশের সর্বদলীয় নেতাদের সমর্থনে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের কথা ঘোষণা করেন। ফ্রন্টের অঙ্গীকারপত্রে প্রথম পর্বে দেশের উভয় অংশের ৫৪ জন নেতা স্বাক্ষর করেন। পরে আরো অনেকে ফ্রন্টে শরিক হন।

অতঃপর ৭ই অক্টোবর ঢাকার পল্টন ময়দানে আয়োজিত ঐতিহাসিক জনসমুদ্রের উদ্দেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশবাসীকে তিনি 'কন্টকাকীর্ণ পথে পাড়ি জমাবার' জন্যে প্রস্তুত

www.pathagar.com

হওয়ার আহবান জানিয়ে ৯ নেতা সমভিব্যাহারে বিভিন্ন পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের শহর-বন্দর-গঞ্জে ঝটিকা সফর করে দেশবাসীর মনে জাগরণের যে জোয়ার জাগান, তা এক ইতিহাস। বাংলার নগরে-বন্দরে, হাটে-ঘাটে, মাঠে-ট্রেনে, স্টীমারে সেদিন যে জাগরণ তথা প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা গিয়েছে, আর কোনোকালে তা দেখা যাবে কিনা সন্দেহ।

দেশবাসীকে জাগাবার কঠোর ব্রত নিয়ে প্রায় তিনমাস যাবৎ সিংহহৃদয় সোহরাওয়ার্দী যে অমানুষিক পরিশ্রম করেন, তদ্দরুন কারাগারে লব্ধ রোগ তাঁর আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। জানুয়ারির (১৯৬৩) প্রথমভাগে ফিরে যান তিনি করাচীর জিন্নাহ হাসপাতালে। কঠিন হৃদরোগে তিনি যখন হাসপাতালে শয্যাশায়ী তখনই সরকার প্রধানত তাঁকে লক্ষ্য করেই দু'দফা নয়া অর্ডিন্যান্স জারি করেন। এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী জনাব সোহরাওয়ার্দীর মতো লোকেরও কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংযুক্ত থাকা অথবা রাজনৈতিক প্রশ্নে বিবৃতি দান পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়। রোগশয্যা থেকে ঐ রাতেই তিনি তাঁর প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারি দুরভিসন্ধির তীব্র সমালোচনা করেন।

দেশ যাঁর প্রতীক্ষায় ছিলো উন্মুখ

রোগ কিছুটা উপশম হলে চিকিৎসকদের পরামর্শে ১৯শে মার্চ (১৯৬৩) তিনি বৈরুত রওয়ানা হয়ে যান। স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হলে তিনি লণ্ডন যান। লন্ডন থেকে দেশে ফিরবার প্রস্তুতিকালে ১৩ই সেপ্টেম্বর তিনি রোমে তাঁর ভগ্নীপতি জনাব একরামউল্লার আকস্মিক ইন্তিকালের খবরে খুব মুষড়ে পড়েন। ফলে দেশে ফেরার পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রেখে তিনি আরো কিছুদিন বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বৈরুত রওয়ানা হন। পথিমধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় কয়েকদিন তিনি এথেন্সে কাটান। কিছুটা সুস্থ হলে বৈরুত গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং এক পর্যায়ে তিনি দেশে ফিরবার সংকল্পও করেন। ইত্যবসরে, তাঁর চিকিৎসক দেশে ফিরবার আগে জুরিখ গিয়ে হার্নিয়া অপারেশন করিয়ে নেয়ার পরামর্শ দিলে তিনি দিন পনেরোর জন্যে জুরিখ যাবার প্রস্তুতি নেন। অর্থাভাবে যাত্রা কিছুটা তাঁর বিলম্বিত হয়। ইত্যবসরে, তাঁর এক পত্রে জানা যায় যে, ১লা বা ২রা ডিসেম্বরে (১৯৬৩) তিনি করাচী পৌঁছে ৭ই ডিসেম্বর নাগাদ ঢাকায় পৌঁছাচ্ছেন। এই পত্রের মর্ম অনুযায়ী সারা দেশ যখন তাঁর আগমন-প্রতীক্ষায় উন্মুখ, ঠিক সেই মুহূর্তে ৫ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে খবর পাওয়া যায় যে, ঐদিন ভোর তিনটায় বৈরুতের ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে জাতির গৌরব জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্না এলায়হে রাজেউন)।

পাকিস্তানে গণতন্ত্রের সঙ্কট

পাকিস্তানে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে, একথা জনাব সোহরাওয়ার্দী কখনোই স্বীকার করেননি। তিনি একথাই বরাবর বলেছেন যে, পাকিস্তানে গণতন্ত্রকে কোনোদিন সুযোগই দেয়া হয়নি। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর সারা দেশ ভিত্তিতে একবারও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এমনকি বহু বছর অপচয়ের পর ১৯৫৬ সালে যে শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়, সেটাও কার্যকর হওয়ার পূর্বেই বাতিল হয়ে যায়। দেশে আজ যাবতীয় ক্ষমতা এক ব্যক্তির করায়ত্ত। এই পরিস্থিতিতে দল গঠন নিরর্থক বিধায় বর্তমান শাসনতন্ত্রকে গণতন্ত্রায়নের জন্যে তিনি দেশময় আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। এই আন্দোলনের সাফল্যের জন্যে তিনি সকল দলকে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ, হওয়ার আহবান জানিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কানে বাজে আজো

নেতা যে ভাষায় তাঁর দেশবাসীর সঙ্গে কথা বলতেন.....

[মরহুম নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জনসভায় দাঁড়িয়ে তাঁর দেশবাসীর সঙ্গে যে ভাষায় এবং যেভাবে কথা বলতেন, সাঁটলিপির মাধ্যমে তা হুবহু ধরে রাখা হয়েছে। মরহুমের নিজস্ব বাচনভঙ্গির অভ্রান্ত ও নিখুঁত নজির হিসেবে এখানে তার একটি বক্তৃতার হুবহু বিবরণ পরিবেশন করা হলো। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে ১৯৫৭ সালের ১৪ই জুন পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনি এই ঐতিহাসিক বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন। সেদিনের শ্রোতামণ্ডলীর স্মৃতিপটে আজও এই বক্তৃতা অক্ষয় হয়ে রয়েছে। বক্তৃতাটি পাঠ করলে মনে হবে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যেন শ্রোতাদের সামনে সশরীরে দাঁড়িয়ে তাঁর ভাষণ দিচ্ছেন।]

এই সেদিনই তো এখানে একটা বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করে গেলাম। পূর্ব পাকিস্তানে যখন আসবো, তখন প্রত্যেকবারই যদি আমাকে এরকম জনসভায় বক্তৃতা করতে হয়, তাহলে প্রতিবারই নতুন কথা কোথা থেকে বলবো? যাক, আপনারা শুনেছেন যে, আওয়ামী লীগের একটা কাউন্সিল মিটিং হয়ে গেছে। পূর্ব পাকিস্তানের সব জায়গা থেকে প্রতিনিধিরা এসে এ মিটিং-এ যোগদান করেছেন। তাঁরা সে মিটিং-এ কতকগুলো decision নিয়েছেন, তা আপনারা খবরের কাগজে পড়েছেন। সেগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আমি বোধ করছি না। এখন কথা হচ্ছে, আপনারা আমার কাছে কি শুনতে চান? আমি যখন যা বলেছি, তা আপনারা খবরের কাগজে পড়েছেন।

অবশ্য আমি আগে যে কথা বলতাম, তা খবরের কাগজ ছাপতো না, যদি বা কখনও ছাপতো তা ঠিকমতো ছাপতো না। এখন যদিও তারা আমাকে সমালোচনা করে থাকে, আমার বিরুদ্ধে লিখে থাকে, তবে যা বলি, সেটা খবরের কাগজে ছেপে থাকে, কেননা জনসাধারণ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কি কথা বলেন সেটা জানতে চায়। সেজন্যে আমি বলছি যে, আপনাদের কাছে বলবার মতো নতুন কথা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আপনাদের প্রাদেশিক সরকার ভালোভাবেই চলছে। তবে দেশের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা আছে, তা আমরা সকলেই জানি। পূর্ব পাকিস্তানের যে সমস্ত সমস্যা আছে, সেগুলো কি করে সমাধান করা যায়—সেগুলো দূর করতে আপনাদের প্রাদেশিক সরকারকে সাহায্য করার জন্যে আমি এখানে এসেছি।

আপনারা সকলেই জানেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে চালের দর বেড়ে গেছে। আপনারা একথাও জানেন যে, এ বছরে ফসল ভালো হয়েছে। যদি কেউ বলেন যে, এবার ফসল মন্দ হয়েছে, তিনি মিথ্যা বলবেন। ফসল ভালো হয়েছে, একথা সত্য। লোকের কাছে চাল আছে, বাজারেও চাল আসে। কিন্তু চালের দর বেশি। গরীব লোকেরা চাল কিনতে পারছে না, খেতে পারছে না, তারা দুঃখে দিন যাপন করছে—এ বিষয়টা সামনে রেখে আমাদের

www.pathagar.com

কাজ করতে হবে। আমাদের দেখতে হবে এ সমস্যার কিরূপে সমাধান করা যায়। আমরা দেখতে পারছি যে, গরীব জনসাধারণ চড়াদরে চাল কিনে খাচ্ছে কিন্তু জিজ্ঞাসা হলো যে, বর্ধিত মূল্যটা কার পকেটে যাচ্ছে? যে কৃষকেরা এ চাল উৎপন্ন করেছে, তারাই এ টাকাটা পাচ্ছে, চালের মূল্য বৃদ্ধির একটা কারণ হলো যে, অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বর্ধিত মূল্যে কিনতে হচ্ছে এবং সে যদি চাল সেই হারে চড়া দামে বিক্রি না করে তাহলে তার সংসার চলতে পারে না। কাজেই অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সাথে সাথে চালের মূল্যও বৃদ্ধি হতে বাধ্য।

এখন কথা হচ্ছে, কি রকম করে আমাদের এখানে ওটা বন্ধ করবো, কি করে এখানে দর নিম্নমুখী করবো। এই হচ্ছে চালের অবস্থা। আমরা এখন দেখছি বাজারের মধ্যে চাল আসছে; কিন্তু দর একটু বেশি আছে, এটা হওয়া উচিত নয়। তবু এর কারণ আমাদের জানতে হবে। এখন দুনিয়ার সব জায়গায় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছে। দুনিয়ার মধ্যে কেন জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছে? লোকের আয় বেড়ে গিয়েছে, শ্রমিকদের বেশি টাকা দিতে হয়, বা টাকা বেশি হয়ে গিয়েছে, বা যা কিছু হোক তার ফলে এই অবস্থা হয়েছে। যখন দুনিয়ার মধ্যে সব জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছে, তখন এখানেও জিনিসের দাম কিছু বাড়বে। কিন্তু কতটা বাড়বে, কতটা বাড়তে পারে, কতটা লোকে সহ্য করতে পারে, তা দেখতে হবে। লোকের যা আয় আছে, তার বেশি যদি দাম বেড়ে যায়, তখন সেখানে লোকের দুঃখ আরম্ভ হয়। সেইজন্যে প্রথমত আমাদের এদিকে খাবার জিনিসের দাম কম করতে হবে। দ্বিতীয়ত, চাল বাজারে আসতে হবে। তৃতীয়ত, চাল বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হবে, তারপর তা এখানে কম দরে বিক্রি করতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা।

বাইরে থেকে চাল আমাদের কিনতে হয় ৩২ টাকা, ৩৩ টাকা, ৩৫ টাকা মণ হিসেবে; কিন্তু এখানে বিক্রি করতে হয় ২২ টাকা কি ২২৷৷ টাকা মণ হিসেবে। এখনো এখানে ২০ টাকা মণ দরে চাল বিক্রি করা হচ্ছে। জানি না, এটা কিছু বাড়াতে হবে কিনা এবং ২২৷৷ টাকা পর্যন্ত করতে হবে কিনা। এখন দেখা যাচ্ছে, আমরা বাইরে থেকে ৩৪ টাকা মণ দরে চাল কিনবো আর এখানে বিক্রি করবো ২০ টাকা মণ দরে। এই যে মণপ্রতি ১৪ টাকার তফাৎ, এটা আসবে কোথা থেকে ? নিশ্চয়ই আপনাদের কাছ থেকেই আসবে। আপনারা যে কর দেন তা থেকেই আসবে। general revenue থেকে তা আনতে হবে, তার জন্যে আমাদের আফসোস করার কিছু নেই। আমাদের সম্পদ যা আছে তার থেকেই এই রকম করে চালিয়ে নিতে হবে। লোকের যদি অবস্থা ভালো হয় লোকে দেবে, না হয় government-এর pocket থেকে দিতে হবে। কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে, লোককে চাল দিতে হবে। আমাদের কেউ বলেন, ১ লক্ষ টন খাদ্য কম আছ, কেউ বলেন ৩ লক্ষ টন খাদ্য কম আছে, কেউ বলেন ৫ লক্ষ টন খাদ্য কম আছে। যাই হোক, যখন আপনারা বলবেন যে, ৩ লক্ষ টন খাদ্য কম আছে, তখন আমি ৭ লক্ষ টন আনবার বন্দোবস্ত করবো। যখন বলবেন, ৫ লক্ষ টন খাদ্য কম আছে, তখন ৮ লক্ষ টন খাদ্য বাইরে থেকে আনবার বন্দোবস্ত করবো। এই রকম করে যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি খাদ্য আমদানী করার বন্দোবস্ত করবো। লোকের psychology মনমানসিকতার দিকে আমাদের একটু লক্ষ্য করতে হবে। চাল একটা জিনিস যা আমাদের কৃষকের মনের মধ্যে একটা ধারণা হতে

www.pathagar.com

পারে যে, গত বছর এই সময় দেশে আকাল হয়েছিল। চাল পাওয়া যায় নাই। এবারেও তেমন হতে পারে। যে মন্ত্রিদল চলে গেলেন তাঁরা খবরের কাগজের মধ্যে লিখলেন যে, দেশে আকাল হয়েছে, ৫ লক্ষ কি ১০ লক্ষ লোক মারা যাবে, সেটা বন্ধ করতে পারবো না। ১০ লক্ষ লোক মারা যাবে, তাঁরা চালের কোনো বন্দোবস্ত করতে পারবেন না। আবার শুনি তখনো তাঁদের হাতে ৮ লক্ষ টন চাল ছিলো। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তাঁরা বললেন, ১০ লক্ষ লোক মারা যাবে, তা বন্ধ করতে পারবো না। সেই অবস্থার মধ্যে বর্তমান মন্ত্রিদল power নিলেন, ক্ষমতায় আসলেন এবং এই অবস্থার মধ্যে আগের মন্ত্রিদল চলে গেলেন। তাঁরা বলে গেলেন, লোক মারা যাবে, কিছুতে বন্ধ করতে পারবো না। এ অবস্থায় বর্তমান প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ক্ষমতা হাতে নিলেন এবং তাঁরা দিন-রাত কাজ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যেখান থেকে হোক, যত দামে হোক, চাল আনতেই হবে, লোককে বাঁচাতেই হবে, লোককে মরতে দেয়া হবে না। তাঁরা ক্ষমতায় এসে দু'শ' লঙ্গরখানা খুলে দিলেন, রেশনিং এবং সংশোধিত রেশনিং-এর বন্দোবস্ত করলেন, কতক লোককে বিনামূল্যে চাল বিতরণ করলেন, টেস্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ করলেন, ইত্যাদি। তার ফল এই হলো যে, পূর্ববর্তী প্রাদেশিক সরকার যে বলেছিলেন লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা যাবে সেটা বন্ধ হলো। একটি লোককে না খেয়ে মরতে দেওয়া হলো না। লোককে খাইয়ে বাঁচান আমাদের দায়িত্ব। লোক না খেয়ে মরে যাবে আর আমরা মন্ত্রিত্বের গদিতে বসে থাকবো, এ কখনো হতে পারে না।

বিদেশ থেকে চাল আমদানী

লোককে খাওয়ানোর দায়িত্ব মন্ত্রিসভাকে নিতেই হবে। সে গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গা থেকে চাল আর গম আনবার বন্দোবস্ত করেছি। আমরা ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, সাউথ ভিয়েতনাম, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে চাল আনবার বন্দোবস্ত করেছি, এ খবর আপনারা জানেন। এখন আমাদের অর্থমন্ত্রী আমজাদ আলী সাহেব আমেরিকায় যাচ্ছেন। সেখান থেকে চার কোটি মণ চাল এবং গম আনবার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। টাকা যতই খরচ হোক, আমরা লোককে অনাহারে মরতে দেবো না। জেনে রাখবেন, যত টাকা লাগে চাল এবং গম যেখান থেকে হোক এনে আমরা দেশে ছেড়ে দেবো, লোকসান হয় হোক। তবু আমরা কিছুতেই লোককে না খেয়ে মরতে দেবো না।

মজুতদারদের প্রতি সতর্কবাণী

তারপর, যারা চাল ধরে বসে আছে, তাদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি। যে গরীব কৃষকরা চাল উৎপন্ন করে, তারা কিছু টাকা পাক, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বড় বড় লোকেরা চাল গুদামজাত করে রাখবে আর গরীব জনসাধারণ খেতে পারবে না, না খেয়ে মরবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। আমি তাদের warning দিচ্ছি যে, যাদের গুদামে দু'শ' তিনশ' ছ'শ' মণ চাল আছে, তারা যদি ঠিকমতো সরকারকে খবর না দেয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। আমি জানি এদের Prosecute করা হলে এরা এমপি এবং এমপিএ-দের দিয়ে সুপারিশ করিয়ে রেহাই পেতে চাইবে। কিন্তু আমি তাদের বলে দিচ্ছি যে, কোনোক্রমেই তাদের মাফ করা হবে না। কাউকেও মাফ করবো না। যত বড় হোক, ছোট হোক, যে কেউ হোক, যারা অন্যায় করবে,

www.pathagar.com

যারা লোককে খেতে দেবে না, যেখানে চালের ওপর লোক বসে থেকে পরে চড়া দরে বিক্রি করবে, তাদের কাউকেও আমরা মাফ করবো না, এটা মনে রাখবেন। এটা আপনারা খবর দিয়ে দেবেন সকলকে। আপনারা যাঁরা গ্রামবাসী তাঁরা নিজেদের ফুড কমিটিকে সমর্থন করুন। সকলেই ফুড কমিটিতে থাকতে পারেন। কিন্তু আপনারা তাদের সমর্থন করুন। তাদের জানান চালের ভাণ্ডার কোথায় আছে। তাদের বলুন, চাল কে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। তাদের বলুন, গোলা কোথায় রয়েছে। তাদের খবর দিন, তারা সেখান থেকে চাল-ধান বের করুক। এই কাজটা আপনারা নিজেরা করবেন। যদি আপনারা নিজেরা ষড়যন্ত্র করেন, যদি আপনারা নিজেরা বসে থাকেন, তাহলে গরীবরা কোথায় যাবে? আমি আপনাদের এটা বলছি যে, আপনাদের মধ্যে যাঁরা সমাজসেবী আছেন, যাঁদের হাতে কিছু ক্ষমতা আছে, বুদ্ধি আছে, যাঁদের কিছু ঈমান আছে তাঁরা গরীবের মুখ দেখে কাজ করবেন। যারা ধনী, যাদের কাছে চাল আছে, তাদের ওপর আপনারা সামাজিক চাপ দিন। আমি কোনো মোকদ্দমা করতে চাই না। যাতে তার দরকার না হয় সে জন্যে সামাজিক চাপ দিন। আপনারা জানেন, সামাজিক চাপ দিয়ে আমি বড় বড় জমিদার ও ধনী লোকের কাছ থেকে কম দরে ধান চাল নিয়ে বিলি করেছি। কম দরে চাল, কম দরে ধান বিক্রি করে দিয়েছি। এই রকম করে যখন আপনারা কাজ করবেন, তখনই সত্যিকারের কাজ হবে। এখন আমাদের ওপর যে দায়িত্ব আছে, ইনশাল্লাহ আমরা সে দায়িত্ব পুরা করতে থাকবো।

আমরা বাইরে থেকে যে পরিমাণ চাল পেতে পারি তা আনবো। সেখানে কোনো বাধা নাই। সেখানে এমন কিছু বাধা নাই যে, এক জায়গায় যেখানে এক লক্ষ টন পাওয়া যাবে, সেখান থেকে পঞ্চাশ হাজার টন কিনবো। যেখানে এক লক্ষ টন পাওয়া যাবে সেখান থেকে এক লক্ষ টনই কিনবো। যেখানেই চাল পাবো, সেখান থেকেই নিয়ে আসবো, এই বিষয়টা আমি ঠিক করে রেখেছি। প্রথম বিষয় টাকা-পয়সা নয়, প্রথম বিষয় হচ্ছে লোকের জান বাঁচানো। সেটা হচ্ছে প্রধান বিষয়। লোকে আগে বাঁচবে, লোকে খেতে পাবে, লোকে পরতে পাবে, তার পরে সব কিছু করতে পারবে। তারপরে তাদের দিতে পারবো, তাদের থেকে নিতে পারবো।

খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি

এখন আমার ঝোঁক বেশি হয়েছে একটা বিষয়ের ওপর। সেটা হচ্ছে Development. এই Development আমাদের বেশি করা উচিত। এখন আমাদের বেশি পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করা উচিত। সেজন্যে বেশি ঝোঁক Agricultural Development-এর ওপর, বেশি ঝোঁক কৃষিকাজের ওপর দিন। ফসল বেশি হোক। নতুন নতুন জমি-জমা আবাদে এসে যাক এবং যেখানে পানি নাই, সেখানে পাম্প এবং টিউবওয়েল দিয়ে পানি সেচের বন্দোবস্ত করুন। আপনারা ফসলের বন্দোবস্ত করুন। নতুন ফসলের বন্দোবস্ত করুন। নতুন seed বা বিছনের বন্দোবস্ত করুন। এসব বিষয়ের ওপর আমার ঝোঁক হয়েছে। আমি সকলকে বলছি আর যা কিছু কাজ আছে পরে হবে। প্রথমে খাদ্যের বন্দোবস্ত করে দিয়ে লোককে খেতে দিন, তারপর তাকে উন্নতির পথে যেতে দিতে পারেন। যখন তারা খেতে না পায় তখন তারা কি উন্নতি করবে ? যখন পেটে ভাত থাকবে না, যখন লোকে এসে বলবে, ছেলে মরে যাচ্ছে, মেয়ে মরে যাচ্ছে, বাড়িতে সবাই মরে যাচ্ছে, তখন মনের মধ্যে কি সাহস হবে, দেশের জন্য কি প্রেম হবে—সেই হচ্ছে আসল

www.pathagar.com

কথা। আমরা সবাই বলছি, পাকিস্তানের জন্যে জান দেবো, পাকিস্তানের জন্যে সবরকম কাজ করবো। সেই পাকিস্তানে যদি আমরা নিজেদের ভাইদের না বাঁচাতে পারি তাহলে পাকিস্তানের জন্যে আমাদের কি মহব্বৎ হলো ? সেই জন্যে আমি বলছি, আপনাদের প্রথমেই এইদিকে কাজ করা উচিত। তারপরে আমরা আরও উন্নতির পথে, যেটা আমরা এখন সামনে দেখতে পাচ্ছি—সেই উন্নতির পথে এগিয়ে যাব।

বৈদেশিক নীতি

আর একটা বিষয়, সেটা বোধহয় আমার বলবার প্রয়োজন নেই। কারণ সেটা আপনারা খবরের কাগজে পড়ে থাকেন। আমরা যে বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেছি, তার ফলে আল্লাহর মেহেরবানীতে দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে পাকিস্তানের ইজ্জত ও মর্যাদা বেড়ে গেছে। পূর্বে যে বদনাম ছিলো 'পাকিস্তান দেশ কিছুই নয়' সে বদনাম কেটে গেছে। আর একটা ধারণা ছিলো যে, আমরা বড় ভাইয়ের আঁচলে বাঁধা আছি—সে ধারণাটাও এখন বদলে গেছে। আমরা একটা নীতি নিয়ে ময়দানে নেমেছি। এখানে আমি বলতে চাচ্ছি যে, একথা বলা হয়ে থাকে যে, মুসলিম লীগ যে বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করে গেছে আমি সেটাই অনুসরণ করছি। একথা সম্পূর্ণ ভুল হতে পারে, মুসলিম লীগ কতগুলো প্যাক্ট করে গেছে। আমি সেগুলোর রূপ সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছি এবং আরও বেশি জোরদার করে তুলেছি। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, সামরিক দিক দিয়ে সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রকে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ করবো যেন তারা এক তালে চলে। আমরা ইরাক, ইরান, তুরস্ক ও পাকিস্তানকে এমনভাবে এক সূত্রে বেঁধে দিব যেন কোনো রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে। এই হচ্ছে আমার আসল উদ্দেশ্য। আপনারা নিশ্চয়ই খবরের কাগজে পড়েছেন যে, আমার বৈদেশিক নীতি হচ্ছে 'আমরা দুনিয়ার কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হিংসা পোষণ করবো না এবং সকলের সঙ্গে ভালো ভাব রক্ষা করে চলবো।'

বর্তমান দুনিয়া দুটি শক্তিজোটে ভাগ হয়ে গেছে। একটা হচ্ছে কমিউনিস্ট জোট এবং আর একটা হচ্ছে কমিউনিস্ট বিরোধী জোট। আমরা কমিউনিস্ট জোটের সঙ্গে নেই। আমাদের নীতি হচ্ছে যে, আমরা কমিউনিস্ট জোটের সঙ্গে থাকবো না। কিন্তু যদিও আমরা কমিউনিস্ট জোটের সঙ্গে নেই তাহলেও তাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়তেও যাব না। আমরা তাদের সঙ্গে ভালো ভাব রেখে চলবো। তবে একথা আমি বলে দিচ্ছি যে, আমাদের আঘাত করতে, যে আমার দেশকে দখল করতে চাবে, যে আমাকে মারবার চেষ্টা করবে আমি তার বিরুদ্ধে কাজ করে যাব; কিন্তু যে আমার ওপর কোনো আঘাত করছে না সে কমিউনিস্ট হোক আর কমিউনিস্ট বিরোধীই হোক, তার সঙ্গে লড়াই করবার আমার কোনো দরকার নেই। যার যার নীতি নিয়ে প্রত্যেকে চলবো। আমি তাদের আচ্ছালামুয়ালাইকুম করতে পারি।

[এখানে শ্রোতামণ্ডলীর মধ্য থেকে কেউ একজন প্রধানমন্ত্রীকে কাশ্মীর সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করলে প্রধানমন্ত্রী বলেন] আপনি বসুন, বসুন। বুঝলাম কাশ্মীর সম্বন্ধে আপনার দরদ আছে। কাশ্মীর এতদিন কোথায় ভেসে চলে যাচ্ছিলো, আমি সেটা বন্ধ করেছি আর আপনি এখন দাঁড়িয়ে বলছেন, কাশ্মীর সম্বন্ধে বলুন।

আমার নীতি হচ্ছে যে, আমার কারো বিরুদ্ধে কোনো হিংসা নেই। এজন্যেই আমি চীনে গিয়েছিলাম। আমি সেখানকার নেতাদের বুঝিয়ে বলেছি যে, আমাদের দুই দেশের

www.pathagar.com

মধ্যে নীতিগত পার্থক্য থাকলেও আমরা বন্ধুভাবে থাকতে পারব না কেন ? আমার ওপর অত্যাচার হলে তখন তোমরা কেন আমার প্রতি হামদরদী থাকবে না ? আর একটা Parliamentary delegation আমরা চীনে পাঠাচ্ছি। আপনাদেরই উপযুক্ত ছেলে মুজিবুর রহমান সেই delegation-এর leader হয়ে যাবেন। যখন এখানে চৌ এন লাই এসেছিলেন তখন আমি আপনাদের কাছে খবর দিয়েছিলাম যে, এতবড় একটা বিরাট দেশের প্রধানমন্ত্রী যিনি একটা দেশ গঠন করেছেন তাঁকে আপনারা অভ্যর্থনা জানাবেন। তাঁর যেন ইজ্জত করা হয়। আপনারাও লক্ষ লক্ষ লোক এক বিরাট সভা করে ঢাকা স্টেডিয়ামে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। এত বিরাট জনসভা ঢাকায় আর কখনই হয় নাই। এই কাজ আমিই প্রথম আরম্ভ করি। এতদিন পর্যন্ত কারো সাহস হলো না যে, এইসব কাজ করেন। আমার আগে আরও সব যাঁরা ছিলেন তাঁরা বললেন, বাবা এইসব কাজ করতে ভয় করে। ভয় কি আছে এর মধ্যে ? যদি আমার মন সৎ থাকে, যদি আমার মনের মধ্যে মহব্বত থাকে, যদি আমার মনের মধ্যে হিংসা না থাকে তাহলে ভয়ের কারণ কি আছে? আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করি না। আমি কাজ করে যাব। আমি তাঁর সেখানে গেলাম, তিনি আমার এখানে আসলেন, তাতে কি হলো? আমাদের যে উসুল আছে তা হচ্ছে আমরা ইনসাফের জন্যে ও আজাদীর জন্যে যুদ্ধ করতে থাকব। International field-এ ও আমরা ইনসাফ করতে চাই। যে অত্যাচার করবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব, তা সে ছোট হোক আর বড় হোক।

আভ্যন্তরীণ সম্প্রীতি

দেশের পলিটিক্সের মধ্যেও আমরা হিংসা আনবো না। অর্থাৎ বাঙালি ও অবাঙালির মধ্যে হিংসা চাই না, পূর্ব পাকিস্তানী ও পশ্চিম পাকিস্তানীর মধ্যে হিংসা চাই না। পাকিস্তানের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে হিংসা চাই না। হিংসার ওপর যদি কোনো দেশের ভিত্তি হয় তাহলে সে দেশ কখনও উন্নতি করতে পারে না। মহব্বতের ওপর, প্রেমের ওপর যে দেশের ভিত্তি, সেই দেশই উন্নতি করতে পারে। এটাই আল্লাহর পথ, আমরা এ পথেই যাচ্ছি। ইসলামের আসল শিক্ষা হচ্ছে লোকের সঙ্গে মহব্বত করো, হামদরদী করো, লোককে সঙ্গে নাও, লোককে আদর করো। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ইনসাফ এবং সুবিচার। এটাই হচ্ছে আমাদের Government-এর পলিসি। এটা আমাদের external policy এবং আমাদের internal policyও এই।

কাশ্মীরের যে মসলা আজকে আমাদের সামনে উঠেছে এটা এতদিন চেপে রাখা হয়েছিল, প্রায় সবাই ভুলেই গিয়েছিল। আজকে আবার কেন কাশ্মীরের চর্চা সারা দুনিয়ায় চলছে ? কাশ্মীর একটা সামান্য জায়গা যা India জোর করে, জবরদস্তি করে অন্যায়ভাবে নিয়ে নিয়েছে। দুনিয়ায় আরও অনেক দেশ আছে যা অন্যায়ভাবে কেউ কেউ নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আজকে India কেন আমাদের জিনিস অন্যায়ভাবে নিয়ে নিয়েছে যে দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজেকে International moralist বলে সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ান। তিনি peace চান, তিনি শান্তি চান। তিনি বলেন, আমি imperialism-এর বিরুদ্ধে, আমি colonialism-এর বিরুদ্ধে; কিন্তু কাশ্মীরের বেলায় তিনি কোথায় ? কাশ্মীরের বেলায় তাঁর মুখ বন্ধ কেন? আজ সারা দুনিয়া আমাদের সমর্থন করছে। কেন সমর্থন করছে?

www.pathagar.com

আমাদের তো বেশি ক্ষমতা নেই। আমরা প্রেমের জন্যে, মহব্বতের জন্যে দাঁড়িয়েছি, ইনসাফের জন্যে দাঁড়িয়েছি, এই জন্যে সারা দুনিয়া আমাদের সমর্থন করছে। তুমি মুখে বলছো, আমি বিশ্ব শান্তি চাই, দুনিয়ার মধ্যে শান্তি চাই; কিন্তু সেই শান্তি সেই সময় আসতে পারে—যখন তুমি ইনসাফ করবে। যখন অবিচার হবে, লোকের ওপর জুলুম হবে, এক দেশ আর এক দেশ অন্যায় করে, জোর করে নিয়ে নেবে সেই সময় শান্তি থাকতে পারে না, তখন বিশ্বশান্তি থাকতে পারে না। তখন বিশ্বে গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে। Kashmir issue ছাড়া আর একটা issue রয়েছে, তা হচ্ছে পানি। এই পানির issue এরপর আসতে পারে। এটা শুনলে আপনারা আশ্চর্য ও বিস্মিত হবেন। সেই কথা আমি এখন বেশি বলতে চাই না। কিছুদিন আগে আমি স্পষ্টভাবে এ সম্বন্ধে বলেছি। কাশ্মীরের ওপর আমাদের অধিকার আছে এবং যে পর্যন্ত হিন্দুস্থান আমাদের সেই অধিকার দেবে না সে পর্যন্ত আমরা লড়তে থাকবো। আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের অধিকারের জন্য লড়তে থাকবো।

একদিন যখন আমরা ইনসাফ পাবো, আমাদের অধিকার যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন আমিও আমার প্রতিবেশী দেশের সাথে ভালো ভাব রক্ষা করে চলতে চেষ্টা করবো। আমি কখনও চাই না যে, শেষ পর্যন্ত India-র বিরুদ্ধে লড়তে থাকব। আমি চাই না যে, পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থানের ভিতর হিংসার ভাব চলতে থাকুক। তবে এটা আমি নিশ্চয়ই চাই যে, পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে যে বিরাট দেশ—হিন্দুস্থান আছে. সে যেন পাকিস্তানকে না মারে। যদি সে পাকিস্তানকে মারতে চায়, তখন আমরাও politics শিখেছি। আল্লাহর মেহেরবানীতে মুসলমান জাতি জানে কি করে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এ সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ সাহস আছে। এই সাহস নিয়ে নিজের শক্তি জেনেশুনে আমি বাড়াতেও পারি।

পানি বিরোধ

পশ্চিম পাকিস্তানে নদীর পানির কথা আমরা কখনো ভুলি নাই। আপনারা জানেন, র‍্যাডক্লিফ সাহেবকে ভারত কিভাবে হাত করেছিল এবং তাঁর রোয়েদাদে সে পাকিস্তানের প্রতি কিরূপ বে-ইনসাফী করেছে। সেই র‍্যাডক্লিফ সাহেবও তাঁর রোয়েদাদে লিখেছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে নদীর পানি যে হিসেবে আসছে সে হিসেবেই আসতে থাকবে। তারপর একটা সালিসী কমিটি গঠিত হয়েছিল। তার প্রেসিডেন্ট ছিলেন স্যার প্যাট্রিক স্পেন্স। তাঁর বোধহয় সন্দেহ হয়েছিল, তাই তিনি পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থানের ইঞ্জিনিয়ারদের বললেন যে, তোমরা সবই ভাগ করে নিয়েছ, পানিও ভাগ করে নাও, এতে বিচার বা সালিসীর কিছু নাই।

তখন হিন্দুস্থানের চীফ ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা বললেন, এটা কিছু না, এটা মেনে নেওয়া হয়েছে যে, পাকিস্তান যে হিসেবে পানি পেয়ে এসেছে সে হিসেবে পানি পেতে থাকবে। স্যার প্যাট্রিক স্পেন্স একথা র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ওপর ভিত্তি করে লিখে দিলেন যে, পাকিস্তান যে রকম পানি পাচ্ছে সে রকম পানি ভবিষ্যতেও পাবে এবং তিনি রোয়েদাদ সই করে দিলেন। আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, এ রোয়েদাদ দেওয়ার তিনদিন পরই হিন্দুস্থান পাকিস্তানের পানি বন্ধ করে দেয়। তিনদিনের মধ্যে স্যার প্যাট্রিক স্পেন্স তাঁর রিপোর্ট লিখলেন। সেই রিপোর্টের মধ্যে এই কথা লেখা আছে যে, আমি যে award দিলাম সেটা এই হিসেবে দিলাম যে, ওখানকার ইঞ্জিনিয়াররা বললো ও পাকিস্তানের ইঞ্জিনিয়াররা বললো যে, এতে সেখানে পানি আসবে। এই বলা হলো এবং তার ওপর আমি সই করলাম।

www.pathagar.com

কিন্তু তিনি নিজে রিপোর্টের মধ্যে লিখেছেন, বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তিনদিনের মধ্যে হিন্দুস্থান যে guarantee দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে কাজ করলো। এর ফলে আমাদের এখানে সব নদী শুকনা হয়ে গেল। আমাদের লক্ষ লক্ষ মহিষ মরে গেল পানির অভাবে। লোকের সেখানে পানির অভাব হলো, খাওয়ার পানির অভাব হলো, সেখানে এই রকম করে কারবালা হয়ে গেল। তার ফলে যে সকল ফসল ছিলো সেগুলো শুকনো হয়ে গেল। লোক সব দৌড়ে চলে গেল India-য়। India-কে বলবো তোমরা এটা কি করলে? এটা অন্যায়, কি অভদ্রতা। এটা মানুষের কথা নয়। তারা বললো, আমরা যা করেছি ঠিক করেছি। তোমরা আগে স্বীকার করো যে, এই পানিতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তখন ছাড়বো। তারা এই রকম করলো। এটা কি মানুষের কথা? তারা কেন এটা বন্ধ করলো? অনাচার, অবিচার করে কেন বন্ধ করলো? আমাদের মহিষ মরে গেল, আমাদের সব মরে গেল। ওরা বললো, তোমরা আমাদের অধিকার স্বীকার করো, তখন আমরা তোমাদের জন্যে পানি ছেড়ে দেবো। তখন আমাদের সেখানে আর কোনো উপায় নাই; তবু আমরা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলাম না। তারা পরে বললো, আমরা পানি ছেড়ে দেবো; কিন্তু আপনাদের দর দিতে হবে। পানির একটা দাম দিতে হবে। সেই জিনিসটা সম্বন্ধেই এখন কথা চলছে।

তারা সেখানে একটা বড় dam করে দিয়েছে। যার অর্থ এই যে, তিনটি নদীর পানি তারা ওদিকে নিয়ে যাবে আর এদিক শুকনা হয়ে যাবে। তারা বললো যে, আরও একটা নদী আছে, তার পানি ওদিক যাচ্ছে, তার পানি এদিকে নিয়ে এসো। পানি বেশি কোথা থেকে আসবে? ওদিকে বেশি পানি নিয়ে যাবে। আর এদিকে শুকনা হয়ে যাবে। তারা এই রকম সব কথা বলে। কার কি অধিকার আছে সেটা এখন World Bank-এ প্রশ্ন উঠেছে। সেটা সেখানে এখন আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ওপর জোর-জুলুম করছে। আমরা কতদিন এই অবস্থায় থাকবো, কতদিন এইরকম সহ্য করে যাব সেইটাই হচ্ছে কথা। সে সময় কোনো pact ছিল না, কোনো সামরিক pact ছিলো না, Bagdad pact ছিলো না যার জন্য তারা বলতে পারে এই রকম অত্যাচার করেছে। তারা সম্পূর্ণ ওয়াদা করেছিল; কিন্তু তিনদিনের মধ্যে সে ওয়াদা ছেড়ে চলে গেল। এটা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের কথা। সেখানে যা হয় আস্তে আস্তে হয়, একবারে হয় না। এদিকে ফারাক্কার কথা হচ্ছে। গঙ্গা নদীর পানি যা কুষ্টিয়ায় আসে তা বন্ধ করবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এদিকে তিস্তা নদীর পানি যা না হলে রংপুরে ফসল হবে না, সেটাও বন্ধ করে আসামের দিকে পানি নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত হচ্ছে। এইসব চিন্তা করা হচ্ছে। ওদিকে জল নিয়ে শুকনা করে দিচ্ছে, এদিকে ব্রহ্মপুত্র থেকে এত জল দিয়েছে যে, আমরা ভেসে সমুদ্রের দিকে চলে যাব। এই সমস্ত আমাদের চিন্তা করার যথেষ্ট জিনিস আছে। সেইজন্যে আমি বলছি যে, আমি লড়াই করতে চাই না। আমি শান্তি চাই, বিশ্বশান্তি চাই। আমরা এখানে আমাদের ডাইনে-বাঁয়ে যারা আছে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। সেইজন্যই আমি আফগানিস্তানে গেলাম। আপনারা এটা দেখেছেন। আমি সেখানে গিয়ে বললাম, আপনাদের ইসলামী মুলুক, আপনারা কেন আমাদের বিরুদ্ধে যাবেন ? আমি সেখানে গিয়ে দোহাই দিলাম। বললাম, 'আমি তোমাদের সঙ্গে লড়তে চাই না, তোমরা কেন খোঁচা দিচ্ছ ? এদিকে আর ওদিকে কেন যাচ্ছ?' আমি এই কথা বললাম। যাই হোক, আল্লাহর মেহেরবানী যে,

www.pathagar.com

আজকে তাদের সঙ্গে আমাদের খুব ভালো ভাব হয়ে গেছে। তারা এটা আজকে বুঝতে পেরেছে। আমি আশা করি, এই ভাব আমরা বজায় রাখবো। আমি determined যে, এই ভাব আমরা বজায় রাখবো। ভাব রাখলে কে আর আমার সঙ্গে লড়বে ? তালি দুই হাতে বাজে। যদি আমরা একটা হাত বন্ধ করি, একটা হাতে আর কতদিন তালি বাজাবেন তিনি?

তাঁর সঙ্গে আমার কোনো যুদ্ধ নাই। আমি হিন্দুস্থানের সঙ্গেও ভালো ভাব রাখতে চাই। কিন্তু আমার যে অধিকার আছে তা আমি কোনোদিন ছাড়বো না। আমি appeal করছি, কার কাছে appeal করবো জানি না। পণ্ডিত নেহরুর কাছে appeal করবো, না ভারতের দেশবাসীর কাছে appeal করবো—সেখানকার হিন্দুদের কাছে আমি appeal করছি—ভাই, সামান্য জমাজমি নিয়ে বিবাদ করো না। তোমাদের ৪০ কোটি লোকের দেশ, সেখানে যদি ৪০ লক্ষ লোক পাকিস্তানে আসতে চায় তাদের সে অধিকার কেন দিচ্ছ না? তাদের মত প্রকাশ করতে কেন দিচ্ছ না। দুনিয়ার সামনে তোমাদের মুখ কালো হয়ে যাচ্ছে। দুনিয়ায় তোমাদের যত বন্ধু ছিলো সব তোমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তোমাদের দেশের মর্যাদা, তোমাদের দেশের ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে। ইনসাফ করো। আমি তোমাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে থাকতে চাই, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না। তোমরা যদি বলো যে, কাশ্মীরে তোমাদের অধিকার আছে, তবে আমিও বলছি যে, সেখানে আমাদেরও অধিকার আছে। U.N.O আছে সেখানে দুনিয়ার সমস্ত Nation আছে। চলো, তাদের হাতে মকদ্দমা ছেড়ে দিই। তারা যেভাবে বলবে, আমরা সেভাবে কাজ করবো। আমরা সবাই শান্তি চাই। তারা সেখানে ডিক্রি দিয়েছে, তোমরা সে ডিক্রি মানছো না। তোমরা বলছো, আমরা সে ডিক্রি মানি না। এখন কথা হচ্ছে, যদি আদালত কোনো ডিক্রি দেয়, আপনি বললেন যে, আমি ডিক্রি মানি না, জমি ছাড়বো না। তখন গভর্নমেন্ট পুলিশ নিয়ে এসে যার জমি তার দখলে দিয়ে দেয়। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু ভাবছেন, ডিক্রি না মানলে তাঁকে কে বাধ্য করবে? দুনিয়ার মধ্যে এত বড় কে আছে তাঁকে ওয়াশিল করবার জন্য। তিনি হয়তো ভাবছেন, তাঁর পিছনে কমিউনিস্টরা আছে, রাশিয়া আছে। পাকিস্তানের পিছনে এসে কে দাঁড়াবে? এই অহংকার নিয়ে তিনি বসে আছেন। কিন্তু আমি তাঁকে এটুকু মাত্র বলতে পারি যে, দেখুন, আপনি কাশ্মীর জোর করে দখল করে বসে থাকতে পারেন। আপনার বিরুদ্ধে ডিক্রি হয়েছে, আপনি ডিক্রি মানবেন না। একদিন হবে সারা দুনিয়া আপনার বিরুদ্ধে যাবে, দুনিয়ার সামনে আপনি Criminal হয়ে থাকবেন। সেদিন আপনাকে কাশ্মীর দিতেই হবে। U.N.O-র ডিক্রি এখনো মেনে নিন, কাশ্মীর আমাদের ছেড়ে দিন, পাকিস্তানের সঙ্গে ভালো ভাব স্থাপন করুন। এক সময় আমরা এক ছিলাম। আমাদের এক রং, এক ভাষা। একটা সামান্য জিনিস নিয়ে যুদ্ধ বা ঝগড়া আমরা করতে চাই না। হিন্দুস্থানের দেশবাসী আমাদেরও ভাই। সেখানে সরদার প্যাটেল নামে একজন নেতা ছিলেন। সরদার প্যাটেলকে আমরা বুঝি একজন মুসলিম-বিরোধী বলে, মুসলমানদের ওপর অত্যাচারী বলে। আমরা জানি মুসলমানদের যে অধিকার আছে তা উনি কেড়ে নিতে চান। সেই প্যাটেল পর্যন্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, কাশ্মীর যে জিনিস সেটা পাকিস্তানের জিনিস—এর ওপর হাত দিও না। এটা বোধহয় আপনারা জানতেন না যে প্যাটেল পর্যন্ত বলেছিলেন যে, কাশ্মীর পাকিস্তানের তার ওপর হাত দিও না। তথাপি সেখানকার যে বিরাট প্রধানমন্ত্রী সাহেব আছেন তিনি তা মানলেন না। তিনি মনে ভাবলেন, সেখানে তাঁর জন্মের জায়গাটা পরকে

www.pathagar.com

দিয়ে দেবেন। এই রকম যদি হয়, তাহলে ভাই, আমারও তো একটা জন্মের জায়গা আছে ওদিকে, তখন কি করা যাবে? এই রকম করে যদি কাজ করা হয় তাহলে কি করে চলে? যাই হোক, আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা ডিক্রি পেয়েছি এবং আরো মামলা আমরা নিয়ে আসবো। Jarring সাহেব এসে একবার এদিকে একবার ওদিকে গেলেন, তারপর তিনি প্রকাশ করে দিলেন যে, India কাশ্মীরের ব্যাপারটার Settle করতে চায় না। Security Council-এর মধ্যে এইসব কথা আসবে এবং তারা আরও বেশি Step নেবেন।

বিশ্বের সমর্থন

যেসব কমিউনিস্ট দেশ আছে তাদের কাছেও আমরা ইনসাফ চাই। তাদের সঙ্গে আমাদের লড়াই নাই। আমি তাদেরও বলবো, তোমরা ইনসাফ করো। তবে জানি না, তারা কি করবে, কারণ India-র সঙ্গে তাঁদের ভাব বেশি। কাশ্মীরের ব্যাপারটা যখন United Nations General Assembly-তে আসবে তখন সেখানে ৮১টি Nation-এর মধ্যে আমার বিশ্বাস আমরা ৭০টির সমর্থন পবো। ১১টি দেশ আমাদের সঙ্গে না আসতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত দুনিয়ার সমর্থন আমরা পাবো। যেসব দেশ Bagdad Pact-এর বিরুদ্ধে, সমস্ত ইসলামী দুনিয়া তাদের বিরুদ্ধে হয়ে গিয়েছে। এখন আপনারা দেখতে পাবেন, কে কোন্ দিকে যাচ্ছে। Geography যারা জানেন তারা বুঝতে পারবেন। আফগানিস্তানে আমি গিয়েছিলাম, তারাও আমাদের সমর্থন করবেন, ইরান Bagdad Pact-এর মধ্যে আছে, তারা বলেছে আমাদের সমর্থন করবে। ইরাক আমাদের সমর্থন করবে, তুরস্ক তো খুব জোর করে বলেছে যে, যাই হোক না কেন, আমাদের সমর্থন করবে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত থাকবে। তারপর আরো আগে বাড়ুন, Arab সেখানকার King Saud আমাদের সমর্থন করবেন বলেছেন, King of Jordanও আমাদের সমর্থন করবেন, Tunisia, Morocco, Libya, Sudan ইত্যাদি যত ইসলামী মুল্লুক আছে সবাই আমাদের সঙ্গে আছেন। মাত্র একটি মুল্লুক আছে যার নাম আমি নেব না, তিনি কি করবেন তা আমি বলতে পারি না। তবে এটা বলতে পারি যে, তিনি আমাদের বিরুদ্ধে যেতে পারবেন না। ওদিক থেকে তাঁকে উস্কানি দিয়ে এইরকম করা হচ্ছে। শুধু তাঁর কথা আমি বলতে পারবো না। তবে সমস্ত Arab Country যদি পরামর্শ করে বলে যে, তোমাকে পাকিস্তানকে সমর্থন করতে হবে, সেই সময় উনি না করতে পারবেন না।

ইসলামী দুনিয়া আমাদের সঙ্গে আছে। South Africa-য় যতো Country আছে, যেখানে যত Block আছে সব আমাদের সঙ্গে আছে। মাত্র ১১টা ভোট হিন্দুস্থান পেতে পারে এবং আমি আশা করি, আমরা ৭০টা ভোট পাবো। পূর্ব পাকিস্তানের গত সাধারণ নির্বাচনের সময় এ মুখ দিয়ে বলেছিলাম যে, মুসলিম লীগ মাত্র ৯টা সিট পাবে। তারপর Election হলো, ২৩৭টা সিটের মধ্যে মুসলিম লীগ মাত্র ৯টা সিটই পেলো—১০টা পেলো না। এখনো আশা করি, আল্লাহ আমার মুখের ইজ্জত রাখবেন। হিন্দুস্থান U.N.O-র General Assembly-তে ১১টার বেশি ভোট পাবে না। আপনাদের কাছে খাদ্যের কথা বললাম, International Relations-এর কথা বললাম।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

এখন কথা হচ্ছে, ভাই আমরা এখানে পাকিস্তানী Nation করার জন্যে চেষ্টা করছি, আমরা দেশে হিংসার সৃষ্টি করতে চাই না। আমি চাই আমরা সকলে একসঙ্গে ভালোভাবে

www.pathagar.com

বসবাস করবো, আমি চাই পাকিস্তানে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং খ্রীস্টান—সকলে এক হয়ে পাকিস্তানের উন্নতির জন্যে একযোগে কাজ করে যাবেন। আমি বহুবার বলেছি যে, পাকিস্তানে মুসলমান মুসলমান থাকবে, হিন্দু হিন্দু থাকবে, খ্রীস্টান খ্রীস্টান থাকবে; কিন্তু এক আদর্শকে সামনে রেখে একত্র হয়ে পাকিস্তানের খেদমত করে যাবে। দুঃখের বিষয়, আমি খবর পাচ্ছি যে, মুসলিম লীগ দেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। তারা আশা করছে যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে দিয়ে তারা ক্ষমতায় চলে আসবে। আমি খবর পেয়েছি যে, এক জায়গায় নাকি তারা হিন্দুদের ওপর হাত উঁচু করবার চেষ্টা করেছে। এটা অত্যন্ত অন্যায় কথা। আমি অনুরোধ করবো, এটা আপনারা হতে দেবেন না। এভাবে দেশের মধ্যে অশান্তি নিয়ে আসবেন না। পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান সকলকে এক জাতি হয়ে বাস করতে হবে। ঝগড়া-ঝাটি-লুটপাট কখনো করবেন না। ভারতে এ সম্পর্কে কি হচ্ছে না, হচ্ছে সেটা আমাদের দেখবার নয়। আমরা আমাদের নীতি নিয়ে চলবো। পাকিস্তানে আমরা এক জাতি হয়ে মহব্বতের সঙ্গে বাস করবো। আমি অনুরোধ করছি আপনারা দেশে ফিরে যাচ্ছেন। আপনারা দেখবেন মুসলিম লীগ যে অশান্তির বিষ, অত্যাচারের বিষ ছড়াতে চাচ্ছে সেটা বন্ধ করবেন। সকলকে সাহস দেবেন যে আমরা এক জাতি, ইনশাআল্লাহ আমরা এক জাতি হিসেবেই পাকিস্তানের খেদমত করে যাব। পাকিস্তানের উন্নতির জন্য অগ্রসর হবো। আপনাদের কাছে আমার বলবার মতো এই আছে। আশা করি, আপনারা আমার এ বাণী দেশে বহন করে নিয়ে যাবেন।

স্বায়ত্তশাসন

আমি আর একটা কথা বলছি। কেননা, আপনারা শুধু স্বায়ত্তশাসন স্বায়ত্তশাসন বলেন। আমি কখন তার বিরুদ্ধে বলেছি ? তার বিরুদ্ধে কি বলেছি ? আমি এক জায়গায় বলেছিলাম যে, এটা একটা Stunt; কিন্তু আমি এ কথা বলিনি যে, Provincial Autonomy একটা Stunt। আমি বলেছিলাম যে Provincial Autonomy-র Slogan একটা Stunt. আমি এটা বলি যে Provincial Autonomy বা Regional Autonomy-র Slogan দিয়ে বা চিৎকার করে কি হবে ? আমরা এটা স্বীকার করি, আর তার জন্যে চেষ্টাও করছি। আমরা এই ছয়-সাত মাসের মধ্যে প্রায় শতকরা আটানব্বই ভাগ স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দিয়েছি। সামান্য কিছু বাকি আছে, তাও আমরা জানি। তার জন্যে একটা কমিটি করে enquiry করা হচ্ছে। কি করে কাজ করতে হয় তা আপনারা জানেন। Practical method-এ কাজ করতে হয়। আমরা বরাবর সেটা করে আসছি। আমি আপনাদের সঙ্গেই আছি। আমি বলছি এটা এমন কিছু জিনিস নয় যাতে কারো কিছু বলবার আছে। যে ক্ষমতা আমার দেশবাসীর কাছে আছে, যে ক্ষমতা আপনাদের কাছে আছে, সেটাই আমার ক্ষমতা। আমি নিজের ক্ষমতা কেন ছাড়বো। এই জিনিসটা সম্বন্ধে আমি আপনাদেরকে অনেকবার অনেক বুঝিয়ে বলেছি।

আপনারা হয়তো জানেন, কিছুদিন আগে আমার একটু অসুখ ছিলো। এটা বোধহয় আপনারা খবরের কাগজে পেয়েছেন। এখন পর্যন্ত আমার সামান্য কিছু কিছু অসুখ আছে। কাজেই এখন যদি আমি বসে যাই তাহলে আপনারা আমাকে মাফ করবেন। আপনাদের প্রধানমন্ত্রী আতা মিয়া এখানে আছেন। তিনি এখন কিছু বলবেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

'আমার মৃত্যুর পর দেশবাসী যেন বলতে পারে যে…'

[১৩ই জুন (১৯৫৭) তারিখে ঢাকার নিউ পিকচার হাউসে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে প্রদত্ত পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা ঃ]

শ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানী সাহেব ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্রদ্রোহ ইত্যাদির অভিযোগে আদালতে বিচার করে তাঁকে ফাঁসি দেওয়ার কথা বলেছেন। ছাত্রদের যোগসাজশে তাঁর বিরুদ্ধে আমি ষড়যন্ত্র করেছি, এ-কথাও তিনি বলেছেন। কিন্তু আশা করি, মওলানা সাহেবও এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, আমার দীর্ঘ ৩৬ বছরের রাজনৈতিক জীবনে আমি কোনোদিন কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিনি, বর্তমানেও করছি না এবং ভবিষ্যতেও করবো না। ষড়যন্ত্র করা কাকে বলে তা আমি জানি না। ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে আমি বিশ্বাস করি না। আপনারা আমাকে ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দেশ সেবার যে সুযোগ দিয়েছেন, আমি জীবন থাকতে তার অমর্যাদা করবো না। আপনারা এই দোয়াই করুন এবং পরম করুণাময় আল্লাহর কাছেও আমার প্রার্থনা এই যে, যে কয়দিন আমি ক্ষমতার আসনে আছি, সে কয়দিন যেন সকল ষড়যন্ত্রের উর্ধ্বে থেকেই দেশের খেদমত করে যেতে পারি। আল্লাহ আমাকে এমনিভাবে কাজ করে যাবার তওফিক দিন, যেন আমার মৃত্যুর পর দেশবাসী বলতে পারেন যে, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এমন একজন লোক ছিলেন যিনি বিনা ষড়যন্ত্রে ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং বিনা ষড়যন্ত্রেই দেশসেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

মওলানা সাহেব তাঁর বিচারের কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি জেনে রাখুন যে, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। প্রতিটি ব্যাপারে গণতান্ত্রিক ফয়সালা আমার কাম্য। রাজনীতির ব্যাপারে আদালতের বিচারে আমি বিশ্বাসী নই। রাজনীতির ক্ষেত্রে কেউ কোনো অপরাধ করে থাকলে জনগণের আদালতেই তার বিচার হবে। তাই এ ব্যাপারে কাউকে আমি আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় হাজির করে সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যবস্থা করতে রাজি নই। আমার অতি বড় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকেও আমি আদালতে প্রেরণের চেয়ে জনগণের আদালতে প্রেরণই সবচেয়ে ভালো সমাধান বলে মনে করি। আমাদের সমাজে যদি সত্যিই কোনো গাদ্দার থেকে থাকে, তাহলে পাকিস্তানের আজাদী, পাকিস্তানের তরক্কী ও পাকিস্তানের অখণ্ডত্বে যারা বিশ্বাসী তারাই; অর্থাৎ জনগণের আদালতই তার উপযুক্ত বিচার করবে। এ জন্যেই দেখা যায়, আদালতের শরণাপন্ন হয়ে যেখানে সমস্যার সমাধান হয়নি, সেখানে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায়ই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে টেনে নামিয়ে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। আমি সব সময়েই জনমতের ওপর আস্থাবান এবং সব সময় জনমতকেই মেনে চলবো। একমাত্র জনমতই সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখতে পারে। কিন্তু জনমত যদি এই দেশকে কম্যুনিস্টদের হাতে অথবা ভারতের হাতে তুলে দিতে চায় তাহলে আমি সরকারি ক্ষমতা

www.pathagar.com

ছেড়ে দিয়ে বিদায় নেবো। আমি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে পাকিস্তানকে কোনো প্রকারে দুর্বল হতে দেবো না।

আমি সব সময়েই প্রদেশকে সর্বাধিক ক্ষমতা প্রদানে রাজি আছি। প্রদেশগুলোকে ততদূর পর্যন্তই ক্ষমতা দেয়া হবে, যতটা ক্ষমতা দিলে পাকিস্তানের আজাদী ও সার্বভৌমত্বের ওপর কোনোরূপ আঘাত আসবে না।

মওলানা সাহেব অভিযোগ করেছেন যে, আমার মন্ত্রিসভার বৈদেশিক নীতি সাবেক মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার বৈদেশিক নীতিরই অনুরূপ। স্বাধীন দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্যে মুসলিম লীগ যে নীতি নিয়েছিল সে নীতি আমার মন্ত্রিসভাও নিয়েছে, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মুসলিম লীগ সরকার বিদেশের সাথে কতগুলো চুক্তি করেছিলো। এ চুক্তি মেনে চলতেই হবে। গণতান্ত্রিক দেশে নতুন কোনো পার্টি ক্ষমতাসীন হলে সে পার্টির মন্ত্রিসভাকে শালীনতা ও মর্যাদার খাতিরে পূর্ববর্তীদের শাসনামলের বিভিন্ন চুক্তি ও ওয়াদার মর্যাদা রক্ষা করে নীতি নির্ধারণ করতে হয়। অবশ্য কমিউনিস্টদের মতো বিপ্লব করে যারা ক্ষমতা দখল করে তারা পূর্ববর্তীদের বিভিন্ন চুক্তি লংঘন করতে পারে।

আমাদের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান কথা 'কারো সাথে শত্রুতা নয়, সকলের বন্ধুত্বই আমাদের কাম্য।' সম্ভব মতো সকলের সাথেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আমি বিশ্বাসী। এই নীতিকে কার্যকরী করার জন্যই আমি চীন এবং অন্যান কমিউনিস্ট দেশের প্রতি আমাদের বন্ধুত্বের হস্ত সম্প্রসারণ করেছি। আপনারা জানেন, আফগানিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি রকম তিক্ত হয়ে পড়েছিল। আজ আমি বলতে পারি যে, কাবুলের আর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেই বিদ্বেষভাব নেই। আমার সাম্প্রতিক কাবুল সফর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আমি আশা করি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও তামুদ্দুনিক মিশনের আদান-প্রদানের মাধ্যমে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের পারস্পরিক সম্পর্ক আরো উন্নত হবে।

মওলানা ভাসানী বিভিন্ন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে অনবরত আওয়াজ তুলে চলেছেন। বিরোধীদলে থাকাকালে এ সম্বন্ধে অনেকেই আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁদের কেবল এ কথাই বলতে চেয়েছি যে, বিভিন্ন চুক্তির শর্তাবলী পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা না করে মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়। অন্য সবকিছু যদি তর্কের খাতিরে ছেড়েও দেওয়া হয়, তবু ভারত কর্তৃক খালের পানি বন্ধ, কাশ্মীর গ্রাস, ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি ঘটনার পর নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি সম্বল করে নিশ্চুপ থাকা কি কোনো স্বাধীন জাতির পক্ষে সমীচীন হবে?

যে কোনো উপায়েই হোক, দেশের আজাদী ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতেই হবে। আমি আমার এই হাত দিয়ে পাকিস্তানের পিঠে ছুরিকাঘাত করতে পারবো না। কেউ যদি পাকিস্তানের পিঠে ছুরিকাঘাত করতে চান, তবে এই হাত দিয়েই আমি তার প্রতিরোধ করবো—তিনি আমার দলের লোক হোন আর যিনিই হোন।

আমি চাই না যে, পাকিস্তান অন্য দেশের তাঁবেদার হয়ে থাকুক। এ রকম মৈত্রী আমি কখনই করতে যাবো না যার দরুন দেশের স্বাধীনতা ও সংহতি ক্ষুণ্ন হতে পারে। আমি যখন বিরোধীদলের নেতা ছিলাম, তখনই ঢাকায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের সভায় আমি এ কথা বলেছিলাম। ঐ সময়ে পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে আমি সাহসের সংগে কিছু বলতে

www.pathagar.com

পারিনি; কারণ, আমি তখন বিভিন্ন প্রতিরক্ষা চুক্তির শর্ত সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। বিরোধী দলের নেতা হিসেবে তখনকার ক্ষমতাসীন দল আমার উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেনি।

বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে কোয়ালিশন সরকার যে সাহসিক কর্মপন্থা নিয়েছে তার ফলে বিদেশে পাকিস্তানের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কাশ্মীরের ব্যাপারে আমরা যে নীতি নিয়েছি তা থেকেই প্রমাণ হয় যে, আমাদের বৈদেশিক নীতি ন্যায়নীতি ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই আল্লাহর মর্জি দুনিয়ার জনমত আজ পাকিস্তানের পক্ষে। পাকিস্তানের জনসাধারণ আমার মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্রনীতি মেনে নিয়েছে; কেননা আমি এর স্বপক্ষে জনমত সংগঠন করতে সক্ষম হয়েছি। পাকিস্তান সব সময়েই জাতিসংঘের মর্যাদাকে সকলের ওপরে স্থান দিতে চায়। জাতিসংঘের মর্যাদা অক্ষুণ্ন না থাকলে ছোট ছোট দেশগুলোর নিরাপত্তা স্থায়ী হবে না। বিদেশ থেকে যেসব সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে শর্ত যোগ করে আমি আমার দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাই না। আপনারা বিবেচনা করে দেখুন, আমেরিকার কাছ থেকে আমরা কি পরিমাণ সাহায্য পাচ্ছি।

মওলানা ভাসানী এবং অন্যান্য নেতা হয়তো সরল বিশ্বাসেই অতীতের বিভিন্ন জোটের বিরোধিতা করেছেন। আমি মওলানা সাহেবের প্রতি সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি যে, যেসব প্রতিরক্ষা চুক্তির কোনো আক্রমণাত্মক উদ্দেশ নাই, সেসব চুক্তি সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন এবং তাঁর প্রচার কার্যের ধারা বদলে ফেলুন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

‘আমার দেশের দরিদ্র জনসাধারণই আমার একমাত্র ভরসা........’

[১৯৫৬ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর করাচীর ফ্রেয়ার গার্ডেনে নাগরিক সম্বর্ধনার জওয়াবে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাষণঃ]

আপনারা এত কষ্ট করে এখানে এসে আমার সাথে চা পান করে আমাকে যে সম্মানিত করেছেন, সেজন্যে আপনাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মানপত্রে আপনারা আমার যে প্রশংসা করেছেন, আমি সে প্রশংসার যোগ্য নই। তবে মানপত্রে আপনারা যে-সব সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সেসব সমস্যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং সেগুলোর সমাধান করা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, সমস্যাবলীর তালিকা এত দীর্ঘ যে, সবগুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে গেলে একজন লোকের পক্ষে এক জীবনে তার মোকাবিলা করা সম্ভবপর হবে না, এর জন্যে একাধিক জীবনের প্রয়োজন। আমার সময় অল্প। আপনাদের দুঃখ-কষ্টের খবর আমি রাখি। আমি নিজেও গত আট বছর আপনাদের সাথে এক পংক্তিতে দাঁড়িয়ে এই দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য সংগ্রাম করেছি। বর্তমানে আমাদের সামনে যে সব সমস্যা উপস্থিত, তা আমাদের অজানা নয়। এখন চাই কাজ। সবাই মিলেমিশে কাজ না করলে সাফল্য লাভ অসম্ভব। আপনাদের সহযোগিতা ব্যতীত সরকার কখনও আপন কর্তব্য ও দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পারবে না। ছোটখাটো ব্যাপারে ঘাবড়ে গেলে কাজে অত্যন্ত অসুবিধা ঘটে।

আমি খোলাখুলি কথা বলি; আগেও তাই বলেছি, আপনারা তা জানেন; এখনো বলবো, আর ইনশাআল্লাহ, আজীবন এমনি খোলাখুলি বলে যাব। কারণ, আমি জীবনে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করিনি।

সুতরাং ভাইসব, আমার আসল কথা হলো, আমি আপনাদের সাথে সহযোগিতা করতে চাই, আর আপনাদের সহযোগিতা পেতে চাই, যাতে আমরা সবাই মিলে পাকিস্তানের সত্যিকার খেদমত করতে পারি। নৈরাশ্যবোধের কোনো কারণ নেই। আপনারা বলেছেন যে, আপনারা সবাই নিরাশ হয়ে পড়েছেন। আপনারা নৈরাশ্য বা ব্যর্থতাবোধের কথা তুলেছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ নৈরাশ্যবোধ অহেতুক। যদি আমাদের মনে আবার এই অনুভূতি জাগে যে, যা হবার হবে, আমরা সবাই মিলে আর একবার নতুন আশা-উদ্যম নিয়ে, মনপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করবো, তবে সফলতা সুনিশ্চিত। যদি আপনারা এই ভেবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকেন যে, আর কিছু হবার নয়, আর কোনো উপায় নেই, দেখি শহীদ সোহরাওয়ার্দী এখন কি করেন, তবে কোনো কাজ হতে পারে না। কিন্তু যদি আপনারা বলেন যে, তাঁকে আমরা কাজ করার সুযোগ দেবো, তিনি যা বলেন, তা সবাই মিলে করবো, তবে দেখবেন অদূর ভবিষ্যতে আপনাদের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

ভাইসব, আমাদের শাসন ব্যবস্থার ত্রুটি ও আমাদের দুর্বলতা আমাদের জানা আছে। তবে সবাই মিলেমিশে এগুলো সংশোধন করতে পারি। আপনারা ভালো করেই জানেন যে, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমার এ নতুন দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাকে সত্যি প্রশ্ন করলে আমি কি বলবো? কোনো কোনো সংবাদপত্র রটিয়েছে যে, এই প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের জন্য আমি খুব চেষ্টা করেছি। আমি কিন্তু বলবো যে, আমি এ দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম। আমি এই ভেবে আনন্দিত ছিলাম যে, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে এবং অন্যেরা যা করেছেন বা করেননি, এজন্যে আমি তো দায়ী নই। এখন আপনারা আমার ওপর দায়িত্ব চাপিয়েছেন, আর এ দায়িত্ব আমাকে পালন করতেই হবে। যদি দায়িত্ব পালন না করি, তবে আপনাদের কাছে আমাকে জওয়াবদিহি করতে হবে। তাই দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই দিন-রাত এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি। আমি আগেই বলেছি, যদি আমরা সবাই একযোগে কাজ করি, তবে ইনশাআল্লাহ নিশ্চয়ই আমরা সফলকাম হবো।

আপনারা মানপত্রে আরও কয়েকটা ব্যাপার উল্লেখ করেছেন; যেমন ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি। আমি আপনাদের বলছি যে, আপনারা ঘুষ না দিলে ঘুষখোর কেউ হবে না। আপনারা ঘুষ দেন তাই তারা ঘুষ নেয়। এজন্যে আপনাদের দোষারোপ করছি না; কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের এখানে এমনি এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যে, মানুষ বুঝতে পারছে ঘুষ না দিলে কোনো কার্যোদ্ধার হবে না। আমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ প্রাপ্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। এ অবস্থা কেমন করে দূর করা যায়? অথচ এ দূর করা আবশ্যক। আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি, পরিণাম যাই হোক, আমি এ অবস্থার অবসান ঘটাবো। আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই, পরোয়াও নেই—শাসনকর্তৃত্বও নয়, প্রধানমন্ত্রিত্বও নয়। আমি জানি, এ নিয়ে কাজে নামলে আমরা নতুন শত্রুর সৃষ্টি করবো। আমি কাদের ওপর ভরসা করবো? যারা অপরাধী তারা তো আমার বিরুদ্ধাচরণ করবেই। তাদের অর্থ আছে, প্রতিপত্তি আছে, তাদের হাতে সংবাদপত্র আছে। এসব উপাদান তারা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে, আমার বিরুদ্ধে নানা অপবাদ প্রচার করবে।

আমি বুঝি আমার একমাত্র ভরসা হলো গণতন্ত্র আর গণতন্ত্রপন্থীর দল; অর্থাৎ আমার দেশের দরিদ্র জনসাধারণ; তারাই আমার একমাত্র ভরসা কারণ, তাদের কল্যাণের জন্যেই আমি এ কাজে নেমেছি। তাদের কল্যাণসাধন আর সেবা করতে গিয়েই আমি শত্রু সৃষ্টি করছি। তাই আমি আশা করতে পারি যে, তারা আমাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে; কেউ আমার বিরুদ্ধাচরণ করলে বাধা দেবে। তারা আমার বিরোধীদলকে এমন শক্তিশালী হতে দেবে না—যাতে আমার আরব্ধ কর্ম অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আর একটা সমস্যা আছে। এমন অনেক লোক আছেন—যাঁরা ভাবেন, জনাব, আমি তো তাঁর সাথে আট-নয় বছর কাজ করেছি, তাঁর সেবা করেছি—তাঁর দলের প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন তো তাঁর ওপর আমার দাবি আছে। এখন তো আমার সুদিন এসেছে। চলো তার কাছে গিয়ে সামান্য সুপারিশ আদায় করে নিয়ে আসি।

আমি এ সব লোকদের জন্যে অত্যন্ত দুঃখিত। এ কথা সত্যি যে, অতীতে অন্যেরা নিজেদের কার্যোদ্ধারের জন্যে ক্ষমতাসীনদের অত্যন্ত জঘন্যভাবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু আমি আশা করি, আপনারা আমার কাছে এমনটি আশা করবেন না। আমি চাই না যে,

www.pathagar.com

আপনারা এ কথা বলুন ঃ আপনি নিজে যে কাজের নিন্দা করেছেন, নিজেই তো তা করেছেন। আপনারা আমার কাছে চাইবেন না ঃ এবার তুমি যখন কর্তৃত্ব পেয়েছ, তখন আমাদের জন্যে পোলাও-কোর্মার বন্দোবস্ত করে দাও। আমি এজন্যে আদৌ প্রস্তুত নই। আপনারা যখন আমাকে এ আসনে বসিয়েছেন, এ দায়িত্ব দিয়েছেন—সারা রাষ্ট্রের দায়িত্ব—তখন আমার চোখে সবাই সমান। এখন আমি দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে। যদিও আমি একজন আওয়ামী লীগার এবং এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সভাপতি, আমি আমার ভাইদের, বন্ধুদের আর কর্মীদের বলে দিতে চাই যে, আপনাদের সাহায্যে আমি জনসাধারণের কাছে যেতে চাই, তাদের সাথে মিশতে চাই বটে; কিন্তু রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমাকে সুবিচার করতে হবে—আমি এখন দেখবো না যে, ব্যক্তিবিশেষ কোন্ দলের সমর্থক—আমার লোক, না আমার বিরুদ্ধাচারী।

সঠিক নেতৃত্ব

আপনারা আশা করবেন না যে, আমি আমার নেতৃত্বের ধর্ম থেকে বিচ্যুৎ হবো, বা পক্ষপাতিত্ব করবো। বর্তমানে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগানো এবং তাদেরকে কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। আমাদের জনসাধারণ অত্যন্ত সৎস্বভাব; তারা ত্যাগধর্মী; তাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত খাঁটি। এখন প্রয়োজন শুধু তাদের সঠিক পথে চালিত করা, সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া, কোনো অসদুদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার না করা বা কোনো রাজনৈতিক ব্যাপারে তাদের উস্কানি না দেওয়া। উস্কানি দেওয়া আগুন লাগানোর মতোই অতি সহজ। কিন্তু এ কথা মনে রাখবেন যে, আগুন লাগানো যত সহজ, নিভানো তত সহজ নয়। আপনারা মনে রাখবেন, আমাদের এই দরিদ্র, সরল জনসাধারণকে যেন কেউ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা স্বার্থসাধন মানসে ব্যবহার না করে। যদি তাদের কাজে লাগাতে হয় বা তাদের পথ দেখাতে হয়, তবে যে পথে চললে পাকিস্তানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে, তাদের সেই পথে পরিচালনা করুন।

কাশ্মীর

কাশ্মীর সমস্যার প্রতি আপনারা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এ সম্বন্ধে আমার মনোভাব আপনারা জানেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান হলো না। আমি তো বুঝি এ সমস্যার সমাধান অতি সহজ, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বিশ্ববাসীর কাছে এ সমস্যার গুরুত্ব পরিস্ফুট। ভারতের তরফ থেকে বলা হয় যে, যে সময় ভারত সরকার গণভোটে স্বীকৃত হয়েছিলো, সে সময়ের তুলনায় বর্তমানে এ সমস্যার রূপই বদলে গেছে। এই সময়ের মধ্যে কি পরিবর্তন যে হয়েছে, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। বিশ্বের অন্যান্য জাতিও এরূপ পরিবর্তন হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। যা হোক, কাশ্মীর যে পাকিস্তানেরই অংশ হওয়া উচিত আমাদের এই অভিমতে কোনো স্বজ্জন ও ন্যায়-নীতিজ্ঞানীর সন্দেহ থাকতে পারে না। তবে এ প্রশ্ন সম্বন্ধে কাশ্মীরী ভাইদের মতামত গ্রহণ করা আমাদের উচিত। আমাদের সঙ্গে কাশ্মীরী ভাইদের সম্পর্ক এতো নিবিড় আর আমাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙির এমনি ঐক্য আছে যে, আমি বেশ জানি তারা কোন্ পক্ষে মত দেবে। কিন্তু তা হলেও সব অবস্থায় তাদের মত গ্রহণ করা কর্তব্য। আমাদের মতে চলবে না—যাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, তাদের বরং জিজ্ঞেস করুন তারা কি চায়।

www.pathagar.com

মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ তাদের দিন। ভারতকে আমি বলছি, যদি আপনারা কাশ্মীরী ভাইদের এ সুযোগ না দেন, যদি আপনারা তাদের ওপর অন্যায় আধিপত্য বিস্তার করে রাখেন, তবে কতদিন আপনারা এমনি করে অর্থের অপচয় করবেন? ফলে আপনারা অর্থের অভাবে দেশের কাজ করতে পারবেন না, আর অন্যদিকে পাকিস্তানেরও অর্থ ব্যয় হচ্ছে, কারণ আমরাও তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না।

এখন আমাদের শক্তিশালী হতে হবে; এ সম্বন্ধে আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আমার দুঃখ হচ্ছে যে, দেশরক্ষা খাতে আমাদের এত অধিক অর্থ ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এ-কথাও ভুললে চলবে না যে, দুনিয়ায় যদি আমাদের বেঁচে থাকতে হয়, যদি মর্যাদা অর্জন করতে হয়, তবে আমাদের অন্ততঃপক্ষে এতোটুকু শক্তি সঞ্চয় করতে হবে—যাতে অন্য কোনো শক্তি আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে না পারে। আর যদি কেউ করে, তবে আমরা যেন তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারি—আত্মরক্ষা করতে পারি। পরস্পর মনোমালিন্যের দরুন ভারত সরকারেরও অর্থের অপচয় হচ্ছে, আমাদেরও হচ্ছে। এজন্যে সর্বসাধারণের কল্যাণার্থ আমরা যে পরিকল্পনা গ্রহণ করি, তা অর্থাভাবে সম্পূর্ণভাবে সমাধা করতে পারছি না। শত হোক, দুনিয়ার সব ঐশ্বর্যই তো আর আমাদের হাতে নেই। ভারত সরকারও আপন পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করতে পারছে না। এই সূত্রে আমি আশা করছি, ভারত সরকার কালবিলম্ব না করে এ সমস্যার একটা সমাধান করবেন। এই বেচারা কাশ্মীরী জনসাধারণের ধৈর্যের পরীক্ষা আর কত দিন চলবে? আপনারা কেমন করে আশা করেন যে, তারা চিরদিন এ অবস্থায় থাকবে, এক পাও এগুবে না? আর তারা যদি এগুতে আরম্ভ করে, তবে মনে রাখবেন, আমরা দু'পক্ষই এতে জড়িয়ে পড়বো। তাই ও-পক্ষের উচিত আগে থেকেই ন্যায়বিচার করা, কাশ্মীরীদের অবাধে ও স্বাধীনভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে দেওয়া, দিলেই ন্যায়বিচার সম্ভব হবে।

মোহাজের সমস্যা

আসুন, এবার আমরা মোহাজের সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করি। আপনারা জানেন, আমি প্রথম থেকেই মোহাজেরদের হয়ে লড়েছি, তাদের দুর্গতির কথা আমার জানা আছে। এ সমস্যার সমাধানও আমি সামান্য জানি; তাই এ সমস্যা সমাধানের সুযোগ আমাকে দিন। আমি এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি। সবাই বলছে যে, এ প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, আজ পর্যন্ত এর কোনো মীমাংসা হলো না। এ সমস্যার সমাধানের জন্য জীবনপণ করবো। যদি অকৃতকার্য হই তবে এ আসনে থাকবার আমার কোনো অধিকার নেই। এ জন্য আমি মোহাজেরদের ব্যাপার আমার নিজের হাতে রেখেছি যাতে উজীরে আজম হিসেবে আমাকে কেউ এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে আমি যেন বলতে না পারি, 'এতো আমার দফতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। এতো অন্য মন্ত্রীর ব্যাপার, আমি কিছু করতে পারবো না', অথবা 'আমি দেখছি', 'আমি দেখবো' বা 'তা হবে'। আমি এমন বাজে কথা বলতে চাই না। তাই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি। যদি আমাকে সময় ও সুযোগ দেন, তবে আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে, এ সমস্যার আশু সমাধান আমি করবো—যাতে আমাদের দীন-দরিদ্র, আশ্রয়হীন ভাইরা আশ্রয় পায়।

www.pathagar.com

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও জাতির অন্যান্য সমস্যার প্রতিও আপনারা ইংগিত করেছেন, তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আমি আগেও এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি; এ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অবহিত আছি। একটি একটি করে ধীরে ধীরে এ সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, খাদ্যবস্ত্র ইত্যাদি এবং জীবনের বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উচ্চমূল্য—এসব সমস্যা সম্বন্ধে আমরা অবহিত আছি, আর এগুলোর প্রতি আমরা দৃষ্টিও দিচ্ছি। একটা ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যদি আমি ন্যায় ভাবে কাজ করে আপনাদের সেবার চেষ্টা করি, তবে সাফল্য অনিবার্য।

নিজের গদি কায়েম রাখার জন্য আমি অন্যায় কথা বলতে চাই না। আমি এবং আমার মন্ত্রিসভার সদস্যরা দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আমরা নিশ্চয়ই কিছু করে দেখাবো। আমি কাউকেও তোষামোদ করতে চাই না। কাউকে মন্ত্রিসভায় না নিলে তিনি আমাকে ব্ল্যাকমেলিং করবেন বা বিরোধিতা করবেন, সে ভয়ও আমি করি না। এমন লোককে আমি মুখের ওপর বলে দেবো ঃ আমি আপনাকে মন্ত্রিসভায় নিতে অক্ষম, আপনি এর যোগ্য নন। এ জন্যে আপনি যদি আমার বিরুদ্ধাচরণ করতে চান, তবে মনের সুখে তা করুন; কিন্তু দুনিয়ার লোক আপনার কীর্তি দেখবে; জনসাধারণ বিচার করবে যে, আপনি কি করছেন। আমার ওপর আপনারা যে সেবার ভার দিয়েছেন, তা সম্পন্ন করা ছাড়া আমার আর কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। ইনশাআল্লাহ, অদূর ভবিষ্যতে আপনারা ফলাফল দেখতে পাবেন।

করাচী

আপনারা করাচীর সম্বন্ধেও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভাইসব, আপনারা জানেন, করাচীকে আমি একটা বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী। আমার সমর্থক দলও সর্বদাই একে একটা বিশেষ মর্যাদালাভের যোগ্য মনে করেন। আমি কখনো করাচীর গুরুত্বকে বিস্মৃতির তলে ডুবতে দেবো না। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, আমি করাচী শহরকে সাজ-সজ্জায় মনোরম করতে চাই। শহরের বর্তমান অবস্থার উন্নতি করতে পারলে ভাববো যে, একটা কাজের মতো কাজ হলো। আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে, এখানে দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসছেন, করাচী দেখেই তাঁরা একটা ধারণা করে নেন যে, সারা পাকিস্তানই বুঝিবা এরূপ। যদি করাচী শহর এমনি নোংরা আর অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তবে বিদেশীরা ভাববেন যে, পাকিস্তানের অন্যান্য জায়গার অধিবাসীরাও বুঝি এমনি জীবনযাপন করে। এসব কারণে আমি করাচীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি; কারণ করাচীর মাধ্যমেই পাকিস্তান সম্বন্ধে বিশ্বের অভিমত গড়ে উঠবে।

ভারতীয় মুসলমান

ভাইসব, আমি আরও দু'একটা ব্যাপারে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। আমাকে মাফ করবেন, আপনারা মানপত্রে এ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ করেননি। প্রথম কথা হলো, আপনারা জানেন, আমি ভারতেই রয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কেন? এর কারণ আমি নিবেদন করছি। সেখানে আমাদের অনেক মুসলমান ভাই রয়ে গেছেন। তখন তাদের এক মহা পরীক্ষার দিন; তারা তখন অধীনতাপাশে আবদ্ধ। তাই তাদের দিকে চেয়ে আমি

www.pathagar.com

সেখানে রয়ে গিয়েছিলাম। আমার সেই ভাইদের কথা কখনো আমাদের মন থেকে মুছে যেতে পারে না। আমরা কেমন করে তাদের কথা ভুলবো? তাদের কোনো দুঃখ-কষ্ট হলে আমাদের মন অস্থির হয়ে ওঠে। ওপারের ভাইদের কষ্ট হলে এপারের ভাইদের মনে দুঃখ হয়। আমি তাদের এ মনোভাবের সম্মান করি; এ মনোভাব মহান। আশা করি, এ মনোভাব চিরদিন অক্ষুণ্ন থাকবে। আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে পত্র লিখছি, 'মহোদয়, ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থার প্রতি একটু ফিরে তাকান, আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, সেখানে আমাদের বেচারা ভাইদের ভাগ্যে শান্তি-নিরাপত্তা জুটছে না, অথচ এখানে সংখ্যালঘুর দল দিব্যি নিরাপদে আছেন।' তবে আমি আপনাদেরকে আমার মনের কথা বলছি; ভারতে তারা যাই খুশী করুক, আমি আমার কর্তব্য করে যাবো।

পাকিস্তানী সংখ্যালঘু

কারো কোনো কষ্ট না হোক, এই আমার মূল-নীতি। এ কথা আমার মনঃপূত নয় যে, ভারতে আমার ভাইয়েরা দুঃখে আছে বলে এখানকার সংখ্যালঘুদের আমরা দুঃখ দেবো। আপনাদের আমি খোলাখুলি বলে দিচ্ছি যে, আমার এ নীতি যদি আপনাদের মনঃপূত হয়, তবে তা গ্রহণ করুন; যদি মনঃপূত না হয় আমাকে বলে দিন। কিন্তু জেনে রাখুন, আমি আমার পাকিস্তানী ভাইদের ওপর তারা যেকোন ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন—অবিচার করবো না। আমার সামনে মাত্র দুটো কথা আছে; সে কথাগুলো আমি সর্বদা মনে রাখি, আর সে অনুযায়ী কাজ করি। কথাগুলো হলো 'সুবিচার' আর 'সততা'। এ আমার মন্ত্রিসভার মূলনীতির বলেও ধরে নিতে পারেন। এ দুটো আমার কর্মনীতি, আর আমি এ অনুযায়ী কাজ করবো। যদি আমি এ থেকে নীতিভ্রষ্ট হই, তবে আপনারা আমাকে সাবধান করে দেবেন। এ অবস্থায় আমাকে সাবধান করে দেওয়া আপনাদের কর্তব্য। আপনাদের সত্যিকার সেবা করাই আমার উদ্দেশ্য।

ভদ্রমহোদয়গণ, একটা কথা মনে রাখবেন। আমার হাতে যাদুদণ্ড নেই যে, মুহূর্তে সব কিছু সমাধা করে আপনাদের তাক লাগিয়ে দেবো। আপনারা জানেন, অতীতে কোনো কোনো কাজে আমাদের দেশে এ যাদুদণ্ড ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, এ যাদুদণ্ড এখন আর ব্যবহার হবে না।

নতুন নির্বাচন

আমার আন্তরিক প্রচেষ্টা হবে দেশে যথাশীঘ্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, অবাধ ও স্বাধীনভাবে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করা। নির্বাচনের ব্যাপারে আমি সরকারি কর্মচারিদের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবো না। 'এদের ভোট দাও', 'ওদের ভোট দাও' বলে তাঁরা যেন ক্ষমতা প্রয়োগ বা প্রভাব বিস্তার না করেন। তাঁদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে হবে—তাঁরা পুলিশ কর্মচারি হোন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই হোন, কমিশনার হোন, অথবা কোনো দফতরের সেক্রেটারিই হোন। জনসাধারণের ভোটদানে অবাধ স্বাধীনতা থাকা চাই, আমার মতে এই যথার্থ গণতন্ত্র। কিন্তু এর আগে জনসাধারণকে সঠিক পন্থা দেখানো আর সদুপোদেশ দেওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা সঠিক পথ বেছে নিয়ে তাতে অটল থাকতে পারে।

সমালোচনা

আপনাদের কাছে আমার আর একটা নিবেদন আছে। আপনারা যা খুশী করুন, কেবল

www.pathagar.com

অনর্থক সমালোচনা করার বদ অভ্যাস ত্যাগ করবেন। দুঃখের বিষয় কোনো ব্যাপার উপস্থিত হওয়া মাত্র চারদিক থেকে সমালোচনা আরম্ভ হয়। একদল বলে 'এ রকম হওয়া উচিত' আর একদল বলে 'না, ও-রকম হওয়া উচিত'; একদল বলে, 'এটা হওয়া অন্যায়'; অন্য দল বলে, 'ওটা হওয়া অন্যায়'। ফলে, কাজ হয় না, শুধু সমালোচনা চলতে থাকে, নিত্য নতুন সমালোচনা। তাই আমাকে সুযোগ দিন কাজ আরম্ভ করার। কিছু কাজ হোক, তখন বরং সমালোচনা করবেন। কাজ আরম্ভ করার পূর্বেই সমালোচনা করা অন্যায়। অধিকাংশ লোক কার্যারম্ভের পূর্বেই বাধার সৃষ্টি করে। একদল বলে, 'কাজ করো', আর অন্য দল বলে, 'কাজ করতে দেবো না।' এভাবে গোলমাল লেগেই থাকে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি কায়েদে আজমের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কাজেও হাত দেবো, আর ইনশাআল্লাহ্, শীগ্‌গিরই। কিন্তু বহু কাজ অসমাপ্ত পড়ে আছে। আমার কার্যক্রম শীগ্‌গিরই আপনারা দেখতে পাবেন।

ভাইসব, অতীতে আমাদের দিয়ে অনেক বাজে কাজ হয়েছে। আমার অনুরোধ, আপনারা আমার সাথে সহযোগিতা করুন। আমি একাকী মুহূর্তের মধ্যে সব বাজে কাজ আর ত্রুটি সংশোধন করতে পারবো না। আপনাদের সহযোগিতা আর ধৈর্যের প্রয়োজন। কোথায় কাঁটা ফুটছে, তা আপনারা না জানালে আমি কেমন করে জানবো? কাঁটা তোলা আমার কাজ। আশা করি আপনারা আমার সাথে সহযোগিতা করবেন, আর আপনাদের কোথায় এবং কিসের অসুবিধা সে কথা আমাকে জানাবেন।

আমি বর্তমানে সমস্ত বিভাগের সেক্রেটারি ও অফিসার প্রমুখ সরকারি কর্মচারির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে অবস্থা জেনে নিচ্ছি; পরে আপনাদের কাছ থেকেও শুনবো এবং আপনাদের সাথেও আলাপ-আলোচনা করবো। এভাবে আমি আপনাদের কি অসুবিধা আছে তা জানতে পারবো, আর তা দূর করার উপায় নির্ধারণ করতে পারবো। আমি সুযোগ চাই। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের মর্জির ওপর নির্ভর করে উজিরে আজমের আসনে আছি। আপনারা যতদিন আমাকে চান, ততদিন আমি কাজ করতে থাকবো। এজন্য আমি আপনাদের বারবার অনুরোধ করছি, আপনারা আমাকে সেবা করার সুযোগ দিন—যাতে আমি কাজ করার নতুন পন্থা দেখতে পারি। যখন দেখতে পাবো যে, আপনারা আর আমার ওপর সেবার দায়িত্ব দিচ্ছেন না, তখন আমি স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব থেকে মুক্তি নেবো, আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে 'আসসালামু আলায়কুম' বলে বিদায় নেবো।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

‘ব্যক্তির খেয়াল নয়, জনগণের ইচ্ছাই সরকারি নীতির ভিত্তি হতে হবে.....’

[প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতির উদ্দেশে জনাব সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা ১৩-৯-৫৬]

আল্লাহতায়ালা মেহেরবানী করে আমাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করেছেন। আমি সবিনয়ে এবং সভয়ে এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। দেশের সমস্যা বহু ও জটিল এবং এদের অনেকগুলোর আশু সমাধান প্রয়োজন। আমাদের সম্পদ সীমাবদ্ধ, দেশবাসীর আস্থা এবং সহযোগিতা না পেলে এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। প্রথমে যেটা একান্ত প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে, রাজনৈতিক স্থায়িত্ব। আমরা যদি অবাধে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসৃত হওয়ার সুযোগ না দিই, যদি অক্ষরে অক্ষরে শাসনতন্ত্র মেনে না চলি এবং আইনের শাসন মেনে চলার নিশ্চয়তা বিধান না করি, তবে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব সম্ভব হবে না। গত কয়েক বছর ধরে আমি এই নীতিরই স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করে আসছি; কেননা আমি মনে করি যে, মাত্র এভাবেই কর্মসূচির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং কোনো ব্যক্তির খেয়ালের ওপর নয়, বরং জনগণের ইচ্ছাই সরকারি নীতির ভিত্তি হতে হবে। গণতন্ত্রের দুর্বলতা সম্পর্কে আমি সচেতন; কারণ, গণতন্ত্র মানুষেরই তৈরি। এর অনেক অপরিহার্য ত্রুটি আছে, কিন্তু মোটের ওপর গণতন্ত্রই হচ্ছে প্রগতি ও বিবর্তনের একমাত্র নিশ্চিত পথ। একে শুধু সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগই দিতে হবে না, বরং একে এই রাজনৈতিক স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করতে হবে যে, নির্ভুল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র কখনই ব্যর্থ হতে পারে না। রাজনীতি যে রাষ্ট্রের সংহতি বিধানের জন্য প্রয়োজন এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে এর সেবক, তা উপলব্ধি করতে যারা অক্ষম, তারাই না বুঝে-সুঝে রাজনীতি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিন্দা করেন।

রাজনীতি হচ্ছে মানব সেবার মহৎ পন্থা। রাজনীতি একটা শক্তিশালী অস্ত্র, এই জন্যে ন্যায্য উদ্দেশ্য এবং সম্মানজনক লক্ষ্য সাধনের জন্যে একে সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে।

বন্ধুগণ, একমাত্র জনসাধারণের কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্যোগী হয়ে আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করে রাজনীতিকে জনসাধারণের নিকট এর প্রাপ্য আস্থা ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি কিনা, আমাদের তাই লক্ষ্য রাখতে হবে।

সরকারের ওপর আস্থা প্রতিষ্ঠা এবং জনসাধারণের সদিচ্ছা, উৎসাহ ও সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের ঐকান্তিকতা প্রমাণ করা, আমরা যা বলি, তা কার্যক্ষেত্রে পালন করা এবং প্রমাণ করা যে, প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য আমরা যথাসম্ভব আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবো এবং অবশ্যম্ভাবী মানবীয় ভুলভ্রান্তি ছাড়া আমরা ভয় অথবা অনুগ্রহের তোয়াক্কা না রেখে সকলের প্রতি ন্যায়নীতি দেখাবো। জনসাধারণ যদি নিশ্চিতভাবে বোঝে যে, তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না এবং ওয়াদাসমূহ পূরণ

www.pathagar.com

করা হবে, তাহলে তারাও বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করবে এবং তাদের সম্পদ ও কার্যকলাপ স্বদেশের কল্যাণের জন্যে সংহত করবে। জনসাধারণ যদি উপলব্ধি করতে পারে যে, ন্যায় নীতিই হবে সরকারের মূলমন্ত্র এবং প্রত্যেকেই তার ন্যায্য পাওনা পাবে, তবেই দেশে স্থিতিভাব প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং এই কর্তব্য পালন ও এই উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করার জন্য আমার সহকর্মীরা ও আমি সকল উপায়ে চেষ্টা চালাবো।

নিষ্কলুষ শাসন ব্যবস্থা

আমাদের দুর্নীতিমুক্ত শাসন ব্যবস্থা ও নিষ্কলুষ রাজনীতির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমি মনে করি, আমরা যদি ন্যায়পরায়ণতার সরল ও সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ক্ষমতার রাজনীতিতে নেমে আসি, তাহলে প্রকৃত ও আশানুরূপ দেশসেবা সম্ভব হবে না। এতে করে জবরদস্তি, স্বজনপ্রীতি এবং দুর্নীতির পথ প্রশস্ত হবে। আমরা বরং মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলের কর্মপন্থা গ্রহণ করে দেশের সেবা করবো; তবু আমরা রাজনীতিকে ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতির পর্যায়ে নিয়ে যাব না এবং ক্ষমতার জন্যে আমাদের নীতি হতে বিচ্যুত হবো না। এই নীতিতে যে দেশকে চালনা করা যায় এবং কূটনীতি, রাষ্ট্রশাসন ও রাজনীতির অর্থ যে ছলনা, মিথ্যা, প্রতারণা, জবরদস্তি ও দুর্নীতি নয়, তা প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্যে আমি জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

আমি এ ব্যাপারে স্থিরনিশ্চিত যে, যথোপযুক্ত আদর্শবাদ থাকলে শাসনতন্ত্র কলুষমুক্ত ও অধিকতর কর্ম তৎপর হবে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের নির্দেশে, পরিচালনায় ও দৃষ্টান্তে শাসনযন্ত্র অনেকখানি প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। সকলেই বলেন এবং অনুভব করেন যে, দেশ আজ দুর্নীতিতে ভরে গেছে। এমনকি, গর্হিত পথ অবলম্বন না করলে কেউ তার ন্যায্য পাওনা পায় না।

দুর্নীতির উচ্ছেদ

আসুন, আমরা আমাদের ভিতর থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদের জন্য ঐক্যবদ্ধ হই এবং বর্তমান কলুষপূর্ণ পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করি। কিন্তু আমরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে এটা করা সম্ভব হবে না।

আমরা দুর্নীতি-দমন-বিভাগকে শক্তিশালী করতে চাই এবং যে মহান আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে কওমের খেদমত করার আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁর কাছে সবিনয়ে প্রার্থনা জানাই যে, যেখানেই দুর্নীতি দেখা যাবে, সেখানেই তাকে দমন করার জন্যে তিনি যেন আমাদের শক্তি দেন। আমি ইতিপূর্বেই বলেছি, জনগণের সহযোগিতা ব্যতীত এবং এ সম্পর্কে তথ্যাদি না পেলে আমরা এই বিরাট কর্তব্য পালন করতে পারবো না। আমি বিশ্বাস করি যে, এই ব্যাপারে আমরা এমনভাবে একযোগে কাজ করবো, যাতে শাসনযন্ত্রের ন্যায়পরায়ণতার প্রতি জনগণের আস্থা ফিরে আসে।

সাধারণ নির্বাচন

আজ আমাদেরকে অবহিত হতে হবে যে, আমরা আমাদের শাসনতান্ত্রিক প্রগতির অন্তর্বর্তীকালীন স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি। পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর আমাদের পার্লামেন্টের প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। যতদিন না প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফত জনগণের অভাব-অভিযোগ শোনা যায়, ততদিন তাদের দাবি-দাওয়া

www.pathagar.com

পূরণ হতে পারে না। যাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁরা তাঁদের ধারণা অনুযায়ী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়ণের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁরা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে কতখানি সংবেদনশীল ও সজাগ এবং জনগণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ও তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁদের কতখানি সংযোগ আছে, তার ওপরেই তা অনেকখানি নির্ভর করে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অনেকটা আইন প্রণয়নকারীদের দৃষ্টিভঙির ওপরেই আইন রচনা নির্ভর করে; তাঁদের মানবহিতৈষণা আত্মস্বার্থের দরুণ ব্যাহত হয়। যদি আইন প্রণয়নকারিগণ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হন, একমাত্র তাহলেই জনগণের ইচ্ছানুযায়ী সংস্কারমূলক কাজ সম্ভব হতে পারে। সুতরাং যতশীঘ্র সম্ভব প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

নির্বাচন ত্বরান্বিত করার জন্যে এবং নির্বাচনের সময়-তালিকা দৃঢ়তার সাথে অনুসরণের জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। তবে আমার আশংকা হয় যে, এ বিষয়ে এত বেশি বিলম্ব করা হয়েছে এবং এখনও নির্বাচনের জন্যে এত বেশি প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করতে হবে যে, আমরা যত শীঘ্র নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে চাই, সম্ভবত তত শীঘ্র নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এতদিন যাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা জানতেন যে, ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না; তবু তাঁরা সরবে ঐ সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দিতেন। শুধু বিরোধিতা করার জন্যেই নয়, বরং নির্বাচনের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই আমি তাঁদের এই উক্তিকে বার বার চ্যালেঞ্জ করেছিলাম। সম্ভবত তাঁরা জনসাধারণের উৎসাহ বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই বারবার এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। জনসাধারণ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে মনে করে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের ওপর আস্থা স্থাপন করবে, সম্ভবত এই তাঁরা ভেবেছিলেন। আমি জনসাধারণকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমরা অযথা সময় নষ্ট করবো না। আমি অন্তত এ দাবি করতে পারি যে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমার দায়িত্ব থাকা পর্যন্ত নির্বাচন স্বাধীন ও অবাধ হবে। যেহেতু শেষ পর্যন্ত আমরা জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধি-স্থানীয় আইন-সভা পেতে যাচ্ছি, অতএব আমি আশা করি যে, রাজনৈতিক দলগুলো জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ও দেশের বিভিন্ন সমস্যা এবং এগুলোর ন্যায়সঙ্গত ও বাস্তব সমাধান সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জনসাধারণের কর্মপন্থা সম্পর্কে জনসাধারণকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দিতে হবে। আমি এরূপ প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। আমরা জনসাধারণকে দীর্ঘকাল অন্ধকারে রেখেছি। নির্বাচনের ব্যাপারে সরকার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবেন এবং এই মহান কাজে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে না। প্রকৃতপক্ষে এই কাজকে আমি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। কারণ এরূপ রাজনৈতিক শিক্ষার সাহায্যেই জাতীয় চরিত্র গঠিত হয় এবং এর ওপরেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও দলকেই তাদের বক্তব্য বলার এবং জাতির খেদমতের উদ্দেশ্যে তারা যে কার্যসূচি গ্রহণ করেছে, তা জনগণের সামনে পেশ করার সুযোগ দিতে হবে। আমি আশা করি যে, প্রচারণার সময় প্রত্যেকেই সহিষ্ণুতা অবলম্বন করবেন, যুক্তিতর্কের ওপর নির্ভর করবেন, যথার্থ সমালোচনা

www.pathagar.com

করবেন, গঠনমূলক প্রস্তাবাদি পেশ করবেন এবং অশোভনীয় নিন্দাবাদ পরিহার করে চলবেন। জনসাধারণ কি করবে তা জনসাধারণই স্থির করবে। পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব ও স্থায়িত্ব নষ্ট হতে পারে এমন কিছু যাতে বলা না হয় ও করা না হয়, সেদিকে সব সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

জনসাধারণের দেশপ্রীতির ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। পাকিস্তানের ক্ষতিকর কোনো শক্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে জনসাধারণ তা সহ্য করবে না। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, এই অনিষ্টকর শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে জনসাধারণ শুধু সরকারের সাথে সহযোগিতাই করবে না, বরং তারা স্বেচ্ছাকৃতভাবেই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। তবে সস্তা বুলি ও উদ্ভট প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা স্থাপন না করার জন্যে আমি জাতিকে সতর্ক করে দিচ্ছি। আমাদেরকে মাটিতে পা রেখেই চলতে হবে। আদর্শ প্রচারের ব্যাপারে আমাদেরকে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে আমরা জনগণের মনোভাবকে উত্তেজিত করে এর সুযোগ গ্রহণ না করি। কারণ, এরূপ করা হলে বিভিন্ন শ্রেণী ও জনগণের পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও শত্রুতার ভাব জেগে উঠতে পারে। আমি আশা করি যে, জাতির বাস্তব সাধারণ জ্ঞানই জাতিকে আসল নীতি বেছে নিতে সাহায্য করবে।

পাকিস্তানের স্থায়িত্ব

পাকিস্তানের সংহতি ও স্থায়িত্ব বিধান আমাদের কর্মসূচির পুরোভাগে স্থানলাভ করবে। কতিপয় ঘটনা এমন এক মনোভাবের সৃষ্টি করেছে যে, পাকিস্তানের উভয় অংশ বহু সমস্যা সম্পর্কে একমত নয় এবং সম্ভবত উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বেড়েই চলেছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয় সরকার গঠিত হওয়ায় এবং গণতান্ত্রিক শক্তি জয়লাভ করায় এরূপ নৈরাশ্যের কোনো কারণ নেই। আমাদের মৌলিক নীতি এই হবে যে, আমরা অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ থাকবো। আমাদের যোগসূত্র শিথিল করা হবে না, জাতি হিসেবে আমরা এক। আমরা সকলেই পাকিস্তানী। আমাদেরকে অবশ্যই এক সাথে বাঁচতে অথবা মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং জনসাধারণের ওপর আমার এরূপ বিশ্বাস ও আশা আছে যে, আমরা যদি একত্রে জীবন-যাপন করার সংকল্প করি, তাহলে আমরা কখনই মরবো না। আদর্শ এবং কাজের মাধ্যমে উভয় অংশে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার জন্যে আমাদেরকে অবশ্যই সকল প্রকার চেষ্টা করতে হবে। উভয় অংশের আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্যাণ এবং অগ্রগতি যাতে সমভাবে কার্যকরী হয় এবং জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ বিধানে আমরা যাতে সর্বাধিক কাজ করে যেতে পারি, সেদিকে আমাদেরকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা

আমরা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে গভীরভাবে পর্যালোচনা করবো এবং দেশের সামনে এরূপ একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা পেশ করবো, যা উভয় অংশকে সন্তুষ্ট করবে এবং যা সকলের প্রতি সম-আচরণের ভিত্তিতে রচিত হবে।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমাদের সমস্যা বহু এবং জটিল। পৃথিবীর যে সব জাতি এসব সমস্যার সমাধানে আমাদের সাহায্য করছে, আমি তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রতিদান দিতে না পারলে কোনো প্রকার সাহায্য গ্রহণ করার পক্ষপাতী আমি নই। অন্তত শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি এই প্রতিদান দিতে চাই। শালীনতা

www.pathagar.com

ও নীতিবোধের জন্যেই এর প্রয়োজন। জ্ঞান এবং পরামর্শ সংগ্রহের জন্যে আমি দূর-দূরান্তরে যেতেও প্রস্তুত আছি। আমি অবশ্যই স্বীকার করি যে, আমি অধৈর্য ও ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, আমাদের সামনে বহুসংখ্যক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সে-সবের সমাধানের জন্যে আমরা কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিনি। আমি জানি যে, অনেকে আমাদের নিজস্ব সম্পদ, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করার পক্ষে মত পোষণ করেন। পৃথিবী এ-যুগে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, অতএব পৃথিবীর যেকোনো স্থান থেকে উৎকৃষ্ট পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে আমাদেরকে সমর্থনের জন্যে আমি তাঁদের অনুরোধ জানাচ্ছি এবং আমি আশা করি যে, এই উপায়ে সম্ভবত আমরা দ্রুত এবং সন্তোষজনকভাবে আমাদের সমস্যাবলীর সমাধান করতে সক্ষম হবো।

আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী

দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীর দিকে লক্ষ্য করলে আমি নিরাশ হয়ে যাই। আমার মনে হয়, শাসন ব্যবস্থার ন্যায়পরায়ণতায় জনগণের অপসৃয়মান আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং জনসাধারণের সেবার জন্যে শাসনযন্ত্রকে সক্রিয় করে তোলাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ। দেশের শাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব যাঁদের ওপর অর্পিত রয়েছে, তাঁদের প্রতি আমি হিতোপদেশ বর্ষণ করছি না। তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে তাঁরা ভালোভাবে অবহিত আছেন। তাঁরা জানেন যে, তাঁরা জনগণের প্রভু নন, রাষ্ট্রের খাদেম মাত্র। জনগণের মঙ্গলের জন্যেই তাঁরা কাজ করে যাবেন, আমি এই আশা করি এবং তাঁদের আমি আশ্বাস দিতে পারি যে, এরূপ সকল কাজে তাঁরা আমাদের সমর্থন লাভ করবেন। আমি শাসনকার্যে কোনো প্রকার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হতে দেবো না; কিন্তু এর পরিবর্তে আমি প্রশংসনীয় ন্যায়পরায়ণতা এবং ব্যবহার আশা করি। আমি এ শুধু চাই যে, দেশকে নতুন করে সুযোগ দেয়া হোক। সম্মান এবং সততার সাথে কাজ করা যায় কিনা, তা আমাদেরকে দেখতে হবে। আমাদের ভুললে চলবে না যে, আমাদের ওপরে এবং আমাদের চারপাশেই আল্লাহ আছেন; আমরা তাঁর ইচ্ছার যন্ত্র মাত্র এবং তিনি সব কিছুই লক্ষ্য করছেন।

আমাদের বিভিন্ন সমস্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না। আমাদের প্রধান কর্মসূচি হবে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করা এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। অবশ্য এটা পুরানো কথা। এমন কোনো সরকার নেই যারা বলবে না যে, এই তাদের কর্মসূচি এবং তাদের উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে পরিকল্পনা কার্যকরি করার ওপরই বিভিন্ন সরকারের পার্থক্য নির্ভর করে।

খাদ্য সমস্যা

আমাদের যে সমস্যাটির এক্ষণে আশু সমাধান প্রয়োজন এবং যাকে আমি একটি সাময়িক সমস্যা বলে মনে করি সেই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী বিষয়টি হচ্ছে খাদ্য সমস্যা। পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যসঙ্কট প্রায় দুর্ভিক্ষের পর্যায়ে পৌঁছেছে। আমি মনে করি যে, জনসাধারণের জন্যে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে না পারলে আমাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য আনার জন্যে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা করা হয়েছে; কিন্তু খাদ্যের প্রয়োজন খুব বেশি। এই মুহূর্তে আমাদের খাদ্যের জরুরী প্রয়োজন এবং যেকোনো স্থান থেকে হোক খাদ্য সংগ্রহের জন্যে ইতোমধ্যেই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যের পরিমাণ পর্যাপ্ত অপেক্ষা অধিক না হওয়া পর্যন্ত সেখানে খাদ্য প্রেরণের জন্যে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে। আমরা ইতোমধ্যেই কতগুলো নয়া চুক্তি স্বাক্ষর করেছি এবং এ সম্পর্কে সব রকম ব্যবস্থা নেয়া শুরু হয়েছে। আমরা আশা করি যে, খাদ্য সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হবে। পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রিসভা ১৪ই সেপ্টেম্বর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও খাদ্য দফতরের অফিসারদের একটি বৈঠক আহ্বান করেছেন। এই সভায় যোগদান করে আমি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অর্থ সচিব, তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলী এবং খাদ্য দফতরের প্রতিনিধিদের সাথে এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার ইচ্ছা রাখি। পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে আমরা বহু পরিমাণ গম আমদানী ও মজুত করছি। আমাদের আশা করবার কারণ রয়েছে যে, উক্ত ব্যবস্থার ফলে মূল্য হ্রাস পাবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে।

মোহাজের পুনর্বাসন

আমরা এখনও দেশ-বিভাগের দরুন উদ্ভূত পরিস্থিতির জের টানছি। এই বিরাট পরিবর্তনের ফলে যারা গৃহহীন হয়েছে, সেসব মোহাজেরের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের শব্দসম্ভার থেকে 'মোহাজের' শব্দটি মুছে ফেলবার জন্যে আমি উদ্বিগ্ন। আমি এ-দেশের স্থায়ী অধিবাসীদের থেকে তাদের আলাদা করে দেখছি কেবল এই জন্যে যে, পাকিস্তান আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপই তাদের উদ্ভব, নইলে স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যেও তাদেরই মতো অসহায় ও নিঃস্ব লোকের সংখ্যা কম নয়। আমাদের যে সম্পদ আছে, তার সাহায্যেই দেশের অর্থনীতিতে তাদের স্থান করে দেওয়া; এবং দেশের অগ্রগতিতে সাহায্য করতে তাদের সক্ষম করে তোলাই হবে আমাদের প্রধান প্রচেষ্টা। তাদের মধ্যে উচ্চস্তরের প্রতিভা রয়েছে এবং তাদের কাজে লাগাতে পারলে তারা সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করতে পারে।

আমরা নানা ক্ষেত্রের উন্নয়ন সাধন করতে পারি; কিন্তু খাদ্যের ঘাটতিই আজ আমাদের সামনে সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। যাতে আমরা খাদ্যের দিক দিয়ে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, অন্যকে সাহায্যও করতে পারি, তজ্জন্য উন্নত ধরনের কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদেরকে কৃষির উন্নয়নের জন্যে অবশ্যই সর্বপ্রকারে সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কৃষিই আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বাস্তব ক্ষেত্রে এরূপ গুরত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে যতখানি নজর দেয়া উচিত ছিলো, তা দেয়া হয়নি।

পল্লী উন্নয়ন

গ্রামীণ সমিতিসমূহের সংগঠন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উন্নতি সাধন আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেবল এই পন্থাতেই আমরা আমাদের জনগণের সর্বাধিক সহযোগিতা লাভ করতে এবং তাদের সম্পদকে কাজে লাগাতে পারবো। সমস্ত উন্নত দেশের জনগণই স্বেচ্ছায় তাদের সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে। কারণ, তারা জানে যে, কেবল আভ্যন্তরীণ সম্পদই তাদের সমস্ত সমস্যা দূর করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যদি জনগণ এ সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত হয় যে, তাদের নিজস্ব সরকারই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে এবং সরকার কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে, শুধু তা হলেই তারা

www.pathagar.com

দেশের সমস্যা সমাধানে স্বেচ্ছায় সাহায্য করার জন্যে চেষ্টা করবে এবং জাতির পুনর্গঠন কাজে তাদের আস্থা ও সহযোগিতা লাভ করা যাবে। শহর এবং পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা এ-ব্যাপারে সাহায্য করবে।

কৃষির সাথে দেশকে শিল্পায়িত করে তুলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু আমি একই জায়গায় বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর জোর না দিয়ে সমগ্র দেশে ব্যাপকাকারে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছি, যাতে দেশের প্রয়োজন বড় বড় ব্যবসায়ীর মাধ্যমে পূরণ না হয়ে যত বেশিসংখ্যক সম্ভব লোকের মাধ্যমে পূরণ হতে পারে। সুতরাং আমি কুটিরশিল্পের উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছি। এর ফলে আমাদের গণ-জীবনে কিছুটা ব্যয়-সঙ্কোচের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। মোটা কাপড়েই হয়তো আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সোনার বদলে টিনের পাত দিয়েই হয়তো আমাদের কাজ চালিয়ে নিতে হতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, ত্যাগ ও তিতিক্ষার বলে গণ-জীবনের সংকটময় এই পর্যায়টি যদি আমরা উত্তীর্ণ হতে পারি, তাহলে দেশকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে আমরা সক্ষম হবো।

আমাদের অনেক কিছু করতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, শাক-সব্জির চাষ, সন্তানদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান– এমনিতর হাজারো সমস্যা রয়েছে আমাদের সামনে। ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ নেই। এসব সমস্যা আমাদের গণ-জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে—এদের মোকাবিলা আমাদের করতেই হবে।

দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে; যে কোনো বহিরাক্রমণের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকা। অত্যন্ত আশার কথা, বিশ্ব আজ শান্তির পথে এগিয়ে চলেছে। এখানে সেখানে ছোটখাটো শান্তি ভঙ্গ ও আলোড়নের সৃষ্টি হলেও এবং এমনকি তীব্র সংঘর্ষ মাথাচাড়া দিতে থাকলেও সাধারণভাবে সকলের মনেই আজ এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে দেখা দিয়েছে যে, শান্তি ছাড়া মধ্যপথ বলতে কিছুই নেই। একমাত্র শান্তিতেই মানুষের মুক্তি, সংঘর্ষে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। যুদ্ধের শেষে বিজয়ী ও বিজিতের কোনো পার্থক্য থাকে না, উভয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কেবল, আমরা যদি সকলে সম্মিলিত হতে পারি, আমরা যদি একে অপরের প্রতি ন্যায় আচরণ করতে পারি, আর ন্যায্য রায় দেওয়ার মতো একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক বিচারালয় রয়েছে বলে আমরা যদি বিশ্বাস করতে পারি—তাহলে কি বিস্ময়করভাবে সুন্দর হবে এই পৃথিবী! এ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করাই হবে আমাদের লক্ষ্য; তবে যতদিন না সে পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, ততদিন দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে আমাদের পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে আজ পাকিস্তান এমন একটি সৈন্যবাহিনীর অধিকারী, যা কোনো সৈন্যবাহিনীর চেয়েই নিকৃষ্ট নয় বলে আমি দাবি করি। এজন্য আমরা গর্বিত। হতাশায় ভেঙে-পড়া দেশে স্থায়িত্ব আনার এ একটা বড় শক্তি। আমাদের সেনাবাহিনীর সামনে রয়েছে বিরাট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। আধুনিক সাজসরঞ্জামে তাদেরকে সজ্জিত করার সুযোগের সদ্ব্যবহার যদি আমরা করতে পারি, তাহলে কোনো মহলের হুমকিতেই আর পাকিস্তান ভীত হবে না।

www.pathagar.com

পররাষ্ট্রনীতি

আমি এ কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আমরা আগ্রহশীল। বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং আমাদের বন্ধু মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে আমরা আগ্রহশীল, আমাদের পররাষ্ট্রনীতি হবে সকলের প্রতি শুভেচ্ছা, কারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব আমরা পোষণ করবো না। সকলের সহযোগিতা হবে আমাদের কাম্য, শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে আমরা সকলেই কাজ করে যাব একযোগে। প্রতিশ্রুতি এবং চুক্তিসমূহের যথার্থ সম্মান আমরা অবশ্যই দেবো। আমরা জানাতে চাই যে, আমরা যা বলবো, কাজেও আমরা তাই করবো। আমাদের কথাই আমাদের এ করারনামা। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমি ক্রীড়নক হতে চাই না; কিন্তু সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হওয়ার জন্যে এবং অন্যান্য জাতির কাছে সম্মান লাভের জন্যে আমাদের ঘর সামলানো। তা না করলে আমাদের অবদানের কোনো মূল্যই নেই।

সংখ্যালঘু

অতএব, আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে নিজেদেরকে গড়ে তোলা। এই জন্যে জনসাধারণের একনিষ্ঠ মনের একান্ত প্রয়োজন; তারা যে কোনো বিশ্বাস, ধর্ম অথবা বৃত্তির অনুসারী হোন না কেন। বারবার বলা হয়েছে যে, সংখল্যাঘুরা উদার ব্যবহার পাবেন। এসব প্রতিশ্রুতি পালন করাই হবে আমাদের দায়িত্ব। সাম্প্রদায়িক ও ধর্মভিত্তিক সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু মনোভাব যাতে দূর হয়, তার জন্যে আমি অত্যন্ত আগ্রহশীল।

মনেপ্রাণে আমাদেরকে একান্তভাবে পাকিস্তানী হতে হবে। আমাদের সকলকে উপলব্ধি করতে হবে যে, আমরা এক মহান জাতি, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনধারা যাই হোক না কেন, ধর্ম আমাদের যত পৃথকই হোক না কেন, আমাদের পরিবেশ, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাই থাকুক না কেন, আমাদের লক্ষ্য মাত্র একটি এবং তা হচ্ছে দেশের প্রতি আনুগত্য এবং সমান নাগরিক হিসাবে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দেশের কল্যাণের জন্যে নিজেদের দায়িত্ব পালন করা।

এ কথা প্রায়ই বারবার বলা হয় যে, খাঁটি ইসলামিক ঐতিহ্য অনুযায়ী আমাদের ন্যায়বিচারের ওপর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো নির্ভর করতে পারে। যা কিছু ভালো এবং যা কিছু কল্যাণকর, ইসলাম তারই প্রতীক। আমরা যদি ন্যায়বিচার, সত্য ও মর্যাদার পথে চলি, আমরা যদি সহনশীলতা ও ন্যায়পরায়ণতার পথে এবং মানব-প্রেম ও মানব-সেবার পথে চলি, তাহলে আমরা ইসলামের মহৎ নীতিকেই অনুসরণ করবো। আমরা মুসলমান এবং ইসলামের নীতি আমাদের কাছে প্রিয়; কিন্তু আমাদের কাজের সমর্থনের জন্যে বা নিন্দার জন্যে সদা-সর্বদাই যেন আমরা ইসলামের নামের দোহাই না দিই।

আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা আছে, তার প্রতি চোখ বন্ধ করে থাকা সম্ভব নয়।

কাশ্মীর

এসব সমস্যার মধ্যে কাশ্মীর সমস্যাই আমাদের কাছে সব চাইতে বেশি বেদনাদায়ক। আমরা কাশ্মীর বিরোধের আশু সমাধান চাই—গণতান্ত্রিক উপায়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ

www.pathagar.com

গণভোটের মাধ্যমে। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, কাশ্মীর সমস্যার আজও কোনো সমাধান হয়নি। এ সমস্যার যাতে সুসমাধান হয়, সেজন্যে আমি এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দিতে চাই। ইতোমধ্যে আমার এই সরকার কাশ্মীরীদের আশ্বাস দিচ্ছেন যে, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা আমাদের বিশ্বাসেরই একটা অঙ্গ এবং যাই ঘটুক না কেন, কোনো অবস্থাতেই আমরা তাদের ত্যাগ করবো না। আমি কেবল এ আশাই করবো যে, ভারতীয় সরকার ও জনসাধারণ আমাদের এ দাবির যৌক্তিকতা বুঝতে পারবেন। সমগ্র বিশ্ব, এমনকি যে সব দেশের সঙ্গে ভারতের সব চাইতে বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তাঁরাও এ ব্যাপারে তাঁদের রায় দিয়েছেন এবং সমাধান বাৎলিয়েছেন। এটা একটি দুষ্টক্ষত এবং এই ক্ষত আমাদের উভয় দেশের মধ্যে এমন তিক্ততার সৃষ্টি করে রেখেছে যে, আমরা কি বিশ্বশান্তির এবং পরস্পরের প্রতিবেশীসুলভ সমঝোতার খাতিরে আশা করতে পারি না যে, ভারত ন্যায়ের পথে চলবে। যদি এ সমস্যাটার একটা সমাধানে পৌঁছানো যেতো তাহলে সত্যি এটা অত্যন্ত সুখের হতো? তাহলে উভয় দেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ঐক্যবন্ধনের মাধ্যমে দেশের সম্পূর্ণ সম্পদ দেশবাসীর উন্নতির কাজে সাফল্যজনকভাবে লাগাতে পারতো।

এ স্বীকৃতি ক'জনে দেয়?

আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমার পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই। তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়েছেন। আমি তাঁর প্রশংসাও করেছি, সমালোচনাও করেছি; যখনি আমি মনে করেছি যে, তিনি ঠিক পথে চলছেন, তখনি আমি তাঁকে সমর্থন জানিয়েছি এবং যখন আমি মনে করেছি যে, তিনি ভুল পথে চলছেন তখন তাঁর ভুল দেখিয়ে দিতেও আমি দ্বিধা করিনি। কিন্তু আমি তাঁর নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম সম্বন্ধে কখনই সন্দেহ পোষণ করিনি। তাঁর মতো দেশপ্রেম ও একাগ্রতা নিয়ে জাতির সেবা করতে পারলে আমি গৌরবান্বিত বোধ করবো। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর যে সব গুণ আছে এবং পাকিস্তানকে তিনি যে সেবা দিয়েছেন, শালীনতার খাতিরে তাঁর প্রশংসা করা সকলেরই উচিত।

পরিশেষে আসুন আমরা সকলে পাকিস্তানের গৌরব বৃদ্ধি এবং তার জনগণের সমৃদ্ধি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনায় আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পাকিস্তানে গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

[পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৫৭ সালের এপ্রিল সংখ্যা 'ফরেন এফেয়ার্স' পত্রিকায় প্রকাশিত জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রবন্ধ]

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তা আমার দেশের সমস্ত বড় বড় সমস্যার প্রাণকেন্দ্র বিধায় আমি এই সমস্যার বিশ্লেষণেই অধিকতর মনোসংযোগ করবো এবং সেইসঙ্গে বিশেষ কোনো নীতির বুলি না আওড়িয়ে যে মনোভাব নিয়ে তার মোকাবিলা করতে হবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করবো।

বিদেশী শ্রোতাবর্গের সামনে এমন একটা বিশ্লেষণমূলক বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করতে গিয়ে যে কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যে দু'টি লোভ পেয়ে বসে তা হচ্ছে, একদিকে নিজের দেশ সম্পর্কে দম্ভ প্রকাশের, অন্যদিকে আবার দেশের বিভিন্ন ঘটনার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্যে নানারূপ যুক্তির অবতারণার ইচ্ছা। কিন্তু আমি সে লোভ সংবরণ করতে পারবো বলেই আশা করি। কারণ, মিত্রবর্গ আমাদের প্রকৃত অবস্থা জানুন, আমরাও নিজেদেরকে বুঝতে চেষ্টা করি, এটাই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। এর মধ্যে ভালো-মন্দের অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা থাকবে না বা ভুলত্রুটিকে প্রশ্রয় দেবার কথাও উঠবে না।

অনেক সময় পাকিস্তানে আমাদের মধ্যে কোনো কিছুর শুধু কাল্পনিক ভালোর দিকটার জন্যই নিজেদেরকে অহেতুক বাহবা দেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। অথচ উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া গেছে কিনা, সেদিকটার প্রতি আমাদের লক্ষ্য থাকে না। অবশ্য এ স্বভাবটা শুধু যে আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়, আমাদের দেশের প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে মিল রেখে আমাদের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নামের সাথে একটি বিশেষণমূলক শব্দ জুড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে এক বছর আগে। সেই অতি সাধারণ বিষয়টির মাহাত্ম্য আমাদের মধ্যে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যে, একমাত্র এটাই যেন আমাদের বীর্যবত্তা আর নৈতিক উৎকর্ষের মূর্ত প্রতীক। আদর্শের দিক থেকেও আমাদের খুব একটা শ্রেষ্ঠত্ব রয়ে গেছে, এমনটাও লোককে প্রায়শই শোনানো হয়ে থাকে বা এ বিষয়ে অনেক কথাই বলা হয়। মনে হয় যেন কাজের চেয়ে প্রচারের দরকারটাই আমাদের বেশি। অপরদিকে আমাদের প্রকৃত রাজনৈতিক জীবনে যে অপূর্ণতা রয়েছে, তার উল্লেখ করে আবার এটাও বলা হয় যে, হাজার হলেও রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের বয়স এখনো দশ বছর পুরো হয়নি।

সাবালকত্বের সম্মান পেতে হলে....

এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, বিশ্ব-রাজনীতির ঘটনাচক্র এমনই জটিল যে, কোনো দেশই বয়সের অজুহাতে দায়িত্ব পালনের দায় থেকে রেহাই পেতে পারে না। এ যুক্তি কেবল শিশুদের পক্ষেই শোভা পায়। কোনো জাতিকে সাবালকত্বের সম্মান পেতে হলে তাকে সাবালকের মতোই কাজ করতে হবে। বয়সে তরুণ বলেই নিজেদের রাজনৈতিক জীবনের

www.pathagar.com

দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা নিন্দনীয়। ক্রটি-বিচ্যুতি শুধরিয়ে নেবার প্রথম ধাপ হচ্ছে নিজের ক্রটিগুলোকে খুঁজে বের করা ও তা স্বীকার করা। আত্মস্তুতিতে ডুবে না থেকে সতর্কতার সঙ্গে আন্তরিকভাবে নিজেকে জানতে চেষ্টা করলেই আমরা অপরের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করতে সমর্থ হবো। অতীতের যে সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্য হতে একটা রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে, আমাদের সমস্যাবলীর প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্যে এখানে তার কিছুটা আমি আলোচনা করবো।

পাকিস্তানের আগে ও পরে

১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। এর বহু শতাব্দী পূর্ব হতেই যে শাসন ব্যবস্থার সাথে এশিয়ার এই অঞ্চলের জনগণের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ ঘটেছিল, তাকে দখলকারী শক্তির অধিকার বলেই জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এজন্যে জনমতের কোনো তোয়াক্কা করা হয়নি। বৃটিশ শাসন অনুরূপ জনমত নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থার সুদীর্ঘ ইতিহাসেরই শেষ অধ্যায় মাত্র। অবশ্য বৃটিশ শাসনাধীন থাকাকালে আমরা তাদের কাছ থেকে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় শাসনতান্ত্রিক কার্যক্রম ও দক্ষতা সম্পর্কে যে শিক্ষা লাভ করেছি, আমি সে ঋণ অস্বীকার করছি না। শাসন ক্ষমতার চাবিকাঠি লন্ডনেই থাক আর দেশীয় রাজধানীতেই থাক, সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা এই যে, স্বায়ত্তশাসনের যে ঐতিহ্য, প্রচলিত প্রথা আর নীতিগত রূপ থাকে, পরাধীন আমলের শাসন ব্যবস্থায় সেটার অভাব ছিলো।

ওদের বদ্ধমূল ধারণা ছিলো....

এই অবস্থায় সরকারি শাসনযন্ত্র ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা একে অন্যের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। শাসকবর্গের মধ্যে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, শাসিতরা যতই বিরোধিতা করুক তাকে উপেক্ষা করেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। শাসিত জাতি মনে করে, তাদের স্বার্থকে গলা টিপে হত্যা করার জন্যেই ঐ সরকারি শাসন ব্যবস্থা খাড়া করা হয়েছে। ফলে, এরূপ একটা খাপছাড়া অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, শাসিতকে বলপূর্বক বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্যে সরকারকে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু গভীর নৈতিক মূল্যবোধের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, এই অবস্থায় শাসিতের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি লাভ করা বা তাদেরকে বিবেকের নিগড়ে আবদ্ধ করার মতো যোগ্যতা সরকারের থাকে না। তখন শাসিতের ওপর আইনকে চাপানো হয়। অর্থাৎ শাসকরা নির্দেশ জারি করেন আর ম্যাজিস্ট্রেটরা রাষ্ট্রের বহুবিধ দৈনন্দিন কার্যে তা প্রয়োগ করেন। এতে আইনের শাসনের অস্তিত্বই থাকে না এবং জনগণের সম্মতি বা ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট বিধিনিষেধের মাধ্যমে শাসকদেরকে সংযত করা বা প্রয়োজনবোধে তাদেরকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করার আদর্শও থাকে না।

আইন যখন ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহার হয় না এবং ওতে যখন আইনের বিধানের মহান নৈতিক মূল্যবোধ থাকে না, তখন শাসনযন্ত্রের কর্ণধাররা মনে করেন যে, জনগণের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনিকারীরা অনধিকার চর্চাকারী এবং এদের সাথে ভিন্নতর ব্যবহার করার অধিকার তাদের রয়েছে। একইভাবে বলা যেতে পারে যে, যাঁরা শুধু জনগণের আকাঙ্ক্ষার অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করার উদ্দেশ্যে রাজনীতি করেন, সরকারের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁরা নিতান্তই অজ্ঞ থাকেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাকে একটা

www.pathagar.com

কঠোর কর্তব্য বলে গণ্যই করেন না। তাঁরা রাজনীতিকে বাগাড়ম্বর করা, বুলি আওড়ানো ও আদর্শ প্রচারের উর্বর ক্ষেত্র বলে মনে করেন।

সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা বহাল রাখতে হলে....

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় সরকারি শাসনযন্ত্র ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটা বৈরীভাব বিদ্যমান থাকে। এটাই এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত না করার দরুন যে শাসনযন্ত্রকে জবাবদিহি করতে হয় না, তার পরিচালকদের কোনো বিবেচনা-জ্ঞান থাকতে পারে না। খুব ভালো হলে এরূপ শাসন ব্যবস্থা হয় অকর্মণ্য, আর খুব খারাপ হলে হয়ে ওঠে অত্যাচারী। সরকারি কাজের জন্য প্রকৃতই কি কি দরকার এবং সরকারি ক্ষমতা কতখানি সীমাবদ্ধ সেদিকে লক্ষ্য না রেখে সাধারণ রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া সম্পর্কে চাপ দেয়াটা অনেক সময় অস্থিরচিত্ততা ও সস্তা নাম কেনার জন্যে মেঠো বক্তৃতাতে পর্যবসিত হয়ে থাকে। রাজনৈতিক দরকষাকষি বাস্তবতা বর্জিত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে তা হট্টগোল ও ইউটোপিয়া মার্কা অবাস্তব রাজনীতিতে পরিণত হয়। সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা বহাল রাখতে হলে জনগণের কি চাই আর সরকারের কতটুকু ক্ষমতা আছে, তার মধ্যে সর্বদাই একটা যোগাযোগ থাকতে হবে ও শাসনতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষ ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সংযোগ রাখতে হবে। উভয়পক্ষই যদি পরস্পরকে বুঝতে পারে, তাদের মধ্যে একটা আত্মীয়তা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে ও পরস্পরের ওপর হতে অবিশ্বাসের ভাব পরিহার করতে পারে তবেই উভয়ের মধ্যে এরূপ একটা ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হতে পারে।

ঔপনিবেশিকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে যে জাতি স্বাধীনতার আলোকে আসতে সক্ষম হয়, সে-জাতির সামনে প্রথম যে কাজটি দেখা দেয় সেটা হচ্ছে পরস্পরের প্রতি এই বিরূপতা পরিহার করা। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের যাঁরা কর্ণধার আর যাঁরা বাইর থেকে এর মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে অবশ্যই একটা সুন্দর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পুরাতনের স্থলে নতুন মানসিকতা আমদানী করতে হবে। শাসনযন্ত্রকে অবশ্যই রাজনীতির প্রতি বিদ্বেষ ভুলে যেতে হবে। শাসনযন্ত্রের প্রতি রাজনীতিকদের শত্রুতা পরিহার করতে হবে। সরকার ও শাসিত জনগণের মধ্যে এভাবেই পরস্পরের প্রতি আস্থার ভাব আসতে পারে, এভাবেই তারা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করার শিক্ষা লাভ করতে পারে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা এভাবে জনগণের আস্থা ও সমর্থন লাভে সক্ষম হন। কারণ, এই আস্থা ও সমর্থনই তাঁদের ক্ষমতার উৎস আর এর মাধ্যমেই তাঁরা কাজ হাসিল করতে পারেন। জনগণের এরূপ আস্থা ও সমর্থনের অভাবে তারা স্বভাবতই অনিশ্চিতবোধ করেন। তখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে বিশেষ উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয়। এরূপ অবস্থায় জনগণের আস্থা ও ইচ্ছা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য লাভ করে। তার ফলে জনসাধারণের কল্যাণমূলক কার্যে শাসক কর্তৃপক্ষের হস্ত শিথিল হয়ে পড়ে।

সরকার ও শাসিতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি, ক্ষমতাসীনদের গদিতে থাকার কার্যকাল শেষ হবার উপক্রমে তাঁদের মধ্যে উৎকণ্ঠা দেখা দেয়া, আস্থাভাজন জনগণের মধ্য হতে গঠনমূলক কার্যক্ষম ব্যক্তিদের সংগ্রহ করার দক্ষতা সম্পর্কে ক্ষমতাসীনদের আত্মবিশ্বাসের অভাবহেতু সরকারি কার্যে বন্ধ্যাত্ব, অহঙ্কার, সুবিধাবাদ, যাঁরা কখনো কোনো প্রকার দায়িত্ব

www.pathagar.com

নিয়ে কাজ করেননি এমন গণনেতাদের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা এবং অহেতুক বাগাড়ম্বর করা এ সমস্ত কারণে সরকারি কাজে স্থিতিশীলতার অভাব দেখা দেয়। পাকিস্তানেও ঐ একই অবস্থা চলে আসছে। আমাদের দেশে এটা এতখানি শিকড় গেড়েছে যে, আমরা পুরাতন অভ্যাসকে এখনো ঝেড়ে ফেলার সংকল্প গ্রহণ করতে পারিনি; নৈতিক স্বাধীনতাকে আইনানুগ স্বাধীনতার পেছনে ঠেলে দিয়েছি এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সরকারি শাসনযন্ত্রের গুরুদায়িত্ব এ দুটোকে পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ় সংবদ্ধ না করে বরং এদেরকে বিপরীতমুখী করে রেখেছি।

রোগ নিবারণের উপায়…

রোগের লক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমি তা নিবারণের উপায়েরও আভাস দিয়েছি। সৌভাগ্যক্রমে সেটা আমাদের নাগালের মধ্যেই রয়েছে। এজন্যে আমাদেরকে 'বৈদেশিক সাহায্য' নিতে হবে না। কিভাবে আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটা সুষ্ঠু ভিত তৈরি করা যেতে পারে সে ব্যাপারে পাকিস্তানে আমাদের সামনে নিজস্ব কোনো সুস্পষ্ট পথ নেই। আমাদের সামনে প্রাচীন ঐতিহ্য বা সার্বজনীন স্বীকৃতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এমন কোনো রাজকীয় বা অভিজাত শ্রেণীর কর্তৃত্ব ব্যবস্থা নেই যা আমাদের কাজে আসতে পারে। একমাত্র নির্বাচন পদ্ধতির মারফতেই এই লক্ষ্যে পৌঁছা যেতে পারে। অবশ্য কেউ কেউ আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক ভাবধারার পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়ে ওঠেনি। এর জবাবে আমি শুধু এটাই বলতে চাই যে, পাকিস্তান তবে কোনো কিছুর জন্যেই প্রস্তুত হয়নি। কারণ, পাকিস্তানে শাসক কর্তৃপক্ষ ও জনগণের মধ্যে একটা আপোষ করার জন্যে গণতান্ত্রিক পথ ছাড়া আর কোনো বিকল্প উপায় নেই, জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণেরও ভিন্ন রাস্তা নেই।

জাতীয় সংহতি বিধানের জন্য আমি অনেক সময় ভিন্নরূপ পথ গ্রহণের পক্ষে সুপারিশ করতেও শুনেছি। তাদের বক্তব্যের মর্মার্থ হলো ভোটাধিকারের মতবাদকে পরিত্যাগ করা, শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার নীতি বিসর্জন দেওয়া, ন্যায়নীতিতে উদ্বুদ্ধ না হয়ে বরং ক্ষমতামদমত্ত হয়ে শাসন কর্তৃত্বের বল্গা টেনে ধরা; সংক্ষেপে যাকে বলা হয় ডিক্টেটরি শাসন কায়েম করা। এ পক্ষের সমর্থকরা অবশ্য সংখ্যায় নিতান্তই ক্ষুদ্র ও ক্রমশ তা বিলুপ্তির পথেই চলেছে। এ সত্ত্বেও অন্য কোনো কারণ না হলেও অন্তত আমাদের বেছে নেওয়া পথের ঔচিত্য প্রমাণের জন্যই ডিক্টেটরি শাসনকামীদের উক্তির উত্তর দেয়া দরকার।

আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কতিপয় নির্দিষ্ট ক্রটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে একনায়কত্বের সমর্থক লোকের কাছ থেকে যখনই তালিকা চেয়ে বসি, তখনই উত্তর আসে দুর্নীতি, শাসন ব্যবস্থায় প্রতিভাবান লোকের অভাব, জনসাধারণ ও শাসকবর্গের অভিন্নতা স্থাপনে গলদ, গণশিক্ষার অপ্রতুলতা, রাজনৈতিক জীবনে যুক্তিতর্ক অপেক্ষা ভাবাবেগের প্রাধান্য এবং প্রাদেশিকতার কেন্দ্রবিমুখী প্রভাব।

একনায়কত্বের রোগ নিরাময় হবে না…

আমি এ সমস্ত ক্রটির কথা অস্বীকার করছি না। এ অভিযোগের বিরুদ্ধে আমার সহজ উত্তর এই যে, দেশের রোগের প্রতিষেধক হিসেবে যে একনায়কত্বের কথা বলা হচ্ছে, তাতে রোগ নিরাময় হবে না, রোগের আরোগ্যকে এড়িয়ে যাওয়া হবে মাত্র। যে সমস্ত দেশে

www.pathagar.com

কন্টকাকীর্ণ যে সমস্যাটি দেখা দিয়েছে, সেটা হচ্ছে ভোটদাতা জনগণের মুসলিম ও অমুসলিমদের প্রাপ্য অংশের আনুপাতিক সম্পর্ক নির্ণয় করা। আমাদের দেশকে এ ধরনের গভীর গুরুত্বপূর্ণ বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

নির্বাচনী বিতর্কে অংশগ্রহণকারী একপক্ষ আমাদের ভোটারদের ধর্মীয় মতবাদ অনুযায়ী বিচ্ছিন্ন করে রাখার পক্ষপাতী। তারা বলেন, পাকিস্তান হবে একটি আদর্শের বাহন রাষ্ট্র। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে যে বিভেদাত্মক সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগের ফলে এই উপমহাদেশ ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল, এরা সেই মনোভাবকেই পাকিস্তানে জিইয়ে রাখতে চান।

সংখ্যাগুরু জাতির নৈতিক দায়িত্ব....

অপর পক্ষ চান, পাকিস্তানকে একটা 'নেশন স্টেট'রূপে দেখতে। আমিও দ্ব্যর্থহীনভাবে এদেরই পক্ষ নিয়েছি। কারণ, আমি পাকিস্তানকে এমন এক মহান ও শক্তিশালী দেশ বলে মনে করি, যেখানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে। এতে আমাদের দেশের আরও সম্মান বাড়বে ও দেশ আরও শক্তিশালী হবে।

কেউ কেউ এরূপ যুক্তি দিয়ে থাকে যে, অবিভক্ত ভারতে যেখানে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা দাবি ও নিজেদের একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্যে চাপ দেওয়া হয়েছিল, সেখানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকে, বিশেষভাবে হিন্দুদের এখানকার মুসলমানদের সাথে পূর্ণ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কোনো অর্থই হয় না। কিন্তু আমি একে সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে পারছি না। অবিভক্ত ভারতে মুসলমানরা ছিলো সংখ্যালঘু। কিন্তু পাকিস্তানে আমরা সংখ্যাগুরু জাতি। নতুন একটা দেশে আমরা যখন সংখ্যাগুরুর মর্যাদা লাভ করেছি, সেখানে সংখ্যাগুরু জাতি হিসেবে আমরা একটা নৈতিক দায়িত্ব লাভ করেছি। আমি এটাকে মহানুভবতার সুযোগ ও দায়িত্ব বলতে পারি। স্বাধীনতা দাবি করতে গিয়ে আমাদেরকে এই সুযোগ—এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্যও সংগ্রাম করতে হয়েছে। স্বাধীনতা লাভ করার পর এখন সেই দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে হবে।

পৃথক নির্বাচনের দাবিটা প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তান থেকেই ধ্বনিত হয়েছে বেশি। অথচ সেখানে সংখ্যালঘুদের লোকসংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। প্রশ্নটা সেখানে নিতান্তই পুঁথিগত। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের লোকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য। প্রশ্নটির গুরুত্ব এখানে রয়েছে। এ সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে ক্রমবর্ধমান সমর্থন রয়েছে। ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে আমাদের জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাব পাস হয়। অথচ পাকিস্তানের এ অঞ্চলের জন্যে প্রশ্নটির কোনো গুরুত্ব নেই। আইনের দিক থেকে এ ফর্মুলা মোটেই সুষ্ঠু নয়। সঠিকভাবে এর মীমাংসা করতে হবে অবশ্য বর্তমান ফর্মুলার ত্রুটির দিকটা নগণ্য। এখন আমাদের যে ব্যবস্থা চালু আছে, ওটাতেই কিছুদিন চলতে পারে। জাতীয় দৃষ্টিকোণ হতে প্রশ্নটির বিচার করার জন্যে ইতিমধ্যেই আমরা মনকে প্রস্তুত করতে পারবো।

পাকিস্তানে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা....

অনেকে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে স্বীকার করতেই প্রস্তুত নয়। তাদের যুক্তি হচ্ছে, পাকিস্তানে রাজনীতির প্রতি মানুষের আসক্তি নেই, অর্থনৈতিক জীবনে প্রাচুর্য নেই এবং আমাদের জনগণের একটা বিরাট অংশেই নাকি নিরক্ষরতা বিদ্যমান। তারা

www.pathagar.com

ডিক্টেটরি শাসন কায়েম হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দিলেই আমরা বুঝতে পারবো, কিভাবে একটা নীতির মধ্যে স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থা দুর্নীতির পাহাড় গড়ে তোলে। ডিক্টেটরি শাসন ব্যবস্থা কখনই প্রতিভাবানদের জনসেবার দ্বার প্রশস্ত করে না। এটা বরং কোটারী বিশেষকে সরকারি দায়িত্বে নিযুক্ত করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতিভাবানদের দ্বার রুদ্ধ করে দেয় ও অন্যদের সরিয়ে দেয়। জনমতকে মান্য করার ফলে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে যে একটা স্থায়ী একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয়, ডিক্টেটরি শাসন ব্যবস্থায় তা হতে পারে না। ডিক্টেটরি শাসন ব্যবস্থা শুধু গোঁয়ার্তুমির ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। তথ্য ও জ্ঞান বিতরণ করা এর কাজ নয় বরং এর অস্ত্র হচ্ছে প্রতারণা ও লুকোচুরি। এই শাসন ব্যবস্থা মানুষকে শিক্ষার আলো দেয় না। ভাবাবেগের সুযোগ নিয়ে এরা জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ও তাদের ওপর প্রভুত্বের জোয়াল চাপিয়ে দেয়। এরা যুক্তিরও ধার ধারে না।

আমাদের দেশের দু'টি প্রদেশের মধ্যে স্বার্থ ও ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার কঠিন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে; তাতে ডিক্টেটরী প্রথায় আজ এদের মধ্যে মিলনের বন্ধন সুদৃঢ় করা যাবে না। এ প্রথায় শুধু একের ওপর অপরের প্রভুত্ব বিস্তারের পথই প্রশস্ত করা যায়। একনায়কত্বের পথ ধরলে নিজেরাও যেমন বিভ্রান্ত হবো অন্যদিকে তেমনি আমাদের বন্ধুবর্গকেও হারাবো।

গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের অবাধ সুযোগ দান....

যা হোক, আমাদের অতীতের যত ক্রটিই থাক না কেন, সেজন্যে আমরা গণতন্ত্রের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগকে দায়ী করতে পারি না। কারণ, এখনও আমরা গণতন্ত্রের পুরামাত্রাই ভোগ করতে শুরু করিনি। প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হবার পর আমি সুস্পষ্টভাবে এ সম্পর্কে আমার যে মতামত ব্যক্ত করেছিলাম, আজো এখানে তারই পুনরুল্লেখ করছি। আমি বলেছিলাম, আমাদের সর্বপ্রথম অত্যাবশ্যক কার্য হচ্ছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিধান করা এবং আমরা যদি গণতান্ত্রিক কার্যক্রমকে অবাধ সুযোগ না দিই, তবে এই স্থিতিশীলতা আসতে পারে না। গণতন্ত্রের যে ক্রটি-বিচ্যুতি রয়েছে, সেটা আমি জানি। কারণ, গণতন্ত্র মানুষেরই অবদান। তাই এর অনিবার্য ক্রটি থাকবেই। কিন্তু এটাই একমাত্র সুনিশ্চিত পথ এবং এপথে চলেই অগ্রগতি ও পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব। রাষ্ট্রের সংহতির জন্যই রাজনীতি যে অত্যাবশ্যক এবং রাজনীতিকরা যে রাষ্ট্রেরই সেবক, একথা যারা বোঝে না, তারাই রাজনীতি ও রাজনীতিকদের কুৎসা করে থাকে। রাজনীতি মানবতার সেবার একটা মহান উপায়। আমি কথা দিয়েছিলাম, সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণকালে কোনোক্রমেই কালক্ষেপণ করা হবে না। আমি এটাও বলেছিলাম, আমার ওপর অন্তত এটুকু বিশ্বাস রক্ষার দাবি আমি করতে পারি যে, যতদিন এ ব্যাপারে আমার হাত থাকবে, ততদিন নির্বাচন হবে সুষ্ঠু ও অবাধ।

এখনই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হোক, এটাই আমি কামনা করি। কিন্তু তা সম্ভব নয়। প্রস্তুতিমূলক প্রাথমিক কার্যাদি সমাপ্ত করতেই কয়েক মাস কেটে যাবে। যদি কোনোরূপ বিপদ না আসে এবং অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হয়, তবে এখন থেকে বছরখানেকের মধ্যেই যাতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যেতে পারে, এখন আমরা তার ভিত্তিটুকু গড়ে তুলতে পারি।

এমন একটা পদ্ধতি প্রস্তুত করতে হবে যার সাহায্যে আমরা খাঁটি প্রতিনিধিত্বশীল জাতীয় আইন পরিষদ পেতে পারি। কিন্তু এই পদ্ধতি প্রস্তুতের ব্যাপারে সবচেয়ে

www.pathagar.com

আশংকা করে যে, এরূপ একটা দেশে ভোটাধিকার লাভ করলে ভোটাররা ভাবাবেগে চালিত হয়ে এমন সমস্ত দাবি-দাওয়ার জন্যে ভোট দেবে, যা পূরণ করা সম্ভব নয়। তারা রাজনীতিকে এমন এক স্তরে নামিয়ে আনবে যে, বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য বিকল্প পথগুলোর মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কোনো একটাকে বেছে নিতেও তারা রাজি হবে না।

কিন্তু এ সমস্ত আশঙ্কার ব্যাপারে আমি তাদের সাথে একমত নই। কারণ, পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা রাজনীতির দিক থেকে যে কতদূর সজাগ, তা আমি ভালোভাবেই জানি। বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে রাজনীতিকে এরা যে নিজেদের জীবনে ধাতস্থ করে নিতে পারেন তা আমি অস্বীকার করতে পারবো না। আবার এছাড়া বহু ক্ষেত্রেই দেখতে পেরেছি যে, জাতীয় নীতিসংক্রান্ত বাস্তবমুখী আলোচনা গভীর মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য তারা হাজার হাজার লোক একত্র হয়েছেন। আমি তো এদের চেয়ে অধিক রাজনীতি-সচেতন লোক আর কোথাও দেখতে পাইনি।

জনতা আর সরকার পরস্পরের মুখোমুখি....

পশ্চিম পাকিস্তানেও রাজনীতির প্রতি অনুরূপ সজাগ মনোভাব বিদ্যমান রয়েছে বলেই আমি মনে করি। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেই ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে আমি পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে সফরে বের হই এবং সেখানে ১০টি চিত্তাকর্ষক দিন কাটাই। এ সময়টা আমি দুর্গম বন্ধুর ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাহাড়ী এলাকায় বাসকারী কঠোর পরিশ্রমী উপজাতীয়দের সমাবেশে বক্তৃতা করেছি, প্রাকৃতিক সম্পদে সুসমৃদ্ধ উপত্যকাবাসী কৃষকদের নিকট, শহরাঞ্চলের কুটির শিল্পী ও বণিকদের জনাকীর্ণ জনসভায়ও বক্তৃতা করেছি ও তাদের প্রশ্ন শুনেছি। কিন্তু তাদের প্রশ্নের মধ্যে আমি কোথাও কল্পনাসর্বস্ব অবাস্তব রাষ্ট্রব্যবস্থার অবান্তর স্বাপ্নিক ভাবালুতা দেখিনি বা সে সমস্ত প্রশ্ন সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিদ্বেষ সৃষ্টও নয়। তাদের প্রশ্ন ছিলো রাজনীতির প্রকৃত মূল কথা, শস্যাদির মূল্য, সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা, উন্নততর গৃহসংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট অনুরূপ বহু সমস্যা সম্পর্কে। এই সফরকালে বারবার আমি পুলিশকে আমার নিরাপত্তার জন্য নির্মিত আমার ও শ্রোতার মধ্যকার বাধা অপসারণ করতে নির্দেশ দিয়েছি। তাদের মুখ যাতে আমি দেখতে পাই এবং তারাও যাতে আমার মুখ দেখতে পান, সেজন্যেই আমি প্রত্যেকবার শ্রোতামণ্ডলীকে বক্তৃতা মঞ্চের ঠিক সামনে এসে বসতে আহ্বান জানিয়েছি। কারণ এর আগেই আমি আশ্বাস দিয়েছি যে, এখন হতে জনতা আর সরকার পরস্পরের সামনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে কাছে ডেকে আনার পরই আমি তাদের কাছে জনসাধারণ আর সরকারের মধ্যেকার অভিন্ন সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছি, তাঁদের আর ম্যাজিস্ট্রেট এবং শাসন পরিচালকদের ঘাড়ে যে বিরাট দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে, তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছি। সরকার প্রভুত্ব করবেন না, সরকার জনগণেরই সেবক মাত্র—এটা যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারেন তাই ছিলো আমার সফরের উদ্দেশ্য। সরকারকে যাতে কোনো প্রকার চাপ, ভাবাবেগ, অবাস্তব নীতি এবং হাট-বাজারের কলহ-কোন্দলের মধ্যে টেনে না এনে জনগণের সাধারণ কল্যাণার্থে সুষ্ঠুভাবে সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরী করার সুযোগ দেয়া হয় এবং সেজন্যে সরকারের হাতে যে ক্ষমতা থাকা দরকার, সেটাও আমি তাদের কাছে জোর দিয়ে বলেছি। আমার কথাগুলো যে তাদের

www.pathagar.com

মনে দাগ কেটেছে সেটা আমি উৎসুক মুখের ভাব দেখেই বুঝতে পেরেছি। এ সফরের ফলে আমার পূর্ব ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে এবং আমি নিশ্চিত করে বুঝতে পেরেছি যে, জনগণের আস্থা আর তাদের যুক্তিতর্কভিত্তিক সম্মতি আদায় করা দুঃসাধ্য কাজ নয়। আমি আরও বুঝতে পেরেছি যে, জনগণের মধ্যে এই একটা অনাবিষ্কৃত অবহেলিত সম্পদ পড়ে রয়েছে, এর মাধ্যমে জাতি ইস্পাত-কঠিন শক্তি অর্জন করতে পারে।

আমাদের সাফল্য....

এ পর্যন্ত আমি নিজেদের কেবল ত্রুটিগুলোরই উল্লেখ করেছি। কিন্তু অন্যদিকে আমরা যে সমস্ত সাফল্য লাভ করেছি, এবার তার কয়েকটি বর্ণনা দেবো।

প্রথমত, এর একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, আমাদের শাসনতন্ত্র লাভ। এ কাজ করতে বোধহয় অনেক সময় লেগেছে। ১৯৫৪ সালে যখন শাসকশক্তি প্রথম গণপরিষদ ভেঙে দেয়, তখন পরিস্থিতির ঘূর্ণাবর্তে জাতি এক সঙ্কট মুহূর্তে উপনীত হয়। শাসকদের জানা ছিলো না, কিভাবে বা কাকে এর স্থলাভিষিক্ত করা যাবে। যে শাসনতন্ত্র শেষ পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে, পার্লামেন্ট গঠন না করা পর্যন্ত এবং পার্লামেন্টের নিকট দায়ী একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ শাসনতন্ত্র অসম্পূর্ণ থেকেই যাবে। তবু যে একটা শাসনতন্ত্র তৈরে করা সম্ভব হয়েছে, তাতেই অনেকগুলো আশ্বাস পাওয়া যাবে। এর ফলে জনগণ নিজেদের দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে জাতিত্বের দ্বারে পৌছোবার পথে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে।

দ্বিতীয়ত, বিচার বিভাগকে রীট জারি করার সার্বভৌম ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ ক্ষমতার মাধ্যমে আদালত নিজেদের প্রচেষ্টায়ই আইনের শাসন কায়েম করতে পারবে। কিভাবে এ কাজ হাসিল করা হয়েছে, সে কাহিনী এখানে পুরাপুরি ব্যক্ত করার অবকাশ নেই। আমি শুধু এটুকুই জানাচ্ছি যে, প্রথম গণপরিষদই ১৯৫৪ সালে এই ধারা পেশ করেছিল। এ ধারা বলেই শাসকশক্তি কর্তৃক প্রথম গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ১৯৫৫ সালের প্রথমদিকে মামলা দায়ের করা হয়। শাসকশক্তি পাল্টা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললো, উক্ত ধারায় এক্সিকিউটিভের সম্মতি পাওয়া যায়নি, তাই আদালত উক্ত আইন বলে রীট জারি করার এখতিয়ার রাখে না। দেশের সর্বোচ্চ আদালতকেও এ যুক্তি মেনে নিতে হলো। এর ফলে সংশ্লিষ্ট আইনটি তো অবৈধ ঘোষিত হলোই, উপরন্তু প্রথম গণপরিষদ কর্তৃক প্রস্তুত আইনই নাকচ করে দেওয়া হলো। কিন্তু দ্বিতীয় গণপরিষদ শাসকপক্ষের প্রবল বিরোধিতার মুখেও নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থেকে হাই কোর্টকে রীট জারি করার সার্বভৌম ক্ষমতা মঞ্জুর করলো। এভাবে একটা আইন পরিষদ শাসকচক্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেদের সিদ্ধান্তকে বহাল রাখার সংগ্রামে যে সাফল্য লাভ করলো, আমি মনে করি সেটা আমাদের ইতিহাসে এই প্রথম। নিঃসন্দেহে এটা আইনের শাসন কায়েমের অনুকূল।

মন্ত্রিসভার ভীতি....

তৃতীয়ত, যে বিষয়টি আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই তার সাথে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ রয়েছে ও সেটা আমার কাছে রাজনৈতিক দিক থেকে উৎকণ্ঠার কারণ। বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রিসভা আইনসভার সম্মুখীন হতে ও তার কাছে নিজেদের কার্যের কৈফিয়ত দিতে মোটেই সাহস পেতো না। এ ব্যাধি সবসময় লেগেই ছিলো। এখন যদি তার একটা হিসাব

www.pathagar.com

দিতে যাই তবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। কারণ ১৯৫৫ সালে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলোকে এক ইউনিটে পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং তৎকালে ৭টি প্রদেশে কতবার এ ব্যাপার ঘটেছিল এখন তার বর্ণনা দিতে গেলে বর্তমানের দু'টি প্রদেশের ওপর দোষ এসে পড়ে। যা হোক, পূর্ব পাকিস্তানে এ ব্যাধি বহুদিন চলে আসছিল। ১৯৫৪ সালের বসন্তে যে আইনসভার নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছিল, ১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত তাকে স্বাভাবিক কাজ করতে দেওয়া হয়নি। সেখানকার মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় শাসক কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত বাজেট নিয়ে কোনোক্রমে গদিতে টিকে থাকছিল। প্রদেশের কোনো জরুরী অবস্থা দেখা দিলে তার মোকাবিলা করার জন্যে কেন্দ্রীয় শাসক কর্তৃপক্ষকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, এখানে সেটাই প্রয়োগ করা হয়েছে। অথচ যে সমস্ত তথাকথিত জরুরী অবস্থার নামে এভাবে বাজেট অনুমোদন করা হয়েছিল, সে সমস্ত সঙ্কটকে একটা অথর্ব প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার ওপর গোদা পায়ের প্রচণ্ড লাথি মারার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিসভার এই ভয় ছিলো যে, আইনসভার অধিবেশনে শক্তি পরীক্ষা করতে গেলে তাদের গদিচ্যুত হবার সুনিশ্চিত আশঙ্কা রয়েছে। প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ যখন আবার আইনসভার প্রথম বাজেট অধিবেশনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অধিবেশন মুলতবি রেখে তথাকথিত জরুরী অবস্থাকে টেনে লম্বা করার প্রয়াস পান, তখন কেন্দ্রীয় সরকার এরূপ শাসনতান্ত্রিক অপকর্মের শরিক হতে সোজাসুজি অসম্মতি জানান। তখনকার যে বিরোধী দলের সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম, তখন তাকে মন্ত্রিসভা গঠনে অনুমতি দেওয়া হয়। জরুরী অবস্থার দোহাই দিয়ে কাউকেও দলীয় স্বার্থ হাসিল করতে দেওয়া হবে না বলে আমার পূর্বতন বিশিষ্ট প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি সেটা রক্ষা করলেন। দলীয় রাজনীতির হীনমন্যতার ওপর শাসনতান্ত্রিক ন্যায়-নীতির আশীর্বাদ প্রভাব বিস্তার করলো। পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা কায়েমের অনুমতি দেওয়া হলো। একটা শাসনতন্ত্র থাকার যে কি উপকারিতা ও শাসনতান্ত্রিক ন্যায়-নীতি মেনে চললে যে কতখানি সুফল পাওয়া যায়, আমি এর চেয়ে আর কোনো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিতে পারবো না।

তাই বলে কোনো প্রধানমন্ত্রীকে আমি তাচ্ছিল্য করি না...

আমি বলতে চাই যে, এই সর্বপ্রথম পার্লামেন্টারি শক্তিগুলোর কাছে দায়ী কেন্দ্রে একটি প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠিত হয়েছে এবং এর ফলে পাকিস্তান রাজনৈতিক সাবালকত্ব অর্জনের পথে আর এক ধাপ এগিয়ে গেছে ,তবে এ মন্তব্যে আমার পূর্ববর্তী কোনো প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করছি না। এজন্যে যখন কোনো একটা মার্কিন কাগজে হেডলাইন দেখলাম, 'রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আবার পাকিস্তানীদের প্রতারণা করলো' তখন আমার হাসিই পেয়েছিল।

গ্রীক ভাষার ক্রিয়াপদ

আমার সিদ্ধান্ত এর বিপরীত। মনে রাখা দরকার, 'গভর্নমেন্ট' শব্দটি গৃহীত হয়েছে গ্রীক ভাষার ক্রিয়াপদ থেকে আর এর অর্থ হচ্ছে একটা জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। অর্থটা অতি খাঁটি। কোনো একটা চলনশীল জাহাজকেই চালিয়ে নিতে হয়, জাহাজের স্থিতিশীলতার অর্থে কোনো একটা নোঙর করা স্থির হয়ে দাঁড়ানো অবস্থাকে বোঝায় না। তাল ঠিক রেখে জাহাজকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং জাহাজকে উল্টিয়ে যেতে না দিয়ে

www.pathagar.com

প্রয়োজনবোধে এর গতিমুখ পরিবর্তন করার অর্থে এখানে স্থিতিশীলতা শব্দটি প্রযোজ্য। সরকারের বেলায়ও ঐ একই কথা খাটে।

গত গ্রীষ্মে পাকিস্তানের বুকে যে সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ বয়ে গেছে তাতে কর্ণধারের পক্ষে একটা জাহাজকে সঠিকভাবে চালিয়ে নেবার যে যোগ্যতার প্রয়োজন, সেটারই প্রতিফলন হয়েছে। সত্যিকারের খাঁটি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা লাভের পথে এটা উল্লেখযোগ্য সূচনা। আজ যাঁরা শাসন ক্ষমতার গদি অলঙ্কৃত করে রয়েছেন, কাল তাঁদেরকেই বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করতে হতে পারে, আবার আজ যাঁরা বিরোধী দলে আছেন, কাল তাঁদেরকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ শাসন কর্তৃপক্ষরূপে রাষ্ট্রের গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে তুলে নিতে হতে পারে। এই উভয়পক্ষই যদি একথা ভুলে যান তবে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এমন একটা মারাত্মক আঘাত আসবে যার চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছুই হতে পারে না। সরকারের চিন্তাধারাকে ভোঁতা করে দেওয়া বা সমালোচকদের মধ্যে খেয়ালীপনা বাড়াবার জন্যে এর চেয়ে অন্য কোনো নিশ্চিত পথ আছে বলে আমি জানি না। আমাদের রাজনীতির যাতে এমন অবাঞ্ছিত পরিণতি না ঘটে, সেজন্যে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি।

পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা

আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশে গণতন্ত্রপ্রিয় ও গণপ্রতিনিধিদের কাছে দায়ী সরকার বহাল রয়েছে। সেখানকার নয়া প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা আইনসভার মোকাবিলা করার দায়িত্ব পালনে পিছপা হয়নি। তাঁরা একে একটা অগ্নিপরীক্ষা বলে মনে করেননি, সুযোগ বলেই মনে করেছেন। এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও গণতন্ত্রমনা ভাবধারার জন্য তাঁরা আইনসভায় উল্লেখযোগ্য সমর্থনও পেয়েছেন। তছাড়া তাঁরা কালবিলম্ব না করে উপনির্বাচনের ঝুঁকি নিতেও কসুর করেননি। এক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক ন্যায়-নীতির প্রতি বিশ্বাস রাখায় কোনো ক্ষতি হয়নি বরং শক্তি বেড়েছে।

ডিসেম্বরের উপনির্বাচনে দেখা গেল যে, নয়া প্রাদেশিক সরকার ৭টি নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে ৬টিতে জয়লাভ করেছেন, জনগণ তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। এশিয়ার বর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা হয়তো একটা অতুলনীয় কিছু নয়। তবে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, এরূপ মুক্ত অবাধ ভোটাভুটির ঝুঁকি নিয়ে কোনো সরকারের পক্ষে নিজেদের হস্ত দুর্বল না করে বরং শক্তিশালী করার সৌভাগ্য খুব কমই লাভ হয়। আমার মনে হয় যে, অন্যান্য অনেক খবর ছাপাতে হয় বলে পশ্চিমী সংবাদপত্রগুলো আমাদের এই রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাবলী প্রকাশের জন্যে সামান্যই জায়গা দিতে পারেন। কিন্তু আমার মতে, এটা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ যা পাকিস্তানের বন্ধুবর্গ ও গণতন্ত্রকে প্রকৃতই আশ্বস্ত করতে পারে।

উপনির্বাচনী ফলাফলের গুরুত্ব

বেশ কতগুলো কারণে আমাদের উপনির্বাচনে জয়লাভের সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হয়ে যখন আমি সুস্পষ্টভাবে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি প্রচার করি, দ্ব্যর্থহীনভাবে নিরপেক্ষতাবাদ পরিহারের কথা বলি, সুদৃঢ়ভাবে স্বাধীন গণতন্ত্রকামী দেশগুলোর পক্ষ সমর্থন করি এবং বিশ্বরাজনীতিতে দায়িত্ববোধের নীতিকে শক্ত করে তুলে ধরি, ঠিক তখনই আমাদের দেশে উপনির্বাচন শুরু হয়েছিল। পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে এটা একটা কঠিন সময়

www.pathagar.com

ছিলো। ঐ সময় সুয়েজ খালের অতীব জটিল ঘটনাপ্রবাহের উত্তেজনায় দেশের জনগণের মধ্যে ধূমায়িত বিক্ষোভের প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছিলো। তা সত্ত্বেও জনগণ আমাদের যুক্তি শুনেছিলেন এবং ভাবাবেগ ও সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করে একটা যুক্তিসঙ্গত পথই বেছে নিয়েছিলেন।

পাশ্চাত্য বন্ধুদের উদ্দেশে দু'টি কথা

আমাদের পাশ্চাত্যের বন্ধুদের উদ্দেশে দু'কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার ও সমৃদ্ধি লাভ করার সংগ্রামে পশ্চিমা বন্ধুরা আমাদেরকে যেভাবে অতি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য বৈষয়িক সাহায্য দিয়েছেন সেজন্যে তাদের নিকট আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের সাহায্য নিয়ে যদি আমরা আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান করে সবদিক দিয়ে একটা শক্তিশালী বন্ধু দেশে পরিণত হতে পারি; তবে আমরা পশ্চিমী বন্ধুদের ও বিশ্বের সর্বত্র স্বাধীনতার ঝাণ্ডা উঁচু করে রাখার কাজে যথেষ্ট উপকার করতে পারবো।

অতীতে আমাদের বৈদেশিক প্রতিশ্রুতিসমূহ অনেকাংশেই গুটিকয়েক মন্ত্রীর গোপনীয়তার বেড়াজালে ঢাকা চুক্তির রূপ নিয়েছিল। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, আইনের দিক থেকে এগুলো এক বান্ডিল নিছক চুক্তিই রয়ে গেছে। জনগণ নিজেদের বিবেক অনুযায়ী এগুলোকে কোনোরূপ দায়িত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি বলে মেনে নিতে পারেননি। অথচ গণতন্ত্র বিকাশের সাথে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির একটা মূল্য নিরূপণ করতেই হয়। আমি এটাকে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের কাজের বা নীতির মূল্য পুনর্বিন্যাসের চেষ্টা বলে কিছুতেই উল্লেখ করতে চাই না। কারণ, অতীতে এরূপ কোনো চেষ্টাই হয়নি। এরূপ কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে এ সমস্ত চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে, কোনোরূপ বিতর্কের সুযোগ না দেওয়ায় এ সম্পর্কে জনগণের মনোভাব প্রতিফলনের এরূপ অভাব ঘটেছে যে, এ সমস্ত চুক্তি সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ জেগে ওঠা স্বাভাবিক। এই সন্দেহের বশবর্তী হয়েই জনগণ ভেবেছেন যে, তাদেরকে পদানত করার প্রচেষ্টা চলছে ও তাদের স্বাধিকারকে বিলিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। সুতরাং একদা অতি গোপনে যা করা হয়েছিল তাকে সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করতে হবে। এটাই হবে একমাত্র উত্তম, অনিবার্য ও প্রতিবিধানমূলক কাজ।

সত্য ঘটনা প্রকাশ করলেই সংশয়ের মেঘ কেটে যাবে

আমি এসব প্রতিশ্রুতির প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত আছি। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, সত্য ঘটনা প্রকাশ করলেই সংশয়ের মেঘ কেটে যাবে এবং এ ব্যাপারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা চলবে। বৈদেশিক সম্পর্কে অনিশ্চয়তা প্রকাশে দেশের মধ্যে স্থিতিশীলতা আসবে না। এর উল্টোটাও সত্যি। একথা সত্য যে, আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো যদি শক্তিশালী হতে পারে, আমরা যদি খাঁটি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দিকে দৃঢ়পদে অগ্রসর হতে পারি তাহলে আমাদের মিত্রবর্গ লাভবান হবেন এবং আমরাও লাভবান হবো।

উপসংহারে আমি এই দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করছি যে, আমরা পারস্পরিক স্বার্থে যে সমস্ত চুক্তি করেছি, সেগুলো শুধু ক্ষমতার আসনে ক্ষণস্থায়ী মন্ত্রীদের কথা ও ইচ্ছার মধ্যেই সীমিত থাকলে চলবে না—বস্তুত দেশের যারা চিরস্থায়ী বাসিন্দা, সেই জনগণের বিশ্বাস ও সংহতির মধ্যেই এর মূল দৃঢ় নিবদ্ধ থাকতে হবে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

‘স্বদেশ ভূমিতে অপরের হামলা বরদাশ্‌ত করবো না...’

[১৯৫৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদে সরকারের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কিত বিতর্কের সূচনায় প্রদত্ত পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঐতিহাসিক বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ]

এই বিবৃতি দিতে গিয়ে আমি প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়েছি। সাধারণত সব দেশেই অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে জনসাধারণের কাছে সব কিছু প্রকাশ করা হয় না, এবং দেশের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব যে সরকারের ওপর ন্যস্ত এটা সম্পূর্ণরূপে সে সরকারেরই ব্যাপার বলে গণ্য। প্রচুর আলাপ-আলোচনা ও সে বিষয়ে সিদ্ধান্তগুলো প্রায়ই এমন এক নাজুক ধরনের ব্যাপার যে, সেগুলো যথাসময়ের পূর্বে প্রকাশিত হলে সাংঘাতিক রকমের জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। বস্তুত, আমরা অবহিত রয়েছি যে, জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার জোট ও চুক্তিগুলো জাতিসংঘে রেজিস্ট্রিভুক্ত করার বিধান থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে এখনো এমন সব গোপন চুক্তি ও দলিল বিনিময় হচ্ছে, যা দিনের আলো দেখেনি। আমি আনন্দিত যে, আমরা এরূপ ব্যাপারে জড়িত নই—আমাদের এ ধরনের কোনো গোপন চুক্তি বা উদ্যোগ নেই।

পররাষ্ট্র নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, যেহেতু অন্যান্য দেশও স্ব স্ব নীতির ভিত্তিতে একটি বিশেষ পন্থায় কাজ করে এবং তদনুযায়ী স্ব স্ব জাতিগুলোকে তৈরি করে নেয়, সেজন্যে আমাদেরও বৈদেশিক নীতি বিষয়ক ব্যাপারগুলোতে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। সরকার পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক রং-ঢং (ক্যালাইডস্কোপ) সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন রয়েছেন এবং পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার জন্যে তাঁর ক্ষমতানুযায়ী সবকিছু করবেন। আমরা যা কিছু করি, তার প্রত্যেকটিই অবিশ্যি সত্যিকার অর্থে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার ও আমাদের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। আমাদের প্রতিটি একক কার্য, অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিটি জোট, চুক্তি, আলাপ-আলোচনা বা সমঝোতা এই নীতির শর্তেই শর্তবান। এটা বিশ্বশান্তি রক্ষায় এবং সব জাতির জন্যে ন্যায়বিচারের শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তার মহান আদর্শকেও সমুন্নত রাখে। ন্যায়বিচারের শাসন প্রতিষ্ঠা বিশেষত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর জন্যেই অপরিহার্য, কেননা নিজেরা শক্তিশালী এবং স্বাধীন না হলে এই মহান আদর্শ সমুন্নত রাখার কাজে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি না। অতএব, স্বাধীনতা বলতে আমি এমন একটি পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণে আমাদের সক্ষমতা বুঝইতে চাই যা পাকিস্তানের স্বার্থকে এগিয়ে নেবে এবং তাকে শান্তি ও ন্যায়বিচারের আদর্শ সমুন্নত রাখার কার্যে সহায়তায় সক্ষম করবে।

www.pathagar.com

আঞ্চলিক অখণ্ডতা বলতে আমি এ কথা বুঝাতে চাই যে, আমাদের স্বদেশ ভূমিতে অপরের হামলা বা অন্যায় দখল আমরা বরদাশত করবো না এবং এ ধরনের কোনো অন্যায় দখল থেকে থাকলে ন্যায্য অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের দাবি ত্যাগ করবো না।

পররাষ্ট্র নীতির মূলতত্ত্ব

আমাদের পররাষ্ট্র নীতির কতিপয় মূল তত্ত্ব রয়েছে। আমি সেটা বিবৃত করতে চেষ্টা করবো, যদিও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমি যে বিবরণী দেবো তা ব্যাপক হতে পারে না এবং পারস্পরিকভাবে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমি বিভিন্ন সময়ে যে কয়টি বিবৃতি দান করেছি, তাতে এগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং ধরে নেয়া যেতে পারে যে, এই পরিষদের সদস্যগণ এবং আমাদের জনসাধারণও তা অবগত আছেন। কিন্তু এটা আমি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি যে, আপনাদের সরকারের পরারাষ্ট্র নীতি যাতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক হয় সে উদ্দেশ্যে আমি নিজের জন্যে যে সব পন্থা স্থির করেছি তদনুযায়ী আরো অগ্রসর হওয়ার পূর্বে সেগুলো জাতীয় পরিষদে পেশ করবো এবং এর মাধ্যমে জাতিকে সে সম্পর্কে অবহিত করবো ও জাতির মনোভাব অবগত হবো।

আরো কিছু বলার আগে আমি একথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রায় প্রথমেই যে কথাটি আমি বলেছি তা এই যে, পাকিস্তানের নীতি হবে সকলের প্রতি শুভেচ্ছা ও কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়। একথা সত্যি যে, নিজেদের জীবন-পদ্ধতিতে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে ঐসব দেশের সঙ্গে আমাদের অধিকাংশ ব্যাপারে সাদৃশ্য ঘটেছে যে সব দেশ অবাধ গণতন্ত্রের জন্যে বিখ্যাত এবং যারা বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের জাতিগুলোর পক্ষে নিজেদের জনসাধারণ ও সভ্যতার প্রকৃতি অনুযায়ী এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী গঠিত বিশেষ পন্থায় এবং নিজস্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নের ও রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত পরিবেশে বাস করা সম্ভব। যারা আরো বিশ্বাস করে যে, আমরা সকলেই আমাদের জনগণের মঙ্গল ও সুখ-সুবিধা বিধানের উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ এবং এক্ষেত্রে বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও আমরা শান্তিপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধভাবে পাশাপাশি বাস করতে এবং আমাদের জনগণের স্বার্থে ও বিশ্বের মঙ্গলের জন্যে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে সক্ষম হবো।

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক

অতএব, একথা সকলের বোঝা উচিত যে, যারা অবাধ গণতন্ত্রের পথ অনুসরণ না করে নিজস্ব ধরনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সাদৃশ্য নেই। আমি প্রথম সুযোগেই চীন সরকারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করি এবং ব্রহ্মদেশ হয়ে চীনে যাই। ব্রহ্ম-সরকারের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং তাঁদেরকে আমাদের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার আশ্বাস দেয়ার জন্যে আমি আমার গমন ও প্রত্যাবর্তনকালীন উভয় সফরেরই সুযোগ গ্রহণ করেছি। আমার চীন সফর ও পরবর্তীকালে চীনের প্রধানমন্ত্রীর সফর, ১৯৫১ সালে প্রজাতন্ত্র চীনের সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব বিরাজমান রয়েছে, তার বন্ধন সুদৃঢ় করেছে। আমরা উভয়েই একমত হয়েছি যে, আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পার্থক্য এবং এমনকি বহু প্রশ্নে মতের বিভিন্নতা আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার পথে বাধা সৃষ্টি করবে না এবং আমাদের আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের

www.pathagar.com

ওপর যথাযথ গুরুত্ব দেয়া উচিত। শীঘ্রই চীনের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল পাকিস্তান সফর করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে এবং আমি নিশ্চিত যে, এতে কেবল দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যই বৃদ্ধি পাবে না, এর ফলে আরো একটি বন্ধুত্বের সম্পর্কও গড়ে উঠবে।

সোভিয়েট রাশিয়া

সোভিয়েট রাশিয়ার ক্ষেত্রে আমরা সব দেশের প্রতি আমাদের বন্ধুত্বের নীতিতে অটল রয়েছি এবং রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করছি। রাশিয়ার সঙ্গে আমরা একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছি এবং পাকিস্তানের একটি পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি সে দেশে সফর করেছে। আমরা আমাদের দিক থেকে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত অধিকাংশ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্যে রুশ প্রতিনিধিদল প্রেরণের আমন্ত্রণ জানিয়ে আসছি।

মুসলিম বিশ্ব

বিশ্বের সব দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ছাড়াও যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে আমাদের গ্রথিত রেখেছে, সেটাকে শক্তিশালী করার জন্যে আমরা অত্যন্ত উদগ্রীব। আমি এ ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত যে, বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর পক্ষে যখনি সম্ভব হয়, তখনি একযোগে বসে মতামত বিনিময় করা উচিত এবং রাজনৈতিক না হলেও এরূপ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা উচিত যা আমাদের সাধারণ স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নে সাহায্য করবে। আমাদের কাছে আমাদের আরব ভ্রাতৃবৃন্দ পৃথক কোনো জাতি নয়। তারা আমাদেরই ন্যায় মুসলমান, আর আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, জাতি বা মযহাব নির্বিশেষে সব মুসলিম দেশের মধ্যে ইসলামের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়ন।

আমাদের প্রতিবেশী

আমাদের নীতির আর একটি মূল তত্ত্ব হচ্ছে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখা, আর এটা আমরা যতদূর সম্ভব অনুসরণ করে এসেছি। কিন্তু প্রত্যেকেরই একথা উপলব্ধি করা উচিত যে, আমাদের প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আগ্রহ যতই তীব্র এবং যতই বাধ্যবাধকতামূলক হোক না কেন, আমরা সে জন্যে পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে উৎসর্গ করতে পারি না। আমাদের মহান প্রতিবেশী চীনের কথা ইতিপূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি। প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশের সঙ্গে আমরা সব সময়ই বন্ধুভাবাপন্ন রয়েছি। পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচনা ও মীমাংসার জন্যে গত বছর একটি পাকিস্তানী প্রতিনিধিদল ব্রহ্মদেশ সফর করেছেন। এতে যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তা উভয় পক্ষেরই স্বার্থ রক্ষা করবে। আমাদের মধ্যে সময় সময় কতিপয় ছোটখাট সীমান্ত প্রশ্নের উদ্ভব হলেও আমি দ্বিধাহীনচিত্তে একথা বলতে পারি যে, ব্রহ্মদেশের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত গোলযোগমুক্ত রয়েছে এবং উভয় দেশের সীমান্ত কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পরিস্থিতির আরো উন্নতি সাধন করা যেতে পারে। আমাদের বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সমবায়ে গঠিত একটি পাকিস্তানী প্রতিনিধিদল ইতিমধ্যে রেঙ্গুনে পৌঁছেছেন এবং সরকারি সাহায্যে ফ্রেণ্ডস অব বার্মা সোসাইটির উদ্যোগে প্রেরিত একটি বেসরকারি শুভেচ্ছা মিশন গত বছর ব্রহ্মদেশ সফর করেছেন। রেঙ্গুনে মহাযুদ্ধের ২৫০০তম জন্মবার্ষিকী উৎসবেও পাকিস্তান প্রতিনিধিত্ব করেছে। কেবল যাওয়া-আসার পথের

www.pathagar.com

সফর হলেও ব্রহ্মদেশে আমি যে সাদর ও অন্তরঙ্গতাপূর্ণ সম্বর্ধনা পেয়েছিলাম, আমি তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছি। আমি ব্রহ্মদেশের সরকার ও জনসাধারণকে আমাদের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

আফগানিস্তান

আফগানিস্তান আমাদের আর একটি প্রতিবেশী। কেবল প্রতিবেশী হিসেবে নয়, মুসলিম দেশ হিসেবেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা তার প্রতি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের দু'টি দেশ অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত এবং আমাদের ভাগ্যও একই সঙ্গে গ্রথিত। উভয় দেশের জনগণের কল্যাণ ও অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে এসব বন্ধন সুদৃঢ় করা এবং উভয় সরকারের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা জোরদার করাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য।

দুর্ভাগ্যবশত একেবারে শুরু থেকেই যখন পাকিস্তানের জাতিসংঘভুক্তির বিরুদ্ধে একমাত্র আফগানিস্তান সরকারই ভোট দান করে—সে দেশের সরকার আমাদের প্রতি এক ধরনের অবন্ধুচিত মনোভাব গ্রহণ করে এবং বহু বছর যাবৎ পশতুনিস্তান নীতির সমর্থনে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালিয়ে আসছে। তারা বিভিন্ন সময়ে সীমান্ত-হামলা, বাণিজ্য বর্জন প্রভৃতির মাধ্যমেও অবন্ধুসুলভ মনোভাবের প্রমাণ দিয়েছে। আফগানিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্যে বহু চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু এগুলো ফলবতী হয়নি। ১৯৫৫ সালে যখন পাকিস্তানী দূতাবাসের ওপর হামলা চালানো হয়; এবং আমাদের জাতীয় পতাকার অবমাননা করা হয়, তখনই এ সম্পর্ক চরম রূপ ধারণ করে।

গত বছর এরূপ মনে হয় যে, সেখানকার শাসক-পরিবার পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে ইচ্ছুক যেহেতু আমরাও বিশ্বাস করতাম যে, ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগের মাধ্যমে উভয় দেশের মতানৈক্য দূর করা যাবে এবং এতে পরস্পরের বক্তব্য বিষয় আরো উত্তমভাবে উপলব্ধি করা যাবে। কাজেই এরূপ ব্যবস্থা করা হয় যে, বাদশাহ জহীর শাহ্‌র আমন্ত্রণক্রমে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে কাবুল সফর করবেন। কাবুলে যে সুফলজনক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, সেটা গত বছর নবেম্বর মাসে আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পাকিস্তান সফর উপলক্ষে পুনরায় শুরু করা হয়। ভবিষ্যতের জন্যে শুভ ইঙ্গিত বহনকারী একটি প্রারম্ভের সূচনা করা হয়। আমাদের সার্বভৌম অধিকার ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রশ্নে কোনোপ্রকার আপোষ না করে আমরা বর্তমান অনুকূল ও বন্ধুভাবাপন্ন পরিবেশে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধুত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যোগাযোগ জোরদার করার জন্যে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো।

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন

এবং সবশেষে আমরা আমাদের মহান প্রতিবেশী ভারতের প্রসঙ্গে আসছি। অবিশ্যি এ ব্যাপারটি আলোচনা করার আগে আমি আমাদের নীতির কয়েকটি মূল তত্ত্ব আরো বিশ্লেষণ করতে চাই। আমরা বিশ্বে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং এরই অনুসরণে যে সব দেশ বৈদেশিক শক্তির কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্যে আন্দোলন করে যাচ্ছে, তাদের সবাইকে সমর্থন করতে উদগ্রীব। এসব বৈদেশিক শক্তিকে প্রায়ই সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়। এগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং বর্তমানে

www.pathagar.com

আমরা সেকেলে উপনিবেশবাদের তুলনায় অধিকতর ঘৃণ্য ও ধ্বংসকারী ধরনের অভিভাবকত্বের গ্রাসে নিপতিত হওয়ার বিপজ্জনক পরিবেশে রয়েছি। এরূপ গ্রাস থেকে কেবলমাত্র নিজেদের রক্ষা করাই নয়, বরং অভিভাবকত্ব যে কোনো ধরনেরই হোক, তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে যে সব দেশ সংগ্রাম করে যাচ্ছে, তাদের সকলের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপনও আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি।

দুর্ভাগ্যবশত মধ্যপ্রাচ্যে এমন কয়েকটি দেশ রয়েছে, যেখানে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি বিরাজমান। তেল সরবরাহ সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে এর বিশেষ গুরুত্বই কেবল এই উত্তেজনার কারণ নয়, এখানে সুয়েজ খাল নামক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববাণিজ্য পথের অবস্থানও এজন্যে দায়ী। এ অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্যে যথোপযুক্ত মনোযোগ প্রদান অত্যাবশ্যক।

ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম ও এর পরবর্তীকালের ঘটনাবলীর ইতিহাস বর্ণনা করার মতো যথেষ্ট সময় আমার নেই। আমরা আরবদের তাদের ন্যায্য দাবির প্রতি সমর্থন করেছি এবং আমরা মনে করি যে, জাতিসংঘের মাধ্যমে সমস্যার এমন একটি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এ অঞ্চলে স্থায়ী ধরনের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যে সমাধান আরবদের ন্যায্য দাবিগুলো যাকে আমি সম্পূর্ণ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আমাদেরও দাবি বলতে পারি—পূরণ করা হবে। এখানে কেবল উদ্বাস্তুদের সমস্যাই বিরাজমান নয়, যাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অবিশ্যি করতে হবে, এখানে ইসরাইল ও তার প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার সীমান্ত পুনর্নির্ধারণের প্রশ্নটি অত্যন্ত প্রকট। বাগদাদ জোটভুক্ত চারটি মুসলিম রাষ্ট্র ১৯৫৬ সালের ৮ই নবেম্বরে প্রকাশিত এক ইশতেহারে মিসরীয় ভূমিতে ইসরাইলী হামলার কঠোর নিন্দা করেছে এবং যুদ্ধবিরতি রেখার অপর পারে সকল ইসরাইলী বাহিনী অপসারণের ও ইসরাইল কর্তৃক ধৃত সব বন্দীর মুক্তির দাবি জানিয়েছে। আমরা আরো প্রস্তাব করেছি যে, ১৯৪৭ সালের জাতিসংঘ প্রস্তাবের ভিত্তিতে ফিলিস্তিন বিরোধের মীমাংসা করা উচিত।

সুয়েজ সঙ্কট

সুয়েজ সঙ্কটের ব্যাপারে ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে কর্নেল নাসের আসওয়ান বাঁধ নির্মাণে বৃটিশ ও মার্কিন অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাহারের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সুয়েজ খাল জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্টের একটি ফরমান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত মিসরীয় পরিচালন বোর্ড সুয়েজ খালের যাবতীয় সম্পত্তির কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে। ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুগুলো প্রেসিডেন্ট নাসেরের এই কর্মপন্থার তীব্র নিন্দা করে। এরপর থেকে বহু কিছু ঘটে। পাকিস্তান এই বিরোধের একটি পক্ষপাতহীন ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষপাতী। পাকিস্তান সুয়েজ খাল জাতীয়করণে মিসরের সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে কোনোপ্রকার বৈষম্য ব্যতিরেকে একে বিশ্বের সবদেশের জাহাজের জন্যে একটি উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক নৌ-পথ হিসেবে সংরক্ষণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করে। আমরা মনে করি যে, যে সব জাহাজ স্বাভাবিকভাবে এই পথে গমন করে, সেগুলোর চলাচলে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ আমাদের দেশসহ বিশ্বের বহুদেশের অর্থনীতিতে ভয়াবহ বিপদের আশঙ্কা সৃষ্টি করবে এবং এতে বিশ্বশান্তি ব্যাহত হতে বাধ্য।

সুয়েজ খাল সঙ্কট সম্পর্কে দু'টি লণ্ডন সম্মেলনে পাকিস্তানের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো। আমরা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্যে চাপ প্রদান করি এবং সুয়েজ খাল জাতীয়করণে

www.pathagar.com

মিসরের সার্বভৌম অধিকারের স্বীকৃতি আদায়ে সহায়তা করি। একই সময়ে আমরা ১৮৮৮ সালের কনভেনশন অনুযায়ী অবাধ নৌ-চলাচলের অভিমত দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি। মিসরও এটা স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছে। আমরা ধৈর্য ধারণের যে পরামর্শ দিয়েছি, তা ফলবতী হয়েছে এবং বিরোধটি মীমাংসার জন্যে জাতিসংঘের হাওয়ালা করা হয়েছে।

মিসরে ত্রি-পক্ষীয় আক্রমণ অত্যন্ত গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করার পর এক সময় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক বলে মনে হয়। পাকিস্তান সরকার এবং পাকিস্তানের জনগণ উভয়েই দ্ব্যর্থহীনভাবে এই হামলার তীব্র নিন্দা করে এবং যুদ্ধবিরতি ও হামলাকারী বাহিনীগুলো অপসারণের দাবি জানায়। পাকিস্তান যে কার্যক্রম গ্রহণ করে, ১৯৫৬ সালের নবেম্বর মাসে তেহরান সম্মেলনের পর বাগদাদ জোটের চারটি মুসলিম রাষ্ট্রের যৌথ আলাপ-আলোচনা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেটা আরো জোরদার হয়। এটা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক যে, আংশিকভাবে আমাদের প্রচেষ্টার ফলেই মিসরীয় ভূমি থেকে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী অপসারিত হয়। এরূপ আশা করা যাচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে সুয়েজ খাল বাধা-বিমুক্ত করা হবে এবং সব জাতির ব্যবহারের জন্যে সেটাকে পুনরায় উন্মুক্ত করা হবে।

সীটো

পাকিস্তান দুর্ভাগ্যক্রমে ১,৫০০ মাইল বিদেশ ভূমি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হলেও তার এই অবস্থান এদিক দিয়ে সৌভাগ্যজনক যে, সে একদিকে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও পাশ্চাত্যের পাশে এবং অপর দিক দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর পাশে রয়েছে। আর এতে পাকিস্তান শান্তির নিমিত্তকে জোরদার করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যৌথ ও পারস্পরিক নিরাপত্তা জোট গঠনের প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে পারে।

আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি সংস্থার সদস্য। আমরা ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, নিউজিল্যাণ্ড, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, থাইল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই সংস্থায় যোগদান করি। এটা এই অঞ্চলের শান্তি সুনিবিড় ও নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণে এবং এখানকার জনগণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করেছে। এটা জোর দিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সীটো নির্ভেজালভাবে একটি প্রতিরক্ষামূলক চুক্তি। এককভাবে বা যৌথভাবে বিভিন্ন জাতির নিজস্ব প্রতিরক্ষার অধিকার জাতিসংঘ সনদের ৫১ নং অনুচ্ছেদের বিধানে পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে বান্দুং-এ এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলের ২৯টি দেশও এই অধিকার পুনরুনুমোদন করেছে। আমাদের এই সদস্যপদ যে সুফলদায়ক হয়েছে, সেটা কাশ্মীর ও ডুরান্ড লাইনের প্রশ্নে আমাদের নীতির প্রতি ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে সীটো দেশগুলোর সমর্থনমূলক যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সীটোর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান। এই চুক্তি সংস্থা তার এশীয় সদস্যদের মধ্যে এক নয়া আস্থাবোধের সৃষ্টি করেছে এবং আমাদের দুর্বলতাকে যারা প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে দেখে তাদের জন্যে এটা প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করেছে।

সীটো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণেও সংশ্লিষ্ট। আমরা স্থির নিশ্চিত যে, এই সংস্থা তার এশীয় সদস্যদের অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টায় সহায়তার ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

বাগদাদ জোট

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি রক্ষার ও স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান, ইরান ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে তুর্কো-ইরাকী জোটে যোগদান করেছে। এটাও বাগদাদ জোট নামে পরিচিত। এই চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিরক্ষায় একই মনোভাবাপন্ন জাতিগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছে এবং তাদের পারস্পরিক প্রতিরক্ষামূলক সক্ষমতায় সহায়তা করছে। এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, কেন আমরা এরূপ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি? এ ব্যাপারে এতটুকু সন্দেহ নেই যে, আত্মরক্ষার তাগিদেই এরূপ করা হয়েছে।

জোটসমূহে যোগদানের কারণ

আমি আপনাদের দেশ বিভাগের পরবর্তীকালের প্রসঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। দেশ-বিভাগের ফলে যুক্ত ভারতের সম্পত্তিসমূহ বিভক্ত করা হয় এবং সমরাস্ত্রের একটি অংশ আমাদের ভাগে পড়ে। দুর্ভাগ্যবশত ভারত এব্যাপারে যে চুক্তি হয়, তা পালন করেনি এবং আমাদের এসব অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করেনি। ফলে, আমাদের দেশ-বিভাগের পরবর্তীকালীন অবস্থা ছিলো ক্ষীণ, দুর্বল এবং এসময়ে আমরা আমাদের সীমান্ত, আমাদের স্বাধীনতা ও আমাদের অখণ্ডতা রক্ষায় অক্ষম ছিলাম। যদিও ভারতের এমন কতিপয় দল ও ব্যক্তি ছিলো যারা পাকিস্তান ও ভারতকে পুনরেকত্রীকরণের এবং দেশ-বিভাগকে বানচাল করার পরিকল্পনা করে। তথাপি আমরা ভারতের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছিলাম যে, দেশ বিভাগকে বানচাল করার কোনো ইচ্ছা তার নেই। অতএব ১৯৪৯ সালের প্রারম্ভে কাশ্মীরে হানাহানির অবসান ঘটিয়ে একটি মীমাংসা, সাময়িক মীমাংসা হওয়া সত্ত্বেও ভারত যখন ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে তাদের বিবেচনায় কোনো যুক্তিযুক্ত কারণে পাকিস্তানের সীমান্তসমূহ আক্রমণোন্মুখভাবে তার সেনাবাহিনী সমাবেশ করে, তখন আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। ঐ সময় কার্যত পাকিস্তানের কোনো রক্ষা ব্যবস্থা ছিলো না। একটি মীমাংসায় পৌঁছার জন্যে ও আসন্ন হামলা প্রতিনিবৃত্ত করার জন্যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তখন ভারত গমন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। মীমাংসা হয় এবং কিছুকালের জন্যে বিপদাশঙ্কাও প্রতিনিবৃত্ত হয়। কিন্তু আবার ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে ভারত কয়েকটি বিরোধের সুরাহা করার জন্যে আমাদের সীমান্তসমূহে তার সেনাবাহিনী সমাবেশ আবশ্যক ও যুক্তিযুক্ত মনে করে। এবারেও আমরা প্রস্তুত ছিলাম না; কারণ যে সরকার পাকিস্তানকে স্বীকৃতিদানের পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে যে আমাদের ভীতি-বিহ্বল ও আক্রমণ করার চেষ্টা করবে, তা আমরা ভাবতে পারিনি। আমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকলে, জাতিসংঘের দ্বারস্থ হয়ে বিশ্বসংস্থার মাধ্যমে তার মীমাংসা করাই ছিলো প্রকৃষ্ট পন্থা। অতএব, আমাদের প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতি বৃদ্ধি করার জন্যে নিজস্ব সম্পদের ওপরই আমাদেরকে নির্ভর করতে হয়।

এই পরিষদের সদস্যগণ জানেন যে, আমাদের সম্পদ সীমাবদ্ধ এবং আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশ্যে আমাদের সেনাবাহিনীর জন্যে জাতীয় অর্থনীতির সক্ষমতার চাইতেও অনেক বেশি অংশ ব্যয় করছি। অতএব, মিত্রের খোঁজ করা আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং সৌভাগ্যক্রমে এমন সব দেশ আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে যারা জীবন সম্পর্কে একই দৃষ্টিভঙ্গির এবং গণতান্ত্রিক সরকার সম্পর্কে একই পদ্ধতির অনুসারী। আমরা আমাদের মিত্র যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক সাহায্য দানের জন্যে অনুরোধ জ্ঞাপনের আবশ্যকতা

www.pathagar.com

বোধ করি এবং তদনুযায়ী একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিটি ইতিপূর্বে এই পরিষদে পেশ করা হয়েছে, এর ওপর বিতর্ক হয়েছে এবং পরিষদ এটা অনুমোদন করেছে। অতএব, আমি এবারে এটা পরিষদে পেশ করিনি কিংবা তার বর্ণনাও দিচ্ছি না। এই চুক্তি অনুযায়ী আমরা কিছু পরিমাণ সামরিক সাহায্য পেয়েছি। আমেরিকা বিভিন্ন ৪০টি দেশের ন্যায় আমাদেরও যে অর্থনৈতিক সাহায্য দিচ্ছে, তার বাইরে প্রাপ্ত এই সাহায্য আমাদেরকে যে কোনো মহল থেকে হামলার মোকাবিলা করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী করেছে। কিন্তু আমরা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও নিরাপত্তায় সহায়তা না করলে যে পরিমাণে এই সাহায্য লাভ করেছি, সে পরিমাণে তা পাওয়া যেতো না। এজন্যে তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যকার চুক্তির সুযোগ গ্রহণ এবং বাগদাদ জোটে যোগদান আমাদের আবশ্যক হয়ে পড়ে।

এই চুক্তিটি মাননীয় সদস্যগণ দেখেছেন কিংবা পড়তে চাইলে তাঁরা সেটা দেখতে পারেন, কেননা ইতিপূর্বেই সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র তাঁদের কাছে পেশ করা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষামূলক; এটা কোনো দেশ হামলা পরিচালনা করলে জোটভুক্ত কোনো সদস্যকে উক্ত দেশের সহায়তা করার অনুমতি দেয় না। কাজেই যুক্তরাজ্য যখন সুয়েজ খাল থেকে সরে পড়ার জন্যে মিসর ও ইসরাইলকে চরমপত্র দেয়া নিজস্ব নীতি অনুযায়ী যুক্তিযুক্ত ও যথাযথ বলে মনে করে, তখন এই জোটের কোনো সাহায্য কামনা করেনি, করা হলে সংস্থাটি সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতো। যুক্তরাজ্য কেন এরূপ করা যুক্তযুক্ত মনে করেছিল, তার কারণসমূহ বিভিন্ন সময়ে আমাদের কাছে পেশ করে। যুক্তরাজ্য এই বলে তাদের কর্মপন্থার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পায় যে, তারা ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে মধ্যপ্রাচ্য হানাহানিতে জড়িত হয়ে পড়তো এবং যেভাবে ইসরাইল এগিয়ে যাচ্ছিল তাতে তার পক্ষে অনেক বেশি এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো।

আমি এখানে যুক্তরাজ্যের পক্ষ সমর্থন করতে কিংবা পরিষদে তার নীতি পেশ করতে যাচ্ছি না। আমরা বাস্তব বিষয় যা উপলব্ধি করেছি, কেবল সেটাই আমি পরিষদে বর্ণনা করছি। অতএব, বাগদাদ জোট যুক্তরাজ্যকে সাহায্যের ব্যাপারে জড়িত ছিলো না। বরং বাগদাদ জোটের চারটি মুসলিম সদস্য এক বৈঠকে মিলিত হয়ে যুক্তরাজ্যের আচরণের নিন্দা করে এবং তাকে মিসর থেকে সেনা-বাহিনী অপসারণের ও জাতিসংঘের প্রস্তাবে সম্মতিদানের জন্যে আহ্বান জানায়। সুখের বিষয় যে, যুক্তরাজ্য সে আহ্বানে সাড়া দেয়।

আমরা সব সময়ের জন্যে বিরোধিতা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে পারি না। বিশ্বে ঘটনাবলীর পরিবর্তন হয়, নতুন নতুন ব্যাপার ঘটে এবং নয়া নয়া পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, আর তাই যুক্তরাজ্য যখন জাতিসংঘের রায় মেনে নিয়েছে, তখন কেন সে মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্যে এবং আমাদেরকে আরও শক্তিশালী করার জন্যে আমাদের সংস্পর্শে আসতে পারবে না, আমরা তার কোনো কারণ খুঁজে পাই না। আমরা একথা অত্যন্ত ভালোভাবেই অবগত রয়েছি যে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর যে ক্ষমতা রয়েছে, সেটা দুর্ভাগ্যবশত যে কোনো মহল থেকে হামলার বিরুদ্ধে কিংবা সাংঘাতিক রকমের যুদ্ধ-বিগ্রহে নিজেদের রক্ষা করার মতো যথেষ্ট নয়। তাই আমি অন্যত্র বলেছি যে, যে কোনো সংখ্যক শূন্যের ফল শূন্যের চাইতে বেশি হতে পারে না; অথচ আপনি যদি এক-এর সঙ্গে সেটা যোগ করেন, তা হলে সম্ভাব্য শূন্যের সংখ্যা যত বেশি হবে, তার ফলও শেষ পর্যন্ত তত

www.pathagar.com

বৃহত্তর হবে; আপনি শূন্যগুলো ডানেই সন্নিবেশিত করুন কিংবা বামেই সন্নিবেশিত করুন, সেগুলোর ফল শূন্যের চাইতে বেশি হবে।

জোটগুলো পাকিস্তানের জন্যে কল্যাণকর

অতএব, আমি দ্বিধাহীনচিত্তে পরিষদকে এটা অনুমোদন করার আহ্বান জানাচ্ছি যে, আমরা যে দু'টি জোটে যোগদান করেছি সেগুলো পাকিস্তানের জন্যে কল্যাণকর এবং যাঁদের চোখ আছে তারা নিজেরাই দেখতে পারেন যে, এগুলো আমাদের সুফল দান করেছে। আমি অতদূর অগ্রসর হয়ে এরূপ মতবাদ সমর্থন করবো না—আমার পক্ষে সেটা করা প্রয়োজন যে, বিশ্বের সব দেশের পক্ষে অবশ্যি একটা না একটা শক্তি জোটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা উচিত। আজকে আমি কেবল পাকিস্তানের কথাই বলছি এবং পরিষদকে একথা বিবেচনার জন্যে অনুরোধ করছি যে, আমাদের অবস্থা কি এমন যে, আমরা বিচ্ছিন্ন থাকতে পারি, কিংবা একথা কি সত্যি নয় যে, আমরা এমন জটিল অবস্থায় রয়েছি যে, আমাদেরকে অবশ্যি সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

এই পরিষদ অবশ্যি প্রবাহমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন আর তাই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, আমাদেরকে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্যে এবং আমরা যাতে বন্ধুহীন ও একা হয়ে পড়ি সেটা সুনিশ্চিত করার জন্যে কিরূপ প্রচণ্ড চেষ্টা চালানো হয়েছে। অতএব, স্যার, আমরা জাতিসংঘ সনদের সুযোগ গ্রহণের বাইরে কোনো কিছু করিনি। আমরা এটাকে সমর্থন করি, আর এটার বিষয় আমি আমার বক্তৃতার শেষের দিকে উল্লেখ করবো। এটা বিভিন্ন দেশকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণের এবং পারস্পরিক যৌথ নিরাপত্তা জোটে যোগদানের অধিকার দান করেছে।

আমরা যে সব জোটে যোগদান করেছি, সেগুলো কেবল এসব অঞ্চলের শান্তিই নির্বিঘ্ন করেনি, আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি থাকতে পারে, এমন সব মহলের বিপদ থেকেও অঞ্চলগুলোকে নিরাপদ রেখেছে। এসব জোট সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রাজনৈতিক, এমনকি অর্থনৈতিক শক্তিকে এবং এদের প্রতিরক্ষামূলক সম্ভাবনাকে জোরদার করেছে। স্যার, আমি যেমন বলেছি, একথা অবশ্যি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, আমরা মিত্র রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে যে সব সাহায্য পেয়েছি, তার জন্যে প্রধানত এসব জোট এবং চুক্তিগুলোই দায়ী।

নিরপেক্ষতা

আমাকে এরূপ প্রশ্ন করা হয় যে, ভারত যদি নিরপেক্ষ থাকতে পারে, তাহলে এ দেশও কেন নিরপেক্ষ থাকতে পারে না? এ ব্যাপারে প্রায়ই যে সব যুক্তি প্রদর্শন করা হয়, আমি সেগুলো পূর্বাহ্ণেই অনুমান করছি। আমি ভারতের নিরপেক্ষতার ধরন ও তাৎপর্য সবিস্তারে বর্ণনা করবো না। কিন্তু আমরা যদি বলি যে, আমরা নিরপেক্ষ থাকতে যাচ্ছি, তাহলে তার অর্থ কি হবে, আমি সেটা বলতে পারি। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, পাকিস্তান যা বলে তদনুযায়ী কাজ করে এবং সে তার নিরপেক্ষতায় অবিচল থাকবে। এটা এক দেশকে আর এক দেশের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে না; এর যদি কোনো শক্তি ও ক্ষমতা থাকে তাহলে সেটা অপর দেশকে ভয় দেখিয়ে কার্য উদ্ধারের জন্যে ব্যবহার হবে না। আমাদের কাছে নিরপেক্ষতার অর্থ সুইজারল্যাণ্ড ও সুইডেনের ন্যায় কিংবা যে সব দেশ কথা ও কাজে নিরপেক্ষ তাদের যে কোনোটির ন্যায় নিরপেক্ষতা। কিন্তু, স্যার, আমাদের কি

www.pathagar.com

এরূপ চমৎকার নিরপেক্ষতা বজায় রাখার মতো অবস্থা আছে? আমরা এমন সব বিপদ দেখেছি, যা কয়েক দিক থেকে আমাদের বেষ্টন করেছে। আমরা নিজেদের রক্ষা করার মতো যথেষ্ট বড় নই, যথেষ্ট শক্তিশালী নই। আমাদেরকে অন্যদের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য চাইতে হয়, কারণ আমাদের সঙ্গতি নেই।

এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা হয়, 'আমাদের প্রতিবেশী ভারত অন্যদের কাছ থেকে এ সাহায্য পায় না।' আমি ভারতের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস জানি বলে দাবী করছি না; কিন্তু কাগজপত্রে যা দেখা যায় সেটা আমি জানি। ভারত একটি বিরাট দেশ, প্রচুর সম্পদশালী দেশ। সে কোনো কিছুর জন্যে অর্ডার পেশ করে তার মূল্য দিতে পারে—যেখানে আমাদের একটিও মাঝারি ধরনের বোমারু বিমান নেই, সে ক্ষেত্রে তারা ৬৫টি 'ক্যানবেরা' বিমান কিনতে পারে। মাননীয় সদস্যগণ এটা অবগত আছেন কিনা জানি না যে, ক্যানবেরা বিশ্বের দূরতম পাল্লার সর্বাধিক আধুনিক বিমান, আর নিজস্ব সম্পদ দ্বারা সেগুলো কেনার মতো সঙ্গতি ভারতের রয়েছে। ভারত ৩০০ সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্ক—বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ট্যাঙ্ক কিনতে পারে এবং সেগুলোর মূল্য দেয়ার মতো ক্ষমতা রাখে। পাকিস্তানের সমগ্র সম্পদ সরকারের হাতে আসে, তার দ্বারা এসব সম্ভব নয়, আর সেজন্যেই আমাদের অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। কেন? কেবল নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে; আমরা এর বেশি কিছু চাই না, আর তারা যদি আমাদের এর অতিরিক্ত কিছু দেয় এবং আমাদেরকে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি রক্ষায় সহায়তা করার মতো সক্ষম করে তোলে, তাহলে অত্যন্ত সানন্দে আমরা তা করবো।

কোনো আক্রমণ নয়

সমর বিজ্ঞান অনুযায়ী এরূপ বলা হয়, এই পরিষদের যে সব সদস্য সেনাবাহিনীতে ছিলেন তাঁরা সেটা অবগত আছেন এবং সামরিক ব্যাপারে সম্ভবত প্রামাণ্যভাবে বলতে পারেন; কিন্তু আমরা বই-পুস্তকে পড়েছি যে, কোনো দেশ অপর দেশকে আক্রমণ করতে চাইলে তাকে অবশ্যি আক্রান্ত দেশ থেকে কমপক্ষে তিনগুণ বেশি শক্তিশালী হতে হবে। ভারতের মোকাবিলায় পাকিস্তান তা কল্পনাও করতে পারে না এবং আমি আমাদের স্থির নীতি হিসেবে একথা বলতে চাই যে, আমরা বিশ্বে শান্তি চাই; আমাদের দেশ কাউকে আক্রমণ করবে না; কিন্তু পরিস্থিতি এমন হতে পারে যে, কোনো দেশ ধারাবাহিকভাবে নির্মূল হওয়ার চাইতে, তিলে তিলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরার চাইতে, সেটাকে প্রয়োজনীয় মনে করতে পারে; কোনো দেশ ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হওয়ার জন্যে অপেক্ষা না করে একবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের জীবনও শেষ করে দিতে পারে। এটা স্বতন্ত্র ব্যাপার; কিন্তু আক্রমণের ব্যাপারে আমরা কখনো সে ধরনের কোনো মনোভাব পোষণ করিনি। সেজন্যেই ভারতের এই বিরাট সমর সজ্জায় আমরা কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। আমরা আশা করবো যে, এটা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হবে না। আমরা আশা করবো যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রকাশ্য উক্তিগুলো তাঁর সঠিক মনের কথা; আমরা আশা করবো যে, সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নীতির পরিবর্তন হবে না; কিন্তু আমাদেরকে কেবল আশা করে বসে থাকলেই চলবে না, বরং এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে সে নীতির যদি পরিবর্তন ঘটে কিংবা ভারত যদি কখনো মনে করে যে, যে অবস্থায় সে ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে ও ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে আমাদের বিরুদ্ধে সেনাসমাবেশ যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছিল তার

www.pathagar.com

ব্যতিক্রম এমন কোনো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যাতে পাকিস্তান আক্রমণ করা তার পক্ষে যুক্তিযুক্ত, তাহলে আমরা যে কোনো হামলার মোকাবিলা করতে পারি।

কোনো বিপদের ঝুঁকি নয়

আমি পরিষদের কাছে আমাদের সরকারের একটি নীতি হিসেবে একথা বলছি যে, আমি এই বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজি নই। মাননীয় সদস্যগণ যদি মনে করেন যে, আমার এই বিপদের ঝুঁকি নেয়া উচিত, তাহলে, স্যার, আমি ছাড়া অন্য কেউ এদিকে বসে সে ঝুঁকি গ্রহণ করবে। আমার কাছে একটি স্বাধীন সত্তা হিসেবে পাকিস্তানের অস্তিত্বই সর্বাপেক্ষা মুখ্য ব্যাপার, আর এজন্যে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য পন্থা গ্রহণ না করলে আমি আমার কর্তব্যচ্যুত হবো। এ প্রসঙ্গেই আরব দেশসমূহের জনৈক প্রতিনিধি আমাকে বলেছিলেন, 'আপনার নিজের অস্তিত্বই যদি বিপন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে সাহায্যের জন্যে শয়তানের কাছেও যাওয়া আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে।' সৌভাগ্যবশত আমরা শয়তানের কাছে যাইনি।

অতএব, স্যার, আমি জোর দিয়ে একথা বলছি যে, যে দেশ আক্রান্ত হতে পারে, যে-দেশ বিপদগ্রস্ত, যে দেশের ঐ ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে শক্তিশালী করার মতো সম্পদ নেই, নিরপেক্ষতা ও বিচ্ছিন্নতা সে দেশের নীতি হতে পারে না। তাই আমাদের মিত্রের খোঁজ করতে হয় এবং এ দেশের জন্যে এটা সৌভাগ্যজনক যে, আমরা এমন সব বন্ধু পেয়েছি যারা সঙ্কটের সময় আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে; আমরা এমন সব বন্ধু পেয়েছি, যারা বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদে ন্যায়বিচারের খাতিরে আমাদের সমর্থন করার জন্যে নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করেছে। নিরাপত্তা পরিষদে আমার দাবি ন্যায্য না হলে, আমি তাদেরকে তেমনটি করতে বলতাম না এবং বন্ধু হিসেবে তাদের পক্ষে আমাদের সাহায্য করা উচিত, এ দাবিও করতাম না।

স্যার, এটা আমাদের জন্যে সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, আমাদের পররাষ্ট্র নীতি এতটা সুফলদায়ক হয়েছে যে, আমাদের বন্ধুরা আমাদেরকে সমর্থন করেছে এবং যারা আমাদের বিরোধিতা করেছিল তাদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে আমরা বুঝতে পারি যে, কে আমাদের মিত্র, আর কে নয়। স্যার, আমি তাদের শত্রু বলবো না, কারণ আমি আশা করি যে, এমন সময় আসবে যখন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি সব সময় এরূপ আশা পোষণ করি যে, আমরা যখন চরম সঙ্কটজনক মুহূর্তে উপনীত হবো, তখন বিশ্বজনমত তার অধিকার বর্তাবে এবং যে কোনো ব্লকেরই অনুসারী হোক না কেন, বিশ্বের সকল দেশ ন্যায্য দাবি সমর্থন করবে এবং বৃহৎ দেশের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র দেশের ন্যায্য অভিযোগের প্রতি সমর্থন জানাবে।

পাকিস্তানের দাবির ন্যায্যতা

স্যার, সাময়িকভাবে আমাকে এরূপ দুঃখ প্রকাশ করতে হচ্ছে যে, আমাদের দাবির প্রতি কোনো একটি দেশ অন্তত একটি ক্ষেত্রে সমর্থন জ্ঞাপন করেনি, অথচ কিছুকাল আগেও সে দেশ তা সমর্থন করেছিল। আমাদেরকে এখনো আরো কিছু দূর অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু আমাদের প্রারম্ভ ভালো এবং আমরা যদি আমাদের অনুসৃত পথে অব্যাহতভাবে চলতে থাকি, তাহলে আমি নিঃসন্দেহ যে, আমাদের প্রতিদানও সন্তোষজনক হবে। আর যাই হোক, আমরা সামগ্রিকভাবে ও এককভাবে অপরের ওপর নির্ভর করছি না। আমরা

www.pathagar.com

আমাদের দাবির ন্যায্যতার ওপর নির্ভর করছি। আমরা আমাদের দাবির নৈতিকতার ওপর নির্ভর করছি। আমরা বিশ্ব জনমতের ওপর নির্ভর করছি, যার প্রবণতা আমাদের অনুকূলে। আজ আমি দাবি করছি যে, পাকিস্তান যে সব দেশ অধিকারের জন্যে সংগ্রাম করছে তাদের সমর্থনে যে নীতি গ্রহণ করেছে, জাতিসংঘকে সমর্থনে এবং সেখানে নিজেদের দাবি পেশে ও উহার নির্দেশগুলো মান্য করার ব্যাপারে যে নীতি গ্রহণ করেছে, যে সব দেশ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কেবল শ্লোগান হিসেবে বড় বড় বুলি আওড়ায় তাদের অন্তঃসারশূন্যতার বিরুদ্ধে যে নীতি গ্রহণ করেছে তাতে পাকিস্তানের মর্যাদা এতোখানি বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আমি আশা করি, বিশ্ববাসী এটা উপলব্ধি করেছে যে, আমরা কখনো দুর্বলের স্বার্থের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না। এবং এরই প্রতিদানে আমরা এ দাবি করছি যে, আমাদের দাবি যখন ন্যায্য তখন বিশ্ববাসীরও আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা উচিত নয়।

স্যার, এই জোট সমর্থন করতে গিয়ে আমি নিজে সবখানি কৃতিত্ব দাবি করছি না। মুসলিম লীগ সরকারই চুক্তিটি সম্পাদন করেন, কাজেই দূরদৃষ্টির জন্যে আমি তাঁদেরকেই সবখানি কৃতিত্ব দিচ্ছি, এটা তাদের প্রাপ্য। আমি মনে করি, এর মাধ্যমে তাঁরা দেশের মঙ্গল করেছেন। তাঁরা যা করেছেন সে ব্যাপারে আমার যদি কোনো আপত্তি থাকে, তাহলে সেটা এই যে, তারা কি করছিলেন, সে সম্পর্কে নিজেরাই অবহিত ছিলেন না। ফলাফল সম্পর্কে তাঁদের আশঙ্কা ছিলো। কিন্তু ফলাফল তাঁদের কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছে। ঐ সময়ে ইতস্ততার জন্যে আমি তাদের দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু জনগণের কাছে সহজ সত্যিটি বলার জন্যে এগিয়ে না গিয়ে এবং তাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন না করে তাঁরা যে সাহসের অভাব দেখিয়েছেন, সেজন্যে আমি তাদের প্রতি দোষারোপ করছি। তাঁরা যদি সেটা করতেন তাহলে এসব জোট সম্পর্কে এদেশে এত কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতো না।

এসব চুক্তি কখনো দেশবাসীর কাছে পেশ করা হয়নি। আমরা এগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি। এগুলো সম্পূর্ণ রূপে আত্মরক্ষামূলক, শান্তি সুনিবিড় করাই এগুলোর লক্ষ্য। পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তির মাধ্যমে আমরা বিপদ এড়িয়েছি। অন্যরা, যারা নিরপেক্ষ বলে দাবি করেছে, তারা পরাভূত হয়েছে, কেউ কেউ এখনো বিপদগ্রস্ত রয়েছে। আমাদের বেলায় আমরা নিরাপদ বোধ করছি। মুসলিম লীগ সরকারের যদি এব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের সাহস থাকতো, তাহলে আমি নিশ্চিত যে, দেশবাসী তাঁদের প্রতি সমর্থন জানাতো এবং সেক্ষেত্রে এটাই সম্ভব ছিলো যে, আজকে পরিষদের এদিক থেকে আমার স্থলে তাঁরাই কথা বলতেন। কিন্তু তাঁদের ইতস্ততা এরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করে যে, এই গোপন চুক্তির পেছনে সম্ভবত কোনো কিছু রয়েছে, এমন কোনো বোঝাপড়া, যা আমাদের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার ওপর আঘাত হানবে। এই কারণেই বিরোধী দলের বহুলোক তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছে কিংবা অন্ততপক্ষে এই চুক্তির প্রতি তাদের সমর্থন নেই বলে জানিয়েছে। আমার নিজের বেলায়, আমি আনন্দিত যে, আমি তখন যে অভিমত পোষণ করতাম তা যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে এবং বর্তমানে দেশবাসীও সে মত সমর্থন করেছে। আমি সবসময়েই একথা বলে এসেছি যে, পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে যাঁরা বিরোধীদলে রয়েছেন তাঁদের পক্ষে বাস্তব বিষয়গুলো পুরোপুরিভাবে না জানা পর্যন্ত চপলভাবে সেটার নিন্দে বা সমালোচনা করা উচিত নয়; যে বিষয়ে আমরা খুব কম অবগত, তার নিন্দে করা সমীচীন নয়।

www.pathagar.com

মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আমাদের প্রতিরক্ষামূলক সম্ভাবনা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টায় কেন যে আমাদের প্রতিবেশী ভারত আপত্তি করছে, সেটা এখনো পর্যন্ত আমি বুঝে উঠতে পারিনি। সুয়েজ দুর্ঘটনার পর আমরা যখন আমাদের মিত্র যুক্তরাজ্যের নিন্দা করি, তখন কেন ভারতে এতো উল্লাসের সৃষ্টি হয় যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাগদাদ জোট বিপন্ন হয়ে পড়েছে বলে তিনি সুখী? কেন তিনি এর বিরুদ্ধে? এতে এমন কিছু রয়েছে, যা, আমরা বুঝতে পারি না। তাঁর উত্থাপিত আপত্তি এই যে, এতে শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে শক্তির ভারসাম্য বলতে কি বুঝানো হচ্ছে, তা আমি নিজে বুঝতে পারি না। আমি যা জানি তা এই যে, নিজকে রক্ষা করার মতো সক্ষমতা অবশ্যি আমার থাকতে হবে। অন্যরা যাই বলুন, তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণমুখো হওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আমি এক মুহূর্তের জন্যেও একথা ভাবতে পারি না যে, তাঁর মতো বুদ্ধিমান—আমি সেটাকে জাঁকালো বুদ্ধি বলতে পারি—ব্যাপক দৃষ্টিভঙিসম্পন্ন ও বিরাট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক বাস্তবিকই বিশ্বাস করেন যে, পাকিস্তান তার সীমাবদ্ধ সম্পদ নিয়ে এবং এর কঠিন অর্থনৈতিক অবস্থায় কখনো এক মুহূর্তের জন্যে ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার কথা চিন্তা করতে পারে না। এরূপ বলা হয় যে, তিনি মনে করেন, কাশ্মীরের ব্যাপারে তাঁর কর্মপন্থা এমন ধরনের যে, এতে পাকিস্তানের তরফ থেকে আক্রমণ পরিচালিত হতে পারে। তিনি যখন উপলব্ধি করেন যে, বিপুলসংখ্যক লোককে বলপূর্বক তিনি তাঁর কর্তৃত্বাধীন রেখেছেন এবং তাঁর আশঙ্কা হচ্ছে যে, এসব লোক দীর্ঘকাল তাদের ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হবে না, তখন সম্ভবত তিনি বিবেকের কিছুটা দংশন অনুভব করেন। সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু তার সঙ্গে বাগদাদ জোট ও উক্ত জোটের প্রতি তাঁর বিরোধিতার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাহলে এটা কি এই যে, পাকিস্তান সবল হোক তিনি তা চান না; তিনি সেটাকে সবসময় তাঁর দয়ার ওপর নির্ভরশীল রাখতে চান; আমাদের উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিরোধের ব্যাপারে—ধরুন, প্রথমত কাশ্মীরের ব্যাপারে; ধরুন, দ্বিতীয়ত খালের পানির ব্যাপারে; ধরুন, তৃতীয়ত গঙ্গা নদীর পানি বন্ধ কিংবা আসাম থেকে প্লাবন সৃষ্টির প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানে যে নতুন বিরোধের উদ্ভব হচ্ছে সে ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ মেনে নেয়া ছাড়া পাকিস্তানের কোনো কিছু বলার বা করার মতো ক্ষমতা না থাকুক?

বিশ্বের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন

স্যার, এর থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্যে আমরা বিশ্বের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানাবো। আমাদের স্বাধীনতা ও আমাদের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্যে আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। ভারত আমাদের বিচ্ছিন্নতাই কামনা করবে। আমরা নিজেরা ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হওয়ার জন্যে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। এমনকি, এখনো আমি এ কথা বলছি যে, বর্তমানে অন্য একটি সংস্থায় মীমাংসাধীন এই কাশ্মীর বিরোধেও আমাদের সম্পর্ক ব্যাহত হওয়া উচিত নয়। আমাদের অনেক কিছু—অনেক সমস্যার সমাধান করতে হবে। আমার অন্তরে কোনো বিদ্বেষ নেই। আমি এটা কামনা করি যে, ভারতের প্রতি আমার যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব রয়েছে, অন্যদেরও—যে সব বন্ধুদের আমি ভারতে রেখে এসেছি—পাকিস্তানের প্রতি সেই একই মনোভাব থাকবে। কিন্তু ভারত যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ক্রমাগত আমাদের কণ্ঠরোধ করতে থাকে এবং আমাদের প্রতি

www.pathagar.com

ন্যায়বিচার করার জন্যে আন্তর্জাতিক সংস্থার যে কোনো বা প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার বিরোধিতা করতে থাকে, তাহলে কতদিন যাবৎ আমাদের পক্ষে এই মনোভাব অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হবে? আমি ভারতকে এরূপ নিশ্চয়তা দিতে চাই যে, আমরা তার সঙ্গে সর্বাধিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কামনা করি। কিন্তু আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করবোঃ অনুগ্রহ করে আমাদের সেরূপ করার সুযোগ দিন।

কয়েকটি মহল থেকে আমাকে বলা হয়েছে, দেখুন ভারত কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে—এর কারণ সে দু'নৌকায় পা দেয়ার নীতি গ্রহণ করেছে; তাহলে আমরা কেন সেরূপ করতে পারবো না? আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, আমরা তা করতে পারি না, কেননা আমাদের সেরূপ সম্পদ নেই। ভারতকে এগিয়ে যেতে দিন, ভারত সমৃদ্ধিশালী হোক এবং ভারত সুখী হোক। বিশ্বের যে কোনো অংশের জনগণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধিত হলে তাতে আমি ঈর্ষান্বিত নই। কিন্তু, আগেও আমি বলেছি যে, ভারতও যেন তার বেলায়ও এই মনোভাবটি পোষণ করে, তা আমি চাই।

পারস্পরিক আলোচনা, কোনো সমাধান নেই

তারপর, রাশিয়া কাশ্মীর সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছে বলে যারা বিশ্বাস করেন, তাঁরা বলেনঃ আপনারা কেন ভারতের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন না এবং পারস্পরিক ব্যবস্থা ও পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে আপনাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করছেন না?

ন্যায্য ও নিরপেক্ষভাবে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে ভারতের যদি আগ্রহ থাকতো, তাহলে সেটা সম্ভব ছিলো, সেটা সম্ভব হতো। কিন্তু আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি যে, একেবারে শুরু থেকে, যে সময় বিমানযোগে ভারতীয় বাহিনী শ্রীনগরে প্রেরণ করা হয়, সে সময় থেকে—এমনকি, তারো পূর্ব থেকে, কারণ তথাকথিতভাবে কাশ্মীরের ভারতে যোগদানের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঐরূপ করা হয়েছিল—সে সময় থেকে কাশ্মীরকে ভারতভুক্তি করার উদ্দেশ্যে এবং ব্যাপারটি পরিসমাপ্তি ঘটেছে, পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ নেই, কাশ্মীর ভারতের অংশ, প্রভৃতি বলার মতো সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভারতের অনুসৃত প্রত্যেকটি কর্মপন্থা পরিচালিত হয়। যেখানে এমনি একটা মানসিকতা গভীরতর হয়েছে, যেখানে এমনি একটা মনোভাব রয়েছে, সেখানে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আমরা বৈঠকে মিলিত হয়ে ফায়দা কি? কিসের সমাধান? আমরা বিগত বছরগুলোতে এজন্যে বহু চেষ্টা করেছি। মরহুম প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় সেটা প্রদর্শন করেছেন এবং এমন বহু বই-পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়েছে, যেগুলো প্রমাণ করে যে, আমরা একযোগে মিলিত হয়েছি; আমরা একটা আপোষ মীমাংসায় পৌঁছার জন্যে চেষ্টা করেছি; আমাদের উভয়ের মধ্যে মতৈক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ যে সব প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে, তাঁরা জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী—যেমন, পূর্বাহ্নে অসামরিকীকরণের পর গণভোট অনুষ্ঠান—কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের সম্মানজনক পন্থা নির্দেশ করেছেন এবং তারা সমাধানের যে সব পন্থা নির্দেশ করেছেন, তার সবগুলোই আমরা গ্রহণ করেছি এবং ভারত প্রত্যাখ্যান করেছে। এতদসত্ত্বেও বহু দেশ ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতার দরুন—আন্তর্জাতিক বিশ্বে তার মধ্যে কিছুটা 'পরাজয়ী' মনোভাব কাজ করা সত্ত্বেও এই তৎপরতা জোরেসোরে চালান হচ্ছে—এই ধারণাকে (পারস্পরিক আলোচনা) তুলে ধরার জন্যে প্ররোচিত হয়েছে। এসব দেশের

উপরোক্ত কার্যক্রমের আংশিক কারণ এই যে, তারা এমন একটি নিরপেক্ষ ও ন্যায্য সমাধানে পৌঁছার দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়, যা ভারতের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না; দ্বিতীয়ত, তারা ভারতীয় অভিমতের তোষণ করতে চায়, কেননা, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ভারত একটি অত্যন্ত শক্তিশালী দেশ এবং তৃতীয়ত, তারা এ জাতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও এগুলোর বিরোধিতা করতে চায়, কেননা তাদের আশঙ্কা এই যে, এমনি ধরনের প্রস্তাব বিশ্বরাজনীতিতে তাদের বিরুদ্ধেও সন্নিবেশিত হতে পারে। সে যাই হোক, এটা সুস্পষ্ট যে, একটি সমাধানে পৌঁছার উদ্দেশ্যে আমাদের পক্ষ থেকে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার যে কোনো প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, কাজেই এই পদ্ধতির সমাধানে এক মুহূর্তের জন্যে এতটুকু কর্ণপাত করতে আমি প্রস্তুত নই।

প্রাচ্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ

ভারতের প্রসঙ্গ আমি আলোচনা করেছি। অন্যান্য দেশের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। প্রথমে আমি প্রাচ্যের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রসঙ্গ আলোচনা করবো। এসব দেশের সঙ্গে আমরা যতটা আশা করেছিলাম, দুর্ভাগ্যবশত সে পরিমাণে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু সক্ষমতা অনুযায়ী আমরা তা করেছি। আমরা আমাদের মস্কোস্থ রাষ্ট্রদূতকে চেকোশ্লোভাকিয়ায় মন্ত্রী হিসেবে কার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছি; আমাদের সুইজারল্যাণ্ডস্থ রাষ্ট্রদূতকে যুগোশ্লাভিয়া ও অস্ট্রিয়ায় মন্ত্রীপর্যায়ে কূটনৈতিক কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য চুক্তি রয়েছে এবং আমরা আশা করি যে, শীঘ্রই উক্ত দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিনিময়ে আমরা সক্ষম হবো। পাশ্চাত্য দেশগুলোর বেলায় আমি আনন্দিত যে, এদের সঙ্গে আমরা কিছুটা মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ এবং আমরা তাদের ওপর এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি যে, অনিশ্চিত হামলার ক্ষেত্রে তারা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এদের অধিকাংশের সঙ্গেই আমরা স্বতন্ত্রভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছি। কিন্তু অস্ট্রিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও পর্তুগালের সঙ্গে আমরা পৃথক পৃথক মিশন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইনি। আপনারা হয়তো জানেন যে, আমাদের যুক্তরাজ্যস্থ হাইকমিশনারকে পর্তুগালে ও তুরস্কস্থ রাষ্ট্রদূতকে গ্রীসে আমাদের মন্ত্রী হিসেবে কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে আমরা কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সক্ষম না হলেও সে দেশের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত উত্তম সম্পর্ক বিরাজমান রয়েছে। বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং শান্তি রক্ষার ব্যাপারে আমরা ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে সুফলজনকভাবে সহযোগিতা করে এসেছি এবং এ প্রতিদানে তারা আমাদের বিভিন্ন সমস্যায় সহানুভূতি ও সৌজন্যে প্রদর্শন করেছে।

ভিসার বিধিনিষেধ

পাকিস্তান ও কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের মধ্যে ভিসার বিধিনিষেধ অপসারণ করা হয়েছে ও হচ্ছে এবং আমি আশা করি, শীঘ্রই এমন এক সময় আসবে, যখন আমাদের ও বহু মুসলিম দেশের মধ্যেকার ভিসার বিধিনিষেধও প্রত্যাহার করা হবে। আমাদের জনগণের সংহতি ও অধিকার অক্ষুণ্ন রেখে অন্যান্য যারা এব্যাপারে সমপরিমাণে আগ্রহান্বিত, তাদের সঙ্গেও ভিসার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করতে পারলে আমরা খুবই আনন্দিত হবো। স্পেনের সঙ্গে আমরা অতি শীঘ্রই একটি শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করছি এবং অস্ট্রিয়ার

www.pathagar.com

অনুরোধক্রমে আমরা তাদের স্থায়ী নিরপেক্ষতার স্বীকৃতিদান করেছি। কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তি—প্রখ্যাত বৈদেশিক ব্যক্তি আমাদের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং আমরাও বহু দেশ সফর করেছি। আমি আনন্দের সঙ্গে বলছি যে, আমাদের মধ্যে তাঁদের উপস্থিতি অত্যন্ত সুফলদায়ক হয়েছে। অন্যান্য যাঁরা আমাদের দেশ সফর করতে ইচ্ছুক, আমরা তাঁদের সাদর আমন্ত্রণ জানাতে প্রস্তুত রয়েছি।

স্যার, বিশ্বের কতিপয় দেশের সঙ্গে আমাদের যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রয়েছে সে সম্বন্ধে বর্ণনা না দিয়ে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বলার বাকি আর তেমন কিছু নেই।

বন্ধু ও মিত্র

স্যার, আমি যদি একথা বলে আমার বিবৃতি শুরু করতাম যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অন্তরঙ্গতার চাইতেও বেশি সুনিবিড় বলে আমি আনন্দিত, তাহলে সেটা যথাযথ হতো। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বন্ধু ও মিত্র। যথেষ্ট ক্ষমতাবান এমন একটি দেশ আপনার পেছনে থাকলে সেটা মঙ্গলের কথা, যে দেশ আপনার আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা দিতে পারে। যারা বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করতে প্রস্তুত রয়েছে তাদের সংখ্যা বেশি নয়; আর, স্যার, আমি যদি তেমনটি বলতে পারি, তাহলে আমি মনে করি যে, বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তিরক্ষার ব্যাপারে অতটা দ্ব্যর্থহীন ভূমিকা গ্রহণকারী এই মহান দেশের প্রতি বিশ্বের যে অংশ শান্তি কামনা করে তারা বাধিত রয়েছে। এই নিশ্চয়তা ছাড়াও তাদের কাছ থেকে আমরা এমন সাহায্য পেয়েছি, যাতে আমরা বিপদের আশঙ্কায় ডানে-বামে ও সম্মুখে-পেছনে না তাকিয়ে আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনেকখানি উৎসাহিত হয়েছি। তাদের কাছ থেকে আমরা বহুক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহায্য পেয়েছি এবং আমাকে যদি আমাদের কিছুকাল পূর্বের সঙ্কটজনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে হয়, তাহলে বলতে হয় যে, তারা যেভাবে আমাদের খাদ্যসঙ্কট নিরসনে সাহায্য করেছেন এবং আমাদেরকে খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবার ব্যাপারে সক্ষম করে তুলছেন, তাতে আমরা তাদের কাছে দ্বিগুণভাবে কৃতজ্ঞ।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমরা কেবল **সীটোরই** সদস্য নই, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও অগ্রগতি অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে আমাদের একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং লক্ষ্যও রয়েছে। জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্লক বড় বড় দেশ ও ল্যাটিন আমেরিকার কতিপয় দেশের ক্ষেত্রে আমি বাস্তবিকই আনন্দের সঙ্গে বলছি যে, এদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। এদের কারো কারো সঙ্গে আমরা কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা আশা করি, এদের মধ্যে যত বেশি সম্ভব দেশের সঙ্গে আমরা এধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবো; কিন্তু আমাদের সম্পদ আশার তুলনায় যথেষ্ট নয়। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে আমি বাস্তবিকই অত্যন্ত সুখী হবো; কিন্তু আমরা সবাই একথা জানি যে, এই পরিষদে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে ব্যয়ের ব্যাপারে আমাদের কিছুটা সাবধান ও সতর্ক হতে হবে।

ইন্দোনেশিয়া

স্যার, ইন্দোনেশিয়ার সংগে আমাদের সম্পর্ক সুষ্ঠু, ইন্দোনেশীয় জনগণের জন্যে আমরা অত্যন্ত ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মনোভাব পোষণ করি এবং ইন্দোনেশিয়ার যে সব সমস্যা রয়েছে তার প্রতি আমরা সহানুভূতিশীল। ইন্দোনেশীয় প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক পাকিস্তান সফরকালে

www.pathagar.com

আমরা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচনার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছি, আমরা ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে একটি মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেছি এবং একটি সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদনের বিষয় বিবেচনাধীন রয়েছে। পাকিস্তানের একটি সামরিক মিশনও সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়া সফর করেছে।

যুক্তরাজ্য ও মালয়

স্যার, এটা অত্যন্ত উল্লাসের কথা যে, মালয় ফেডারেশন কমনওয়েলথের আওতায় ১৯৫৭ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা লাভ করছে এবং এখানে আমাকে এক মুহূর্তের জন্যে প্রসঙ্গান্তরে যেতে দেয়া হলে আমি বলবো যে, যুক্তরাজ্য যে-রূপ প্রগতিশীল পন্থায় তার বিভিন্ন সদস্যকে স্বাধীনতা দান করছে আমরা তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছি। আমি নিশ্চিতভাবে অনুভব করি যে, যুক্তরাজ্যের এই কর্মপন্থা শেষ পর্যন্ত তার সুনাম বৃদ্ধি করবে, তার নৈতিক বৈশিষ্ট্যকে উন্নীত করবে এবং বিশ্বজনমতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করবে। আমরা এখানে পাকিস্তানস্থ মালয় ফেডারেশনের কমিশনারের অধীনে করাচীতে মালয়ের একটি ফেডারেশন অফিস স্থাপনের প্রস্তাব করছি। আমরা মালয়ে একজন প্রতিনিধি প্রেরণের প্রশ্নও বিবেচনা করছি। একজন পাকিস্তানী আইনবিশেষজ্ঞ মালয়ের শাসনতন্ত্র কমিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। উক্ত কমিশন বর্তমানে মালয়ের খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ব্যাপৃত রয়েছে। আমরা আশা করি, এই শাসনতন্ত্র মালয়ী জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হবে। পাকিস্তানে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের অধ্যয়নে সাংস্কৃতিক বৃত্তি প্রদান কার্যসূচি অনুযায়ী আমরা মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও পাকিস্তানী শিক্ষা সংশ্লিষ্ট একজন অধ্যাপক প্রেরণের প্রস্তাব করেছি। মালয়ী ছাত্রদের জন্যে দু'টি বৃত্তিও প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রতিরক্ষা সংস্থায় ট্রেনিং গ্রহণের উদ্দেশ্যে ক্যাডেট প্রেরণের জন্যে মালয়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রগতিশীল ও গতিশীল প্রতিভার অধিকারী মালয়ী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ আমার হয়েছে এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, মালয় এমনি একজন যোগ্য লোকের নেতৃত্ব লাভ করেছে। মালয়ে বর্তমানে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে যাচ্ছে এবং একে যে সব দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, সে ব্যাপারে আমরা পাকিস্তানীরা তার সর্বপ্রকার শুভ কামনা করি।

১৯৫৪ সালে জেনেভায় ইন্দোচীন প্রশ্নে যে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তদনুযায়ী আমরা লাওস ও কম্বোডিয়াকে স্বীকৃতিদান করেছি। আমাদের ব্যাঙ্ককস্থ রাষ্ট্রদূতকে এসব রাষ্ট্রে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করে আমরা বর্তমানে এদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। জেনেভা-চুক্তি অনুযায়ী ভিয়েতনামের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারিত হওয়া সাপেক্ষে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামকে কার্যত স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

চীন ও জাপান

আমি আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করছি যে, চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হচ্ছে এবং স্যার, আমি আশা করি যে, দেশে আমার জাপান সফরের মতো যথেষ্ট উপযুক্ত পরিবেশ ও অবস্থা সৃষ্টি হবে। আমি সে বিষয় চিন্তা করছি এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধির সঙ্গে সাম্প্রতিক সাক্ষাতের পর আমি আশা করি যে, আমরা উক্ত দেশের সঙ্গে আরো আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো। যুদ্ধোত্তরকালে জাপান যেরূপ

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্যভাবে যুদ্ধের ধকল কাটিয়ে উঠেছে সেটা আমাদের কাছে খুবই খুশীর ব্যাপার। শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উন্নয়নে জাপান সুস্পষ্টভাবে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আমাদের মধ্যে ব্যাপক বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে। আমরা সব সময় কামনা করেছি যে, জাপান জাতিসংস্থায় তার উপযুক্ত স্থান লাভ করুক। পাকিস্তান জাপানের জাতিসংঘভুক্তি সমর্থন করেছে এবং আমরা আনন্দিত যে, সে বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেছে। জাপান সরকার আমাকে সে দেশ সফরের এই আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেছেন এবং আমিও অবস্থা অনুকূল হওয়া মাত্র এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার কথা চিন্তা করছি।

স্যার, বিশ্বে এমন কয়েকটি দেশ আছে যেগুলো সম্প্রতি স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, এগুলো দক্ষ লোকের পরিচালনাধীনে রয়েছে এবং এদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। আমি বিশেষভাবে সুদান, লিবিয়া, তিউনিসিয়া ও মরক্কোর কথা উল্লেখ করছি। আমরা আমাদের স্পেনস্থ রাষ্ট্রদূতকে তিউনিসিয়া ও মরক্কোতে কূটনেতিক দায়িত্ব অর্পণ করেছি। আমাদের সুদানস্থ দূতকে লিবিয়ায় দায়িত্ব সম্পাদনের ভার অর্পণ করা হয়েছে। আমরা আশা করি যে, এসব দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরো ব্যাপকতর হবে এবং এই পরিষদ অনুমতি দিলে আমি অত্যন্ত সানন্দে এসব দেশ সফর করবো ও তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবো।

কমনওয়েলথ

স্যার, কমনওয়েলথের প্রসঙ্গ আলোচনা না করলে আমার পর্যালোচনা আদৌ সম্পন্ন হবে বলে আমি মনে করি না। কাজেই, আমি এখন কমনওয়েলথ নামে পরিচিত বিশ্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশের প্রসঙ্গ আলোচনা করছি।

আমি মনে করি যে, এই মহান জাতি সমবায়ের সদস্য হতে পেরে আমরা ভাগ্যবান। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে আমরা প্রজাতন্ত্রী সরকারের রূপ পরিগ্রহ করলেও এতে কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে আমাদের মর্যাদার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। স্যার, আপনার স্মরণ থাকতে পারে যে, পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে যে সময় অসন্তোষের ঝড় বয়ে যায়, সে সময় এরূপ দাবি উত্থিত হয় যে, কমনওয়েলথের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত। ব্যক্তিগতভাবে আমি এটা যথাযথ মনে করি না যে, আমাদের নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা উচিত এবং আমি আনন্দের সঙ্গে বলছি যে, আমরা সে সময় যে সংযম ও সতর্কতামূলক মনোভাব গ্রহণ করেছি, সেটা নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ভারতেও একই রূপ অসন্তোষের ঝড় বয়ে যায় এবং এটা অবশ্যি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কৃতিত্ব যে, তিনিও কমনওয়েলথের সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পর্ক ছিন্নের বিরোধিতা করেছিলেন; কারণ তিনিও এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ দেশের সমবায়ে গঠিত একটি সংস্থার সদস্য থাকা একটি দেশের পক্ষে কতো সুবিধাজনক সেটা উপলব্ধি করেছিলেন। কমনওয়েলথের ভূমিকা প্রদর্শনীমূলক নাও হতে পারে; কিন্তু, সেটা গঠনমূলক ও যথার্থ। কমনওয়েলথের আওতাধীন সবগুলো দেশই সার্বভৌম রাষ্ট্র, বহু ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতের বিভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে মিল এবং গণতান্ত্রিক জীবনধারা সম্পর্কে সাধারণ বিশ্বাস রয়েছে। আমরা মানবজাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্যে পারস্পরিকভাবে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। সদস্য রাষ্ট্রগুলো যদি কমনওয়েলথের ভাবধারাকে বাস্তবায়িত করার মহান উদ্দেশ্যের প্রতি আস্থা

www.pathagar.com

অক্ষুণ্ন রাখে এবং আমরা যদি সেগুলো বাস্তবায়িত করি, তাহলে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আমরা নিজেদের শক্তি ও নৈতিক প্রভাব বিস্তারে অবশ্যি সক্ষম হবো। আমরা আনন্দিত যে, কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ রয়েছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, আমাদের ভারতের ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে; কিন্তু এটা ব্যতিক্রম—আমি আশা করি, এগুলো সাময়িক ব্যতিক্রম। এটা দুঃখজনক যে, দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের অনুসৃত বর্ণ-বৈষম্য নীতির ফলে সেখানকার পাকিস্তানী ও ভারতীয়রা মৌলিক মানবাধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশ্বের নৈতিক জনমত এই জাতিগত বৈষম্যের নিন্দা করেছে। আমরা এমন একটি সন্তোষজনক ও আপোষমূলক সমাধানে পৌঁছার জন্যে প্রস্তুত রয়েছি, যাতে উভয় দেশের মধ্যে অন্তরঙ্গতাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হবে।

কলম্বো পরিকল্পনা

কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সহযোগিতামূলক সাফল্যের অন্যতম অত্যন্ত সুফলজনক দিক হচ্ছে কলম্বো পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্পায়িত সদস্য রাষ্ট্রগুলো অনুন্নত সদস্য দেশগুলোকে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহায্য প্রদান করছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের অর্থনৈতিক ও শিল্পায়নের জন্যে আমরা বিশেষ করে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট বৃটেন ও নিউজিল্যাণ্ডের কাছ থেকে বৈষয়িক সাহায্য লাভ করেছি। তাছাড়া, কারিগরি ট্রেনিং গ্রহণের উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক পাকিস্তানী তরুণ এসব দেশে গমন করেছেন।

পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত বিনিময়ের জন্যে কমনওয়েলথের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠান সুফলজনক। গত বছর লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাম্প্রতিককালে প্রথমত সিংহলের প্রধানমন্ত্রী মিস্টার বন্দরনাকেকে এবং অতঃপর কানাডার স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সচিব মিঃ পল মার্টিনকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি।

আমরা ক্রমবর্ধমান আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, কমনওয়েলথ রাষ্ট্রসমূহের সংবাদপত্র ও জনসাধারণ আমাদের সমস্যাগুলো এবং কাশ্মীর প্রশ্নে আমাদের নীতি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছে। আমাদের কমনওয়েলথ সহযোগীদের কাছ থেকে নিরাপত্তা পরিষদে আমরা গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন পেয়েছি, এজন্যে তাদের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এই সুযোগে আমি কমনওয়েলথের অন্যতম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বর্ণ-উপকূলের আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ঘানার সরকার ও জনসাধারণের সঙ্গে তাদের স্বাধীনতা উপলক্ষে আমরাও আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করছি এবং তাদের জন্যে সর্বপ্রকার শুভ কামনা করছি। আমি নিশ্চিত, এই নতুন রাষ্ট্র তার সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী ডক্টর কোয়ামে ন'ক্রুমার নেতৃত্বে কমনওয়েলথের নৈতিক শক্তিকে আরো জোরদার করে তুলবে।

জাতিসংঘ

স্যার, যেটাকে আমি অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি, আর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ না হলেও যেটা আমাদের নীতির প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর বর্তমানে আমি সে প্রসঙ্গে আলোচনা করবো। এটা হচ্ছে, জাতিসংঘের প্রতি এবং জাতিসংঘ সনদের মূলনীতি ও লক্ষ্যসমূহের প্রতি আমাদের অবশ্যি সমর্থন জ্ঞাপন করতে হবে। আমরা পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করছি যে, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতি কিরূপ সুষ্ঠুভাবে এসব লক্ষ্য সম্পাদন করে এবং এসব নীতিকে সমুন্নত রাখে, তার ওপরই স্থায়ী শান্তি নিহিত। জাতিসংঘ

www.pathagar.com

সনদের সুস্পষ্ট বিবরণী অনুযায়ী, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও উত্তম প্রতিবেশীসুলভ মনোভাবের বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত শান্তিই আমাদের কাম্য।

জাতিসংঘের অন্যতম মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে, মানবজাতিকে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে রক্ষা করা এবং সমরাস্ত্রের ধ্বংসকারী বোঝা লাঘব করা। পৃথিবী বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে মানবজাতি উদজান বোমার ন্যায় ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের উপযোগী অত্যন্ত শক্তিশালী মারণাস্ত্র তৈরি করেছে এবং এতে বিশ্বব্যাপী প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ শুরু হলে শেষ পর্যন্ত সভ্যতা তথা মানবজাতি টিকে থাকবে কিনা, সে সম্পর্কে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হতে বাধ্য। আমাদের মতে নিরস্ত্রীকরণ এরূপ অবস্থা সৃষ্টির একটি অবিচল পদ্ধতি হওয়া উচিত, যাতে কোনো জাতির পক্ষেই অবাধ শান্তি ভঙ্গ করা সম্ভব হবে না। জাতিসংঘ যদি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় দ্রুত ও সক্রিয় যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে এবং এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে, যেখানে ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন অক্ষুণ্ন থাকে, তাহলে সব জাতি বড়-ছোট, শক্তিশালী-দুর্বল, উন্নত-অনুন্নত কোনোপ্রকার রাজনৈতিক আধিপত্য কিংবা অর্থনৈতিক শোষণ থেকে বিমুক্ত পরিবেশে মিলেমিশে বন্ধুভাবে বাস করতে পারবে।

নতুন আশা

এ প্রসঙ্গে পরিষদের স্মরণ থাকতে পারে যে, মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক সঙ্কটের সময় যখন নিরাপত্তা পরিষদে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন আন্তর্জাতিক জরুরী বাহিনী গঠনে সাধারণ পরিষদের দ্রুত তৎপরতা বিশ্বের দুর্বল জাতিগুলোর মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করে। আমরা আশা করি যে, আন্তর্জাতিক বিরোধসমূহে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে জাতিসংঘ সনদের ৭ম ধারার বিধান অনুযায়ী অহেতুক বিলম্ব না করে স্থায়ী ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী গঠন করা হবে।

আমাদের মতে বিশ্বের কোনো দেশেরই জাতিসংঘের রায় অমান্য করার মতো ধৃষ্টতা থাকা উচিত নয়। এটা দুঃখজনক যে, এখনো এমন কতিপয় দেশ রয়েছে, যেগুলো নিজস্ব স্বার্থপরতার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ বাহিনী গঠনের বিরোধিতা করছে। অথচ যে সময় নিজেদের স্বার্থে কোনো বাদ সাধেনি, যখন তারা নৈতিক মতবাদ প্রচারের এবং বিশ্বের কাছে নিজেদেরকে শান্তি ও জাতিসংঘের মর্যাদা রক্ষার অগ্রদূত হিসেবে প্রতিপন্ন করার সুবিধেজনক অবস্থায় ছিলো, তখন তারা এর প্রতি সমর্থন জানায়।

মিসরে জাতিসংঘ পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করা হলে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স উক্ত এলাকা ত্যাগ করে চলে আসে এবং বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে শান্তি রক্ষার ব্যাপারে ও মধ্যপ্রাচ্যে যে সব বিরোধের উদ্ভব হয়েছে, তার একটি সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছার ব্যাপারে সহায়তা করার জন্যে তথায় জাতিসংঘ বাহিনী প্রেরণে সম্মতি জানায়। এমনকি, এখনো অন্যান্য দেশকে, তারা যদি জাতিসংঘের আদেশ পালন না করে, তাহলে তাদেরকে জাতিসংঘ বাহিনী প্রেরণের হুমকি দেয়া হয়। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে, বিশ্বের অন্যান্য দেশ, বিশেষ করে বৃহত্তর দেশগুলো যদি সমর্থন না জানায়, তাহলে জাতিসংঘ বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আমরা দেখেছি যে, ছোট ছোট দেশগুলোকে ভীতি প্রদর্শন করা গেলেও বড় বড় দেশগুলো, বিশেষত যে সব দেশ বড়োও নয় ছোটোও নয়, অথচ বড়োদের সহায়তা

www.pathagar.com

আদায় করতে পারে, সে সব দেশ সেটা অমান্য করার ক্ষমতা রাখে। আমরা দেখেছি যে, যেখানে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স মিসর থেকে সরে পড়ে, সেখানে অন্যান্য দেশ—শক্তিশালী দেশ—যারা নিজেরা জাতিসংঘ জরুরী বাহিনীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল, তারা জাতিসংঘের রায় মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। তারা জানতো যে, তারা জাতিসংঘের আদেশ অমান্য করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতাবান; তারা জানতো যে, তারা ঐরূপ করলে জাতিসংঘ বলপূর্বক তাদের এলাকায় পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করতে পারবে না। আমরা স্বীকার করছি যে, জাতিসংঘের তেমন প্রাপ্ত ক্ষমতা এবং তার পেছনে তেমন সমর্থন নেই যাতে করে সে একটি বৃহৎ দেশকে তার রায় মেনে নেয়ার জন্যে বাধ্য করতে পারে; কিন্তু একই সময়ে আমাদের এরূপ একটি অপরিহার্য পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে চেষ্টা করা উচিত, যাতে জাতিসংঘের নৈতিক শক্তি এতো বড়ো হবে যে, প্রত্যেকটি দেশই তার রায় মেনে নিতে বাধ্য হবে এবং এ ব্যাপারে ঐ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না, যখন জাতিসংঘ তার পুলিশ বাহিনী রাখার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হবে এবং যে কোনো দেশের বিরুদ্ধে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। আমরা যতো শীঘ্র পাশব শক্তির ওপর নৈতিক শক্তির বিজয়, অন্যায়-বিচারের ওপর সুবিচারের বিজয় সূচিত করতে সক্ষম হবো, পৃথিবীও ততো শীঘ্রই শান্তির জন্যে প্রস্তুত হবে।

দ্ব্যর্থহীন পররাষ্ট্র নীতি চাই

স্যার, শেষ করার পূর্বে আমি যেভাবে ও যে ভিত্তিতে বিভিন্ন সমস্যার ওপর আলোকপাত করেছি, সে সম্পর্কে আর একটি কথা বলতে চাই। স্যার, আমি বলতে চাই যে, আমাদের পররাষ্ট্র নীতি যাই হোক না কেন, সেটাকে দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট হতে হবে। বিশ্বের একথা জানা উচিত যে, আমরা যা বলি তাই করি। আমি এই বাস্তব বিষয়কে উপেক্ষা করতে চাই না যে, পররাষ্ট্রবিষয়ক ব্যাপারে এবং বর্তমানে বিশ্বে যখন সবকিছু নিরপেক্ষ ও ন্যায্য নয়, যেখানে এমনও জাতি এবং রাষ্ট্র রয়েছে, যারা ন্যায়বিচারের পন্থাকে অমান্য করে এবং ন্যায়বিচারের কণ্ঠরোধ করতে প্রস্তুত, এধরনের একটি বিশ্বে ঐরূপ একটি সুস্পষ্ট ও সরাসরি নীতি সফল নাও হতে পারে। কাজেই এমন হতে পারে যে, কোনো কোনো সময় গরজের তাগিদে আমাদের চলার পথের সংস্কার সাধন করতে হবে, এমন হতে পারে যে, বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এবং বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে আমরা যাদের সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করছি, সময় সময় তাদের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি। কিন্তু এতটা পরিমাণে আমি নিশ্চিত যে, আমরা গরজের কাছে সাময়িকভাবে মাথা নত করি বা না করি, সত্যি ও ন্যায়বিচারের আদর্শ থেকে আমরা কখনো বিচ্যুত হবো না এবং বিশ্বে শান্তি, ন্যায়বিচার ও সত্যি সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আমরা আমাদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা নিয়োজিত করবো।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ন্যায্য অধিকার আদায়ে জনগণকে আমি যদি উদ্বুদ্ধ করতে পেরে থাকি...

[পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে বক্তৃতা শেষ করার পর পার্লামেন্টে যে সমালোচনা ও বিতর্ক চলে, তাহার পরিসমাপ্তি প্রসঙ্গে ২৫শে নভেম্বর (১৯৫৭) তিনি বলেন ঃ]

'স্যার, অত্যন্ত আনন্দের ও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, পরিষদের সব পক্ষ, যাঁরাই বক্তৃতা দিয়েছেন তাঁদের সবাই বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্র নীতি সমর্থন করেছেন। বরং তাঁরা আরো আগে বেড়েছেন, তাঁরা এ নীতির পিতৃত্ব দাবি করারও চেষ্টা করেছেন। এ প্রশ্নে তাঁদের পক্ষে আমি পিতৃত্বের দাবি ছেড়ে দিতেও প্রস্তুত আছি; কিন্তু বিপদ হলো, পিতার সংখ্যা খুবই বেশি, তার ওপর বাহ্যত কেউ কেউ আবার সন্তানকে ত্যাজ্য করারও প্রয়াস পেয়েছেন। তবে একটি মাত্র ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখেছি, আর সে ব্যতিক্রমকে আমি তেমন বড় রকমের কোনো ব্যতিক্রম বলে মনে করি না। কারণ, সংশ্লিষ্ট সদস্য বা সদস্যগণ হয়তো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের হস্ত শক্তিশালী করার মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়েই তা করেছেন।

স্যার, যিনিই সরকারের পররাষ্ট্র নীতির বিরোধিতা করেন, তিনি দেশের শত্রু এ ধারণা যাঁরা পোষণ করেন, আমি তাঁদের সঙ্গে নেই। তাঁরা বিপথগামী হতে পারেন, তাঁদের নিজস্ব বিচিত্র রকমের ধারণা থাকতে পারে, তাঁদের নিজস্ব মতামত থাকতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষকে তাঁর দেশের ভাগ্যের সাথে বিজড়িত মৌলিক বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাটুকু অন্তত দিতে হবে।

সর্বান্তকরণ অনুমোদন

পরিষদের পক্ষে সর্বান্তকরণে সরকারের পররাষ্ট্র নীতি অনুমোদনের ব্যাপারটি যে একটি অভিনন্দনযোগ্য ব্যাপার, তা আমি আগেই বলেছি। এ অনুমোদনের অর্থ আমার প্রতি পরিষদের সমর্থন নয়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরিষদ ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি আস্থা জানালেন—এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বিষয়টি দেখতে চাইনে। আমি একে একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করি। কারণ, জাতি যে আজ সামগ্রিকভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং জাতির লক্ষ্য কি, আর কিভাবেই বা সেই বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জন করতে হবে, পরিষদের এই সমকণ্ঠ সমর্থনের ফলে তা সপ্রমাণিত হলো। এ ব্যাপারে আজ আমাদের মনে আর কোনো সন্দেহ রইলো না।

এই কারণেই পরিষদের সদস্যগণকে পররাষ্ট্র নীতি সমর্থনের জন্যে আমি আজ অভিনন্দন জানাচ্ছি। অন্যান্য জাতির দৃষ্টিতে এবার আমাদের দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং বিশ্বের দরবারে পাকিস্তান মর্যাদার উচ্চাসন লাভে সক্ষম হবে।

স্যার, আমি আনন্দের সাথে লক্ষ্য করেছি যে, পরিষদের সদস্যদের মধ্যে বাস্তববোধের পরিচয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

www.pathagar.com

বন্ধুদের মধ্যে আনুগত্য

বন্ধুত্ব ও মৈত্রীর হস্ত সম্প্রসারণ এবং সাহায্য ও সমর্থন যোগানোর জন্যে সদস্যরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি প্রশংসাসূচক যে সব মন্তব্য করেছেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিষদের সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রের এ সাহায্য-সহযোগিতার প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করেন। আমার মতে এবারই সর্বপ্রথম এই পরিষদ বাস্তবতার স্বীকৃতি ও সত্যপ্রীতির পরিচয় দেবার সুযোগ পেয়েছেন। এতে, অবশ্য আমারও কিছুটা অবদান আছে। আন্তর্জাতিক বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আপনাদের আজ সত্যাশ্রয়ী হতে হবে ও সততার সাথে কাজ করতে হবে। যাঁরা আপনাদের সাথে আছেন, তাঁদের গুণের স্বীকৃতি দিতে হবে; যাঁরা পথভ্রষ্ট হয়ে বিপথগামী হয়েছে তাদের মোকাবিলা করতে হবে। আমি মনে করি, এতে আমাদের দেশের নৈতিক মর্যাদা বরং বৃদ্ধিই পাবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি এবং আমাদের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের জন্যে যাঁরা দায়ী, আমাদের প্রশংসাদৃষ্টে তাঁরা নিশ্চয়ই খুশী হয়েছেন। এ থেকে তাঁদের এ শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত যে, আমরা পাকিস্তানীরা বন্ধুদের গুণের স্বীকৃতি দিতে জানি; তাঁদের স্মরণ রাখা উচিত, আমরা সর্বান্তকরণেই তাঁদের সঙ্গে আছি। তাঁরাও সর্বান্তকরণেই আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা ছোট হতে পারি, ক্ষুদ্র হতে পারি, কিন্তু সময় আসলেই তাঁরা দেখতে পাবেন, আমাদের চেয়ে বড় ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু আর কেউ নেই। আমাদের যাঁরা বন্ধু তাঁদের কাছ থেকেও আমরা ঠিক এই ব্যবহারই আশা করি।

ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের দুরূহ সমস্যা ও কাশ্মীর প্রশ্ন আলোচনার আগে আমি কয়েকটি মন্তব্যের ওপর আলোকপাত করতে চাই। মন্তব্যগুলো আমাদের পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধে নয়, সম্ভবত যেভাবে বিষয়টি আমি পেশ করেছি, তার বিরুদ্ধেই করা হয়েছে। আমার যে একটি কথায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপত্তি নেয়া হয়েছে তা হলো এই যে, আমি বলেছিলাম, মধ্যপ্রাচ্যের যে সব দেশ আমাদের সঙ্গে রয়েছে তাঁরা মোটামুটি কতগুলো শূন্যের সমষ্টি। আপত্তি করা হয়েছে এই জন্যে যে, আমি নাকি তাঁদের তাচ্ছিল্য করেছি। আসলে তা নয়। আমি জানি, আমার বিরোধীদলের বন্ধুরা নিজেদেরকে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের সমর্থক হিসেবে জাহির করার জন্যে আমার এই মন্তব্যের সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করবেন। আমি তাঁদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের প্রতি কার শ্রদ্ধা আছে না আছে তা তাঁরা (মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানরা) জানেন।

শক্তির অমান্য

বস্তুত আমি তাঁদের সামরিক শক্তির প্রতিই ইঙ্গিত করেছি, তাদের আন্তর্জাতিক মর্যাদার প্রতি নয়, আমাদের শক্তি এবং আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড বা রাশিয়ার মতো দেশের শক্তির ক্ষেত্রে যে ব্যবধান রয়েছে আমি তার প্রতিই ইঙ্গিত করেছি। আমি একথাই বলতে চেয়েছি যে, কারিগরি দক্ষতা বা সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে আমরা এমন কোনো উন্নতি করি নাই, যার জন্যে আমাদের 'শূন্য' ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যেতে পারে; আমি এ সত্যের প্রতিই অঙ্গুলি সঙ্কেত করেছি, যে কোনো আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বা বিশ্ব সংঘর্ষে ন্যায্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হলে তাদের সমর্থন আমাদের পেতে হবে। কে কবে তাদের তাচ্ছিল্য করার চেষ্টা করেছে? সেই 'শূন্যের' মধ্যে আমি পাকিস্তানকেও ধরেছি। মহাদেশের এ প্রান্তে আমাদের সেনাবাহিনী

www.pathagar.com

সর্বোত্তম সেনাবাহিনী। আমাদের পিছনে এমন পরাক্রমশালী এক জাতি রয়েছে, যার ওপর ভরসা করে আমি আস্থার সাথে বলতে পারি যে, আমরা বিশ্বের যে কোনো অংশের যে কোনো সেনাবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম।

কিন্তু একটি জিনিসের আমাদের অভাব আছে, সে হলো সম্পদ। আমাদের সাহস আছে, শৌর্য আছে; সর্বোপরি আছে আমাদের নিজেদের প্রতি, আমাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি ও দেশের প্রতি অটল আস্থা। আর তা-ই আমাদের অগ্রাভিযানে এবং যে কোনো বাধা-বিপত্তি অতিক্রমে সাহায্য করবে। এসত্ত্বেও এ দেশ আমার দেশকে অন্যদের সাথে 'শূন্য' হিসেবে তুলনা করেছি। আমরা বন্ধু চাই। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আমরা টিকতে পারি না—কেবল এই কথা বোঝাবার জন্যেই আমি এই মন্তব্য করেছি। আমাদের বাগদাদ চুক্তির বন্ধুবর্গ যাঁদের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি, তাঁদেরই জিজ্ঞাসা করুন, আমরা তাঁদের জন্যে কি করেছি, আর তাঁরাই বা আমাদের কিভাবে শ্রদ্ধা করে আর কোন্ চোখেই বা আমাদের দেখে?

বাগদাদ চুক্তি

একথা ঠিক যে, বাগদাদ চুক্তির জন্যে কেউ না কেউ একজন দায়ী। অথচ, কেউ এর দায়িত্ব নিতে চান, আবার কেউ চান না। আমি এর কৃতিত্ব মুসলিম লীগকেই দিতে চেয়েছিলাম; কিন্তু মুসলিম লীগের জনৈক সদস্য আমাকেও কিছুটা কৃতিত্বের ভাগী করেছেন। কারণ, আমি মন্ত্রিসভায় থাকাকালেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মুসলিম লীগের আর একজন সদস্য বলেছেন যে, মুসলিম লীগের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ খাজা নাজিমউদ্দিনের ক্ষমতাচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে এই সদস্য সাহেবের মুসলিম লীগ ত্যাগের পর নাকি বাস্তবক্ষেত্রে মুসলিম লীগ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিল। তখন তার কোনো অস্তিত্ব ছিলো না, কিন্তু পরে সংশ্লিষ্ট সদস্যের প্রত্যাবর্তনের পরই মুসলিম লীগ আবার আপনা-আপনিই পুনরুজ্জীবিত হয়ে পড়ে। আমি নিজে বাগদাদ চুক্তির পিতৃত্ব দাবি করি না। পিতৃত্ব যে কার, তা নিয়েও আমি মাথা ঘামাতে চাই না অথবা কারো ওপর পিতৃত্বের বোঝা চাপিয়েও দিতে চাই না। আসল কথা হলো, সন্তান একটি ভূমিষ্ঠ হয়েছে, দেখতেও সে কুৎসিত নয়। দিন দিন সে শক্তিশালীও হয়ে উঠছে। আজ সে নিজের পায়ে দাঁড়াতেও শিখেছে। আমাদের নীতি হলো বাগদাদ চুক্তিকে আরও শক্তিশালী করা, আর চুক্তিভুক্ত দেশগুলোকে ঘনিষ্ঠতর করা যাতে মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বের শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে তা সন্তোষজনক অবদান রেখে যেতে পারে।

এখন দেখা যাক, এ চুক্তির ফল কি দাঁড়িয়েছে। সেদিন তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন, কাশ্মীর প্রশ্নে তার চাইতে স্পষ্টতর বিবৃতি কি আপনারা এর আগে কখনো দেখেছেন? তুরস্ক, ইরাক ও ইরানের মতো যত বন্ধু এখন আপনাদের রয়েছেন, আগে কি কখনো তা ছিলো? আজ এঁরা সবাই আপনাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি নিজের পক্ষ থেকে, এই সরকারের পক্ষ থেকে, আশা করি এবং এই দেশের পক্ষ থেকেও এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, বিপদের মুহূর্তে তাঁরাও আমাদেরকে তাঁদের পাশেই দেখতে পাবেন। তাঁরা জেনে রাখুন, আমরা যখন বন্ধুত্ব করি তখন খাঁটি বন্ধুত্বই করি। তাঁরা আরো জানুন যে, আমরা যখন বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিই তখন মনেপ্রাণেই দিই। তাঁদেরও নিজেদের সমস্যা রয়েছে এবং আমি আশা করি, আজ তাঁরা আমাদের যেভাবে সমর্থন করছেন, প্রয়োজনের

www.pathagar.com

সময় তাঁদেরও এই রকম সমর্থন যোগাতে পাকিস্তান পিছ-পা হবে না। তাই বলছিলাম, আমি তাঁদের তাচ্ছিল্য করেছি একথা হাস্যকরই শোনায়।

বিষয়টিকে আপনারা অনেক দূর গড়িয়েছেন। আমি জানতাম সুযোগ পেলে আমি এ প্রসঙ্গটির ওপর বিশদ আলোচনা করে আমার বক্তব্যের আরও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারবো। বিষয়টি আসলে আপনাদের বিকৃত চিন্তাধারাপ্রসূত এবং বাহ্যত সমালোচনার হাতিয়ার। বাগদাদ চুক্তি সম্পর্কে আলোচনার সময় বৃটেনও যে এই চুক্তির অন্যতম শরীক তা আমি ভুলতে পারি না।

কেউ চির শত্রু বা চির মিত্র হতে পারে না

বৃটেনের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কিছু বলা হয়েছে। আমার বন্ধু ও 'সাগরেদ' মিয়া মমতাজ দৌলতানা বৃটিশ জাতি ও তাদের বিভিন্ন ঐতিহ্য যেগুলোকে আমরা গর্বের ও মূল্যবান বস্তু বলে মনে করি, উচ্চ প্রশংসা করতে গিয়ে যে সব শব্দালংকার ব্যবহার করেছেন তা ভুলবার নয়। প্রকৃতপক্ষে এ তাঁদের প্রাপ্যও। আমার আপত্তি সত্ত্বেও মিয়া সাহেব আমাকে 'নেতা' বলে সম্বোধন করায় আমি তাকে সাগরেদ বলে অভিহিত করলে তাতে তাঁর কোনো আপত্তি থাকবে না বলেই আমি মনে করি। জনাব খুরোর একটি কথাও আমার স্মরণ আছে। তিনি বলেছেন, আমরা চিরকালের জন্যে কাকেও শত্রু করতে পারি না, আবার চিরকালের জন্যে কাকেও মিত্রও করতে পারি না। এ বাস্তবিকই শত্রু-মিত্র আছে এমন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখ নিঃসৃত একটি বিজ্ঞ মন্তব্য। মিত্র যে শত্রু হয়, আবার শত্রু যে মিত্র হয়, এ অভিজ্ঞতা তাঁর আছে।

বৃটেন এমন অনেক কাজ করেছে যার জন্যে আমাদের অভিযোগ থাকতে পারে; কিন্তু কথা হলো, অতীত ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ কি? বৃটেনের প্রতি আমাদের এখন মনোভাব কি হবে, তা নির্ধারণের জন্যে এসব কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে কোনো লাভ নেই। আমি বৃটেনকে দু'দিক থেকে আঘাত হানতে চাই না। একদিকে আমরা তাদের নিন্দা করি অন্যদিকে কাশ্মীর প্রশ্নে আমাদের সমর্থন দেয়ায় ভারত তাদের নিন্দা করবে, এমনটা চলতে পারে না। আসুন, আমাদের যাঁরা বন্ধু তাঁদের প্রতি আমরা সুবিচার করি। তাঁরা আজ আমাদের সঙ্গে আছেন, আর আমাদের সঙ্গে থাকার সাহস দেখাতে গিয়ে তাঁরা যে কমনওয়েলথে নিজেদের মর্যাদা হারাতে গেছে, তা কারো নজরে পড়েনি, এ দেখে আমি বিস্মিত।

কেন সুয়েজ ত্যাগ করলো?

আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে আমাদের বন্ধুরা নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করেছেন বলে আমি যে কথা বলেছি, জনৈক সদস্য তার প্রতিবাদ পর্যন্ত করেছেন। প্রকৃতই তাঁদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়েছে। যদি অবস্থা তাই হয় তবে আমাদেরও কর্তব্য হবে সত্যকে স্বীকার করা। একে আমি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা বিরাট ত্যাগ বলে মনে করি। তারা জাতিসংঘের ম্যাণ্ডেট মান্য করে মিশর ত্যাগ করে চলে গেছে। বলা হয়ে থাকে যে, তাদের চলে যাবার পেছনে অন্যবিধ কারণও ছিলো। জাতিসংঘ দাবি করেছিল তারা সুয়েজ ত্যাগ করুক। তারা তাই-ই করেছে। তাদের সুয়েজ ত্যাগের পেছনে এই-ই একমাত্র কারণ। বলা হয়ে থাকে যে, রাশিয়া বোমা পাঠাবার হুমকি দেয়ার ফলেই তারা সুয়েজ ত্যাগ করেছে। কিন্তু আমার জবাব হলোঃ না। সে হুমকির কোনো মূল্যই ছিলো না। রাশিয়া সীমান্তপারে বোমা পাঠালে, রাশিয়াকেও

www.pathagar.com

বোমার মোকাবিলা করতে হতো। যেখানে নৈতিক শক্তি দ্বারা একই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে, সেখানে কার্যকারণের ব্যাখ্যায় হুমকির কথা অবান্তর। বাগদাদ চুক্তিভুক্ত মুসলিম দেশগুলো বৃটেনের প্রতি মিশর থেকে সরে পড়ার দাবি জানিয়েছিল। আমরাও ওই দাবি জানিয়েছি। এ ব্যাপারে অনেকে অনেক বিদ্রূপ করেছেন, অনেকে উপহাসও করেছেন। কিন্তু কেন করেছেন, আমি জানি না। জানি না, মানুষ কেন এত রূঢ় হয়। জানি না, মানুষ কেন বন্ধুর প্রতিবাদ বা সবিনয় অনুরোধ-উপরোধের চেয়ে শত্রুর হুমকিকেই বড় বলে মনে করে।

আমার মতে আমি অটল। আমার মতে ভীত হয়ে তারা সুয়েজ ত্যাগ করেনি। সব পক্ষের এমনকি শূন্যদেরও নৈতিক চাপের ফলে তারা চলে গিয়েছে। কারণ সামরিক শক্তির দিক দিয়ে তারা 'শূন্য' হলেও অন্যান্য দিক থেকে শূন্য নয়। আমার পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো ঃ সব মুসলিম দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন।

সুস্পষ্ট যে, আমি একটি মাত্র উদ্দেশ্যেই মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করছি। মুসলিম দেশগুলোর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আপনা-আপনিই বিশ্বে একটি শক্তির অভ্যুদয় ঘটাবে। এই শক্তি সম্ভবত সামরিক শক্তির চাইতে বড় হবে এবং এই শক্তি সামরিক শক্তিকে যথাযথ পথে পরিচালিত করবে অর্থাৎ গঠনমূলক কাজের পথে পরিচালিত করবে।

হুমকির দ্বারা প্রভাবিত হয়নি

যা হোক, আমি বলছিলাম যে, আমরা বাগদাদ চুক্তির মুসলিম দেশগুলো একত্রে বসে আমাদের বন্ধু ও মিত্র রাষ্ট্র বৃটেনকে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করার আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছিলাম। সেক্ষেত্রে কি বুঝতে হবে যে, তারা আমাদের অনুরোধের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই ভিন্ন মহলের হুমকিকেই বড় করে দেখেছিলেন?

বন্ধুর অনুরোধে আপনারা কি কখনো কোনো কাজ করেননি? আপনারা কি কেবল হুমকির মুখোমুখি হলেই কোনো কাজ করেন? কারণ, আমার কাছে বন্ধুদের অনুরোধ, বন্ধুদের সবিনয়ে প্রার্থনা, বন্ধুদের সাথে আমার সম্পর্কের মূল্য–যাঁরা আমার বন্ধু নন, তাঁদের হুমকির চেয়ে অনেক বড়।

স্যার, বৃটেনের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ করা হয়েছে, সেগুলোর উত্তর দেবার জন্যে তারা এখানে নেই। আমরা সবাই বৃটেনের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস জানি। ভবিষ্যতের কথা উঠলে বৃটেনকে অবশ্যই কৃতিত্ব দিতে হবে। তারা একে একে সাম্রাজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করছে। তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সব দেশকে ক্রমে ক্রমে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদান করছে। এ বিষয়ে যদি আপনারা অন্যদের সঙ্গে তাদের তুলনা করেন, তবে কি তাদের পক্ষে বলার মতো একটি কথাও আপনাদের থাকে না? যারা জাতিসংঘ এবং ছোট-বড় সব দেশকে অমান্য করেছে, আর যারা নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হয়েও তার নির্দেশ অমান্য করে, অথচ তাদের হাতেই জাতিসংঘের মান-ইজ্জত। তাদের সাথে যখন আপনারা বৃটেনের তুলনা করেন, তখনো কি আপনাদের বলার কিছু থাকে না? আপনারা কি এ প্রশ্নে বৃটেনকে কোনোই কৃতিত্ব দিতে পারেন না। ইচ্ছে করলে তাঁরা মিসরে থেকেও যেতে পারতো, তাদেরকে চলে যেতে হতো না।

আমরা দেখেছি সংশ্লিষ্ট দেশ নির্দেশ পালন না করলে জোর করে তা মানাবার কোনো ক্ষমতাই জাতিসংঘের নেই। বৃটেন ও ফ্রান্স মিসরে থেকে যাওয়ার ইচ্ছে করলে তাদের চলে

www.pathagar.com

যেতে বাধ্য করার মতো কোনো ক্ষমতাই জাতিসংঘের হাতে ছিলো না। আজো ভারতের মতো একটি দুর্বল দেশও যখন বলে যে, তাঁরা জাতিসংঘ বাহিনীকে ভারতে আসতে দেবে না, কারণ তাদের মতে কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; তখন জাতিসংঘের পক্ষে অবস্থার দাস হয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কারণ, তারা ভালোভাবেই জানে যে, ভারতের আপত্তি ও আক্রমণাত্মক ব্যবস্থার মুখে ভারত-ভূমিতে জাতিসংঘের পক্ষে সৈন্য প্রেরণ অসম্ভব। কেবল সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সম্মতির পরই মিসরে জাতিসংঘের সৈন্যবাহিনী প্রেরণ ও মোতায়েন সম্ভবপর হয়েছে।

ভ্রমাত্মক

যাঁরা নিজেদের কোনো চুক্তি বা জোটের বিরোধী বলে জাহির করেন, তাঁদের মনোভাব সম্পর্কেও আমি কিছু বলা প্রয়োজন মনে করছি। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত বলে কথিত কয়েকটি বিবৃতি আমি এই পরিষদে পেশ করবো। ঐগুলো এখন আমার সঙ্গেই আছে। এই পরিষদের ভিতরে ও বাইরে আমার এত বক্তৃতা-বিবৃতির পরও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ভ্রমাত্মক কথাবার্তা বলেই চলেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে কি, তা আমার জানা নেই। কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, সংবাদপত্রের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করা আমার উচিত হবে না; আবার কেউ হয়তো বলবেন যে, আমি যে বিবৃতিগুলো পরিষদে পেশ করতে যাচ্ছি, তার অমুকটি বা তমুকটি তিনি দেননি, কারণ তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐগুলো ভারতীয় বেতার থেকেও বার বার প্রচারিত হয়েছে।

এই সুযোগে আমি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত বিবৃতিগুলোর প্রতিবাদ ও প্রত্যাহারেরই কেবল অনুরোধ জানাচ্ছি না, বরং আমি বিশ্ববাসীকে আমাদের বিরোধের প্রকৃতি এবং আমাদের বিরুদ্ধে কিভাবে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হচ্ছে আর আমাদেরকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে কিভাবে তুলে ধরা হচ্ছে তাও দেখাবার চেষ্টা করছি।

নয়াদিল্লী থেকে পরিবেশিত ও 'ডনে' প্রকাশিত এই রিপোর্টে বলা হয়েছেঃ 'প্রধানমন্ত্রী নেহরু আজ রাত্রে হায়দ্রাবাদে বলেন যে, পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য এবং দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রতি বৃটেনের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব করে সংঘর্ষের সৃষ্টি করতে পারে।'

এবার চিন্তা করে দেখুন। আমি নিশ্চিত যে, মিস্টার নেহরুর একথা যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের প্রতি আঘাতস্বরূপ হবে, যদি বলা হয় যে, তাঁরা দ্বি-জাতিতত্ত্বের সমর্থন যোগাচ্ছে। মিস্টার নেহরু ১০০ মিনিটকাল বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, 'দায়িত্বহীনদের (যেমন আমাদের) হাতে ক্রমাগত অস্ত্রশস্ত্র এসে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মীর প্রশ্ন গৌণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।'

'মিস্টার নেহরু জিজ্ঞাসা করেন, পাকিস্তান যে ভারতের বিরুদ্ধে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়?'

এই পরিষদ, মিস্টার নেহরু নিজে এবং পাকিস্তানের আর যাঁরা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে মাথা ঘামান, তাঁদের অবগতির জন্যে মিস্টার নেহরু আর কি বলেছেন আমি তার উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন, 'পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আণবিক অস্ত্রশস্ত্রসহ এই অস্ত্রশস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবেন।'

প্রত্যেকেই জানেন যে, আমাদের কোনো আণবিক অস্ত্রশস্ত্র নেই। তদুপরি আমি এই পরিষদেই ঘোষণা করেছি যে, আমরা মার্কিন সূত্রে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার

www.pathagar.com

করবো না, আমরা আমাদের বন্ধু ও মিত্র দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর এবং এইসব অস্ত্রশস্ত্র কোনো আক্রমণাত্মক যুদ্ধে ব্যবহার হবে না। এতদসত্ত্বেও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন, আমি আণবিক অস্ত্রশস্ত্রসহ এইসব অস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহারের প্রকাশ্য ঘোষণা করেছি।

পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য প্রদানের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মিস্টার নেহরু বলেন ঃ 'ভারতকেও তার অনেক জাতিগঠনমূলক পরিকল্পনা কাট-ছাঁট করতে হবে এবং সেই অর্থ পাকিস্তানের দিক থেকে বড় রকমের হুমকির মোকাবিলার জন্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্রসজ্জিত করার কাজে ব্যয় করতে হবে।'

বড় রকমের হুমকিই বটে!

তিনি বলেন, 'আমাদের সেনাবাহিনী (ভারতের সেনাবাহিনী) যথেষ্ট সুসজ্জিত এবং আমাদের যে অস্ত্রশস্ত্র আছে, তা, দেশের রক্ষব্যবস্থার কাজে লাগানো হবে।'

তিনি একই কথা এমনভাবে বারবার উল্লেখ করেছেন, যা থেকে মনে হয় যে, পাকিস্তান যেন আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুরু করার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে!

আমি অন্যত্রও বলেছি, সম্ভবত বিবেকের দংশনে অতিষ্ঠ হয়েই তিনি (নেহরু) এসব কথা বলছেন। কারণ, কাশ্মীর প্রশ্নে তাঁর মনোভাব এত প্রবঞ্চনাপূর্ণ যে, তিনি আর স্থির থাকতে পারছেন না। তিনি জানেন যে, পাকিস্তান বা কাশ্মীরের জনগণের ধৈর্যের বাঁধ একদিন না একদিন ভাঙ্গবেই এবং যুদ্ধের দাবানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠবেই। কিন্তু আমরা তাঁকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আমরা কোনো আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছি না।

এবার ভারতীয় বেতারে যে সংবাদটি প্রচার করা হয়, আমি তা পড়ছিঃ

'গতকল্য হায়দরাবাদের এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিস্টার নেহরু সামরিক চুক্তি ও সামরিক সাহায্যের নিন্দা করেন এবং বলেন যে, এতে যুদ্ধের বিপদ বৃদ্ধি পেয়েছে।'

মিস্টার নেহরুর কথায় আমি আশ্চর্য হইনি। তিনি কোনোদিনও রাশিয়ার ও তাঁর তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পাদিত 'ওয়ারশ' চুক্তির নিন্দা করেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। এটি এমন একটি কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ রক্ষা জোট যা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা কারো নেই। হাঙ্গেরীর মতো কেউ যদি বাইরে আসার চেষ্টা করে, তবে তাকে নির্মূল করা হবে। কারণ সেখানে রাশিয়া স্বীয় সাম্রাজ্যবাদ অক্ষুণ্ন রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি কোনোদিনও এই রুশ-চীন সামরিক জোটের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করতে শুনিনি। রাশিয়া সিরিয়ায় যে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করছে তার বিরুদ্ধেও একটি নিন্দাসূচক কথা মিস্টার নেহরুর মুখ থেকে নিঃসৃত হতে আমি শুনিনি। কিন্তু বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র যখন আমাদের কাছে আসে, তখনই তাঁর মুখ থেকে সামরিক চুক্তি ও সাহায্যের নিন্দা শোনা যায়। কারণ, তিনি নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম এবং তিনি বিপদগ্রস্তও নন। বিপদগ্রস্ত নয় এমন যে কোনো দেশই মনের সুখে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে; কারণ, তার ভয়ের কোনো কারণ নেই। কিন্তু আমাদের মতো একটি ক্ষুদ্র দেশের সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ও সামরিক সাহায্যলাভের বিরুদ্ধে তাঁর খেদের কারণ কি?

আমি এর আগেও বলেছি যে, নিজস্ব সম্পদে ভারত যে কোনো সংখ্যক 'ক্যানবেরা' (জঙ্গী বিমান), সেঞ্চুরিয়ান ট্যাংক ক্রয় করতে পারে, ৫ কোটি পাউণ্ড মূল্যে একটি নৌ-বহর

www.pathagar.com

খরিদ করতে পারে—যা আমি পূর্বে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। তাছাড়া তারা বিমানবাহী জাহাজ, ডেস্ট্রয়ার ও ক্রুজারও খরিদ করতে পারে। কিন্তু এসব কার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে, কেউ জানে না! এই কারণেই আমাদের প্রয়োজন বন্ধু—যাঁরা আক্রমণাত্মক যুদ্ধের সময় আমাদের রক্ষা করবেন।

কয়েকজন সদস্য বলেছেন সব দেশই নাকি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছে যে, ভারত আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুরু করলে সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রতি তাঁদের কোনো দায়িত্ব থাকবে না। এ প্রসঙ্গে তাঁরা নিউজিল্যাণ্ডের কোনো মহলের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা যে আমাদের সাহায্যার্থ যখন-তখন এগিয়ে আসবে, এমন আশা আমি প্রকাশ করিনি। কেবল কমিউনিস্ট আক্রমণের ক্ষেত্রেই অন্যেরা আমাদের সাহায্যার্থ এগিয়ে আসবে, একথাই আমি বলেছি। একটু পরেই এই বিষয়টি সম্পর্কে আমি বিশদ আলোচনা করবো। এখন ভারতীয় বেতার ঘোষণা প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাই। তাতে বলা হয়েছেঃ 'পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, আণবিক অস্ত্রসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে'। স্যার, আমরা আর কতদিন এই মিথ্যার বেসাতি শুনে যাবো?

মিস্টার নেহরু বলেনঃ 'এশিয়ায় শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে এভাবে পাকিস্তানে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের অর্থ তিনি বুঝতে পারেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে এই আশ্বাস দিয়েছে যে, পাকিস্তানে প্রদত্ত সামরিক সাহায্য ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার হবে না।'

এই আশ্বাস যুক্তিযুক্ত; তবে এ যে পাকিস্তান কর্তৃক আক্রমণের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হবে, মিস্টার নেহরু সতর্কতার সঙ্গে তা এড়িয়ে গিয়েছেন। আমাদের সদস্যরাও মিস্টার ডালেসের মন্তব্যের বিকৃত ও ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা পূর্বাপর সম্বন্ধ না রেখেই তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি একটি বিশেষ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই মন্তব্যটি করেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, পাকিস্তান আক্রমণাত্মক কাজে যদি ভারতের বিরুদ্ধে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে, সেক্ষেত্রে আমেরিকা কি করবে? জবাব সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেনঃ 'আমরা কয়েকটি শর্তসাপেক্ষেই পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছি এবং পাকিস্তান যদি সে সব শর্ত ভঙ্গ করে, সেক্ষেত্রে আমরা ভারতের পক্ষ অবলম্বন করবো।'

আমি পরিষদকে জানাতে চাই যে, এই জবাব যথার্থ জবাব। অথচ ভারত প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করতে ছাড়েনি।

এবার আসল কথায় আসা যাক্। তিনি (মিস্টার নেহরু) জানতে চেয়েছেন যে, যুদ্ধ সরঞ্জাম ব্যবহার সমাপ্ত হওয়ার পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তদন্ত শুরু করবে কিনা? তিনি বলেছেন, এজন্যেই ভারত সিয়াটো ও বাগদাদ চুক্তির ন্যায় সামরিক চুক্তির বিরোধী।

তিনি বলেছেন, দায়িত্বহীন ব্যক্তিদের হাতে আণবিক অস্ত্র প্রদানের পর পরিস্থিতি বেশি ঘোলাটে হয়ে উঠছে। বোম্বাইতে একটি রি-এ্যাক্টর স্থাপিত হওয়ার পরও এপর্যন্ত আমরা কোনো আণবিক রি-এ্যাক্টর পাইনি। তিনি দায়িত্বহীন লোক বলতে নিজেকেই বুঝিয়েছেন কিনা, তা আমার জানা নেই। বাস্তবিকই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের হাতে ব্যবহারের মতো কোনো আণবিক অস্ত্র নেই।

ভারতের প্রতি আমাদের মনোভাব কি হওয়া উচিত এবং প্রত্যুত্তরে আমাদের প্রতি ভারতের মনোভাব কি হওয়া উচিত, এ প্রসঙ্গে আমি কিছু বলতে চাই। চলতি মাসের শেষে

www.pathagar.com

ভারতের সাথে আমাদের বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কথা ছিলো। এই চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্যে আমাদের বাণিজ্যমন্ত্রী সম্প্রতি ভারতে গিয়েছিলেন। সেই সময় সেখানকার জনগণ 'পাকিস্তান-ভারত ভাই ভাই' ধ্বনি উচ্চারণ করেছিল। এর বিরুদ্ধেও এই পরিষদে অনেক মন্তব্য ও সমালোচনা হয়েছে। আমার মতে স্যার, এব্যাপারে আপত্তি তো দূরের কথা, এই-ই হওয়া উচিত আমাদের সত্যিকারের মনোভাব। কারণ, আমরা ভারতীয় জনগণের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নই। আমি জাতিতে জাতিতে শত্রুতা ও ঘৃণার ভাব সৃষ্টির পক্ষপাতী নই। কারণ, কাশ্মীর প্রশ্নে আমরা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থাতেই লড়ছি। সংঘর্ষ এখনো জনগণ পর্যন্ত গড়ায়নি। তবে আমাদের অন্তর ও মনোবলকে ইস্পাত-কঠোর করে তুলতে হবে। দুনিয়ার সমস্ত মধু ঢেলেও আমাদের পথ থেকে বিচ্যুত করা যাবে না, অর্থাৎ আমরা কাশ্মীরের ওপর দাবি ত্যাগ করছি না। কিন্তু এই অবসরে যদি আমরা ভারতীয় জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব ও আস্থার ভাব সৃষ্টি করতে পারি, তাতে ক্ষতির কি হলো? আমরা চিরকালের জন্যে পরস্পরের শত্রু নই। আমি আশা করি, অবশ্য আমার এই আশা দুরাশাও হতে পারে যে, ভারতের জনগণ নিজেরাই তাদের নেতাকে এসব মিথ্যার বেসাতি হতে নিবৃত্ত করবে এবং তারা নিজেরা সত্য ও সৎ মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্যাটি বিবেচনা করবে আর পাকিস্তানকে তার ন্যায্য পাওনা প্রদান করবে।

কাশ্মীর প্রশ্নে আমাদের বরাবরের নীতি কি ছিলো, কি জন্যে আমরা সংগ্রাম করছি এবং বর্তমান পরিস্থিতিই বা কি? যে নীতিতে ভারত বিভক্ত হয়েছে, সেই নীতিতেই কাশ্মীর আমাদের প্রাপ্য ছিলো এবং এখনো আছে। মহারাজার ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্তের আগেও কাশ্মীরের ওপর ভারতের শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো। কিন্তু কেন? কারণ, কাশ্মীর ভারতে না গিয়ে পাকিস্তানের অংশে পরিণত হোক আর তিনি ভারতে বহিরাগত হোন, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিস্টার নেহরু তা চিন্তাও করতে পারেন না। তাই, ন্যায্য পাওনা থেকে আমাদের বঞ্চিত করার জন্যে ভারত কাশ্মীর আক্রমণ করলো। কাশ্মীরে সংঘর্ষ বাধলো এবং বিষয়টি জাতিসংঘে গেল। ভারত বিভাগের ক্ষেত্রে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তাতে গণভোটের কোনো প্রশ্ন ছিলো না। জাতিসংঘ বন্ধুত্বপূর্ণ ও শান্তির পথে বিষয়টির ন্যায়সঙ্গত সুরাহার জন্যে রায় দিলেন যে, কাশ্মীর কোন্ রাষ্ট্রে যোগ দেবে-না-দেবে, তা সেখানকার জনসাধারণের ইচ্ছামাফিকই নির্ধারিত হবে। এভাবেই গণভোটের প্রশ্নটি আসে। তবে ন্যায়ের খাতিরে বলতে গেলে, কাশ্মীর যে পাকিস্তানের প্রাপ্য তাতে দ্বি-মতের কোনো অবকাশ নেই।

বিরোধের প্রথম থেকেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি মীমাংসার জন্যে বারবার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু মীমাংসার কোনো পথ বের করা সম্ভব হয়নি। কারণ কেউ যদি প্রথম থেকেই মনস্থির করে বসেন যে, তাঁর হাতে যা আছে তিনি তা কোনো অবস্থাতেই ছাড়বেন না, সেক্ষেত্রে কোনো মীমাংসাই সম্ভব নয়। অবশ্য, এ মনোভাব সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবেরই শামিল। বলা হয়েছে যে, তৃতীয় প্রস্তাবে কিছুই নেই—অথচ আমরা তাতে সম্মত হয়েছি। সদস্যরা যেটাকে দ্বিতীয় প্রস্তাব বলেছেন, আমি সেটাকে তৃতীয় প্রস্তাব হিসেবেই অভিহিত করবো। কারণ, প্রথম প্রস্তাবটিই ছিলো প্রকৃত প্রস্তাব এবং আমাদের জন্যে তার গুরুত্বও ছিলো অপরিসীম। প্রথম প্রস্তাবে যদি

www.pathagar.com

জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুমোদিত না হতো, প্রথম প্রস্তাবে যদি গণভোট ও অসামরিকীকরণের উল্লেখ না থাকত, প্রথম প্রস্তাবে যদি ভারতের এযুক্তি প্রত্যাখ্যাত না হ'ত যে, কাশ্মীর প্রশ্নের ইতি ঘটেছে; সুতরাং বিচার-বিবেচনার আর কিছুই নাই, তাহলে আমরা এক পাও অগ্রসর হতে পারতাম না। আমার মতে, প্রথম প্রস্তাব ছিলো আমাদেরই বিজয়ের সূচক এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা হয়েছে মাত্র। প্রথম প্রস্তাব এখনো বলবৎ আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? উভয় প্রস্তাবেই গণভোট ও অসামরিকীকরণের কথা আছে। তবে একটিতে কেবল এই পর্যায়ে জাতিসংঘ বাহিনী প্রেরণ না করার কথা আছে। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এখানেই।

১৯৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারির প্রস্তাবে পূর্বের প্রস্তাবগুলোও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মূল প্রস্তাব এড়িয়ে যাওয়া হয়নি। সম্প্রতি চীনা প্রধানমন্ত্রী সিংহল সফরে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের আলাপ-আলোচনা শেষে সিংহলী প্রধানমন্ত্রী আফ্রো-এশীয় দেশসমূহের কাছে প্রেরিত এক বাণীতে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ ব্যতীত পাকিস্তান ও ভারতের নিজেদের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁদের সকল প্রভাব কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন, একথা কে না জানে? প্রকৃত পরিস্থিতি কি, আমরা আফ্রো-এশীয় দেশসমূহকে তা জানিয়েছি। আমরা তাদের এও জানিয়েছি যে, চেষ্টা বহু হয়েছে; তবে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। এখন আর আমাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা নেই। ঐ পর্যায়ে যদি আমরা সাধারণ পরিষদে যেতাম, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই হেরে যেতাম। অমন ঝুঁকি নিতে পারি না। এই অবসরে আমাদের হাতে যে সময় আছে, তার মধ্যে আমরা কেবল জাতিসংঘের সদস্যবর্গকে ও বিশ্বের অন্যান্য জাতিকে প্রকৃত পরিস্থিতিই জানাতে সক্ষম হবো না, বরং তাদের কেউ কেউ যে পথ নিয়েছেন সে পথ থেকেও তাদের সরিয়ে আনতে সক্ষম হবো। এই অবসরে মিস্টার জেরিং-এর মিশনও ভারতের একগুঁয়েমির মুখোশ আরও উন্মোচন করবে বলেই আমি মনে করি। এতে আমাদের নৈতিক শক্তি আরো বৃদ্ধি পাবে।

এমন জাতিও হয়তো আছে, মহাপরাক্রমশালী ভারতকে ভয় করে; সেজন্যে বিশ্ব জনমতকে একটা নির্দিষ্ট পথে চালাতে হবে। এমন হতে পারে যে, এই পরিষদে উচ্চারিত সেই একক কণ্ঠের স্বরও যদি রাশিয়ার সিংহাসনে গিয়ে পৌঁছে, তাহলে হয়তো রাশিয়াও কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানকে সমর্থন করবে। সম্ভবত এই একক কণ্ঠও কার্যকরী হতে পারে। কারণ, কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানের দাবি সততা ও ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্যার, মিয়া মমতাজ দৌলতানা বলেছেন, এমন অবস্থা সৃষ্টির জন্যে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করতে হবে, যাতে আন্তর্জাতিক বিশ্বে প্রভাবের ক্ষেত্রে আমরা ভারতের সমকক্ষ হতে পারি। এই সমকক্ষতা আনয়নের উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, আমাদের মুসলিম দেশসমূহের সাথে দল গঠন করা উচিত। এ-ই হবে আমাদের নীতি, এ-ই হবে আমাদের প্রচেষ্টা। তাঁর বক্তব্য হলো, আমরা বৃটেনকে ত্যাগ করে পরে মুসলিম দেশগুলোর সাথে দল গঠন করি। কি অদ্ভুত যুক্তি। বাগদাদ চুক্তিতে আমরা ছাড়াও যে আরও দেশ আছে, তা তিনি ভুলে গিয়েছেন। তাদের নিজস্ব নীতি আছে, তাদের নিজস্ব গোষ্ঠী আছে। তুরস্ক, ইরাক ও ইরান আমাদের আদেশ পালনে বাধ্য নয়। প্রত্যেক মুসলিম দেশের নিজস্ব নীতি আছে, তাদের নিজেদের মধ্যে মত-পার্থক্য আছে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে রেষারেষিও

www.pathagar.com

আছে। সেজন্যেই আমি বলেছি যে, আমার নীতির প্রথম পদক্ষেপ হবে—মুসলিম দেশগুলোকে জোটবদ্ধ করার প্রচেষ্টার পরিবর্তে আলাপ-আলোচনার জন্যে তাদের এক জায়গায় একত্রিত করা। কারণ এই পারস্পরিক জানাশুনা থেকে এমন কিছু গড়ে উঠতে পারে, যা হবে যে কোনো জোটের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। অবশ্য আমরা প্রচেষ্টা চালালেই এই সব দেশকে একত্রিত করা যাবে, একথা সহজে মেনে নেয়া যায় না।

অপরপক্ষে, মিয়া ইফ্‌তেখারউদ্দিনের সেই একক কণ্ঠ থেকে অভিযোগ উঠেছে যে, আমাদের অনুসৃত নীতির ফলে মুসলিম বিশ্ব আমাদের শত্রু বনে গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শতকরা ৮০টি দেশ আমাদের বিরুদ্ধে এবং ভারতের পক্ষে। তিনি এসব তথ্য কোথায় পেয়েছেন, কেবল আল্লাহই জানেন। এটি এমন ধরনের প্রপাগাণ্ডা যা এতদিন আমাদের বিরোধীরাই একদিকে ভারত ও অপরদিকে কমিউনিস্ট দেশগুলোতে আমাদের বিরুদ্ধে চালিয়ে আস্‌ছিল। সম্ভবত সেই প্রপাগাণ্ডার ব্যাপকতা ও প্রাচুর্য দেখেই আমার বন্ধু মিয়া ইফতেখারউদ্দিন তা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন। এছাড়াও এই পরিষদে আরো অনেক কথা বলা হয়েছে। আপনারা যদি মুসলিম দেশগুলোকে অর্থাৎ পাকিস্তান, ইরান, ইরাক ও তুরস্ক এক সঙ্গে ধরেন তাহলে এই দেশগুলোর লোকসংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে বারো কোটি এবং আমাদের বাইরে থাকে আড়াই কোটি মাত্র। তারা আমাদের বিরুদ্ধে আছে, এ কথা আমি বলবো না। তারা আমাদের বাইরে আছে, এ কথাই আমি বলবো। অতএব দেখা যাচ্ছে, শতকরা আশিটি মুসলিম দেশ আমাদের বিরুদ্ধে আছে, একথা বলা অঙ্কের হিসেবেও ঠিক নয়। এমনকি, পাকিস্তানের জনসংখ্যা বাদ দিলেও এ কথা বলা ঠিক হবে না। তারা যে আমাদের বিরুদ্ধে আছে, এই তথ্য তিনি কোথায় পেলেন, আমি তাঁকে এই কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। তাঁর এই ধারণার কারণ এই যে, বাগদাদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করার সময়ও আমাদের সরকার দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন; তাঁরা কোনো সময় পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সাহসী হননি, তাঁরা নিজেদের প্রতি আস্থাবান ছিলেন না। ফলে, এই চুক্তি সম্পর্কে মুসলিম দেশসমূহে ভয়ানক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে।

আমি জোরের সঙ্গে দাবি করতে পারি যে, অধিকাংশ আরব দেশ আজ আমাদের সঙ্গে আছে এবং আমাদের সমর্থন করছে। তারা আমাদের অবস্থা বুঝতে পেরেছে এবং আমাদের বাগদাদ চুক্তিতে যোগদানের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পেরেছে—যদিও নিজ নিজ অসুবিধার কারণে তারা তাতে যোগ দিতে অক্ষম। নজির হিসেবে বলা যায় যে, আরব দেশগুলো এই জন্যেই এতে যোগ দিতে চায় না যে, তারা এখনো 'আরব-ঘোড়া' সাম্‌লানোর কাজেই ব্যস্ত। তারা এখনো মনে করে যে, আরব দেশগুলোর একত্রিত হওয়া উচিত, অথচ মুসলিম দেশ হলেও অন্য কোনো দেশের তাদের কোনো চুক্তিতে যোগ দেয়ার অধিকার নেই।

ইরাক বাগদাদ চুক্তির অন্যতম সদস্য—কয়েকটি আরব দেশের বাগদাদ চুক্তির বিরোধিতার অন্যতম কারণও এই। এছাড়াও তাদের নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে মত-বিরোধ ও রেষারেষি বিদ্যমান। কিন্তু একথা সত্য যে, তারা আজ আমাদের কাজের যথার্থতা উপলব্ধি করতে পেরেছে। আমি আপনাদের একটি বাণী পাঠ করে শুনাবো, যা এইমাত্র আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। কয়েকটি আরব দেশ আমাদের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করে, তা দেখাবার জন্যেই আমি এটি পড়তে চাই। মিসর, সিরিয়া, জর্দান ও সৌদী-আরব

www.pathagar.com

এই চুক্তির বিরোধী বলে বিশ্বাস করা হয় এবং তারা একটি ব্লক গঠন করেছে; কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই নীতি অনুসরণ করে বলেই একে ব্লক বলা যেতে পারে না। কারণ এই দেশ চারটিও একে অপরকে দেখতে পারে না। এসব দেশ ছাড়াও আরো আরব দেশ রয়েছে যার মধ্যে একটি হলো মহান নেতা বরগুইবার নেতৃত্বে পরিচালিত তিউনিসিয়া। তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন যে, কাশ্মীর প্রশ্নে তিউনিসিয়া আমাদের পক্ষ অবলম্বন করবে। লিবিয়া ও সুদানের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য।

সৌদী আরবের সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ। কেবল গতকালই আমরা তাদের সাথে একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছি। পাকিস্তানের সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন এবং পাকিস্তানের প্রতি সৌদী আরবের বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সৌদী আরবের বাণিজ্যমন্ত্রী আবদুল রিজা ২/৩ দিন আগে নিজেই পাকিস্তানে এসেছেন।

সৌদী আরবের বাদশার অতিথি হিসেবে আমাদের প্রেসিডেন্ট দুই দিন রিয়াদে অবস্থান করেন এবং তাঁরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি যে বাণীটি প্রেরণ করেছেন, আমি তা পড়ে শুনাচ্ছি। সৌদী আরবের পররাষ্ট্র বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেলের মাধ্যমে প্রেরিত এই বাণীতে বাদশা বলেছেন, 'কাশ্মীরের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের ব্যাপারে সৌদী আরব সর্বতোভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করবে।'

প্রিন্স ফয়সলের বাণীটিও আমি পড়ে শুনাচ্ছি, 'এই ব্যাপারে সৌদী আরবের সাহায্য চাওয়ায় আমরা পাকিস্তানের কাছে কৃতজ্ঞ। পাকিস্তানের মঙ্গল ও স্বার্থে আমরা যে কোনো কিছু করতে দ্বিধাবোধ করবো না।'

সৌদী আরবের পররাষ্ট্র দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল আমাদের রাষ্ট্রদূতকে বলেছেনঃ 'পাকিস্তান ও সৌদী আরবের মধ্যকার সম্পর্ক দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।' তিনি মুসলিম দেশসমূহের স্বার্থে পাকিস্তানের অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি আরো বলেছেন যে, 'এই চুক্তিতে যোগদানের জন্যে কোনো সময়ে পাকিস্তানের সমালোচনা করা হয়নি এবং চুক্তিতে পাকিস্তানের যোগদানের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যাচ্ছে।'

স্যার, মুসলিম দেশসমূহকে আমাদের পক্ষে আনা এবং ভুল বোঝাবুঝি ও অহেতুক আশঙ্কা দূরীকরণের ব্যাপারে এই সামান্য অবদান যদি আমার থাকে, তাহলে আমি মনে করব যে, আমি আমার সরকারের পররাষ্ট্র নীতির প্রতি সুবিচারই করেছি।

একই ভদ্রলোক বলেছেন যে, কাশ্মীর আগের যে কোনো সময় অপেক্ষা আজ অনেক বেশি দূরে সরে গিয়েছে। কাশ্মীরের অতীত ইতিহাস নিয়ে আমি ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই না অথবা কার দোষে আমরা আজ হাবুডুবু খাচ্ছি এবং হাতের কাছে পেয়েও কেন আমরা কাশ্মীর ছেড়ে দিয়েছি, সে সম্পর্কেও কিছু বলতে চাই না। সে সব অতীতের ইতিহাস। অতীতের সব ভুলের প্রায়শ্চিত্তই আজ আমাদের কাম্য। কাশ্মীরের জনগণ যাতে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে, সেজন্যে সর্বপ্রথমে চেষ্টা করতে হবে।

স্যার, আমি অনেক সময় নিয়েছি সেজন্যে আমি দুঃখিত। আমি আর মাত্র ১০ মিনিট সময় নেবো। মিয়া ইফতেখারউদ্দিনের কথাগুলো আমাকে সব সময় আমাদের পররাষ্ট্র নীতির সঠিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় সাহায্য করে। তিনি বলেছেন ঃ 'আসুন, আমরা এই বিচ্ছিন্নতা থেকে বেরিয়ে পড়ি।' কিন্তু কথা হলো, আজকের এ বিচ্ছিন্নতা কেমন বিচ্ছিন্নতা?

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্নতা এই জন্যে যে, আমাদের বিরুদ্ধে একটি 'ভেটো' রয়েছে। আমরা বন্ধুদের ছেড়ে এই 'বিচ্ছিন্নতা' থেকে বেরিয়ে আসতে পারি; কিন্তু তখন যে অবস্থা দাঁড়াবে, তা হবে বন্ধুদের বিচ্ছিন্নতারই নামান্তর। সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদিগকে অন্যদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বন্ধুত্বের জন্যে ভিক্ষা মাগতে হবে। কারণ, তখন আমরা সম্পূর্ণ বন্ধুহীন হয়ে পড়ব। এই নীতিই মিয়া ইফতেখারউদ্দিন আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এসব চুক্তি ত্যাগ করুন এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে বেরিয়ে পড়ুন।' কারণ, রাশিয়া ও অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।

স্যার, আমার বক্তব্য হলো, আমরা বিচ্ছিন্ন নই। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শুভেচ্ছা সফরে আমি চীনে যাই। কারণ, আমি এ কথাই পরিষ্কারভাবে বোঝাতে চেয়েছি যে, পৃথক পৃথক শিবিরে অবস্থান করলেও কোনো অবস্থাতেই আমরা পরস্পরের শত্রু নই এবং আমি চীনের বন্ধুত্ব কামনা করি। আমরা আদৌ বিচ্ছিন্ন নই। আমি স্থির নিশ্চিত যে, সঙ্কটকালে চীন আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবেই। তারা এরই মধ্যে তার প্রমাণও দিয়েছে।

'কাশ্মীর সম্পূর্ণরূপে ভারতের এবং সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না'—এই মর্মে যে বিবৃতিগুলো দেয়া হয়েছিল, সেগুলো আজ কোথায়? ভারতভূমিতে অবস্থানকালে রাশিয়ার দুই নেতা যে দ্ব্যর্থহীন বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা থেকে আজ রাশিয়া সরে পড়েছে। একটি বিরোধ যে আছে এবং তার যে মীমাংসার প্রয়োজন এবং ভারত যে কাশ্মীরের একচ্ছত্র প্রভু ও অধিকারী নয়—এই কথা আজ তাঁরাও স্বীকার করছেন।

বলা হয়েছে যে, কাশ্মীরের ওপর আমাদের দাবি আজ নস্যাৎ হতে বসেছে। বস্তুত এটি একটি অসত্য ভাষণ। পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা সজাগ আছি, আমরা মোটেই অসাবধান নই। আমরা যখন রাশিয়া বা চীনের বিরোধী নই এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণের কোনো ইচ্ছেও যখন আমাদের নেই, তখন তারাই বা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে কেন? এগুলো নৈতিক প্রশ্ন। সমগ্র বিষয়টি এখন আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে রয়েছে। স্বভাবতঃই আমাদের এখন বিশ্ববাসীর বিবেক উজ্জীবিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের লক্ষ্যও তাই। আমরা ন্যায়বিচারের জন্যে সেখানে গিয়েছি এবং কোনো দেশ যদি বিশ্ববাসীর বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার প্রতিফল ভোগ করবে তারাই—আমরা নই।

মিয়া ইফতেখারউদ্দিনের মনে একটি ভুল ধারণা বিদ্যমান; অন্য কয়েকজন সদস্যের মনেও অনুরূপ ভুল ধারণা আছে বলে মনে হয়। মিয়া সাহেবের মতো যাঁরা মনে করেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধেই আমরা বিভিন্ন চুক্তিতে শরীক হয়েছি, আমি কেবল তাঁদের কথাই বলছি। তিনি বলতে চেয়েছেন, আমরা যদি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধেই চুক্তিতে শরীক হয়ে থাকি, তাহলে সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্তানকে সমর্থন করতে যাবে কোন্ দুঃখে? তিনি ঠিকই বলেছেন। চুক্তি যদি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হয়ে থাকে, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক দূরভিসন্ধি নিয়েই যদি তা রচিত হয়ে থাকে, তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন আমাদের সাহায্যার্থ এগিয়ে আসবে কেন? কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, এ চুক্তি আমাদের আত্মরক্ষামূলক। সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি আমাদের আক্রমণ করে, কেবল সেক্ষেত্রে এই চুক্তিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে, অন্যথায় এ চুক্তি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নয়।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। কোনো কাজ যতক্ষণ পর্যন্ত শান্তির সহায়ক, ততক্ষণ পর্যন্তই কেবল আমরা সমর্থন করবো। আমরা অনেক মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ এবং জাতির জীবনে সে সব চুক্তির তাৎপর্য রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আমি 'যুদ্ধ নয়' ঘোষণা বা অনাক্রমণ চুক্তির দুই একটি নজির দিতে চাই। আমরা প্রথমাবধি ভারতের সাথে 'যুদ্ধ নয়' ঘোষণার প্রস্তাব করে আসছি। কারণ, ভারতই একমাত্র দেশ, যার সাথে আমাদের বিরোধ রয়েছে। আমি আমার পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে এই জন্যে কৃতিত্ব দিচ্ছি যে, তিনি ভারতের সাথে একটি 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি সম্পাদনের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে একটি মাত্র শর্তই তিনি আরোপ করেছিলেন। শর্তটি খুবই ন্যায়ানুগ। ভারতকে সব বিরোধের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সালিস বা মধ্যস্থতা মেনে নিতে হবে। কিন্তু ভারত তাতে সম্মত হয়নি।

তাহলে এই কি সেই মহান আন্তর্জাতিক নেতার নীতি যিনি শান্তির বাণী প্রচার করেন এবং সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরোধিতা করেন?

ভারতের সাথে যদি আমাদের সব বিবাদ মিটে যায়, তাহলে আমি সে দেশের সাথে যে কোনো রকমের চুক্তি করতে, এমনকি জাতীয় সেনাবাহিনী পর্যন্ত ভেঙ্গে দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু ভারতের সাথে বিরোধ বিদ্যমান থাকা অবধি আমাকে অবশ্যই সব রকমের বন্দোবস্ত করতে হবে।

স্যার, বলার অনেক কিছুই আছে; কিন্তু আমি এই বলে আমার বক্তৃতা শেষ করতে চাই যে, জাতিসংঘের প্রতি আমাদের মনোভাবই হলো কাশ্মীর প্রশ্নে দাবির শেষ পুঁজি। জানি না, স্যার, কতদিন আর আমি এ পদে থাকবো, জানি না, তখন আমি বেঁচে থাকবো, না মাটির বুকে আশ্রয় নেবো। তবে নিজের পক্ষ থেকে ও দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে একথাই বলতে চাই যে, কাশ্মীরী জনগণকে তাঁদের নিজস্ব মতামত প্রকাশের অধিকার দিতেই হবে এবং সে অধিকার আদায়ে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এবং গভীরভাবে আমরা এই আশাই পোষণ করি যে, কাশ্মীর পাকিস্তানের পক্ষেই মত প্রকাশ করবে। কেবল তখনই পাকিস্তান পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হবে।

জনৈক মাননীয় সদস্য আর একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। সেটা হলো, আমরা যদি সুয়েজ খাল ব্যবহারকারীদের সম্মেলনে থেকে যেতাম, তাহলে হয়তো সুয়েজ খাল বিরোধের সন্তোষজনক সমাধানের ব্যাপারে আমাদের বেশি অবদান থাকতো।

স্যার, আমার মতে, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তাও বিবেচনার যোগ্য; তবে সুয়েজ খাল সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা কত দূর কি করতে সক্ষম, তার ওপরই আমাদের সুয়েজ খাল ব্যবহারকারীদের সম্মেলনে থাকার প্রশ্ন নির্ভরশীল। বিষয়টির সাথে জড়িত রয়েছে সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। কিন্তু সার্বভৌম বলেই আপনি সমস্ত চুক্তি খেয়াল খুশিমতো বাতিল করতে পারেন না—যে চুক্তি আপনি নিজে অন্যান্য শক্তির সাথে করেছেন। সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে আপনি অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপও করতে পারেন না—যেমন এক্ষেত্রে করা হয়েছে। প্রত্যেক সার্বভৌম অধিকারই অন্যদের অনুরূপ অধিকার এবং সার্বভৌম অধিকারবলে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী অন্যদের প্রদত্ত অধিকারে সীমিত। সুতরাং সার্বভৌম অধিকারের অর্থ এই নয় যে, আপনি তার মাধ্যমে প্রত্যেককে এবং বিশ্বজনমতকে অগ্রাহ্য করবেন।

www.pathagar.com

ইসরাইলকে কখনো স্বীকৃতি দেবো না

ইসরাইল সম্পর্কে একটি কথা ঃ এ বিষয়ে আমাদের নীতি সম্পর্কে আমি একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। আমরা একে (ইসরাইলকে) স্বীকার করিনি এবং কোনোদিনও করবো না। আমি একে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলেই মনে করি। আমরা রাশিয়াসহ সমগ্র বিশ্বের জন্যে পাসপোর্ট দিয়ে থাকি; কিন্তু ইসরাইলের জন্যে দিই না।

এটাই আমাদের নীতি। বলা হয় যে, ইসরাইলকে ভিত্তি করেই আরব জগতের রাজনীতি চলে। নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে আরব দেশগুলো যে কিভাবে ইসরাইল প্রশ্ন ব্যবহার করে, তা ভেবে আমি আশ্চর্য হই। তবে তা তাদের অন্তরের কথা কিনা, আমি জানি না। একথা সত্যি যে, ইসরাইলের সাথে তাদের একটা মীমাংসায় আসতে হবে এবং ফিলিস্তিন সমস্যার অবশ্যই একটা সমাধান করতে হবে। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, ইসরাইল ও তার বন্ধুদের প্রতি তাদের মনোভাব কি? যে মিসর নিজেকে আরব স্বার্থের ও ইসরাইল-বিরোধী স্বার্থের পূজারী বলে দাবি করে, সেই মিসরই যখন ইসরাইলকে স্বীকৃতি দানকারী ও ইসরাইলের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনাকারী ভারতের সাথে বন্ধুত্ব করে, জাতিসংঘ বাহিনীর অংশ হিসেবে নিজ ভূমিতে পাকিস্তানী সৈন্যের পরিবর্তে ভারতীয় সৈন্যকে পছন্দ করে, তখনো কি আমি বলবো যে, ইসরাইলকে ঘিরেই আরব রাজনীতি আবর্তিত হয়? আমি দুঃখিত যে, আমি তা বলতে পারি না। আমার মতে, আরব দেশসমূহের সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা উচিত।

বন্ধু জনাব দৌলতানার মতো আমি অবাস্তববাদী হতে পারি না। তিনি বলেছেন, মুসলিম দেশসমূহের মতভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। প্রত্যেক মুসলিম দেশেরই আলাদা আলাদা আনুগত্য আছে। কেউ এ ব্লকে, কেউ সে ব্লকে, আবার কেউ হয়তো কোনো ব্লকেই নেই। তাছাড়া, তাদের নিজেদের মধ্যেও বিবাদের অন্ত নেই। আজ শুনি সিরিয়া লেবানন আক্রমণের চেষ্টা করেছে, কাল শুনি সিরিয়া, সৌদী আরব ও ইরাকের সেনাবাহিনী জর্দানের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার সময় আমাদের এসব ঘটনাও বিবেচনা করতে হবে।

খালের পানি সমস্যা

স্যার, খালের পানি বিরোধ সম্পর্কে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে, এ আমাদের পররাষ্ট্র নীতিকে কতখানি প্রভাবিত করবে, তা আমার জানা নেই। এই সমস্যার সাথে পাকিস্তানের জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত।

স্যার, একথা পরিষ্কার যে, ভারত আম্বালা বিভাগ বা মরুভূমিতে পানি সেচের জন্যে বেশি পানি চায়। কিন্তু তারা পাকিস্তানের মধ্যে প্রবাহিত নদী থেকে পানি টানতে চায় কোনো যুক্তিতে? পাকিস্তানকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায় তারা কোনো অধিকারে? তাদের যদি পানির দরকার থাকেই, সেক্ষেত্রে তাদের একমাত্র করণীয় হলো ঃ নিজেদের ভূমিতে নিজেদের অর্থেই হেডওয়ার্ক, বাঁধ ও জলাশয় নির্মাণ করা।

অতীতে আমাদের কোনো কোনো নেতা অনেক গুরুতর ভুল করেছেন। সেই ভুলের মাশুল হিসেবে পাকিস্তানকে কোনোক্রমেই অধিকার বঞ্চিত করতে দেয়া হবে না। এই-ই আমাদের শেষ কথা। কাশ্মীর ও খালের পানি সমস্যার ন্যায্য, সুবিচারমূলক ও যুক্তিযুক্ত সমাধান হতেই হবে। বাঁচার জন্যে পাকিস্তানকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতেই হবে।

www.pathagar.com

জনাব ফরিদ আহমদের বক্তৃতা শোনার সময় আমার ইচ্ছে করছিল, তাঁকে আমাদের দলে যোগদানের আহ্বান জানাই। কারণ তিনি যা বলেছেন, তা সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত আওয়ামী লীগেরও মূলমন্ত্র তাই—যে আওয়ামী লীগের আমি একজন নগণ্য খাদেম।

স্যার ঃ আমি এতক্ষণে যদি কিয়ৎ পরিমাণেও সে সব ভণ্ড লোকের মুখোশ উন্মোচন করতে পেরে থাকি, উঠতে-বসতে যাঁদের মুখে বিশ্বশান্তি, সুবিচার, জাতিসংঘ, উপনিবেশবাদ বিরোধিতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার খই ফোটে; আমি যদি বাগদাদ চুক্তির সদস্যদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করতে পেরে থাকি এবং তাঁদের যদি এ আশা দিতে সমর্থ হয়ে থাকি যে, বাগদাদ চুক্তি টিকে থাকবার জন্যেই এসেছে; তাঁদের যদি বুঝাতে পেরে থাকি যে, আমাদের সবার লক্ষ্য এক অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির নিশ্চয়তা বিধান, বিশ্বশান্তির নিশ্চয়তা বিধান করা এবং নিজেদের আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব স্বাধীনতা বজায় রাখা। আমি যদি আমাদের বিপদে অর্থাৎ কাশ্মীর সমস্যায় তাঁদের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন লাভ করতে সমর্থ হয়ে থাকি, যদি আমি অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সমর্থন সংগ্রহে সমর্থ হয়ে থাকি, তবেই আমি মনে করবো, আমি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিছু অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছি ও বিশ্ব সংস্থায় যথাযথভাবে পাকিস্তানের সমস্যা তুলে ধরতে পেরেছি যা আমাদিগকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাবে।

আমরা যদি বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের ভয়-ভীতিকে তোয়াক্কা না করে ক্ষুদ্রতর জাতিসমূহের স্বার্থে কাজ করে ন্যায় ও সুবিচারের পক্ষে বিশ্বজনমত জাগ্রত করতে পেরে থাকি; যদিও বিশ্বসংস্থা আজও পুরাপুরি সেই আদর্শে উপনীত হতে পারেনি, আমরা যদি সেই লক্ষ্যের পথে কিছুটাও এগোতে পেরে থাকি, তাহলে বুঝতে হবে আমরা আমাদের সত্তার প্রমাণ দিতে পেরেছি।

স্যার, আমাদের নীতির মাধ্যমে যদি আমরা জাতিসংঘের হাতকে শক্তিশালী করে থাকি, আমরা যদি তার মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা সার্থকভাবে চালাতে পেরে থাকি, আমরা যদি প্রমাণ দিতে পেরে থাকি যে, আমরা 'এ' ব্লক বা 'বি' ব্লকের ভয়ে ভীত নই, আমরা যদি সুয়েজের ব্যাপারে বৃটেনের ও হাঙ্গেরীর ব্যাপারে রাশিয়ার নিন্দা করতে পেরে থাকি এবং পরে নিজেদের অপরাধী মনে করে যদি প্রদত্ত বিবৃতি প্রত্যাহার না করে থাকি, আমরা যদি ইসলামের মহান নীতি, ন্যায়বিচার ও ন্যায়ানুগতার পথে অবিচল থেকে থাকি—তাহলে আমি মনে করবো, আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। আমরা যদি দেশকে হতাশামুক্ত হওয়ার ব্যাপারে নেতৃত্ব দিতে কিছুটাও সক্ষম হয়ে থাকি, জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে আমাদের যদি এতটুকুও দান থেকে থাকে এবং জাতিকে যদি আমি নিশ্চিন্ত করতে পেরে থাকি যে, প্রতিপক্ষ নিজেকে যত শক্তিশালীই মনে করুন না কেন, পাকিস্তানের অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার মতো ক্ষমতা তার নেই, জাতি যদি আজ আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি আত্মপ্রত্যয়ী ও দৃঢ়চিত্ত বলে মনে করতে পেরে থাকে, বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানকে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে উন্নীত করার ব্যাপারে আমার সরকারের যদি কিছুমাত্র দান থেকে থাকে এবং সর্বোপরি নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্যে জনগণকে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে আমি যদি সত্যিই উদ্বুদ্ধ করতে পেরে থাকি, তবেই জানবো, সরকারের পররাষ্ট্র নীতির প্রতি পরিষদের সমর্থন চাইবার অধিকার আমার আছে।

www.pathagar.com

'আমি অধীর আগ্রহে সেই বাঞ্ছিত দিনটিরই প্রতীক্ষা করছি, যেদিন...'

[জীবনে সময়ের মূল্য সম্পর্কে যিনি ছিলেন সদা-সচেতন, কর্মব্যস্ততাই ছিলো যাঁর জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৫৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সুদূর কাগমারী থেকে ঐদিন ঢাকার সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রদের আমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে তাঁকে হেলিকপ্টারযোগে সরাসরি এস.এম হল প্রাঙ্গণে অবতরণ করতে হয়। সেদিনকার সে সম্বর্ধনা সভায় ছাত্ররা জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে পররাষ্ট্র নীতির ওপর বক্তৃতার অনুরোধ জানান। পরক্ষণেই তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর সে বক্তৃতা বেতারে প্রচার করা হবে। একে তো পররাষ্ট্র নীতি, তার ওপর আবার বেতারে প্রচারের ব্যবস্থা—দুই মিলে বেশ চিন্তার কারণ ঘটালেও অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী, বুদ্ধিজীবী ও বিদেশী কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী কোনো কাগজপত্রের সাহায্য না নিয়েই মৌখিকভাবে ছাত্রদের উদ্দেশে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতির ওপর দীর্ঘ ৬৫ মিনিটব্যাপী যে সারগর্ভ আলোচনা করেন, তা সর্বমহলে তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতা হিসেবেই স্বীকৃতি পায়। নিম্নে সেই বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হলোঃ]

আমি কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করছি। এইমাত্র আমাকে বলা হলো যে, আমার বক্তৃতা বেতারযোগে প্রচার করা হবে। এ-কথা আগে জানলে আমি একটি লিখিত বক্তৃতা নিয়ে আপনাদের সামনে আসতাম। স্বভাবতঃই কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই আমাকে এখন বক্তৃতা দিতে হবে। বক্তৃতার বিষয়বস্তুটি আবার অসম্ভব রকমে গুরুত্বপূর্ণ, এ অবস্থায় আমার বক্তৃতা তেমন যুক্তিপূর্ণ হবে কিনা সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হতে পারছি না। আপনারা আমাকে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে বলতে অনুরোধ জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্রদের অভিনন্দন জানাতে চাই। আমি তাদের অভিনন্দিত করি এই জন্যে যে, পড়াশোনার বাইরেও বিভিন্ন অঙ্গনে তাঁরা নিজেদের ব্রতী রেখেছেন এবং সমাজ সেবার বিভিন্ন দিকে আত্মনিয়োগ করেছেন। আশা করি, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাও আপনাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন। যদি তাঁরা তা করেন, তবে আমি তাঁদের নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারি যে, আমার কাছ থেকে তাঁরা যথাসম্ভব উৎসাহ পাবেন।

পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে জনসভায় বক্তৃতা দেয়া সাধারণ রীতি নয়। তাই অনেক বিষয়ে আমাকে অত্যন্ত সতকর্তার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। কোথাও কোথাও কেবল আভাসেই কাজ করতে হবে এবং আপনাদের কাছে এমন অনেক কথা গোপন রাখতে হবে যা পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে আমাদের সরকারকে প্রভাবিত করছে। তবে আশা করি, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আমি আপনাদের কাছে একটি সঠিক ও মোটামুটি বিবরণ পেশ করতে পারবো যা থেকে আপনারা আমাদের পররাষ্ট্র নীতি এবং এর মূলীভূত কারণগুলো অনুধাবন করতে পারবেন।

www.pathagar.com

চারটি প্রধান প্রতিপাদ্য

প্রথমত, আমরা স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করতে যাচ্ছি বলে খোলাখুলি সুস্পষ্টভাষায় আমি যে ঘোষণা করেছি, আপনাদের নিশ্চয়ই সে কথা স্মরণ আছে। আমাদের পররাষ্ট্র নীতি কোনো বড় বা ছোট রাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা হবে না এবং আমরা যা কিছুই করবো, তা সততা ও আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতির দিকে নজর রেখেই করবো।

দ্বিতীয়ত, আমাদের পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য হবে সারা দুনিয়ায় শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করা ও আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে শান্তি অক্ষুণ্ন রাখা। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস করার ব্যাপারেও আমরা আমাদের সাধ্যমতো কিছু একটা করতে পারবো বলে আমি আশা করি।

আমরা জাতিসংঘ সনদের সকল নীতি এবং জাতিসংঘকে সর্বতোভাবে সমর্থন করবো। আমাদের পররাষ্ট্র নীতির আরেকটি লক্ষ্য হবে, আমাদের রাজনৈতিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা। দেশের রাজনৈতিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার সঙ্গে দেশের সবকিছু জড়িত। এই আদর্শকে ভিত্তি করেই আমাদেরকে পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

আমাদের রাজনৈতিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার সবচেয়ে উত্তম পন্থা কি, সে সম্বন্ধে কিছুটা মতভেদ আছে। এ সম্পর্কে এক দলের মত হচ্ছে নিরপেক্ষ থাকাই সবচেয়ে ভালো পন্থা। আর এক দলের মত হচ্ছে, কোনোদিক থেকে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হলে যে সব রাষ্ট্র আমাদের সাহায্য করবে সেই সব রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করাই বাঞ্ছনীয়।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

এ দু'টি পন্থার মধ্যে কোনোটি আমাদের দেশের পক্ষে সবচেয়ে কল্যাণকর তা যাতে আপনারা নিজেরাই স্থির করতে পারেন, সে জন্যে আমি এ দু'টি বিষয় বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করবো। প্রথমত, পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কি তা দেখা যাক। জনসংখ্যার দিক দিয়ে আমাদের দেশ একটি বড় দেশ। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের দেশ অনুন্নত এবং সামরিক দিক দিয়ে দুর্বল। এ অবস্থায় আমাদের রাজনৈতিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে আমাদের কি নীতি অবলম্বন করা উচিত? প্রথমে ধরা যাক, আমরা যদি নিরপেক্ষ থাকি তাহলে কোনো যুদ্ধে আমাদের জড়িয়ে পড়ার বিপদ খুব কম এবং আমাদের ওপর আক্রমণের আশঙ্কা আরও কম। এক্ষেত্রে এখানে নিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকা। এক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের ভাবতে হবে, বিশ্বব্যাপী আণবিক যুদ্ধের আদৌ কোনো সম্ভাবনা আছে কি? আমার মতে, বর্তমানে সে রকম কোনো বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে না।

বিশ্বে দু'টি ব্লক এমনভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে এবং অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে তারা এমন শক্তিশালী যে, তারা শুধু নিজেদের শক্তি সম্পর্কেই অবহিত নয়, তাদের প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কেও তারা ওয়াকিবহাল। তারা জানে, যদি একটা বিশ্বব্যাপী আণবিক যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহলে উভয় ব্লকই ধ্বংস হয়ে যাবে। এ যুদ্ধে কেউ জয়ী হতে পারবে না—বিজিত বলেও কেউ থাকবে না। কারণ, উভয় পক্ষই নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে। এ অবস্থায় এটা কি আদৌ সম্ভব যে, এ দু'টি ব্লক পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে? হবে না বলেই সঙ্গতভাবে আশা করা যায়। অতএব, যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার অর্থ নিরপেক্ষতার কোনো তাৎপর্য নেই।

www.pathagar.com

কিন্তু যুদ্ধের আশঙ্কা কি সম্পূর্ণ দূর হয়েছে? এক্ষেত্রেও ধরে নেয়া যায়, না, তা হয়নি। প্রচলিত সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পৃথিবীর এখানে-সেখানে যুদ্ধ বাধতে পারে।

আমরা লক্ষ্য করেছি, বিভিন্ন আঞ্চলিক যুদ্ধে উপরোক্ত ব্লক দু'টি পরোক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে, তবে তারা পরস্পরকে সরাসরি আক্রমণ করেনি। এ অবস্থায় যদি আঞ্চলিক যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে আমাদের নীতি কী হবে? ধরা যাক, আমরা নিরপেক্ষ রইলাম।

নিরপেক্ষতার তত্ত্বকথা

কেউ কেউ আমাদের বলেনঃ যদি আপনারা নিরপেক্ষ থাকেন, তবে আপনারা দু'দিক থেকেই লাভবান হবেন। আপনারা এক পক্ষকে আর এক পক্ষের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিতে পারবেন। আমার মতে, সাধারণভাবে বলতে গেলে, এরূপ নিরপেক্ষতাকে ভয় দেখিয়ে কাজ আদায়ের এক ধরনের চেষ্টা বলা যেতে পারে। এই নীতির আসল কথা হচ্ছেঃ কোনো একটি বিশেষ ব্লকের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না; বরং এক ব্লককে অন্য ব্লকের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করুন। আমেরিকার কাছে গিয়ে বলুনঃ তুমি যদি আমাদের সাহায্য না করো, তাহলে আমরা চললাম রাশিয়ার কাছে। তারপর রাশিয়ার কাছে গিয়ে বলুনঃ তুমি যদি সাহায্য না করো, তাহলে আমরা চললাম আমেরিকার কাছে। এটা করা হয় কেন? এর কারণ দেখা যাচ্ছে, উভয় ব্লকই যতগুলো সম্ভব দেশকে তার স্বপক্ষে এবং তার প্রভাবাধীন রাখতে আগ্রহশীল। এর কারণ কি? এখানে আবার আমাদের কিছুটা অতীত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে হবে। প্রধানত, বিশ্ব কমিউনিজম বা আন্তর্জাতিক কমিউনিজম পৃথিবীর সমস্ত দেশকে তাদের নিজস্ব মতবাদে দীক্ষিত করার জন্যে যে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা থেকেই এ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। দু'টি ব্লকের উদ্দেশ্য যখন এ রকম, তখন আমরা কি অন্যান্য দেশের মতো এ দু'টি ব্লকের সঙ্গে এ ধরনের দর কষাকষি করতে পারি? যদি কোনো দেশের যথেষ্ট আর্থিক সম্পদ থাকে, তাহলে সে দেশ হয়তো দু'টি ব্লকের একটিকে অপরের বিরুদ্ধে লাগাতে পারে। কিন্তু সে দেশ যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এমন অনুন্নত হয় যে, সে কোনো ব্লকেরই শক্তি বৃদ্ধি করতে পারবে না, তাহলে আমার আশঙ্কা হয় যে, সে দেশ নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করলে দু'টি ব্লকই তাকে অবহেলা করবে। আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া বা আমাদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা তাদের পক্ষে লাভজনক হবে না বলে তারা মনে করবে।

অনুন্নত দেশগুলোকে সাহায্য করার জন্যে আমেরিকা যে নীতি গ্রহণ করেছে, সে নীতি অনুযায়ী হয়তো আমাদের সীমিত পরিমাণ সাহায্য দেয়া হবে; কিন্তু আমাদের দেশ যাতে অর্থনৈতিক ও সামরিক উভয় দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে পারে, তেমনভাবে কোনো দেশই আমাদের আদৌ সাহায্য করবে না—যদি আমরা নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করি।

ভারতকে চটানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়

আপনারা সবাই জানেন, ভারত আমাদের একটি শক্তিশালী প্রতিবেশী। আপনারা জানেন, মাত্র কয়েক বছর আগে পাকিস্তান ও ভারত এক দেশ ছিলো। রাজনৈতিক কারণে আমরা পৃথক রাষ্ট্র গঠন করেছি। এখন এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, শান্তির জন্যেই আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের প্রতিবেশীসুলভ ভালো সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি, আপনাদের সরকারের নীতি হচ্ছে ভারতের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করা। অবশ্য যদি ভারত তার সঙ্গে এরূপ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে তোলে। আমরা যুদ্ধ

www.pathagar.com

চাই না। আমরা কোনো দেশ আক্রমণ করতে চাই না। আমরা কোনো রকম বিরোধ চাই না। আমরা জানি, আমাদের অবস্থা কি। আমরা জানি, আমাদের মর্যাদা কি।

ভারত একটি বড় দেশ এবং তার বিপুল সম্পদ রয়েছে। এ অবস্থায় ভারত যদি আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করে এবং আমরা যদি নিজেদের শক্তিশালী করে না তুলি, তাহলে ভারত আমাদের দেশ দখল করে নিতে পারে। এই বিরাট দেশকে চটানো অথবা এই দেশকে শত্রু বলে বিবেচনা করা সম্ভবও নয়—বুদ্ধিমানের কাজও নয়। সে জন্যে আমরা ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য আছে বলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছেন, তাতে আমি মাঝে মাঝে কৌতুক বোধ করি এবং আশ্চর্য হয়ে যাই। আমার ধারণা, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের উন্মাদ বা প্রায়-উন্মাদ বলে মনে করেন। কিন্তু আমরা খোলাখুলি বলছি, আমরা ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই। কিন্তু সেরূপ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে আমাদের সুযোগ দেয়া হোক। এখন বলা যেতে পারেঃ ধরে নেয়া যাক বিশ্বযুদ্ধের কোনো আশঙ্কা নেই। কাজেই বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার কোনো কথা আসছে না। কিন্তু ছোটখাটো যুদ্ধের ব্যাপারে আপনারা কি মনে করেন যে, নিরপেক্ষ থাকলে আক্রান্ত হওয়ার ভয় কম?

নিরপেক্ষতার তাৎপর্য

শান্তির পরিবেশে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের আসল তাৎপর্য হচ্ছে ঃ আমাদের দেশ দখল করে নেয়া যদি কোনো বড় শক্তির পক্ষে সামরিক কৌশলের দিক থেকে সুবিধাজনক হয়, তবে সে ক্ষেত্রে আমাদের দেশের নিরপেক্ষতা বজায় থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। দৃষ্টান্ত হিসেবে যে কথা আমি আগেও একাধিকবার বলেছি, আবার এখানে তার উল্লেখ করছি। জার্মানী যখন ফ্রান্স আক্রমণ করতে চাইলো, তখন সে বেলজিয়াম বা হল্যাণ্ড নিরপেক্ষ কিনা, সে কথা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ফ্রান্স আক্রমণ ও ম্যাজিনো লাইন ধ্বংস করার জন্যে সে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম দখল করে নিলো। কাজেই, নিরপেক্ষ থেকে আপনারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দূর করতে পারছেন না।

সামরিক মৈত্রী প্রয়োজন কেন

তবে হয়তো বলা হবে, নিরপেক্ষ থাকলে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার ভয় কম; আর জোটবদ্ধ থাকলে বা সামরিক চুক্তি সম্পাদন করলে যুদ্ধে জড়িত হওয়ার ভয় বেশি। আমি এই যুক্তি কিছুটা মানি। তবে আরো একটি সুবিধাজনক দিক আছে। আর সেটা হচ্ছে, সামরিক চুক্তিতে শরিক হলে আপনারা শক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও অখণ্ডতা বজায় রাখতে পারেন, যুদ্ধ এড়াতে পারেন। নজির হিসেবে ধরা যাকঃ 'ক' ও 'খ' দু'টি দেশ এবং তাদের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক নেই। ধরা যাক, 'ক' হচ্ছে একটি শক্তিশালী দেশ এবং 'ক'-এর পক্ষ থেকে 'খ'-এর আক্রান্ত হওয়ার ভয় রয়েছে। এ অবস্থায় 'খ' কি করবে? আমাদের সামনে ঠিক এমনি ধরনের একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় 'খ' হয়তো বলতে পারেঃ আমি নিরপেক্ষ, অবহেলিত; বিচ্ছিন্ন ও বন্ধুহীন থাকি। 'খ'-র এ দুরবস্থায় 'ক' তাকে আক্রমণের যোগ্য বলে মনে না-ও করতে পারে। কিন্তু যদি 'ক' তাকে ('খ'-কে) আক্রমণের যোগ্য বলে মনে করে বসে, তবে 'খ' বেচারা নিরুপায়। তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে অথবা সে হয়তো বলবেঃ 'ক' খুব শক্তিশালী দেশ; আমি তাকে বাধা দিতে পারবো না।

www.pathagar.com

তার চেয়ে 'ক'-র হাতে আক্রান্ত হলে 'গ', 'ঘ', ও 'চ'-কে তার রক্ষার্থ এগিয়ে আসতে হবে—এই শর্তে 'গ', 'ঘ', 'ঙ' ও 'চ'-এর সংগে একটি চুক্তি সম্পাদন করাই কি 'খ'-এর উচিত নয়? এখন কথা হচ্ছেঃ 'খ' 'গ', 'ঘ', 'ঙ' ও 'চ'-এর মধ্যে যদি এ ধরনের কোনো প্রতিরক্ষা চুক্তি থাকে তবে সেটা তখনি কেবল কার্যকরী হবে, যখন অপর কেউ তাদেরকে আক্রমণ করবে। আর যদি 'খ' নিজের খেয়াল-খুশিমতো কাউকে আক্রমণ করে কিংবা 'খ' 'গ' 'ঘ', 'ঙ' ও 'চ'-এর মধ্যে যে কোনো একজন অপর কাউকে আক্রমণ করে বসে—এক কথায় তারা যদি আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে, সে ক্ষেত্রে এই চুক্তি কার্যকরী হবে না। এই চুক্তির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা যাবে কেবল তখনি—যখন তারা আক্রান্ত হবে; যখন তারা নিজেরা কাউকে আক্রমণ করবে, তখন নয়। সুতরাং 'খ' যদি সতর্ক হয় এবং 'গ', 'ঘ', ও 'চ'-এর সাহায্য নেয়, তখন 'খ'-কে আক্রমণ করার আগে 'ক' গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করবে। কারণ, 'খ' আক্রান্ত হলে অন্যরা তার সাহায্যে অগ্রসর হবে। ফলে, 'ক' হয়তো সহজে জয়ী হতে পারবে না। অতএব, দেখা যাচ্ছে, এ ধরনের সামরিক চুক্তিতে শান্তি ও সংহতির বীজ নিহিত রয়েছে। এদিক থেকেই আমরা মনে করি, পাকিস্তানের পক্ষে সামরিক চুক্তি সম্পাদন করা উচিত।

আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে, এ ব্যাপারে দুই ধরনের চিন্তাধারা রয়েছে—এর একটি হচ্ছে পঞ্চশীলা বা পঞ্চনীতি। এই পঞ্চনীতি এমন কিছু মৌলিক জিনিস নয়। তবে এগুলোর মৌলিকত্ব হচ্ছে এই যে, জাতিসংঘ সনদের আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই এগুলো রচিত হয়েছে। পঞ্চশীলার প্রত্যেকটি নীতিই জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত আদর্শগুলোর মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে।

এই পাঁচনীতি আমাদেরকে সামরিক চুক্তির কথা মুখে আনতে দেয় না। এগুলো ছাড়াও বান্দুং সম্মেলনে দশ-নীতি বলে আর একটি সনদ রয়েছে, যা এশিয়া ও আফ্রিকার সব দেশই গ্রহণ করেছিলো। এই বান্দুং সম্মেলনে আমরা শরীক হয়েছিলাম, ভারত শরীক হয়েছিলো, সিংহল শরীক হয়েছিল; জাপান, ইন্দোনেশিয়া এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য প্রায় সব দেশই শরীক হয়েছিল। এই সম্মেলন সামরিক চুক্তি সম্পাদনের অনুমতি দিয়েছিল।

বান্দুং সম্মেলন এ কথা মেনে নিয়েছিল যে, যদি কোনো দেশ আত্মরক্ষার জন্যে কোনো চুক্তি সম্পাদন করতে চায়, তবে তাকে তা করতে দিতে হবে। এ-ও জাতিসংঘ সনদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোনো আজগুবী বা অসাধারণ ব্যবস্থা এ নয়। জাতিসংঘ সনদ এতে (সামরিক চুক্তি সম্পাদনে) অনুমতি দিচ্ছে। তবু কতগুলো জাতি কেন যে সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করছে, তা আমি বুঝতে পারি না। দুঃখের বিষয়, আজ আমাদের মনোবৃত্তি এমন হয়েছে যে, আমরা যদি আমেরিকা বা বৃটেনের পক্ষে কিছু বলি, তবে আমাদেরকে 'সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক' বলা হয় আর যদি রাশিয়ার পক্ষে আমরা কিছু বলি, তবে আমাদেরকে বলা হয় 'স্বাধীন'।

নতুন সাম্রাজ্যবাদ

এখন দেখা যাচ্ছে, এ ধরনের 'স্বাধীন' হওয়ার জন্যে আমাদেরকে অবশ্যই প্রথমোক্ত দু'টি দেশকে গালাগালি দিতে হবে এবং রাশিয়ার প্রশংসা করতে হবে; যদিও রাশিয়া হাঙ্গেরীতে এমন ভয়াবহ নৃশংস ঘটনা ঘটিয়েছিল, যার নজির সাম্প্রতিক ইতিহাসে মেলে

www.pathagar.com

না। তবু আপনারা তার নিন্দা করতে পারবেন না। যদি করেন, তবে বলা হবে, আপনারা 'সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক'। 'সাম্রাজ্যবাদ' কথাটায় পুরানো দেশগুলোর ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদকে বোঝালেও এ সব ব্যাপারেই এ আখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু নতুন দেশগুলোর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক কি এবং তারা এ ব্যাপারে কি করতে পারে?

সাম্রাজ্যবাদের একটি লক্ষণ হচ্ছে ঃ সাম্রাজ্যবাদী দেশটির সৈন্যবাহিনী তার নিয়ন্ত্রণাধীন দেশে মোতায়েন রাখা হয়। আমি ভেবে আশ্চর্য হই যে, যারা কমিউনিস্ট দেশগুলোর প্রতি সহানুভূতিশীল তারা মনে করেন যে, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করার অধিকার একা তাদেরই আছে—আর কারুর সে অধিকার নেই।

পাকিস্তান হচ্ছে সব রকমের উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী—তা সে যেখানেই দেখা যাক না কেন। এর কারণও সুস্পষ্ট। কেননা, দেশ হিসেবে আমাদের কোনো ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি থাকতেই পারে না। কিন্তু আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, তা হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোই প্রায় সবার আগে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জোর গলায় চিৎকার জুড়ে দেয়।

বিরাট দেশ রাশিয়ার কথাই ধরা যাক। আমি গোড়াতেই বলেছি, পররাষ্ট্র নীতি আলোচনার সময় জনসাধারণের কাছে সব সময় সব-কিছু প্রকাশ করা সঙ্গত নয়। কারণ, এ কথা ঠিক যে, রাশিয়া আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠুক তা আমরা চাই না। আমরা রাশিয়ার তুলনায় এত ছোট যে, তার দুশমনি আমাদের কাম্য হতে পারে না এবং আমি আশা করি, আমরা তাকে কিছুতেই শত্রুভাবাপন্ন করে তুলবো না। কিন্তু কমিউনিস্ট দেশগুলোর ভুল-ভ্রান্তি দেখিয়ে দেয়া আমাদের কর্তব্য—কেননা বিশেষত আমাদেরকে যখন প্রায় তাদের প্রভাবের পক্ষপুটের মধ্যে এনে ফেলা হচ্ছে। তাছাড়া আমি আমার দেশবাসীকে সাবধান করে দেয়া প্রয়োজন মনে করছি যে, দুর্ভাগ্যক্রমে যদি আমরা তাদের আওতার মধ্যে এসে পড়ি, তাহলে আমাদের ভাগ্যও হাঙ্গেরীর মতো হবে। হাঙ্গেরীতে আমরা কি শোচনীয় ও মর্মান্তিক অবস্থা দেখতে পাচ্ছি?

তাঁবেদার দেশ বলে একটা কথা আছে। আমার ধারণা, 'তাঁবেদারে পরিণত করা' কথাটি বা তাঁবেদার রাষ্ট্র হওয়ার অর্থ কোনো এক ধরনের নিকৃষ্ট অবস্থা বোঝায়। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, রাশিয়ার আশপাশে অবস্থিত বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরী, পূর্ব জার্মানী ও পোল্যাণ্ডে রাশিয়ার সৈন্য প্রেরণের অধিকার রয়েছে বলে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবেই ধরে নেয়া হচ্ছে। তবু একে উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ বলে মনে করা হচ্ছে না। এই জন্যেই আমি বলি, সতর্ক হয়ে কথা বলাই ভালো। কিন্তু আমরা যদি তাঁবেদার দেশে পরিণত হই, তবে সে অবস্থায় আমাদের ওপর যে দুর্ভাগ্য নেমে আসতে পারে, তার কথা চিন্তা করে আমি শঙ্কিত হচ্ছি। এই জন্যেই আমাকে দু'-একটি কথা বলতে হচ্ছে।

তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হলে আমরা কখনো আমাদের প্রভুদের শৃংখল থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবো না। সুদীর্ঘকাল পরে আমরা বৃটিশের দাসত্বের নিগড়মুক্ত হয়ে স্বাধীন হতে পেরেছি। কিন্তু আমরা দেখেছি, যে তাঁবেদার দেশই রাশিয়ার শৃংখল-মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছে, পূর্ব জার্মানী, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর মতো তাকে নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছে। এ সব ঘটনা আমাকে শঙ্কিত করে তুলেছে। আমি দেখেছি, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে

www.pathagar.com

কম্যুনিজমের অভিযান চলেছে। এই অভিযান শুরু হওয়ার সময় থেকে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে, আমরাও যাতে সেই বিশেষ প্রভাবের কুক্ষিগত না হই, সে জন্যে শক্তিশালী দেশগুলোর সাহায্য নেয়া আমাদের পক্ষে অনেকটা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সামরিক চুক্তির নিন্দা করছে, এমন দেশ কোন্ কোন্টি তা আপনাদের কাছে খুলে বলা আমার পক্ষে কিছুটা অবিবেচকের কাজ হবে। আমি শুধু একটি মাত্র সামরিক চুক্তির উল্লেখ করবো ঃ যাকে বলা হয় 'ওয়ারশ চুক্তি'। এটা হচ্ছে রাশিয়া ও তার তাঁবেদার দেশগুলোর মধ্যে সম্পাদিত একটি পূর্ণাঙ্গ সামরিক চুক্তি। তাছাড়া আরো যে সব সামরিক চুক্তি রয়েছে, আমি এখানে সেগুলোর উল্লেখ করবো না। তবে আমি আপনাদের নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, অন্যান্য অনেক দেশ সামরিক চুক্তি সম্পাদন করেছে।

ভারতের সাথে সম্পর্ক

সামরিক চুক্তি যতটা নিন্দনীয় বলে চিত্রিত করার চেষ্টা করা হয়, আসলে তার মধ্যে নিন্দার তেমন কিছু নেই। প্রশ্ন হচ্ছেঃ আমাদের অবস্থা কি এবং কি ধরনের সম্ভাবনা আছে, সর্বাগ্রে এদিকটাই আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। দুঃখের বিষয় হলেও আমি বলবো, আমাদের দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত এবং সামরিক দিক দিয়েও অতি দুর্বল। আপনারা বলতে পারেন, আমাদের দেশ বিপন্ন নয়; সুতরাং, আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?

আমি বলি এবং আমি এ কথা মানতেও প্রস্তুত যে, সব কিছু দেখে-শুনে মনে হয়, পণ্ডিত নেহরু পাকিস্তানের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তাঁর পাকিস্তান আক্রমণের বা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবার ইচ্ছে নেই। কিন্তু দু'-একটি জিনিস আমি ভুলতে পারি না। আমি ভুলতে পারি না যে, পণ্ডিতজী দয়া করে কাশ্মীর দখল করে নিয়েছেন—যে কাশ্মীর আমাদের এলাকা ছিলো বলে আমি মনে করি।

এছাড়াও কাশ্মীরের অধিবাসীরা যাতে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারে, পণ্ডিতজী তার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে দিচ্ছেন না। তাঁর অন্যান্য অপপ্রয়াসের কথা আমি উল্লেখ করবো না; কারণ, সেগুলোর সাথে আমাদের স্বার্থ জড়িত নয়। কিন্তু এও আমি ভুলতে পারি না যে, অন্তত দুইবার পণ্ডিতজী পাকিস্তানের ওপর এতখানি মারমুখো হয়েছিলেন যে, তিনি পাকিস্তান সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন এবং সে সেনাবাহিনী পুরাদস্তুর আক্রমণাত্মক কায়দায় সজ্জিত হয়ে থেকেছিল। আমাদের আক্রমণ করবার কোনো আকাঙ্ক্ষা হয়তো তার না-ও থাকতে পারে এবং আমি বিশ্বাস করি, সে রকম আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিলো না। কিন্তু তবু এমন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব যাতে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটতে পারে। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে এবং ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে যখন আমাদের আত্মরক্ষার শক্তি ছিলো না, তখন আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের সীমান্ত বরাবর ভারতীয় সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছিল। তখন পণ্ডিতজীর মনে বিশেষ কতকগুলো ভাবের উদয় হয়েছিল—যার ফলে তিনি ভেবেছিলেন যে, পাকিস্তানের কাছ থেকে আরও ভালো ব্যবহার পেতে হলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত।

এছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি, কতগুলো ব্যাপার রয়েছে যাকে আমরা কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারি না। মাত্র কিছুদিন আগে ভারতীয় পার্লামেন্টে বিভিন্ন সদস্য একের

www.pathagar.com

পর এক ঘোষণা করেছেন যে, তাঁদের বা তাঁদের দলের পাকিস্তান গ্রাসের বা পাকিস্তান আক্রমণ করার কোনো অভিসন্ধি নেই। আমি এসব ভদ্রলোককে অবশ্যই বিশ্বাস করবো। কিন্তু তবু এ বিপদ সব সময়ই রয়েছে যে, পার্লামেন্ট ভবনে দাঁড়িয়ে কথা বলেনি এমন দলের উদ্ভব হতে পারে, যার লক্ষ্য হবে পাকিস্তানের ধ্বংস সাধন।

আমি এ কথা বিশ্বাস করতে চাই, ভারতে যাঁরা বাস করছেন, তাঁরা সবাই পাকিস্তানকে একটা বাস্তব সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। আমি এও বিশ্বাস করতে চাই যে, তাঁরা আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে উৎসুক এবং তাঁরা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোনো বৈষম্য করেন না। আমার যে সব বন্ধু এখানে রয়েছেন তাঁদের আমি বলতে চাই যে, বৈষম্যমুক্ত ও সমমর্যাদাসম্পন্ন এদেশের দু'টি সম্প্রদায় কেবল পাকিস্তানী হিসেবেই পাকিস্তানে বাস করছেন, আমি সেই পরম বাঞ্ছিত মুর্হূতটির জন্যেই সবচেয়ে বেশি উদগ্রীব হয়ে রয়েছি।

মুসলিম, হিন্দু, খৃস্টান, পারসী বা বৌদ্ধ যে যাই হোন না কেন, সব পাকিস্তানীই আমার চোখে এক এবং অভিন্ন। যে দৃষ্টিতে এবং যেভাবে অন্য সবার কল্যাণের প্রতি নজর দেই ঠিক সেই দৃষ্টিতে এবং সেইভাবে তাদের প্রতি নজর দেয়াকে আমি মহত্তর এক কর্তব্য বলে মনে করি। সমদলিতাই আমার নীতি। এই মহত্তর লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমি এমন একটি জাতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আপ্রাণ চেষ্টায় ব্রতী রয়েছি, যে-জাতির জনসাধারণ পাকিস্তানকেই তাদের স্বদেশভূমি বলে মনে করবে—আমাদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হবে না। আমরা যাকে যুক্ত নির্বাচন বলে অভিহিত করছি, এই হলো তার ভিত্তি। এই নির্বাচন-ব্যবস্থা আপনাদের সামনে আমি পেশ করেছি এবং একে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে আমি আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি। কারণ এ একটি সংহত ও অভিন্ন জাতি গড়ে তোলার সহায়ক হবে। এর জন্যেই আমরা গত কয়েক বছর ধরে বিরামহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছি এবং আমার মনে হয়, আমার দল দেশের প্রতি প্রান্তে নিরন্তর শান্তির বাণীই বহন করে চলছে।

দুষ্কৃতিকারীরা যখনি সাম্প্রদায়িক ঘৃণা বিস্তারের চেষ্টা করেছে, যখনি তারা এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেয়েছে, আমার দল, আমার স্বেচ্ছাসেবকরা, আমার ছেলেরা আর আমার ছাত্ররা তখনি কালবিলম্ব না করে ঝড়ের বেগে দিকে দিকে ছুটে গেছে শান্তির বাণী নিয়ে। শান্তি রক্ষার জন্যে তারা কোনো চেষ্টাই বাদ দেয়নি—আমি আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে এ কথা বলতে পারি।

আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, লিয়াকত-নেহরু চুক্তির পর থেকে এদেশে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। লজ্জার সাথে আমি উল্লেখ করছি যে, শেষের দিকে বর্তমানে ক্ষমতাচ্যুত একটি দলের কার্যকলাপের ফলে প্রাক্তন সিন্ধু প্রদেশের এক স্থানে সামান্য একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল; কিন্তু অনতিবিলম্বেই তা আয়ত্তে আনা হয়। এছাড়া আমাদের দেশে আর কোথাও কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি।

অন্য দিকে কি হচ্ছে? আপনারা নিশ্চয়ই বেদনা-ভারাক্রান্ত মন দিয়ে সংবাদপত্রে পড়েছেন যে, ভারতে ইতিমধ্যেই ৩৬০টি সম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেছে। এ সত্যি চরম দুর্ভাগ্যজনক। আমি কেবল এই আশাই করি যে, পণ্ডিত নেহরুর উপদেশবাণী যা তিনি সময় সময় তাঁর দেশবাসীকে দিয়ে থাকেন—তা তারা গ্রহণ করবেন এবং তাঁর উপদেশ মেনে চলবেন।

www.pathagar.com

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তারা তা করেন না। কোনো কারণ বা সুযোগের অবকাশ ঘটলে তারা মনে করেন, সেখানকার দরিদ্র হতভাগ্য মুসলমানরা তাদের কৃপায় সেখানে রয়েছে। সেখানকার মতো অবস্থা এখানেও সৃষ্টি হোক তা আমি আদৌ চাই না এবং এদেশের জনসাধারণও তেমন মনোভাবাপন্ন হোক—তা আমি ভাবতেও পারি না।

আমি মনে করি, আমাদের সীমান্তের অপর দিকের যে—সব লোক আজো তাদের নিজেদের মধ্যে মুসলমানদের অস্তিত্ব অথবা তাদের সীমান্তের এ পাশে পাকিস্তানের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়নি, সৌহার্দ্য, সদিচ্ছা ও সহযোগিতা দিয়েই কেবল আমরা তাদের মনোভাবের পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হবো। আজ এ-ই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি অবস্থা।

আপনাদের মধ্যে এমন কেউ যদি থাকেন, যাঁরা মনে করেন, আমাদের বিচ্ছিন্ন ও বন্ধুহীন থাকাই ভালো অথবা যাঁরা মনে করেন, কোনো বিপদই নেই বা যদি বিপদ আসেই তবে পাকিস্তানের পক্ষে ভারতের সাথে একীভূত হয়ে যাওয়াই ভালো হবে, তাহলে আমি যে নীতির কথা বলছি তা তাদের গ্রহণ করা উচিত নয়।কিন্তু আপনাদের মধ্যে এমন যাঁরা আছেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন, আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে পাকিস্তানকে অবশ্যই যথার্থভাবে শক্তিশালী হতে হবে, আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, বিশ্বের জাতিনিচয়ের মধ্যে আমাদের মাথা উঁচু করে তুলতে হবে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমাদের উন্নত হ'তে হবে, তাহলে আপনাদের কাছে আমার কথা হচ্ছে ঃ আমরা যে নীতি গ্রহণ করেছি, সেটাই হচ্ছে একমাত্র অনুসরণযোগ্য নীতি। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করতে অক্ষম। এর অর্থ যদি আমরা মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হই অথবা কোনো শক্তির কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করি তাহলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সব শক্তির আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন, তাদের আমরা সাহায্য করতে পারবো না।

মিসরের স্বার্থ

এর দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি বলতে পারি যে, সুয়েজ খাল-বিরোধের সময় আহূত ২৪ জাতি সম্মেলনে আমাদের দাবির ফলেই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদেরকে শান্তির পক্ষে, মিসরের সার্বভৌমত্ব ও সংহতির অনুকূলে তাঁদের প্রস্তাব পরিবর্তন করতে হয়েছিলো। আমাদের দাবির ফলেই মিসরে আক্রমণ বন্ধ হয়েছিলো। যখন আমরা দেখতে পেলাম যে, মিসরের সার্বভৌমত্বের ওপর হামলার আশঙ্কা রয়েছে, তখন আমরা অষ্টাদশ জাতি সম্মেলনে যোগ দিলাম না। তারপর আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী মিসরকে সমর্থন করেছি। সে সময় আমি চীনে ছিলাম। চীন থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর আমি সর্বাগ্রে যে কাজটি করি, সেটা হলোঃ আমি ইসরাইলকে 'আক্রমণকারী' বলে অভিহিত করেছিলাম। এর পর আমরা যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের নিন্দা করেছিলাম।

আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে ঃ ইসরাইলকে যেভাবে আমি 'আক্রমণকারী' বলে অভিহিত করেছি, ঠিক সেভাবে তাদেরকে আমি আক্রমণকারী বলে অভিহিত করিনি কেন? এর জবাব খুব সহজ এবং তা হলো এই যে, সব সমস্যা বিবেচনার পর এবং যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সকে মিসর ত্যাগের নির্দেশ দানের পরও যদি জাতিসংঘ একে 'আক্রমণ' বলে অভহিত না করে থাকেন, তবে সারা দুনিয়ার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে একে আক্রমণ বলে অভিহিত করার আমি কে? সব কিছুর পরে জাতিসংঘকে সমর্থন করা ও জাতিসংঘের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখাই হচ্ছে আমাদের মূলনীতি।

www.pathagar.com

তারপর যখন মিসরে সৈন্য সাহায্য প্রেরণের প্রশ্ন উঠলো, আমার মনে হয়, সে সময় উপস্থিত ছয়টি দেশের কথা বাদ দিলে মিসরে সৈন্য সাহায্য প্রেরণের প্রথম প্রস্তাবকারীদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন। মিসরে একটি রেডক্রস দল, টাকা-পয়সা, খাদ্য-বস্ত্র ও ঔষধপত্র প্রেরণের জন্যে আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম। আমরা আমাদের অন্যতম মিত্র যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যাচ্ছি একথা জেনেও এত কিছু করেছিলাম। কেন করেছিলাম? কারণ, আমরা একে আমাদের কর্তব্য বলে মনে করেছিলাম। কারণ, মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্বভাব ঘনিষ্ঠ করে তোলা এবং সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলাই হলো আমাদের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ-ই আমাদের নীতি। এর ব্যতিক্রম করার উপায় আমার নেই। আমাদের হৃদয়ে পুঞ্জীভূত রয়েছে মুসলমানদের জন্যে দরদী ও সম্প্রীতির অনুভূতি। যখন আমরা দেখতে পাই—অন্য কোথাও আমাদের কোনো মুসলিম ভাই আক্রান্ত হয়েছে অথবা কোনো প্রকারে নির্যাতিত হচ্ছে, আমাদের হৃদয় সেই মুহূর্তেই সম অনুভূতিতে মোচড় দিয়ে ওঠে। এ আমাদের রক্তের স্বভাব।

কিন্তু আমরা দেখতে পাই, অন্যদের মনোভাব সে রকম নয়। আমরা দেখছি, যখন আমরা অন্যদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে এগিয়ে যাই, তখন তাদের দিক থেকে আমাদের প্রতি একই ধরনের অনুভূতির কোনো প্রকাশ ঘটছে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, মিসর ঘোষণা করেছে যে, কাশ্মীর প্রশ্নে সে ভারতের পক্ষে। আমাদের হাতে এর প্রতিকার নেই। যদি মিসর আমাদের রাষ্ট্রদূতকে আহ্বান না করে, যদি সে আমাদের কাছে আবেদন না জানিয়ে ভারত ও যুগোশ্লাভিয়ার কাছে আবেদন জানায়, তা-ও আমরা বন্ধ করতে পারি না। তবে মিসর পছন্দ করুক আর নাই করুক, আমাদেরকে আমাদের কাজ করে যেতেই হবে। কিন্তু তারপর স্বভাবতঃই এ প্রশ্ন এসে পড়ে যে, তারও একটি সীমা আছে। এদেশের জনসাধারণের মনোভাব বিচার করে আমি দেখতে পাচ্ছি, দুর্ভাগ্যক্রমে মিসর এমন কতগুলো কাজ করেছে যার ফলে তাদের প্রতি আমাদের আস্থা শিথিল হয়ে পড়ছে এবং তাড়াতাড়ি কোনো কিছু করার ব্যাপারে আমাদের একটুখানি ইতস্তত করতে হচ্ছে এবং আমাদের আরো কিছুটা সতর্ক হতে হচ্ছে।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ

এ-ই হচ্ছে আমাদের অবস্থা। আপনাদের সেবা করার একটি সুযোগ ছাড়া প্রধানমন্ত্রিত্ব আমার কাছে খুব বেশি লাভের ব্যাপার কিছু নয়। ব্যক্তিগত খোঁজ-খবরের দিক দিয়ে বলতে গেলে, আপনারা সম্ভবত আমাকে জানেন। বাইরে বিরোধী দলে থেকে আমি বেশ আরামেই ছিলাম। কোনো রকম দায়িত্ব না নিয়েই আমি খুসিমতো অন্যের সমালোচনা করতাম। তবে আমি দায়িত্বশীল হতে চেষ্টা করেছি। এমনকি পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে অন্যরা যখন যথাযথ অবস্থা না জেনেই এর নিন্দা করছিলেন, তখনো আমি বলেছিলাম যে, বিরোধী দলের কারো পক্ষে সঠিক তথ্য না জেনে এ সম্পর্কে চট্ করে কিছু বলা উচিত নয়। কারণ, যতক্ষণ না আমরা সব তথ্য জানতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পক্ষে কোনো রায় দেয়া সম্ভব নয়—সমীচীনও নয়।

আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে, আমি বহুবার চাপ দিয়ে বলেছিলাম যে, পররাষ্ট্র নীতি আইন পরিষদে বিবেচিত ও অনুমোদিত হওয়া উচিত। এ এমন একটি বিষয় যা আমি পরিষদে পেশ করার মনস্থ করেছি। পরিষদ যদি আমার অভিমত অনুমোদন করে তবে

www.pathagar.com

ভালো কথা। যদি তা না করে, তবে আমি অত্যন্ত খুশী মনে এই পদে ইস্তফা দেবো। এই পদে কেবল গুরুতর পরিশ্রম আর দায়িত্ব রয়েছে—কোনো মজুরি বা কোনো পারিতোষিক নেই।

আপনারা হয়তো জানেন (এ কথা আমার আপনাদেরকে জানানোর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না), আমি একজন 'বিখ্যাত ব্যারিস্টার' বলে পরিচিত। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার হিসেবে আদালতে হাজির হয়ে আমি একদিনে যা রোজগার করতাম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমার এক মাসের মাইনে তার চাইতেও কম। সুতরাং আয়ের দিক দিয়ে এই পদ আঁকড়ে থাকা আমার কাছে বেশি লাভের ব্যাপার কিছু নয়। কোনোদিক থেকে লোভনীয়ও নয়। তবে আমি একটি প্রতিশ্রুতি দিতে পারিঃ আমি যতদিন প্রধানমন্ত্রী থাকবো, ততদিন আমার লক্ষ্য হবে পাকিস্তানকে দুর্মর শক্তিতে পরিণত করা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমার দেশ যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, তার জন্যে অবিরাম চেষ্টা করে যাওয়া।

আমি আমার এই হাত দিয়ে এমন কোনো কাজ করবো না যাতে পাকিস্তান দুর্বল হয়ে পড়তে পারে কিংবা কোনো দেশের তাঁবেদারির নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে পড়তে পারে। আমার প্রচেষ্টা হবে আপনাদেরকে অর্থনৈতিক দিক থেকে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী করে তোলা এবং দুনিয়ায় আপনাদের মর্যাদা সম্পর্কে আপনারা যে নৈরাশ্যজনক মন্তব্য করেছেন আপনাদের সেই মর্যাদা বৃদ্ধি করা। আমার বিশ্বাস, ইতিমধ্যেই আমি এদিক দিয়ে আপনাদের কিছু সেবা করতে পেরেছি।

মুসিলম বিশ্ব

আপনাদের কাছে আমার কৃতিত্ব ও সাফল্যের বর্ণনা দেয়ার সময় ও স্থান এটা নয়। তবে এটা ঠিক যে, এমন অনেক দেশ আছে যারা বিভিন্ন সময়ে আমাদের সাহায্য ও মধ্যস্থতা কামনা করে আসছে। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে অন্যান্য মুসিলম দেশ এবং আমরা এক সময় সংঘবদ্ধ হতে পারি। এই সংঘবদ্ধতা এদের মধ্যে কোনো চুক্তি সম্পাদনের জন্যে না হলেও ক্ষতি নেই। ওতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু আমার কাছে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, শুধু পরামর্শ বা আলোচনার জন্যে হলেও আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। আমি মনে করি, আমরা শেষ পর্যন্ত এই উদ্দেশ্যে সফল হতে পারবো। এই সব দেশের প্রত্যেকটিই কোনো-না-কোন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছে। আপনাদের কি এ কথা খুলে বলতে হবে যে, ক দেশটি খ দেশের বিরোধী, খ দেশটি ক দেশের বিরোধী এবং গ দেশটি ঘ দেশের বিরোধী এবং ঘ দেশটি ক খ গ প্রভৃতি দেশের বিরোধী? বিষয়টি পরিষদে উত্থাপিত হলে হয়তো আমি তখন এসব দেশের নাম বলতে পারবো।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে ঃ এই মুসলিম দেশগুলো আজ নিজেদের মধ্যে এমনভাবে বিভক্ত হয়ে আছে যে, তাদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া কঠিন। আমার নিজের প্রচেষ্টা ও আমার সরকারের নীতির অপরিহার্য লক্ষ্য হবে–মুসলিম দেশগুলোর মধ্যকার সমস্ত বিভেদ দূর করে তাদের একটি সাধারণ লক্ষ্যের পথে এগিয়ে আলাপ-আলোচনার জন্যে তাদের মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা করা এবং এমন অনুভূতি জাগিয়ে তোলা যাতে মুসলমানরা একটি সাধারণ স্বার্থের জন্যে, শন্তির জন্যে একযোগে কাজ করে যেতে পারে।

মাঝে মাঝে আমাকে বলা হয়ে থাকে যে, আলোচনা বা পরামর্শের কথা বলে কোনো লাভ নেই। কোনো চুক্তি কিম্বা জোটের কথা আমি বলিনি। তার কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে

www.pathagar.com

অবস্থা এই যে, দুনিয়ার বর্তমান মুসলিম সরকারগুলো সবাই দুর্বল। আমি দাবি করি, আমাদের সেনা বাহিনী দুনিয়ায় অদ্বিতীয়। হয়তো আমার এ দাবির মূলে রয়েছে আমার তীব্র জাতীয়তাবোধ এবং পাকিস্তানের জন্যে গভীর ভালোবাসা কিংবা গর্ববোধ। আমি আমাদের কিছু কিছু সামরিক কলা-কৌশল দেখেছি এবং আমার মতে আমাদের সেনাবাহিনী সত্যিই চমৎকার। সম্ভবত, আমাদের সেনাদল অন্য শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী সেনাবাহিনীগুলোর অন্যতম। আমি মনে করি, মুসলিম দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। অনেক সময় প্রশ্ন করা হয়ঃ বৃটেন অথবা আমেরিকার মতো বৃহৎ শক্তির সঙ্গে যুক্ত না থেকে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই না কেন? এ ব্যাপারে আমার জবাব হচ্ছে, শূন্যের সঙ্গে ক্রমাগত যত শূন্যই যোগ দিই না কেন, তার যোগফল শূন্যই দাঁড়াবে। সুতরাং, সবগুলো শূন্য একত্র না করে আমাদের সামনে আরও কিছুদূর এগুতে হবে, কেননা সেগুলোর যোগফল থেকে আদৌ কোনো পদার্থ মিলবে না।

পণ্ডিত নেহরুর প্রতি আহ্বান

এখন আমি আমার বন্ধু পণ্ডিত নেহরুর ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত করতে চাই। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। আমি তাঁকে বলতে চাই যে, তাঁর দেশের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি নেই। আর কোনোকালে তা থাকবেও না। আমরা সব সময়ই তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাই। তাঁর কাছে আমার প্রস্তাবঃ আমাদের সমস্যা ও যুক্তি জাতিসংঘের সামনে পেশ করা হোক এবং জাতিসংঘের নির্দেশ বিনাদ্বিধায় মেনে নেয়া হোক। আমি জিজ্ঞাসা করি, পণ্ডিতজী কেন তা করতে প্রস্তুত নন? আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি যে, বন্ধুত্ব, সদ্ভাব ও সদিচ্ছার তাগিদে এ ধরনের কিছু করা হোক এবং কাশ্মীর সমস্যা শেষ হয়ে গেছে কিংবা 'কাশ্মীর গণপরিষদ' একে ভারতের অংশ বলে ঘোষণা করেছে—এ ধরনের কথা বলা বন্ধ করা হোক।

এত বিভিন্ন কণ্ঠস্বর ও সুরে কথা বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই, এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে আমরা আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি, তা বুঝতে পারি না। আমরা সব সময় বলে এসেছি যে, জাতিসংঘকেই সব চাইতে বড় সালিস বলে মেনে নিতে হবে। আমরা আলাপ-আলোচনার ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করেছি। জাতিসংঘ নয় বার সমাধানের ফর্মুলা পেশ করেছেন। আমরা এর সবগুলোই মেনে নিয়েছি; কিন্তু পণ্ডিত নেহরু সবগুলোই নাকচ করে দিয়েছেন। এ অবস্থায় আমাদের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার আশা কোথায়? এখন একমাত্র পথ হলোঃ বিষয়টি জাতিসংঘের কাছে পেশ করা এবং জাতিসংঘকে এ সম্পর্কে রায় দিতে বলা। জাতিসংঘ যদি রায় দেয় যে, কাশ্মীর আমরা পেতে পারি না, তবে আমি তাও মানতে প্রস্তুত। আমি চাই, পণ্ডিত নেহরুও এটা মেনে নিন।

তাঁর কাছে আমার আরও অনুরোধ, দয়া করে আমাদের এক থাকতে দিন। আমার অনুরোধ, আমাদের পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে ও পররাষ্ট্র নীতিতে হস্তক্ষেপ করবেন না। আমি আপনাকে (পণ্ডিত নেহরুকে) জিজ্ঞাসা করি, আমাদের পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে আপনার কি? বাগদাদ চুক্তির অস্তিত্ব থাকুক বা না-ই থাকুক, তাতে আপনার কি? বৃটেন যে অন্যায় কাজ করেছে, আমরা সবাই তার নিন্দা করেছি। তবু আমাদের কাছ থেকে কোনো কিছু না শুনেই পণ্ডিতজী বিবৃতি দিয়ে বসলেন যে, বাগদাদ চুক্তি পঙ্গু হয়ে পড়ায় তিনি খুশী হয়েছেন!

www.pathagar.com

তিনি যখন বাগদাদ চুক্তির নিন্দা করেন তখন আমাদের জনসাধারণ মনে করেন যে, নিশ্চয়ই এর মধ্যে ভালো কিছু আছে। এই হচ্ছে তাঁর সম্পর্কে আমাদের জনসাধারণের ধারণা। আমাদের জনসাধারণ যে তাঁর সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করতে পারছে না, তিনি তা বুঝতে পারেন না। তা সত্ত্বেও সব সময়েই তিনি বলে বেড়াবেন যে, পাকিস্তানের কোনো সামরিক চুক্তিতে যোগ দেয়া উচিত নয়। আমি জানতে চাই, আমরা কি করি-না-করি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ কি হবে-না-হবে, তা নিয়ে তাঁর এতো দুশ্চিন্তা আর মাথাব্যথা কেন? কিসে আমাদের মঙ্গল হবে, তা আমরা নিজেরাই বিচার করতে পারি।

বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি

প্রত্যেক দেশেরই পররাষ্ট্র নীতি নিঃসন্দেহে বাস্তবভিত্তিক হতে হবে। পররাষ্ট্র নীতি ভাবাবেগ আশ্রয়ী হতে পারে না। এই কথাটি বিশেষভাবে আপনাদের মনে রাখতে হবে। কোনোক্রমেই পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে আমরা ভাবপ্রবণতা দিয়ে চালিত হতে পারি না–ভাবপ্রবণতার ওপর পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি নির্মিত হতে পারে না। আপনারা বাস্তববাদী, আপনারা পাকিস্তানকে একটি মহান জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্‌গ্রীব। আমিও মনে করি, একটি মহান জাতি হওয়ার ভাগ্য নিয়েই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে ঃ আমাদের মতে, আমাদের অনুসৃত পন্থাই সে উদ্দেশ্য সার্থক করে তুলবার পক্ষে সবচেয়ে বেশি সহায়ক হবে।

বন্ধুগণ, আপনারা সবাই শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত যুবক। আপনারা নিজেরাই বিচার-বিবেচনা করে দেখতে পারেন, এ নীতিটি কি ধরনের। আপনারা চারদিকের ব্যাপার দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কেবল একদিক থেকে নয়, কয়েকটি দিক থেকেই আমরা বিপন্ন হয়ে পড়তে পারি। আমি সেগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমি মনে করি, আর নিশ্চিতভাবে আমি দাবি করতে পারি, আপনারা সেই নীতি অনুমোদন করবেন—কেবল সেই নীতিই, যে নীতি পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী, স্বয়ংসম্পূর্ণ, অজেয় এবং এক সুসংহত শক্তি হিসেবে গড়ে তুলবে। আর ঠিক এ-ই হচ্ছে আমাদের পররাষ্ট্র নীতির গোড়ার কথা। আমি বিশ্বাস করি আপনারা এই নীতি অনুমোদন করবেন। আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

'৪৬-এর ঐতিহাসিক দিল্লি সম্মেলনে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী

[১৯৪৬ সাল। পাকিস্তান ইস্যুর ওপর নির্বাচনী যুদ্ধ শেষ করে সারা ভারতের আইন সভার সদ্য নির্বাচিত মুসলিম লীগ সদস্যদের কনভেনশন বসেছে নয়াদিল্লিতে। সভাপতির আসনে স্বয়ং কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। মুসলিম-ভারতের ভাগ্য কোন্ পথে নির্ধারিত হবে, তার ওপর তুমুল বিতর্কের ঝড় বইছে। কায়েদে আজমের ধমকে অনেকেই অপ্রস্তুত হয়ে বসে পড়েছেন। বাংলার নির্বাচন যুদ্ধ জয়ী 'বীর মুজাহিদ' জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উঠলেন মূল প্রস্তাব পেশ করতে। কণ্ঠবিদারী উল্লাস ধ্বনিতে ফেটে পড়লো সমগ্র জনতা। সোহরাওয়ার্দী বক্তৃতা করলেন। কারো মুখে টু শব্দ নেই। কেবল মাঝে মাঝে তুমুল করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানালো তাঁর ঘোষণাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দুর্জয় সংকল্প নিয়ে সবাই আবার ছুটে চললো দিকে দিকে। দিল্লীর সেদিনের সে সম্মেলনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা জানেন, তুমুল বিতর্কের মাঝে সেদিন সোহরাওয়ার্দীর কণ্ঠই ছিলো সর্বোচ্চ।]

সারা ভারতের আইন সভাসমূহের নির্বাচিত মুসলিম সদস্যদের এই সমাবেশে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি উত্থাপনের সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত এবং গৌরবান্বিত। সবচেয়ে বড় কথা, মুসলিম জাতির যে প্রতিনিধিবৃন্দ আজ এখানে সমবেত হয়েছেন, তাঁদের সকলকেই ভারতের মুসলিম জনসাধারণ পাকিস্তান ইস্যুর ওপর নির্বাচিত করেছেন।

ভারতের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ যুগ সন্ধিক্ষণে আজ আমাদের এই কনভেনশনের কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। ভারত ও বৃটেন দুই দেশই আজ উভয়সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এমতাবস্থায় বাতিল, পঙ্গু ও পুরাতন কাঠামোর ওপর আবার যদি বিকৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা হয়, তাহলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হবে—যার পরিণতিতে ভারতের ভবিষ্যৎ শান্তি ও সমৃদ্ধি মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। বৃটেন আজ ভারতীয়দের হাতে তাদের হৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয়েছে। বৃটিশ কেবিনেট মিশন এখন এদেশে এসেছেন ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি নিরূপণ করতে। ক্যাবিনেট মিশনের আগমন একথাই প্রমাণ করছে যে, বৃটিশ সরকার অন্তত এইবার ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে সদিচ্ছাশীল। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজ নিজ প্লাটফর্ম থেকে নিজেদের দাবি-দাওয়া পেশ করতে এগিয়ে এসেছে।

এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে—বৃটিশ সরকার ক্ষমতা কার হাতে ন্যস্ত করবেন? কংগ্রেস চেষ্টা করছে ক্ষমতা এককভাবে নিজেই দখল করতে, যাতে তারা মুসলমান ও দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা পিষে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। কংগ্রেস বলছে ঃ সরকার বাহাদুর ক্ষমতা আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, আমরা সব বিরোধিতা শেষ করে দেবো। মুসলমানদের আমরা পিষে ফেলব। অনুন্নত সম্প্রদায়গুলোকে পরাভূত করবো। আদিবাসীদের

www.pathagar.com

নিশ্চিহ্ন করে ফেলবো। কংগ্রেস বলছেঃ পুলিশ বাহিনীকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, সৈন্যবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র আমাদের হাতে দাও তাহলে তাঁরা পারবেন অখণ্ড ভারত কায়েমের নামে সারাদেশে কাটাকাটি, খুনোখুনি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুদ্ধ ও নরহত্যার বাজার সরগরম করে তুলতে। কিন্তু আমি বলবো ঃ কংগ্রেসের এতসব চিৎকার, পত্রিকার সোরগোল-সবই শেয়ালের ভাঁওতা, সবই নিছক পাগলামি আর ক্ষমতা লাভের অন্ধ মোহে আচ্ছন্ন।

বৃটেন যদি এই রক্তলোলুপ গোত্রের হাতেই ভারতের ভবিষ্যৎ এবং ভাগ্য ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে—তাহলে সেটা হবে তার চরম অন্ধত্ব ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক।

আমি বলবো, এ উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে মুসলিম লীগ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। আর পাকিস্তান ছাড়া দ্বিতীয় কোনো লক্ষ্যও তাদের সামনে নেই। সিন্ধু বা পাঞ্জাবে যদি কেউ 'গাদ্দার' বনে থাকে—সেকথা অবশ্য আলাদা; কিন্তু তারাও তো পাকিস্তানের বিরোধী নয়। এমনকি সীমান্তের কংগ্রেসী মুসলমানরাও পাকিস্তানের বিরোধী নয়। বরঞ্চ তারা নিজেদের প্রদেশে সম্ভবত ইতিমধ্যেই পাকিস্তান কায়েম করে বসেছেন। এদেশে আজ এমন কোনো মুসলমানের স্থান নেই, যিনি পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী নন, মালিক খিজির হায়াত খানও কি একথা বলেননি যে, তিনি পাকিস্তানের আদর্শে আস্থাবান? আমি তাঁকে বলবোঃ কওমের একজন খাদেম হিসেবে আপনি এখন মুসলিম লীগে শামিল হউন। মান-ইজ্জতের জন্যে এতই যদি তিনি আগ্রহী হন, তবে নিজ কওমের কাছেই তিনি তা দাবি করেন না কেন? দুনিয়ায় আজ আর এমন কোনো শক্তি নেই, যা দশ কোটি মুসলমানের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং বিকাশের ধারায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। ভারতীয় উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি। হিন্দু বলে যে ত্রিশ কোটি মানুষকে সনাক্ত করা হয়, তাদেরকে বরং এক জাতি বলা ভুল। তারা কিছুতেই এক জাতি নয়। অচ্ছুত, অনুন্নত এবং আদিবাসীদের মধ্যেও আজ জাগরণ এসেছে। তারাও সবাই এই উপমহাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদা লাভের দাবিদার।

এখন প্রশ্ন হলো, পাকিস্তান কি আমাদের সর্বশেষ দাবি? আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে যাবো না। তবে এ কথা আমি অবশ্যই বলবো যে, পাকিস্তান আমাদের হাল-আমলের প্রধান দাবি। গোড়ার দিকে হিন্দু মানসিকতা এমন ছিলো যে, তারা মুসলমানদের বলতো ঃ এদেশের সঙ্গে তোমাদের কোনো নাড়ীর যোগ নেই। জবাবে আমরা বলেছি ঃ ভারতবর্ষ যেমন তোমাদের, ঠিক তেমনি আমাদেরও। কংগ্রেসকে এ প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাইঃ গত কয়েক বছর ধরে আমরা সব রকমে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার চেষ্টা করেছি। ন্যায্য পাওনার চেয়ে আমরা তখন অনেক কমই দাবি করেছি। একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের অধীনে আমরা হিন্দুদের সংখ্যাভিত্তিক অধিকার মেনে নিতে এতদিন প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু বরাবরই তারা আমাদের সে একান্ত ন্যায়সঙ্গত দাবিও প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। আমাদের একটা কথাতেও তারা কর্ণপাত করেনি, নিজেদের জিদই তারা অক্ষুণ্ন রেখে এসেছে।

আজ স্বাধীনতা ও শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের লগ্ন সমুপস্থিত। তাই সময় বুঝে কংগ্রেস এবং হিন্দুরা এখন বলছে ঃ ভাই মুসলমান। তোমরা আমাদের সাথী, তোমরা আর আমরা দুয়ে মিলে এক জাতি।

www.pathagar.com

কংগ্রেসের এই দাবির মুখে আমাদের সামনে আজ আর দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই। তাই আমরা স্বাতন্ত্র্য ও বিভাগের দাবি তুলেছি। আমাদের এই দাবি সঙ্গত, ন্যায্য এবং সুবিচারের ভিত্তিতেই উত্থাপিত হয়েছে।

আমরা, ভারতের মুসলমানরা আজ গোটা দেশের মধ্যে মাত্র সামান্য দু'টি অংশ দাবি করছি। এই দাবির ভিত্তিতে একমাত্র কায়েদে আজমের নেতৃত্বে ভারতের দশ কোটি মুসলমান আজ মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ···সমগ্র কওমের লক্ষ্য এবং আদর্শ আজ এক ও অভিন্ন, এজন্যে খোদাতালার দরবারে হাজার শোকর। ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে কোনো চেষ্টা, যে কোনো ষড়যন্ত্র আমরা, মুসলমানরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করবো, প্রতিরোধ করবো। মুসলমান আজ আর মুর্দা কওম নয়, তাদের প্রতিরোধশক্তি আজ আর কেবল দুর্বলকণ্ঠের চিৎকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাই শান্তি ও সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে হলে কংগ্রেসের আজ কর্তব্য হলো—পাকিস্তানের দাবি সসম্মানে স্বীকার করে নেয়া।

আমরা ভারতের দশ কোটি মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি। একটি জীবন্ত ও দায়িত্বশীল জাতি হিসেবে বিশ্বে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদেরও আজ যথাযোগ্য অংশ নিতে হবে। তাই, আজ আমরা এই বিরাট উপমহাদেশের দুই প্রান্তের দু'টি এলাকা পেতে চাই। এ সত্ত্বেও আমাদের দেশীয় ভাইরা যদি পাকিস্তান দাবি মেনে না নেন, লড়াইর জন্যেই যদি তারা আয়োজন করতে থাকেন—তাহলে ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে বলতে পারি না।

এখন প্রশ্ন হলো ঃ আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম কি? এ সম্পর্কে কায়েদে আজম বলেছেনঃ আমাদের সম্মতি না নিয়ে কোনো শাসনতন্ত্র আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হলে সর্বশক্তিতে আমরা তা প্রতিরোধ করবো, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো।

মুসলিম জাতি আজ সজাগ, তারা আজ সচেতন। তাদের মতামতে আমল না দিয়ে কোনো ব্যবস্থা চালু করা হলে তারা তার মোকাবিলা করতে ওয়াদাবদ্ধ। মুসলিম লীগ মুসলমানদের ঈমানকে শক্তিশালী করেছে, বিশ্বাসকে করে তুলেছে দুর্জয়। মুসলিম লীগ তাদের নবজীবনদান করেছে। সাম্প্রতিক নির্বাচন প্রমাণ করেছে মুসলমানদের কাছে মুসলিম লীগ কি। দুর্বল, বিকলাঙ্গ, খঞ্জ এবং অসুস্থ মুসলমানরাও মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে নির্বাচন কেন্দ্রে এসে মুসলিম লীগের পক্ষে ভোট দিয়েছে। তারা উপলব্ধি করেছে, অনুভব করেছে যে, একমাত্র মুসলিম লীগের শক্তি ও সংগঠনের মধ্যেই মুসলমান তথা ইসলামের সাফল্য নিহিত। মুসলিম লীগই তাদের চূড়ান্ত জয়ের পতাকাবাহী। যে জাতি ঈমান ও বিশ্বাসে বলীয়ান, স্বকীয় শক্তির রূপে আস্থাবান, সে জাতিকে কখনো পরাভূত করা যায় না। মকসুদ মঞ্জিলে পৌঁছবার জন্যে গৃহযুদ্ধের ইচ্ছে আমাদের নেই। আপোষ রফা এবং শান্তির সঙ্গে বসবাস করাই আমাদের কাম্য। সেইসঙ্গে আমরা মান-ইজ্জতের সঙ্গেও বাঁচতে চাই। নিজেদের জন্যে আজ আমরা এমন একটু জায়গা চাই, যেখানে আমরা নিরাপদ এবং শান্তিতে বসবাস করতে পারবো।

কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতবাদের প্রভাব হিন্দু জনসাধারণের ওপরে মোটেই নেই। কংগ্রেস শুধু বিত্তবান শিক্ষিত শ্রেণীর হিন্দুদেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। এরা যোগ্য বটে; কিন্তু বাকসর্বস্ব পাঁচালি বিশারদ। একদিকে তাঁরা ধমক দিচ্ছেন, হুমকির সাথে বিবৃতি দিচ্ছেন।

www.pathagar.com

অন্যদিকে তারা শ্বেত কপোতের মতো নিষ্কলঙ্ক সাজছেন, ভেজা-বিড়ালের মতো নির্জীব বনছেন। দেশে এমন অনেক হিন্দু আছেন—যাঁরা নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার হিসেবে পাকিস্তানই একমাত্র সমাধান বলে মনে করেন। বর্ণ হিন্দুদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে এখন অন্যান্য হিন্দু ও অস্পৃশ্যরা আজ তাদের কাছ থেকে আলাদাই থাকতে চায়। বাংলাদেশে আড়াই কোটি অধিবাসীও অস্পৃশ্য রয়েছেন, যাঁরা আমাদের সাথে সহযোগিতা করতে চান। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পাকিস্তান কায়েম হলে তাঁদের দারিদ্র্য এবং বিভিন্নমুখী সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাঁদের মনে এখন আর কংগ্রেসের ওপর আস্থা মোটেই নেই। এমনো অনেক হিন্দু আছেন, যাঁরা মুসলিম লীগকেই মুক্তিলাভের একমাত্র আশ্রয়স্থল বলে ভাবছেন। পাকিস্তানকে তাঁরা মজলুম, সর্বস্বান্ত, পর্যুদস্ত মানুষের জান্নাত বলে ভাবছেন (বিপুল করতালি)।

পাকিস্তান দাবির মূলে এমন কি আছে যেটাকে যুক্তির সীমারেখার বাইরে বলে আখ্যা দেয়া সম্ভব? মুসলমানরা দেশের দুই প্রান্তের দু'টি ছোট্ট এলাকাই মাত্র চাইছে, যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলমান কওম একটি সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না।

আজ প্রশ্ন হচ্ছে, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এবং হিন্দু কংগ্রেস শান্তিপূর্ণভাবে মর্যাদার সঙ্গে পাকিস্তান মেনে নিতে রাজি আছে কিনা। আমি এ নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। অনুধাবন করতে চেষ্টাও করেছি যে, মুসলমানরা পাকিস্তান হাসিলের জন্যে লড়তে প্রস্তুত আছে কি না। আজ আমি পূর্ণ ঈমানদারী ও সততার সঙ্গে ঘোষণা করছি ঃ বাংলার প্রতিটি মুসলমান আজ লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত। আমরা পাকিস্তান চাই-এ প্রশ্নে কোনো অবস্থাতেই আপোষ নেই। এ পথে যেই বাধা দিতে আসবে, মুসলিম জনতাই তাকে সরিয়ে দেবে। পাকিস্তানের জন্যে তারা জান কবুল করতেও প্রস্তুত।

*****

বাঙলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত আসার পথে এমন কতগুলো প্রদেশ অতিক্রম করতে হয়েছে, যে সব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যালঘু। আমি তাদের মধ্যেও আজাদীর প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখেছি। তারা আমাকে বলেছেন ঃ তোমরা আমাদেরকে আমাদের ভাগ্যের ওপরই ছেড়ে দাও। তবু নিজ এলাকায় তোমরা পাকিস্তান কায়েম করো। আমাদের ভাইয়েরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করবে, একটি আজাদ দেশের বাসিন্দা হবে—এতেই আমাদের গৌরব। সত্য বলতে কি, মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানরাই আজ আমাদের আজাদীর পথ দেখিয়েছে, আজাদীর পথে উৎসাহ যুগিয়েছে। তাদের এই সুদৃঢ় সংকল্পের প্রতি আমাদের অভিনন্দন।

এ তো গেল সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা। কিন্তু যে সব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা পাকিস্তান সংগ্রামে নিজেদের জানমাল সব কিছুই কোরবানী দিতে, সব রকম দুর্যোগ-বিপদ হাসিমুখে বরদাশত করতে আজ প্রস্তুত হয়েছেন।

পূর্ণ ঈমানদারি আর সততার সঙ্গেই আজ আমি ঘোষণা করছিঃ বাংলার প্রতিটি মুসলমান আজ প্রস্তুত। আমাদের আজকের একমাত্র দাবি, একমাত্র কাম্য পাকিস্তান। এ প্রশ্নে কারও সঙ্গে আমাদের আপোষ নেই। আমাদের পথের প্রতিবন্ধক মুসলিম জনতাই সরিয়ে দেবে। আমরা আজ জান কোরবানে প্রস্তুত।

www.pathagar.com

'কায়েদে আজম, আপনি আমাদের পরীক্ষা নিন। আমরা বাংলার মুসলমান পাকিস্তান হাসিলের জন্যে, অভীষ্ট লাভের জন্যে আপনার নির্দেশ মোতাবেক যে কোনো ধরনের কোরবানীর জন্যে আজ প্রস্তুত।'

দেশরক্ষার ব্যাপারে আমি বলবো আমেরিকা হোক বা বৃটেনই হোক, কোনো দেশই এককভাবে আত্মরক্ষায় সমর্থ নয়। তবে একথা আমি বলি না যে, পাকিস্তান লাভের পরই আমরা আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে দেবো বা অস্ত্র সংগ্রহ ও নিজেদের সশস্ত্র করে তোলার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করবো। তবে হিন্দুস্থানের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যাপারে আমি কেবল একথাই বলতে চাইঃ আমাদের একা ছেড়ে দিন। আমরা নিজেরাই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে নেবো।

–পাকিস্তান, জিন্দাবাদ।

দিল্লি কনভেনশনে উত্থাপিত ও গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাব

১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল দিল্লির এ্যাংলো-এ্যারাবিক কলেজে অনুষ্ঠিত ভারতের আইন পরিষদের মুসলিম লীগ সদস্যদের কনভেনশনে জনাব সোহরাওয়ার্দী যে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার পূর্ণ বিবরণ ঃ

"Whereas in this vast subcontinent of India 100 million Muslims are adherents of a Faith which regulates every department of their life, educational, social, economic and political, which is not carefined merely to spiritual doctrines and tenets or rituals and ceremonies, and which stands in sharp contrast to the exclusive nature of the Hindu Dharma and philosophy which has postered and maintained for thousands of year a rigid caste system resulting in the degradation of 60 million human beings to the position of Untouchables, creation of unnatural barriers between man and man and superimposition of social and economic inequalities on a large body of the people of the country, and which threatens to reduce Muslims Christians and other minorities to the status of irredeemable Helots, socially and economically;

"Whereas the Hindu Caste System is a direct negation of nationalism, equality, democracy and all the noble ideals that Islam stands for.;

"Whereas, different historical backgrounds traditions, cultures. social and economic orders of the Hindus and the Muslims made impossible the evolution of a single Indian nation inspired by common aspirations and ideals and whereas after centuries they still remain two distinct major nations;

"Whereas soon after the introduction by the British of the policy of setting up political institutions in India on lines of western Democracies based on majority rule which means that the majority of the nation or society could impose its will on the majority of the other nation or society inspire of their opposition as amply demonstrated during the two and half year's regime of Congress goverments the Hindu Majority provinces, under the Government of India Act 1935, when the Muslims were subjected to untold harassments and oppressions as a result of which they were convinced of the futility and ineffectiveness of the socalled safeguards provided in the constitution and in the

www.pathagar.com

Instrument of Instructions to the Governors and where driven to the irresistable conclusion that in a united India Federation, if established, the Muslims, even in Muslim Majority provinces, could meet with no better fate and their rights and interests could never be adequately protected against the perpetual Hindu majority at the centre;

"Whereas the Muslims are convinced that with a view to saving Muslim India from the domination of the Hindus and in order to afford them full scope to develop themselves according to their genius, it is necessary to constitute a sovereign independent state comprising Bengal and Assam in the North East Zone and the Punjab, North West Frontier Provinces, Sind and Baluchistan in the North West Zone;

"This convention of the Muslim League Legislators of India, Central and Provincial, after careful consideration hereby declares that the Muslim Nation will never submit to any constitution for a United India and will never participate in any single constitution Making machinery set up for the purpose;
"and any formula devised by the British Government for transferring power from the British to the Peoples of India, which does not conform to the following just and equitable principles calculated to maintain internal peace and tranquility in the country will not contribute to the solution of the Indian Problem :

1) That the Zones comprising Bengal and Assam in the North-East and the Punjab, the N. West, Frontier Province, Sind and Baluchistan in the North West of India, namely the Pakistan Zones, where the Muslims are a dominant majority be constituted into one sovereign independent state and that an unequivocal undertaking be given to implement the establishment of Pakistan without delay.

2) That two separate Constitution Making Bodies be set up by the Peoples of Pakistan and Hindustan for the purpose of framing their respective constitutions.

3) That the minorities in Pakistan and Hindustan be provided with safeguards on the line of the All India Muslim League Resolution passed on the 23rd March, 1940 at Lahore.

4) That the acceptance of the Muslim League demand for Pakistan and its implemenation without delay are the sine-qua-non for the Muslim League Co-operation and participation in the formation of an Interim Government at the Centre.

This Convention further emphatically declares that any attempt to impose a constitution on a United India basis or to force any interim arrangement at the Centre, contrary to the Muslim demand, will leave the Muslim no alternative but to resist such imposition by all possible means for their survival and national existence."

The Resolution was passed unanimously.

www.pathagar.com

বিহারের বিপন্ন মুসলমানদের রক্ষায় সোহ্‌রাওয়ার্দী সরকারের ভূমিকা

[সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিলো জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর জীবনের প্রধান ব্রত। এই ব্রত পালনের জন্যেই তিনি স্বাধীনতা-উত্তরযুগেও কায়েদে আজমের পাঁচ-পাঁচটি পদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কলিকাতায়ই অবস্থান করতে থাকেন। বিহারের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় বিপন্ন মুসলিম নরনারী ও শিশুদের উদ্ধারের জন্যে বিহার সরকারের আমন্ত্রণ বা অনুমতির অপেক্ষা না রেখে তিনি ও তাঁর সরকার যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা কারো অজানা নেই। বিহারের বাস্তুচ্যুত হাজার হাজার বিপন্ন নরনারীকে কিভাবে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং বঙ্গীয় সরকারের কোষাগার উন্মুক্ত করে দিয়ে তিনি কিভাবে মানবতার সেবা করেছিলেন এবং তদ্দরুন বঙ্গীয় পরিষদে (স্পীকার জনাব নূরুল আমীন) বিরোধীদলের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তিনি ও তাঁর সরকার কি বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়েছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গীয় পরিষদের ২২শে মার্চ, ১৯৪৭-এর অধিবেশনের প্রশ্নোত্তরের বিবরণ থেকে তা সুস্পষ্ট ঃ]

মিস্টার সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ঃ সমবায়, ঋণ ও সাহায্য দফতরের মন্ত্রীমহোদয় জানাইবেন কি?

ক) বিহার থেকে বাস্তুচ্যুত মোট কতজনকে বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়া হয়েছে এবং কোথায় কোথায় ? (খ) এইসব বাস্তুচ্যুতের জন্যে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তা বঙ্গীয় সরকার বহন করেছেন কি ? (গ) তাদের প্রত্যেকের জন্যে মাসে কত টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে ? এবং (ঘ) আজ পর্যন্ত এজন্যে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং মোট কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে?

জনাব মসিহউদ্দিন আহ্‌মদ (মন্ত্রী জনাব এ.এস.এম. আবদুর রহ্‌মানের পক্ষ থেকে) ঃ

☆ (ক) প্রশ্নের জবাবে উপস্থাপিত বিবৃতি ঃ

ক্যাম্পের স্থান	শরণার্থীর সংখ্যা
কলিকাতা	
আলীপুর	১৮১৪
লোয়ার চিৎপুর রোড	১৮৬১
বলাই দত্ত স্ট্রীট	১১৪৮
মির্জাপুর স্ট্রীট	১২৭২
লিটন স্ট্রীট	১২৪০
ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড	৪৯২
নিকাশী পাড়া	৯১২
প্রিন্সেপ স্ট্রীট	৪২৭
রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট	৬২৬
বেলগাছিয়া	৬৫৭
সার্কাস স্কোয়ার	৬৪৩
সন্তোষপুর	৫৯৪
হেষ্টিংস	২৩৫
বলমুকুন্দ স্যাকার রোড	১০০০
হুগলী	
পাণ্ডুয়া	১৯৮৪
বান্ডেল	২৯৫
অন্যত্র	৭৭২৪
দিনাজপুর	
বি-আর-ক্যাম্প	৬০৫০
বাঁকুড়া	
বিষ্ণুপুর	৩৬৯৬
বর্ধমান	
কেন্দুলিয়া	৫৫৫১
সাধাইগঞ্জ	৩২২১
ময়রা	৩২২২
নাংখা	৩৪৪
চান্দা	১৫৪৮
বসুরা	১৩৭৪
নিমডাঙ্গা	১২১৪
শ্রীপুর	৯৩৮
নবাবনগর	৫০০০
কাশীপুর	৩০০০
শালকুনি	২০০০
হাওড়া	
ফরশোর রোড	২২৮৯
মেদিনীপুর	
শালবনী (১)	৪৯০০
শালবনী (২)	২৭০০
দিগরী	১০০০
নদীয়া	১৪
মুর্শিদাবাদ	৭৭৩
জলপাইগুড়ি	৭৫
বীরভূম	৩৩৯
রাজশাহী	৩৭৩
খুলনা	৪০০

ক) পরিষদে উপস্থাপিত বিবৃতি দ্রষ্টব্য। ★ খ) হ্যাঁ।

গ) ভরণ-পোষণের জন্যে মাথাপ্রতি ১৮ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে।

ঘ) এ পর্যন্ত কত টাকা ব্যয় হয়েছে তা সংগ্রহ করতে সময় লাগবে; তবে তাদের ভরণ-পোষণ, পানি সরবরাহ, শিবির মেরামত প্রভৃতির জন্যে গত (১৯৪৭) ২৯শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। তাছাড়া ২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকার কাপড়-চোপড় ও খাদ্যদ্রব্য (দুধ ছাড়া) সরবরাহ করা হয়েছে।

ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—বিহার থেকে আগত বাস্তুচ্যুতদের আর কতদিন বাংলাদেশে রাখার ইচ্ছা সরকার পোষণ করেন?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ যতদিন পর্যন্ত বিহার সরকারের মনোভাব পরিবর্তন না হয়।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি—কিভাবে বাস্তুচ্যুতদের বাংলাদেশে আনা হয়েছে ? কেমন করে তারা বাংলাদেশে আসলো? সরকারই তাদের এনেছেন, না তারা নিজেরাই এসেছে ?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ তারা নিজেরাই এসেছেন।

ডঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় ঃ মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি—অন্যত্র আশ্রিত বাস্তুত্যাগী বলতে তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ অন্যান্য জেলায় স্থানীয় অধিবাসীরাও তাদের আশ্রয় দিয়েছে।

মিস্টার বিমলকুমার ঘোষ ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—বাংলা সরকারের জনৈক কর্মচারিকে যে বিহার প্রেরণ করা হয়েছে, তা তিনি জানেন কিনা, যদি পাঠানো হয়ে থাকে তবে কেন পাঠানো হয়েছে ?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ বিহারের রিলিফ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের জন্যে।

জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ চৌধুরী ঃ মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি—বিহার থেকে যে সকল বাস্তুচ্যুত বাংলাদেশে এসেছে, তার ব্যয় বহনের জন্যে বিহার সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে কি?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলছে।

ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী ঃ মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি—বিহারে শান্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গীয় সরকার বিহার থেকে আগত শরণার্থীদের বিহারে ফেরত পাঠাতে রাজি আছেন কি?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ শরণার্থীদের মতে বিহারের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়।

জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ চৌধুরী ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—বিহার থেকে আগত শরণার্থীদের মধ্যে কতজন কৃষক, কতজন ব্যবসায়ী এবং কতজন চাকরিজীবী ?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ নোটিস চাই।

ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী ঃ মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি—তাদের স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে রাখার কোনো পরিকল্পনা বঙ্গীয় সরকারের আছে কি?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ এখনও সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

www.pathagar.com

মিস্টার প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী : মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি—মূল প্রশ্নের (ক) অধ্যায়ের জবাবে যে বিবৃতি দাখিল করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, কলকাতা থেকে আরম্ভ করে বাংলার মফস্বল জেলাগুলোর যে সব এলাকা হিন্দুপ্রধান সে সব এলাকায়ই বিহার থেকে আগত শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়া হয়েছে। এটা লীগ সরকারের পাকিস্তান পরিকল্পনার অংশ কি না?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ : না। এসব এলাকা বিহারের নিকটবর্তী, তাই তাদের সেখানে আশ্রয় দেয়া হয়েছে।

মিস্টার নিশীথনাথ কুণ্ডু : দিনাজপুর শহরে ৬ হাজার বিহারী শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে; কিন্তু তাদের জন্যে কাপড়, চিনি ও কেরোসিন তেলের বিশেষ কোটা দেয়া হয়নি। এতে করে দিনাজপুরের স্থায়ী বাসিন্দাদের যাতে অসুবিধা না হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্যে উল্লিখিত দ্রব্যের কোটা বাড়ানো প্রয়োজন বলে কি মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ : সরকার এ ব্যাপারে দৃষ্টি রাখবেন।

মিস্টার বিমলচন্দ্র ঘোষ : কয়েক মিনিট আগে প্রদত্ত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—যে কর্মচারিটিকে বিহারে পাঠানো হয়েছে, বিহার সরকারের আমন্ত্রণক্রমেই তাকে সেখানে পাঠানো হয়েছে কি?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ : না।

জনাব খোদা বক্স : মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, বহরমপুর মহকুমা সদরে অবাঞ্ছিত ক্যাম্পে অবস্থানরত শরণার্থীরা স্থানীয় সরকারি কর্মচারিদের সহানুভূতিশীল মনোভাবের অভাবে নিয়মিত সাহায্য পাচ্ছেন না, সে সম্পর্কে সরকার জানেন কি?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ : সরকার এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ : মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি—কেন বঙ্গীয় সরকারের কর্মচারিকে বিহারে প্রেরণ করা হয়েছে?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ : এর জবাব আগেই দিয়েছি।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ : মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি—বিহার সরকারের সাথে আলোচনা বা তাদের সহযোগিতা ছাড়া বিহারে কিভাবে সাহায্য ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ : সরকারি কর্মচারিটি বিশেষভাবে বিহারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ চৌধুরী : মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি—বিহার থেকে যে সব শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করছেন তাদের দুর্দশা লাঘবের জন্যে এ পর্যন্ত বিহার সরকার কি করেছেন?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ : কিছুই না।

ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী : মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—বিহার থেকে আগত শরণার্থীদের কাউকে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে জমি দেয়া হয়েছে কি?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ : না। এখনো হয়নি।

মীর্জা আবদুল হাফিজ : মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—বিহার সরকার বাংলাদেশ থেকে তাদের শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে নিতে বা তাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার কোনো ব্যবস্থা করেছেন কি?

www.pathagar.com

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ এখনো পর্যন্ত অনুরূপ কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি।

মিস্টার বিজয়কৃষ্ণ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি—বিহারের মোহাজেরদের বিহারে ফিরে যেতে বাধা দেয়া হচ্ছে কি?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ না।

মিস্টার বিজয়কৃষ্ণ সরকার ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—নোয়াখালী থেকে বাস্তুচ্যুতদের প্রত্যেককে মাসিক যে হারে সাহায্য দেয়া হয়েছে, বিহার থেকে আগত শরণার্থীদের সে হারে সাহায্য দেয়া হচ্ছে কি?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ হ্যাঁ, একই হারে দেয়া হচ্ছে।

মিস্টার খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ঃ সৈয়দপুরে বিহারী শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়া হয়েছে, মন্ত্রী মহোদয় তা জানেন কি?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ তারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে।

মিস্টার রাজেন্দ্রনাথ সরকার ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—খুলনার কোথায় ৪০০ শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে?

স্পীকার ঃ এ প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। তারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—মুসলিম লীগের আসন্ন প্রাদেশিক কাউন্সিল সভায় সভাপতি পদপ্রার্থীর জন্যে বিশেষ প্রার্থীকে সমর্থনকারী একদল মুসলমানের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে বিহার থেকে আগত শরণার্থীদের ব্যবহার করা হচ্ছে বলে কতিপয় মুসলিম পত্রিকায় যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা তিনি জানেন কি?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ অনুরূপ কোনো খবর আমার জানা নাই।

ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—বিহার থেকে আগত কোনো শরণার্থীকে বঙ্গীয় সরকারের চাকরিতে নিয়োগ করা হয়েছে কি না?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ নোটিস চাই।

জনাব হাবিবুল্লাহ চৌধুরী ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—বিহার থেকে আগত শরণার্থীদের জন্যে বঙ্গীয় সরকার আজ পর্যন্ত যে অর্থ ব্যয় করেছেন তা বিহার সরকারের কাছ থেকে আদায় করার জন্যে বঙ্গীয় সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ এই প্রশ্নের জবাব আগেই দিয়েছি। বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

মিস্টার মনোরঞ্জন ধর ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—বর্ধমানে আশ্রিত বিহারী শরণার্থীরা সেখানে গণ্ডগোল পাকাচ্ছে এবং স্থানীয় লোকদের হয়রানি করছে বলে সংবাদপত্রে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা তিনি দেখেছেন কি?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ এরকম কোনো খবর সরকার পাননি।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—বিহার থেকে আগত শরণার্থীদের বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ব্যবস্থার জন্যে সরকার কোনো পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা চিন্তা করেছেন কি?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ এ প্রশ্নের জবাব আগেই দিয়েছি।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ জনাব, তিনি জবাব দিয়েছেন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। আমি জানতে চাই, তাঁরা তা বিবেচনা করছেন কি না।

www.pathagar.com

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ এ ব্যাপারে আমার আর কিছু বলার নেই।

মিস্টার খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—প্রকৃত প্রস্তাবে কতজন শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ নোটিস চাই।

মিস্টার নিশীথনাথ কুণ্ডু ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—সদস্যদের মধ্যে বিলিকৃত বিবৃতিতে বিহার থেকে আগত শরণার্থীদের যে সংখ্যা দেয়া হয়েছে, তা আজকের সংখ্যা, না কয়েক সপ্তাহ আগের সংখ্যা? অর্থাৎ আমি বলতে চাই, বিবৃতিতে উল্লিখিত সংখ্যা আগের সংখ্যা থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে, না হ্রাস পেয়েছে?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ ২০শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাদের যে সংখ্যা ছিলো বিবৃতিতে তারই উল্লেখ করা হয়েছে।

মিস্টার নিশীথনাথ কুণ্ডু ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—ঐ তারিখের পর মোহাজেরদের সংখ্যা বেড়েছে, না কমেছে?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ নোটিস চাই।

মিস্টার প্রতাপচন্দ্র গুহরায় ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রিত শরণার্থীরা নিজ নিজ গ্রামে বসবাস করার জন্যে বিহারে ফিরে যাচ্ছেন, একথা সত্য কি না?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ আমি এমন কোনো খবর জানি না।

মিস্টার দেবেন্দ্রনাথ সেন ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, কয়েকদিন আগে বর্ধমান জেলার শ্রীপুর ক্যাম্পে আশ্রিত শরণার্থীদের সাথে স্থানীয় পুলিশের সংঘর্ষ হয়?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ আমি জানি না।

মিস্টার নিশীথনাথ কুণ্ডু ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—ভরণ-পোষণ ভাতা দেয়ার আগে বিহারী শরণার্থীদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে কোনো প্রকার তদন্ত করা হয়েছিল কি না?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ না, তা সম্ভব ছিলো না।

জনাব আবদুস সালাম ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি—বর্ধমানে অবস্থানরত বিহারের মোহাজেরদের ওপর পুলিশ কর্মচারিরা নির্যাতন চালাচ্ছেন?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ এই অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করা হচ্ছে।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—বিহারের মোহাজেরদের ব্যাপারে বঙ্গীয় সরকারের জনৈক কর্মচারিকে বিহার পাঠিয়ে সরকারের কি লাভ হয়েছে? (জনাব মসিহউদ্দিন কিছু জবাব দেন; কিন্তু তা শ্রুতিগোচর হয় না)।

মিস্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ঃ মন্ত্রী মহোদয় দাঁড়িয়ে এমনভাবে জবাব দেবেন কি–যাতে আমরা তা শুনতে পাই?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ মেহেরবানী করে প্রশ্নটি আবার করুন।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ আমার প্রশ্ন ছিলো—বিহারী শরণার্থীদের ব্যাপারে বঙ্গীয় সরকারের কর্মচারিকে বিহারে পাঠিয়ে সরকারের কী লাভ হয়েছে?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ বিহারী শরণার্থীদের ব্যাপারে কর্মচারিটিকে প্রেরণ করা হয়নি-রিলিফ কার্যের সমন্বয় সাধনের জন্যেই তিনি সেখানে আছেন।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—বিহারের রিলিফের ব্যাপারে বঙ্গীয় সরকারের কর্মচারি সেখানে কি করছেন?

www.pathagar.com

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ বিভিন্ন রিলিফ সংস্থার কাজে সমন্বয় সাধন করছেন।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—বিহার সরকার যখন সহযোগিতা করছে না, তখন সরকার কর্তৃক রিলিফের সমন্বয় সাধন বলতে তিনি কি বুঝাতে চান?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ বাংলাদেশ থেকে কয়েকটি সাহায্য সংস্থা বিহারে গিয়েছে। এসব সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধনের জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারিটি সেখানে প্রেরিত হয়েছেন।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—কেন সরকারি কর্মচারিটি সেখানে প্রেরিত হলো; বিহারে যে রিলিফের কাজ চলছে তা সরকারি, না বেসরকারি মহলের?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ বিহার সরকারকে সাহায্য করার জন্যে কয়েকটি রিলিফ পার্টি বিহারে প্রেরিত হয়েছে। সব সংস্থার কাজের ও সাহায্যের সমন্বয় সাধনকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্মচারি তথায় প্রেরিত হয়েছেন।

জনাব বদিউজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস ঃ উত্তরবঙ্গের জনসাধারণ বিহার থেকে আগত শরণার্থীদের স্বাগত জানাতে আগ্রহান্বিত বিধায় উত্তরবঙ্গে আরো ক্যাম্প খোলার সম্ভাবনা বিবেচনা করতে মন্ত্রী মহোদয় রাজি আছেন কি?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ সরকার বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ মন্ত্রী মহোদয় সংক্ষেপে জানাবেন কি—বঙ্গীয় সরকারের কর্মচারি কর্তৃক বিহারের রিলিফ কার্যের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্য কি এবং বিহার সরকার যখন বঙ্গীয় সরকারের কর্মচারির কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নন, তখন কিভাবে সমন্বয় সাধন করবেন?

স্পীকার ঃ আমার মনে হয়, এ প্রশ্নের যথোপযুক্ত জবাব দেয়া হয়েছে। সরকারি অথবা বেসরকারি রিলিফের সমন্বয় সাধনের জন্যেই কর্মচারিটিকে পাঠানো হয়েছে।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ আমরা জানি না, বঙ্গীয় সরকার সেখানে কাকে রিলিফ কার্যের জন্যে পাঠিয়েছেন? এ প্রশ্নের কোনো জবাব আমরা এখনো পাইনি। এ গেল আমার প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয়ত, বিহারে যদি বেসরকারি পর্যায়ে রিলিফের ব্যবস্থা হয়ে থাকে তবে একজন সরকারি কর্মচারিকে বেসরকারি রিলিফকার্যে সহযোগিতার জন্যে প্রেরণ করা সরকার প্রয়োজন মনে করলেন কেন? মন্ত্রী মহোদয় এ প্রশ্নের জবাব দেন নাই।

স্পীকার ঃ হ্যাঁ, তিনি জবাব দিয়েছেন।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ স্যার, সে উত্তরটা কী?

স্পীকার ঃ তার জবাব হলো—সরকারি অথবা বেসরকারি সাহায্য কার্যের সমন্বয় সাধনের জন্যে কর্মচারিটিকে সেখানে পাঠানো হয়েছে।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ বিহারে বঙ্গীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোনো রিলিফের ব্যবস্থা হয়েছে কি?

স্পীকার ঃ সরকার শুধু একজন কর্মচারি প্রেরণ করেছেন; রিলিফ পাঠাননি—আপনি তো তা জানেনই।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ স্যার, আমার একটিমাত্র নিবেদন আছে। আপনি সরকারের জবাবের যথোপযুক্ততা সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়েছেন কী? তবে আমি আশ্বস্ত হতে

www.pathagar.com

পারিনি; আপনি যদি সরকারের জবাবে আশ্বস্ত বোধ করে থাকেন, তবে আমি আর চাপাচাপি করবো না। আমি শুধু জানতে চাই যে, বঙ্গীয় সরকার বিহারে কোনো রিলিফ পার্টি পাঠিয়েছেন কি না?

স্পীকার ঃ সরকার এভাবে জবাব দিয়েছেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের রিলিফের জন্যে বেসরকারি সাহায্য সংস্থার কর্মীদের সেখানে পাঠানো হয়েছে। তাদের ও বিহার সরকারের রিলিফ কার্যের সমন্বয় সাধনের জন্যে বঙ্গদেশ থেকে একজন সরকারি কর্মচারি সেখানে পাঠানো হয়েছে।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ মন্ত্রী মহোদয় তাহলে স্বীকার করেন যে, বাংলা থেকে প্রেরিত বেসরকারি রিলিফ টিম ও বিহার সরকারের রিলিফ কার্যের সমন্বয় সাধনের জন্যে বঙ্গীয় সরকারের কর্মচারিটিকে বিহারে পাঠানো হয়েছে।

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ বিহার সরকারের রিলিফের সমন্বয় সাধনের জন্যে, যাতে কিনা কোথাও একাধিকবার, আবার কোথাও আদৌ সাহায্য না পাওয়ার মতো অবস্থা না থাকে।

মিস্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—বিহার সরকারের অনুরোধক্রমেই বঙ্গীয় সরকারের কর্মচারিটিকে বিহারে পাঠানো হয়েছে কি না?

স্পীকার ঃ এ প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। বিহার সরকারের অনুরোধক্রমে নয়, বঙ্গীয় সরকারের উদ্যোগে তাকে পাঠানো হয়েছে।

মিস্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—কতজন কর্মচারিকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ মাত্র একজনকে।

মিস্টার নিহারেন্দু দত্ত মজুমদার ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—সংশ্লিষ্ট কর্মচারিটির নাম কি এবং এ ব্যাপারে বিহার সরকারের কাছ থেকে বঙ্গীয় সরকার কোনো অনুরোধ পেয়েছিলেন কি?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ (নোটিস চাই)।

জনাব হাবিবুল্লাহ্ চৌধুরী ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—মোহাজেরদের প্রত্যেকের খোরপোষ বাবদ মাসিক যে ১৮ টাকা দেয়া হয় তা যথেষ্ট কি না?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ সরকার তা যথেষ্ট বলে মনে করেন।

মিস্টার বিমল চন্দ্র সিংহ ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—বিহারে বঙ্গীয় সরকারের উক্ত কর্মচারিটি অনভিপ্রেত এবং বঙ্গীয় সরকার অফিসার না পাঠিয়ে জিনিসপত্র পাঠাতে পারেন বলে বিহার সরকার যে প্রেসনোট প্রকাশ করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারিটি কিভাবে সেখানে রিলিফ কার্যের সমন্বয় সাধন করবেন?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ বিহার সরকারের প্রেসনোট পরে প্রকাশিত হয়েছে।

মিস্টার বিমল চন্দ্র সিংহঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি–বিহার সরকারের সাথে পূর্বাহ্নে কোনো প্রকার আলোচনা ছাড়াই বঙ্গীয় সরকার একজন কর্মচারিকে বিহারে প্রেরণ করেছেন বলে বিহার সরকার যে প্রেসনোট দিয়েছেন তা তিনি জানেন কি না?

স্পীকার ঃ এর আগে এ প্রশ্নের জবাব এইমর্মে দেয়া হয়েছে যে, বিহার সরকারের কোনো রকম অনুরোধ ছাড়াই বঙ্গীয় সরকার নিজের উদ্যোগে উক্ত কর্মচারিকে প্রেরণ করেছেন।

www.pathagar.com

মিস্টার বিমল চন্দ্র সিংহ ঃ স্যার, আমার প্রশ্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি জানতে চাই—বিহার সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও পূর্বাহ্নে কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই ঐ কর্মচারিকে প্রেরণ করা হয়েছে কি না?

স্পীকার ঃ পরবর্তী পর্যায়ে বিহার সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

মিস্টার নিহারেন্দু দত্ত মজুমদার ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—বঙ্গীয় সরকারের উক্ত কর্মচারিটিকে বিহারে পাঠাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ নোটিস চাই।

মিস্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, জনসাধারণের রাজস্বের কোনো্ খাত থেকে এই বিশেষ ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ নোটিস চাই।

মিস্টার নিশীথনাথ কুণ্ডু ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—দিনাজপুর থেকে সরকার এমন কোনো সংবাদ পেয়েছেন কি যে, মুসলমানদের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানকারী বিহারী শরণার্থীরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' প্রভৃতি ধ্বনি উচ্চারণ করে। এ যদি সত্য হয়, তবে সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ শরণার্থীরা এমন কিছু করেনি।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ আর একটি অতিরিক্ত প্রশ্ন, স্যার।

স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্যবৃন্দ এ বিষয়ের জন্যে ২০ মিনিট সময় নিয়েছেন। আমার মনে হয়, এ প্রশ্ন নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ আপনি মেহেরবানী করে আর একটি প্রশ্ন করতে দেবেন কি?

স্পীকার ঃ একঘণ্টা ধরে কেবল অতিরিক্ত প্রশ্নের অবতারণা করতে দেয়া যেতে পারে না। সময় নির্দিষ্ট হওয়া দরকার।

মিস্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ঃ স্যার, আজকের কর্মসূচিতে মাত্র তিনটি প্রশ্ন রয়েছে। আলোচ্য প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আরো কিছু সময় দেয়ার জন্যে অনুরোধ করছি।

স্পীকার ঃ যেহেতু বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাই এর জন্যে ২০ মিনিট সময় দেয়া হয়েছে। এখন সময় নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আইনবিদ আছেন। এভাবে সওয়াল-জওয়াব চলতে থাকলে এর শেষ হবে না।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—বিনা অনুমতিতে, এমনকি না চাইতেও এক প্রদেশের সরকারের অন্য প্রদেশে এই ধরনের ব্যাপারে কর্মচারি প্রেরণ তিনি কি সমীচীন বলে মনে করেন?

স্পীকার ঃ যদিও এই অতিরিক্ত প্রশ্নগুলো মূল প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, তবু তা উত্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মূল প্রশ্নে বাংলাদেশে বিহারের শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়া সম্পর্কে তথ্য জানতে চাওয়া হয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, সদস্যগণ বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন কর্মচারির ব্যাপারেই তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। যে সব শরণার্থী বিহার থেকে এখানে এসেছে তাদের ব্যাপারেই মূল প্রশ্নটি সংশ্লিষ্ট ছিলো, সেদিকে সবার খেয়াল রাখা দরকার।

www.pathagar.com

মিস্টার বিমল চন্দ্র সিংহ ঃ আমি নিবেদন করতে চাই যে, (খ) প্রশ্নের জবাব থেকেই অতিরিক্ত প্রশ্নগুলোর উদ্ভব হয়েছে। প্রশ্নটি ছিলো মোহাজেরদের জন্যে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, তা বঙ্গীয় সরকার বহন করছেন কি-না। প্রশ্নটির হ্যাঁ-সূচক জবাব থেকেই অতিরিক্ত প্রশ্নগুলোর উৎপত্তি। এখন দেখা যায়, অফিসার প্রেরণের ব্যয়ও বঙ্গীয় সরকার বহন করছেন। এই অফিসার প্রেরণের জন্যে যে ব্যয় হয়েছে তা থেকেই অতিরিক্ত প্রশ্নগুলোর উদ্ভব হয়েছে।

স্পীকার ঃ আপনার যুক্তিটি কষ্টকল্পিত।

মিস্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ঃ পরিষদ এই তথ্য জানতে চায় যে, প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী বিহারের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপ-আলোচনা করছেন, না বঙ্গীয় সরকারের সাহায্য দফতরের কর্মচারি আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন? বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্পীকার ঃ যদি কোনো কর্মচারি আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন তবে নিশ্চয়ই তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমেই তা করছেন।

মিস্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ঃ স্যার, আমি নিবেদন করতে চাই যে, এই তথ্যটিই সরকার সরবরাহ করতে পারেন না। আমি মন্ত্রী মহোদয়কে এই তথ্যই জানাতে বলেছিলাম যে, কোনো কর্মচারিকে আলাপ-আলোচনা চালাতে নিযুক্ত করা হয়েছে?

স্পীকার ঃ আমার মনে হয়, বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়; কেননা আমরা সরকারি নীতি সম্পর্কে জানতে চাই। সরকার কাকে নিযুক্ত করেছেন তাতে কিছু আসে-যায় না। আমার মনে হয়, বিষয়টি জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নয়। কোনো কর্মচারিকে কোনো কাজে নিযুক্ত করা হলো, কোনো কর্মচারি পত্রের মুসাবিদা করলেন বা কে তাতে সই করলেন, তার কোনো গুরুত্ব নেই।

মিস্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ঃ প্রশ্নকর্তাদের ওপর সুবিচার করা হচ্ছে না।

স্পীকার ঃ কোনোটি গুরুত্বপূর্ণ তাই স্থির করা যাক, যাতে জনস্বার্থ সংরক্ষণ করা যায়। সরকার কোনো আলোচনা চালাচ্ছেন কি-না, এই প্রশ্নেই আমাদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখি।

জনাব হাবিবুল্লাহ চৌধুরী ঃ মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—পরিষদের কয়েকজন সদস্য বিহার সরকারের পক্ষে ওকালতি করছেন কেন?

মিস্টার বিমল চন্দ্র সিংহঃ অধিকারের প্রশ্ন স্যার। কোন্‌টি গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন্‌টি গুরুত্বপূর্ণ নয়, এ প্রশ্নে আপনার রুলিং চাই। আমার পরবর্তী বক্তব্য হলো–বিধি অনুযায়ী উত্থাপনযোগ্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেজন্যে কি প্রশ্ন উত্থাপন করতে না দেয়া বাঞ্ছনীয়? আমার নিবেদন, বিধি মোতাবেক উত্থাপনযোগ্য হলে প্রশ্ন উত্থাপন করতে না দেয়ার কোনো অধিকার স্পীকারের নেই এবং মন্ত্রীও তার জবাব দিতে বাধ্য। সরকারের জবাব কি হবে তা স্পীকারের বিচার্য নয়।

স্পীকার ঃ মামুলী ব্যাপার বলে মনে করলে তা উত্থাপন করতে না দেয়ার পূর্ণ অধিকার স্পীকারের আছে।

মিস্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ঃ বৈধতার প্রশ্ন স্যার। আপনার কাছ থেকে জানতে পারি কি—আমার কোন্ প্রশ্নটি মামুলী বিধায় আপনি বাতিল করছেন? এ ব্যাপারে আপনার রুলিং চাই।

স্পীকার ঃ সরকার যখন জবাব দিয়েছেন যে, বিহারের শরণার্থীদের প্রশ্নে সরকার

www.pathagar.com

বিহার সরকারের সাথে আলোচনা করছেন তখন এই তথ্যই সংশ্লিষ্ট সদস্যের প্রশ্নের জবাব বলে আমি মনে করি। কিন্তু কোন্ কর্মচারি আলোচনা চালাচ্ছেন—এ প্রশ্নটি আমি তুচ্ছ বলে মনে করি। তাই তা আমি বাতিল করেছি।

মিস্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ঃ আমি পরিষ্কার জবাব চাই, আলোচনার ব্যাপারে বাংলার প্রধানমন্ত্রী প্রথমে বিহারের প্রধানমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করেছেন কি না?

স্পীকার ঃ আপনি এভাবে প্রশ্নটি করেননি। এখন আপনি আসল প্রশ্ন থেকে দূরে সরে গিয়েছেন।

মিস্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ঃ আপনি আমাকে প্রশ্নটি উত্থাপনই করতে দেননি। প্রশ্নটি আমি এভাবে করতে চাই—সাহায্য ও পুনর্বাসন প্রভৃতির কাজে বঙ্গীয় সরকার একজন কর্মচারিকে নিযুক্ত করেছেন বটে, তবে আমি জানতে চাই যে, আলোচনা চালানোর জন্যে সরকার কোনো মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেছেন কি না?

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ প্রধানমন্ত্রী ও সাহায্য মন্ত্রী বিহার সরকারের সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং আলোচনা চলছে।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ স্যার, আমার প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়নি।

জানব হাবিবুল্লাহ চৌধুরী ঃ জনাব, মিস্টার দত্ত মজুমদার ৩ বা ৪টি প্রশ্ন করেছেন, মিস্টার ঘোষ ৪ বা ৫টি এবং মিস্টার সিংহও অনুরূপসংখ্যক প্রশ্ন করেছেন—এতজনকে আপনি প্রশ্ন করতে দিচ্ছেন····।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ স্যার, আমার প্রশ্নটিই মিস্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার এইভাবে উত্থাপন করেছেন—কোন প্রদেশের সরকারের সাথে আলোচনা না করে অপর এক প্রদেশের কর্মচারিকে এই ধরনের কাজে সেই প্রদেশে প্রেরণ করা মন্ত্রী মহোদয় সমীচীন মনে করেন কি? বিশেষ করে যখন সংশ্লিষ্ট প্রদেশ উক্ত কর্মচারিকে অবাঞ্ছিত বলে মন্তব্য করেছেন?

স্পীকার ঃ এ প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। আপনি অনেক প্রশ্ন করেছেন। মন্ত্রী মহোদয়ের জবাব হলোঃ বঙ্গীয় সরকার নিজের উদ্যোগে বিহার সরকারের সাথে আলোচনা ছাড়াই একজন কর্মচারিকে প্রেরণ করেছিলেন; কিন্তু বিহার সরকার বিষয়টি জানালে তাকে ফিরিয়ে আনা হয়।

মিস্টার বিমল কুমার ঘোষ ঃ এটা বাঞ্ছনীয় হয়েছে কি? এই আমার প্রশ্ন। এই প্রশ্ন করার এখতিয়ার আমার নাই কি? কেন মন্ত্রী মহোদয় জবাব দেননি।

জনাব মসিহউদ্দিন আহমদ ঃ জবাব দেয়া প্রয়োজন মনে করিনি। এটি একটি মতামতের প্রশ্ন মাত্র।

মিস্টার জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভট্টচার্য ঃ এ যদি মতামতের প্রশ্ন হয় তবে মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি—এ ব্যাপারে মন্ত্রিসভার মতামত কি?

স্পীকার ঃ সরকার জবাব দিয়েছেন। আর প্রশ্ন করতে দেয়া যেতে পারে বলে আমি মনে করি না।

www.pathagar.com

আমি এমন একটি শাসনতন্ত্র চেয়েছিলাম, যা…

[১৯৫৬ সালের ৩১শে জানুয়ারি করাচীতে তদানীন্তন গণপরিষদে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে জনাব সোহরাওয়ার্দী শাসনতন্ত্র বিলের ওপর যে ঐতিহাসিক বক্তৃতা করেছিলেন, তার পূর্ণ বিবরণ ঃ]

মহিমান্বিত ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি—সেই আল্লার নামে শুরু করছি, সঠিক পথ-নির্দেশের জন্যে প্রতিদিন আমরা যাঁর শরণ নিই, যাঁর উদ্দেশে মস্তক অবনত করি।

সব কিছুর আগে আমি জনাব আই.আই. চুন্দ্রীগড়কে গণপরিষদে এই শাসনতন্ত্র বিল পেশের সৌভাগ্যের জন্যে অভিনন্দিত করছি। এ ব্যাপারে তিনি যে পরিশ্রম করেছেন, এই পরিষদে আমি তার সপ্রশংস স্বীকৃতি জ্ঞাপন করছি। আমরা জানি, অবিমিশ্র নিষ্ঠা ও পূর্ণাঙ্গ আন্তরিকতা নিয়ে তিনি রাত-দিন কাজ করে গেছেন। এজন্যে দেশ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমি জানি, এই শাসনতন্ত্র বিলে এমন অনেক বিধান রয়েছে, আমাদের মতো যেগুলো জনাব চুন্দ্রীগড়ের কাছেও অসঙ্গত এবং অনভিপ্রেত ঠেক্ছে। তাঁর মনের গভীরে লালিত বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে আমরা অবহিত রয়েছি বলেই আমি একথা বলছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি নিঃসন্দেহে এবং বিনা দ্বিধায় একথা বলতে পারি যে, জনাব চুন্দ্রীগড় শাসনতন্ত্র বিলের প্রতিটি বিধি-ব্যবস্থাকেই সমর্থন করবেন। আর এ সব ব্যবস্থা পাকিস্তানের কল্যাণের জন্যেই বিলে সংযোজিত করা হয়েছে বলে তিনি নিজেকে এবং আমাদের সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন। এ প্রসঙ্গে আমি প্রধানমন্ত্রীকেও অভিনন্দিত করছি। তাঁর আমলে এবং তাঁর পরিচারলাধীনে শাসনতন্ত্র বিল প্রণয়ন করা হয়েছে বলে নয়—অন্যসব কাজ ফেলে রেখে এ ব্যাপারে তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তার জন্যেই তাঁকে আমি অভিনন্দিত করছি। আমরা সবাই জানি, এই গণপরিষদ যাতে শাসনতন্ত্র বিবেচনা করার সুযোগ পেতে পারে, প্রধানমন্ত্রী তার জন্যেই এমন নিরলসভাবে কাজ করেছেন। শাসনতন্ত্র বিল বিবেচনার আগে গণপরিষদ ভেঙ্গে না দেয়ার সৌভাগ্যের জন্যে এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সীমিত হয়নি বলেও তাঁকে আরেকবার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এ শাসনতন্ত্র কি আমরা চেয়েছি ?

পরিষদের বিভিন্ন মহল হতে বলা হয়েছে যে, শাসনতন্ত্রের জন্যে সারাদেশ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো সদস্য এমন কথাও বলেছেন যে, জনসাধারণ শাসনতন্ত্রের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা এ জন্যে আর্তনাদ শুরু করেছে, হাহাকার করছে আর ত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। ভালো-মন্দ কিংবা জনস্বার্থ-নিরপেক্ষ যে কোনো রকমের একটি শাসনতন্ত্রের জন্যে নাকি তারা উদ্গ্রীব! যথাসম্ভব সত্বর যে কোনো ধরনের একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে আমিও নাকি খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলাম এবং সে প্রসংগে আমার বহু উক্তি ও বক্তৃতার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। এর সবটুকু অবশ্য সত্যের অপলাপ বলা যায় না।

www.pathagar.com

আমি সত্যি একটি শাসনতন্ত্র চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম এমন একটি শাসনতন্ত্রের খসড়া পরিষদে পেশ করা হোক যা দেশের দুই অংশের কাছেই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হবে, দুই অংশের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে যার রূপরেখা অঙ্কিত হবে। কিন্তু আমি এমন শাসনতন্ত্র চাইনি, যা এক অংশের স্বার্থে—এক অংশের কল্যাণের উদগ্র আকাঙ্ক্ষার তাগিদে অন্য অংশের স্বার্থের পরিপন্থী হবে। আমি সত্যি যত শীঘ্র সম্ভব এমন একটি শাসনতন্ত্র পাসের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে থেকেছিলাম, যার ফলে পরোক্ষ নির্বাচনের যুগের অবসান ঘটবে—যার ফলে জনগণের কাছে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের এই গণপরিষদের সদস্যপদসহ বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল তবিয়তে থাকার সুযোগ লাভের পক্ষে উন্মুক্ত এই আমলটির হাত থেকে আমরা রেহাই পাবো। কিন্তু বর্তমানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? যারা নিজেদের জন্যে কোনো নির্বাচনী এলাকা খুঁজে পাচ্ছেন না, যারা কস্মিনকালেও নিজেদের প্রদেশ হতে নির্বাচিত হতে পারবেন না, তারা বহু দায়িত্বপূর্ণ পদ আলো করে রয়েছেন—এই গণপরিষদের সদস্যপদেও তারা বহাল রয়েছেন! একটি সুষ্ঠু শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে এই অবস্থা থেকে আমি মুক্তি চেয়েছিলাম। এই ছিলো আগাগোড়া আমার অভিমত এবং এখনো আমি এই অভিমতেরই অভিসারী। আমি যথাশীঘ্র সম্ভব দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন চেয়েছিলাম। বলেছিলাম ঃ যত শীঘ্র দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, যত তাড়াতাড়ি জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি পার্লামেন্ট গঠিত হবে, তত তাড়াতাড়ি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে—তার আগে নয়। মানে, আমি বলতে চেয়েছিলামঃ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পার্লামেন্ট গঠনের পরই কেবল দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে; তার এক মুহূর্ত আগেও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস যে, শাসনতন্ত্র বিলের রচয়িতারা যাঁদের দেশের প্রতিনিধিত্বের ধারক বলে মনে করছেন এবং যাঁদের দিয়ে তাঁরা বিলের অনুকূলে বিরাট সমর্থন আদায় করতে পারবেন বলে আশা করছিলেন, তাঁদের কাছ থেকেও তাঁরা যেন সাড়া পাচ্ছেন না। গুণগত বৈশিষ্ট্য বা মানের দিক থেকে বিলটি যে কেমন নিকৃষ্ট এ থেকেই তা বোঝা যাচ্ছে। বিলটি যেমন হবে বলে আশা করা যাচ্ছিলো, এর মান যে রকম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছিলো দুর্ভাগ্যক্রমে বিলটিতে সে সব প্রত্যাশিত গুণের অভাব রয়েছে।

শাসনতন্ত্র বলতে কি বোঝায় ?

শাসনতন্ত্র কথাটা বলতে আদতে আমরা কি বুঝি? কি এর উদ্দেশ্য? আর শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানেরই বা মানে কি? এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য ও অর্থ হচ্ছে ঃ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা বিধান এবং এ-ই হচ্ছে এর মুখ্য ও অভীষ্ট লক্ষ্য।

পরিষদের ওদিককার সদস্যরা যখন বলেন যে, 'আমাদের যে কোনো একটি শাসনতন্ত্র হলেই চলবে', তাতে কি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নের সমাধান হচ্ছে? অথচ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আজ পাকিস্তানের পক্ষে একান্ত জরুরী এবং অপরিহার্য। শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য যদি এমন হয় এবং এই বৈশিষ্ট্যের দরুন যদি শাসনতন্ত্রকে দলীয় রাজনীতির অঙ্গনে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে শাসনতন্ত্র একটি নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত হবে। এর ফলে কিছুতেই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব হবে না। অথচ রাজনৈতিক

www.pathagar.com

স্থিতিশীলতাই হচ্ছে একমাত্র উপায় যার মাধ্যমেই কেবল দেশের সাধারণ কল্যাণে আমরা সবাই সমানভাবে শরিক হওয়ার সুযোগ পেতে পারি। কাজেই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শুধু নামকাওয়াস্তে যেনতেন প্রকারের একটা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করলেই আন্তর্জাতিক বিশ্বে আপনারা মর্যাদা লাভ করতে পারবেন না। বস্তুত, দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকলেই কেবল বহির্বিশ্বে আপনারা মর্যাদার দাবি করতে পারবেন। আপনারা যে সব কাজ করার কথা বলছেন, আপনাদের মধ্যে যে সব সম্ভাবনা রয়েছে বলে বলেছেন, আপনারা সত্যি সেগুলো বাস্তবায়িত বা ফলপ্রসূ করতে সক্ষম হবেন কিনা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মাপকাঠি দিয়েই সারা দুনিয়া তার বিচার করবে। তাই কেবল এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আপনাদের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্যে বিশ্ব আজ আপনাদের দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে।

বিক্ষুব্ধ পূর্ব পাকিস্তান

সংবাদপত্রে আর এই পরিষদের কণ্ঠস্বরে যে বিরোধিতার কথা আমরা শুনতে পাই সেটা কি 'কাগুজে বিরোধিতা', না আদতে জনসাধারণের ইচ্ছা ও অভিপ্রেতের ওপর তার পাকাপোক্ত ভিত রয়েছে—এ বিষয়টি সরেজমিনে যাচাইয়ের জন্যে সম্প্রতি আমি পূর্ব পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলাম। এই সফরে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে তিলমাত্র দ্বিধা না করে আমি বলতে পারি যে, সেখানকার জনসাধারণ এক দারুণ উদ্বেগজনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে—তারা বিচলিত হয়ে পড়েছে। অবস্থা আসলে এর চেয়েও আরো গুরুতর। সেখানে একটি বিরাট রকমের ঝড় প্রত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে এবং এতে আমি অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছি। এখানকার মন্ত্রিসভা (কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা) এবং তাঁদের রচিত শাসনতন্ত্র বিলের ওপর পূর্ব পাকিস্তানের কোনো আস্থা নেই। তারা চায়, তাদের কল্যাণ ও উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে শাসনতন্ত্রে অবশ্যই যথার্থ রক্ষাকবচ বা বিধি-ব্যবস্থা সংযোজিত থাকতে হবে এবং এ বিষয়টির দায়িত্ব কিছুতেই মন্ত্রিসভার 'শাসন কিংবা কুশাসনের' আওতায় ছেড়ে দেয়া চলবে না। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এমন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে যে, তার তীব্র চাপের মুখে সেখানকার মন্ত্রিসভা টিকে থাকতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করতে তারা যেভাবে ইতস্তত করছেন তা থেকেই একথা প্রমাণিত হচ্ছে। তাদের অবস্থা এমন নাজুক হয়ে পড়েছে যে, তারা আইনসভার বৈঠক ডেকে আস্থাভোট লাভের ঝুঁকি নেয়ার সাহস পর্যন্ত পাচ্ছেন না।

কেন্দ্রেও নিশ্চিতভাবে এর প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। আমি অবশ্য আশা করবো যে, এখানেও মন্ত্রিসভা বহাল তবিয়তে থাকুন, ওখানেও মন্ত্রিসভা বহাল তবিয়তে থাকুন, কিন্তু তার জন্যে একটি কাজ করতে হবে এবং সেটি হচ্ছে ঃ আমাদের এমন ধরনের শাসনতন্ত্র গ্রহণ করতে হবে যা পূর্ব পাকিস্তানের আস্থা লাভ করবে এবং দেশের উভয় অংশের পক্ষে যা সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হবে।

'জাতি' কথাটার তাৎপর্য কি ?

একটি মাত্র উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েই আমি এসব শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব পেশ করছি। শাসনতন্ত্রকে অবশ্য পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও সংহতির নিশ্চয়তা বিধানের উপযোগী হতে হবে। পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে এর ভৌগোলিক পরিসীমায় যারা বসবাস করছে, আমার

www.pathagar.com

আর আমার পার্টির দৃষ্টিতে তারা হচ্ছে এক জাতি—অঞ্চল-ধর্ম-গোত্র-বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে তারা হচ্ছে এক জাতি। তারা কোন্ প্রদেশের বা কোন্ অঞ্চলের, তারা কোন্ বর্ণ বা সম্প্রদায়ের, তারা কোন্ মানবীয় শাখা বা গোষ্ঠীর, তারা কোন্ ধর্মের বা ধর্মশ্রেণীর আমার আর আমার পার্টির কাছে এসব কোনো প্রশ্নের বালাই নেই। আমরা জানি, আমরা সবাই মিলে এক জাতি—এক পাকিস্তানী জাতি। আমাদের রাষ্ট্র হচ্ছে এক ও অভিন্ন আর আমরাও হচ্ছি এক ও অভিন্ন জাতির মানুষ। এ প্রসঙ্গে এখানে বলা যেতে পারে যে, পরিষদের এদিককার (বিরোধীদল) কয়েকজন সদস্য আমরা দুটি আলাদা অঞ্চলের লোক এবং আমাদের একটি জাতিতে পরিণত করা উচিত বলে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁরা এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, দেশের দুই অংশের মধ্যে অনেক বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। এবং এই অভিমত ব্যক্ত করে তাঁরা এসব বৈষম্য অপনোদনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিরোধী দলের ওপর ঢিল ছোড়ার জন্যে যে সব পত্রিকা সুযোগের সন্ধানে সব সময় ওঁৎ পেতে থাকে, এই অভিমত তাদের বিরাট গাত্রদাহের কারণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাদের বোঝা উচিত, বিভিন্ন বিষয়ের প্রেক্ষিতে জাতি, রাষ্ট্র, জনসাধারণ একথাগুলোর বিভিন্ন রকম নির্গলিতার্থ হয়। 'জাতি' কথাটিকে যাঁরা কেবল একটি অর্থে—মানে, পাকিস্তানী জাতি অর্থে ব্যবহারের জন্যে জোর দিচ্ছেন, তাঁরা সে সময় কোথায় ছিলেন যখন দুই জাতিত্বের অর্থে পাকিস্তানে দুটি জাতি রয়েছে বলে একশ্রেণীর লোক একটি থিওরির অবতারণা করেছিলেন। 'জাতি' শব্দটিকে যদি একটি অর্থেই ব্যবহার করতে হয়, তবে কেন তাঁরা সে সময় বাধা দেননি? আমরা দুটি আলাদা শ্রেণীর লোক বলে জনাব আবুল মনসুর যে কথা বলেছেন, তাঁরা তাতে গোটা পাকিস্তানী জাতিকে দুই আলাদা জাতিতে বিভক্ত করার একটা গন্ধ খুঁজে পেয়েছেন! এখন অবস্থাটা কি? আর তখন অবস্থা কি ছিলো? তখন কেন তাঁরা লা-জওয়াব ছিলেন, তখন কেন তাঁরা মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন? আর তখন এই পত্রিকাগুলোই-বা কোথায় ছিলো? তারা তখন কেন এগিয়ে আসেনি? এবং কেন তখন তারা একথা বলেনি যে ঃ 'না, আমরা দুই জাতি নই—এবং আমাদের রাষ্ট্র এক অখণ্ড রাষ্ট্র'? আর আজ কেবল বিরোধী দলের প্রতি ঢিল ছোড়ার পাঁয়তারা দেয়ার তাগিদেই তারা তাদের পাকিস্তানী জাতীয়তার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে।

আমি আগেই বলেছি, বিভিন্ন বিষয়ের প্রেক্ষিতে বা অবস্থা ভেবে 'জাতি', 'জনসাধারণ', 'রাষ্ট্র' প্রভৃতি শব্দের বিভিন্ন নির্গলিতার্থ হয়। মানে, অবস্থা বা ক্ষেত্রভেদে এ শব্দগুলো বিভিন্ন রকমের তাৎপর্য বহন করে। ভারত বিভাগের উদ্দেশ্যে যে দ্বি-জাতিবাদের অবতারণা করা হয়েছিল, এ প্রসঙ্গে তার তাৎপর্য বা নির্গলিতার্থকে নজির হিসেবে নেয়া যেতে পারে। মুসলমানরা তখন বলছিলোঃ 'আমরা এক জাতি—কেননা, বহু বিষয়ে হিন্দুদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য রয়েছে। ধর্মের দিক থেকে হিন্দুদের সঙ্গে আমরা আলাদা, দৃষ্টিভঙির দিক থেকে হিন্দুদের সঙ্গে আমরা আলাদা, জীবনযাত্রার ধারার দিক থেকেও হিন্দুদের সঙ্গে আমরা আলাদা। আমাদের সাহিত্য আলাদা, আমাদের সংস্কৃতিও আলাদা। আদতে, ভারত-বিভাগের প্রয়োজনে আমাদের যুক্তিকে জোরদার করার জন্যেই আমরা দাবি করেছিলাম ঃ আমরা এক জাতি; আর বাদ-বাকি সবাই আরেক জাতি। এটা ছিলো পুরোপুরি অযৌক্তিক—কেননা, ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রয়েছে।

www.pathagar.com

কিন্তু এর নির্গলিতার্থ ছিলো এই যে, আমরা এমন একটি দেশ চাই, যাতে মুসলিম প্রাধান্য থাকবে। আমরা যদি সেই থিওরিটি আজ এদেশের বেলায় প্রয়োগ করি, তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াবে? তাহলে সংখ্যাগুরু মুসলমানরা হবে এক জাতি, হিন্দুরা হবে আরেক জাতি, পারসিকরা হবে আরেক জাতি, খৃস্টানরা হবে আরেক জাতি। আরো রয়েছে—বৌদ্ধরা হবে আরেক জাতি। এছাড়াও আরো অনেক রয়েছে। আমি তাদের নাম করতে চাই না। কথা হচ্ছে, আমাদের দেশে বহু বিভিন্ন গ্রুপ বা শ্রেণীর মানুষ বসবাস করছে এবং দ্বি-জাতিবাদ গ্রহণ করা হলে তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য দাবি করবে। আর আমরা যেভাবে ভারত বিভাগের দাবি করেছিলাম, তারাও সম্ভবত তেমনি তাদের সংস্কৃতি অনুযায়ী আলাদাভাবে বসবাসের জন্যে পাকিস্তান বিভাগের দাবি করে বসবে। মোদ্দাকথা হচ্ছে ঃ আমরা যখন ভারত-বিভাগের দাবি করেছিলাম, 'জাতি' কথাটাকে আমরা তখন এক অর্থে বা এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু তারপর থেকে 'জাতি' কথাটা এক ভিন্নতর অর্থে—যথা 'জাতীয়তা' হিসেবে প্রযুক্ত হয়ে আসছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, আমাদের বিভিন্ন জাতীয়তা রয়েছে—যেমন ঃ পাঠান, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বাঙালি ও বেলুচি। এখানে 'জাতির' পূর্বোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই 'জাতীয়তা' কথাটাকে প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু তবুও তারা সবাই পাকিস্তানী জাতির অংশ-বিশেষ, তারা সবাই পাকিস্তানী জাতির অন্তর্ভুক্ত। এসব কিছু সত্ত্বেও আমরা এক জাতি—আমরা এক অখণ্ড জনসমষ্টি। রাষ্ট্রের সেবা বা কল্যাণের ব্যাপারে আমাদের সবার সমান ও সাধারণ স্বার্থ রয়েছে। ঠিক একইভাবে কেউ পাকিস্তানের 'জনসমষ্টিনিচয়' বা একাধিক জনসমষ্টি কথাটি বলে থাকলে তাতে এ কথাই বোঝানো হয় যে, এই জাতির মধ্যে এমন বিভিন্ন ধরনের বহু মানুষ রয়েছে—যারা আলাদাভাবে চিন্তা করে, যারা আলাদাভাবে জীবনধারণ করে, যাদের আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি এবং আলাদা সংস্কৃতি রয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পাকিস্তানের একটি বিশাল ও মহান জনসমষ্টি গঠনের উদ্দেশ্যে মিলিত হতে পারে, সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায় ?

একইভাবে বিভিন্ন অর্থে 'রাষ্ট্র' বা 'স্টেট' কথাটির ব্যবহার হয়। পাকিস্তানী রাষ্ট্র বলতে পাকিস্তান রাষ্ট্রকেই বোঝায়। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ইউনিট (অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশ)গুলোকেও 'স্টেটস' বা রাষ্ট্রনিচয় বলা হয়ে থাকে। কোনো একটি বিরাট রাষ্ট্রের ইউনিটগুলোকে 'স্টেটস' বলা যেতে পারে। এখানে ভারতের কথা ধরা যেতে পারে—ভারতের ইউনিটগুলোকে 'স্টেটস' বলা হয়ে থাকে। 'মামলুকাত' (রাষ্ট্রপুঞ্জ বা একাধিক রাষ্ট্রের সমবায়) সম্পর্কে আমাদের যে সাধারণ ধারণা রয়েছে বা যাকে আমরা মামলুকাত বলে অভিহিত করি, তার বাইরেও বিভিন্ন প্রদেশ বা 'স্টেটস'-এর অস্তিত্ব থাকতে পারে। মানে মামলুকাত-এর অন্তর্ভুক্ত না হলেও আমাদের আলাদা আলাদা প্রদেশ বা 'স্টেট' থাকতে পারে এবং এ থেকে কিছুতেই এক অখণ্ড রাষ্ট্রের ধারণার বিরোধিতা বোঝায় না। কিন্তু যখনই আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এদিকগুলো তুলে ধরতে চাই, তখনি একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয় এবং ধারণা করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা পাকিস্তান সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানবাসীদের চাইতে কম আগ্রহশীল। কিন্তু আমি এখানে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে একথা ঘোষণা করতে চাই, এবং এটা আমাদের দাবি যে, পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার

www.pathagar.com

ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানবাসীদের চাইতেও পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা খুব বেশি আগ্রহশীল। এর পেছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে। সামরিক কারণ রয়েছে, অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। এবং এর কারণ ও বাস্তব সত্যও রয়েছে যে, আমাদের একসঙ্গে বসবাস করতে হবে। আর আমরা এটা বুঝি এবং অনুধাবন করি যে, এ হচ্ছে এক অবশ্যম্ভাবী সত্য—একে কেউই অস্বীকার করতে পারে না, কারুরই এ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথ নেই।

ক্বচিৎ কখনো আমরা যে বিচ্ছিন্নতার কথা শুনতে পাই, সেটা নৈরাশ্যজনক মুহূর্তের একটা ভাবপ্রবণ অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ হচ্ছে আদতে ঘটনার নিছক এক যৌক্তিক দিক। অথবা বলা যায়, এ হচ্ছে নিছক যুক্তিবাদী মনের এক বিশ্লেষণাত্মক বহিঃপ্রকাশ মাত্র—আর এ থেকে আপনাদের এ কথাই বোঝাতে চাওয়া হয় যে, আপনারা যদি দেশের এক অংশের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন তাহলে হয়তো একদিন এ ধরনের অনুভূতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। এ থেকে কি বোঝা যাচ্ছে? আপনারা দেশের আরেক অংশের স্বার্থের প্রতি নজর দেন না কেন? আমরা কেউ কারো হাতে শোষিত হতে চাই না। পরস্পরের কাছ থেকে আমাদের নিজ নিজ দাবি-দাওয়া এবং নিজ নিজ হিস্যা বুঝে নিতে দিন। আমার মনে হয়, 'বিচ্ছিন্নতা' শব্দটি একটা অভিসম্পাত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে। আমি চাই না যে, কেউ যুক্তিতর্কের ছলেও এ শব্দটি ব্যবহার করুক—কেননা এ থেকে কোনো এক সময়ে অনুরূপ সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে বলে একটা ধারণা সৃষ্টি হতে পারে।

বিচ্ছিন্নতা নয়—নিরবচ্ছিন্নতা

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে কোনোকালে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হতে পারে, একজন পাকিস্তানী হিসেবে একথা আমি কল্পনায়ও আনতে পারি না। আমরা যে সঙ্কজনক অবস্থার মধ্যে রয়েছি, সে সম্পর্কে সবাইকে—অন্তত প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করার জন্যে যাঁরা কমবেশি আবেগের আতিশয্যে হাল্কাভাবে এধরনের কথা বলেছেন, আপনারা আজ তাঁদের নিন্দায়-সমালোচনায় কোণঠাসা করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমি এই পরিষদকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, পশ্চিম পাকিস্তানেরই কিছুসংখ্যক লোক এই সেদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, ইচ্ছা করলে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যেতে পারে। আমার মনে আছে, সে সময় আমি কঠোর ভাষায় এই মনোভাবের নিন্দা করে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়েছিলাম। বিবৃতিতে আমি বলেছিলাম, এসব লোক দেশদ্রোহী এবং এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

আমি বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা কল্পনায়ও আনতে পারি না। আমাদের অবিশ্যি একসঙ্গে বাস করতে হবে। আমাদের মাঝে বহুবিধ বন্ধন রয়েছে। পরে আমি সেগুলোর ওপর আলোকপাত করবো। 'ইসলাম-ই' দুই অংশের প্রধান সেতুবন্ধন বলে সদস্যরা প্রায়ই বলে থাকেন। কিন্তু আমার মতে, এ তেমন জোরালো বন্ধন নয়। মাত্র এই বন্ধনের ভিত্তিতে দুই অংশ একসঙ্গে বাস করতে পারে না। এটা অবিশ্যি সত্যি যে, ভারত-বিভাগের সময় আমরা মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশ কিংবা অঞ্চলগুলোর সমন্বয়ে একটি অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের নীতি অনুসরণ করেছিলাম। সেই সন্ধিক্ষণে একটি অঞ্চলের মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যাধিক্যই ছিলো ভারত-বিভাগের মাপকাঠি। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এই নীতি একটি

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক পটভূমির রূপ পরিগ্রহ করেছে। ভারত ছিলো একটি অখণ্ড দেশ। আমরা ভারতকে ভাগ করেছি। ভারতে এমন অনেক অঞ্চল ছিলো, যেগুলোর প্রত্যেকটিতে মুসলিম জনসংখ্যা ছিলো বেশি। আমি আগেই বলেছি, এসব অঞ্চলের মুসলিম-প্রাধান্যই ছিলো দেশ বিভাগের মানদণ্ড। আপনারা যদি বলেন, ইসলামই দুই অংশের যোগসূত্রের মাধ্যম, তাহলে আপনারা স্পষ্টতই ভুল করবেন। আমাদের দেশের লাগোয়া এবং আমাদের চারপাশে অনেক ইসলামী (মুসলিম) রাষ্ট্র রয়েছে। আমরা সে ইসলামী দেশ বা দেশগুলোর কতখানি অবিচ্ছেদ্য অংশ? আমরা আদৌ এসব দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ নই। আমরা সামগ্রিকভাবে আলাদা আলাদা দেশ। আমাদের দেশের দুই অংশকে সাধারণ একটি সংগ্রামের নিছক স্মৃতিই কেবল ঐক্যবদ্ধ করে রাখছে না; বস্তুত, আমাদের ঐক্যবদ্ধতা ও নিরবচ্ছিন্নতার পেছনে রয়েছে একটি দুর্মর অনুভূতি। আর সে অনুভূতিটি হচ্ছে ঃ পাকিস্তানের কোনো অংশই তার অপর অংশ ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। শত-সহস্র দিক থেকে আমরা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং এ অবস্থায় কেউ যদি বলে—আমরা অন্য অংশের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে অন্যত্র আমাদের ভাগ্যের সন্ধান করবো, তবে সেটা তার পক্ষে বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার পটভূমি

মাঝখানে বিস্তীর্ণ এক এলাকার ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন থাকলেও আমরা যে একটি বিশাল ভৌগোলিক পরিসরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রয়েছি, দুনিয়ার চোখে তার জন্যেই আমাদের এমন মর্যাদা। এই ঐক্য সৌহার্দ্যের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমি বিশ্বাস করি, দুই অংশের মধ্যে চিরকাল এই সৌহার্দ্য—এই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে। এই নিবিড় সৌহার্দ্যের মাঝেই আমাদের মর্যাদার প্রাণবীজ নিহিত। এ জন্যই আমরা নিজেদের বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম জাতি বলে দাবি করতে পারছি।

দুই অংশের এ বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক ব্যবধানের ফলে আমরা যে সব অনুকূল অবস্থা এবং সুবিধা লাভ করেছি, সম্ভবত দুনিয়ার কোনো রাষ্ট্রেরই সে সব সুবিধা নেই। সদস্যদের আমি এই বিষয়টি অনুধাবন করতে অনুরোধ করছি। এই সুবিধার ফলে আমরা একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো—এখান হতে পশ্চিম আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম দেশগুলোকে প্রতিবেশী হিসেবে পেয়েছি। আর অন্যদিক দিয়ে ইন্দোনেশিয়া ও বার্মাসহ প্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের সংযোগ রয়েছে। এই যোগাযোগ আমাদের অপরিসীম রাজনৈতিক প্রভাবের সুযোগ দিয়েছে। বিভক্ত থাকলে দুই প্রান্তের কোনোদিকেই আমাদের কোনো প্রভাব থাকবে না। অখণ্ড এবং ঐক্যবদ্ধ থাকলে, আল্লার রহমতে, কোনো-না-কোনো এক সময়ে আমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম একটি জাতির মর্যাদায় অভিষিক্ত হবো। সেদিন সম্ভবত এই জাতির হাতেই ন্যস্ত থাকবে এই অঞ্চলের শান্তির গুরুদায়িত্ব।

আমি এখন আশা করছি, সদস্যরা ও মন্ত্রিসভা খোলামন নিয়ে সরাসরি বিভিন্ন সমস্যা ও প্রশ্নের মোকাবিলা করবেন। আমি আরো আশা করি, শুধু সংখ্যাধিক্যের জোরে যেন-তেন প্রকারে তাঁরা শাসনতন্ত্র বিল পাস করিয়ে আত্মতুষ্টি লাভ করবেন না। আপনাদের অবশ্যই দেশের উভয় অংশের সমস্যাবলী অনুধাবন করতে হবে। আমি একথা বলছি না যে, আপনারাই কেবল আমাদের সমস্যাবলী অনুধাবন করুন—আর পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা

www.pathagar.com

আপনাদের (পশ্চিম পাকিস্তানের) সমস্যা অনুধাবনের প্রয়োজন বোধ করবে না। আমি বলতে চাই, অগ্রগতি এবং সমঝোতা দুই অংশের জন্যেই অপরিহার্য। আমি মনে করি, পশ্চিম পাকিস্তান ও গোটা পাকিস্তানের কল্যাণ ও অগ্রগতিতে পূর্ব পাকিস্তানের যতখানি স্বার্থ রয়েছে, পূর্ব পাকিস্তান ও গোটা পাকিস্তানের কল্যাণ ও অগ্রগতিতে পশ্চিম পাকিস্তানেরও ঠিক ততখানি স্বার্থ রয়েছে। কেননা, এক অংশ ছাড়া অন্য অংশ বাঁচতে পারে না। এ ক্ষেত্রে দুই অংশের মধ্যে সমঝোতা ও পারস্পরিক আপোষরফার প্রয়োজন রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান এবং সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের সুষ্ঠু শাসন-পরিচালনার জন্যে আপোষ ও সমঝোতা একেবারে অপরিহার্য। এই পারস্পরিক মতৈক্য ও আপোষরফায় পৌঁছার জন্যে আপনাদের যদি সত্যি কোনো সদিচ্ছা থাকে তাহলে আমাদের নিজেদের মধ্যে দলাদলি বাদ দিয়ে—এমনকি পরিষদের ভেতরেও বাকবিতণ্ডা পরিহার করে যত সত্বর সম্ভব (দুই অংশের প্রতিনিধিদের) আমাদের অবশ্যই একটি বৈঠকে মিলিত হতে হবে।

বিরোধী দলের অসুবিধা কোন্‌খানে ?

দুঃসহ বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধার মধ্য দিয়ে বিরোধী দলকে কাজ করতে হচ্ছে। কারণ? কারণ, তাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেই। তাঁরা যদি কোনো কথা বলেন, কোনো সুপারিশ করেন, কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিংবা কোনো কিছুর সমালোচনা করেন—তাহলে ক্ষমতাসীন সরকারের অর্থ-সাহায্যপুষ্ট ও তাদের সমর্থক পত্র-পত্রিকাগুলো আমাদের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে। আমরা যা কিছু বলি, তাঁরা তাকে হতাশা থেকে উদগত এবং বাজে ও তুচ্ছ ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেন। আর সরকারের পক্ষ থেকে একটা কিছু বলা হলেই তারা তাঁকে প্রজ্ঞা ও দেশপ্রেমের অমোঘ বাণী বলে অভিনন্দিত করে দেশময় তোলপাড় শুরু করে দেয়।

আমি জানি, এক্ষেত্রে আমাদের চরম প্রতিকূলতা রয়েছে। কিন্তু তবু আমাদের কর্তব্য পালন করতে হবে এবং আমরা নির্ভয়ে ও অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে সে কর্তব্য পালন করে যাবো। আমি জানি, আমি আজ এখানে যা কিছু বলতে যাচ্ছি, সরকার সমর্থক পত্রিকাগুলো থেকে তারও হাজারো রকমের অপব্যাখ্যা হবে। আমি আরো জানি, এই অপব্যাখ্যার ফলে আমাদের দলকে হয়তো চরমতম প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমার দেশের প্রতি আমার যে কর্তব্য রয়েছে, আমার ধর্ম ও বিশ্বাসের দর্শন ইসলামের প্রতি আমার যে কর্তব্য রয়েছে—তার তাগিদে ভয়-ভীতি এবং সম্ভাব্য পরিণতি ও প্রতিক্রিয়ার তোয়াক্কা না করে আমি এই পরিষদে সত্য-ভাষণদান করবো। আর জাতির সামনে সবকিছুর অবিকল চিত্র তুলে ধরবো।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন

আমি জানি, আমার সত্যকথনে বাইরে যে প্রতিক্রিয়া হবে, প্রধানমন্ত্রী তাকে জনমত বলে ভাবতে পারেন। কারণ, এক ধরনের প্রচার ও অপপ্রচারে তিনি অভিভূত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু আমরা নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারি না এবং স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দিতে পারি না। আমরা আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্বের গুরুভার সম্পর্কে সজাগ। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির পেছনে কি রয়েছে আর পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ কেন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চায়, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ আর এই পরিষদের সদস্যদের অবশ্যই সে কথা জানতে হবে। আমার দলের সদস্যরা এ কথাই আপনাদের বলার চেষ্টা করে

www.pathagar.com

আসছেন। জনাব গুরমানী এই পরিষদে বলেছেন যে, পরিষদের এই দিককার (বিরোধী দল) সদস্যরা আমাদের সামনে হিসাব-নিকাশের একটি ফিরিস্তি কেন তুলে ধরেছেন, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। আমি তাঁর এ 'কেন'র জওয়াব দিচ্ছি। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে অন্যায় ও অবিচার করা হয়েছে, এ ফিরিস্তি হচ্ছে তারই হুবহু বাস্তব চিত্র। পূর্ব পাকিস্তানকে যে সমান চোখে দেখা হয়নি এবং বিশেষভাবে পশ্চিম পাকিস্তানকে দরাজহস্তে যে সব সুযোগ-সুবিধা ও দাক্ষিণ্য বিতরণ করা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানকে যে সেগুলো হতে বঞ্চিত করা হয়েছে—তা প্রমাণের জন্যেই সদস্যরা এ হিসাব-নিকাশের ফিরিস্তি তুলে ধরেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বঞ্চনার এই করুণ চিত্র তুলে ধরে সদস্যরা এই পরিষদকে এ কথাই বোঝাতে চাইছেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ছাড়া বাংলার অগ্রগতি ও উন্নয়নের আর কোনো বিকল্পই নেই। এই অবস্থা এবং ঘটনার এই বাস্তব চিত্র আমাদের বড় মুখকে ছোট করে দিয়েছে। এটা কোনোক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দেশের এই অংশের অগ্রগতির তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে ধরতে গেলে সত্যিকারের কোনো উন্নয়নই হয়নি। দেশের এই অংশের আমরা কল্যাণ কামনা করি। এই অংশের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে দেখে আমরা সুখী। কিন্তু কথা হলো, পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী করতে হলে দুই অংশকেই সমানভাবে গড়ে তুলতে হবে। কেবল একটি অংশ উন্নত হলে আর অন্য অংশ অনুন্নত থাকলে নিশ্চিতভাবে গোটা পাকিস্তান দুর্বল হয়ে পড়বে। আপনাদের কাছ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের ন্যায্য অংশ দাবি করার নিশ্চয়ই অধিকার রয়েছে। এ ব্যাপারে আপনাদের সুবিবেচক হতে বলার অধিকারও তাদের রয়েছে। তারা নিশ্চয়ই এখানে এসে এ কথা বলতে পারে যে, একটানা গত কয়েক বছর ধরে নানাদিক থেকে তাদের বঞ্চিত এবং পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। আমি এসবের হিসেব বা সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইনে। আমাদের সামনে যে প্রমাণপঞ্জি উপস্থিত করা হয়েছে এবং এই বঞ্চনার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, বাস্তব ঘটনা হচ্ছে তা-ই এবং অবিকল তাই ঘটেছে। দেশের সেই অংশে প্রকৃত অর্থে কোনো উন্নয়নই হয়নি। ঝড়-জোয়ার ও বন্যার সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে বেঁচে আছে যারা, সাড়ে চার কোটি মানুষের সেই বিপুল জনসমষ্টির জন্যে একটি পাটকল, কি একটি কাগজের কল দিলেই কি আপনারা মনে করেন তাদের জন্যে যথেষ্ট কিছু করা হলো? কিংবা সেই অংশের প্রভূত উন্নয়ন সাধন করা হলো? জীবনধারণের সংগতি তাদের এতো কম যে, চাউলের সামান্য মূল্য বাড়লেই তাদের অনশনে দিন কাটাতে হয়।

আর বাহানা নয়

এঁকে-ওঁকে দায়ী করে, এ কারণ-সে কারণ দেখিয়ে, মূলধন আর মিলের শেয়ার কেনার আগ্রহের অভাবের কথা তুলে আর বাজে ওজর-অজুহাত খাড়া করে কোনো লাভ নেই। পূর্ব পাকিস্তানের দুরবস্থার কারণ হিসেবে এসব বাহানা তুলে কোনো ফায়দা হবে না। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, এসব কথা বলে তা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে সুবিচার করা হয়নি এবং সেখানে যে চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়া হয়নি, সরকারি দলের অনেক সদস্য সে কথা স্বীকার করেছেন দেখে আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত এ থেকে কি সিদ্ধান্তে পৌঁছবো? বাস্তব অবস্থা থেকে আমাদের একটা ধারণা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। একেবারে শুরুতে আমরা

www.pathagar.com

দেশের কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা ছাব্বিশ ভাগ দিয়েছি। আর আজকে আমাদের দেয় সেই রাজস্বের পরিমাণ কমতে কমতে একেবারে শতকরা বারো ভাগে এসে ঠেকেছে। এ থেকে আপনারা কি বুঝতে পারছেন? আমাদের অবস্থা কোন্ দিকে যাচ্ছে? আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, না পিছিয়ে পড়ছি? পাকিস্তানের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের প্রয়োজনে এবং কেন্দ্রীয় রাজস্বে অন্যদের মতো আমরা কি হিস্যা গ্রহণ করতে চাইতে পারি না? আমরা চাই যে, আমাদের নিজেদের জীবনযাত্রার মান এমন পর্যায়ে উন্নীত হোক যাতে করে আমরা পাকিস্তানের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও সাহায্যের কাজে লাগতে পারি। আমরা চাই না যে, বারবার এখানে এসে আমরা বলিঃ আমরা একেবারে শেষ হয়ে গেলাম, দিন দিন আমরা রসাতলে যাচ্ছি—আপনারা আমাদের বাঁচান, আমাদের সাহায্য করুন। আমরা আপনাদের কৃপার পাত্র হতে চাই না—আমরা চাই আপনাদের মতো সমান উন্নত হতে।

পূর্ব পাকিস্তানের মর্মান্তিক চিত্র

আমি সংখ্যাতত্ত্বের চুলচেরা হিসেব এখানে তুলে ধরতে চাই না। কিন্তু কে একথা অস্বীকার করতে পারবে যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে পরিমাণ অর্থাগম হচ্ছে, তার চাইতে অনেক কম পরিমাণ টাকা সেখানে ব্যয় করা হচ্ছে বা বিনিয়োগ করা হচ্ছে? এটা কি অস্বীকার করা যেতে পারে যে, এই দুঃসহ অবস্থার মধ্যে থাকলে কোনো দেশেরই একেবারে ফতুর হয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই? কি করে এটা অস্বীকার করা যাবে? এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, 'ভারতের শাসন-পরিচালনার জন্যে বৃটিশ সরকার একটি পয়সাও ভারত থেকে স্বদেশে নিতেন না।' এ উদ্দেশ্যে তারা কোনো কিছু না নিলেও কিন্তু এদেশ থেকে ইংল্যান্ডে টাকা যেত। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে নিয়োজিত পুঁজির সুদ বা আয় হিসেবে সে টাকা যেতো। বৃটিশের বিরুদ্ধে আমাদের তখন সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ ছিলো যে, আমাদের দেশ থেকে তারা ইংল্যান্ডে টাকা চালান করছে বলেই আমাদের দেশ দিন দিন দারিদ্র্য-জর্জরিত ও ফতুর হয়ে পড়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, পূর্ব পাকিস্তানেও আজ ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে টাকা বাইরে চালান হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু বাইরে থেকে সেখানে কোনো অর্থাগম হচ্ছে না। ফলে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ছে।

আমি আমাদের অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-দুর্দশার অসংখ্য নজির দিতে পারি। আমাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে; আমরা যে টাকা আয় করছি, তা আমাদের কাছে ফিরে আসছে না। আমাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের উন্নয়নের কাজে লাগানো যেতো এবং ন্যায়সংগতভাবে এটা দাবি করার অধিকার আমাদের রয়েছে। কিন্তু এসব কথা বলা অপরাধ। আমি যদি বলি, আমাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বা আমাদের আয়ের টাকা আপনারা এখানে ব্যয় করছেন তাহলে আমার বিরুদ্ধে প্রাদেশিকতার অভিযোগ আনা হবে; পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়ন ও অগ্রগতিতে আমরা ঈর্ষান্বিত বলে অভিযোগ করা হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে আমাদের চোখ আদৌ টাটাচ্ছে না। কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই দাবি করতে পারি যে, পশ্চিম পাকিস্তানের মতো সমানভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে উন্নত করে তোলা যেতো এবং সেটা করা উচিত ছিলো। পূর্ব পাকিস্তানে নানারকম শিল্প গড়ে তোলা যেতো। আমাদের তুলো নেই—কিন্তু আমাদের পাট রয়েছে। ইতিমধ্যেই আমরা অনেকগুলো

www.pathagar.com

পাটকল গড়ে তুলেছি এবং আরো পাটকল গড়ে উঠছে। আপনারা যদি সত্যি পূর্ব পাকিস্তানের অগ্রগতি চান, তাহলে সেখানে আরো বহুবিধ শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন কেন হয়নি ?

দেশের উন্নয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো অর্থনৈতিক দফতরের ওপর। এই দফতরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো অর্থ দফতর। উন্নয়ন সংক্রান্ত সব রকমের প্রস্তাব বিবেচনার ভারও ছিলো এই দফতরের হাতে। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘকাল থেকে অর্থনৈতিক দফতরের মন্ত্রিত্বের পদ অলংকৃত করে এসেছেন এবং এখনো এই দফতরের ভার তাঁর ওপর। আপনারা আজ যেমন হঠাৎ জেগে উঠেছেন, পরিকল্পনা বোর্ডও তেমনি এই সেদিন জেগে উঠেছে। আপনাদের সামনে খাতায়-কলমে বাস্তব অবস্থায় তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার পর আজ আপনারা একটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ গঠনের জন্যে যেন উঠেপড়ে লেগেছেন। এর আগে আপনারা এর কথা চিন্তা করতে পারেননি! প্রাদেশিক মন্ত্রীরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে বসে যাতে আধাআধি ভাগে উন্নয়ন কর্মসূচি ভাগ করে দিতে পারেন, আপনারা এর আগে তার কোনো ব্যবস্থা করতে পারেননি। আপনারা আজ এটা বিবেচনা করছেন। আজ আর এর কি মূল্য আছে? কেবল পূর্ব পাকিস্তানকে খুশী করার জন্যে কিংবা পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে একটা সান্ত্বনা হিসেবেই আপনারা শাসনতন্ত্র বিলে অর্থনৈতিক পরিষদ গঠনের বিধান সংযোজিত করেছেন। কিন্তু এতে কি পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন-সমস্যার সমাধান হবে? পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমান বা আধাআধি প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একটি অর্থনৈতিক পরিষদ থাকবে—শাসনতন্ত্রে সংযোজিত এই কথা কয়টিতেই কি পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার সুরাহা হবে? আসলে এই অর্থনৈতিক পরিষদে আমাদের মধ্যে পদে পদে প্রতি টুকরো রুটি নিয়ে—তথা ছোট-বড় প্রতিটি দাবি-দাওয়া নিয়েই কামড়া-কামড়ি শুরু হবে। 'পরিষদে' অপর পক্ষ যদি অভিযোগ করে যে, তাঁদেরকে তাঁদের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তাহলে আমাদের জন্যে কোনো কিছু দাবি করতে নিশ্চয়ই আমরা ইতস্তত করবো। আসলে আপনারা কেন শাসনতন্ত্রে অর্থনৈতিক পরিষদের ব্যবস্থা রেখেছেন? পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে আপনারা কিছু করছেন—জোর গলায় একথা বলার জন্যেই তো আপনারা এটা করেছেন। কিন্তু আমি যতদূর জানি, পূর্ব পাকিস্তান কিছুতেই এতে সন্তুষ্ট হবে না। কারণ, এতে তাদের নৈরাশ্যের মৌলিক কারণগুলোর কোনো প্রতিকার হবে না। সুতরাং তাদের হতাশা থেকেই যাবে। তারা শাসনতন্ত্রে তাদের স্বার্থের রক্ষাকবচ হিসেবে আরো সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্বলিত রয়েছে, দেখতে চায়। বর্তমান অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারবে না। এই পরিষদে হিসাব-নিকাশের যে তালিকা পেশ করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার ক্রমাবনতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা যাচাই করে দেখার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি নিয়োগের জন্যে সরকারের নিকট প্রস্তাব করছি। অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা যাতে এগিয়ে যেতে পারি এবং আমাদের দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ার অবস্থা যাতে অব্যাহত না থাকে, এই কমিটি সে সম্পর্কে বিভিন্ন সুপারিশ পেশ করবেন।

বন্যা প্রতিরোধে শৈথিল্য

দেশের এই অংশের (পশ্চিম পাকিস্তান) উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্যে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সমদর্শিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করা হলে সেই সঙ্গে

www.pathagar.com

পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করা যেতো। পূর্ব পাকিস্তান নদীমাতৃক দেশ। পানি সেচের জন্যে দেশের এই অংশে নতুন নতুন খাল খনন করা হয়েছে। আর আমাদের এ ব্যাপারে আদৌ কোনো খাল খননের প্রয়োজন নেই। কেননা, নদীগুলো সেখানে পানির প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু বর্তমানে এই নদীগুলোর অবস্থা কি? পূর্ব পাকিস্তানের বেশিরভাগ নদীর শাখা ও উপনদী এবং খালগুলো আজ পলি পড়ে পড়ে মজে গেছে। এসব নদী সাফ করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ দেয়া কি সরকারের পক্ষে উচিত ছিলো না? এদিক থেকে আজ পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেকজনক এবং এ ব্যাপারে আমি খুব শঙ্কিত হয়ে পড়েছি। আমি বিষয়টির প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আশু দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে বলছি যে, গত বছরের বন্যায় ব্রহ্মপুত্র থেকে পানির যে তোড় নেমে এসেছে, তাতে আমাদের নদী ও উপনদীগুলো পলি পড়ে মজে গেছে। কোনো কোনো নদীতে পাঁচ থেকে ছয় ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে পলির স্তর জমেছে। বর্তমানে ভারত থেকে বাহিত বন্যার পানির চাপ সহ্য করার মতো শক্তি পূর্ব পাকিস্তানের কম নদীরই রয়েছে। আল্লাহ্ না করুন, আবার যদি আমাদের ওপর এ ধরনের কোনো বন্যার অভিশাপ নেমে আসে, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের আদৌ কোনো নাম-নিশানা থাকবে কিনা, সন্দেহ।

মৎস্য শিল্প

পূর্ব পাকিস্তানে অসংখ্য নদী থাকা সত্ত্বেও আপনারা মৎস্য শিল্প গড়ে তুলতে পারেননি। পূর্ব পাকিস্তানে সমুদ্র, নদী, খাল, বিল, পুকুর, দীঘি ও জলাশয়কে মৎস্য শিল্প গড়ে তোলার কাজে লাগানো যেতো। কিন্তু এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কি করা হয়েছে? আমি যতদূর জানি, জাতিসংঘ কিংবা অনুরূপ কোনো একটি সংস্থা একটি মৎস্য-বন্দর প্রতিষ্ঠার জন্যে গত চার বছর ধরে অনবরত সরকারকে সাহায্যদানের কথা বলে আসছে। কিন্তু মাত্র এ বছর প্রস্তাবটি পশ্চিম পাকিস্তানে কার্যকরী করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানেও আপনারা সে সঙ্গে খুব সহজে অনুরূপ কয়েকটি মৎস্য-বন্দর প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে পারতেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ ন্যায়সংগতভাবেই এ দাবি করতে পারে এবং ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তারা প্রাপ্ত সাহায্যের সমান অধিকারের দাবিদার।

ফল-ফলারী শিল্প

এবার ফল-ফলারি শিল্পের কথায় আসা যাক। আপনারা হয়তো জানেন না যে, পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে পূর্ব পাকিস্তানেই বেশি পরিমাণ জমিতে ফল-ফলারির চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে বেশির ভাগ ফলই বে-ফায়দা নষ্ট হয়ে যায়। ফল সংরক্ষণ, ফলের পচনশীলতা—নিরোধ ও প্রসেসিং-এর জন্যে কি পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব নয়? আমরা জানি, পাকিস্তানে মোট ১৪০টি ফল সংরক্ষণ (ক্যানিং) কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে ১৩৬টিই রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে—আর পূর্ব পাকিস্তানে রয়েছে মাত্র ৪টি। এ ব্যাপারে কি কিছু করা যেতো না? আমি বলছি না যে, পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩৬টি কারখানার সবগুলোই সরকারি অর্থে গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানে এই শিল্প সম্প্রসারণের ব্যাপারে কি সরকারের কোনো দায়িত্ব ছিলো না? অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ঃ পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের কাজ কিভাবে করতে হবে, সরকার যেন তা জানেন না—কিংবা তারা এটা জানতে বা বুঝতে অক্ষম।

www.pathagar.com

নারকেল শিল্প

এবার ছোবড়া বা নারকেলের শাঁস বা তেল শিল্পের কথা ধরা যেতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানে সহজেই নারকেল শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। কিন্তু এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো কিছুই করা হয়নি। এ শিল্প গড়ে তোলা হলে আজ আমাদের বিদেশ থেকে নারকেলের তেল আমদানী করতে হতো না; বরং আমরা সহজে বিদেশে প্রচুর পরিমাণে নারকেলের তেল রফতানী করতে পারতাম।

বৈদেশিক সাহায্যের বন্টন ব্যবস্থা

আমি কেবল নজির হিসেবেই আপনাদের সমক্ষে এসব বিষয় তুলে ধরছি। এ রকম আরো অসংখ্য বিষয় রয়েছে যেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমি বৈদেশিক সাহায্যের ব্যাপারটার কথাই বলছি। এটা কি কেউ আদৌ অস্বীকার করতে পারবেন যে, আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছি এবং এখনো পেয়ে আসছি? এবং এটা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন যে, প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই কেবল পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছে। অথচ বৈদেশিক সাহায্যে দুই অংশেরই সমান ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে।

দেশরক্ষার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি উপেক্ষা

আরেকটি বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে দেশরক্ষা ব্যবস্থা ও সামরিক ঘাঁটিগুলো প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত প্রশ্ন। আমি সমর-নীতি বা রণ-কৌশলের সমস্যা নিয়ে এখানে আলোচনা করছি না। সেটা হচ্ছে সামরিক কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারের বিষয়। তবে আমি বলতে চাই যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের খুব উঁচুমানের সামরিক যোগ্যতা রয়েছে এবং উপযুক্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হলে তাদের মধ্য থেকে একটি উৎকৃষ্ট ও বিক্রমশালী সেনাদল গড়ে তোলা যেতে পারে। সামরিক শৌর্যের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে এবং এককালে তারা তাদের এ সামরিক যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিল। আমি এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, অন্য সব রেজিমেন্টের বহু আগে বেঙ্গল রেজিমেন্টই তার সামরিক খ্যাতি ও নৈপুণ্যের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল। এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু একটা করা যেতো। সামরিক ট্রেনিংদানের ব্যাপারেও নজর দেয়া যেতো। আমরা ভালো সৈনিক তৈরি করতে পারি কিনা, বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তান তার নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করতে পারে কিনা, অথবা পূর্ব পাকিস্তানে কোনো বহিরাক্রমণ হলে পূর্ব পাকিস্তানেই তাকে হটিয়ে দেয়া যাবে কিনা, না বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে কেবল পশ্চিম পাকিস্তানেরই প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে—ইত্যকার ব্যাপারে আমি যেতে চাই না। কিন্তু আমি কেবল এটুকু বলতে চাই এবং আমি এব্যাপারে নিশ্চিত যে, প্রত্যেক দেশপ্রেমিক নাগরিক তার দেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে নিজকে যুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। সামরিক স্ট্র্যাটেজি বা সামরিক দর্শন যা-ই থাক না কেন, যে কোনো মহলের যে কোনো সম্ভাব্য হামলার মোকাবিলায় আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের সুসংগঠিত করা এই সরকারের পক্ষে অপরিহার্য ছিলো। অন্তত নৌ-বাহিনীর জন্যে সেরা নাবিক আমরা দিতে পারি এবং আমরা দিচ্ছিও। পূর্ব পাকিস্তানে কি একটি নৌঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা যেতো না? নৌ বাহিনীর সদর দফতর পূর্ব

www.pathagar.com

পাকিস্তানে থাকবে, আমি ঠিক অতদূর পর্যন্ত দাবি করতে চাই না। সামরিক স্ট্র্যাটেজির দিক থেকে হয়তো নৌ-বাহিনী, স্থল-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর সদর দফতরগুলোর এক জায়গায় থাকার প্রয়োজন থাকতে পারে। কিন্তু আমরা কি পূর্ব পাকিস্তানে ন্যায়সংগতভাবে এক বা একাধিক নৌ-ঘাঁটির আশা করতে পারি না? নৌ ও সেনাবাহিনীর অফিসার ট্রেনিং-এর জন্যে আমরা কি সেখানে একাধিক ট্রেনিং কেন্দ্রের আশা করতে পারি না? এ সবকিছুই করা সম্ভব হতো। আসলে, সরকারের সব নজরই দেশের এই অংশে (পশ্চিম পাকিস্তান) নিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তাঁরা কখনো দেশের অপর অংশের ব্যাপারে নজরদানের কথা আদৌ চিন্তা করতে পারেননি।

পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব সম্পদ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে তাকে দেউলিয়ায় পরিণত করা এবং পূর্ব পাকিস্তানের জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী করে রাখার পেছনে কোনো পরিকল্পনা বা চক্রান্ত নেই বলে জনাব গুরমানী যে কথা বলেছেন, আমি সেটা বিশ্বাস করবো। আমি সেটা বিশ্বাস করবো এই জন্যে যে, এ ধরনের কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। কোনো প্রমাণ বা দলিল না পেলে এটা বিশ্বাস না করে আমাদের উপায় কি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানকে যে দেউলিয়া করা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানের জীবনযাত্রার মান যে নিম্নগামী হচ্ছে একে তো আর অস্বীকার করা যাবে না। এ অবস্থার অবিশ্যি প্রতিকার করতে হবে এবং সমস্যা হচ্ছে, কিভাবে এর প্রতিকার করা হবে। প্রতিশ্রুতির বহর আর ফাঁকা বুলি ছেড়েই কি এর প্রতিকার করা হবে? যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানাচ্ছি যে, বর্তমান মন্ত্রিসভা আর তাঁদের সমর্থকদের এসব প্রতিশ্রুতির ওপর পূর্ব পাকিস্তান তার সমস্ত আস্থা হারিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান কেন সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়েছে, তার কারণগুলোর বিশদ বিশ্লেষণ আমি দিতে চাইনে। কিন্তু এটা সত্যি একটা বড়ো কারণ যে, দুই অংশের মধ্যে সংখ্যাসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে আমি যে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিলাম, সরকার তাকে পানিতে নিক্ষেপ করেছেন—তাকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। কিন্তু সব কথার গোড়ার কথা হচ্ছেঃ পূর্ব পাকিস্তান চায়, তার অধিকার ও দাবি-দাওয়াগুলোর বাস্তবায়নের জন্যে শাসনতন্ত্রের যথার্থ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকবে। সোজা কথা, আমরা আর কিছুতেই প্রতিশ্রুতির বহরে তুষ্ট থাকবো না।

পূর্ব পাকিস্তানকে এমন অনুন্নত ও অনগ্রসর এলাকা বলে চিত্রিত করা হয়ে থাকে যেন পূর্ব পাকিস্তান একটা বিরান এলাকা, যেন পূর্ব পাকিস্তানে কিছুই নেই, যেন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এতো আদিম যে, নিজেদের জন্যে তারা কিছুই করতে পারে না, আর তাদের জন্যে কিছু করাও সম্ভব নয়। এই ধারণার পেছনে আদপেও কোনো সত্যি নেই—এই ধারণার পেছনে এতটুকুও সঙ্গত কারণ নেই।

ঢাকায় কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থানান্তরের দাবি

আমাদের দাবি-দাওয়াগুলোকে যে কি দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে, রাজধানী স্থানান্তরের দাবির ব্যাপারটা থেকেই তা বোঝা যায়। আমাদের কেউ কেউ ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের দাবি করলে ওদিককার আসনগুলো থেকে হাসির হুল্লোড় পড়ে যায়, ক্রোধ উদ্‌গীরণ করা হয়, প্রচণ্ডভাবে বাধাদান করা হয়, বিদ্রূপের তুফান ছোটানো হয়। তাঁরা বলেন, 'ঢাকায় রাজধানী নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? কেন রাজধানী ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হবে? রাজধানীতে কি আসে যায়

www.pathagar.com

এবং রাজধানীর কিই-বা মূল্য আছে?' একজন সদস্য এমনও বলেছেন, 'রাজধানী টিমবাকতুতে গেলেই বা কি!' একটা রাজধানীর সুযোগ-সুবিধা যে কি, সেটা খুঁজে বের করার জন্যে কারো সপ্ত-পাতাল মন্থন করার প্রয়োজন পড়ে না। যাঁরা রাজধানীর কাছাকাছি থাকেন, রাজধানীর অবস্থানগত সুবিধা বা নৈকট্যের জন্যেই তারা খুব সহজেই কেন্দ্রীয় সরকারের সান্নিধ্যে আসতে পারেন, তাঁদের সঙ্গে দেন-দরবার করতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ওপর অনিবার্যভাবে রাজধানীর পরিবেশ ও প্রভাবের প্রতিফলন ঘটতে বাধ্য। এক কথায়, রাজধানীর মানস ও পারিপার্শ্বিকতা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কাঠামোকে নিয়ন্ত্রিত করে—তাকে রূপদান করে। সরকার ক্রমবর্ধমানভাবে নাগরিকদের যে সব সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন, যে সব সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্যে দেশের এই অংশের লোকেরাই খুব সহজে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে দেন-দরবার করতে পারেন। অবাধ বাণিজ্যের আমলে যা সম্ভব ছিলো না, এখন সরকারের হাতে বাণিজ্যিক ব্যাপারে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকার ফলে তারা যদৃচ্ছ যে কাউকে যে কোনো রকম আনুকূল্য, দাক্ষিণ্য ও সুযোগ-সুবিধা বিতরণ করতে পারেন। সবাই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা এখানে আসেন, সরকারের নিম্ন পদস্থ সাধারণ একজন কর্মচারির দর্শন পেতেই তাদের দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয় এবং তারপর এক সময় তাদের খালি হাত নিয়েই ফিরে যেতে হয়। এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের কাছে রাজধানীর অবস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম এবং বলা যায় সর্বাধিক। ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত হলে অনতিবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের রূপ পাল্টে যাবে, তার মুখশ্রীর আমূল পরিবর্তন হবে। এ অঞ্চলের জনসাধারণ আজ কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে, রাজধানী স্থানান্তরিত হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণও অনুরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হবে। এসব কারণেই তারা পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী স্থানান্তরের দাবি করছে। রাজধানীর অবস্থানের ব্যাপারটা একেবারে তাৎপর্যহীন এবং এর পেছনে আদপেও কোনো গুরুত্ব নেই বলে যে কথা বলা যাচ্ছে, সেটা বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

শাসনতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা

এবার খসড়া-শাসনতন্ত্রের বিধি-বিধানের ব্যাপারে আসা যাক্। উন্মুক্ত মন নিয়ে বিচার করলে এই শাসনতন্ত্রকে কি সত্যিকারভাবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের চাইতে উন্নতমানের বলা যায়? আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে কোনোদিক থেকেই আমি একে তেমন উঁচুমানের বলতে পারি না। '৩৫ সালের আইনে বিধি-বিধানের যে সব ফিরিস্তি ছিলো এতেও ঠিক সে সবই আছে। ওতে যে সব ক্ষমতা ছিলো, এতেও হুবহু সে সবই আছে। আপনারা এখন কেবল একে একটা ফেডারেল শাসনতন্ত্র বলতে পারেন—আগে যা ফেডারেল ছিলো না। পরিবর্তন শুধু এটুকু হয়েছে যে, এটা একটা ফেডারেল বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। আইনের এই ধরনের সব তালিকা ('৩৫ সালের আইন) এতেও সন্নিবিষ্ট রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল সামান্য রদবদল করা হলেও, ভারত-শাসন আইনের বিধির ১নং তালিকা, ২নং তালিকা ও ৩নং তালিকা হুবহু এতেও রয়েছে। ভারতের এককেন্দ্রিক শাসনের যুগে যে এক, দুই ও তিন নম্বর তালিকা বহাল ছিলো, এতেও আপনারা সেগুলো রেখে দিয়েছেন। এ অবস্থায় এ শাসনতান্ত্রিক আর ভারত-শাসন আইনের মধ্যে পার্থক্য

www.pathagar.com

কোথায়? আপনারা বলতে পারেন, এ শাসনতন্ত্রের আওতায় প্রদেশগুলোকে 'রেসিডুয়ারি' বা অবশিষ্ট ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু অবশিষ্ট ক্ষমতা বলতে কি বোঝায় এবং সে অবশিষ্ট ক্ষমতা কোন্‌গুলো? সেগুলো কি কখনো বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে লাগবে? প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞরা এ তালিকাগুলো প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু যাঁরা ভারত-শাসন আইনের রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন অসাধারণ দূরদৃষ্টির অধিকারী; শাসন পরিচালনায়ও তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতা ছিলো অপরিসীম। তাই, তাঁরা সরকারের খুঁটিনাটি প্রায় প্রতিটি কার্যক্রম এবং সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়কে নিয়ন্ত্রণাধীন ও আইনের অংগীভূত করে এসব তালিকা প্রণয়ন করেছেন। আমি যতো দূর জানি, এই দীর্ঘকালের মধ্যে একটি মাত্র বিষয় কেবল গোচরীভূত হয়েছে যা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলো না এবং পার্লামেন্টকে তার জন্যে বিধানের ব্যবস্থা করতে হয়। সুতরাং প্রদেশকে যে অবশিষ্ট ক্ষমতা দান করা হয়েছে, সেটা শুনতে নিঃসন্দেহে ভালো শোনালেও এবং তাকে একটা ভালো কথা হিসেবে ধরে নিলেও আসলে এর কোনো বাস্তব গুরুত্ব বা মূল্য নেই। সত্যি কথা বলতে কি, কার্যক্ষেত্রে আদপেও এর কোনো মূল্য নেই। তাহলে, আপনাদের রচিত শাসনতন্ত্র আর ভারত-শাসন আইনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ১৯৩৫ সালের যে ভারত-শাসন আইন আগাগোড়া গণতন্ত্র এবং দেশের স্বার্থের বিরোধী ছিলো, তার সঙ্গে এই শাসনতন্ত্রের কোন্‌খানে কতটকু তফাত? এ প্রসঙ্গে আমি কেবল কয়েকটি নজির উপস্থাপন করতে চাই এবং তারপর এগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবধারার সাথে শাসনতন্ত্রের সঙ্গতি বিধানের জন্যে আপনাদের কোনো প্রচেষ্টায় ব্রতী হওয়া উচিত কিনা, সে বিবেচনার ভার আপনাদের বিবেকের ওপরই ছেড়ে দেবো।

প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও নিয়মতান্ত্রিক ঐতিহ্য

প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার কথাই ধরা যাক। জনাব চুন্দ্রীগড় বলেছেন যে, তিনি এব্যাপারে একটি সংশোধনী পেশ করবেন। ভালো কথা। সংশোধনীটি পেশ করা হলে আমরা তার গুণাগুণ বিবেচনা করে দেখবো। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধা এবং বিচ্যুতি রয়েছে, আমাদের সেগুলো অবশ্যই নির্দেশ করতে হবে। আপনারা প্রেসিডেন্টকে বৃটেনের রাজা বা সার্বভৌম শাসকের সমান ক্ষমতাদান করেছেন। কিন্তু রাজা বা শাসন প্রধানের ওপর সর্বোচ্চ ক্ষমতা বর্তালেও বৃটেনে এমন সব নিয়মতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও রীতিনীতি গড়ে উঠেছে যা লজ্ঘন করা কিছুতেই তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং তাঁরা কখনো এ ধরনের রীতি বিরোধী কোনো কাজ করতে সাহসও পাবেন না। বৃটেনের এসব ঐতিহ্যগত রীতি তথা শাসনতন্ত্র হচ্ছে অলিখিত এবং রাজার ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়গুলোও অলিখিত। যে মুহূর্তে আপনারা এসব ক্ষমতা লিপিবদ্ধ করবেন, যে মুহূর্তে আপনারা এগুলোকে শাসনতন্ত্রে সংবদ্ধ করবেন, ঠিক তক্ষুণি মামুলি বা নিষ্ক্রিয় এসব অধিকারও আদালতের এখতিয়ারের আওতায় এসে পড়বে। আর সঙ্গে সঙ্গে অলিখিত রীতিগুলোরও অপমৃত্যু ঘটবে। কেননা, লিপিবদ্ধ নেই বলে এগুলো আর আইনানুগ থাকবে না এবং আইনের সাহায্যে তাই এসব রীতিকে বলবৎও করা যাবে না। এ অবস্থায় স্বীকৃত রীতি হিসেবে এগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আপনাদের বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ, বিক্ষোভ ও বিপ্লবের সুদীর্ঘ ধারা পরিক্রমার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে এবং ততদিন নিশ্চয়ই আমি বেঁচে থাকবো না। প্রেসিডেন্টের

www.pathagar.com

ক্ষমতার কথা আমি বলছিলাম। বৃটেনের সার্বভৌম শাসন প্রধানের (রাজা বা রাণী) অনুরূপ ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের জন্যে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ না করাই ভালো। মানে বৃটেনের রাজার যে সব ক্ষমতা রয়েছে, ঠিক সে সব ক্ষমতা একইভাবে বা হুবহু প্রেসিডেন্টের জন্যে শাসনতন্ত্রে সুনির্দিষ্ট না করাই সমীচীন। কিন্তু আপনারা যদি তা না করেন এবং প্রেসিডেন্টের জন্যে বৃটেনের রাজার অনুরূপ ক্ষমতার ব্যবস্থা রাখতে চান, তাহলে সে সঙ্গে বৃটেনে অনুসৃত শাসনতান্ত্রিক রীতিগুলোকেও আপনাদের শাসনতন্ত্রের অঙ্গীভূত করতে হবে। কেননা, ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত এসব রীতিই রাজার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত করে দিয়েছে।

আইন পরিষদ বা পার্লামেন্ট বাতিলের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টকে এই খসড়া শাসনতন্ত্রে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, এ প্রসঙ্গে আমি তার উল্লেখ করছি। এতে বলা হয়েছে যে, মন্ত্রিসভার ওপর আর দেশের আস্থা নেই বুঝতে পারলে প্রেসিডেন্ট আইন পরিষদ বাতিল করে দিতে পারবেন। এটা একটা উদ্ভট এবং হাস্যকর ব্যাপার। আর এটা এমন একটা আজব ব্যাপার যে, আমি নিশ্চিত—হয় সরকারকে এটা প্রত্যাহার করতে হবে, না হয় এর জায়গায় খানিকটা যুক্তিসঙ্গত একটা কিছু জুড়ে দিতে হবে। মন্ত্রিসভা বা আইন পরিষদ দেশের আস্থা হারিয়েছে কিনা কিংবা এ ধরনের কোনো সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে কিনা, তার বিচারের ভার প্রেসিডেন্টের ওপর ছেড়ে দেয়া সত্যি একটা আজগুবি ব্যাপার। একটা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের পক্ষে প্রেসিডেন্টের ওপর এধরনের ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া একটা উদ্ভট ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। হ্যাঁ, প্রেসিডেন্ট যদি মনে করেন যে, ক্ষমতাসীন মন্ত্রিসভার ওপর আইন পরিষদের কোনো আস্থা নেই, সেক্ষেত্রে পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে প্রেসিডেন্টের হাতে কিছু ক্ষমতা ন্যস্ত করা যেতে পারে। কিন্তু, মন্ত্রিসভার ওপর জনগণের কোনো আস্থা নেই, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কিংবা এ ধরনের অজুহাত দেখিয়ে প্রেসিডেন্টের খোদ আইন পরিষদই ভেঙ্গে দিতে যাওয়াটা আগাগোড়া একটা বিপরীত ব্যাপার এবং দুই ক্ষেত্রে একটা আসমান-জমিন ফারাক রয়েছে। এছাড়া প্রেসিডেন্টকে এমন আরেকটি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যা গোটা শাসনতন্ত্রকেই উল্টে দেবে কিংবা এর ওপর খোদকারি করে একে একেবারে অচল বা নিষ্ক্রিয় করে দেবে। এ হচ্ছে প্রেসিডেন্টের জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা। দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।.....প্রেসিডন্ট বলতে খোদ 'এখতিয়ার ক্ষমতায় পরিচালিত নয়—মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে পরিচালিত' প্রসিডেন্ট বলে জনাব চুন্দ্রীগড় যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেটা কেবল এই পরিষদেই চলতে পারে—আদালতে নয়। আদালত এব্যাপারে হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিমত গ্রহণ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এই পরিষদের বিতর্ক এবং এ সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয়ের ব্যাখ্যা আদালতে আদৌ গ্রাহ্য হবে না।

মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন

এবার এই খসড়া শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারের ধারাটির ওপর আমি আলোকপাত করতে চাই। মৌলিক অধিকারগুলোকে যদি বিধি-নিষেধের বেড়াজালে ঘিরে রাখা হয়, তাহলে সেগুলোকে শাসনতন্ত্রে সংবদ্ধ করার কি ফায়দা রয়েছে? চারদিক থেকে মৌলিক অধিকারগুলোকে বিভিন্ন রকমের শর্ত ও বিধি-নিষেধে সীমিত করে রাখা হলে এগুলোর যে কি প্রয়োজন থাকতে পারে, তা আমি বুঝতে পারি না। আপনারা সম্ভবত ভারতীয় শাসনতন্ত্র

www.pathagar.com

থেকে এগুলো গ্রহণ করেছেন। [এ সময় জনাব চুন্দ্রীগড় বলেন যে, তিনি অন্য একটি দলিল থেকে এগুলো নিয়েছেন]।

হতে পারে, অন্য কোনো দলিল থেকে আপনারা এগুলো নিয়েছেন। তবে নিশ্চয়ই সে একই দলিল থেকে ভারতীয় শাসনতন্ত্রে এগুলো সংঘবদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, দুটোর (খসড়া শাসনতন্ত্র ও ভারতীয় শাসনতন্ত্র) মধ্যেই সাদৃশ্য রয়েছে এবং এই মৌলিক অধিকারগুলো নিয়েছেন, সেই শাসনতন্ত্রে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের মতো শর্ত ও বিধি-নিষেধের বেড়াজাল রয়েছে কি-না, তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। আমি ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংগে খসড়া শাসনতন্ত্রটি মিলিয়ে দেখেছি। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কয়টি শর্ত ও বিধি-নিষেধ রয়েছে—কিন্তু তার সংগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দ 'যুক্তিসঙ্গত' কথাটি জুড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের শাসনতন্ত্রে 'যুক্তিসংগত' কথাটি বাদ দেয়া হয়েছে। কথা হচ্ছে, বিধি-নিষেধগুলোকে অবশ্যি যুক্তিসংগত হতে হবে এবং যে মুহূর্তে আপনারা এ কথাটি শাসতন্ত্রে জুড়ে দেবেন, অমনি বিধি-নিষেধগুলো যুক্তিসংগত কিনা, সে প্রশ্ন আদালতের এখতিয়ারাধীন হয়ে পড়বে। গণপরিষদ যদি মৌলিক অধিকারগুলোর সংগে 'যুক্তিসংগত' কথাটি যোগ করে দেন, তবেই কেবল আদালতগুলোর পক্ষে বলা সম্ভব হবেঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে বিধি-নিষেধ রয়েছে সেটা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত কিনা; আর অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হলেই আদালত সংশ্লিষ্ট বিধি-নিষেধকে শাসনতন্ত্র বহির্ভূত বলে ঘোষণা করতে পারবেন। কাজেই, মৌলিক অধিকারের নামে দয়া করে আপনারা আমাদের প্রতারিত করার চেষ্টা করবেন না। 'যুক্তিসঙ্গত' কথাটি ব্যতিরেকে এই মৌলিক অধিকার সম্পূর্ণ অর্থহীন।

রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্দেশক সংজ্ঞা

আরেকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঃ রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্দেশক সংজ্ঞা। এ ক্ষেত্রেও পুরাতন সংবিধানের সঙ্গে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের বিরাট রকমের ব্যবধান রয়েছে। রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্দেশক সংজ্ঞাগুলো আদালতের আওতায় না পড়লেও সরকারের নীতি ও লক্ষ্য হিসেবে এগুলোর অনেকখানি তাৎপর্য রয়েছে। সরকার ও দেশের দৃষ্টিভঙি, নীতি, উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট লক্ষ্য এই নীতিমালায় বিধৃত থাকে বলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া, নীতি-নির্দেশক এই সংজ্ঞাগুলোতেই সরকারের নীতি ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। কিন্তু দেশের স্থায়ী শাসনতন্ত্রের এই নীতি-নির্দেশক সংজ্ঞাগুলোতে আমরা কি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি? এতে কেবল এইটুকু বলা হয়েছেঃ আমরা ওকাজটা করার 'চেষ্টা' করবো, সে কাজটা করার 'প্রচেষ্টায়' ব্রতী হবো। আমরা আবহমানকাল ধরে কেবল চেষ্টাই চালিয়ে যাবো।

এই নীতি-নির্দেশক সংজ্ঞাগুলো কাদের জন্যে? এতে বলা হয়েছেঃ নিরক্ষরতা দূর করার জন্যে এবং দেশে বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্যে আমরা 'চেষ্টা' করবো, আমরা 'চেষ্টা' করবো শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার জন্যে। কিন্তু কথা হচ্ছে, কেবল প্রচেষ্টা হিসেবে নয়—সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্দেশক সংজ্ঞাগুলোকে শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মানে, নীতি-নির্দেশক সংজ্ঞাগুলোকে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের ধারক হতে হবে ; যথা ঃ শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে সরকারের জন্যে একটি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নীতি থাকতে হবে, এ

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যটিকে কার্যকরী করার জন্যে হয়তো আপনারা সময় নিতে পারেন; আপনাদের আর্থিক সঙ্গতির ওপর এটা নির্ভর করতে পারে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক সংস্থানের ওপরও এটা নির্ভর করতে পারে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, এব্যাপারে আপনাদের সত্যিকারের লক্ষ্য কি, সেটা শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। আপনাদের সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে যে, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে আপনারা চান কিনা। আপনারা কতটুকু করতে পারবেন, সেটা অন্য কথা—সেটা আপনাদের সংগতির ওপর নির্ভর করবে। কিন্তু নিরক্ষরতা দূরীকরণ কিংবা অন্য কোনো কিছু করার জন্যে আপনারা অনন্তকাল ধরে 'চেষ্টা চালিয়ে যাবেন', এমন একটা কথা দেশের স্থায়ী শাসনতন্ত্রে সংবদ্ধ থাকতে পারে না। এটা একেবারে অর্থহীন। এর মানে দাঁড়ায়ঃ আপনারা এগুলো চান না—আপনারা চান না যে, এগুলো কখনো বাস্তবায়ন হোক। 'প্রচেষ্টা' দিয়ে আপনারা কি বোঝাতে চাইছেন সেটা একদম আমার বোধ ও বুদ্ধির অগম্য।

চাষীদের জমির মালিকানা দিতে হবে

নীতি-নির্দেশক সংজ্ঞার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেটা হচ্ছে নাগরিক সাধারণের প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য সংক্রান্ত প্রশ্ন। ব্যাপারটা আমার কাছে পুরোপুরি ইসলামের আদর্শের পরিপন্থী বলে মনে হচ্ছে। ইসলাম সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর গভীর জ্ঞান আছে বলে আমি তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি যে, কি করে প্রধানমন্ত্রী এমন একটি অনৈসলামিক বিষয় প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে দিলেন? সাবেক মূল নীতি কমিটির রিপোর্টের অঙ্গীভূত কথাটিই এখানে আক্ষরিকভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের সব নাগরিকের জন্যে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা রাষ্ট্রই করবে—এর উল্লেখ এতে নেই। এখানেও 'চেষ্টা'র কথাই বলা হয়েছে এবং তাও সব নাগরিকের জন্যে নয়। এতে বলা হয়েছেঃ যারা অক্ষম, পঙ্গু, রুগ্ন ও বেকার, তাদের জীবনের এসব মৌলিক প্রয়োজনগুলো (জনগণের জন্যে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা জনকল্যাণ রাষ্ট্রের একটা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য এবং সেদিক থেকে একটা ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষেও এটা অপরিহার্য) মেটানোর জন্যে চেষ্টা করা হবে। এটা জনসাধারণের প্রতি সরকারের দায়িত্বকে এমন একটা স্তরে সীমিত করে দিয়েছে যে, আমি আশঙ্কা করছি····

এসময় মাগরেবের নামাজের জন্যে পরিষদ অধিবেশন আধ ঘণ্টা মুলতবী ঘোষণা করা হয়। অধিবেশন শুরু হলে জনাব সোহরাওয়ার্দী স্পীকারের চেয়ারে উপবিষ্ট ডেপুটি স্পীকার মিস্টার গীবনকে জানান যে, তিনি কিছুটা অসুস্থ বোধ করছেন এবং তাঁর আলোচ্য প্রসঙ্গে শেষ কথাটি ভুলে গেছেন। ডেপুটি স্পীকার তাঁকে সূত্র ধরিয়ে দেন।)

আমি রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্দেশক সংজ্ঞাগুলোর ওপর আলোকপাত করছিলাম। আমি এই খসড়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাদের একথা বোঝাতে চাইছিলাম যে, যে সব কাজ সরকারের লক্ষ্য ও নীতির অভিসারী হবে, সে সব ক্ষেত্রে 'চেষ্টা চালানো'র মতো কথা সম্পূর্ণ অবাস্তব একটা কথা বলে প্রতিভাত হবে। এছাড়া এসব মৌলিক অধিকার এবং নীতি-নির্দেশক সংজ্ঞাগুলোতে কতোগুলো সাংবিধানিক ফাঁক রয়েছে, কতোগুলো অপরিহার্য বিষয়ও এ থেকে বাদ পড়ে গেছে। আমি আশা করি, এগুলো যথার্থভাবে সন্নিবেশ করা হবে।

মৌলিক অধিকার ও নীতি-নির্দেশক সংজ্ঞাগুলোর কোথাও কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থের হেফাজত এবং শোষণের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থার সুস্পষ্ট

www.pathagar.com

উল্লেখ আমার নজরে পড়ছে না। একটা সাধারণ অনুচ্ছেদ রয়েছে এবং তাতেও সেই এই 'প্রয়াস' ও 'প্রচেষ্টার' কথা রয়েছে। এতে বলা হয়েছে ঃ জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং অনুরূপ আরো কিছুর জন্যে আর ভূস্বামী, প্রজা এবং মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্কের উন্নয়ন ও সঙ্গতি বিধানের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে। নীতি-নির্দেশক বিধান কিংবা মৌলিক অধিকার হিসেবে এটা আদৌ আমাদের দাবি ও অভীষ্ট লক্ষ্যের সম্পূরক নয়। কেননা আমাদের দাবি হচ্ছেঃ আসূর্যাস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে ফসল ফলায়, যে জমি চাষ করে, সেই চাষীই হবে জমির মালিক, (তুমুল হর্ষধ্বনি) আমাদের শাসনতন্ত্রে অন্তত এ কথাটা থাকা উচিত এবং এটা এই সরকারের লক্ষ্যের অনুগামী হওয়া উচিত।

দুর্নীতির প্রশ্ন

দুর্নীতি সম্পর্কেও শাসনতন্ত্রে একটি ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিলো। কিন্তু এ ধরনের কোনো কিছুই আমি শাসনতন্ত্রের কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। এই 'সর্বজন পরিচিত সামাজিক অভিলাষ' আজ আমাদের প্রশাসনযন্ত্র, রাষ্ট্র ও জনসাধারণকে কলুষিত করে ফেলেছে—তাদের মধ্যে এক চরম নৈতিক অধঃপতন ডেকে এনেছে। এ অবস্থায় অন্তত নীতি-নির্দেশক বিধান সংজ্ঞা হিসেবেও শাসনতন্ত্রে একটা কিছু সংঘবদ্ধ করা হবে বলে আমি আশা করছি। সরকার দুর্নীতি, স্বজন-তোষণ, ঘুষ-রেসাওয়াত ও একদেশদর্শিতার মূলোৎপাটনে অভিলাষী—অন্তত এ কথাটা এই নীতি নির্দেশক সংজ্ঞায় থাকতে পারে। কেননা, দেশের সামগ্রিক অবস্থায় এর ওপর নির্ভর করছে। বিভিন্ন আইনের বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এই নীতি-নির্দেশক সংজ্ঞাগুলোর আলোকেই নির্ণীত হবে। এদিক থেকে দুর্নীতির উৎসাদনও যে আইনের একটি উদ্দেশ্য, সেটা সুস্পষ্টভাবে এতে সন্নিবদ্ধ থাকা উচিত।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও গ্রাম-পঞ্চায়েত

প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক থেকে গেছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর উন্নয়ন সম্পর্কে এতে কোনো কিছু বলা হয়নি। পৃথিবী দ্রুত প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্যে ক্ষমতার কিছুটা বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন রয়েছে। মানে, আমাদের জনসাধারণকে আরো কিছু ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে তাদের কর্মশক্তিকে জাতির বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োজিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং সেদিন এসে গেছে। আমার মতে, ব্যাপারটার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। আজকের পৃথিবীর প্রতিটি সমৃদ্ধ ও প্রগতিমুখীন দেশই জাতি গঠনের কাজে সক্রিয় সহযোগিতাদানের ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। জনসাধারণ তাদের সরকার ও রাষ্ট্রের একটা অপরিহার্য অংশ হিসেবে ভাবতে পারলেই কেবল তাদের মধ্যে এ ধরনের উদ্দীপনা ও প্রাণ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা সম্ভব। গ্রাম পর্যন্ত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের আওতা সম্প্রসারণ করলে—মানে, দেশের সমস্ত গ্রামকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্ভুক্ত করে গ্রাম-পঞ্চায়েতকে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডের পাদপীঠ হিসেবে গড়ে তুললেই এর জনগণের কর্মশক্তিকে দেশের সামগ্রিক কল্যাণে নিয়োজিত করা যেতে পারে।

আমাদের জনসম্পদ নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। পৃথিবীর আর কোথাও আমাদের দেশের মতো এমন অপূর্ব লোকসম্পদ আছে বলে আমার জানা নেই। যে কোনো কর্মের ত্যাগ

www.pathagar.com

স্বীকার এবং অক্লান্ত শ্রম ও প্রচেষ্টায় ব্রতী হওয়ার যে ক্ষমতা এদেশের জনগণের রয়েছে, তার নজির কোথাও বড় একটা নেই। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শ্রমে অতুলনীয় এমন একটি জনসম্পদের জন্যে পাকিস্তানকে নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান বলতে হবে। আমি আশা করি, এই জনসম্পদকে সংহত ও সংঘবদ্ধ করা হবে এবং দেশাত্মবোধে তাদের উজ্জীবিত করা হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণা তখনই কেবল তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব, যখন তারা ভাবতে পারবে যে, তারাও সরকারের একটা অঙ্গ।

বিনা বিচারে আটক রাখার প্রশ্ন

গণতন্ত্রের মৌলিক ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী আরেকটি বিষয়ের ওপর আমি আলোচনা করবো। আইনের শাসনকে সবকিছুর উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্যে এ প্রসঙ্গে আমি বৃটিশ জাতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আইনের অনুশাসনের প্রেরণা আমরা তাদের কাছ থেকে লাভ করেছি। আইনের অনুশাসনই আমাদের শাসন-ব্যবস্থার পাদপীঠ হওয়া উচিত এবং একমাত্র তাহলেই (গণতান্ত্রিক অগ্রগতির কোনো ধাপে আমরা রয়েছি, সেটা যাচাই করতে পারবো) আমরা আমাদের সামগ্রিক অবস্থা সম্যক অনুধাবন করতে পারবো। এই খসড়া শাসনতন্ত্রে একেবারে লাগামছাড়াভাবে নিবর্তনমূলক আটক ও বিনা বিচারে আটক রাখার নীতিকে সংবিধানের পবিত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে দেখে আমি তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি। বর্তমান পর্যায়ে কেউ এ ধরনের একটা বিধানের কথা ভাবতে পারে বলেও আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না, দেশের বর্তমান সন্ধিক্ষণে কেউ এ ব্যবস্থার প্রতি আদৌ সমর্থনদান করবে। ৭ (২) অনুচ্ছেদে সাধারণ একজন অপরাধীকেও ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে হাজির করার বিধান রয়েছে এবং এ বিধান অনুসারে গ্রেফতারের কারণও তাকে অবশ্যই জানাতে হবে। কিন্তু বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিদের সম্পর্কে এধরনের কোনো ব্যবস্থারই উল্লেখ এই শাসনতন্ত্রের কোথাও নেই। গ্রেফতারের পর তাদের কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা এবং আটকের কারণ তাদের জানানো হবে কিনা, এ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি—এসম্পর্কে একটা অনুচ্ছেদও এতে সংবদ্ধ নেই! কিন্তু এসব প্রশ্নের উর্ধ্বেও আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে আমরা এর পেছনে কি দেখতে পাচ্ছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ঃ বিনাবিচারে যাদের আটক রাখা হয়, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের আটক রাখা হয় এবং সেটা হচ্ছে স্রেফ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য? কোনো অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্যে তাদের আটক করে রাখা হয় না। অবশ্য কোনো অপরাধের জন্যে তাদের আটক রাখা হলে, সে অপরাধ অবশ্যি এমন পর্যায়ে পড়বে যার বিচার প্রচলিত সাধারণ ফৌজদারি আইন অনুযায়ী করা যেতে পারে—তার জন্যে নির্বতনমূলক আটকের আদৌ প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা কেন তাদের বিচারের ব্যবস্থা করছেন না? কেন আপনারা তাদের গ্রেফতার করে বিনা বিচারে আটক করে রাখছেন? এ প্রসঙ্গে আমি এই পরিষদেরই দুজন সদস্যকে আটক করে রাখার বিষয়টি সম্পর্কে পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

[এ সময় ডেপুটি স্পীকার জনাব সোহরাওয়ার্দীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, এ সম্পর্কে পরিষদের অধিকার সংরক্ষণ কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছেন, সেটা পরিষদে বিবেচনার জন্যে পেশ করা হবে। জবাবে জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন, সদস্যদের গ্রেফতারে পরিষদের অধিকার ভঙ্গ হয়নি বলে কমিটি রিপোর্ট দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর (জনাব সোহরাওয়ার্দীর) আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে ভিন্নতর।]

www.pathagar.com

আমি শুধু এ ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি যে, কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই পরিষদের এক মাননীয় সদস্যকে এখান থেকে (করাচী থেকে) গ্রেফতার করে অন্যত্র (ঢাকায়) নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর স্পীকারকে জানানো হয়েছে যে, আটক সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের উদ্দেশ্যে তদন্ত পরিচালনা করা হচ্ছে। আমি কখনো এ ধরনের উদ্ভট ব্যাপারের কথা আর শুনিনি। গ্রেফতারের পর সেই গ্রেফতার কিংবা মামলার যৌক্তিকতা সপ্রমাণের জন্যে তথ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করা হচ্ছেঃ আজব ব্যাপার বটে! এ প্রসঙ্গটি যখন আসবে, আমি তখন এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করবো।

[এই সময় জনাব আই.আই. চুন্দ্রীগড়ের একটি কটাক্ষের জওয়াবে জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেনঃ মাননীয় সদস্য জানেন যে, ৩২টি দাঁতের মাঝখানে বিরোধী দলের নেতার একটি মাত্র জিহ্বাই আছে। আর তাঁর আরো জানা উচিত, সরকারি নীতি পরিচালনা করেন ওদিককার আসনে উপবিষ্ট প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবর্গ—বিরোধী দলেন নেতা নন।]

কিন্তু কথা হচ্ছে, আপনারা যদি সত্যি দেশে আইনের অনুশাসন কায়েম করতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনাদের নির্বতনমূলক আটক ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করতে হবে। এক্ষেত্রে এ পরিষদের একজন সদস্যের ব্যাপারে যা করা হয়েছে, সারা দুনিয়ার সামনে সেটা আমাদের তুলে ধরতে হবে। কেননা, এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। গ্রেফতারের পর সংশ্লিষ্ট সদস্যকে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হাজির করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে জামিনে মুক্তি দেন। কিন্তু মুক্তির নির্দেশ কার্যকরী না করে তাঁকে নিবর্তনমূলক আটক আইন বলে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে অথচ তিনি জেলে আটক রয়েছেন। এর পেছনে যে কি রয়েছে, সবার সামনেই তা খোলাসা হয়ে গেছে। কারোরই আজ বুঝতে বাকি নেই যে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যেই সরকারি দল এই নিবর্তনমূলক আটক আইনের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করছেন।

আইনের শাসনের প্রতি মর্যাদার প্রশ্ন

বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার এবং পূর্বতন সরকারগুলো যদি আইনের শাসনের প্রতি মর্যাদা প্রদান করতেন, তাহলে জনসাধারণ নিশ্চয়ই তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করতো। জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তখন একথা বলতো ঃ 'দেশের কল্যাণ এবং দেশের স্বার্থেই আমাদের সরকার ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন; কাজেই তাঁদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই।' কিন্তু আমরা এখন কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকার তাঁদের ওপর ন্যস্ত জনসাধারণের এ ক্ষমতা তাঁদের রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে নির্বিচারে এবং যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় কিছুতেই তাঁরা জনসাধারণের কাছ থেকে অনুরূপ বিবেচনা এবং আস্থার দাবি করতে পারেন না।

যুদ্ধ-বিদ্রোহ কিংবা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অনুরূপ পরিস্থিতিতেই কেবল কোনো সরকারকে নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে, অন্যথা নয়। আমাদের দেশে বর্তমানে যে অবস্থা রয়েছে, তাতে তো কিছুতেই সরকারকে এ ধরনের ক্ষমতা দেয়ার কথা উঠতে পারে না। পূর্বোক্ত অবস্থার মতো কোনো জরুরী অবস্থা দেখা দিলে প্রেসিডেন্ট কিংবা সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাধিকারী ব্যক্তি যথার্থ অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে সরকারের হাতে এই ক্ষমতা (নিবর্তনমূলক আইনের ক্ষমতা কিংবা অনুরূপ জরুরী কোনো ক্ষমতা) ন্যস্ত করবেন। এ সময়

www.pathagar.com

পার্লামেন্টের অধিবেশন চলতে থাকলে পার্লামেন্ট অবশ্যই জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইন পাস করে সরকারের হাত জোরদার করবেন। কিন্তু নিজেদের ক্ষমতার গদিতে টিকিয়ে রাখার কৌশল হিসেবে রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে এই ক্ষমতার অপব্যবহার নিঃসন্দেহে ন্যায়-নীতি, ন্যায়বিচার, আইনের অনুশাসন, মানবতা ও মানবীয় মূল্যবোধের প্রতি চরম অবমাননাকর।

সরকারি ভাষা, জাতীয় ভাষা, না রাষ্ট্রভাষা ?

এরপর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যগুলোর প্রশ্ন। এখন পর্যন্ত এসব বৈষম্যের একটিরও কোনো রফা হয়নি। এখানে আমি নজির হিসেবে কয়টি বৈষম্যের কথা বলছি। প্রথমে ভাষার প্রশ্নটিই ধরা যাক। প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানে দু'টি সরকারি ভাষা থাকবে। আর এই দুই ভাষা হবে বাংলা ও উর্দু। তারপর কিছুকাল পরে একটি 'জাতীয় ভাষার' উন্মেষ সাধন করা হবে! জাতীয় ভাষা? জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্যে নানাজন নানাভাবে এর ব্যাখ্যা করছেন। আমি আপনাদের সামনে ব্যাপারটা তুলে ধরছি।

জনৈক সরকারি সদস্য বলেছেন ঃ 'শাসনতন্ত্রে দু'টি জাতীয় ভাষার ব্যবস্থা রয়েছে।' তার মতে, সরকারি ভাষার মানে হচ্ছে ঃ 'জাতীয় ভাষা'। ক্ষমতাসীন সরকারের আরেকজন বিশিষ্ট মুখপাত্র 'সরকারি ভাষার' যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার ওপরও আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি বলেছেনঃ 'বর্তমান সরকার পূর্ব বাংলার দাবি মেনে নিয়েছেন এবং বাংলাকে 'রাষ্ট্রভাষার' মর্যাদা দিয়েছেন।' তাদের মুখনিঃসৃত উক্তিগুলোই আমি অবিকল এখানে উদ্ধৃত করলাম। এতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি ঃ কারো কাছে সরকারি ভাষার মানে 'রাষ্ট্রভাষা'—আর কারো কাছে 'জাতীয় ভাষা'। এই ভদ্রলোকরা আরো বলেছেন যে, সরকারি ভাষা ও রাষ্ট্রভাষার মধ্যে কোনো তফাৎ বা হেরফের নেই।

[জনাব সোহরাওয়ার্দী যে দু'জন সরকার দলীয় সদস্যের উক্তির উদ্ধৃতি দেন, তাঁদের একজন এ সময় বলেন, তিনি বিষয়টির ওপর সংশোধনীর নোটিস দিয়েছেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন, তাঁর (সদস্যের) উক্তি থেকে এ কথাই বোঝা যায় যে, ওটা সরকারি ভাষা—রাষ্ট্রভাষা নয়। সংশ্লিষ্ট সদস্য বলেন, তিনি একে 'রাষ্ট্রভাষা'ই বোঝাতে চেয়েছেন।]

আপনারা যদি সত্যি একে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে সাহসের সংগে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে কথা ঘোষণা করুন। বাংলা ও উর্দু এই দুই ভাষাই দেশের রাষ্ট্রভাষা হবে, সুস্পষ্ট ভাষায় এ কথা ঘোষণা করার সৎসাহস কেন আপনাদের নেই ?

আমার বন্ধুগণ 'জাতীয় ভাষা' বলে আরেকটি ভাষার কথা বলেছেন এবং এরও তাঁরা নানান রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বলতে চাইছেন, এই 'জাতীয় ভাষাটিই' হবে পাকিস্তানের সব ভাষার সেতুবন্ধ এবং দুই অংশের ভাব বিনিময়ের সংযোগ মাধ্যম ('লিংগুয়া-ফ্রাংকা')। ভাষা সম্পর্কে এই নতুন প্রশ্নের অবতারণা করে তাঁরা বিরোধের আরেকটি বিষবৃক্ষ বপন করেছেন; কারণ এতে ব্যাপারটা আগাগোড়া আবার ঘোলাটে হয়ে গেলো। এর সবকিছুই অস্পষ্ট থেকে গেলো। আপনারা এই শাসনতন্ত্রের রচয়িতা এবং প্রবক্তা। কাজেই যেভাবেই সম্ভব চিরকালের জন্যে এই বিরোধ অবসানের দায়িত্ব আপনাদের ওপরই বর্তাচ্ছে। যেভাবেই পারেন, এই বিরোধ আপনারা মিটিয়ে ফেলুন। এই পরিষদে আপনারা হচ্ছেন সংখ্যাগুরু। সংখ্যাধিক্যের এই শক্তি নিয়ে আপনারা পাড়ি দিয়ে যান এবং

www.pathagar.com

বলে দিন, আপনারা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে যাচ্ছেন। কিন্তু দয়া করে ব্যাপারটাকে ঝুলিয়ে রাখবেন না; দয়া করে নানা মুনির নানা ব্যাখ্যা এবং অর্থ-কদর্থের জন্যে একে ফেলে রাখবেন না। আর ব্যাখ্যার ব্যাপারে আপনাদের মধ্যে সত্যি কোনো রকম মতানৈক্য থাকলে আমাদের খোলাখুলি জানিয়ে দিন ঃ এটা আদতে রাষ্ট্রভাষা—তবে ছদ্মাবরণে কিংবা নিগূঢ় অর্থে।

এরপর রেলওয়ের ব্যাপারেও বৈষম্য রয়েছে। তারপর রয়েছে নির্বাচন পদ্ধতির প্রশ্ন। নির্বাচন পদ্ধতির প্রশ্নটির গুরুত্ব আমাদের কাছে অপরিসীম। এ সম্পর্কে পরে আমি বিশদ আলোচনা করবো। কিন্তু এ পর্যায়ে আমি কেবল এটুকুই বলতে চাই যে, এই প্রশ্নটির ওপরই গোটা শাসনতন্ত্রের আদর্শগত ভিত্তি আজ টলটলায়মান। কেননা, যুক্ত-নির্বাচনের সঙ্গে সংখ্যা-সাম্যের ভাগ্যটিও ঝুলে রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান কস্মিনকালেও পৃথক নির্বাচন মেনে নেবে না।

মজার কথা হচ্ছে, আপনারা সংখ্যা-সাম্য মেনে নিয়েছেন; কিন্তু যুক্ত-নির্বাচন পদ্ধতি মেনে নিচ্ছেন না। আপনাদের অজুহাত হচ্ছে ঃ যুক্ত নির্বাচন ইসলাম বিরোধী, অথচ যার পেছনে আদপেও কোনো সত্য নেই। আসলে এ ধরনের একটা মনোবৃত্তি আপনাদের পেয়ে বসেছে এবং এই সুযোগে আপনারা তাকে পরিতৃপ্ত করছেন। কিন্তু আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলছি, এই মনোভাব পূর্ব পাকিস্তানকে ধ্বংস করে দেবে। আমরা কখনো এতে সম্মত হবো না—আমরা কখনো পৃথক নির্বাচনের জিগির মেনে নেবো না।

এরপর হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্ন। জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল গঠনের আবরণে এতো বড়ো একটা বিষয়কেও আপনারা সযত্নে শিকায় ঝুলিয়ে রেখেছেন। প্রস্তাবিত কাউন্সিলে দুই অংশ থেকে সমানসংখ্যক মন্ত্রী থাকবেন এবং এর ফল হবে, কাউন্সিলে বিরোধ ও মতানৈক্য একটা সার্বক্ষণিক ব্যাপার হয়ে থাকবে। এর ফল হবে, পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের বিষয়গুলো কাগজে-কলমে থাকবে আর কাগজের শোভা বর্ধন করবে। কিন্তু আদতে কাজ কিছুই হবে না। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধান এবং দেশের কল্যাণ সাধনের ও বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপারে আপনারা যা কিছু করতে চাইছেন, তার সবই এতে ভেস্তে যাবে।

কেন্দ্রীয় রাজধানীর প্রশ্নে

এখন আসুন করাচীর ব্যাপারে। এ বিষয়টিকেও আপনারা এক চরম বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখেছেন। পাকিস্তানের ফেডারেল রাজধানী অন্য কোথাও প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। কিন্তু আপনারা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ফেডারেল রাজধানী করাচীতেই থাকবে আর এর প্রশাসন ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশের আওতার বাইরে থাকবে। করাচী থেকে পশ্চিম পাকিস্তান আইন পরিষদে যে সব সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, ন্যায়সঙ্গতভাবেই তাঁরা বলতে পারেন ঃ 'আমাদের অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে—আমরা না ঘরকা না ঘাটকা। আমরা না এখানে আছি, না ওখানে আছি।

করাচী ফেডারেল সরকারের আওতাভুক্ত। পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের কোনো নির্দেশ বা পরোয়ানা করাচীর ওপর প্রযুক্ত হচ্ছে না অথচ তবু পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদে আমরা করাচীর প্রতিনিধিত্ব করছি! এর কি মানে হতে পারে? এর উদ্দেশ্য এবং সার্থকতাই বা কি? এই একটা ব্যাপারে আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রতিবাদ ও দেন-দরবার করা হয়েছে।

www.pathagar.com

[এ সময় করাচী থেকে নির্বাচিত জনৈক সদস্য একটা আপত্তি তোলার চেষ্টা করেন।]

করাচীর অধিবাসীরা তাঁদের নিজস্ব আইন-পরিষদ এবং নিজস্ব মন্ত্রিসভার দাবি করলেও তাতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে ঃ করাচীই কেন্দ্রীয় রাজধানী থাকবে এবং এর ওপর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ বা যৌথ অধিকার থাকবে। আমরা কিছুতেই গাড়াপে কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করতে দেবো না। আমরা সেখানে শিকড় গাড়তে যেতে চাই না। কায়েদে আজম করাচীকে কেন্দ্রীয় রাজধানী ঘোষণা করেছিলেন এবং আমাদের পক্ষে যতোদিন করাচীতে রাজধানী রাখা সম্ভব হবে, ততোদিন অবিশ্যি রাজধানী করাচীতেই থাকতে হবে।

আরো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনার দাবি রাখে। শাসনতন্ত্রে এমনকি, শাসনতন্ত্রের নীতি-নির্দেশক সংজ্ঞায় পর্যন্ত এ বিষয়গুলো সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয়নি। নজির হিসেবে বলা যেতে পারে, নিজেদের দেশের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণে উৎসাহদানের জন্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণকে সামরিক শিক্ষাদান এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন সম্পর্কেও শাসনতন্ত্রে কোনো কিছুরই উল্লেখ নেই। পাশাপাশি এবং সমান পর্যায়ে দেশের উভয় অংশেরই উন্নয়ন সাধন করা হবে, এমন কোনো কথাও শাসনতন্ত্রে নেই। আমাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয়-বরাদ্দ এবং বিলি-বন্টন সম্পর্কে কোনো কথা বলা হয়নি। সরকারি চাক্‌রি এবং এ ধরনের অন্যসব প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও শাসনতন্ত্র নীরব। তাহলে এ শাসনতন্ত্র দিয়ে আমরা কি করবো? এর প্রয়োজনই বা কোথায়? দেশের প্রতিটি সমস্যাকেই এই শাসনতন্ত্র আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে সযত্নে তাকের ওপর তুলে রেখেছে। এতে যা কিছু আছে, তার সবই হচ্ছে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন থেকে ধার করে নেয়া কয়েকটি অনুচ্ছেদ মাত্র! কিন্তু তাও আবার যেখানে মূল অনুচ্ছেদের রদবদল করা হয়েছে, সেখানে একে আরো খারাপ করে তোলা হয়েছে।

অপপ্রচারের জওয়াব

এই পরিষদে একটা কথা আমি শুনতে পেয়েছি। ওদিককার কোনো কোনো সদস্য বলেছেন যে, এই খসড়া শাসনতন্ত্র সোহ্‌রাওয়ার্দীর খসড়ার চেয়েও ভালো। জনৈক সদস্য গলা ফাটিয়ে বলেছেন, সোহ্‌রাওয়ার্দীর শাসনকালে গণতন্ত্র একটা ভাঁওতায় পরিণত হয়েছিলো এবং সরকারের সেই 'সৌভাগ্যবান' মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন, 'সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা' দেশের জন্যে কি করেছে।

যথাবিহিত সম্মানপূর্বক আমি এই মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর নিজের অবস্থা সম্পর্কে আত্মানুসন্ধান করতে বলছি। তিনি এক্ষণে যে মন্ত্রিসভার সদস্য, একে কি তাঁর মন্ত্রিসভা বলা যায়? মোটেও এ হতে পারে না। আমি যে মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলাম, সেটা সত্যিকার মন্ত্রিসভা ছিলো এবং কে সে মন্ত্রিসভার নীতি নির্ধারণ করতো, ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেবে। এপ্রসঙ্গে আমি সুস্পষ্ট ভাষায় একথা ঘোষণা করতে চাই যে, আমি কোনো সময় শাসনতন্ত্রের কোনো খসড়া রচনা করিনি। গোটা ব্যাপারটাই আজগুবী। আদতে বুজরুকি জাহির করার জন্যে একটা ফাঁকা তুবড়ি ছেড়ে কথাটা প্রচার করা হচ্ছে।

[এ সময় সরকারি দলের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর কথা কাটাকাটি হয়।]

www.pathagar.com

কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে ঃ আইন দফতরের অফিসাররা তাঁদের প্রতি প্রদত্ত কয়েকটি নির্দেশক্রমে কথিত খসড়াটি প্রণয়ন করেন। প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই সরাসরি তাঁদের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী কি একথা অস্বীকার করতে পারবেন? মন্ত্রিসভায় আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। তাতে কি আসে যায়? তাতে একথা বলা যায় না যে, আইন সচিবই (জনাব সোহরাওয়ার্দী) খসড়াটি প্রণয়ন করেছেন। একথা বলা হলে সম্পূর্ণ ভুল বলা হবে এবং এতে আইন দফতরের অফিসারদের প্রতি অবিচার করা হবে। তাঁরা এই পরিষদের সাহায্যের জন্যেই দিন-রাত খেটে খসড়াটি দাঁড় করিয়েছেন। এ অবস্থায় এ ধরনের কথা বলা হলে তাঁদের প্রতি অমর্যাদাই প্রদর্শন করা হবে।

এই পরিষদে গণতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনাকালে আমার বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ করা হয়। অভিযোগ করা হয় যে, আমি নাকি অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের কথা বলেছিলাম। আমার মনে আদৌ এ ধরনের একটা কল্পনার বিন্দুমাত্র ছায়াপাত হয়েছিলো কিনা, আমি সেটাও স্মরণ করে দেখেছি। আমি বলতে পারি, এমন কোনো কিছু আমি কল্পনা করেও দেখিনি। আমি যদি আদৌ কোনো কিছু এ সম্পর্কে বলে থাকি, তবে হয়তো সেটা জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে সতর্কবাণী হিসেবে বলেছিলাম। আমি হয়তো এমনভাবে কথাটা জনসাধারণকে লক্ষ্য করে বলেছিলাম যে, আমরা যদি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে প্রস্তাবিত কনভেনশনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ না করি, তাহলে হয়তো আমাদের ওপর এ ধরনের একটা শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেয়া হতে পারে। আমার মনে আছে, বিশৃংখলা সম্পর্কে আমি একবার জনসাধারণকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, তারা যদি দেশে বিভেদ ও অনৈক্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে তাহলে তারা শেষ পর্যন্ত দেশে সামরিক শাসনই ডেকে আনবে। বোধহয়, শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কোনো কথা আমি সে সময়ই বলে থাকবো, কিন্তু আমি কখনো জনসাধারণকে কোনো হুমকি দিইনি। আর আমি কখ্খনো একথা বলিনি যে, অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে আমরা একটা শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবো।

আরেকটি প্রশ্নেরও অবতারণা করা হয়েছে। এর সঙ্গে অবশ্য শাসনতন্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। সত্যের অপলাপ বা সত্যের চরম বিকৃতি না থাকলে আমি আদৌ কথাটা এখানে উঠাতাম না। কিন্তু এর ফলে সহজেই জনসাধারণের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে বলে আমি শেষ পর্যন্ত প্রসঙ্গটা এখানে তুলতে বাধ্য হলাম। অভিযোগ করা হয়েছে যে, গণপরিষদ ছাড়াই আমরা একটা শাসনতন্ত্র রচনা করতে চেয়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রী এখানে উপস্থিত রয়েছেন। তিনিও সে সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। আমার বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে তিনিই সাক্ষ্য দেবেন। আমরা ঠিক গণপরিষদেরই অনুরূপ একটি সংস্থার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। আমরা প্রস্তাবিত এই সংস্থাটির নাম দিয়েছিলাম 'কনভেনশন'। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মুখ্য ও জরুরী প্রয়োজন সম্পর্কে সারাদেশের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই আমরা এর নাম 'কনভেনশন' দিয়েছিলাম এবং এর মাধ্যমে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে চেয়েছিলাম। এ সম্পর্কে ফেডারেল কোর্ট আমাদের কাছে জানতে চাইলে আমরা জানিয়েছিলাম যে, পূর্বতন গণপরিষদের সব ক্ষমতাই কনভেনশনকে দেয়া হবে। ফেডারেল কোর্ট তখন আমাদের এই কনভেনশনকে 'গণপরিষদ' নামে অভিহিত করার জন্যে পরামর্শদান করেন। আমরা ফেডারেল কোর্টের পরামর্শ মেনে নিই।

www.pathagar.com

[জনাব চুন্দ্রীগড় এ সময় জানতে চান যে, প্রস্তাবিত কনভেনশনটির কেন্দ্রীয় আইনসভার অনুরূপ কোনো ক্ষমতা ছিলো কিনা।]

প্রস্তাবিত কনভেনশন কিছুকালের জন্যে অবশ্য আইন প্রণয়ন সংস্থা বা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ হিসেবে কাজ করতো না। কেননা, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রধান ও মুখ্য দায়িত্ব ছিলো বলেই এর নাম কনভেনশন দেয়া হয়েছিলো। প্রস্তাবিত কনভেনশনটিকে 'গণপরিষদ' নামে রূপান্তরিত করা হলেও সেই একই অবস্থাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। কেননা, এখন পর্যন্ত আইন-পরিষদ হিসেবে গণপরিষদের একটি বৈঠকও বসতে পারেনি। এ থেকে দেখা যাচ্ছে, গণপরিষদ নাম দেয়া হলেও এতে কনভেনশনের ধারণাই রূপলাভ করেছে।

আমরা সে সময় ধারণা করেছিলাম যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজেই গণপরিষদের সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। আমাদের ধারণাই এখন বাস্তবায়িত হয়েছে। কেননা, গণপরিষদের সমস্ত শক্তি এখন আইন প্রণয়নেই ব্যয় হচ্ছে। গণপরিষদের আয়ুষ্কালের দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও আমরা আজো আইন-পরিষদ হিসেবে এর একটি অধিবেশনেও যোগদান করতে পারিনি। আমার যতোদূর মনে পড়ে, গতবছরের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে সরকার এই পরিষদে সংশোধিত বাজেট পেশ করতে চেয়েছিলেন এবং এই পরিষদের মেঝেয় দাঁড়িয়েই সে কথা ঘোষণা করা হয়েছিলো। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে বাজেট পেশ করা সম্ভব হয়নি এবং তার বদলে আমরা আগামী বছরের নয়া বাজেটের বিষয় বিবেচনা করতে যাচ্ছি।

এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কি বোঝা যাচ্ছে? আর তাছাড়া, আমার খসড়া বলতেওবা তাঁরা কি বোঝাতে চাইছেন? যে খসড়ার আদৌ অস্তিত্ব নেই, তার বাহানা তুলে কি লাভ?

[এ সময় ডেপুটি স্পীকার বলেন ঃ যে জিনিসটির কোনো অস্তিত্ব নেই, এখানেই তার ইতি হওয়া উচিত।]

প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের এই খসড়ার যা কিছু কৃতিত্ব, তার সবই আমি জনাব চুন্দ্রীগড়কে দিতে চাই। এই খসড়ায় যা কিছু ভালো রয়েছে, তার সব সুনামই জনাব চুন্দ্রীগড়ের পাওনা। আর এতে যদি কোনো বিচ্যুতি কিংবা অকৃতিত্বের কোনো কিছু থেকে থাকে, তবে তার অপযশও সমানভাবে তাঁর বরণ করে নেয়া উচিত। আমি জানি, এই খসড়ায় এমন অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলোকে জনাব চুন্দ্রীগড় অনভিপ্রেত বলে মনে করেন।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ছাড়া সংখ্যা-সাম্যের মানে নেই

এখন আমি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটির ওপর আলোকপাত করতে চাই। এ ব্যাপারটি সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। আপনাদের বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। আপনাদের ভেবে দেখতে হবে, দেশের দুই অংশ—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যদি আপোষে বা মতৈক্যে না আসে, তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াবে? তাহলে আমাদের কি করতে হবে? আমি আগেই বলেছি, পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন চক্র আমাদের ভাগের অংশ সাবাড় করছে এবং ইতিমধ্যে তাঁরা অনেক কিছু সাবাড় করে ফেলেছেও। তারা সবকিছুই নিজেদের কুক্ষিগত করতে চায়। তাঁরা নিজেদের সুবিধা মতো শাসনতন্ত্রের বহু জায়গায় প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সংখ্যা-সাম্যের পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। তাঁরা নিজেদের জন্যে এটাকে একটা অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তাঁরা এমন ব্যবস্থা করে নিয়েছে যে, জাতীয় পার্লামেন্টে সদস্য-সংখ্যা বাড়লেও এই সংখ্যা-সাম্য অপরিবর্তনীয় থাকবে। দুঃখের সঙ্গে

www.pathagar.com

আমাকে এ কথা বলতে হচ্ছে যে, সংখ্যা-সাম্যের সঙ্গে যে সব বিষয় অপরিহার্যভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁরা তার সবকিছুই সযত্নে উপেক্ষা করে গেছেন। আমি দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে এ কথা ঘোষণা করছি যে, একই সঙ্গে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনদানের স্বীকৃতি দেয়া না হলে বাংলার জনসাধারণ কখনো সংখ্যা-সাম্য মেনে নিতো না। সংখ্যা-সাম্য মেনে নেয়ার জন্যে পূর্ব পাকিস্তানকে তখন বলা হয়েছিলো, এক অংশ যাতে অন্য অংশের ওপর কোনোরকম প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে, তার রক্ষাকবচ হিসেবে সব কিছুই আপোষ-রফা ও মতৈক্যের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করতে হবে। এর নীতি হবে ঃ আদান-প্রদান বা দেয়া-নেয়া। জবরদস্তির কোনো প্রশ্ন এখানে থাকবে না। সেজন্যেই বলছি যে, একই সঙ্গে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন না দেয়া হলে বাংলার জনসাধারণ সংখ্যা-সাম্য মেনে নেবে না। উভয় অংশের মধ্যে সব কিছুতেই সমতা বা সংখ্যা-সাম্য থাকতে হবে। কেননা, সংখ্যা-সাম্যের পরিসরে পশ্চিম পাকিস্তানকে একটা 'জাতি', গ্রুপ বা আঞ্চলিক সত্তা হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে; পূর্ব পাকিস্তানকেও এই দৃষ্টিকোণ থেকেই একটা স্বতন্ত্র 'জাতি', গ্রুপ বা আঞ্চলিক সত্তা হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে। পাকিস্তানী জাতি অর্থে নয়—সাধারণ যৌক্তিক অর্থেই আমি এখানে 'জাতি' কথাটা ব্যবহার করলাম। এই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য, দুই অংশের মধ্যে বিদ্যমান দুস্তর ভৌগোলিক ব্যবধান এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কারণে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অপরিহার্য। এদিক থেকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি অবশ্যই আমাদের মেনে নিতে হবে।

তারপর যুক্ত-নির্বাচনের প্রশ্ন। পূর্ব পাকিস্তান যাতে একটি একক ও অখণ্ড ইউনিট হিসেবে সামগ্রিকভাবে কথা বলতে পারে, তার জন্যে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি অপরিহার্য। আমরা কিছুতেই অধিবাসীদের একটা অংশের ওপর তথা হিন্দু অধিবাসীদের ওপর ক্ষমতার ভারসাম্যের চাবিকাঠি ন্যস্ত করতে পারি না। কারণ, যুক্ত নির্বাচন মেনে নেয়া না হলে তারাই হবে ক্ষমতার ভারসাম্যের নিয়ন্তা এবং তাদের ওপরই সমগ্র অঞ্চলের ভাগ্য নির্ভর করবে। এ অবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের ধ্বংস ডেকে আনবে।

[এ সময় ডাক্তার এস. কে. সেন বলেন, ওরা (হিন্দু অধিবাসীরা) পৃথক নির্বাচন চান না।]

আমি জানি, তারাও (হিন্দুরাও) ক্ষমতার এ ধরনের অস্বাভাবিক ভারসাম্যের নিয়ন্তা হতে চান না (তথা তারাও পৃথক নির্বাচন চান না)। সংখ্যা-সাম্যের সঙ্গে যুক্ত-নির্বাচন পদ্ধতি ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। মানে, সংখ্যা-সাম্য যুক্ত-নির্বাচনেরই অনিবার্য পরিণতি এবং এজন্যে একটা ছাড়া অন্যটা অর্থহীন। পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি মেনে নেয়া হলে আমাদের সম্পদ, আমাদের চাকরি-বাকরি, কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সবরকম লেনদেন এবং আরো অনেক কিছু পৃথক করার প্রয়োজন হবে। আমি জানি, আমাদের মতো জনাব গুরমানীও আজ এ ব্যাপারটায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কেননা, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম একজন প্রবক্তা। তিনি বলেছিলেন ঃ 'সংখ্যা-সাম্য চাইলে আপনাদের অবশ্যই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনও মেনে নিতে হবে।' কিন্তু এটা সত্যি দুঃখজনক যে, তাঁকে আজ ভিন্নভাবে সরকারি দলে থাকার জন্যে কথা বলতে হচ্ছে।

[এ সময় জনাব গুরমানী বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে তিনি কোনো ভিন্ন মত পোষণ করেন না। জনাব সোহরাওয়ার্দী এতে খুশী হয়ে বলেনঃ আমরা তো তা-ই চাইছি। তাহলে তো কোনো কথাই নেই।]

www.pathagar.com

[আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে জনাব গুরমানীর সমর্থনসূচক উক্তির পর] কথা হচ্ছে, আপনি যদি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি সমর্থন করেন, তাহলে আপনার সঙ্গে আমাদের কোনো তফাৎ নেই। তাইতো আমি বলছিলাম, পরিষদের এদিক (বিরোধী দলের আসন) থেকে আপনার কথা বলা উচিত।

আমি মুসলমান হিসেবে বাঁচতে ও মরতে চাই

এখন আমি সবচাইতে জটিল এবং 'বিপজ্জনক' প্রশ্নটির ওপর আলোকপাত করতে চাই, প্রশ্নটা হচ্ছে ঃ পাকিস্তানের ইসলামী প্রজাতন্ত্র নামকরণ। এ প্রসঙ্গে আমি পূর্বাহ্নে পরিষদের এদিককার সদস্যদের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট ভাষায় একথা ঘোষণা করতে চাই যে, ইসলামের ওপর আমাদের অটল বিশ্বাস রয়েছে। আমরা মুসলমান, মুসলমান হিসেবেই এ পৃথিবীতে আমরা বেঁচে থাকতে আর মুসলমান হিসেবেই আমরা শেষনিশ্বাস ত্যাগ করতে চাই।

এখন আমার কথা হচ্ছে, দেশের সর্ব পর্যায়ের সব আইন পরিষদের সম্মিলিত সংকল্প ও উদ্যমকে একীভূত করা হলেই কেবল আমাদের পক্ষে ইসলামী আদর্শ, ইসলামী জীবন-দর্শন আর ইসলামী আইনের অনুশাসনের বাস্তবায়ন সম্ভব।

প্রশ্ন হচ্ছে, যে দেশের অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানরাই বিপুল সংখ্যাগুরু, সে দেশের আইনসভায় ইসলামসম্মত আইন ছাড়া অন্য কি আইন পাস হতে পারে? মুসলমানদের হাতে অন্য কোনো ধরনের (ইসলামের বিধানের পরিপন্থী) আইন পাস হতে পারে বলে আমি ভাবতেও পারি না। এ অবস্থায় আপনারা রাষ্ট্রের নাম ইসলামী প্রজাতন্ত্র কেন দিয়েছেন, আমি বুঝতে পারি না। আমার মনে হয়, এর আসল কারণ হচ্ছে ঃ ইসলামের মহান মূল্যবোধের প্রতি সত্যিকার মর্যাদা প্রদর্শনে আপনাদের অন্তরের কোনো তাগিদ নেই। রাষ্ট্রের নাম ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার মানে হচ্ছে, আপনারা ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন।

'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' বলতে তাঁরা কি বোঝাতে চান?

'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' বলতে তাঁরা কি বোঝাতে চান? আদর্শের দিক থেকে রাষ্ট্রকে ইসলামী জীবন অভিসারী না করে শুধু শুধু নামকাওয়াস্তে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্রে'র ঘোষণার কি মানে হতে পারে? পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপায়ণের ব্যাপারে আপনাদের অন্তরে যদি সত্যি কোনো তাগিদ থাকতো, যদি আপনাদের সত্যি কোনো সদিচ্ছা থাকতো, যদি সত্যি এ-ই আপনাদের আকাঙ্ক্ষা ও অভীষ্ট লক্ষ্য হতো, তাহলে শাসনতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় আদর্শের সংজ্ঞায় কেন আপনারা একথা সংবদ্ধ করলেন না? মৌলিক অধিকারের অনুচ্ছেদেই বা কেন আপনারা এর উল্লেখ করেননি? সবশেষে অন্তত রাষ্ট্রের নীতি-নির্দেশক সংজ্ঞায়ইবা কেন এর উল্লেখ থাকলো না? আসল কথা আমি জানি। আসল কথা হচ্ছে ঃ ইসলামী আদর্শের রূপায়ণ আপনাদের উদ্দেশ্য নয় এবং এ সম্পর্কে আমি একেবারে স্থিরনিশ্চিত। সরকারি দল কিংবা বিরোধী দলের যাঁরাই এ সম্পর্কে আলোচনা করছেন, তাঁরা জোর দিয়েই এ কথাটা বলেছেন যে, নীতি ও আদর্শের দিক থেকে পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র নয়। একে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে বহু কিছু করতে হবে এবং অনেক দূর এগোতে হবে। এই যদি অবস্থা হয় এবং ঘটনার বাস্তব চিত্র যদি এ-ই হয়, তবে কেন আপনারা এদেশের জনসাধারণ এবং সারা দুনিয়ার চোখে ধূলা দিচ্ছেন? কেন আপনারা তাদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন? 'কেবল

www.pathagar.com

আমরাই পাকিস্তানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হয়েছি'—বড়গলায় এ ফাঁকা কথাটি প্রচার করে কেন আপনারা মুসলিম দুনিয়াকেও প্রতারিত করছেন?

পাকিস্তানকে সত্যিকার অর্থে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে রূপায়ণের ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। আমিও এ অভিমতেরই অনুসারী। তবে আমার আপত্তিটা হচ্ছে এখানে যে, খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত না করা পর্যন্ত আপনারা পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে অভিহিত করতে পারেন না। আমি জানি, ইসলাম সম্পর্কে আমার এই পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙি এবং সুস্পষ্ট অভিমতের অনেক কদর্থ করা হবে, অনেক অপব্যাখ্যা করা হবে। আমি আরো জানি, সরকারের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত সংবাদপত্রগুলো বড় বড় শিরোনামায় কালই একথা বলবে যে, 'সোহরাওয়ার্দী ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিরোধী'। আমি ভালোভাবেই একথা জানি যে, ভালো কিংবা যুক্তিসঙ্গত কোনো একটা কথা কেউ বললে, তার কদর্থ করার এবং তাকে বিকৃত করে প্রচার করার লোকের অভাব আমাদের দেশে নেই।

কিন্তু আমার কথা হচ্ছে ঃ সত্য অপ্রিয় হলেও কর্তব্যের তাগিদে আমাকে তা প্রকাশ করতেই হবে। আমার বিবেকের অনুশাসনকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। আমার বিবেকের আহ্বানে আমাকে সাড়া দিতে হবে। আমার দেশের প্রতিও আমার বিরাট কর্তব্য রয়েছে। আর আমার সৃষ্টিকর্তার প্রতিও রয়েছে আমার অন্তরের এক বিরাট তাগিদ। এ অবস্থায় আপনারা যখন কেবল নামসর্বস্বভাবে পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রের খেতাবে অলঙ্কৃত করে জনসাধারণকে ভাঁওতা দিচ্ছেন, তখন আমার কণ্ঠ প্রতিবাদমুখর না হয়ে পারে না। সেজন্যেই স্বাভাবিক সঙ্গত কারণেই এ সম্পর্কে আমি আমার সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করতে এখানে দাঁড়িয়েছি। [এ সময় জনাব গুরমানী জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার মতে বিশ্বে কি কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই? জবাবে জনাব সোহরাওয়ার্দীর বলেন ঃ নিশ্চয়ই না। জনাব জহীরুদ্দিন এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ মুসলিম অধ্যুষিত যে সব দেশ রয়েছে, সেগুলো মুসলিম রাষ্ট্র—'ইসলামী রাষ্ট্র' নয়।]

আমি প্রকৃত অর্থে ইসলামী শাসনতন্ত্র চাই

একটা রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র এবং শাসন মোতাবেক পরিচালিত তার শাসনযন্ত্রগুলো ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী মূল্যবোধ অভিসারী হলেই তাকে সঠিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায়। আমরাও ঠিক এ-ই চাই। আমরাও চাই, শাসনতন্ত্র এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শের পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন হোক। আপনারা যদি পারেন, ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধসহ এর আদর্শের সামগ্রিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করুন, সেটাই বাঞ্ছিত। সেটাই অভীষ্ট লক্ষ্য হওয়া উচিত।

এর পরের প্রশ্ন হলো ঃ কি ইসলামসম্মত আর কি ইসলামসম্মত নয়; মানে ইসলাম কি অনুজ্ঞা করে আর কি নিষেধ করে, কে তা নিরূপণ করবে? আর কোন্ নীতি বা মানদণ্ড অনুসারে আপনারা এসব প্রশ্নের মীমাংসা করতে চান? এরি মধ্যে আলেমসমাজ বলতে শুরু করেছেন যে, শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যার ব্যাপারে চূড়ান্ত রায়দানের মালিক-মোখতার হচ্ছেন তাঁরাই এবং তাঁদের রায়কেই এ ক্ষেত্রে শেষকথা বলে মেনে নিতে হবে। তাঁদের মত হচ্ছে, শাসনতন্ত্রকে অবশ্যই ইসলামী শাসনতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করতে হবে এবং জনসাধারণকে মত-নিরপেক্ষ হয়ে তাঁদের মতামতই মেনে নিতে হবে।

www.pathagar.com

আপনারাও শাসনতন্ত্রে এ ব্যবস্থা করেছেন যে, আলেমসমাজ একসঙ্গে বসে কোরআন ও সুন্নাহর আদেশ-নিষেধগুলো বাছাই করে একসঙ্গে সংবদ্ধ করবেন। এক্ষেত্রে তাঁদের নিজেদের মধ্যে এবং তাঁদের ও জনসাধারণের মধ্যে মতবিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কিভাবে এ মতবিরোধ নিস্পন্ন করা হবে?

আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আইনসভাকে চূড়ান্ত কর্তৃত্বদান করে প্রধানমন্ত্রী সত্যি বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। এর অন্যথা করা হলে দেশে চরম বিভ্রান্তি এবং বিশৃংখলা সৃষ্টির অবকাশ থাকতো। শাসনতন্ত্রে এখন যে ব্যবস্থা সংবদ্ধ রয়েছে, তার ফলে সহজেই সব মুশকিল আসান হবে না। আমাদের আইনগুলো বিবেচনা করে দেখার জন্যে এক বছর কিংবা তার কিছু আগে-পরে একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। কোরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে প্রচলিত আইনগুলোর সঙ্গতি বিধানই হবে এই কমিটির কাজ। কমিটির সিদ্ধান্তের পর বিষয়টি আইন সভায় আসবে এবং আইনসভাই এর ওপর চূড়ান্ত রায়দান করবেন। কিন্তু আপনারা কি ভাবছেন, সব কিছুই স্বচ্ছন্দেই নিস্পন্ন হবে এবং এ পথে কোনো প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি হবে না? অতীতে দেখা গেছে, উলেমারাও সবসময় নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন না। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট আলেমগণ কোনো একটি বিষয়ে ভিন্নতরো পন্থায় যদি কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যাদান করেন, তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াবে? কোনো আইনসভা কি তখন তাঁদের মতামতের বিরুদ্ধে যাবার সাহস পাবে? আলেমদের মতামত নির্ভুল বা সঠিক না হলেও তাঁদের মতামতের বিরুদ্ধে ভিন্নতরো রায়দানের জন্যে তখন সংশ্লিষ্ট আইনসভাকে এক বিপজ্জনক ফতোয়ার মোকাবিলা করতে হবে। আইন প্রণেতাদের বিরুদ্ধে তখন অভিযোগ করা হবে যে, সর্বজন স্বীকৃত আলেমগণ কোরআন ও সুন্নাহর যে অনুজ্ঞাকে চূড়ান্ত বলে রায় দিয়েছেন, আইন প্রণেতাগণ তাকে অগ্রাহ্য করেছেন। এর পরিণাম কি হচ্ছে? হয়তো আলেমদের একটি অযৌক্তিক ও ভুল ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে সঠিক মতামত দানের জন্যেও ধর্মান্ধ রক্ষণশীলদের হাতে আইন-প্রণেতাদের বহু দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে আপনারা শাসনতন্ত্রে দু'টি শক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে তাদের মধ্যে অনিবার্য সংঘর্ষের পথ খোলাসা করছেন। এ দু'টি শক্তির একটি হচ্ছে আলেমসমাজ আর অন্যটি জনসাধারণ। হতে পারে, বিবদমান ব্যাপারটিতে আলেমদের রায়ই সঠিক। কিন্তু কথা হচ্ছে, তাঁদেরও ভুল হতে পারে। তাঁরা হয়তো শতকরা ৯০টি ক্ষেত্রে সঠিক ব্যাখ্যা দেবেন; কিন্তু শতকরা ১০টি ক্ষেত্রে তাঁদের ভুল হতে পারে। তখন কি হবে? তখন তো উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। আমি এ সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলতে চাইনে। আমি কেবল এ প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান দলিলের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এটা হচ্ছে মুনীর (সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি) রিপোর্ট। বিজ্ঞ বিচারপতি এই রিপোর্টে বলেছেন, 'ইসলাম' ও 'মুসলমানের' (ইসলাম কি বা মুসলমান কে এই সংজ্ঞা নিরূপণে) সংজ্ঞা নিরূপণের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এ থেকে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ঝাপসাই থেকে গেছে এবং আমাদের অবস্থা যে সত্যি কি, আমরা আদৌ তা বুঝতে পারছি না।

প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা সম্পর্কে 'ফতোয়া'

প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা সম্পর্কে ইসলামী আইন অনুযায়ী যে সব ফতোয়া দেয়া হয়েছে, এবারে সে সম্পর্কে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আসলে এ ফতোয়াগুলোর স্বরূপ কি? এসব ফতোয়ায় কি একথা বলা হয়নি যে, প্রেসিডেন্ট হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি

www.pathagar.com

যিনি তাঁর মন্ত্রিসভা ও মজলিসের (আইন-পরিষদ) অভিমত নাকচ করে দিতে পারেন এবং ইস্‌লামী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এব্যাপারে তাঁর পূর্ণাঙ্গ কর্তৃত্ব রয়েছে? এক দৃষ্টিভঙিসম্পন্ন আলেমদের কাছ থেকেই এ ফতোয়া পাওয়া গিয়েছিলো; কিন্তু অন্য দৃষ্টিভঙির আলেমরা অন্য ফতোয়া দিয়েছিলেন। বহু বিষয়ে তাঁদের মধ্যে এধরনের মত-পার্থক্য রয়েছে। তাহলে কোন্‌টা ইসলামী এবং কোন্‌টা ইসলাম-বিরোধী, এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে আপনারা কোন্ দলের রায় মেনে নেবেন?

তাছাড়া, তাঁদের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রের একটি আলাদা সংজ্ঞা রয়েছে। এই সংজ্ঞা অনুসারে ইসলামী দেশগুলোর কোনো ভৌগোলিক পরিসীমা নেই। এই দৃষ্টিতে আমরা হচ্ছি, একটি এক ও অভিন্ন 'মিল্লাত' বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত। আর এ মিল্লাত সারা দুনিয়ার মুসলমানদের সমন্বয়ে গঠিত। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, সত্যিকারের ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো আঞ্চলিক জাতীয়তা নেই এবং এতে পাকিস্তানী হিসেবে আমাদের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা থাকতে পারে না। আর এ সংজ্ঞা মেনে নেয়া হলে মিসরের যে কোনো একজন মুসলমানও ইচ্ছে করলে এখানে (পাকিস্তানে) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। ন্যায়সঙ্গতভাবেই তিনি এ অধিকার দাবি করতে পারেন। কেননা, একটি ইসলামী রাষ্ট্রে একজন নাগরিকের সব রকমের সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার তার রয়েছে।

এরপর রয়েছে খলিফা সংক্রান্ত বিতর্ক। এটা প্রণিধানযোগ্য যে, খিলাফত ছাড়া কিছুতেই খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র হতে পারে না এবং যে কোনো জায়গায় অবশ্যই একজন খলিফা থাকতে হবে। খলিফা ইসলামী রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধান করবেন এবং সারা দুনিয়ার মুসলমান তাঁকে ভোট দিয়ে নির্বাচন করবেন।

আরেকটি বিতর্কমূলক প্রশ্ন রয়েছে। এটা হচ্ছে, জমিদারি সম্পর্কে। আলেমসমাজের একদল বলছেন, আপনারা জমিদারী উচ্ছেদ করতে পারেন—আরেক দল বলছেন, আপনারা জমিদারি উচ্ছেদ করতে পারেন না; কেননা জমিদারি হচ্ছে ব্যক্তিগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের আওতাভুক্ত বলে আপনারা জমিদারি উচ্ছেদ করতে পারেন না। তাহলে এখানে আমরা কার অভিমত গ্রহণ করবো এবং কোন্ নীতি অনুসরণ করবো?

এরপর আসছে, ইসলামী রাষ্ট্রে অ-মুসলমানদের অধিকারের প্রশ্ন। কারা এ বিতর্ক সম্পর্কে রায় দেবেন? অমুসলমানরা কি 'জিম্মী', না 'মুসতামিন', না 'মুয়াহিদ', না অন্য কোনো পদবাচ্য? কেউ এর ব্যাখ্যা করতে পারছেন না। এ হচ্ছে আগাগোড়া আমাদের অবস্থা। আর আমাদের এসব অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে।

[এ সময় শেরেবাংলা জনাব আকুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর বক্তৃতা শেষ হলে তিনি কিছু বলবেন এবং সময় কুলালে আর জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী সুস্থ বোধ করলে তিনি তাঁকে কয়টি প্রশ্ন করবেন। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী বলেন, আজ আমি এমন অসুস্থ যে, এ অবস্থায় অন্য কারো পক্ষেই পরিষদে আসা সম্ভব হতো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেবল কর্তব্যের আহ্বানেই আমি পরিষদে এসেছি এবং আজ যদি আমি আদৌ কোনো কথা বলি, তবে সে কেবল আমার কর্তব্যের তাগিদেই আমি বলবো।]

তারপর গণতন্ত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও মতবৈষম্য রয়েছে। কিন্তু এসব কথার অর্থ এই নয় যে, আমরা ইসলামী আদর্শের বিরোধী। আসলে আমরা যথার্থ অর্থে ইসলামী আদর্শ ও মূল নীতির অনুগমন করতে চাই।

www.pathagar.com

আমি বলছিলাম যে, গুণগতভাবে বা সত্যিকারভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করে আপনারা যদি একে 'ইসলামী রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করেন, তবে সেটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবিহীন একটা কথার কথা বা একটা অন্তঃসারশূন্য বচন ছাড়া আর কিছুই হবে না। এখানকার এক শ্রেণীর লোকের যতো সমর্থনই আপনার পক্ষে থাক না কেন এবং এদেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত বাইরের কিছু সংখ্যক লোকের কাছ থেকে যে সার্টিফিকেটই আপনারা আদায় করুন না কেন, তাতেও কিছু যাবে-আসবে না। এ অবস্থায়ও এ দেশকে উদ্দেশ্যহীনভাবে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' বলে অভিহিত করার কোনো অধিকার আপনাদের ওপর বর্তাবে না। যাঁরা আপনাদের সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, তারা পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বলে আপনারা অভিহিত করছেন দেখে ভাবছেন, আপনারা বুঝি সত্যি নীতি ও আদর্শের দিক থেকে একে নিখুঁতভাবে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন।

রাষ্ট্রপ্রধানের বৈশিষ্ট্য

এবার আমি খসড়া শাসনতন্ত্রের এই অনুচ্ছেদের আরেকটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। এতে বলা হয়েছে ঃ রাষ্ট্রপ্রধান যথা প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। আমাদের দেশের এক অংশে যেখানে অধিবাসীদের শতকরা ৯৮ জন হচ্ছে মুসলমান এবং অন্য অংশে সেখানে শতকরা ৮০ জন হচ্ছে মুসলমান, আর সারা দেশে যেখানে মুসলমানদের গড়পড়তা সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৮৮ জন, সেক্ষেত্রে খসড়া শাসনতন্ত্রে এমন একটি ধারার সংযোজন আগাগোড়া অনাবশ্যক। আমার মনে হয়, 'রাষ্ট্রপ্রধান অবশ্যই মুসলমান হবেন'—শাসনতন্ত্রে এই কথাটির উল্লেখ আমাদের জনসাধারণের বুদ্ধিমত্তার প্রতি ব্যঙ্গ রূপ এবং প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের নির্বাচনের জন্যে যে সব মুসলমান সমবেত হবেন তাঁদের বিচার-বুদ্ধিকেও এটা উপহাস করছে। তারপর সত্যিকার অর্থে কে মুসলমান আর কে মুসলমান নন, এ ব্যাপারেও প্রশ্ন উঠতে পারে। এই কিছুদিন আগেও এ প্রশ্ন নিয়েই একটা রক্তক্ষয়ী হাঙ্গামা হয়ে গেছে। আমাদের ধর্মবেত্তাগণ কি সন্তোষজনকভাবে সে সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিলেন? কেউ কি এ কথা দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করতে পারেন যে, 'লা-ইলাহা-ইল্লাল-লাহ্' বললেই একজনকে অবশ্যই মুসলমান বলতে হবে? যদি এ ব্যাপারে কোনো বিরোধ ও মতবৈষম্য না থাকতো, তাহলে আদৌ এ ধরনের হাঙ্গামার অবকাশ থাকতো না। আমাদের দেশ হচ্ছে 'পীর' ও 'খানকা'র দেশ এবং এখানে বহু 'সিলসিলাহ', বহু রকমের মত ও দৃষ্টিভঙ্গি, আর পরস্পর-বিরোধী বহু ফতোয়া জারি রয়েছে।

[এই সময় ডেপুটি স্পীকার বলেন যে, এই পরিষদে কয়েকজন পীর আছেন, কাজেই প্রসঙ্গটির আর উল্লেখ না করাই ভালো। পীর আলী মোহাম্মদ রাশদী বলেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী নিজেই একজন পীর। জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, আমি সোহরাওয়ার্দী পরিবারের সন্তান হলেও আমি এই পবিত্র কর্তৃত্বের দাবি করতে পারি না।]

ইসলামের মর্মবাণী কোথায়

আমার স্যার কথা হচ্ছেঃ আমরা একটি পরিচ্ছন্ন ও নির্ভেজাল শাসনতন্ত্র চাই। জনসাধারণকে প্রতারিত করার কোনো চেষ্টা না করে আসুন আমরা খোলা মন নিয়ে এই আদর্শ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ব্রতী হই। সবরকম কদর্থ ও সমালোচনার উর্ধ্বে উঠে আমি

www.pathagar.com

পুনরায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে একথা ঘোষণা করছি ঃ আমরা খাঁটি ও সত্যিকার ইসলামী আদর্শের অনুবর্তন চাই এবং আমরা চাই, ইসলামের খাঁটি মূল্যবোধের অনুশাসনেই আমাদের দেশ শাসিত হোক। আমি জানি, শাসনতন্ত্র ও ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে আমি যে কথা বলছি, আগামীকাল বড়ো বড়ো শিরোনামা দিয়ে সংবাদপত্রে তার কদর্থ ছাপা হবে। আমি জানি, আমি যা কিছুই বলি, তথাকথিত সংবাদপত্রের এই ভদ্রলোকেরা তাকে বিকৃত করে প্রকাশ করেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি আমার অভিমতে অটল রয়েছি।

আমরা ইসলামের প্রতিটি মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা দেখতে চাই। আমরা ভ্রাতৃত্ব ও সহনশীলতার প্রতিষ্ঠা দেখতে চাই। আমরা মানবতার সেবার আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেখতে চাই। ইসলামের শ্রেষ্ঠতম মূল্যবোধ হচ্ছে এ-ই। ইসলামের সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের মধ্যে এটিই হচ্ছে উচ্চতম আদর্শ। অথচ আমাদের শাসনতন্ত্রে এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটিই বাদ পড়ে গেছে। মানবতার সেবাকে ইসলামে উপাসনার চাইতেও অধিকতর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। শান্তি ও ত্যাগের বাণী হচ্ছে ইসলামের মর্মবাণী। ইসলাম নারীকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিয়েছে, ইসলাম অনাথ, এতিম ও শিশুদের তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিয়েছে, ইসলাম দুঃস্থ, আশ্রয়হীন ও পঙ্গুদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিয়েছে। ইসলাম অনাথ-এতিম, দুঃস্থ-আশ্রয়হীন পঙ্গু ও শিশুদের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত করেছে এবং ইসলামের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রকেই তাদের প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধান করতে হবে। ইসলাম আমাদের ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামের অধিকার দান করেছে। নির্ভয়ে ও নিঃশঙ্কচিত্তে সত্য কথা বলার অধিকারও ইসলাম আমাদের দিয়েছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যাতে আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে এই সত্যের পথ আঁকড়ে ধরে থাকতে পারি, আল্লাহর কাছে তার জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

ইসলামী রাষ্ট্রের আওতায় সব প্রতিশ্রুতি আমাদের পালন করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের প্রতি আমাদের আস্থাশীল থাকতে হবে—এ ভ্রাতৃত্ব কেবল মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বই নয়—বস্তুত সব মানুষ ও সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব এবং ইসলামী রাষ্ট্রে এই মহান মানবীয় ভ্রাতৃত্বের প্রতি আমাদের আস্থাশীল থাকতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে সবার প্রতি থাকবে সমান সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা, থাকবে সত্যাচার ও ন্যায়বিচার, থাকবে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি নিষ্কলুষ আত্মনিবেদন। আর প্রাণে প্রাণে সবার অন্তরে থাকবে প্রার্থনার পবিত্র আকুতি, থাকবে আল্লাহর প্রতি অনুরাগ ও তাঁর প্রতি অবিমিশ্র আনুগত্য।

ইসলামে সব নবী, সব ধর্মের সাধক-মহাপুরুষ এবং সব পুণ্যাত্মা মনীষী ও আল্লার প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত মহামানুষদের প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়েছে। আর অপরিসীম মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়েছে শেষ ও শ্রেষ্ঠতম নবী এবং মানুষের শ্রেষ্ঠতম পথিকৃৎ আমাদের মহান নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) প্রতি। নবীর আদর্শ ও তাঁর ধর্মমতের সংরক্ষণ আমাদের এক বিরাট দায়িত্ব।

আমি বলতে চাই ঃ আপনারা যদি ইসলামের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করতে চান, তাহলে যথার্থভাবে আপনাদের কর্তব্য পালন করুন, ইসলামের অনুশাসনের অনুগমন করুন, ইসলামের আদর্শকে বাস্তবায়ন করুন, দেশ-বিদেশের সর্বত্র ইসলামের বাণী বয়ে নিয়ে যান। আমাদের মধ্যে যাঁরা আলেম রয়েছেন, তাঁদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা থাকলে তাঁরা

www.pathagar.com

পরিষদের সদস্য হয়ে আসুন এবং পরিষদে এসে তাঁরা তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করুন। আর পবিত্র কোরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে আমাদের কি ধরনের আইন প্রণয়ন করা উচিত, এখানে এসেই তাঁরা তা নির্দেশ করুন। তাঁরা ইচ্ছা করলে এক সঙ্গে বসে কোরআন ও সুন্নাভিত্তিক অনুজ্ঞাগুলো একসঙ্গে সংবদ্ধ করতে পারেন। তাঁরা জনমত সংগঠন করে এই বিধান ও অনুজ্ঞাগুলো আইন সভায় পাস করার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। এসব অধিকার থেকে কোনো কিছুই তাঁদের নিরস্ত করতে পারে না। এভাবেই তাঁরা অগ্রসর হতে পারেন কিন্তু এ ব্যাপারে শাসনতন্ত্রে কোনো বিধান থাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু শাসনতন্ত্রে এ ধরনের কোনো বিধান থাকলে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের পক্ষে জনসাধারণের ওপর পীড়নমূলক নীতি চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ থাকবে। অথচ আমরা সবাই জানি, ইসলামে ঘুণাক্ষরেও পীড়নমূলক কোনো ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই। আমরা জানি, ইসলামী জীবন-চারণায়, ইসলামী ধ্যান-ধারণায় এবং ইসলামী আচার-আচরণে ন্যায়বিচার ও মর্যাদাবোধের স্থানই সর্বোচ্চে। আর এই মহৎ বৈশিষ্ট্যগুলোই সমাজের চরিত্র গঠন করে। এই উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্যে আপনারা প্রয়োজন পড়লে যে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন, যে কোনো পথের সন্ধান করতে পারেন।

আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম

শৈশব থেকেই জনসাধারণের মধ্যে ইসলামে সত্যিকারের মূল্যবোধ প্রচারের একটি স্বপ্ন আমি দেখে আসছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখে আসছিলাম, খাঁটি ইসলাম প্রচারের জন্যে সাধ্যায়ত্ত সব সম্পদ নিয়োগের জন্যে সবাইকে আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রকৃত অর্থে একেই বলা হয় 'তবলীগ'। সব সময়েই আমি এতে বিশ্বাস করে এসেছি। আপনারা একে একটা নীতি বা মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন এবং এব্যাপারে আপনারা আমাদের সমর্থন পাবেন। এটা অনস্বীকার্য যে, আমাদের রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্র—যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু। আমাদের রাষ্ট্র এমনি একটি রাষ্ট্র, যেখানে আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে একটি রাষ্ট্র-ধর্মের দাবি করতে পারি। আমাদের রাষ্ট্র এমন একটি রাষ্ট্র, যেখানে জনসমষ্টির বেশির ভাগই বলতে পারে ঃ দেশের ভেতর এবং বাইরে ইসলামের সত্যিকারের শিক্ষা বিস্তারের জন্যে আমাদের সাধ্যায়ত্ত সবকিছুই আমরা করতে পারি; কিন্তু দয়া করে একটা কাজ আপনারা করবেন না—দয়া করে আপনারা একে ইসলামী রাষ্ট্র বলবেন না। আপনারা একে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে পারেন না, কেননা এখনো এ দেশে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আপনারা একে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে পারেন না; কেননা এখনো এ দেশের জনসাধারণ অনশনে থাকছে, এখনো এদেশের জনসাধারণের সৎ-জীবিকার কোনো ব্যবস্থা নেই। আপনারা একে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে পারেন না; কেননা এখনো এ দেশে মানুষ চৌর্যবৃত্তি করছে। আপনারা একে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে পারেন না; কেননা এখনো এ দেশে মানুষ মুখের গ্রাসের জন্যে নিজেদের বিক্রি করছে—বিক্রি করছে নিজেদের দেহ। যেখানে মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, যেখানে কোনো শিক্ষা নেই, ছোট ছোট শিশুরা যেখানে অযত্নে-অবহেলায় বিনা শিক্ষায় নোংরা পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে ভবিষ্যতে চোর-ছেঁচড় ও গুণ্ডা-বদমাশে পরিণত হয়, যেখানে একদিকে মানুষ খাদ্যাভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরছে আর শিক্ষার অভাবে অমানুষে পরিণত হচ্ছে, যেখানে আরেক দিকে মানুষ বিলাস-ব্যসনের মধ্যে গা ঢেলে দিচ্ছে—এমন একটি দেশকে, এমন একটি রাষ্ট্রকে কি করে আপনারা ইস্‌লামী

www.pathagar.com

রাষ্ট্র বলতে পারেন? যেখানে গরীবরা অনাহারে থাকছে আর যেখানে ধনীরা বিলাস ও সৌখিনতার মধ্যে বাস করছে—আমাকে বলে দিন, কি করে আপনারা এমন দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে পারেন?

[এসময় জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর শরীরে জ্বর উঠে যায়। তিনি খুব অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হক (শেরেবাংলা) তখন পরবর্তী দিন পর্যন্ত পরিষদ অধিবেশন মুলতবী রাখার প্রস্তাব করেন। এরপর ডেপুটি স্পীকার পহেলা ফেব্রুয়ারি (১৯৫৬), বুধবার অপরাহ্ণ ৩টা পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেন। ...পহেলা ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হলে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী জানান যে, অসুস্থতার জন্যে তিনি দাঁড়াতেও কষ্ট বোধ করছেন। ডেপুটি স্পীকার তখন তাঁকে বসে বক্তৃতা দেয়ার অনুমতি দেন। এরপর জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী দ্বিতীয়বার তাঁর ভাষণ শুরু করেন।]

গতকাল আমি যে আশঙ্কা করেছিলাম, তাই ঘটেছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষিত পত্রিকাগুলো বড়ো বড়ো শিরোনামা দিয়ে প্রচার করেছে, আমি নাকি ইসলামী আইন-কানুন প্রণয়নের বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করেছি। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে, তারা একটা কথা বলেনি—তারা একথা বলেনি যে, আমি ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলেছি। প্রসঙ্গটি সম্পর্কে পরে আমি আলোচনা করবো।

আমি আগেও বলেছি, পাকিস্তানকে সত্যিকারের ইসলামী রাষ্ট্র রূপদানই আমাদের আগামীদিনের লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে কোনো দ্বিমতের অবকাশ থাকতে পারে না; কিন্তু এখন এই মুহূর্তে একে ইসলামী রাষ্ট্র বলার মানে হচ্ছে এই যে, আপনারা পূর্ব থেকেই এখানে যথারীতি ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা তথা ইসলামী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, আপনারা এর কিছুই করেননি। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এ ধরনের ভাঁওতা বা প্রতারণার নীতি পরিহারের জন্যে অনুরোধ করছি। প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, ইসলামে মোনাফিকির মতো গর্হিত পাপ আর কিছুই নেই। আর আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থেও কঠোর ভাষায় মোনাফিকির নিন্দা করা হয়েছে।

এদেশে যে-কোন কাজে সুবিধামতো ধর্মের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ কিংবা সুবিধামতো ধর্মের ব্যবহার যেন একটা প্রচলিত রেওয়াজ হয়ে পড়েছে। আপনারা রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করছেন। দেশে নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর জন্যেও ধর্মের বুলি আওড়াচ্ছেন। ধর্মের দোহাই দিয়ে যুক্ত নির্বাচনেরও আপনারা বিরোধিতা করছেন। যুক্ত নির্বাচন প্রসঙ্গে গতকাল আমি সামান্য কিছুটা আলোকপাত করেছি। আজ আমি এ সম্পর্কে বলতে চাই। তবে বিষয়টি খুব ব্যাপক বলে আমি কেবল এর দু'একটি দিকের ওপর আলোকসম্পাত করতে চাই।

[এ সময় ডেপুটি স্পীকার জানতে চান যে, তিনি (জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী) আর কতক্ষণ বক্তৃতা করবেন। জওয়াবে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী বলেন ঃ 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমি বক্তৃতা করতে চাই'। ডেপুটি স্পীকার জানান যে, গতকাল তিনি ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট বক্তৃতা করেছেন। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী বলেনঃ 'সময় খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায়।']

ইসলামের অবমাননা ও অপব্যবহার

ইসলামের সঙ্গে যুক্ত নির্বাচনের কি সম্পর্ক রয়েছে? অথচ গুটি কয়েক লোক ইস্‌লামের জিগির তুলে যুক্ত নির্বাচনের বিরোধিতা করছে। যত্রতত্র পবিত্র ইসলামকে যে কিভাবে টেনে

আনা হচ্ছে, কিভাবে যে ইসলামের নীতিগুলোর অপব্যবহার করা হচ্ছে তা দেখানোর জন্যেই আমি কথাটা বল্‌লাম। আলেম সমাজেরও অনেকে নিজেদের মতের পরিপোষণ এবং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ইসলামকে ব্যবহার করছেন। এ ব্যাপারে আমি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে সাবধানবাণী উচ্চারণ করছি। আমি তাঁকে সাবধান করে বলছি, ইসলামের নামে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও বিপথে পরিচালনের ক্ষমতা যেন তিনি তাদের না দেন। তাঁর জানা উচিত, একদিন রাষ্ট্রের পক্ষে এ অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে।

ঘুণাক্ষরেও ইসলামের কোনো মহত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা না করে আপনারা সারা দুনিয়ার সামনে ইসলামের অবমাননা করছেন। বিশ্ববাসী রাষ্ট্রের 'ইসলামী' নাম দেখে ভাববে, এখানকার সবকিছুই ইসলামী আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে। আমি আপনাদের শুভবুদ্ধির প্রতি আকুল আহ্বান জানিয়ে বলছি, আপনারা আপনাদের বিবেক, আপনাদের দেশ ও ধর্মের প্রতি সততার পরিচয় দিন।

নিজেদের প্রয়োজনেই আপনারা ইসলামকে ব্যবহার করছেন। কেননা, জনসাধারণের সামনে গিয়ে আপনারা বলতে পারবেন ঃ 'দেখুন, আমরাই ইসলামের খাঁটি পায়বন্দ। ইসলামের সত্যিকারের পতাকাবাহী আমরাই। এতদিন আপনাদের ইসলাম কোথায় ছিলো? আজ দেখুন, আমরা ইসলামকে কেমন মর্যাদা দিয়েছি।'

সরকারি দলের যে আজ কি অবস্থা, আমাদের জানা আছে। মুসলিম লীগেরও আজ শেষ অবস্থা। এ অবস্থায় ধর্মের বর্ম পরে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হতে পারলেই আপনারা ভাববেন না, আপনাদের ভবিষ্যৎ কুসুমাস্তীর্ণ হবে।

খসড়া শাসনতন্ত্রে 'রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমান হবেন' কথাটা সংযোজন করেও আপনারা কিছুটা সমর্থন আদায় করতে পেরেছেন। এতেও আপনাদের মনে সেই একই উদ্দেশ্য কাজ করেছে। আমি এই অনুচ্ছেদটিকে একটি অনাবশ্যক অনুচ্ছেদ বলে গতকাল উল্লেখ করেছিলাম। কেননা, শাসনতন্ত্রে এ অনুচ্ছেদটি সংবদ্ধ করার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে, পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানরা অতি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অন্য কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অথচ এটা সন্দেহাতীত যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান সব সময়েই মুসলমান থাকবেন। এ ব্যাপারে জনসাধারণের সাধারণ জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করা আপনাদের উচিত ছিলো। কিন্তু এই অনুচ্ছেদটি সংযোজন করে আপনারা এদিকে মুসলমান নাগরিক-সাধারণের বিচার-বুদ্ধিকে ব্যঙ্গ করছেন এবং অন্যদিকে অমুসলমান নাগরিকদের হতোদ্যম করে দিচ্ছেন এই বলে যে, 'রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার অধিকার তোমাদের নেই।' এই কথা বলে আরেকদিকে আপনারা তাদের প্রতি অপরিসীম গুরুত্বও আরোপ করছেন। কেননা, তারা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে, এই চিন্তায় আপনারা উদ্বিগ্ন ও উদব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

[এসময় জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হকসহ বিভিন্ন সদস্য কতগুলো প্রাসঙ্গিক ব্যাপারে কথা বলেন।]

আদর্শ প্রস্তাব প্রসঙ্গ

এ প্রসঙ্গে আমি নজির হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান সম্পর্কে একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। মরহুম জনাব লিয়াকত আলী খান সাবেক গণপরিষদে আদর্শ প্রস্তাব করলে বিষয়টির অবতারণা হয়। গণপরিষদের হিন্দু সদস্যগণ আদর্শ প্রস্তাবের বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা চেয়ে

www.pathagar.com

জানতে চান যে, প্রস্তাবে বর্ণিত নীতির অনুসারী রাষ্ট্রে কোনো অমুসলমান রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবেন কিনা।

[এ সময় আবার এ প্রসঙ্গটি নিয়ে বিভিন্ন সদস্য, জনাব সোহরাওয়ার্দী ও ডেপুটি স্পীকারের মধ্যে খণ্ড আলোচনা চলে।]

জনাব লিয়াকত আলী খান আদর্শ প্রস্তাব উথাপন করে কয়েকটি শর্তে হিন্দু সদস্যদের প্রস্তাবটি গ্রহণের জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি সে সময় তাঁদের যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার সে সব প্রতিশ্রুতির খেলাফ করছেন। আদর্শ প্রস্তাব সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, প্রস্তাবের উত্থাপক জনাব লিয়াকত আলী খান যদি তাঁর সরকারি পদের পূর্ণতম দায়িত্ব (প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে) এবং পরিষদের নেতা হিসেবে তাঁর প্রভাবের কথা বিবেচনা করে পরিষদের অপর পাশের সদস্যদের একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন, তাহলে এতে আর আদৌ কোনো সংশয় থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। তাছাড়া তিনি প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন বলে এব্যাপারে তাঁর ব্যাখ্যাকেই আমাদের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা মেনে নিতে হবে। আদর্শ প্রস্তাবের ৯৫-পৃষ্ঠায় এ ব্যাখ্যাটি সুস্পষ্টভাবে সংবদ্ধ রয়েছে। আমি আশা করি, এরপর আপনারা এর সংশোধনের জন্যে কোনো চাপ সৃষ্টি করবেন না।

এ দৃষ্টান্তের পেছনে যুক্তি নেই

পরিষদের ওদিক থেকে আরো বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর অনেক ক'টি দেশে রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের ব্যাপারে বিধি-নিষেধ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঁরা ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও সুইডেনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের জানা উচিত, এ দেশগুলোর একটিও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের ব্যাপারে এসব দেশের জনসাধারণের কোনো কিছু বলার অধিকার নেই। রাজবংশের নিয়ম অনুসারে এসব দেশে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরা রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন। এ অবস্থায় কি করে পাকিস্তানের মতো একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে ওসব দেশের তুলনা হতে পারে? আমি একথা বুঝি যে, আমাদের শাসনতন্ত্রে এব্যাপারে কোনোরূপ বিধি-নিষেধ থাকার এতটুকুও যুক্তি নেই।

এ স্ব-বিরোধিতা কেন?

তারপরও প্রশ্ন রয়েছে। পাকিস্তানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় একমাত্র মুসলমানরাই রাষ্ট্রপ্রধান হবেন বলে খসড়ায় বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন এসে যাচ্ছে ঃ কোন্ শ্রেণী বা মাজ্হাবের মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবেন—শিয়া,সুন্নী না কাদিয়ানী? এ ব্যাপারে আগেও আমি আলোচনা করেছি। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে ঃ রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের ব্যাপারে যে সব দেশে জনসাধারণের কোনো কিছু বলার অধিকার নেই, কেবল সে সব দেশের জন্যেই এসব বিধি-নিষেধ প্রযুক্ত হতে পারে। আর যে সব দেশে এব্যাপারে জনসাধারণের বলার অধিকার রয়েছে, সে দেশগুলোর ক্ষেত্রে কিছুতেই এসব বিধি-নিষেধ প্রযুক্ত হতে পারে না এবং এটা আগাগোড়া যৌক্তিকতা-বর্জিত।

এরপরও কথা রয়েছে। শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারের ৩টি অনুচ্ছেদে আপনারা বলেছেন যে, সর্বক্ষেত্রে সব ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকের সমান ও সুসম অধিকার রয়েছে। কিন্তু এ অধিকার কোথায় থাকলো? রাষ্ট্রপ্রধান সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটি যোগ করে কি আপনারা এ অধিকার নস্যাৎ করে দিচ্ছেন না? আপনাদের এ স্ব-বিরোধিতার মানে আমি বুঝতে পারছি না।

www.pathagar.com

যুক্ত নির্বাচনের তাৎপর্য কোথায়

এবার আমি যুক্ত নির্বাচন সম্পর্কে বলবো। কিন্তু তার আগে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আমি একথা জানিয়ে দিতে চাই যে, হিন্দুরা চায় বলেই আমরা যুক্ত নির্বাচনের দাবি করছি না। পাকিস্তানের আজকের রাজনৈতিক প্রেক্ষণায় এর গুরুত্ব অপরিসীম বলেই আমরা এ দাবি করছি।

এ প্রসঙ্গে আমি অবস্থার আরেকটি চিত্র তুলে ধরতে চাই। কথাটা হচ্ছে ঃ আমাদের সরকারি দলের বন্ধুরা হিন্দুদের নিয়ে কোনো কাজ করলে কিংবা প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভায় কোনো হিন্দুকে গ্রহণ করলে আপত্তি ওঠে না। তখন বলা হয় যে, কাজটা ঠিকই হয়েছে এবং এ সহযোগিতার দরকার ছিলো। আর অন্যদিকে আমরা কি দেখতে পাই? আমাদের কোনো দাবিতে হিন্দুদের মতের সামান্যতমও যদি কোনো মিল থাকে, আমরা যদি হিন্দুদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে চাই, তখন আমাদের বিরুদ্ধে নানারকম বিষোদগার করা হয়। আমাদের ভারত ও কম্যুনিস্টদের চর বলে প্রচার করা হয়, আমাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়, আমাদের বিরুদ্ধে লোক ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। ক্ষমতার গদিতে অধিষ্ঠিত রয়েছেন বলে আপনারা ভাবছেন, আপনারা খুসিমতো সবকিছুই করতে পারেন। আপনারা ভাবছেন, আপনারা যা কিছু করছেন তার সবই অভ্রান্ত-নির্ভুল। আর অন্যদের? অন্যদের সবকিছুই বিভ্রান্তিকর–বাজে।

আমরা যুক্ত নির্বাচন কেন চাই? আমি আমার মনের সমস্ত দৃঢ়তা নিয়ে দ্বিধামুক্ত কণ্ঠে একথা ঘোষণা করছি যে, পাকিস্তানকে একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যেই আমরা যুক্ত নির্বাচন চাইছি। আমরা জানি, দেশের প্রতিটি নাগরিকের সহযোগিতা ছাড়া পাকিস্তানকে কিছুতেই জনকল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব নয়। আমরা দেশের প্রতিটি নাগরিককে দেশ-গড়ার কাজে খাঁটি দেশপ্রেমিক হিসেবে শরিক হতে দিতে চাই। কিন্তু আপনারা যদি দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং শাসন পরিচালনায় অমুসলমানদেরকে তাদের ন্যায্য ভূমিকা পালনের অধিকার দিতে না চান, তবে কি করে তাদের কাছ থেকে খাঁটি দেশপ্রেমিক সুলভ মনোভাব প্রত্যাশা করেন?

নির্বাচনের সম্ভাব্য পরিণতি

দেশে পৃথক নির্বাচনের সম্ভাব্য পরিণতি কি হতে পারে, আপনারা কি ভেবে দেখেছেন? আমার দৃষ্টিতে এর ফলাফল দু'রকম হতে পারে। এক ঃ এতে দেশের রাজনীতি, প্রশাসন ও আইন প্রণয়নে অমুসলমানদের কোনো প্রভাব থাকবে না। দুইঃ মুসলমানদের বিভেদ ও দলাদলির সুযোগ তারা গ্রহণ করতে পারে এবং এতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ক্ষমতার ভারসাম্যের চাবিকাঠি তাদের হাতে গিয়ে পড়তে পারে। বিষয়টি আমি বিশ্লেষণ করছি। গণতান্ত্রিক দেশ বলে পাকিস্তানে সবসময় মুসলমানদের একাধিক রাজনৈতিক দল থাকবে। আর এর ফলে তাদের মধ্যে মত ও নীতির বৈষম্যও থাকবে। এ অবস্থায় পৃথক নির্বাচনে অমুসলমানদের প্রভাব বিলুপ্ত হওয়ার কোনো হেতু নেই। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকেই নিশ্চিতভাবে ধরা যেতে পারে এবং তার ফল দাঁড়াবে এই যে, যে কোনো ব্যাপারে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিষফোঁড়ার মতো তারা ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষাকারী হয়ে থাকবে। এ অবস্থা কারো পক্ষেই শুভ হতে পারে না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার ভারসাম্যের ভার অমুসলমানদের ওপর বর্তালে সরকারের প্রতিটি ভ্রান্ত নীতি ও অপকর্মের জন্যে তাদের দায়ী করা হবে। তাদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলা

www.pathagar.com

হবে। তাদের পাকিস্তানের শত্রু বলা হবে এবং বলা হবে, তারা বরাবর পাকিস্তানের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে এসেছে। অবশ্য, ভারসাম্য রক্ষার এ সুযোগটি অমুসলমানদের জন্যে তাদের যে কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়ক। কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা পৃথক নির্বাচনের দাবি না করে যে প্রশস্ত চিত্ততার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যে আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

[এসময় ডেপুটি স্পীকার বলেন যে, তিনি (জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী) এ পর্যন্ত ৩ ঘন্টা ২৫ মিনিট বক্তৃতা দিয়েছেন।]

'এ হীনমন্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়'

হিন্দুদের রাজনৈতিক অধিকার অস্বীকার করার কি কারণ রয়েছে, আমি বুঝতে পারি না। সংখ্যালঘুদের নিজস্ব স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান অবস্থায় একমাত্র তারাই পৃথক নির্বাচনের দাবি করতে পারেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, তারা তাদের দাবি নিরপেক্ষ হয়ে যুক্ত নির্বাচন চাইছেন। আর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় জবরদস্তি করে তাদের ওপর পৃথক নির্বাচন চাপিয়ে দিচ্ছে। এর কারণ কি হতে পারে? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠদের আত্মবিশ্বাসের অভাব। এর একটি কারণ, তাদের হীনমন্যতাবোধ।

হিন্দুরা কোনো কিছু দাবি করলেই তার পেছনে একটা 'দুরভিসন্ধি' খুঁজে বের করা হয়। হিন্দুরা এটা দাবি করছে বলেই মনে করা হয় যে, এর পেছনে নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। এই মনোভাবের মানে কি? এতে সুস্পষ্টভাবে একথাই মনে হয়, পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র হিন্দুরাই সব জ্ঞানগরিমা ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। আর তা ছাড়া, পৃথক নির্বাচন কি পাকিস্তানী জাতিকে বহুজাতিতে বিভক্ত করে দেবে না? আর একটা বড়ো কথা হচ্ছে, হিন্দুদের সব সময় পাকিস্তানের প্রতি 'আনুগত্যহীন' বলে অভিযোগ করা হলে কখ্খনো আপনারা তাদের কাছ থেকে আনুগত্য প্রত্যাশা করতে পারেন না। কেননা, মানুষকে নির্বিচারে অহেতুক অপবাদ দেয়া হলে তার মনে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবেই এবং সে ব্যাপারটার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বেই। এ হচ্ছে মানব মনের এক স্বাভাবিক ধারা।

যুক্ত নির্বাচন অনেক বেশি ইসলামসম্মত

ইস্‌লামের দোহাই দিয়ে নির্বাচনের বিরোধিতা করছেন। আমি গভীরভাবে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখেছি। নির্বাচন পদ্ধতির সঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙির প্রশ্নটা নিয়ে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি—অনেক পড়াশোনা করেছি এবং শেষ পর্যন্ত এ থেকে আমার যে সম্যক উপলব্ধি হয়েছে, তাতে আমি দ্বিধামুক্ত কণ্ঠে একথা ঘোষণা করতে পারি যে, যুক্ত নির্বাচন পৃথক নির্বাচনের চাইতেও অনেক বেশি ইসলামসম্মত। কেননা, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু বলে কোনো কিছু স্বীকার করে না। ইসলামী রাষ্ট্রে সব নাগরিকেরই সমান মর্যাদা।

তারা এদেশের মাটির সঙ্গে মিশে থাকতে চায়

যুক্ত নির্বাচনকে যারা আজ ইসলাম-বিরোধী বলছেন, তারা এতদিন কোথায় ছিলেন? পাকিস্তানের দুই অংশে বহু পূর্ব থেকেই যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচন চলে আসছে। এমনকি, গণপরিষদের নির্বাচনও যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতেই হয়েছে। তারা এতদিন এর বিরোধিতা করেননি কেন? এর কোনো জবাব তাঁদের

www.pathagar.com

কাছে আছে কিনা, আমি জানি না। কেউ কেউ বলছেন, যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের প্রাধান্য বেড়ে যাবে। কিন্তু তঁরা কি এটা জানেন না যে, প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন হিন্দুদের সবাই আগেই দেশত্যাগ করে চলে গেছেন। এখন যে সব হিন্দু এখানে আছে, তারা সাধারণ পেশার মানুষ। দেশত্যাগ করে চলে যাওয়ার সঙ্গতি এদের নেই। তারা সংখ্যাগুরু মুসলমানদের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রেখে স্থায়ীভাবে এদেশের মাটিতে বসবাস করতে চায়।

এ প্রসঙ্গে বাস্তব ঘটনা থেকে আমি একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমি বহু হিন্দুকে যুক্ত নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলাম যে, যুক্ত নির্বাচনের আওতায় তাদের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ভরসা খুবই কম। কেননা, মুসলমান ভোটাররা কেবল মুসলিম প্রার্থীদের ভোট দিয়ে পরিষদে পাঠাতে পারে। এতে তারা আমাকে জানান যে, তারা এ ঝুঁকি নিতেও রাজি। কারণ, তারা সত্যিকারের মর্যাদাবান নাগরিক হতে চান এবং সংখ্যাগুরু জনসাধারণের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখে এদেশে বাস করতে চান।

তাদের প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ কোথায়?

আমি আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যুক্ত নির্বাচনের ফলে হিন্দুদের প্রাধান্য বাড়বে বলে যে আজগুবি যুক্তি দেখানো হচ্ছে, সেটা যে কতো অন্তঃসারশূন্য, এ থেকে তা বোঝা যাবে। সাম্প্রতিক আদমশুমারির হিসেবে দেখা গেছে, খুলনা জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৫১ জন (৫০.৫) মুসলমান আর ৪৯ জন অমুসলমান। খুলনার জেলাবোর্ডের আসন সংখ্যা হচ্ছে ৩০টি। পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে জেলা বোর্ডের নির্বাচন হলে কমপক্ষে ১৪টি আসন তারা দখল করবে। কিন্তু যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিতে সম্প্রতি জেলা বোর্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দেখা গেছে, ৩০টি আসনের মধ্যে ২৮টি আসনই মুসলিম প্রার্থীরা দখল করছে।

এই ঘটনা থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি? যুক্ত নির্বাচনে হিন্দুদের সত্যি প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ কোথায় আছে, আমি জানি না। উপরের ঘটনা থেকে বিচার করে দেখলে শতকরা ৮০ জন সংখ্যাগুরুর ওপর শতকরা ২০ জন হিন্দু কি করে যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সেটা আমার কল্পনায় আসছে না। আসল কথাটা কি জানেন? আসলে কথাটা হচ্ছে ঃ যাঁরা যুক্ত নির্বাচনের বিরোধিতা করছেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত অবস্থা এবং সমস্যাটা সম্পর্কে তাঁদের আদৌ কোনো জ্ঞান নেই। তাই আমি বলছিলাম, আর কোনো বাহানা না দিয়ে এসব প্রশ্নের মীমাংসার ভার জনসাধারণের বিচার-বুদ্ধি ওপর ছেড়ে দিন।

তাঁদের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন না

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সীমান্তের অপর পারের মুসলমানদের প্রতি আমাদের কি কোনো দায়িত্ব নেই? তাদের প্রতি কি আমাদের কোনো কর্তব্যের তাগিদ নেই? আপনারা এখানে যে সব কাজ করছেন, তার প্রতিক্রিয়া সেখানে হবেই। আপনাদের এই অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ সেখানকার হিন্দু জনসাধারণকে বিদ্বিষ্ট করে তুলবে। তারা ভাববে ঃ 'আমাদের পাকিস্তানী হিন্দু ভাইদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে। ন্যায়ানুগ দাবি-দাওয়া ও অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। আমরাও এখানকার মুসলমান অধিবাসীদের বিরুদ্ধে ঠিক একই রকম নীতি অনুসরণ করবো।' এর পরিণাম যে কি গুরুতর হতে পারে, তা ভেবে দেখার জন্যে আমি আপনাদের বিবেকের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি। ভেবে দেখুন, সীমান্তের

www.pathagar.com

ওপারের মুসলমানদের প্রতি আমাদের কতো বিরাট দায়িত্ব রয়েছে! অপরিণামদর্শী কোনো নীতি গ্রহণ করে তাদের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন না।

আমি আবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলছি ঃ ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত না করে রাষ্ট্রের নামের সঙ্গে 'ইস্‌লামী' শব্দটি জুড়ে দিয়ে দুনিয়ার সামনে আপনারা ইসলামকে হাস্যাস্পদ করবেন না। আমি আবার বলছি ঃ সময় থাকতে এখনো আপনারা প্রতারণার নীতি ত্যাগ করুন। আমি আবার আপনাদের বলছি ঃ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে বাস্তববাদী নীতি অনুসরণ করুন।

পূর্ব পাকিস্তান কি বলে, দেখুন

আর ক'টি কথা বলেই এবার আমি আমার ভাষণ শেষ করবো। আমি আগেই বলেছি, শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের জনমত যাচাইয়ের জন্যে আমি পূর্ব পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলাম। পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা আপনাদের শাসনতন্ত্র দেখে হতাশ হয়ে পড়েছে। তারা সমস্বরে এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে। তাদের এ সম্মিলিত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তাদের ওপর এ শাসনতন্ত্র আপনারা চাপিয়ে দিতে পারেন না। মনে রাখবেন, জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো শাসনতন্ত্র টিকে থাকতে পারে না। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র দেশের উভয় অংশেরই জনসাধারণের সমকণ্ঠ সমর্থন কেবল প্রয়োজনই নয়—অপরিহার্য।

বিরোধী দলের সদস্যরা শাসনতন্ত্রের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের মনোভাব ব্যক্ত করে যে সব কথা বলেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ থাকলে আমি প্রধানমন্ত্রীকে অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্যে পূর্ব পাকিস্তান সফরে যেতে আহ্বান জানাচ্ছি। তিনি বিভিন্ন দলমতের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের মতামত নিন এবং তারপর একটা সিদ্ধান্তে আসুন। আমি জানি, পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের মনোভাব প্রত্যক্ষভাবে অবহিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী তাদের এ শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দিতে সাহস করবেন না।

সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান

সবশেষে আমি সর্ব দল-মতের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বানের জন্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব করছি। এতে মাত্র আট-দশদিন সময়ের মধ্যেই আমরা সন্তোষজনকভাবে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট নিরসন করতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আরো বিশ্বাস করি, এই সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করে বিভিন্ন দলমতের নেতৃবৃন্দের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনো শাসনতন্ত্র গ্রহণ করা হলে সে শাসনতন্ত্র দেশের উভয় অংশের জনগণের নিরঙ্কুশ সমর্থন লাভ করবে। এর অন্যথা হলে—মানে, জনসমর্থনহীন কোনো শাসনতন্ত্র গ্রহণ করা হলে আমাদের ভবিষ্যৎ হতাশার অন্ধকারে অবলুপ্ত হবে। এই কথা বলেই আমি শেষ করলাম।

www.pathagar.com

যুক্ত নির্বাচনের 'কি' ও 'কেন' ?

[পাকিস্তানের সৃষ্টি অবধি দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের ওপর জনাব সোহরাওয়ার্দী সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে এসেছেন। ১৯৫৭ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কার্যভার গ্রহণের পর সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিতে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। সমস্যা দেখা দেয় নির্বাচন পদ্ধতির প্রশ্নে। যুক্ত নির্বাচন বনাম পৃথক নির্বাচনের প্রশ্নে সারাদেশ তখন সরগরম হয়ে ওঠে। পৃথক নির্বাচনের দাবি তখন খুবই জোরালো। জনাব সোহরাওয়ার্দী বিশ্বাস করতেন, দেশকে এক জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে যুক্ত নির্বাচনই একমাত্র হাতিয়ার। স্বাধীন দেশে পৃথক নির্বাচনের দাবি কতখানি অবান্তর ও আত্মঘাতী—নিজ বিশ্বাস ও জোরালো যুক্তির মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদেরকেও তিনি তা বোঝাতে সক্ষম হন। সেদিন ১৯৫৭ সালের ১০ই অক্টোবর—ঢাকার জাতীয় পার্লামেন্টের সারা রাতব্যাপী অধিবেশন চালিয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দী যে ঐতিহাসিক বক্তৃতার বলে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির প্রতি পার্লামেন্টের সমর্থন আদায় করেন, তার পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ]

শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের নির্বাচন পদ্ধতি কি হবে তা স্থির করা এই পরিষদের পক্ষে প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাসনতন্ত্রের ১৪৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান আইন পরিষদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পরিষদকে এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। নির্বাচনী পদ্ধতি স্থিরীকৃত না হলে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ অথবা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে প্রতিনিধিত্বমূলক 'বিল' উত্থাপন সম্ভব নয়। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ গঠনের পরই এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিতে হবে। কাজেই যত শীঘ্র আমরা নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো তত শীঘ্র সাধারণ নির্বাচনের কাজ শুরু করা যাবে।

১৪৫ অনুচ্ছেদ

যদিও শাসতন্ত্রের ১৪৫ অনুচ্ছেদ মতে জাতীয় পরিষদ প্রাদেশিক আইন পরিষদের মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য নয়; তবু তাদের মতামত বিশেষ মনোযোগের সাথে বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমাদের শাসন পদ্ধতি হচ্ছে জনগণ নির্বাচিত সংস্থাগুলোকে—যেমন ব্যবস্থাপক পরিষদ—জনমতের প্রতিনিধি হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যাওয়া। কোনো একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর জনমত যাচাইয়ের জন্যে গণভোটের বিধান আমাদের শাসনতন্ত্রে নেই। বিশেষত এক্ষেত্রে সে প্রশ্ন উঠেই না; কারণ, শাসনতন্ত্রে এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, দুটো প্রাদেশিক পরিষদের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পরিষদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তদুপরি জাতীয় পরিষদে উভয় আইন পরিষদের মারফত নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই উপস্থিত আছেন। স্বভাবতঃই পরিষদগুলোর মতামতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ তাদের সামনে খোলা

www.pathagar.com

রয়েছে। সে সিদ্ধান্ত এমনকি উভয় পরিষদের সিদ্ধান্ত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রও হতে পারে। উপস্থাপিত বিলটি অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, এতে প্রাদেশিক পরিষদদ্বয়ের স্ব স্ব এলাকায় তাদের সিদ্ধান্তকেই বলবৎ রাখার জন্যে সরকারের তরফ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমান অবস্থাতেও প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের জন্যে সমগ্র পাকিস্তান ভিত্তিতে একটি অভিন্ন নির্বাচনী প্রথা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু, যেহেতু আমরা নিজেদের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন বলে দাবি করে থাকি এবং যেহেতু জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হবার বদলে আমরা প্রাদেশিক পরিষদগুলোর মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছি, সেহেতু আমরা আমাদের নির্বাচকমণ্ডলীর অভিমতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে পারি না অথবা হাল্কাভাবে উপেক্ষাও করতে পারি না। সেজন্যে বিলটিতে পরিষদদ্বয়ের এক্তেয়ারাধীন এলাকার জন্যে তাদের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়েছে।

দুই জাতি তত্ত্ব

পাকিস্তানোত্তর পরিবর্তিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যাঁরা এখনো খাপ খাইয়ে উঠতে পারেননি তাদের কাছে এটা অদ্ভুত বলে প্রতিভাত হতে পারে যে, যে আমি অবিভক্ত ভারতে দুই জাতি তত্ত্বের সমর্থক ছিলাম, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় বিশ্বাস করতাম এবং পাকিস্তান অর্জনে যাঁর অবদান হয়তো কোনো অংশেই সামান্য নয়, সেই ব্যক্তি কেমন করে এখন পাকিস্তানে শাসনতান্ত্রিক নীতি হিসেবে যুক্ত নির্বাচনের সমর্থনে দাঁড়াতে পারে।

একথা সন্দেহাতীতরূপেই সত্য যে, পৃথক নির্বাচন প্রথা অবিভক্ত ভারতে মুসলমানদের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল এবং স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী সাইমন রিপোর্ট সম্পর্কে (১৯১৮-১৯ সালে) তাঁর মতান্তর পত্রে অখণ্ডনীয় যুক্তি সহকারে এর সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু লাহোর প্রস্তাবে যে দুই জাতি তত্ত্বের সাক্ষাৎ আমরা পাই, তার ওপর তাঁর যুক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। আইন পরিষদে সংখ্যা লঘিষ্ঠ মুসলমানদের সঠিক প্রতিনিধিত্বের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার প্রচলন হয়েছিল। এ প্রথা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভাগ থেকে সংখ্যালঘুদের জন্যে কিছু অধিকার আদায় করে নিয়েছিল সত্য; কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বার্থ সংরক্ষণে এর কোনো ভূমিকা ছিলো না। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, লাহোর প্রস্তাব দ্বি-জাতি তত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে; কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। যে মুহূর্তে এ প্রস্তাবে এ তথ্যের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে যে, পাকিস্তান ও ভারত উভয় রাষ্ট্রেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকবে সে মুহূর্তেই দ্বি-জাতি তত্ত্ব নাকচ হয়ে গেছে। দ্বি-জাতি তত্ত্বের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে অবধারিত হয়ে দাঁড়াতো জনসংখ্যার বিনিময়—যাতে করে ভারত হতো পুরোপুরিভাবে হিন্দুর এবং পাকিস্তান হতো পুরোপুরিভাবে মুসলমানের। পাকিস্তানে সমস্ত অমুসলমান জনসম্প্রদায়কেই হিন্দু বলে চিহ্নিত করা হয়েছিলো। এ কাজে কোনো যুক্তি নেই। ভারতের যে সব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো সে সব এলাকার সমবায়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যই মুসলমানরা দ্বি-জাতি তত্ত্বের হাতিয়ার অবলম্বন করেছিলেন। সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দ্বি-জাতি তত্ত্ব মুসলমানদের কাছেও অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই তত্ত্ব যদি আজও অনুসরণ করা হয়, তবে তার ফল দাঁড়াবে পাকিস্তানের পুনর্বিভাগ ও তার সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলোর সমন্বয়ে একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। সে পরিণতি এমনই ভয়ঙ্কর যার কথা ভাবলে পাকিস্তানী মাত্রেই ভয়ে শিউরে

www.pathagar.com

উঠবেন। যে সব মুসলমান এককালে অবিভক্ত ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের অংশ ছিলেন এবং আজ যাঁরা পাকিস্তানের অধিবাসী শুধু তাঁরাই নন, ধর্মনির্বিশেষে পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকই পাকিস্তানী জাতির সদস্য। আমরা মুসলমান কিংবা অমুসলমান যাই হই না কেন, আমরা সবাই সংশয়াতীতরূপে পাকিস্তানী। জাতিত্ব অর্জন করতে পারায় আমরা সবাই আনন্দিত ও গর্বিত। মুসলমান জাতি এবং পাকিস্তানী জাতি, এ দুয়ের মাঝে বিরাট পার্থক্য বর্তমান। প্রথমোক্তটির অস্তিত্ব ভৌগোলিক গণ্ডী দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু পাকিস্তানী জাতি অথবা 'কওম' ভৌগোলিক সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত এবং তার একটি অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য আছে। এই স্বাতন্ত্র্য দিয়েই এ জাতিকে অন্য জাতি থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। যেহেতু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, সেহেতু আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন আসা আবশ্যক।

আজ আমরা দেশের অভ্যন্তরে বিভেদমূলক প্রবণতা সৃষ্টি করতে চাই না—এক জাতি গড়ে তোলা তাই আমাদের আবশ্যিক কর্তব্য। সে জন্যেই আমি যুক্ত নির্বাচনের পক্ষপাতী। কারণ, কেবল এই পদ্ধতিই দেশের সকল মানুষের সমন্বয়ে একটি বিরাট পাকিস্তানী জাতি গঠনে সহায়ক। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের মাঝে বিভেদ, ঘৃণা আর সন্দেহের বীজ বিনষ্ট করে দিয়ে জাতির সেবার স্বার্থে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টিতেও এ পদ্ধতি সাহায্য করবে। আমি পাকিস্তানী জাতি গড়ে তুলতে চাই। আমি চাই দেশের সকল নাগরিকের একটি আদর্শই থাকুক আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী পাকিস্তানের সেবা করুক, আর সবাই মিলে পাকিস্তানের সংহতি, স্থায়িত্ব ও গৌরব বৃদ্ধির ব্রতে দীক্ষা লউক এবং মাতৃভূমির সেবায় একান্তভাবে আত্মনিয়োজিত থাকুক। নিঃসন্দেহেই এ এমন একটি আদর্শ—যা অর্জনের জন্যে সংগ্রাম এবং পরিশ্রম করার সার্থকতা আছে।

যুক্তনির্বাচন কি ইসলাম বিরোধী?

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, যুক্ত নির্বাচন ইসলামী বিধানের পরিপন্থী এবং জাতীয় পরিষদ যদি এই বিল পাস করে তাহলে ইসলাম বিরোধী কাজ হবে। আমার নিজস্ব বিশ্বাস এবং বিশ্বের সকল মুসলমান দেশগুলোই এ ধারণা সমর্থন করে যে, ইসলামে নির্বাচকমণ্ডলী সম্পর্কিত কোনো বিধানই দেয়া নেই এবং এ বিতর্কে ইসলামকে টেনে আনা একান্তই অবান্তর। কিন্তু আমার এ বিশ্বাসের প্রশ্ন ছাড়াও আমি মনে করি যে, বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কোন্‌টা ইসলামসম্মত অথবা কোন্‌টা ইসলাম বিরোধী, তা স্থির করার চূড়ান্ত দায়িত্ব রাষ্ট্র এবং তার শাসনতান্ত্রিক সংস্থা অর্থাৎ জাতীয় পরিষদেরই।

সুন্নী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা পুণ্য-স্মৃতি ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একদিন তাঁর কন্যার দাঁত দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করলে পিতা ইমাম আবু হানিফাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁর রোজা নষ্ট হয়ে গিয়েছে কিনা? ইমাম আবু হানিফা তাঁর কন্যাকে বললেন এ সম্পর্কে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কাজীর কাছে জিজ্ঞাসা করতে। কারণ তাঁর পক্ষে জবাব দেয়া সম্ভব নয়। এতে তাঁর কন্যা বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে চাইলেন যে, ইমাম আবু হানিফা—যিনি শরিয়ত সম্পর্কে সবাইকে উপদেশদান করে থাকেন—তিনি এই সাধারণ প্রশ্নের জবাব দেবেন না কেন? এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম আবু হানিফা বললেন যে, কোন্ জিনিস শরিয়ত-সম্মত, না শরিয়ত-বিরোধী এ সম্পর্কে মতামত প্রকাশের অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রের অর্থাৎ তার প্রতিনিধি কাজীর, তাঁর নিজের নয়।

www.pathagar.com

আমাদের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় পরিষদই এখন কি ইসলামসম্মত, আর কি ইসলামসম্মত নয়, তার ব্যাখ্যা দেবার ক্ষমতার অধিকারী এবং এই জাতীয় পরিষদের কাছ থেকে কেউ এ অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারেন না। কিন্তু এ দাবির আরো একটি দিক আছে। আমাদের কোনো কোনো আলেম শাসনতন্ত্র ইসলামী না অনৈসলামী, এ সম্পর্কে ফতোয়া দিয়ে আসছেন।

কিছু কিছু আলেম, বিশেষ করে একজন, যিনি যুক্ত নির্বাচন বিরোধী আন্দোলনের প্রধানতম হোতা, তাঁর নিজ সুবিধা অনুযায়ী একই বিষয়কে কখনো ইসলামী, আবার কখনো অনৈসলামী বলে ঘোষণা করে থাকেন। আপনাদের কি স্মরণ নেই যে, এই 'মহাপুরুষ'ই এক সময় পাকিস্তান পরিকল্পনাকেও অনৈসলামী শক্তি, পাশ্চাত্য এবং হীনমনাদের সৃষ্টি বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে প্রাণপণে বিরোধিতা করা উচিত বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন? এখন তাঁর মতে পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্র। যদি এ যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, যা এক সময় ইসলামসম্মত ছিলো, তা এখন ইসলাম-বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাহলে আমি একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সেই সম্মানীয় মহাপুরুষকে যখন বলা হয়েছিলো যে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করলে পাকিস্তান ইসলামসম্মত হতে পারে, তিনি তখন বলেছিলেন, যা ইসলামী মতে একবার খারাপ তা কখনো ইসলাম অনুসারে ভালো হতে পারে না। একথাও কি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, সেই একই ভদ্রলোক আর এক পর্যায়ে বলেছিলেন যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মতোই অভিশপ্ত? আজ তিনি মুসলমান জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। যাই হোক, এ হলো নিতান্ত সামান্য ব্যাপার এবং একটু বিচার-বিবেচনা করলেই এই অসঙ্গতির কারণ উপলব্ধি করা যাবে। আমি আরো স্মরণ করিয়ে দিতে পারি যে, এই একই ভদ্রলোক বলেছিলেন, কায়েদে আজম ইসলামের ক, খ-ও জানেন না। খাজা নাজিমউদ্দিনের সময়ে বি.পি.সি রিপোর্ট প্রকাশিত হলে তিনি তাঁকে ইসলাম-বিরোধী বলে ঘোষণা করেছিলেন; কারণ তাতে নারীর ভোটাধিকারের স্বীকৃতি ছিলো। তিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন, নারীর ভোটাধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ইসলামসম্মত নয়; কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রে ওসব কখনো সহ্য করা যেতে পারে না। আমাদের বর্তমান শাসনতন্ত্রে নারীকে শুধু ভোটাধিকারই দেয়া হয়নি, তাদের ভেতর থেকে প্রতিনিধি নির্বাচনের বিধানও রয়েছে এবং ধর্মের স্বাধীনতা এতে একটি মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু এই ভদ্রমহোদয় কিন্তু বর্তমানে ইসলামী শাসনতন্ত্রের এই বিধানগুলোর বিরোধিতা করেননি, কারণ তাহলে তাঁর স্বার্থ রক্ষা হবে না।

আমি একথাও স্মরণ করিয়ে দিতে পারি যে, এই ভদ্রজন বারবার ঘোষণা করেছেন যে, ইসলাম সম্পর্কে কোনো মতামত দেয়ার ব্যাপারে জনসাধারণের ওপর বিশ্বাস করা যায় না। কারণ তাদের শতকরা ৯৯ জনই ভাবালুতা, আবেগ আর শ্লোগানে পরিচালিত হয়। তাঁর মতে তারা অশিক্ষিত এবং সহজে বিপথগামী হতে পারে; কাজেই একমাত্র সমাজের সেই বিশেষ অংশ অর্থাৎ পবিত্র নির্বাচকমণ্ডলীই (Holy Elect.) সঠিক মতামত দিতে পারেন।

পাকিস্তানে নির্বাচন পদ্ধতি গণভোটের মারফত নির্ধারিত হবে বলে যারা বলে আসছেন, তাদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, গণভোটে যে ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সকলেই একত্রে

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ করবে, সে ক্ষেত্রে গণভোটের মাধ্যমে কি করে স্থিরীকৃত হবে কোন্ নির্বাচন প্রথা ইসলামসম্মত, আর কোন্‌টি ইসলামসম্মত নয়?

আমি এ কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলাম একটি মাত্র বিষয় পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে; তা হচ্ছে, ইসলাম সম্পর্কে আলেমদের ফতোয়া—বিশেষ করে যারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন—কত কম নির্ভরযোগ্য। এ প্রসঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে আমি আমার যা ধারণা, তা আবার জোর দিয়ে বলতে চাই। ইসলামিক রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের জীবনধারণের জন্যে মৌলিক প্রয়োজনীয় উপকরণাদির ব্যবস্থা করতে হয়। আমাদের শাসনতন্ত্রে সে ব্যবস্থা কোথায়?

প্রধানত এই কারণে আমাদের শাসনতন্ত্রে ইসলামের তকমা আঁটার আমি বিরোধী ছিলাম। এর আরো একটি দিক সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে আমি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই যে, কোনো কিছুর ওপর ইসলামের লেবেল লাগানো থাকলেই সহজে বিভ্রান্ত হবেন না। সকলের কাছেই আমার বিনীত অনুরোধ, এই বিতর্কের মাঝে ইসলামের পবিত্র নাম টেনে এনে কলঙ্কিত করবেন না।

কিছুদিন আগে পত্রিকায় এই মর্মে এক খবর প্রকাশিত হয়েছিলো যে, অন্য আর এক পরিষদের এক মাননীয় সদস্য স্পীকারের আসন গ্রহণের সময় সদস্যদের উদ্দেশে মাথা নোয়ানোর প্রথার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন। মাননীয় সদস্য বলেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নোয়ানো ইসলাম-বিরোধী। পরস্পরকে অভিবাদন জানানো অথবা সালাম করার সময় আমরা কি করে থাকি? আমরা কি লাঠির মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি? আমাদের 'তাহজিব' ও আমাদের সংস্কৃতি কি কাউকে অভিবাদনের সময় অন্যের কাছে যথাসম্ভব নম্র হওয়ার শিক্ষাই দেয় না? মাননীয় সদস্য কি জানেন না যে, স্বয়ং খোদাও ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন মানুষের সামনে শুধু মাথা নোয়াতেই নয়, তাদেরকে সিজ্‌দা করতেও। মাথা নোয়ানো ইসলামসম্মত, না অনৈসলামিক, এ সম্পর্কে কোনো ধর্মীয় বিতর্ক শুরু করার জন্যে আমি একথা বলছি না। আমি শুধু দেখাতে চেয়েছি যে, যখন-তখন ইসলামের নাম নিয়ে টানাটানি করে বিশ্বের সামনে নিজেদেরকে হাসির পাত্র না করে তোলাই মঙ্গল।

আমার মতে, আমরা মুসলমান, তাই আমাদের ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত, তাতে প্রতিনিয়ত ইসলামেরই সঙ্গীত ধ্বনিত হয়। কি ইসলামসম্মত অথবা ইসলাম-বিরোধী, তা জানার জন্যে প্রগতিবিরোধী ধর্মীয় পণ্ডিতদের দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন নেই। আমার আরো কিছু বলবার আছে। বলা হয়ে থাকে যে, যুক্ত নির্বাচন অনৈসলামিক।

যুক্ত নির্বাচন বলতে এ কথাই বোঝায় যে, হিন্দু এবং মুসলমান জনসাধারণ একত্রে কারো জন্যে ভোট প্রদান করবে। আমাদের আইন পরিষদে আমরা কি তাই করছি না? ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকালে আমরা কি একত্রে ভোট দিইনি? আইন পরিষদে প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর আমরা মুসলমান এবং অমুসলমানরা কি একযোগে ভোট দেই না? আপনাকে স্পীকার নির্বাচনের সময়ে আমরা কি একসঙ্গে ভোট প্রদান করিনি? যারা মনে করেন যে, যুক্তনির্বাচন ইসলাম-বিরোধী এবং পাপ, কেমন করে তারা আজও এই পরিষদের সদস্য হিসেবে বহাল থাকছেন এবং অমুসলমানদের সাথে ব্যক্তির নির্বাচনে বা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর একসঙ্গে ভোট দিচ্ছেন? প্রকৃত প্রস্তাবে এই জাতীয় পরিষদও তো যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতেই গঠিত, অর্থাৎ মুসলমান-অমুসলমান সমন্বয়ে গঠিত

www.pathagar.com

প্রাদেশিক পরিষদদ্বয়ই একে নির্বাচিত করেছে। যুক্ত নির্বাচন ইসলাম-বিরোধী, এ যুক্তি অন্তত পরিষদের বর্তমান সদস্যদের কাছে বলে লাভ নেই, কারণ তাঁরা এই পরিষদের সাথে সম্পর্ক রাখতে গিয়ে নিজেরাও তো অনেক আগেই 'পাপকার্যে' নিমগ্ন হয়েছেন।

অন্যান্য মুসলমান দেশের নির্বাচনী প্রথা

তাছাড়া, পাকিস্তানই কি বিশ্বের একমাত্র মুসলিম দেশ? সৌদী আরব, মিসর, সিরিয়া, ইরান, লেবানন, জর্ডান এবং আফগানিস্তানেও শরিয়তই হচ্ছে বিঘোষিত আইন। এগুলো কি মুসলমান দেশ নয়? এদের কোথাও কি পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রচলিত আছে? তাদের পরাধীনতার সময়, সাম্রাজ্যবাদী শাসনামলে দুয়েকটি দেশে পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রচলিত ছিলো। কে-না জানে যে, সে প্রথা জনসাধারণকে বিভক্ত করে রাখার উদ্দেশ্যেই বহাল রাখা হয়েছিল? স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে সাথেই তারা অভিন্ন নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করে মুসলমান-অমুসলমানদের মধ্যকার সব বিভেদ উঠিয়ে দেয়। যুক্ত নির্বাচন ইসলামসম্মত নয়—এই ফতোয়া শুনলে এসব দেশে প্রতিক্রিয়া কি হবে? তারা পাকিস্তান এবং তার 'মহাপুরুষদের' সম্পর্কে কি ভাববে? এ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখার ভার আমি জনসাধারণের ওপরই ছেড়ে দিলাম।

এবার আমি হাতের কাছের নজির দেবো। পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যেকটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, যেমন ইউনিয়ন বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, স্কুল কমিটি প্রভৃতির সদস্যরা যুক্ত নির্বাচন প্রথায় নির্বাচিত হন। আজ পর্যন্ত এই পদ্ধতিকে কেউ অনৈসলামিক বলে অভিহিত করেননি। তাহলে কি বলতে হবে যে, কেবল আইন পরিষদের নির্বাচন ক্ষেত্রেই যুক্ত নির্বাচন ইসলাম-বিরোধী, আর অন্যান্য ক্ষেত্রে এমনকি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বেলায়ও তা পুরো মাত্রায় ইসলামসম্মত?

আমার মনে হয় সমস্যাটিকে একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা উচিত। সে হলো পাকিস্তানের স্বাধীনতা।

এক দেশ এক জাতি

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, যুক্ত নির্বাচন এক দেশ ও এক জাতিত্ববোধ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে এবং বিভেদমূলক সমস্ত প্রবণতা নস্যাৎ করে দেবে। আমরা যতোই এড়াতে চেষ্টা করি না কেন, পৃথক নির্বাচন ধর্মীয় বিভেদের আগুন জ্বালিয়ে রাখবে; ফলে দেশবাসীর দৃষ্টিভঙ্গিতে আসবে বিভিন্নতা, এমনকি পাকিস্তানের নাগরিকদের আচরণেও বৈষম্য প্রকাশ পাবে। পাকিস্তানকে আমরা যদি একটি জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে চাই তাহলে সেদিক থেকে বিবেচনা করলে পৃথক নির্বাচন একটি অসুস্থ ব্যবস্থা। বিভেদ সৃষ্টির এ একটি শক্তিশালী অস্ত্র।

নিজেদের বিবেকের দিকে যদি তাকিয়ে কথা বলি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, বর্তমান পৃথক নির্বাচনের দাবি অমুসলমানদের প্রতি গভীর সন্দেহ, অবিশ্বাস—এমনকি ঘৃণা থেকেই জন্মলাভ করেছে। আমি জানি, বিভাগজনিত ক্ষত আজো আমাদের শুকোয়নি। হয়তো শুকোতে কয়েক পুরুষ পার হয়ে যাবে; কিন্তু রোগমুক্তি আজই শুরু হওয়া উচিত। জনসংখ্যা বিনিময় একটি অসম্ভব ব্যাপার। ভারতে যে সাড়ে চার কোটি মুসলমান বসবাস করছে তারা যদি সবাই পাকিস্তানে উদ্বাস্তু হিসেবে চলে আসে তাহলে এমনও ঘটতে পারে যে, পাকিস্তান একটি জনসমুদ্রে পরিণত হবে। এই সত্যগুলোকে চোখের সামনে রেখে

www.pathagar.com

আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, পাকিস্তানেও হিন্দু-মুসলমান সমভাবে ও সমমর্যাদায় বসবাস করবে। তাদের সমান অধিকার থাকবে এবং তারা সম-নাগরিক অধিকারসম্পন্ন বলে বিবেচিত হবে। এ কেবল তখনই সম্ভব যখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্থাগুলোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই ধারণার জন্ম দেয়া যাবে যে, দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে সবারই সমান অধিকার আছে। আমি জানি, পৃথক-নির্বাচনপন্থীরা একথা উচ্চস্বরে বলবেন যে, অমুসলমানদের প্রতি তাদের কোনো রকম সন্দেহ, অবিশ্বাস অথবা ঘৃণা নেই। কিন্তু আমরা মূল ঘটনাগুলোকে অস্বীকার করতে পারিনে। সে রকম কোনো মনোভাব যে তাদের নেই তা প্রমাণ করার একমাত্র পন্থাই হলো তাদের যুক্ত নির্বাচন প্রথা মেনে নেয়া।

হিন্দু আধিপত্যের ভয়

যারা পৃথক নির্বাচন সমর্থন করেন তাঁরা বলে থাকেন যে, যুক্ত নির্বাচন প্রথার ফলে হিন্দুরা মুসলমানদের ওপর আধিপত্য করবে, সমআসন দখল করে নেবে এবং মুসলমানদের খারাপ করে দেবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ যুক্তি অভিনব। এ যুক্তি পাকিস্তানের এমন অঞ্চলেই প্রদর্শিত হচ্ছে যেখানে শতকরা দুজনের বেশি হিন্দু নেই। আরো অবাক ব্যাপার এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানের এইসব লোক, যারা পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তারা এ অঞ্চলের ওপর এই রাজনৈতিক তেলেসমাতি দাওয়াই চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন এবং ভাব দেখাচ্ছেন যেন তারাই পূর্ব পাকিস্তানের ত্রাণকর্তা। ভাবখানা যেন পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা কিছুই বোঝে না। তারা কি একথা বোঝেন না যে, যে পূর্ব পাকিস্তানে আজও যথেষ্ট হিন্দুর বাস রয়েছে সেই পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের প্রতি এতে কেবল হীন অপবাদই দেয়া হয়। যারা এরকম ভাবনা-চিন্তা করে থাকেন, তাদের একথা আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, সে রকম কোনো বিপদের সম্ভাবনা এখানে নেই। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা আজো নিজেদের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেনি, আজো তারা সাচ্চা মুসলমান। তারা জানে কেমন করে দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হয়। দেশে যুক্ত অথবা পৃথক নির্বাচন যাই হোক না কেন, তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছুই যায় আসে না; কারণ, সেখানে অমুসলমানরা সংখ্যায় নগণ্য। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বেলায় এ প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা তাই সে সব লোকের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চায় যারা তাদেরকে এত ছোট ভাবে যে, অমুসলমানদের অর্থের বিনিময়ে তারা দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেবে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে একথা বলার প্রয়োজন করে না যে, ধনী হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে গেছে। আমি মনে করি না যে, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা কোনো বিপদের মুখোমুখি। তবু এদিকটার কথা উল্লেখ করলাম সে সব ব্যক্তির সুবিধার জন্যে, যারা মনে মনে এমন ঘৃণ্য ধারণা পোষণ করেন।

তথাকথিত ত্রাণকর্তাদের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করতে পূর্ব পাকিস্তানের জীবনে যুক্ত নির্বাচনের ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ দেবো। খুলনা জেলায় হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান এবং সেখান থেকে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছেন ৮ জন মুসলমান এবং ৭ জন হিন্দু। অথচ ত্রিশজন সদস্যের সমবায়ে গঠিত জেলা বোর্ডে যুক্ত নির্বাচনের বদৌলতে নির্বাচিত হয়েছেন ২৮ জন মুসলমান এবং মাত্র ২ জন হিন্দু। পৃথক নির্বাচনে এই সদস্যসংখ্যা দাঁড়াতো ১৬ জন মুসলমান এবং

www.pathagar.com

১৪ জন হিন্দুতে। ফরিদপুর জেলা বোর্ডে, যেখানে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অনুযায়ী ২৫ জন মুসলমান এবং ১১ জন হিন্দু সদস্য থাকার কথা, সেখানে যুক্ত নির্বাচনের বদৌলতে ৩২ জন মুসলমান এবং ৪ জন হিন্দু সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। দিনাজপুরে যেখানে পৃথক নির্বাচন অনুযায়ী জনসংখ্যার ভিত্তিতে যথাক্রমে ১২ জন মুসলমান ও ৯ জন হিন্দু সদস্য নির্বাচিত হওয়ার কথা, সেখানে ২১ জনই মুসলমান সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, একজন হিন্দুও সেখানে নির্বাচিত হননি। এই সংখ্যাতত্ত্বগুলোর ওপর আর কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন করে না। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থায় হিন্দুরা যদি মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা না করে এবং একাত্ম না হয়ে যায় তাহলে নির্বাচিত হতে পারবে না। জনপ্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা যদি কারো স্বার্থহানি করে তাহলে তা করবে হিন্দুদেরই।

হিন্দুরা কেন যুক্ত নির্বাচন চায়

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার ফলে হিন্দুরা প্রতিনিধিত্বের দিক থেকে যদি এতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবু কি তারা যুক্ত নির্বাচনের পক্ষেই সমর্থন যোগাবে? আমি এর জবাব আগেই দিয়েছি; কিন্তু তার আরো অনেক রকম উত্তর হতে পারে। হিন্দুরা যখন অবিভক্ত ভারতের অধিবাসী ছিলো তখন তারা মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেয়নি। পাকিস্তানে এখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে সে অধিকার দাবি করা তাদের পক্ষে বেখাপ্পা ব্যাপারই বটে! তাছাড়া বর্তমান পরিবর্তিত পরিবেশে হিন্দুরা মনে করেন যে, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার ফলে তারা সব সময়ের জন্যেই শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে থাকবে। একদিক থেকে তারা সংখ্যালঘু হিসেবে হীনমন্যতায় ভুগবে অন্যদিকে সংখ্যাগুরু মানসিকতা ও ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে। একটি পূর্ণ জাতিত্বের ধারণা এবং এই সমস্ত মানসিকতার বিদূরণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থেরই অনুকূল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শব্দটি বিলুপ্ত হলেই তাদের মঙ্গল। অপরপক্ষে পৃথক নির্বাচন প্রথা অনুযায়ী হিন্দুরা এত বেশিসংখ্যক আসনের অধিকারী থাকবে যে, বিবদমান দুটি মুসলমান দলের মাঝে সব সময়ই ক্ষমতার ভারসাম্য থাকবে তাদেরই হাতে।

এদিকে রাজনৈতিক এবং যুক্তিসঙ্গত কারণেই পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সব সময়ই একটি গোষ্ঠী হিসেবে ঐক্যবদ্ধ থাকবে; অপরপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়—যাদের হাতে ক্ষমতার ভার থাকবে, তারা সব সময়ই বিভক্ত হয়ে থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের কৃতিত্ব এখানে যে, তারা বুঝতে পেরেছেন যে, মুসলমানদের এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে তারা খেলাতে সমর্থ হলেও এ অবস্থা তাদের পক্ষে মারাত্মক পরিণামবহই হবে। তাদের সংখ্যা এমনই বেশি হতে পারে যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সাথে কোয়ালিশন করে তারা তাদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে পারবেন এবং সংখ্যাগুরু দলকে উৎখাত করতে সক্ষম হবেন। এর ফলে হিন্দুরা যদিও সাময়িকভাবে কিছুটা লাভবান হবেন, কিন্তু তারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসভাজনে পরিণত হবেন। তখন মুসলমানদের বড় দলটি তাদের সম্পর্কে অবন্ধুত্বমূলক মনোভাব পোষণ না করে পারবে না। হিন্দুরা যে এখন প্রতিনিধিত্বের হার নিয়ে কাড়াকাড়ি না করে বিশ্বাস, সহযোগিতা এবং এক জাতিত্বের মঙ্গলকর দিকটিকেই বরণ করতে রাজি হয়েছেন, এতে তাদের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিই প্রকাশ পাচ্ছে।—

www.pathagar.com

আমি বিশ্বাস করি, এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমান এবং অমুসলমানগণ জাতির স্বার্থে ধর্মের বিভিন্নতার কথা বিস্মৃত হবেন এবং আমরা পাশাপাশি কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে দেশের প্রতিকোণে কাজ করে যাবো। এমনিতর কাজের মাধ্যমে আমরা এক জাতিত্ব অর্জন করতে পারবো এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা, যেমন স্থানীয় সংস্থা এবং আইন পরিষদগুলোতে আমাদের জনসাধারণের সেবার ভিত্তিতে যোগ্য স্থান খুঁজে পাবো।

দেশবাসীর কাছে আমার অনুরোধ—

তাই পরিষদের কাছে এবং এর বাইরে দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে আমার অনুরোধ, এ সমস্যাটিকে একটিমাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করুন অর্থাৎ পাকিস্তানের স্বার্থকেই সর্বোপরি স্থান দিন। আমাদের জনসাধারণ ইসলামের জন্যে তাদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। স্বভাবতঃই তাদেরকে ইসলামের নামে বিভ্রান্ত করা সহজ।

উত্তেজনা ছাড়ানো, বিক্ষোভের আগুন জ্বালানো বা ধ্বংসের বীজ বপন করা এতোই সহজ আর কোনো কিছু গড়ে তোলার কাজ এতোই কঠিন যে, যারা বিরোধিতার হাতিয়ার হিসেবে এই সমস্যাটিকে ব্যবহার করছেন, তাদের কাছে আমার অনুরোধ, গোঁড়ামি, ঘৃণা আর অন্ধ বিশ্বাসের আগুন না ছড়িয়ে আমাদের প্রিয় দেশের সকল অধিবাসীর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা এবং একতার সবল ভিত্তির ওপর পাকিস্তানকে গড়ে তুলুন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দেশ আজ কোন্ পথে?

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

[কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর ১৯৬২ সালের শেষদিকে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী নিজেকে আবার হারিয়ে ফেলেন জনারণ্যে। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত উল্কার বেগে ছুটে বেড়িয়ে প্রাণপ্রিয় দেশবাসীকে তিনি শুনিয়ে গিয়েছেন জাগরণী গান। আর এরই পাশাপাশি দুষ্প্রাপ্য অবসর মুহূর্তটুকু তিনি ব্যয় করেছেন ইংরাজী সাপ্তাহিক 'ঢাকা টাইমসের' জন্যে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লেখার কাজে। সে প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে তিনি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করে গিয়েছেন। এই প্রবন্ধে একদিকে যেমন তিনি নির্ভীকচিত্তে ক্ষমতাসীনদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন, তেমনি অন্যদিকে জাতীয় জীবনের অচলায়তনকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কলুষমুক্ত করে দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েমের সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এটিই জনাব সোহরাওয়ার্দীর স্বলিখিত শেষ প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ]

পূর্ব পাকিস্তানে আমার সাম্প্রতিক সফরকালে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে জাগরণ দেখিয়াছি তাহা বর্ণনারও অতীত। আমাদের জনসভাগুলিতে রেকর্ড সংখ্যক জনসমাগম হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ হইয়াছে, দূর-দূরান্ত হইতে মানুষ আসিয়া জনসভায় শরিক হইয়াছে। এই অবিশ্বাস্য উৎসাহ-উদ্দীপনা ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রতি মানুষের সমর্থনের পশ্চাতে অনেক কারণ থাকিতে পারে, তাহার মধ্যে একটি হইলো জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মহান আদর্শ—স্বাধীনতা, মুক্তি ও সেই নীতি, যে নীতির দ্বারা পাকিস্তানের জনগণই হইবে তাহাদের ভাগ্যনিয়ন্তা—অর্জনের সাধারণ প্রচেষ্টার সকল দল, উপদল ও স্বাধীন চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধ।

যে সমর্থন আমরা লাভ করিয়াছি তাহা ছিলো আমাদের আশারও অতীত। উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিলো অবিশ্বাস্য রকমের; সেই উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে ছিলো না কোনো দলীয় সংগ্রামের হাল্কা মনোভাব, ছিলো কেবল অভীষ্ট সিদ্ধির বজ্র-কঠোর শপথ। বিগত চারি বৎসরের হতাশা, উৎপীড়ন ও নিপীড়ন, স্বাধীনভাবে কথা বলা বা কর্তৃপক্ষের নিকট অভাব-অভিযোগ পেশের অক্ষমতা জনগণ ও তাহাদের সমস্যাবলীর প্রতি শাসন পরিচালনাকারীদের সহানুভূতিহীন মনোভাব, কর ও ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি এবং ঐগুলি আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, অথচ মানুষের আয় সেই হারে বৃদ্ধি পায় নাই, অত্র অঞ্চলের জনগণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র ও অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতি, রাজনৈতিক আমলের চাইতে বহু গুণ বেশি দুর্নীতির ছড়াছড়ি, খেয়ালী ও দায়িত্বহীন প্রশাসকদের হাতে বিচারের বাণীর নিভৃত ক্রন্দন, সাধারণ মানুষের প্রায় অনাহার অবস্থা, তাহাদের প্রয়োজন ও অভাবের প্রতি অবজ্ঞা, এইগুলি এবং আরও অনেক কারণ

মানুষের মনে এই আশার সঞ্চার করিয়াছে যে, কেবল জনগণের সার্বভৌমত্বভিত্তিক শাসনতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি দায়িত্বশীল ও সংবেদনশীল শাসন ব্যবস্থাতেই তাহাদের অযুত সমস্যার সমাধান নিহিত এবং কেবল তাহাই তাহাদের জীবনকে সহজতর করার ব্যাপারে সহায়ক হইতে পারে।

ইহা সত্যিই বিস্ময়কর। বিগত চারি বৎসর যাবৎ সাবেক রাজনৈতিক আমল, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাধারণভাবে রাজনীতিকগণ ও সামগ্রিকভাবে রাজনীতিকে কলঙ্কিত করার জন্যে কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করা হয় নাই। দীর্ঘ চারি বৎসর কাল অবমাননাকর ও বিষাক্ত প্রবন্ধাদি লিখাইয়া আজ্ঞাবহ ও নিয়ন্ত্রিত এবং সরকারের বিশ্বাসভাজন সংবাদপত্রের মাধ্যমে অনবরত অপপ্রচার করা হইয়াছে। দেশের ভিতরে ও বাহিরে সরকারি প্রচারযন্ত্রে, দেশি ও বিদেশি সংবাদপত্রে, নিউজ রিল ও বেতারে এই অপপ্রচার চালাইতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে। এই অপপ্রচারের উদ্দেশ্য ছিলো দ্বিবিধ ঃ মার্শাল ল' ও উহার উত্তরসূরী শাসনামলকে 'জনপ্রিয়' করিয়া তোলা এবং পূর্ববর্তীদের বিরুদ্ধে কুৎসা গাওয়া, বস্তুত কোনো রাজনৈতিক আমলের সরকার যদি এই আমলে ব্যয়িত অর্থের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগও নিজেদের স্বার্থে ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কাজে ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে তাহারা হয়তো চিরকালই ক্ষমতাসীন থাকিতে পারিতেন। স্থায়ী কর্মচারিদের কলুষিত ও সম্পূর্ণরূপে নীতিবিচ্যুত করা হইয়াছে এবং সরকারি কর্মচারিদের 'আচরণবিধি' জঞ্জালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সরকারের 'মাহাত্ম্য' প্রচারের জন্যে সরকারি কর্মচারিগণকে দেশব্যাপী সভা-সমিতি অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা যে সমগ্র জাতির পক্ষে কতো কলঙ্কজনক ও নিন্দার্হ, স্থানান্তরে আমি তাহা প্রমাণ করিবো। সরকারের এই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে সরকার ও উহার বিভিন্ন অঙ্গ জনগণের প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং একটি উদ্ধত, অসহিষ্ণু, দূরদৃষ্টি ও সহানুভূতিহীন বিবেকবুদ্ধি-বর্জিত আমলাতান্ত্রিক প্রশাসক শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে।

উপমহাদেশের ইতিহাসে সম্ভবত আর কোনো সময় সংবাদপত্রকে সরকারের এমন বশংবদে পরিণত করা হয় নাই, নির্যাতিত করা হয় নাই ও নীতিচ্যুত করা হয় নাই। পূর্বে আর কখনও সমালোচনাকে এমনভাবে নিস্তব্ধ করা হয় নাই। গত চারি বৎসরের মতো আগে আর কখনও তোষামোদের এমন প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। সামরিক শাসনামলের গুণকীর্তন ও পূর্ববর্তীদের কুৎসা প্রচারকারী সংবাদপত্রগুলিকে অকাতরে পৃষ্ঠপোষকতা ও বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে; অপরপক্ষে জনগণের অভাব-অভিযোগ ও দেশের প্রয়োজন সম্পর্কে শাসন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণকারী অথবা ক্ষীণস্বরে দুই একটি কথা বলার সাহস প্রদর্শনকারী অথবা ভদ্রভাবে শাসন ব্যবস্থার সমালোচনাকারী সংবাদপত্রগুলিকে ন্যায়বিচারের কোনো তোয়াক্কা না করিয়া সরকারি বিজ্ঞাপন হইতে বঞ্চিত করিয়া শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। রাজনৈতিক শাসন আমলে চরম অধঃপতনের সময়ও কোনো সরকার সংবাদপত্রকে এমন নগ্নভাবে আজ্ঞাবহে পরিণত করে নাই, রক্তচক্ষু প্রদর্শন করে নাই, কলুষিত করে নাই অথবা রাজনৈতিক মতামতের জন্যে সাজা দেয় নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে বাস্তবিকই ইহা নিকৃষ্টতম নিচতারই নিদর্শন। সরকার বেশ ভালোভাবেই জানেন যে, বিজ্ঞাপন ব্যতীত সংবাদপত্র বাঁচিতে পারে না; তাই নিজেদের গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ সংবাদপত্র গোষ্ঠীকে রাখিয়া সামান্যতম স্বাধীনচেতা সংবাদপত্রগুলিকে ধ্বংস করার নিমিত্তেই সরকারের নীতি প্রণীত হইয়াছে।

www.pathagar.com

আমাদের সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল যে, বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্যের, অর্থাৎ তথ্য ও প্রচার মূল্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই কেবল বিজ্ঞাপন বিতরণ করা হইবে। রাজনৈতিক লাভ লোকসানকে কোনো মূল্য দেওয়া হইবে না। তাই সর্বাধিক প্রচারসংখ্যাবিশিষ্ট সংবাদপত্রকেই সরকারি বিজ্ঞাপন বিতরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হইতো এবং তাহাদের রেট্ও ছিলো সর্বোচ্চ। আরও স্থিরিকৃত হইয়াছিল যে, বিজ্ঞাপন বিতরণের যাঁতাকলে ফেলিয়া মতপার্থক্যের দরুন কোনো সংবাদপত্রকে শাস্তি দেওয়া হইবে না।

এই নীতি বাস্তবায়ন করিতে গিয়া প্রচলিত নীতির বিরাট পরিবর্তন সাধন করিতে হয়। কারণ, পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রসমূহ তৎপূর্বে তাহাদের ন্যায্য অংশ পাইতো না অথবা তাহাদিগকে যে রেট দেওয়া হইতো, প্রচারসংখ্যার সহিতও তাহার কোনো সঙ্গতি ছিলো না। 'বজ্রাঘাত' হানার পূর্বে বর্তমান সরকারও এই অসঙ্গতির আংশিক সংশোধন করিয়াছিলেন। তবে পূর্বের এই অসঙ্গতির পিছনে প্রতিহিংসা বা শাস্তির কোনো উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিলো না।

স্বাধীনচেতা সংবাদপত্রসমূহকে বিজ্ঞাপন হইতে বঞ্চিত করিবার ব্যাপারে বর্তমান সরকার এক অদ্ভুত অজুহাত আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাদের এই নবাবিষ্কৃত 'থিওরি' অনুযায়ী বলা হয় যে, বিজ্ঞাপন এক ধরনের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং এই পৃষ্ঠপোষকতা কেবল তাহাদেরই দেওয়ার কথা, যাহাদের ওপর সরকারের বিশ্বাস আছে। অন্য কথায়, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া সরকার ব্যবসায় করেন এবং সরকার কেবল তাহাদের সহিতই ব্যবসায় করিবেন, যাহাদের ওপর তাহাদের বিশ্বাস আছে। এক কথায় সংবাদপত্রকে সরকারের বিশ্বস্ত এজেন্ট হইতে হইবে। যে সংবাদপত্র সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে না, তাহারা সরকারের আস্থা হারাইবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপন পাওয়ার অধিকারও হারাইবে। প্রকৃত ক্ষেত্রে ঘটিয়াছেও তাহাই।

অতএব, পত্রিকার প্রচারসংখ্যার সহিত অথবা বিজ্ঞাপনদানের মূল উদ্দেশ্যের—যথা পাঠকদের অবগতির জন্যে তথ্য সরবরাহের সহিত সরকারের বিজ্ঞাপন বিতরণের আজ আর কোনোও সম্পর্ক নাই। বর্তমান সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া আমি বলিতে চাই যে, ইহার চাইতে বড় নগ্ন-দুর্নীতি, বাধ্যবাধকতা ও প্রতিহিংসা আর কিছুই হইতে পারে না। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে, যে সময় এই পত্রিকাগুলি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত, সেই সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সংশ্লিষ্ট দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, তিনি পত্রিকাগুলিকে 'ব্ল্যাকলিস্ট' করিবার কথা জানেন না, অনুরূপ ব্যাপারে কোনো নোটিং-এর কথাও তিনি অবহিত নহেন এবং তিনি নিজে এ সম্পর্কে কোনো নির্দেশ দেন নাই।

তাঁহার বক্তব্যের সারবত্তা আমাদের বুদ্ধিরও অগম্য এবং তাঁহার কথা কতটুকু সত্য, জনগণকে তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দফতরসমূহ বিশেষ বিশেষ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধের নীতি চালু করার পর রাজনৈতিক লাভ-লোকসানের প্রশ্নে গুরুত্ব না দিয়া অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিজ্ঞাপন বিতরণের জন্যে একটি প্রাদেশিক সরকার সবিনয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, মন্ত্রী ও সরকার কি তাহা অস্বীকার করিতে পারেন? সংবাদপত্রের লাঞ্ছনার এখানেই শেষ নহে। যে কোনো প্লাবনের মুখেও মাথা উঁচু রাখার মতো আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন একটি প্রভাবশালী পত্রিকাকে সরকার কুক্ষিগত করিয়াছেন এবং উহার হুঁকো-কলকে সব পাল্টাইয়া নিজ এজেন্টদের মারফত উক্ত

www.pathagar.com

পত্রিকাকে এখন সরকারি মুখপত্রে পরিণত করা হইয়াছে। সংবাদপত্র দলনের অনুরূপ আর একটি মাত্র নজিরের কথাই আমরা জানি—তাহা ঘটিয়াছিল বিশ্বের অপর প্রান্তে। ইহার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী এমন প্রতিবাদের ঝড় সৃষ্টি হইয়াছিল যে, শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সেই ডিক্টেটরকে বাধ্য হইয়া পত্রিকাটিকে উহার মূল মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে হইয়াছিল।

রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ

ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পদস্থ সরকারি কর্মচারি, মন্ত্রী, পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি তথা তাহাদের চাঁই ও মোসাহেবগণকে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ প্রচারে নিযুক্ত করা হইয়াছে। একটু তলাইয়া দেখিলেই এই বিষয় পরিষ্কার হইয়া পড়িবে যে, ভাষার সামান্য রদবদল করিয়া সরকারেরই কোনো না কোনো ব্যুরোতে প্রায় একই ছাঁদের বিবৃতি তৈয়ার করিয়া হাতের কাছে এজেন্টদের দ্বারা প্রচার করা হইতেছে। বিভিন্ন বিবৃতিতে ভাষার হেরফের থাকিলেও অভিযোগ ও মিথ্যার বেসাতি একই। এমনকি সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতারেও উহার পছন্দসই অংশগুলি প্রচারিত হইতেছে। এই সবের মূল-কারখানা কোথায়, তাহা ইহা হইতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

আমি এমন একটি দুঃখজনক বিষয় জানি, যাহা ভবিষ্যৎ দুর্যোগেরই এক অশুভ লক্ষণ। তাহা হইলো, সরকারি কর্মচারিদের যাহারা চিন্তা-ভাবনা করিয়া কাজ করেন না, যাহাদের মতামত সম্পূর্ণরূপে ওপরওয়ালাদের আদেশ-নির্দেশের ওপর নির্ভরশীল—অবিরাম অপপ্রচারের ফলে তাহাদের মনে শ্রেণী হিসেবে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে গভীর শত্রুতার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে ইহা অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতো। সময় ও শুভবুদ্ধির উন্মেষ, উন্নত ধরনের শিক্ষা ও স্বল্প বিষাক্ত পরিবেশ এবং সাধারণ গণজাগরণই এই শত্রুতা ও তিক্ততার ভাব দূরীভূত করিবে, আমি কেবল এই আশাই করি।

দেশের ভবিষ্যৎ ও স্থায়িত্বের পক্ষে সত্যই শুভ লক্ষণ যে, সামগ্রিকভাবে জাতির মধ্যে সরকারের এই নীতির সম্পূর্ণ উল্টা প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। ছোবল যত বিষাক্ত করা হইয়াছে, জনগণের প্রতিক্রিয়াও তত প্রবল হইয়াছে এবং যে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে সামরিক সরকার ও উহার উত্তরসূরীরা এতকিছু করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি জনগণের আস্থাও ততই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

হায়রে জনগণ !

আমরা এতদিন সব কিছুই একতরফাভাবে ও নিঃশব্দে শ্রবণ করিয়াছি। অবশ্য প্রতিদানে আমরা জনগণের স্নেহ ও আস্থাই লাভ করিয়াছি, তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, এই নিন্দাবাদ কেবল রাজনীতিকদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয় নাই—পাকিস্তানের জনগণকেও অশিক্ষিত, নিরক্ষর, সেকেলে, নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জিত, বোকা, রাজনীতিকদের প্ররোচনায় পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য এবং সত্যিকারের মূল্যায়ন ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম, বিশ্বাস, আস্থা বা দায়িত্বভার গ্রহণের অযোগ্য প্রভৃতি আরও কত বিশেষণেই না তাহাদিগকে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

যে জনগণ একদিন সকল সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং ভোটের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং যে জনগণ গণভোটে অংশগ্রহণ করিয়া সিলেট ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করিয়াছিল, তাহারা সত্যিকারের

www.pathagar.com

বোকাই বটে! নহিলে তাহারা তখন এই 'ধিকৃত রাজনীতিকদের' কথায় সাড়া দিয়া পথভ্রষ্ট হইয়া এইভাবে পাকিস্তান কায়েম করিবে কেন?

বুদ্ধিজীবী শ্রেণী

যে সকল রাজনীতিক দীর্ঘ চার বৎসরকাল সামাজিক ও রাজনীতিক্ষেত্রে থাকিয়া জনসেবা করিয়াছেন এবং যাঁহারা এইভাবে জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ ব্যয় করিয়াছেন, আজ তাঁহাদের বিরুদ্ধেও অহরহ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা লোভের অভিযোগ আনা হইতেছে। নিজস্ব মতামত পোষণ করায় বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে আনা হইতেছে অভিযোগ। তাঁহাদের একমাত্র অপরাধ, দেশের মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে তাঁহারা কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করেন।

যে আইনজীবী সম্প্রদায় নিজেদের আচার-আচরণ, শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাধীন মর্যাদা ও পেশার কারণে স্বাভাবিক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সর্বত্র গণ্য, তাঁহারাও নিন্দাবাদ হইতে রেহাই পান নাই। তাঁহারা নাকি বিচার ব্যবস্থায় ব্যাঘাত সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই জানেন না! তাঁহারা নাকি অতিলোভী। অতএব, তাঁহাদের আইনানুগ ও পেশাগত কার্যকলাপ অবশ্যই খর্ব করিতে হইবে; তাঁহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে দুর্বল করিতে হইবে, পদ বিতরণ করিয়া নীতিচ্যুত করিতে হইবে অথবা ভীতি প্রদর্শন করিয়া বশ্যতা স্বীকার করাইতে হইবে। এক কথায়, তাঁহারা সমাজ-জীবনের 'উপদ্রব' স্বরূপ। তাঁহারা যখন মৌলিক অধিকারকে বিচার বিভাগের আওতাভুক্ত করার দাবি জানান, তাহা নাকি তাঁহারা নিজেদের স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হইয়াই করেন! কারণ, ইহার ফলে আইন-আদালতে তাঁহারা নাকি বেশি মামলা বা মক্কেল পাইবেন। শুধু কি তাহাই? আইন-আদালতকেও আর বিশ্বাস করা চলে না। তাই তাঁহারা ব্যবস্থা করিলেন, শাসন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যত অন্যায় ও অসঙ্গতই হউক না কেন, কোনো আদালতে উহা চ্যালেঞ্জ করা যাইবে না। মোট কথা, দেশের সমস্ত মানুষই নির্বোধ, বিপথগামী ও বিশ্বাসের অনুপযুক্ত। সুতরাং, তাহাদিগকে নূতন করিয়া 'সবক' দিতে হইবে, নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে ও বশ করিতে হইবে।

এই অবিশ্বাস ও অনাস্থার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়াতেই জন্ম নেয় বর্তমান শাসনতন্ত্র। সুপ্রীম কোর্টের জনৈক বিচারপতির নেতৃত্বে একটি শাসনতন্ত্র কমিশন নিযুক্ত করা হইলো। কমিশন সমগ্র দেশ ঘুরিয়া সর্বশ্রেণীর মানুষের মতামত সংগ্রহ করিলেন। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস। কমিশনকে উহার শ্রমের জন্যে কেবল বিনীতভাবে ধন্যবাদ দিয়া উহার রিপোর্টটি প্রত্যাখ্যান করা হইলো। আর, পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট একক স্কন্ধে দায়িত্ব লইয়া নিজেই দেশের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবস্থা, জনগণের মেধা ও দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে প্রস্তুত করিলেন একটি শাসনতন্ত্র। ইহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের অনুরূপ হইলেও সরকারের প্রকৃতি, প্রেসিডেন্টের সহিত মন্ত্রী ও আইন পরিষদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটান হইলো।

সেই 'কালো বাক্সটি'–

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রদত্ত শাসনতন্ত্রে দেশের সমস্ত ক্ষমতাই একজনের হাতে অর্থাৎ প্রেসিডেন্টের হাতে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট দাবি করেন যে, সামরিক শাসনামলে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে তিনি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সেদিনের সেই নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন তিনি নিজে ও একটি

www.pathagar.com

'কালো বাক্স' মাত্র। সেই 'কালো বাক্সটিকে' ভোটে পরাজিত করিয়া তিনি নাকি সেদিন তিন তিনটি বিষয়ে ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্টের মতে, এই নির্বাচনে প্রথমতঃ তিনি নিজের প্রতি আস্থা ভোট, দ্বিতীয়তঃ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কর্তৃত্ব ও তৃতীয়তঃ নিজের প্রণীত শাসনতন্ত্রে বর্ণিত সময়ের জন্যে নিজেকে প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে অধিষ্ঠিত করিবার অনুমোদন লাভ করেন। একটি কালো বাক্সের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভোটের ফলাফল যে কি দাঁড়াইবে তাহা পূর্বেই অনুমান করা গিয়াছিল। কেননা, সামরিক শাসনামলে নিজের পক্ষে ভোট ক্যানভাস করার ক্ষমতা কালো বাক্সের কোথায়? কিন্তু কোনো অভাবিতপূর্ব বা অস্বাভাবিক কারণে বা দৈব-দুর্বিপাকে যদি সেই নির্বাচনে কাল-বাক্সটিই জিতিয়া যাইতো তাহার রাজনৈতিক ফলাফল তথা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাহার প্রতিক্রিয়া যে কি দাঁড়াইতো, তাহা ভাবিয়া রাজনৈতিক চিন্তাবিদমাত্রেই শিহরিয়া উঠিবেন।

সামরিক শাসন পূর্ণ মর্যাদায় চালু থাকাকালে এই শাসনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। রাজনৈতিক মতবাদের জনৈক প্রখ্যাত নেতা প্রকাশ্যে শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে দ্বিমত প্রকাশ করার সাহস প্রদর্শন করিলে, তাঁহাকে সামরিক আইনের বিধানাবলী চালু থাকার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলা হয় যে, সরকার বা সরকারি নীতির সমালোচনার শাস্তি চৌদ্দ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড। অতঃপর মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পর ১৯৬২ সালের জুন মাসে পরিষদের অধিবেশন বসে এবং দেশের বুক হইতে সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অসাড় ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত জাতির ধমনী ও শিরা-উপশিরায় রক্ত সঞ্চালন শুরু হয়। পাকিস্তানের কতিপয় রাজনৈতিক চিন্তাবিদ গত জুন মাসের ২৪ তারিখে এক যুক্ত বিবৃতিতে এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নীতির নির্দেশ দেন, যাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই বিবৃতিতে সাবেক রাজনৈতিক দলের নয়জন নেতা স্বাক্ষর করেন, এই বিবৃতি সংক্ষেপে 'নয় নেতার বিবৃতি' নামে পরিচিত। তাঁহাদের নীতিগত মুখ্য দাবি এই যে, জনসাধারণের ওপর প্রযোজ্য কোনো শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার ব্যক্তিবিশেষের নাই। অন্য কথায় একমাত্র প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সুষ্ঠু ও আইনতঃ নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গেরই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার রহিয়াছে। এই নীতির যুক্তি হিসেবে তাঁহারা দাবি করেন যে, উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে নির্বাচিত একটা গণপরিষদের ওপর শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হউক। এ ব্যাপারে আগে যে প্রারম্ভিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে উহার পরিপ্রেক্ষিতে গণপরিষদ গঠন ও শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ খুব দুরূহ ও বিলম্বিত হওয়ার কথা নহে। তাঁহারা এই কথাও স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেন যে, তাঁহাদের এই প্রস্তাব কার্যকর করিতে বর্তমান শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখারও প্রয়োজন করে না। সুতরাং বর্তমান সরকারের মুখপাত্ররা অনবরত বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, এই প্রস্তাবের পিছনে বর্তমান শাসনতন্ত্রের বিলোপ সাধন ও দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি ও দেশে পুনরায় সামরিক শাসন—প্রেসিডেন্ট মেহেরবানী করিয়া যে শাসনের অবসান ঘটাইয়াছেন—প্রবর্তনের অভিসন্ধি রহিয়াছে, তাহার মূলে কোনো সত্যতা নাই। নয় নেতার বিবৃতির স্বাক্ষরকারীদের তরফ হইতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে, তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য পাকিস্তানে পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন; এ কথাও বলা হইয়াছে যে, তাঁহাদের এই প্রস্তাব দেশবাসীর ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটা পন্থা মাত্র। ইহাতে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে অন্য পন্থা গ্রহণেও কোনো বাধা নাই। ইহা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা।

www.pathagar.com

দেশ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চায়, যে শাসন ব্যবস্থায় জনমতের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইবে। খাস করিয়া কোন্ পন্থায় এমন শাসন ব্যবস্থা কায়েম হইবে তাহা তাহাদের প্রতিপাদ্য নয়। বাস্তববাদী হিসেবে আমরা দেখিতে পাই যে, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আমাদের প্রেসিডেন্ট সর্বক্ষমতার অধিকারী; আমাদের একটা শাসনতন্ত্র এবং একটা ব্যবস্থাপক সভাও রহিয়াছে; ইহাদের অস্তিত্ব ও ক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত থাকিয়া আমাদিগকে নিয়মতান্ত্রিক আইনসম্মত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইবে। শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা এবং সহযোগিতা ব্যতিরেকে আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। প্রেসিডেন্ট স্বয়ং এই আভাস দিয়াছেন যে, যে শাসনতন্ত্র তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন সে শাসনতন্ত্র অলংঘ্য নহে; তবে সেই শাসনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপক সভার। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, যাহারা শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের পক্ষপাতী, তাহাদিগকে জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সমর্থন লাভ করিতে হইবে; তখন তিনি সংখ্যাগুরু সদস্যদের রায় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

একদল চরমপন্থীর মতে, প্রেসিডেন্টের উল্লেখিত মতামত মানিয়া নেওয়ার অর্থ ব্যক্তিবিশেষের তৈরি শাসনতন্ত্র যেকোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়, এমনকি উন্নয়নের ভিত্তি বা প্রারম্ভরূপেও নয়, এই প্রধান নীতিরই অস্বীকৃতি মাত্র। এই চরমপন্থীদের প্রতি আমার অনুরোধ, তাঁহারা যেন এতটা কল্পনাপ্রবণ আর অধীর না হন। যদি—এই 'যদি' অত্যন্ত অনিশ্চিত, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে পারেন, তবে যেকোন পন্থায়ই আমাদের আসল উদ্দেশ্য সফল হোক, সেই পন্থাকে আমরা মিথ্যা দোষারোপ না করিয়া বরং গ্রহণই করিব। আমাদের এই সত্যকে ভুলিলে চলিবে না যে, শাসনতন্ত্রের গুরুতর রদ-বদল প্রয়োজন এবং যতদিন পর্যন্ত জনমতের সার্বভৌমত্ব অর্জিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত দেশ তৃপ্ত না হইয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

ছলনা ও মরীচিকা

প্রেসিডেন্ট যে পন্থার ইংগিত করিয়াছেন, তাহা আদৌ সম্ভবপর কিনা এইবার তাহাই বিচার করা যাক। প্রেসিডেন্ট জানান যে, দেশে শাসনতন্ত্র প্রদানের পর সেই প্রশ্নে তাঁহার আর কোনো এখতিয়ার নাই; তাঁহাকে শাসনতন্ত্রের বিধি মোতাবেকই চলিতে হইবে। তবে তিনি যে ক্ষমতা নিজের হাতে সংরক্ষিত রাখিয়াছেন এবং জাতীয় পরিষদের ঐতিহাসিক উৎপত্তি ও গঠন পদ্ধতির কথা ভাবিলে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে, প্রেসিডেন্ট স্বয়ং সংশোধনের অনুকূলে না থাকিলে শাসনতন্ত্রের কোনো সংশোধন সম্ভবপর নহে। ইহা অযথা আশাবাদ যে, শাসনতন্ত্র সংশোধনের ব্যাপারে আমরা প্রেসিডেন্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাতীয় পরিষদের প্রয়োজনীয়সংখ্যক সদস্যের সমর্থন লাভ করিতে পারিবো। যে আবহাওয়ায়, অবস্থায় ও উপায়ে মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, যে অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে এবং যে দুর্নীতিমূলক পন্থায় মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে জাতীয় পরিষদের সসদ্যবর্গ নির্বাচিত হইয়াছিলেন, তাহা যদি আমরা স্মরণ করি; যদি আমরা স্মরণ করি যে, অবাঞ্ছিত সংশোধনের বিরোধিতা করার জন্যে জাতীয় পরিষদে একদল স্থায়ী সদস্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির শূন্যপদ শূন্যে ঝুলিতেছে এবং ডেপুটি

www.pathagar.com

কমিশনারের মনোনীত যথেষ্টসংখ্যক সদস্য পরিষদে রহিয়াছেন, তবে প্রেসিডেন্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয়সংখ্যক সদস্যের সমর্থন লাভ করার কোনো সম্ভাবনাই নাই; জাতীয় পরিষদের সদস্যদের ওপর গণদাবি সমর্থন করার জন্যে জনমতের প্রবল চাপ হইবে সন্দেহ নাই। জনমতের প্রাবল্য ইতিমধ্যে পরিলক্ষিতও হইতেছে। এমন একটা অলৌকিক ব্যাপার যে ঘটিতে পারে, সে সম্ভাবনাকেও আমি উড়াইয়া দেই না। তবে, প্রেসিডেন্টকে আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিবো যে, গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দাবি সার্বজননী। এই সম্বন্ধে গণজাগরণও বিপুল, এতে কোনো অতিরঞ্জন নাই এবং সরকারি আওতার লোকদের বর্তমান শাসনতন্ত্রের অনুকূলে দল সৃষ্টির উন্মত্ত চেষ্টা বা তাঁহাকে খুশী করার জন্যে লোক দেখান আড়ম্বর যে একটা ছলনা বা মরীচিকা মাত্র, তিনি যেন তাহা বুঝিতে চেষ্টা করেন এবং বিভ্রান্ত না হন।

আমাদের সমস্যা

সুতরাং সমস্যা এই যে, প্রেসিডেন্টকে কেমন করিয়া বোঝানো যায় যাহাতে তিনি দেশকে একটা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রদান করিতে সম্মত হন। মৌলিক শিক্ষার প্রতি আবেদন জানাইয়া আমরা কি তাঁহাকে এই কাজে সম্মত করাইতে পারি যে, জনসাধারণই তাহাদের প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক; জাতির সম্মিলিত জ্ঞান-বুদ্ধিই জাতির ভাগ্য নিয়ামক? এই পন্থার মাধ্যমেই কেবল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত হইতে পারে; স্থিতিশীলতার স্থায়িত্ব এবং হৃদয় ও মনের মিলনের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য, সার্বজনীন একাত্ম ও আদর্শবোধ জাগরূক করা সম্ভবপর; সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ও কৃষ্টির বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি সুনিশ্চিত। সর্বসাধারণের প্রতি বিশ্বাস ও স্নেহ-প্রীতি এবং সহানুভূতি, জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে গণসংযোগের মাধ্যমে জনসাধারণের সমস্যাবলীর গভীর উপলব্ধিই আমাদের ঈপ্সিত গণতন্ত্রের ভিত্তি। দুঃখের বিষয়, বর্তমান পরিবেশ প্রেসিডেন্টকে ইহার চর্চা করিতে দিতেছে না। তাঁহার উপদেষ্টাদের মতে জনসাধারণ বিশ্বাসের পাত্র নহে; তাই তাহাদিগকে সরকারি আদেশ-নির্দেশের বেড়াজালে ফেলিয়া জাতীয় ঐক্য চাপাইয়া দিতে হইবে এবং পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণ করিয়া একদল মোসাহেব সৃষ্টি করিয়া জাতীয় সংহতি অর্জন করিতে হইবে। তাহাদের ধারণা সংকীর্ণমনা আমলাতন্ত্র এবং সরকারি কর্মচারিরা সর্বসাধারণের কল্যাণ ও জীবন-পদ্ধতি নির্বাচনের যোগ্যতর বিচারক।

ক্ষমতা ও পৃষ্ঠপোষকতা

ইহা স্পষ্ট যে, রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি যুক্তিপূর্ণ আবেদন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। কেননা, প্রেসিডেন্ট আমাদের সহিত একমত নন। তাঁহাকে সম্মত করাইবার আর একটা পন্থা হইলো, তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, যে দেশের শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা এবং পৃষ্ঠপোষকতা ব্যক্তিবিশেষের অর্থাৎ প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত, সার্বজনীন দাবি হইলেও শাসনতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ন সে দেশে যতটুকু আশা করা যায়, ততটুকুও সম্ভব নয়। কেননা, সামরিক শাসন আমলে তিনি যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, বর্তমান শাসনতন্ত্র তাঁহার সে ক্ষমতা স্থায়ী করিয়া দিয়াছে। তাঁহার ওপর যে শাসনতান্ত্রিক বাধা-নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে, তাহা কেবল কথার কথা মাত্র; কার্যতঃ তাহা প্রয়োগ করা কখনও সম্ভব নহে। এ বিষয়ে কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, দেশবাসী তাঁহাদের মতামত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ

www.pathagar.com

করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক চেতনার মান অত্যন্ত উন্নত; সুতরাং এ ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্বদান বিস্ময়কর নহে; কিন্তু ইতিমধ্যে ইহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, গণতন্ত্র-সমর্থক সভা-সমিতি বানচাল করিয়া দিবার এবং সভা-সমিতি অনুষ্ঠানে সরকার পক্ষের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির শত চেষ্টা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানে যে গুটিকয়েক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতেও ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের মতন পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণও সচেতন এবং সেখানকার নামজাদা নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের পক্ষে সমর্থন জানাইয়াছেন। যে দুর্গকে সরকার নিজেদের বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই দুর্গে এখন ফাটল ধরিয়া ধসিয়া গিয়াছে। গণতন্ত্রের এই দাবি স্বতঃস্ফূর্ত। ইহার জন্যে কোনো চেষ্টা-তদবিরের প্রয়োজন হয় নাই। ক্ষমতাসীনদের সপক্ষে সমর্থন সৃষ্টির জন্যে বেপরোয়া চেষ্টা চলিয়াছে; নূতন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি করা হইয়াছে বা লুপ্ত রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবিত করিয়া ইহার গায়ে লেবেল আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু জনসাধারণের কোনো সাড়া পাওয়া নাই। বরং যখনই লোকে বুঝিতে পারিয়াছে যে, কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বা সরকারি আর্থিক সাহায্যে চলিতেছে, তখনই জনসাধারণ এই দলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া, এই দলকে তোষামোদকারি বা তল্পীবাহকদের সৃষ্ট বলিয়া চোখ ঠারাঠারি করিয়াছে। এখানে-ওখানে দুই-একটা সভা বন্ধঘরে বা কারো বাড়িতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বা হতভাগ্য প্রাইমারি শিক্ষকদের নেতৃত্বে এই সব সভায় স্কুলের ছাত্ররা শামিল হইয়াছে। পরে এইসব সভাকে অতিরঞ্জিত করিয়া বিরাট সভা বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। একশ্রেণীর সংবাদপত্র আনুগত্যের সাথে সরকার পরিবেশিত এই সংবাদ প্রচার করিয়াছে। প্রেসিডেন্টকে সত্য ঘটনা জানিতে না দিবার বা তাহাকে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়া বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমার মনে হয় তিনি যদি চারিদিকে নজর দিয়া নিজের একটা অভিমত গড়িয়া তুলিতেন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিতেন—হয়তো তিনি তাহা জানিতে পারিয়াছেনও।

তোষামোদী বিবৃতি

প্রেসিডেন্টের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তিনি যেন তাঁহার স্বনিয়োজিত উপদেষ্টা আর প্রতিনিধিদের তোষামোদী বিবৃতিতে বিভ্রান্ত না হন। তাঁহাদের মধ্যে একজন এমন অসাধারণ ধৃষ্টতাও দেখাইয়াছেন যে, দেশের উভয় অংশে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের জন্যে প্রচণ্ড জাগরণ ও বিপুল সমর্থন সত্ত্বেও তিনি বলিতে দ্বিধা করেন নাই যে, দেশের শতকরা নিরানব্বই জন লোকই প্রেসিডেন্টের ঘোষিত শাসনতন্ত্রের পক্ষপাতী; দেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সমর্থক নাই। গোয়েন্দা বিভাগ ও সাংবাদিকদের বিবরণ এবং আলোকচিত্র থাকা সত্ত্বেও তিনি বলিয়াছেন যে, আমি যে সমস্ত সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়াছি, সে সমস্ত সভা-সমিতিতে শ্রোতার বিশেষ সমাগম হয় নাই; সভায় শ্রোতার অভাব হইবে এই ভয়ে আমি নাকি সভা বাতিল করিয়া দিয়াছি। অথচ অন্তত পশ্চিম পাকিস্তান সরকার জানেন যে, আমার সভা বানচাল করার উদ্দেশ্যে খোলাখুলিভাবে সভায় গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা তাহাদিগকেই করিতে হইয়াছে। পাছে তাহাদের নিকটও গণতন্ত্রের সার্বজনীন সমর্থন স্পষ্ট হইয়া ওঠে, এই ভয়ে আমাকে সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অনুমতি দিতেও সরকার আজ ভয় পান। ভাবিয়া বিস্মিত হই যে, মন্ত্রী সাহেবের এই প্রত্যক্ষগোচর অসত্য উক্তি কাহারা হজম

www.pathagar.com

করিবে? তিনি কি মনে করেন যে, এই পন্থায় তিনি প্রেসিডেন্টকে বিভ্রান্ত করিবেন? তিনি কি সংবাদপত্র ও গোয়েন্দা বিভাগীয় মৌলিক রিপোর্ট পড়েন না? আমি বিস্মিত হই, এই ধরনের বিবৃতি দিয়া তিনি সেইসব বৈদেশিক প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের বিভ্রান্ত করিতে চান কিনা যাঁহারা এ দেশে স্বল্পকালের জন্যে আসিয়া মুখ্যতঃ সরকারি উৎস হইতে সংবাদাদি সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

আর একজন মন্ত্রীর বিবৃতি আরও বিপজ্জনক। তিনি উদ্ধতভাবে সজোরে বলিয়াছেন যে, সরকারের ইচ্ছা না থাকিলে, এমনকি যদি ব্যবস্থাপক সভাসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে এই দাবি তোলেও; আর সমস্ত দেশবাসী সেই দাবি মানিয়া সমর্থনও করে, তবুও সরকার এই দাবি মানিয়া লইবেন না। আসলে সরকার যে মনোভাব কয়েকবার ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, কোনো দাবি সার্বজনীন হইলে এবং সে দাবি যতই যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত হোক না কেন, সরকার সে দাবি মানিয়া লইবেন না; কারণ, তাহাতে 'চাপ দেওয়ার কৌশলকে'ই মানিয়া লওয়া হইবে এবং সরকারের মান-মর্যাদার অপূরণীয় ক্ষতি হইবে।

আসলে, দাবি যত প্রবল ও যুক্তিসঙ্গত, সরকারের একগুঁয়েমিও তত প্রবল এবং দমন-নীতিও তত কঠোর হইবে, ইহাই মন্ত্রী সাহেবের প্রতিপাদ্য।

একতার বল

বর্তমানে এই দেশে যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই শাসনতন্ত্রে ব্যক্তিবিশেষেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া যে সব প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, সেইগুলির কোনোই ক্ষমতা বা প্রভাব নাই। গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পূর্বে রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন নিরর্থক। অধিকন্তু, 'এবডো' আইনের ধারা মোতাবিক, 'এবডোর' আওতাভুক্ত রাজনীতিকেরা কোনো রাজনৈতিক দলের পরিচালক বা কর্মচারি হইতে পারিবেন না। এইসব এবডোর আওতাভুক্ত নেতৃবৃন্দের সাহায্য ব্যতিরেকে রাজনৈতিক দল অক্ষম ও নির্জীব হইয়া পড়িবে; এইসব দলের জনসাধারণের ওপর কোনো প্রভাব থাকিবে না সুতরাং তাহারা কোনো উদ্দেশ্যও সাধন করিতে পারিবেন না। রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবিত হইলে জনসভায় দাঁড়াইয়া নানা দল নানা কথা বলার সুযোগ পাইবে এবং ক্ষমতা দখলের জন্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে কারসাজির বিপদও থাকিবে। স্বভাবতই আজিকার বিকল্প ব্যবস্থা ইউনাইটেড ফ্রন্ট; যেখানে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল স্বকীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া কেবল সার্বজনীন লক্ষ্য অর্জনের জন্যে পরস্পর সহযোগিতা করিবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, এহেন মিলন স্থায়ী হয় না; ক্ষমতাসীনদের তোষামোদ, ভীতি ও ষড়যন্ত্রের সংঘাতে এই মিলনে ভাঙ্গনের শঙ্কা থাকে। ক্ষমতাসীনরা একদলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে লেলাইয়া নিজেরা লাভবান হয়। তাই প্রধান সামরিক শাসন পরিচালক রাজনৈতিক দলগুলির পুনরুজ্জীবন চিরতরে নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন কিনা, পুনরুজ্জীবনের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া আমরা এই শাসনতান্ত্রিক বিতর্কের জটিলতা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছি।

বর্তমান পরিকল্পনা

বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবিত হয় নাই। অবশ্য রাজনৈতিক দল বাতিলও হয় নাই। বর্তমান অবস্থায় কেহ একদলকে অন্যদলের বিরুদ্ধে লেলাইতে পারিবে না, যদিও যে দলের প্রতি যাহার আনুগত্য রহিয়াছে, সেই দল বিলুপ্ত

www.pathagar.com

হইলেও তাহার আনুগত্য সেই দলের প্রতি অটল থাকিবে। কিন্তু বর্তমানে যে উদ্দীপনার তরঙ্গ দেখা দিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা মুছিয়া যাইবে এবং এই মহান আদর্শের প্রতি সকলের মনে এক নূতন আনুগত্যের সৃষ্টি হইবে। কে জানে যে, একদিন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক রীতি-পদ্ধতি ও নীতিতে বিশ্বাসী শক্তিসমূহ একই আওতার অন্তর্ভুক্ত হইয়া একটা শক্তিশালী জাতীয় প্রগতিশীল দলে পরিণত হইবে না? দেশের প্রতি কোণে এই দলের শক্তির উৎস থাকিবে এবং সাধারণ লোকের হৃদস্পন্দনে এই দলও স্পন্দিত হইবে।

বস্তুত ইহা একটা সুলক্ষণ যে, দুই-একটা দল যাহারা পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, তাহারাও গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে গণআন্দোলন সমর্থন করিতেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ একতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণের মনে নয়া চেতনা জাগাইয়াছে, জনসাধারণও তাহাদের উদ্দেশ্যের সাফল্য সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতিক্রিয়া

গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দাবিতে সরকারি ছোট-বড় সব মুখপাত্রের প্রতিক্রিয়া কৌতুকপ্রদ। তাহারা একঘেঁয়েভাবে পুনরাবৃত্তি করিতেছে যে, বর্তমান 'সহৃদয় সরকার' কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত নেতৃবৃন্দ আবার ক্ষমতা লাভ করিতে চায় বলিয়াই এই দাবি উত্থিত হইয়াছে। এই কথায় সরকার নিজের পরাজয় স্বীকার করিতেছেন এবং এই নিশ্চয়তাও দিতেছেন যে, সুযোগ দিলে দেশের জনসাধারণ পুরাতন নেতৃবৃন্দকেই ভোট দিয়া ক্ষমতার আসনে বসাইবে। সরকার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে বা নিজের জনপ্রিয়তা যাচাই করিতে সাহস পান না। ইহা স্বাভাবিক যে, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সমর্থক বিভিন্ন দল ও ব্যক্তির মনে সমাজের ভবিষ্যৎ কাঠামো ও রাজনৈতিক কর্মসূচী সম্বন্ধে স্বকীয় মতবাদ বিদ্যমান। এই মতবাদের কয়েকটি সর্ববাদীসম্মত আর কয়েকটি বিতর্কমূলক। তবে এক ব্যাপারে তাঁহারা সম্মত হইয়াছেন যে, সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা এইসব মতবাদের বিবেচনা স্থগিত রাখিবেন।

ইহা সহজেই অনুমেয় যে, রাজনৈতিক দলসমূহের মৌলিক চিন্তাধারা মোতাবিক এমন সব বিভিন্ন প্রশ্ন আছে, যাহা রাষ্ট্রের কল্যাণ এমনকি অস্তিত্বের পক্ষে পর্যন্ত অপরিহার্য। ইহা তাঁহাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার উজ্জ্বল নিদর্শন যে, তাঁহারা তাঁহাদের স্বকীয় মতবাদ সম্বন্ধে চাপ না দিয়া গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র অর্জনের জন্যে একত্রে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছেন। এই কাজে শৃঙ্খলা ও সহনশীলতা আবশ্যক। পুরাতন রাজনৈতিক দলসমূহের উৎসাহী কর্মীবৃন্দকে নিজেদের এবং তাঁহাদের দলের গুরুত্ব প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে হইবে; তাঁহারা যেন অন্যদের শৃঙ্খলা ও সংযমের সুযোগ গ্রহণ না করেন। আশার কথা, দেশের সমস্যাবলী সম্বন্ধে সজাগ বিভিন্ন দলের কর্মীরা নিজেদের ভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন না করিয়া প্রধান উদ্দেশ্য সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

লক্ষ্যভ্রষ্টতার পরিণাম

প্রত্যেকের উপলব্ধি করা উচিত যে, (জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের) নির্ধারিত নীতি হইতে দূরে সরিয়া পড়িলে তাহা বিতর্ক ও বিভ্রান্তি, পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি করিবে। তাহা ছাড়া ইহা হইতে এই ধারণারই সৃষ্টি হইবে যে, আমরা যেন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও জনপ্রিয়তার লড়াইয়েই ব্যস্ত রহিয়াছি। ফলে, দেশব্যাপী আজ যে ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে,

www.pathagar.com

তাহা ব্যাহত হইবে। অথচ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র আদায়ের মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আজ এই ঐক্যের প্রয়োজন সবচাইতে বেশি। আমার মতে, এই লক্ষ্যচ্যুতি জাতীয় দাবির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই শামিল এবং ইহার দ্বারা জনগণকে অহেতুকভাবে হতাশই করা হইবে।

অপরপক্ষে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি এবং দেশ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র লাভ করে ও দেশে সত্যিকার অর্থে আজাদী আসে, তবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ একটি প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদে বসিয়া অবাধ ও প্রাণখোলা আলাপ-আলোচনা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও লেন-দেন, সকল অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশের সম্মুখে আজ যে হাজারও সমস্যা রহিয়াছে, তাহা বিবেচনা এবং তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিবেন। কেবল তাহাই স্থায়ী ও সত্যিকারের জাতীয় ঐক্য বিধান করিতে পারে। সুতরাং আমাদের নিকট একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র অর্জনই সবচাইতে বড় সমস্যা। কারণ, একবার এই সমস্যার সমাধান হইয়া গেলে অপর সকল প্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান আপনা-আপনিই হইয়া যাইবে।

গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দাবি

আমাদের সম্মুখে আজ যে প্রশ্নটি বড় হইয়া দেখা দিয়াছে এবং যাহা মানুষের মনকে অহরহ দোলা দিতেছে তাহা হইলো এই যে, প্রেসিডেন্টকে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে কিভাবে সম্মত করানো যায়। একদিকে আমরা দেখিতে পাই গণজীবনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উৎসাহী, হৃদয়গ্রাহী প্রচণ্ড আলোড়ন। এই আন্দোলন ধ্বংসাত্মক না হইয়া সম্পূর্ণরূপে আইনসম্মত ও গণতান্ত্রিক বিধায় বর্তমান সরকারের মনে ত্বরিত কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না। বস্তুত, যে সকল লোক ক্রমবর্ধমান হতাশা ও নৈরাশ্যের সুযোগে দেশকে বিশৃঙ্খলার মুখে নিক্ষেপ করিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে চাহে এবং যাহারা এখনও আন্দোলনের সাফল্যের অভাবের সুযোগ গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত, আমাদের আন্দোলনের প্রকৃতি ও শক্তিই তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে।

অপরপক্ষে, এমনসব লোক ক্ষমতাসীন, যাহাদের মন মিথ্যা মর্যাদাবোধের অহমিকায় আচ্ছন্ন। ইহারা ক্ষমতার আসন আঁকড়াইয়া থাকার জন্যে যে কোনো বেপরোয়া পন্থা অবলম্বন করিতে বদ্ধপরিকর। ইহারা প্রেসিডেন্টকেও গণদাবি স্বীকার করিতে দিতে রাজি নহেন। কারণ, সে ক্ষেত্রে তাহাদের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটিতে পারে এবং জনগণের আস্থাসম্পন্ন ও জনগণের সমস্যাবলীর সহিত সুপরিচিত ব্যক্তিরা ক্ষমতাসীন হইয়া পড়িতে পারেন। প্রসঙ্গত একটি কথা আসিয়া পড়ে। সরকারপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গ পুনঃ পুনঃ সেই একই অভিযোগ করিয়া বেড়াইতেছেন যে, যাঁহারা গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার দাবি উত্থাপন করিতেছেন, আসলে ক্ষমতাসীন হওয়া ও সরকারের কর্তৃত্ব দখল করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

কিন্তু সরকারপক্ষীয় লোকেরা এ কথা বুঝিতে পারেন না যে, এই ঘোষণার দ্বারা তাঁহারা প্রকারান্তরে এই সত্যই স্বীকার করিয়া লইতেছেন যে, যেই রাজনীতিকদের দুর্নাম, অমর্যাদা ও অপদস্থ করিবার ব্যাপারে তাঁহারা কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করেন নাই, সেই রাজনীতিকরা আজও জনগণের আস্থাভাজন আছেন। বস্তুত, বর্তমান ক্ষমতাসীনদের কৃতিত্ব ও কাজকারবারের নমুনা দেখার পর রাজনীতিকদের প্রতি জনগণের আস্থা পূর্বের যে কোনো

www.pathagar.com

সময়ের চেয়ে এখন বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ক্ষমতাসীন ভদ্রলোকদের একমাত্র লক্ষ্য হইলো, কোনোরকমে ক্ষমতার আসন আঁকড়াইয়া থাকা। অন্যদের যে ক্ষমতাসীন হওয়া ছাড়া অপর কোনো লক্ষ্য থাকিতে পারে, এই ভদ্রলোকরা তাহা চিন্তাও করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা অন্য সবাইকেও একই নিক্তিতে ওজন করিতে অভ্যস্ত।

চিন্তার অধিকারও নাই

জনমতকে নিজেদের দিকে ধাবিত করার জন্যে বহু বিচিত্র প্রচেষ্টা চালানো হইয়াছে। সামরিক আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পরে প্রেসিডেন্ট স্বয়ং বিশেষ ট্রেনের ওপর 'পাক-জমহুরিয়াত' লেবেল আঁটিয়া দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সফর করেন। 'পাক-জমহুরিয়াত' কথাটির অর্থ 'খাঁটি বা পাকিস্তানী গণতন্ত্র'। এই সফরে অসংখ্য সাঙ্গপাঙ্গ, সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার ও টেলিফোনিস্ট এবং সরকারের জনসংযোগ অফিসারদের লইয়া যাওয়া হয়। সুদূর বিদেশ হইতেও সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া রাজকীয় জাঁকজমকের সহিত তাঁহাদের আদর-আপ্যায়ন করা হয়। পক্ষান্তরে, তাঁহারাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সন্তুষ্টি বিধান করেন।

এমন একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী একনায়ক, যিনি সদ্য ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন এবং যিনি অপ্রতিহত কর্তৃত্বসহকারে কথা বলিতে পারেন, তাঁহার এই সফরের তাৎপর্য সহজেই অনুমেয়; কিন্তু ইহার ছাপ বেশি দিন স্থায়ী হইলো না, অল্পকালের মধ্যেই সব ধুইয়া-মুছিয়া গেলো। কারণ, শাসনতন্ত্র বাতিলের ন্যায় গুরুতর কার্য, মানুষের সকল প্রকার স্বাধীনতা হরণ, নিপীড়নমূলক বিধি-ব্যবস্থা, কঠোর সামরিক বিধি-বিধান, বর্বরোচিত শাস্তি (উদাহরণ, শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ ও সামরিক আদালতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অসম্মত হওয়ায় জনৈক ছাত্রকে চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডদান), চিন্তা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ প্রভৃতির বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ হিসেবে জনগণকে কিছুই দেওয়া হয় নাই। সেইজন্যে কিছু সময় যাইতে না যাইতেই তাঁহার (প্রেসিডেন্টের) ব্যক্তিগত গণসংযোগের ছাপ সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া যায়। পরবর্তী ধাপে এমন একশ্রেণীর লোক সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালান হয়, যাঁহারা পদ, ক্ষমতা ও অর্থের বিনিময়ে প্রেসিডেন্ট ও নয়া শাসকদের সমর্থন করিবেন। মৌলিক গণতন্ত্রী সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইহাই। এ সমস্ত বিষয়ে আমি পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করিবো। বলা বাহুল্য, এত করিয়াও মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থাও প্রয়োজনীয় সমর্থন সংগ্রহে ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ, যে জনগণের প্রতিনিধিত্ব ইহাদের করার কথা, সেই জনগণের কোনো আস্থাই ইহাদের প্রতি নাই। তাহাছাড়া এই মৌলিক গণতন্ত্রীদের সংখ্যাগুরু অংশই সীমাহীন কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

একটি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিয়া জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ ও হতাশা, গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার জন্যে অসীম আগ্রহ ও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষ চাপা দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় পরবর্তীকালে এই শাসনতন্ত্র ও ইহার সহিত জড়িত ব্যক্তিদের সমর্থন করার জন্যে একটি রাজনৈতিক দল সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

রাজনীতিতে রাজনীতিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ

আর তাহারই ক্ষেত্র প্রস্তুতের ব্যবস্থা হিসেবে প্রেসিডেন্ট এক অর্ডার জারি করিয়া সমস্ত রাজনৈতিক দল বাতিল ও সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। তিনি

www.pathagar.com

দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করিলেন যে, রাজনীতিই (অন্তত সেই রাজনীতি যাহার সহিত সাধারণ মানুষকে জড়িত করা হয়) দেশের সর্বনাশের মূল। তবে রাষ্ট্রতরী পরিচালনা এবং জনগণকে শাসনতন্ত্র গলাধঃকরণ করাইবার জন্যে যে রাজনীতির প্রয়োজন আছে, তাহা তিনি ঠিকই বুঝিলেন। তিনি সরকারি কর্মচারিদের মাধ্যমে রাজনৈতিক অভিযান শুরু করিলেন এবং এমন সব পন্থা ও পদ্ধতির আশ্রয় নিলেন, কোনো গণতান্ত্রিক সরকার যাহা ঘৃণাভরে বর্জন করিতো। কারণ, সেই সব ঘৃণিত পন্থার আশ্রয় নিলে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে তাঁহারা চিরদিনের জন্যে নির্মূল হইতেন। কিন্তু আমাদের প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক নেতাদের বিভিন্ন প্রকার বিধি-নিষেধের অক্টোপাশে আবদ্ধ করিয়া রাজনৈতিক দল আইন পাস করিয়া রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবনের অনুমতি দিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই আইনে প্রেসিডেন্টকে সমর্থনের জন্যে একটি রাজনৈতিক দল সৃষ্টিরই ব্যবস্থা হইলো। সামরিক শাসনামলের পূর্ববর্তী মুসলিম লীগকে কাউন্সিলের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টাকে বানচাল করিয়া দেওয়া হইলো। একটি রাজনৈতিক সংস্থার প্রধান বাহ্যতঃ স্বাধীন মনে হইলেও তাঁহাকে কিভাবে কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বানের নোটিস প্রত্যাহারে বাধ্য করা হইয়াছিল তাহার করুণ দৃশ্য আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই অপমানজনক ও দৃশ্যত খামখেয়ালী কাজের কৈফিয়ত পর্যন্ত দিবার অবকাশ তাঁহাকে দেওয়া হইলো না।

কারণ যে কি তাহা জানিতে মানুষের বিলম্ব হইলো না। মাত্র কয়েকদিন পরেই রাওয়ালপিন্ডিতে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারি সেক্রেটারিদের এক সভায় করাচীতে মুসলিম লীগের একটি কনভেনশন আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলো। তাহারা ইহার নাম দিলেন মুসলিম লীগওয়ালাদের কনভেনশন। করাচীতে একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হইলেও কেন্দ্রীয় রাজধানী রাওয়ালপিন্ডি হইতেই কয়েক শত ধামাধরা লোকের নামে আমন্ত্রণপত্র ইস্যু করা হইলো এবং ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারদের মাধ্যমে এগুলি বিলির ব্যবস্থা হইলো। প্রতিনিধিদের পূর্ব পাকিস্তানী কোটা পূরণের জন্যে কিছুসংখ্যক বাঙালি কেরানীকেও প্রতিনিধি করা হইলো। কনভেনশন হইয়া গেলো। কিন্তু ইহা যে সরকারি উদ্যোগ-আয়োজনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সরকারকে সমর্থনের উদ্দেশ্যেই যে ইহাদের জোগাড় করা হইয়াছিল তাহাতে কাহারও মনে কোনো সন্দেহ রহিলো না।

সম্মেলন-মঞ্চের শোভাবর্ধনকারী মন্ত্রীবর্গ সম্মেলন ও প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্কহীনতা প্রমাণের যত চেষ্টাই করুন না কেন, উহা তাঁহাদের আসল রূপ গোপন করিতে পারে নাই। কারণ, সংস্থার নামমাত্র কর্মকর্তা না হইলেই যে আসল রূপ চাপা পড়ে, তাহা নহে।

দুই অঙ্কের নাটক

প্রথম গোপন অধিবেশন ও গণবর্জিত প্রকাশ্য অধিবেশনে কি ঘটিয়াছে তাহা অতি সাম্প্রতিক ইতিহাসেরই কথা। মোটামুটিভাবে সমগ্র বিষয়কে দুই অঙ্কের একটি মিলনান্তক নাটক হিসেবে অভিহিত করা যাইতে পারে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত কতিপয় ঘটনা হইতেই কনভেনশনের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সম্মেলনে দুইজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি পরস্পরের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং একে অন্যকে 'সরকারের দালাল' বলিয়া অভিহিত করেন। তৃতীয় একজন কর্মকর্তা তাঁহাদের নিবৃত করিয়া বলেন, 'আসলে এখানে আগত সবাই সরকারের দালাল।' এই সম্মেলন সম্পর্কে কি আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে? আমি

www.pathagar.com

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করিতে চাহি না। কারণ, ঘটনার সহিত জড়িত ব্যক্তিদের নাম সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা হউক, সরকারকে সমর্থনদানের প্রতিশ্রুতিতে সরকার ও উহার শিল্পপতি সমর্থকদের অর্থ ও আনুকূল্যে একটি প্রতিষ্ঠান খাড়া করা হইলো—যাহার নাম দেওয়া হইলো মুসলিম লীগ। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, মর্যাদা, অর্থ ও বাধ্যবাধকতা চিরদিনই এই দলে প্রধান ভূমিকা অভিনয় করিবে। তবে, নিজ সান্ত্বনার জন্যে প্রেসিডেন্টের জানা উচিত যে, ইহা সম্পূর্ণরূপে একটি কৃত্রিম অবয়ব, ইহাতে হাড় আছে মাংস নাই, ইহার প্রতি জনসমর্থন বা আস্থা নাই, ইহার সমস্ত সদস্যই ভুয়া। তাঁহার আরও জানা উচিত যে, সরকারি কর্মচারি ও ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের আয়োজিত মহড়া দ্বারা ইহাকে খাড়া রাখা যাইবে না। বস্তুত, ইহা কোনো রাজনৈতিক দলই নহে, ইহা এমন একটি সৃষ্টি যাহাকে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা জীবন্ত রাখা হইয়াছে মাত্র। বর্তমান শাসকগণ যদি নিজেদের আসন চিরস্থায়ী করার জন্যে এ জাতীয় একটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বকে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের সর্বজনীন দাবি অস্বীকারের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেন এবং উহার ছত্রচ্ছায়ার আশ্রয় নেন, সে ক্ষেত্রে তাহাদিগকে কৃপার পাত্র ছাড়া আর কি বলা যায়।

সরকারি অর্থের অপব্যয়

মাত্র সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মৌলিক গণতন্ত্রীদের এক গোপন সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাহাদিগকে কনভেনশন মুসলিম লীগের সদস্য হইতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সরকারের সমর্থক হিসেবে শীঘ্রই তাহাদিগকে উন্নয়ন ও রিলিফের নামে বিপুল পরিমাণ টাকা দেওয়ার কথা এবং এই টাকা তাহাদিগকে তথাকথিত মহকুমা মুসলিম লীগের কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও সহযোগিতাক্রমে ব্যয় করিতে হইবে—সার্কেল অফিসার ও মহকুমা অফিসারদের নহে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সরকারি অর্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলা ও নীতিবিগর্হিত কাজে সরকারি অর্থ ব্যয়ের ইহার চেয়ে বড় নজির আর কি হইতে পারে? কোনো গণতান্ত্রিক সরকারই সরকারি তহবিলের অর্থ লইয়া এইরূপ জঘন্য ছিনিমিনি খেলা ও রাজনৈতিক ছলচাতুরির সাহস পাইতেন না। প্রেসিডেন্টের প্রতি আমার সবিনয় অনুরোধ—কারণ তাঁহার নামেই সব কিছু চলিতেছে, তিনি যেন ধীরস্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনা করিয়া অনুরূপ নীতিবিগর্হিত কাজ-কর্ম বন্ধ করেন। দেশ সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া কিছুসংখ্যক গণ্যমান্য লোকও এই প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। আমার বিশ্বাস, যখন তাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানের মূল বৈশিষ্ট্য ও কলঙ্ককর উৎপত্তির বিষয় অবহিত হইবেন, তখন তাঁহারা ইহার সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিতে দ্বিধা করিবেন না।

তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে

জনগণকে দলে ভিড়াইবার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এবং সরকার পরিচালনাকারীদের জনপ্রিয়তার অভাব নগ্নভাবে উদঘাটিত হইয়া পড়ায় কতিপয় চমকপ্রদ ও চাঞ্চল্যকর পন্থার আশ্রয় লইতে হয়। তবু, রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে; বরং তাহাদের মানসম্ভ্রম, মর্যাদা ও জনসমর্থন সরকার পক্ষের আক্রমণের অনুপাতেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে পাশ্চাত্য সাহায্য প্রদানের বিষয়টিকে সরকার পক্ষের জন্যে একটি খোদা-প্রদত্ত আশীর্বাদ বলা যাইতে

www.pathagar.com

পারে। বিদ্বেষ, ঘৃণা, ভীতি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং আসন্ন বিপদের ওজর হিসেবে ইহা কাজে লাগান যাইতো। অপরপক্ষে জনগণের স্বার্থের পূজারী যেকোনো সরকার সমগ্র জাতিকে সরকারের পশ্চাতে কাতারবন্দী করিতে পারিতেন। ধনুক বাঁকান হইয়াছিল; কিন্তু অপটু হাতে পড়িয়া তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়।

চীন-ভারত সংঘর্ষ

তাহাদের বিঘোষিত নীতি অনুযায়ীই যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছে। কারণ তাহাদের ও ভারতের মতে ইহা কমুউনিস্ট আক্রমণের মোকাবিলারই নামান্তর। ভারতে সামরিক অস্ত্র সরবরাহের বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। কারণ, চীনের সহিত বিবাদ মিটিবার পর পাশ্চাত্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্য ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারিবে। অপরপক্ষে পাকিস্তানও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অস্ত্রসজ্জিত হইয়া আসিতেছে। তবু ভয় থাকিয়া যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে ভারতে বিপুল অস্ত্র সরবরাহের ফলে উভয় দেশের মধ্যে অস্ত্রসজ্জার অসমতা দেখা দিতে পারে—যাহার ফলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়িবে। কোনো লোকই এই অবস্থাকে নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না। চীন ও ভারতের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করা প্রত্যেক মানবকল্যাণকামী রাষ্ট্রেরই কর্তব্য। অন্যথায় ভারতে অব্যাহতভাবে সমরাস্ত্র সরবরাহের দরুন আন্তর্জাতিক জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং আমাদেরও অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে।

'যদি' এবং 'কিন্তুর' বাহুল্য

এই ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কা 'যদি' এবং 'কিন্তু'-তে ভরপুর। ইহারই সুযোগ গ্রহণ করিয়া সরকার ২২শে নবেম্বর 'পিন্ডিতে জাতীয় পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহবান করিলেন। অথচ ১০ই ডিসেম্বর ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করিয়া পূর্বেই বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইয়াছিল। ঢাকায় আহূত অধিবেশনটি ছিলো সরকারের পক্ষে একটি নাজুক অধিবেশন। কারণ, গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের পক্ষে দেশের উভয় অংশে যে গণবিক্ষোভ দেখা দিয়াছে সদস্যদের ওপর তাহার প্রভাব না পড়িয়া পারে না এবং তাহারা এই গণদাবি অনুমোদন না করিয়া পারিতেন না। সুতরাং রাওয়ালপিন্ডিতে জরুরী অধিবেশন আহবান করতঃ সরকার অত্যন্ত চতুরতার সহিত ঢাকা অধিবেশন এড়াইয়া গেলেন। শুধু তাহাই নহে, এই জরুরী অবস্থার জিগির দ্বারা সরকার গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দাবি চাপা দিয়া সাময়িকভাবে হইলেও জলস্রোত নিজেদের দিকে ধাবিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সমগ্র বিষয়টিই খুব সুন্দর ও সূক্ষ্মভাবে সাজানো গোছানো হইয়াছে। পাকিস্তানের সংবাদপত্র বিশেষ করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রকে বক্তব্য ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। স্বভাবতই পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, ভারতের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অবিরাম প্রচার-অভিযান চলিতে থাকে।

সরকারি উদ্যোগে বিক্ষোভ, শোভাযাত্রা, দোকান-পাট ও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধের ব্যবস্থা হয়। যাহারা দোকানপাট ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখেন প্রকাশ্য দিবালোকে তাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন হয়; দুষ্কার্য সমাধার পূর্ব পর্যন্ত পুলিশও তাহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় নাই। এই বিক্ষোভ ক্রমে ক্রমে চরম আকার ধারণ করে।

www.pathagar.com

জাতীয় পরিষদের গোপন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গেলো। সংবাদপত্রে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত গরম গরম বক্তৃতা ছাপা হইলো। মানুষ হতভম্ব হইয়া পড়িলো। পরিষদের সদস্যদের বক্তৃতা ও সরকারি মুখপাত্রদের বক্তব্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলো। প্রকৃতপক্ষে পূর্বনীতির দ্বিরুক্তিই যদি সরকারের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে জাতীয় পরিষদের বিশেষ অধিবেশনের যৌক্তিকতা কি ছিলো, তাহা ভাবিয়া মানুষ আকুল হইলো। কিন্তু সুকৌশলে যেভাবে সরকার জাতীয় পরিষদের ঢাকা অধিবেশন এড়াইয়া গেলেন এবং গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের মৌলিক গণদাবি হইতে মানুষের দৃষ্টি ভিন্নদিকে ধাবিত করিলেন, তজ্জন্য তাহাদিগকে কৃতিত্ব না দিয়া পারা যায় না। তবে তাহাদের সব গুড়েই বালি পড়িলো। কারণ, নিজেদেরকে জাতীয় স্বার্থের ধারক ও বাহক এবং পাকিস্তানের ত্রাণকর্তা হিসেবে জাহির করিয়া জনগণকে সরকারের পশ্চাতে কাতারবন্দী করার যে মূল উদ্দেশ্য বিশেষ অধিবেশন আহবানের পশ্চাতে কাজ করিয়াছিল, তাহাই ব্যর্থ হইয়া গেলো।

জারিজুরি ধরা পড়িল

একথা সত্য যে, নাগরিকদের জীবন বা জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইলে সকল দেশের সরকারকেই কিছু না কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়; সত্যিকারের জরুরী অবস্থা দেখা দিলে আমাদের সরকারও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি! বৈদেশিক নীতি একটি দ্বি-পক্ষীয় বিষয়। জরুরী অবস্থায় দেশের নেতাদের আস্থায় নেওয়া হয় এবং যাহারা জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করিতে সক্ষম, তাহাদের সহিত পরামর্শ করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে দেশে জাতীয় সরকার কায়েম করা হয়। আমাদের সরকার ইহার কোনোটিই করিলেন না। তাহাছাড়া প্রেসিডেন্টের কর্মসূচি হইতে এ কথাই পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, আসলে কোনোও জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয় নাই এবং জাতীয় পরিষদের বিশেষ অধিবেশন পাকিস্তানের স্বার্থে নহে, বরং সরকারের স্বার্থে আহূত হইয়াছিল। এত চাতুর্য ও উদ্যোগ-আয়োজনের মাধ্যমে সৃষ্ট সুযোগ নষ্ট হওয়ার পর প্রেসিডেন্টের উপলব্ধি করা উচিত যে, গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দাবির তীব্রতা এতটুকুও নষ্ট হয় নাই এবং এত চেষ্টা-চরিত্রের পরও তাঁহার সরকার সামান্য সমর্থনও জনগণের নিকট হইতে লাভ করেন নাই। তিনি যদি আমাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর মোকাবিলা করিতে একান্তই আগ্রহী হন, তাহা হইলে তাঁহার জানা উচিত যে, দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে। তাঁহাকে আজ উপলব্ধি করিতে হইবে যে, দেশবাসীর চোখে-মুখে সমস্যাক্লিষ্টতার যে ছাপ রহিয়াছে তাহা দূর করিবার ব্যাপারে আর বিলম্ব করা চলিবে না।

প্রেসিডেন্টের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, 'জনগণের রায়ের নিকট নতি স্বীকার করুন, কারণ, জনগণের রায়ই শেষ ও চূড়ান্ত কথা।'

জনগণের অভিপ্রায়

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুইটি পরস্পর-বিরোধী শক্তি কাজ করিতেছে। মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইলো পূর্ণ গণতন্ত্র। সংগ্রাম নীতির প্রশ্নে—ব্যক্তিত্বের প্রশ্নে নহে। আসলে ইহাই হওয়া উচিত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, প্রেসিডেন্ট ও তাঁহার গণতন্ত্র বিরোধী মোসাহেবদের শাণিত অস্ত্র গণতন্ত্রের দাবিদার রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

ব্যবহার হইতেছে। রাজনীতিকদের নিন্দাবাদই তাঁহাদের একমাত্র করণীয়। এবড়ো হউক বা না হউক, শ্রেণী নির্বিশেষে সকল রাজনীতিককে তাঁহারা 'ধিকৃত রাজনীতিক' হিসেবেই আখ্যায়িত করিতেছেন এবং প্রচার করা হইতেছে যে, গণতন্ত্রের নামে ক্ষমতা দখল করিয়া ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য। বিকল্প হিসেবে গণতন্ত্রের দাবিদার রাজনীতিকগণকে বিভেদ সৃষ্টিকারী বলিয়াও অপবাদ দেওয়া হয়। জনগণের দৃষ্টি ব্যক্তিগতখাতে প্রবাহিত করার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা (জনগণ) কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ না রাখিয়া একথাই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, 'দেশ একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের আশীর্বাদ লাভ করুক ইহাই তাহাদের অভিপ্রায়'।

পূর্ব পাকিস্তানে তাহারা হাজারে হাজারে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া আন্দোলনের প্রতি নিজেদের পূর্ণ সমর্থন জানাইয়া দিয়াছে। আন্দোলনের সহিত নিজেদের সম্পৃক্ততা প্রমাণের জন্যে তাহারা মাইলের পর মাইল পদব্রজে পথহীন প্রান্তর অতিক্রম করিয়া জনসভায় শরিক হইয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তানেও সরকারি নির্দেশ জারি করিয়া জনসভা নিষিদ্ধকরণ সত্ত্বেও অথবা লাঠিসোঁটায় সুসজ্জিত গুণ্ডাবাহিনী কর্তৃক জনসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলেও জনগণ নিজেদের মনোভাব জানাইতে ছাড়ে নাই। এই সকল গুণ্ডাদল ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পুলিশের রক্ষণাবেক্ষণে বা প্রশ্রয় অথবা উদ্যোগ-আয়োজনে বা সহায়তায় অথবা নির্দেশে কাজ করিয়াছে। অন্যথায় সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণও সন্দেহাতীতভাবে একবাক্যে তাহাদের মনোভাব জানাইয়া দিতো।

সত্যিকারের জাতীয় ঐক্যবোধ

আজাদী অর্জনের পর এইবারই সর্বপ্রথম উভয় অংশের রাজনৈতিক চিন্তাধারা অভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে এবং সত্যিকারের জাতীয় ঐক্যবোধের সূচনা হয়। এই ঐক্য উভয় অংশের মধ্যে চির-অভঙ্গুর সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে পারে। শক্তি ও স্বার্থের পূজারী গুটিকয়েক লোক ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের সকল মতাদর্শের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ বাছিয়া লইয়াছেন। ইহাই হইলো গণতান্ত্রিক শিবিরের চিত্র। এই শিবিরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন প্রেসিডেন্ট নিজে।

কোনো একজন প্রাজ্ঞ-আইনবিদের মতে, 'সাফল্যজনক বিপ্লবের' মাধ্যমে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। অতঃপর প্রেসিডেন্ট হিসেবে অর্ডিন্যান্স মারফত এবং প্রধান সামরিক শাসন পরিচালক হিসেবে মার্শাল ল' রেগুলেশন ও অর্ডার মারফত একক কর্তৃত্বে দেশ শাসন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি জনগণকে শত শত বৎসরের সংগ্রামের ফলে স্বীকৃত ও গড়িয়া-ওঠা সকল প্রকার মানবিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। নিজের খেয়ালখুশি ও মতাদর্শ অনুযায়ী জারিকৃত শাসনতন্ত্র ইতিপূর্বে তৎকর্তৃক কুক্ষিগত ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার হাতিয়ার হিসেবেই কাজ করিয়াছে। ইহা কি সম্ভব যে, সশস্ত্র বাহিনীসমূহের কার্যতঃ সুপ্রীম কম্যান্ডারের পদের ওপর নির্ভর করিয়াই প্রেসিডেন্ট জনগণের রায় অমান্য করিবেন? ইহাও কি সম্ভব যে, নিজ পদে সুরক্ষিত হইয়া তিনি নিজ বিবেকের সামান্য দাবির প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া চলিয়াছেন? এখনও তাঁহার বিবেকের সামান্য যে পীড়নটুকু আছে, উহা নিশ্চয়ই অহরহ একথাই কানে কানে বলিয়া যাইতেছে যে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে

www.pathagar.com

জনগণের প্রতিই তাঁহার কর্তব্য। সুতরাং তিনি জনগণের দাবিকে উপেক্ষা করিতে পারেন না, ঘৃণা করিতে পারেন না, রুখিতেও পারেন না।

বহু নিন্দার পর

প্রেসিডেন্টের বিবেকের যে এখনও সম্পূর্ণরূপে মৃত্যু হয় নাই, তাহার প্রমাণ প্রবঞ্চনা ও দান-দক্ষিণার মাধ্যমে সরকারের প্রতি জনসমর্থন লাভের বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা। অবশ্যই ইহাও ভয়-ভীতি, জবরদস্তিবিমুক্ত নহে। তাঁহাদের জনসমর্থন লাভের এজাতীয় প্রচেষ্টা যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে তাহা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তবে সেই প্রচেষ্টা এখনও চলিতেছে। সর্বশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হইলো প্রেসিডেন্টের প্রকাশ্য রাজনীতিতে প্রবেশের ঘোষণা। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে এবং তাঁহার শাসনতন্ত্র সমর্থনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব করিতে তিনি বিমুখ নহেন। তবে ভিত্তি যত অসার, গাঁথুনি যত কাঁচা ও প্রতিষ্ঠান যত গণধিক্কৃতই হউক না কেন, তিনি উক্ত দলকে তলা হইতে গড়িয়া তোলার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ তিনিই স্বীয় রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের সময় সৈনিক-জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দ্ব্যর্থহীনভাবে রাজনৈতিক দলের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য রাজনৈতিক দল বর্জনের চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন এবং সমাজের সেই সকল পেশাদার ব্যক্তি, যাহাদিগকে সব সময় কৃপা বিতরণকারী কোনো সরকারের সমর্থনের কাজেই কেবল লাগানো যায়, তাহাদিগকে লইয়া একটি রাজনৈতিক দল খাড়া করার জন্যে দেশের সমস্ত সম্পদ কাজে লাগান হইবে। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্রের আওয়াজ সবচেয়ে বেশি বুলন্দ। ইহার মোকাবিলা করিতে হইবে। তাই শীঘ্রই প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসিতেছেন। খবরে প্রকাশ (অবশ্য ইহা গুজব বা অসত্যও হইতে পারে) যে, ৪০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীকে একত্রিত করার ব্যবস্থা হইয়াছে, আরও ১০ হাজার লোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে এবং প্রেসিডেন্টের প্রত্যেকটি পরিদর্শনস্থলে সরকারের প্রতি সমর্থনের মহড়া প্রদর্শনের জন্যে বিপুলসংখ্যক আনসার মোতায়েনের উদ্দেশ্যে প্রদেশব্যাপী বিপুল পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। সম্ভবত ইহারাই কনভেনশন লীগ নামে পরিচিত প্রেসিডেন্টের দলের শাঁস হিসেবে কাজ করিবে।

এই প্রদর্শনীর সফলতার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাক।

কাহার টাকা ?

একথা সত্য যে, এই বাহুল্য ব্যয় নিশ্চিতভাবে সরকারি তহবিল হইতেই নির্বাহ হইতেছে। সুতরাং অনাহারক্লিষ্ট ও শত দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত জনগণ যে ইহার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে তাহা অবধারিত। তাহাছাড়া জনগণের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্যে যে অর্থ পাওয়া যাইবে প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নগণ্য। এমতাবস্থায় এতসব জলুস ও জাঁকজমকপূর্ণ কাজ যে মানুষের মনে কোনো শুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারিবে না, তাহা জানা কথা। আমরা জানি, গভর্নর হইতে শুরু করিয়া সর্বনিম্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মচারি পর্যন্ত সকলকে জোরজবরদস্তি করিয়া কনভেনশন লীগে লোক ভিড়াইবার অপ্রীতিকর কাজে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

www.pathagar.com

আমিই তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছি

আসন্ন মৌলিক গণতন্ত্রীদের সমাবেশে হয়তো-বা গুরুগম্ভীর স্বরে বলা হইবে ঃ 'আমিই তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছি। আমার ইচ্ছা না হইলে তোমাদের সৃষ্টি হইতো না। আমার সামনে নত হও ও আমাকে মান্য করো ; কারণ আমিই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু তোমরা গণতন্ত্ররূপ বৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল খাইতে পারিবে না; যদি তাহা করো, তাহা হইলে আমি তোমাদের স্বর্গ হইতে বিদায় দিবো—যে স্বর্গ আমি তোমাদের জন্যেই তৈয়ার করিয়াছি। 'এস্' নামক সেই সর্প হইতে সাবধান থাকো এবং যাহারা তাহার সহিত আমাদের পবিত্রভূমি চষিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের হইতেও সাবধান থাক।'

সুতরাং পুণ্য জামাতের বেচারা মৌলিক গণতন্ত্রীরা 'স্রষ্টার স্তব' গান এবং 'প্রশংসাগীতি' শুরু করিয়া দিবে। কথা হইলো, এই মহড়া দ্বারা এছাড়া কি আর কোনো ফায়দা উঠানো যাইবে? বর্তমান সরকার যে সকল ব্যবস্থার জন্ম দিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রেণীগতভাবে মৌলিক গণতন্ত্রীরাই বোধহয় সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তাহীন। আমি জানি, মৌলিক গণতন্ত্রী এবং চেয়ারম্যানদের মধ্যে এমন বহু লোক আছেন, যাঁহারা সত্যই ভালো ও সৎলোক। তাঁহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যককে দেশের স্বার্থে উৎসর্গীকৃত প্রাণও বলা যাইতে পারে। কিন্তু শ্রেণী হিসেবে তাঁহারা অযোগ্য ও নৈতিকতা-বিরোধী প্রমাণিত হইয়াছেন।

আমার মতে প্রেসিডেন্টের সেই সকল উপদেষ্টা—যাঁহারা নিজেদের সুরক্ষিত গবেষণাগারে বসিয়া পরিকল্পনা রচনা করেন—পুনরায় তাঁহাকে বিপথগামী করিতেছেন। আমি মনে করি, এই সর্বশেষ অপপ্রচেষ্টা বিক্ষুব্ধ-তরঙ্গের মুখে তৃণখণ্ডেরই সমতুল্য হইবে। ইহাতে প্রেসিডেন্টের পক্ষে কোনোও সমর্থন মিলিবে না।

অখণ্ডনীয় যুক্তিতর্ক ও তথ্যের মাধ্যমে আমি ওপরে পরিস্থিতির যে বিশ্লেষণ করিয়াছি উহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রেসিডেন্ট সর্বাধিনায়কের পদ ছাড়া আর কোন্ দুর্ভেদ্য দুর্গের ওপর ভর করিয়া দাঁড়াইবেন?

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে একটি মানবদরদী মহৎপ্রাণের সংগ্রাম-কাহিনী

সিরাজুদ্দীন হোসেন

দেশ বিভাগের প্রাক্কালে যে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মত্ততা দেখা দিয়েছিল, দেশ বিভাগের পরে তখনও তার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়নি। সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া দুই দেশে জীবন নিয়ে হোলি খেলার নির্মম অভিশাপমুখর উৎসবকে কোন্ পশুমানসিকতায় গ্রহণ করা হয়েছিল, দুঃস্থ, নিরাশ্রয়, আত্মীয়-স্বজনহারা, অসহায় মানবিকতার কাতর হাহাকারে দেশের আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল, কোন্ উন্মাদনা, কোন্ ধর্মবোধ সেদিন মনুষ্যত্বের অবমাননায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, সে অনেকেরই অজানা। মনুষ্যত্ব ও ধর্মের প্রধান শর্ত—শান্তি এবং সর্ব অর্থেই যে শান্তি, তাকে ভুলে গিয়েছিল মানুষ। কিন্তু এই ভুলে যাওয়া সত্যকে পুনর্জাগ্রত ও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার মহান ব্রত নেবার মতো মহৎপ্রাণ মানুষের অভাব ঘটে না কোনোদিন। হয়তো তাঁরা সংখ্যায় বেশি নন। কিন্তু যেহেতু তাঁদের বোধ ও চেতনা চিরন্তন সত্যবহ, তাঁরাই হন জয়ী।

বিভাগোত্তরকালের সেই নিদারুণ দুর্দিনে অসহায় মানবতার সেবক শহীদ সোহরাওয়ার্দী আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চালিয়েছেন শান্তি-অভিযান, দুঃস্থ মানুষকে দিয়েছেন সাদর সান্ত্বনা, তাদের দুঃখ-শোকে হয়েছেন মুহ্যমান, জানিয়েছেন উদার সমবেদনা, প্রচার করেছেন প্রেম, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির আদর্শ।

কিন্তু কেন এই শান্তি-অভিযান?

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা শুধু পাকিস্তানী মুসলমানের জন্যেই নয়; ভারতে যে সব মুসলমান রয়ে গেছে, তাদের জন্যেও। কারণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব যদি দূরীভূত না করা যায়, তবে ভারতীয় মুসলমানের নিরাপত্তা কোনোদিন আসবে না। পাকিস্তানী হিন্দুদের নিরাপত্তার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিয়ে ভারতীয় মুসলমানের নিরাপত্তার দায়িত্ব পাকিস্তানকেই নিতে হবে। আর এজন্যেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ভারতীয় মুসলমানের নিরাপত্তার কারণে ভারতে থাকতে হয়েছিল।

কিন্তু 'সব পথ জেরুজালেমের দিকে' গেলেও, সব মহৎ ইচ্ছা তার পূর্ণতা পায় না; ইচ্ছা পূরণে মানুষের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে। মহৎ ইচ্ছার পরাজয় ঘটে তখনি, যখন অমহানই প্রবল প্রভাবে বিরাজ করে। আর তাই তাঁরই এককালের অনুগৃহীত জন হঠাৎ সুযোগের নেতৃত্ব হারাবার ভয়ে পূর্ববাংলায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর শান্তি-অভিযানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

সে ১৯৪৮ সালের কথা

শহীদ সোহরাওয়ার্দী হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রয়োজনে শান্তি-অভিযানে পূর্ববাংলায় এলে তৎকালীন সরকার তাঁকে পূর্ববঙ্গ নিরাপত্তা আইনে (১৯৪৮) আটক করার নির্দেশ

www.pathagar.com

দেন। যাঁরা এই নির্দেশ দানে ছিলেন অগ্রবর্তী, তাঁদের অনেকেই প্রাক-বিভাগ যুগে ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর অনুগ্রহপ্রার্থী। ইতিহাস সাক্ষী—সে সব নির্দেশদাতার একজন ১৯৩৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর নিজ জমিদারি এলাকা থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে চব্বিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হলে সোহরাওয়ার্দী তাঁর দু'টি কেন্দ্রের একটি (বালুরঘাট) থেকে পরাজিত প্রার্থীকে জয়ী হয়ে দেশ সেবার সুযোগ দান করেন। দেশ বিভাগের পর এই অনুগৃহীত জনই জনাব সোহরাওয়ার্দীর সেই মহৎ মানবতার কর্মকীর্তিকে রাজনৈতিক রঙে কলুষিত করে পূর্ববঙ্গ থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত করেন।

সেদিনের শান্তি-অভিযান ব্যর্থ করার জন্যে তৎকালীন সরকার যে হীন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং সোহরাওয়ার্দীর প্রতি যে অভিযোগ এনেছিলেন, তা যে কত মিথ্যা ও স্বার্থপ্রণোদিত, তার পরিচয় মিলবে সে সময়ের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি ও জনাব সোহরাওয়ার্দীর জবাবে। আসলে তৎকালীন সরকার ও নেতৃবৃন্দ সত্যকে জানেননি, শুদ্ধ দলিলের চুক্তি ও হৃদয়-বিশ্বাসের পার্থক্য বোঝেননি। তাই, শান্তি-মিশনে পূর্ববঙ্গে এসে পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টাকে সেদিন ফিরে যেতে হয়েছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে।

জনাব সোহরাওয়ার্দী সেদিন (আজাদ, ৬ই জুন, ১৯৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) তাঁর কলকাতার বাসভবনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ববঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর পত্রের ও পূর্ববঙ্গ সরকারের ইশতেহারের যে জবাব দিয়েছিলেন, তার গুরুত্ব অপরিসীম; এবং আজো এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও তার প্রয়োজন আদৌ শেষ হয়নি। তাই সেদিনের দৈনিক 'আজাদ'-এর সংশ্লিষ্ট সংবাদের অংশবিশেষের একটি ফটোব্লক ও 'আজাদ' এবং 'ইত্তেহাদ'-এর কয়েকদিনের সংশ্লিষ্ট সংবাদগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো। বলা বাহুল্য, ১৯২১ সালে রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের পর থেকে যিনি জীবনে কোনো নির্বাচনে পরাজয় বরণ করেননি, যিনি সে আমলে বাংলার রাজনীতিতে প্রতি ক্ষেত্রেই ছিলেন মুসলিম নেতৃবৃন্দের সর্বাগ্রে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যাঁর দান ছিলো অনন্যসাধারণ, বিভাগোত্তরকালে সেই মহান নেতাকে পদে পদে—বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে দেশবাসী জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় এবং যে অসীম মনোবল নিয়ে তিনি সেসবের মোকাবিলা করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তা ছিলো প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে একটি মানবদরদী মহৎপ্রাণেরই সংগ্রাম-কাহিনী।

'রূপোর চামচ' মুখে নিয়ে যাঁর জন্ম, সেই জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯২০ সালে লণ্ডন থেকে দেশে ফেরার পর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশ ও দেশবাসীকে যে কত ভালোবেসেছিলেন, আর সেই ভালোবাসার প্রতিদানে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে গণ-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতে মাঝে মাঝে তাঁকে যে কত বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছে, সে এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। প্রতিপক্ষের শাঠ্য ও ষড়যন্ত্রের ফলে জীবনের ওপর দিয়ে তাঁর বহু বিপর্যয় বয়ে গেছে সত্য; কিন্তু সব বিপর্যয় ছাপিয়ে প্রতি পর্যায়েই ফুটে উঠেছে জনাব সোহরাওয়ার্দীর মানবদরদী, অকুতোভয় এক মোহনীয় মূর্তি—রাজনীতি বা দেশ সেবার ইতিহাসে সে মূর্তি বিরল।

বস্তুত, ১৯২০ সালে স্বদেশের মাটিতে পর্দাপণের পর থেকেই জনাব সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। আইনজীবী হিসেবে বারে যোগদানের পাশাপাশি ঐ সময় থেকেই

www.pathagar.com

তিনি আত্মনিয়োগ করেন মানবতার সেবায়। তাই দেখা যায়, তরুণ ব্যারিস্টার জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ওপরতলার মানুষের সান্নিধ্যের চেয়ে সমাজের অবহেলিত, উপেক্ষিত মানুষের সান্নিধ্যকেই বেশি পছন্দ করেছেন। সেদিনের সোহরাওয়ার্দীকে যারা দেখেছেন তাঁরা তাঁকে যতটা না দেখেছেন তাঁর চেম্বারে—তার চেয়ে বেশি দেখেছেন শ্রমিকদের মহলে, কলকাতার অলিতে-গলিতে-বস্তির নোংরা পরিবেশে বা শহরের নির্জন কোনো কোণে নিঃস্ব নিঃসম্বল মানুষের মাঝে, তাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্নে আলাপ-আলোচনায় মশগুল থাকতে। সে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই দেখা গিয়েছে, কী এক গভীর চিন্তায় যেন তিনি বিভোর! দূর-গগনে দৃষ্টি বিস্ফারিত করে কি যেন তিনি ভাবছেন, কি এক জটিল প্রশ্নের যেন সমাধান খুঁজছেন। কপালের কুঞ্চিত রেখায় ফুটে উঠেছে তাঁর তন্ময়তার চিহ্ন। পরক্ষণেই আবার দেখা গিয়েছে, সে চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে চোখে-মুখে তাঁর ফুঠে উঠেছে প্রসন্নতার আমেজ। যে সমস্যার তিনি সমাধান খুঁজছিলেন, এতক্ষণে তার যেন তিনি নাগাল পেয়েছেন। বস্তুত, কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, সমাজের নিচতলার মানুষের যে সেবা তিনি করতে চেয়েছেন, নানাবিধ সংস্কারমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে সত্যিই তিনি তা করতে সক্ষম হয়েছেন।

বস্তুত, রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে যে ভঙিতে চিন্তা করতে দেখা যেতো, পরবর্তী জীবনেরও দেশ ও দেশবাসীর ভাগ্যচিন্তায় সেই একই ভঙিতে তাঁকে চিন্তায় মশগুল দেখা গিয়েছে। বৈঠকী আলোচনায় সারা কক্ষ যখন সরগরম, জনাব সোহরাওয়ার্দীকে তার মধ্যেও তাঁর চিন্তার অবসর করে নিতে দেখা গিয়েছে। শত সোরগোলেও তাঁর সে চিন্তার রজ্জু ছিন্ন হয়নি।

সেদিন সমাজের নিচতলার মানুষকে কেন্দ্র করে তাঁর যে রাজনৈতিক জীবনের শুরু, বস্তুত তাকেই মূলধন করে পর বছরই জনাব সোহরাওয়ার্দী ঝাঁপিয়ে পড়েন রাজনীতির বৃহত্তর অঙ্গনে। ১৯২১ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে সেদিন পার্লামেন্টারি ক্ষেত্রে তাঁর যে জয়যাত্রা শুরু হয়, বলা বাহুল্য, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে জয়যাত্রা তাঁর অব্যাহত থাকে। জীবনের কোনো নির্বাচনে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়নি। হয়নি এ জন্যেই যে, দেশবাসীকে তিনি যেমন ভালোবেসেছিলেন, দেশবাসীও তাঁকে ততোধিক ভালোবেসেছিল।

পাকিস্তান আন্দোলন পর্যায়ের রাজনীতিতে তদানীন্তন মুসলিম লীগ হাই কম্যাণ্ড বলতে অন্যদের বুঝালেও প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯২১ সাল থেকেই বাংলাদেশে মুসলিম নেতা হিসেবে জনাব সোহরাওয়ার্দীকেই দেখা গিয়েছে সব আন্দোলনের পুরোভাগে। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই তদানীন্তন মুসলিম ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহরের তিনি ছিলেন ভাবশিষ্য। ১৯৩০ সালে মওলানা মোহাম্মদ আলীর ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রতিটি পদক্ষেপই ছিলো মওলানার আশীর্বাদধন্য।

অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ১৯২১ সাল থেকেই জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন মুসলিম বাংলার রাজনীতির পুরোধা। তখন থেকেই মুসলিম সমাজের খেদমতে তাঁর ভূমিকা ছিলো অনন্য। তাই দেখা যায়, ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে একযোগে কাজ করে হিন্দু-মুসলিম চুক্তির মাধ্যমে সর্বপ্রথম তিনিই বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার

www.pathagar.com

স্বীকৃতি আদায় করেন। কংগ্রেসের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশবন্ধু ও সোহরাওয়ার্দীর যুগ্ম নেতৃত্ব সেদিন প্রতিষ্ঠা পায়। তারপর ১৯২৭ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির রজ্জু ছিন্ন হয়। নানা স্থানে দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেদিন বিশেষ করে কলকাতার বুকে অসহায় মুসলমানদের বাঁচাতে গিয়ে নিজ জীবন বিপন্ন করে যাঁকে ঝড়ের বেগে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরতে দেখা গিয়েছে, তিনি ছিলেন জনাব সোহরাওয়ার্দী। ঐবছরই রাষ্ট্র-জীবনে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সিমলায় যে সম্মেলন হয়, তাতেও মুসলিম বাংলার নেতৃত্ব দেন জনাব সোহরাওয়ার্দী। পর বছর ১৯২৮ সালে বেঙ্গল মুসলিম কনফারেন্সে, নেহরু রিপোর্টের বিরোধিতায়, নিখিল ভারত খেলাফত সম্মেলনে, দিল্লির নিখিল ভারত সর্বদলীয় মুসলিম কনফারেন্সে মুসলিম বাংলার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে যিনি নেতৃত্ব দেন, তিনিও ছিলেন জনাব সোহরাওয়ার্দী।

আবার, ১৯৩১ সালে তাঁকে দেখা যায় বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত মুসলিম স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে আর ১৯৩২ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্সে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে। ১৯৩৫-৩৬ সালের খিলাফত কনফারেন্স, তবলীগ ও সিরাত কনফারেন্স, স্বেচ্ছাসেবক কনফারেন্স, আখড়া ও শরীরচর্চা সম্মেলন, কর্পোরেশন বর্জন আন্দোলন—সবই ছিলো জনাব সোহরাওয়ার্দীর আয়োজিত।

বলা বাহুল্য, নিখিল ভারত কংগ্রেসের কারসাজি জনাব সোহরাওয়ার্দী যতখানি উপলব্ধি করেছিলেন, আর কোনো মুসলিম নেতাই তা করেননি। এ কারণে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো প্রশ্নে আপোষের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তাই নবপ্রবর্তিত ভারত শাসন আইন অনুযায়ী দেশে যখন নির্বাচন প্রস্তুতির প্রশ্ন দেখা দেয়, জনাব সোহরাওয়ার্দী তখন বেঙ্গল মুসলিম ইউনাইটেড পার্টি গঠন করেন। এর কিছুদিন পর ১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগ নেতা হিসেবে জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কলকাতায় আসেন। তদানীন্তন বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ যে কোনো আন্দোলনের ব্যাপারে মুসলিম বাংলায় সোহরাওয়ার্দী নেতৃত্বের গুরুত্বের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে জিন্নাহ সাহেব তা স্বীকার করেন এবং জনাব সোহরাওয়ার্দীকে মুসলিম লীগে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। তৎকালীন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য সর্বভারতীয় একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে জনাব সোহরাওয়ার্দী লীগে যোগদানে সম্মত হন। তবে তার আগে তিনি জিন্নাহ সাহেবের কাছ থেকে মুসলিম স্বার্থের প্রশ্নে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো পর্যায়েই আপোষ না করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন। অতঃপর বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করে তিনি নির্বাচনী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নির্বাচনের পর হক সাহেবের নেতৃত্বে লীগ-কৃষক-প্রজা কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দী সে মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য হিসেবে শ্রমিকদের জন্যে যে সব সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করেন, উত্তরকালে তা-ই তাদের সর্বতোমুখী স্বার্থ সংরক্ষণ করে এসেছে।

১৯৪০ সালে গঠিত শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা যুদ্ধকালীন জরুরী পরিস্থিতির মোকাবিলায় ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৪৩ সালে নাজিম-মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সে মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য হিসেবে জনাব সোহরাওয়ার্দী কী অপরিসীম মনোবল ও কর্মদক্ষতার মধ্য দিয়ে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' থেকে বাংলার লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে বাঁচান, তার ইতিহাস কারও অজানা নয়।

www.pathagar.com

এরপর ১৯৪৬ সাল। স্বাধীনতা আন্দোলনের চরমতম মুহূর্ত। এই একটি বছরে সমগ্র মুসলিম ভারত যে কঠোরতম পরীক্ষার মুখে নিক্ষিপ্ত হয়, বলতে গেলে, সে পরীক্ষায় জয়ী হওয়ার সর্বোচ্চ কৃতিত্ব এই একটি মানুষেরই প্রাপ্য। সেদিন মুসলিম বাংলার অপরাপর নেতার কেউ মধুপুরে, কেউ হায়দরাবাদে, আবার কেউ দিল্লিতে গিয়ে যখন নিরুপদ্রব জীবন যাপনে ব্যস্ত, তখন অকুতোভয় এই একটিমাত্র মানুষই তাঁর বিপুল কর্মীবাহিনী নিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে পাকিস্তানের বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য কি অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন, আর সারা উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই কিভাবে মুসলিম লীগ ক্ষমতার আসনে এসে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তান কায়েমের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করে, তা কারও অজানা নেই।

এরপর বিজয়ী বীরের বেশে নবনির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের নিয়ে স্পেশাল ট্রেনযোগে ৭ই এপ্রিল জনাব সোহরাওয়ার্দী দিল্লিতে পৌঁছলে যে দৃশ্যের অবতারণা হয় তা বিস্মৃত হবার নয়। দিল্লির এই সম্মেলনে পাকিস্তান দাবির সুস্পষ্ট রূপরেখার ওপর আনুষ্ঠানিকভাবে জনাব সোহরাওয়ার্দী যে প্রস্তাব পেশ করেন এবং সে প্রস্তাবের সমর্থনে সেদিন তিনি যে বক্তৃতা করেন প্রকৃত প্রস্তাবে তাই দেশ বিভাগের মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলিম ভারতের দিগদর্শনে পরিণত হয়।

অতঃপর বৃটিশ সরকার মুসলিম-ভারতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে কংগ্রেসের হাতে অন্তর্বর্তী ক্ষমতা সমর্পণ করায় মুসলিম-ভারত ক্ষুব্ধ হয়। ইত্যবসরে, মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ দিবসকে' কেন্দ্র করে সারা দেশে—বিশেষ করে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বলে ওঠে। জনাব সোহরাওয়ার্দী তখন একদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন প্রশমিত করে বিপন্ন মানবতার উদ্ধার সাধনে ও অন্যদিকে কায়েদে আজম ও লর্ড ওয়াভেলের মধ্যে দৌত্যের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বলা বাহুল্য, এই উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে জয়ী হন। অবশেষে বৃটিশ সরকার মুসলিম ভারতের দাবি মেনে নেয়ায় ঐ বছর ১৫ই অক্টোবরে মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন বৃটিশ সরকার ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বস্তুত সেদিনের 'শেষ রক্ষার' সবটুকু কৃতিত্বই ছিলো জনাব সোহরাওয়ার্দীর।

তারপর, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট স্বাধীন পাকিস্তান ও স্বাধীন ভারতের জন্ম হয়। করাচী ও দিল্লিতে দুই নয়া রাষ্ট্রের কর্ণধার শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু সবকিছুর মূলে বলতে গেলে যে ব্যক্তির দান ছিলো এরকম সর্বাধিক, তিনি তখন দাঙ্গা উপদ্রুত কলকাতার অলিতে-গলিতে ঘুরে বিপন্ন মুসলমানদের উদ্ধার সাধনে রত। কারণ, তিনি তখন ভারতের মুসলমানদের অসহায় অবস্থায় ফেলে পাকিস্তানে আসতে চাননি। কলকাতাকে কর্মকেন্দ্র করে যাদের সেবায় আজীবন তিনি আত্মনিয়োগ করে এসেছেন, তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান না করে তিনি পাকিস্তানে আসবেন কোনো প্রাণে? পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা হিসেবে মনেপ্রাণে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কেবল পাকিস্তানের মুসলমানদের নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের ১০ কোটি মুসলমানের নিরাপত্তার রক্ষাকবচ হিসেবেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এই বিশ্বাসে বলীয়ান হয়েই নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথায় জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি কলকাতাতেই থেকে যান। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ভারতের দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় ঘুরে

www.pathagar.com

ঘুরে বিপন্ন মানবতার সেবায় নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দেন। জীবনের ওপর কত বড় ঝুঁকি নিয়ে তিনি হাসিমুখে সে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, পরবর্তীকালে এখানে-সেখানে তাঁর প্রাণ হরণের ষড়যন্ত্র থেকেই তা বোঝা যায়।

প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম বাংলা তথা মুসলিম ভারতের রাজনীতিতে এই যাঁর ভূমিকা, জনসেবার ইতিহাসে এই যাঁর অবদান, বিভাগোত্তর যুগে রাজনীতির বিচিত্র পটভূমিতে পাকিস্তানের তদানীন্তন স্বার্থসর্বস্ব জননেতারা ইচ্ছে করেই তাঁকে ভালো চোখে দেখতে চাননি। দেশবাসীর ওপর জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রভাবের কথা চিন্তা করে তাঁরা সবাই সোহরাওয়ার্দীর নামে যেন আঁতকে ওঠেন। তাই দেখা যায়, বিভাগোত্তরকালে দুই দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে শান্তি-মিশনে ঢাকা আসলে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ সরকার জনাব সোহরাওয়ার্দীকে জননিরাপত্তা আইনবলে আটক করেন এবং তাঁর পূর্ববঙ্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে তাঁকে কলকাতায় ফেরত পাঠান। একদিন যাঁরা ছিলেন তাঁরই অনুগ্রহপ্রার্থী, তাঁরাই তাঁকে সেদিন পূর্ববঙ্গ থেকে বহিষ্কৃত করলেন; এর চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে!

বস্তুত সেই থেকেই শুরু হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে দূরে রাখার সর্বপ্রযত্ন প্রচেষ্টা। নিয়মতান্ত্রিকতার মস্তকে পদাঘাত করে একের পর এক কিভাবে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চালানো হয়, আর প্রতিটি পর্যায়েই প্রতিপক্ষের শত ভ্রূকুটি, কুৎসা ও বিধি-নিষেধকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে কিভাবে তিনি নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামে শরীক হয়েছেন, তা এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। এ কেবল সম্ভব ছিলো জনাব সোহরাওয়ার্দীতেই।

১৯৪৯ সালে নিঃস্ব নিঃসম্বল অবস্থায় করাচীতে আসার প্রাক্কাল থেকেই তদানীন্তন ক্ষমতাসীন সরকার পদে পদে স্বেচ্ছাচারিতার উলঙ্গ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু করেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। পাকিস্তানের জন্ম অবধি তার শাসনযন্ত্র যে কায়েমী স্বার্থের বাহনে পরিণত হয়, সে কায়েমী স্বার্থ জনাব সোহরাওয়ার্দীকে চিরদিনই ভীতির চোখে দেখে এসেছেন।

এ কারণেই দেখা যায়, ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানে আগমনের প্রাক্কালেই তদানীন্তন সরকার তাঁর গণপরিষদের সদস্যপদটি ছিনিয়ে নিলেন। স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থার অধীনে গণজীবন যখন পদে পদে পর্যুদস্ত, তখন দেশ ও দেশবাসীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে জনাব সোহরাওয়ার্দী স্বভাবতই মুষড়ে পড়েন। তিনি জানতেন নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী আন্দোলন গড়ে না তুললে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের ঘরে ঘরে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বাণী পৌঁছে দেয়ার ব্রত নিলেন। সোহরাওয়ার্দী নেতৃত্বের স্বভাবজ বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণও এমনভাবে তাঁর পেছনে কাতারবন্দী হলো যে, পাকিস্তানের দু' অংশের মধ্যে তিনিই যে একমাত্র যোগসূত্র, তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। ক্ষমতাসীন চক্র এতে প্রমাদ গুনলেন। শুরু হল সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযান। গণমন কলুষিত করার জন্য কুৎসা প্রচারের মাত্রা এমনই বেড়ে গেল যে, পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাকে 'ভারতের লেলিয়ে দেয়া কুত্তা', 'ছের কুচাল দেঙ্গে'

www.pathagar.com

প্রভৃতি বিশ্লেষণ ও হুমকিও শুনতে হলো। এত বড় কুৎসা ও হুমকির মুখে সোহরাওয়ার্দী কিন্তু নির্বিকার! কুৎসার মাধ্যমে কুৎসার জবাব দেয়া ছিলো সোহরাওয়ার্দী চরিত্রের খেলাপ। তাই প্রতিপক্ষের প্রতি আঘাত হানলেন তিনি কেবল নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে।

১৯৪৯ সালের মধ্যভাগে জনাব সোহরাওয়ার্দী প্রথমে জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ ও পরে পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশজোড়া নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পরে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের বিগত ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নির্বাচনী অভিযানের প্রধান অধিনায়ক হিসেবে গণমনে তিনি যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন, তার পরিচয় ইতিহাসের পাতায়। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে, ৯টি আসনের বেশি একটি আসনেও তাঁরা জয়ী হতে পারবে না বলে নির্বাচনের প্রাক্কালে যে ঘোষণা তিনি করেছিলেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়। নির্বাচন-যুদ্ধ পরিচালনাজনিত পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে। চিকিৎসার জন্যে তাঁকে পাড়ি জমাতে হয় সুদূর জুরিখে।

জনাব সোহরাওয়ার্দী যখন বাইরে, তখন এক মাহেন্দ্রক্ষণে তদানীন্তন রাষ্ট্রপ্রধান এক কলমের খোঁচায় গণপরিষদ ভেঙ্গে দেন। ফলে দেশের এক চরম শাসনতান্ত্রিক সংকট দেখা দেয়। সে সংকট থেকে দেশকে উদ্ধার করে পূর্ণ গণতান্ত্রিক কাঠামো ফিরিয়ে আনার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতিতে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে জুরিখ থেকে দেশে আনা হয়। দেশের বৃহত্তর মঙ্গলচিন্তাই যাঁর জীবনের ব্রত, সম্মানের প্রশ্ন তাঁর চলার পথে বাধা হতে পারে না। তাই দেশে গণতন্ত্র প্রবর্তনের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পেয়ে আইনমন্ত্রী হিসেবে তিনি মোহাম্মদ আলী মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। কিন্তু ওপরতলার কর্তাব্যক্তিরা সে প্রতিশ্রুতির মর্যাদা দেয়ার আর প্রয়োজন মনে করেননি।

পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৫৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করার পর জনাব সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী পদে বরিত হন। ১২ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণের পরক্ষণেই করাচী বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি তাঁর প্রথম কর্তব্য হিসেবে দেশে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থাপনার ওয়াদা দেন এবং নির্বাচনের প্রস্তুতিও চলতে থাকে। প্রথম সুযোগেই তিনি নির্বাচনপ্রথার ওপর সব বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে যুক্ত নির্বাচন প্রথা অনুমোদিত করান। সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি দেখে কায়েমী স্বার্থী মহল আতঙ্কিত হন। ফলে শুরু হয় আবার 'প্রাসাদ চক্রান্ত'। এক বছরের স্বল্প পরিসরে আন্তর্জাতিক বিশ্বে জনাব সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানকে যেমন পরিচিত করেছিলেন, পূর্ববর্তী কোনো সরকারের আমলেই তা সম্ভব হয়নি। তদুপরি দেশের দুই অংশের মধ্যে সম্প্রীতি ও সমঝোতার যে সম্পর্ক সেদিন গড়ে ওঠে, তাও অনন্যসাধারণ। এতসব সত্ত্বেও সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি থেকে জনাব সোহরাওয়ার্দী পিছিয়ে আসতে রাজি না হওয়ায় তদানীন্তন রাষ্ট্রপ্রধান মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জার 'অভিপ্রায় অনুসারে' ১৯৫৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তাঁকে ক্ষমতার আসন থেকে নেমে আসতে হয়। পার্লামেন্টে নিজ সরকারের প্রতি আস্থা ভোট অর্জনের সংকল্প প্রকাশ করলেও তাঁর সে সংকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়। তারপর মাত্র দু'মাসের জন্যে জনাব চুন্দ্রীগড় প্রধানমন্ত্রীর পদে বরিত হন (১৭ই অক্টোবর ১৯৫৭)। তাঁর পদত্যাগের পর ঐ বছরই ১৬ই ডিসেম্বর জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন দলের

www.pathagar.com

সমর্থনপুষ্ট হয়ে জনাব ফিরোজ খান নুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দীর সমর্থনপুষ্ট হয়ে নুন-মন্ত্রিসভাও যখন সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে, ঠিক তখনই প্রেসিডেন্ট মির্জা শাসনতন্ত্র বাতিল করে পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে সব ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করেন। অদৃষ্টের পরিহাস, এই ঘটনার মাত্র ২০ দিন পর তাঁকেই রাত্রির অন্ধকারে সকলের অগোচরে সপত্নীক এদেশ থেকে পালিয়ে বৃটেনে আশ্রয় নিতে হয়। আর ২৭শে অক্টোবর দেশে পুরাদস্তুর সামরিক শাসন চালু হয়।

শুরু হয় 'ধিকৃত রাজনীতিক' বাছাই। জনাব সোহরাওয়ার্দীও সে তালিকা থেকে বাদ পড়েন না। তথাকথিত 'এবডোর' আওতায় এসে ছ'বছরের জন্যে তাঁকে রাজনৈতিক জীবন থেকে নির্বাসন দেয়া হয়। জনগণকে বিস্মিত করে জনগণের নেতাকে জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় অন্যের যাত্রাপথ নিষ্কণ্টক করতে। এতেও নিশ্চিন্ত হতে না পেরে ১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারি দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে[১] জনাব সোহরাওয়ার্দীকে অকস্মাৎ কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। জীবনসায়াহ্নে জনগণের নেতা জীবনের সেই প্রথম কারাবাসকে হাসিমুখে বরণ করে নেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দী জানতেন, কেন তাঁকে এই বৃদ্ধ বয়সে কারাগারে ঠেলে দেয়া হয়েছে। তাই তাঁর আটকাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের এ্যাডভোকেট মালিক সরফরাজ আদালতের শরণাপন্ন হলেও জনাব সোহরাওয়ার্দী তাতে আদৌ আগ্রহ দেখাননি। সম্ভবত এই কারণেই মালিক সাহেব করাচী কারাগারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তাচ্ছিল্যভরেই তিনি বলেছিলেন, 'মালিক সরফরাজ, তুমি কেন এত আবেদন আর রীটের ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছো। আমি জানি, আমাকে দশ বছর এখানে থাকতে হবে। তাতে আমার এতটুকু দুঃখ নেই। আমাকে এখানেই থাকতে দাও।' সরকারি অভিযোগের জবাবে কারাগার থেকে প্রেসিডেন্টের বরাবরে জনাব সোহরাওয়ার্দী সেদিন যে স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন, তার কয়েকটি ছত্রও বিশেষ প্রণিধান্যযোগ্য। তিনি বলেছিলেনঃ 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি আমাকে জানেন না, কেন না আপনি ছিলেন তখন একজন সৈনিক আর আপনার বাস দেশের এমনই এক প্রান্তে, যেখান থেকে বাংলাদেশ বহু দূরে, যে বাংলাদেশে বসে পাকিস্তানের জন্য আমি আমার নগণ্য সামর্থ্যমতে সংগ্রাম করেছি। তাই, আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতামূলক কার্যকলাপের অভিযোগ আপনি আনতে পারেন; তবে আমার সান্ত্বনা এই যে, আমার প্রিয় দেশবাসী—পাকিস্তানের জনসাধারণ কস্মিনকালেও তা বিশ্বাস করবে না।' জনাব সোহরাওয়ার্দীকে কারাগারে নিক্ষেপ করার অবিমৃষ্যকারিতাকে ছাইচাপা দেবার জন্য ক্ষমতাসীন মহলের কেউ কেউ বলতে থাকেন, 'মোহাজেরদের দলে ভিড়ে কোনো্ ফাঁকে তিনি পাকিস্তানে প্রবেশ করেছিলেন, সরকার তা জানতেন না', 'পাকিস্তানের প্রতি তাঁর তেমন কোনো দরদ আছে বলে মনে করিনে', পূর্ব পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি তাঁর কতটুকু দরদ আছে তা আমি জানি, 'সরকার শত্রুচরদের সকলকেই এবার শায়েস্তা করবেন', 'সীমা লংঘনকারীদের হাত থেকে দেশকে অবশ্যই বাঁচাতে হবে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতসব সত্ত্বেও, করাচীর অন্ধ জিন্দানখানার বদ্ধ আবেষ্টনীতে জনাব সোহরাওয়ার্দী যখন বর্ণহীন, দীর্ঘ দিন-রাত্রির স্বাদহীন ক্লান্তিকর প্রহর অতিবাহিত করছিলেন, তখন পদ্মা-মেঘনা-

www.pathagar.com

যমুনার তরঙ্গে তরঙ্গে অসীম বেদনা ও ক্ষোভ ফুলে-ফুঁসে গর্জে উঠতে থাকে। সাড়ে তিন বছরের সংজ্ঞাহীন শাসন গণমনে যে অশান্তি ও বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত করে তুলেছিল এবং প্রত্যাসন্ন শাসনতন্ত্রের স্বরূপ যে পুঞ্জীভূত অশান্তি ও বিভোক্ষকে ধূমায়িত করে তুলেছিল, জনাব সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতার তাতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের কাজ করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি নগর-বন্দর ও জনপদ বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার পদভারে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। সামরিক শাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ ভেদ করে ঢাকার ছাত্রসমাজ প্রচণ্ড বিক্রমে গর্জে ওঠে। হাজার হাজার ছাত্র-জনতা হাসিমুখে কারাবরণ করে নেতার প্রতি তাদের অবিচল আস্থা ও শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। পূর্ব পাকিস্তানের সে আন্দোলনের দুর্বার তরঙ্গাঘাতে পশ্চিম পাকিস্তানের গণমনও দুলে ওঠে। দেশবাসীর এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ ৬ মাস ২০ দিন পর জনাব সোহরাওয়ার্দীকে সরকার মুক্তি দিতে বাধ্য হন।[২] অবশ্য সে সময় সরকার যে কৈফিয়ত দেন, তা রীতিমত অভিনব। কৈফিয়তে বলা হয়ঃ

'পাকিস্তানের নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর কার্য হইতে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে বিরত রাখা তখন প্রয়োজন বিবেচিত হওয়ায় গত ৩০শে জানুয়ারি তারিখে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইন বলে (১৯৫২) তাঁহাকে আটক রাখা হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দী অতঃপর আর বিভেদমূলক কোনো কাজে লিপ্ত হইবেন ন, সরকারের এক্ষণে এই বিশ্বাস জন্মানোর ফলে তাঁহাকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অদ্য ১৯শে আগস্ট তাঁহার মুক্তির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।'

দীর্ঘ ৬ মাস ২০ দিন কারাগারে অতিবাহিত করে রোগজর্জর দেহে জনাব সোহরাওয়ার্দী বেরিয়ে এসে দু'দিন পরই আশ্রয় নেন করাচীর জিন্নাহ হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে বেরুবার পর প্রথম সুযোগেই তিনি ঢাকায় আসেন, মিশে যান জনারণ্যে। '৬৩-র শেষভাগে পাক-বাংলার পথে-প্রান্তরে উল্কার মতো ছুটে বেড়িয়ে চারণের বেশে যে জাগানিয়া গান তিনি শোনাতে থাকেন, ক্ষমতাসীন মহল তাতে প্রমাদ গোণেন। ঝটিকা সফর শেষে অসুস্থ শরীরে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে আবার ফিরে যেতে হয় করাচীর জিন্নাহ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসাধীন থাকাকালে প্রকৃত প্রস্তাবে জনাব সোহরাওয়ার্দীরই কণ্ঠ স্তব্ধ করার জন্যে ১৯৬৩ সালের ৭ই জানুয়ারি এবডো রাজনীতিকদের সম্পর্কে দু'দফা নয়া অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়।[৩] এই অর্ডিন্যান্সের একটির বিধান অনুযায়ী এবডো রাজনীতিকদের কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা বা রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকাও নিষিদ্ধ করা হয় এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে জনসভায় বক্তৃতা বা বিবৃতি দেয়া নিষিদ্ধ করে নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই নিষেধাজ্ঞা লংঘনের দায়ে দু'বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডেরই বিধান রাখা হয়। অপরপক্ষে অন্য অর্ডিন্যান্সটিতে প্রেসিডেন্ট এবডো রাজনীতিকদের আবেদনক্রমে তাঁদের অযোগ্যতার মেয়াদ হ্রাস বা মওকুফের ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই অর্ডিন্যান্স জারির সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐ রাতেই জনাব সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহ হাসপাতালের রোগশয্যা থেকে তার সমালোচনা করে বিবৃতি দেন।[৪]

অর্ডিন্যান্স দু'টি জারির পর ক্ষমতাসীন মহল থেকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হতে থাকে যে, বহু এবডো রাজনীতিক প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমা চেয়ে আবেদন করেছেন এবং

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট শীঘ্রই সেগুলো মঞ্জুর করবেন। বলা বাহুল্য, এবডো রাজনীতিকদের ওপর তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বহু প্রচারিত 'শ্বেতপত্র' প্রকাশের ঘোষণার মতো, কোনো এবডো রাজনীতিককেই ক্ষমা চাইতে বা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক কারও প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করতে দেখা যায়নি।

এমনকি, 'অতঃপর আর বিভেদমূলক কোনো কাজে লিপ্ত হইবেন না, সরকারের এই বিশ্বাস জন্মানোর ফলে' যে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে সেদিন কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়, সেই জনাব সোহরাওয়ার্দী দূর দেশে আত্মীয়-পরিজন বর্জিত পরিবেশে শেষনিশ্বাস ত্যাগের পর জাতীয় পতাকা অবনমিত করা হলেও সরকার কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বা বিধিনিষেধ থেকে তিনি মুক্তি পেয়ে যাননি।

তবে একথাও সত্য যে, কোনো বিধি-নিষেধের বেড়াজালেই জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে কোনোকালে বেঁধে রাখা সম্ভব হয়নি। জনগণের নেতাকে জনগণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে, সে সাধ্য কার? তাই দেখা যায়, শত বিধি-নিষেধ আরোপ করে ক্ষমতাসীন সরকার যতই তাঁকে ঠেলে দিতে চেয়েছেন দূরে, ততই তিনি জনগণের আরো কাছে এসেছেন, আরো নিকটাত্মীয়ের মর্যাদা পেয়েছেন। এমনকি, যাঁরা একদিন তাঁকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বৃদ্ধ বয়সে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন, তাঁদেরকেই আবার তাঁর লাশ দাফনের দিনে নিজ হাতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে তাঁকে জাতীয় বীরের সম্মান দিতে হয়েছে।

মৃত্যুর মধ্য দিয়েও তাঁকে সরিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলেই তিনি স্থান করে নিয়েছেন চিরতরে। তাই পাকিস্তানের প্রখ্যাত আইনবিদ জনাব এ.কে. ব্রোহীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সারা দেশই আজ বলবে ঃ 'গোরের বুক থেকেই জনাব সোহরাওয়ার্দী এবার পাকিস্তান শাসন করতে চলেছেন।'

(১) যে অভিযোগে প্রবীণ জননায়ক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন ঃ *১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারি। দেশবাসীকে বিস্মিত করিয়া দেশদ্রোহিতার অভিযোগে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। তাঁহার গ্রেফতার সম্পর্কে সেদিন রাওয়ালপিণ্ডি হইতে প্রকাশিত স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রেসনোটটিতে বলা হয়ঃ 'দেশের বৃহত্তম স্বার্থে পাকিস্তান সরকার জনাব এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করিয়া পাকিস্তান নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী আটক করিতে বাধ্য হইয়াছেন।'*

'এ কথা পূর্ব হইতেই সকলের জানা আছে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই জনাব সোহরাওয়ার্দী ব্যক্তিস্বার্থে এমন সব কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়াছেন, যেগুলি খুবই অনিষ্টকর প্রকৃতির এবং একথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, ১৯৫৮ সালের শেষভাগে পাকিস্তান যে সংকটাবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিল, তজ্জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে বলিতে গেলে অপর কয়েকজনের সঙ্গে তিনিও দায়ী ছিলেন।'

'জনাব সোহরাওয়ার্দী এবং তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিরা যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন কার্যত তাহার ফলেই পাকিস্তান মারাত্মক রকমের বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিল এবং ইহার জন্যই দেশে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার ফলে শুধুমাত্র পঙ্কিলতাই দূরীভূত হয় নাই, গত তিন বৎসরে নিশ্চিত সুফলও পাওয়া গিয়াছে।'

'এমনকি, একরূপ অপরাধী পদবাচ্য হইলেও অতীত অপকর্মের জন্য কাহারও বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা বা শাস্তি না দেওয়াই ছিল গত তিন বৎসরের সরকারের বিঘোষিত নীতি।'

'এইজন্যই 'এবডো' ট্রাইব্যুনাল যে সকল রাজনীতিকের কার্যকলাপ তদন্ত করিয়াছে, তাঁহাদের প্রতিও সদয় ব্যবহার করা হইয়াছে। জনাব সোহরাওয়ার্দী এই ধরনেরই একজন লোক।'

www.pathagar.com

'কিন্তু জনাব সোহরাওয়ার্দী এই সহৃদয়তাকে ভুল বুঝিয়াছেন এবং যেহেতু তাঁহার উচ্চাভিলাষের কোনো সীমা নাই, সেইহেতু তিনি পাকিস্তানের সংহতি ও নিরাপত্তার পক্ষে অনিষ্টকর কার্যকলাপ অব্যাহতভাবেই করিয়া চলিয়াছেন। একথা ভাবিতেও দুঃখ লাগে যে, জনাব সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় বিচার-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন লোক উত্তম দেশপ্রেমিকের ন্যায় দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ না করিয়া বিপ্লবের পরও ধ্বংসাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী প্রকাশ্যভাবেই দেশের অভ্যন্তরের ও বাহিরের পাকিস্তান-বিরোধী ব্যক্তিদের সহিত নিজেকে জড়িত করিয়াছেন। এমত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সরকারের অনিচ্ছাসত্ত্বেও জনাব সোহরাওয়ার্দীকে আটক রাখার নির্দেশ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার নিকট অতীতের কার্যকলাপে দেশের নিরাপত্তার পক্ষে এমন ঘোরতর বিপদ নিহিত ছিলো– যাহাকে কোনো লোক ন্যায়সঙ্গতভাবেই রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক বলিয়া অভিহিত করিতে পারে।'

(২) দেশবাসীর প্রতি সদ্য কারামুক্ত নেতার অভিনন্দনঃ দীর্ঘ পৌনে সাত মাস আটক থাকার পর জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কারাগার হইতে বাহিরে আসার পর এক বিবৃতিতে প্রথমে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা ও রসুলুল্লার দরবারে অশেষ শোকরিয়া আদায় করেন এবং পরে পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে থাকিয়া যাঁহারা তাঁহার মুক্তির দাবি করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের, বিশেষ করিয়া ছাত্র-জনতার প্রতি গভীর মোবারকবাদ জানান।

বিবৃতিতে তিনি বলেনঃ 'করুণাময় আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) দরবারে অশেষ শোকরিয়া আদায়ের পর আমি দেশের সকলকে যাঁহারা পরিষদের ভিতরে বা বাহিরে থাকিয়া আমার মুক্তি দাবি করিয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া যাঁহারা আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ বিশ্বাস করেন নাই, তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।'

'আমি প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানে ও পরে পশ্চিম পাকিস্তানে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলাম অথবা দেশের দুশমন মহলের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণের আসক্তির আমি উর্ধ্বে ছিলাম না অথবা আমি দেশদ্রোহিতামূলক তৎপরতায় লিপ্ত ছিলাম—এ অভিযোগ অস্বীকার করার আদৌ প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কেননা, যাঁহারা আমাকে জানেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমার যে দান ছিলো এবং সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আমি দেশের যেটুকু সেবা করিতে পারিয়াছি তাহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা আমার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগে আদৌ গুরুত্ব দিবেন না।'

পরস্পর বিরোধিতা

'প্রসঙ্গত আমার বিরুদ্ধে প্রকাশিত এই অভিযোগসমূহের সহিত আমার আটক রাখার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত কারণের কোনো সম্পর্ক নাই। ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং আমার ব্যাপারে বিশেষ কিছু আলোচনা করার নাই।'

'আমি আমার বন্ধুদের আরও ধন্যবাদ জানাই যে, আমার এই অভিযোগসমূহ অস্বীকার করার কোনো সুযোগ হয় নাই এবং তবুও আমার পক্ষে যে সকল সদয় উক্তি করা হইয়াছে, তাহাতে ইহা অস্বীকার করার কোনো প্রয়োজনও হয় নাই এবং অভিযোগসমূহ কেহ বিশ্বাস করে নাই। আমার আটক থাকাকালে অন্যরা আমার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁহার নবীর (দঃ) মেহেরবানীতে আমার পূর্বপুরুষ ও পিতামাতার পুণ্যে এই অভিযোগের কোনোটাই আমার দেশবাসী বিশ্বাস করে নাই।'

আমার ছাত্র বন্ধুদের প্রতি অশেষ ধন্যবাদ

'বিশেষ করিয়া আমি আমার ছাত্র বন্ধুগণকে ধন্যবাদ জানাইতে চাই। আল্লাহ তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করুন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করিয়া তাঁহাদিগকে সত্য ও ন্যায়ের সেবায় সদাসর্বদা অবিচল থাকিবার তওফিক এনায়েত করুন। আমি তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করি। ছাত্ররা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের ক্রীড়নক, এ অভিযোগ অত্যন্ত জঘন্য। ছাত্ররা তাঁহাদের নিজের মনকে ভাল করিয়াই জানে। বাহির হইতে কাহারও দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রয়োজন তাহাদের নাই।'

কুৎসা ও গালিগালাজ বন্ধ করুন

'এখন আমার শরীরের অবস্থা এমন নয় যে, দীর্ঘ বিবৃতি দিতে পারি। গত কয়েক মাসে যেসব বিতর্কমূলক প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে, সেই সম্পর্কে তাই পরে আলোকপাত করিব। তবে এই মুহূর্তে একটি কথা আমি বলিয়া দিতে চাই—পরে যাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিব। ''ধিকৃত

www.pathagar.com

রাজনীতিকদের" বিরুদ্ধে কুৎসা ও গালিগালাজ বন্ধ করুন। গত চার বৎসর যাবৎ আমাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য রীতিমত আন্দোলন চালান হইয়াছে। সেই চার বৎসরের আজ শেষ হইয়াছে। দেশবাসী ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য আজ সেই "ধিকৃত রাজনীতিকদের" দিকেই অধীর আগ্রহে তাকাইয়া আছে।'

এ কুৎসা রটনার উদ্দেশ্য কি?

'এখনো এ কুৎসা রটনার অর্থ কি? বস্তুতপক্ষে ইহা পিছন হইতে জাতির পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত ছাড়া আর কিছুই নহে। দেশেরই যদি সেবা করিতে হয়, তবে আসুন, একে অপরের গালিগালাজ বা কুৎসা রটনা করিয়া পরিবেশ বিষাক্ত না করিয়া গঠনমূলক চিন্তাধারা লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।'

ভাসানী-কাইয়ুমের মুক্তি চাই

'স্বভাবতঃই আমি আশা করিব যে, সরকার আমার মতো মওলানা ভাসানী, খান কাইয়ুম ও আব্দুল গফফার খানসহ দেশের সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিবেন।'

(৩) এবডো-রাজনীতিকদের সম্পর্কে দু'দফা নয়া অর্ডিন্যান্স *ঃ রাওয়ালপিণ্ডি, ৭ই জানুয়ারি (১৯৬৩)। এবডো রাজনীতিকদের সম্পর্কে দুই দফা নয়া অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান উহার একটিতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবডো রাজনীতিকদের কোনো রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত থাকা বা রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকা নিষিদ্ধ করেন এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহাদের কোনো জনসভায় বক্তৃতা করা বা বিবৃতি দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়া নির্দেশদানের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এই নিষেধাজ্ঞা লংঘন করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দুই বৎসরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান অর্ডিন্যান্সটিতে রাখা হইয়াছে।*

জারিকৃত অপর অর্ডিন্যান্সটির বলে প্রেসিডেন্টের এবডো রাজনীতিকদের আবেদনক্রমে তাঁহাদের অযোগ্যতার মেয়াদ হ্রাস বা মওকুফের ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রথমোক্ত অর্ডিন্যান্সটি দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুকাল আগে জাতীয় পরিষদে গৃহীত রাজনৈতিক দল আইনটির সংশোধন করিয়া রাজনৈতিক দলের নয়া সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়। রাজনৈতিক দলের এই নয়া সংজ্ঞা অনুযায়ীই এবডো রাজনীতিকদের কোনো রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা যেমন নিষিদ্ধ করা হইল তেমনি উহার অপর একটি বিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট যেকোন এবডো রাজনীতিককে ৬ মাসের জন্য কোনো জনসভায় বা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা অথবা রাজনৈতিক ব্যাপারে বিবৃতিদান হইতে বিরত থাকার নির্দেশদানের ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন।

এতদ্ব্যতীত, এবডো-রাজনীতিকদের উপর শেষোক্ত ৬ মাসের নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজন মনে করিলে উক্ত নিষেধাজ্ঞা আরও ৬ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। এই নিষেধাজ্ঞাটি লংঘনের দায়েও পূর্বোক্ত বিধানের মতোই দুই বৎসর কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডেরই ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

(৪) এবডো-অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে জনাব সোহরাওয়ার্দী *ঃ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এবডো-রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে নয়া ব্যবস্থা হিসেবে রাজনৈতিক দল আইন সংশোধনসহ দুই দফা নয়া অর্ডিন্যান্স জারির তীব্র সমালোচনা করিয়া করাচীর জিন্নাহ হাসপাতালে রোগশয্যাশায়ী জনাব এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দী বলেনঃ 'এ যাত্রায় বাঁচিয়া উঠিব কিনা জানি না; তবু এই রোগশয্যা হইতে প্রেসিডেন্টের অদ্যকার দুই দফা অর্ডিন্যান্স জারির অভিনব সংবাদ সম্পর্কে আমি আমার প্রতিক্রিয়া জানাইয়া দিতে চাহি। নয়া অর্ডিন্যান্সে কোনো এবডো-রাজনীতিক প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন করিলে তাঁহার অযোগ্যতার মেয়াদ হ্রাস বা সম্পূর্ণ মওকুফের ক্ষমতা একদিকে যেখানে প্রেসিডেন্ট স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, অন্যদিকে আবার সকল এবডো-রাজনীতিককে যেকোন রকমের রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা একদিকে যেমন সর্বোচ্চ রকমের নগ্ন দুর্নীতিরই নামান্তর, অপরদিকে তেমনি জবরদস্তি ও দমনমূলক ব্যবস্থারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রেসিডেন্ট কি তাহা হইলে এই উপায়েই দেশের রাজনীতি পরিচালনা করিতে চান? তাঁহার দৃষ্টিতে এবডো-রাজনীতিকরা ধিকৃত হইতে পারেন; কিন্তু আত্মসম্ভ্রম তাঁহাদের নিশ্চয়ই একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। দেশবাসীর নিকটও তাঁহাদের কিছু না কিছু মর্যাদা আছেই।'*

www.pathagar.com

কারামুক্ত নেতার ঢাকা আগমন উপলক্ষে বিমানবন্দরে সৃষ্ট ইতিহাস

(১৭ই সেপ্টেম্বর '৬২-এর দৈনিক ইত্তেফাকের পাতা থেকে)

সে এক ইতিহাস—কেননা, তেজগাঁও বিমানবন্দরের ইতিহাসে ইহাই সর্বপ্রথম, যখন বিমানবন্দরের নিষিদ্ধ এলাকা বলিয়া বিবেচিত পার্কিং প্লেসটি (বিমান দাঁড়াইবার জায়গা) জনতার দখলে চলিয়া যায়। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, মায় জননেতৃবৃন্দের সমবেত চেষ্টা সত্ত্বেও জনসমুদ্রের সে বাঁধভাঙ্গা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নাই।

ইতিহাস এই কারণে যে, তেজগাঁও বিমানবন্দরে ইহাই সর্বপ্রথম, যখন সংশ্লিষ্ট বিমানখানিকে পার্কিং প্লেস হইতে সহস্র গজ দূরে রানওয়েতেই দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় এবং জনারণ্যের মধ্য দিয়া বিমানখানির নিকট সিঁড়ি লইয়া যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির সহিত সংযুক্ত একখানি বিশেষ ধরনের ভ্যানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

ইতিহাস এইজন্য যে, সেই বিশেষ ধরনের গাড়ির পাটাতনটি এলিভেটরের সাহায্যে উঁচু করিয়া রানওয়ের উপর হইতেই জনাব সোহরাওয়ার্দী ও তাঁহার পুত্র রাশেদ সোহরাওয়ার্দীকে নামাইয়া আনিতে হয়।

ইতিহাস এইজন্য যে, বিশেষ ধরনের ভ্যানটিতে করিয়া অতি কষ্টে জনস্রোত ঠেলিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীকে বিমানবন্দরের চত্বরে আনা হইলেও দীর্ঘ ৩৫ মিনিট যাবৎ তাঁহাকে তথা হইতে নামানো সম্ভব হয় না। ফলে, এই দীর্ঘ সময় যাবৎ বিমানের অন্যান্য যাত্রীকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতোই রানওয়ের উপর বিমানেই বসিয়া থাকিতে হয়।

ইতিহাস এইজন্য যে, ছাত্রসমাজ তথা গণতান্ত্রিক শিবিরের কর্মীবৃন্দ সংগ্রামী নেতাকে কাছে পাইয়া এতই উদ্বেলিত হইয়া ওঠে যে, জনাব সোহরাওয়ার্দীকে মাল্যভূষিত করার জন্যে জনাব আতাউর রহমান, জনাব আবু হোসেন সরকার, শেখ মুজিবুর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী প্রমুখ নেতা জীপযোগে নেতার সান্নিধ্যে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও জনসমুদ্রের মাঝেই হাবুডুবু খাইতে থাকেন। এই অবস্থা প্রায় বিশ মিনিট যাবৎ চলে।

ইতিহাস এইজন্য যে, ঐতিহাসিক যুক্ত বিবৃতি দানকারী নয় নেতার ৭ জন (জনাব নূরুল আমীন অসুস্থ ও জনাব হামিদুল হক বিদেশে) ছাড়াও দলমত নির্বিশেষে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রী ও নেতৃবর্গ, বিশিষ্ট শিল্পপতি, আইনজীবী, ব্যবসায়ী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারাইয়া যান, তাহার হদিস করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

ইতিহাস এইজন্য যে, বিমানবন্দরে কাছে পাইয়াও জনাব সোহরাওয়ার্দীর গলায়

www.pathagar.com

সরাসরি মাল্য প্রদান একেবারে অসম্ভব হওয়ায় এলিভেটেড কারের উপর দণ্ডায়মান পি.আই.এ অফিসারদের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না। আর পি.আই.এ অফিসারদের সাহায্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতার গলায় সর্বপ্রথম মাল্যভূষিত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পুরোধা অকুতোভয় ছাত্রসমাজ। আর সেই সঙ্গে পার্কিং প্লেস ও বিমানবন্দরের গৃহশীর্ষের অগণিত জনতার তুমুল করতালিতে সমগ্র বন্দরপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নেতার উদ্দেশে বিভিন্ন দিক হইতে মাল্য ও পুষ্প নিক্ষেপ। কারণ, এলিভেটেড ভ্যানের সুউচ্চ পাটাতনটি ছিলো সকলের নাগালের বাহিরে।

স্বভাবতই আনুষ্ঠানিক মাল্য ভূষণের পালাটি সাঙ্গ করার দায়িত্ব বর্তায় পি.আই.এ অফিসারদের উপর। এই পর্যায়েও কিন্তু মেসার্স আতাউর রহমান, আবু হোসেন সরকার প্রমুখ নেতাকে দূরে বিরাট জনসমুদ্রের মধ্যে ছোট দ্বীপসদৃশ একটি জীপের উপর মাল্যহস্তে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে দেখা যায়।

সাংবাদিকদের অবস্থা ছিলো আরও করুণ। ভি-আই-পি রুমের সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জনাব সোহরাওয়ার্দীর সহিত আলোচনার আশায় তাঁহারা স্থান লইয়াছিলেন ভি-আই-পি রুমে। কিন্তু জনাব সোহরাওয়ার্দী তো অবরুদ্ধ। সে অবরোধের বেড়াজাল ভেদ করিয়া তাঁহার পক্ষে সাংবাদিকদের নিকট আসা বা সাংবাদিকদের পক্ষে জনাব সোহরাওয়ার্দীর নিকট যাওয়া ছিলো একেবারে অসম্ভব।

স্বভাবতই জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর নিম্নে অবতরণ যখন কোনোক্রমেই সম্ভব হইতেছিল না, তখন তিনি একটি মাইকের জন্য অনুরোধ করেন। বহুকষ্টে একটি মাইক তাঁহার হাতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইলে এলিভেটেড ভ্যানের উপর দাঁড়াইয়া পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী জনতার প্রতি ধন্যবাদ জানাইয়া প্রায় ১৫ মিনিট যাবৎ তিনি বক্তৃতা করেন।[৫] তাঁহার প্রতিটি কথাতেই বিমান বন্দরের জনসমুদ্রের বুকে যেন উল্লাসের ঢেউ জাগিতে থাকে। তুমুল করতালিতে ফাটিয়া পড়িতে থাকে সমগ্র জনতা। এই সময় সাংবাদিকদের অবস্থা বড়ই করুণ দেখাইতে থাকে। একক প্রচেষ্টায় কাহারও পক্ষে জনাব সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতার নোট নেওয়া সম্ভব ছিলো না। এক হাতে জানালার শিক ধরিয়া বাদুড়-ঝোলা হইয়া অন্য হাতে দ্বিতীয় কোনো সহকর্মী বা বন্ধুর হাতে রক্ষিত খাতার পৃষ্ঠায় কেবল আঁচড় কাটিয়া যাইতে দেখা যায়।

বক্তৃতা শেষে আসসালামু আলাইকুম বলিয়া বিদায় লইতে চাহিয়াও অবস্থা অনুকূল বিবেচিত না হওয়ায় জনাব সোহরাওয়ার্দী 'এই বয়সে ভিড়ের চাপে আমাকে মরিতে না হয়, এমন একটু ব্যবস্থা তো আপনারা করুন' বলিয়া আবেদন জানান। এই কথার পরই জনতার বুকে সাড়া জাগে। বহু কষ্টে তাঁহারা কিছুটা পথ করিয়া দিতেই দূর হইতে নেতৃবৃন্দের জীপখানি আসিয়া জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে একরূপ ছোঁ মারিয়াই দ্রুত বিমানবন্দরের বাহিরে শোভাযাত্রার পুরোভাগে আনে।

এতক্ষণে বিমানবন্দর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে; ইহারই কিছুক্ষণ আগে করাচীর বিমানখানি কোনোক্রমে পার্কিং প্লেসে আসিয়া দাঁড়াইতে পারায় রানওয়েটি মুক্ত হয়। তৎপূর্বে রানওয়ে আটকা থাকায় যে যাত্রীবাহী ডাকোটাখানিকে কেবল অন্যত্র চক্কর দিতে হইতেছিল, সেও অবতরণ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

www.pathagar.com

এরপর শুরু হয় নজিরবিহীন শোভাযাত্রা। কোথায় ট্রাফিক আইন, কোথায় কি! মাইক ফিট করা কয়েকটি জীপে ছাত্রসমাজ স্থান গ্রহণ করে শোভাযাত্রার পুরোভাগে। সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে থাকে 'রাহ্‌বারে আজম জিন্দাবাদ!' স্বাগতম হে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের নির্ভীক সিপাহশালার, স্বাগতম!'

বিমানবন্দর হইতে শোভাযাত্রাটি রাজপথে নামিতেই হাজার হাজার সাইকেলারোহী ও পথচারী জনতা সমগ্র রাজপথ জুড়িয়া আগাইয়া যাইতে থাকে। পশ্চাতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের অসংখ্য বাস, ট্যাক্সী আর প্রাইভেট কার। বিমানবন্দর হইতে ঢাকা পর্যন্ত রাস্তার উভয়পার্শ্বে সহস্র সহস্র জনতা এমনভাবে ছাকিয়া ধরিতে থাকে যে, শোভাযাত্রার গতি শম্বুক গতিকেও হার মানাইয়া দেয়। ফলে মাত্র ৪ মাইল পথ পাড়ি দিতে শোভাযাত্রাটির দুই ঘণ্টারও বেশি সময় লাগিয়া যায়। আর সারা সময় খোলা জীপের উপর দাঁড়াইয়া জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী জনতার অভিবাদন গ্রহণ করিতে থাকেন। সম্মুখস্থ গাড়ী হইতে মাঝে মাঝে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করা হইতে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিমানবন্দর হইতে শোভাযাত্রাটি 'ডবল রোড' ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকায় এই সারা সময়ই একরূপ বলিতে গেলে ঐপথে বিমানবন্দর অভিমুখে যানবাহন চলা বন্ধ হইয়া যায়। শোভাযাত্রাটি শাহবাগ অতিক্রম করিলে দেখা যায়, একই রুটের ৭ খানি নিয়মিত স্টেটবাসকে অবস্থাগতিকে শোভাযাত্রারই কলেবর বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে।

শোভাযাত্রাটি শেরেবাংলার মাজারে পৌঁছিবার বহু পূর্ব হইতেই জনাব সোহরাওয়ার্দীর আগমন প্রতীক্ষায় অসংখ্য লোক সেখানে হাজির থাকে। মাজার প্রাঙ্গণে সৈয়দ আজিজুল হক জনাব সোহরাওয়ার্দীকে সম্বর্ধনা জানান।

রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী 'শেরেবাংলার' ইন্তেকালের সংবাদ জনাব সোহরাওয়ার্দী কারাগারে বসিয়া পাইয়াছিলেন। শেরেবাংলার ইন্তেকালের অর্ধবৎসর পর ঢাকা আগমনের প্রথম সুযোগে তিনি মরহুম নেতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিয়া তাঁহার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। তথা হইতে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে 'ইত্তেফাক' সম্পাদকের কাকরাইলস্থ বাসভবনে লইয়া যাওয়া হয়। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী সেখানেই অবস্থান করিবেন।

শোভাযাত্রাটি শেরেবাংলার মাজার অতিক্রমের পর দেখা যায়, বিমানবন্দরগামী সড়কের বুকে 'আইয়ুব এভিনিউ' লিখিত ফলক দুইটি উৎপাটিত হইয়া পড়িয়া আছে। সেদিন মাত্র রোগমুক্তির পর জনাব সোহরাওয়ার্দীকে অনেকখানি দুর্বল দেখাইলেও পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান কর্মকেন্দ্র ঢাকা নগরীর সংগ্রামী ছাত্র-জনতা গতকাল্য যে প্রাণপ্রবাহের পরিচয় দিয়াছেন, জনাব সোহরাওয়ার্দীর জন্য তাহা নিঃসন্দেহে এক অপূর্ব পাথেয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রিয় নেতার সম্বর্ধনার জন্য নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা হইতে এক মাইল দীর্ঘ যে বাসের মিছিলটি আসে, উহার অন্যতম শ্লোগান ছিলো, 'ঢাকার সংগ্রামী পত্রিকাত্রয়—জিন্দাবাদ'।

জনসমুদ্রের উচ্ছল প্রাণপ্রবাহ, ব্যাণ্ড পার্টির ঐক্যতান, খোল-করতাল ও পটকার শব্দ সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে উৎসবমুখর করিয়া তোলে। সোহরাওয়ার্দীর সম্বর্ধনা উপলক্ষে ঢাকার

www.pathagar.com

উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়া পূর্ব পাকিস্তানের গণ-ঐক্যের যে সুদৃঢ় পরিচয় ফুটিয়া ওঠে, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা অবধি অনুরূপ গণ-ঐক্যের পরিচয় আর কখনও পাওয়া যায় নাই। এদিক দিয়া এ সম্বর্ধনা একক ও অদ্বিতীয়।

(৫) 'নেতৃত্বের জন্য পাকিস্তান আজ আপনাদের দিকেই তাকিয়ে আছে' ঃ *বিমানবন্দরের বিপুল জনসমুদ্রের মধ্যে ভাসমান দ্বীপসদৃশ এলিভেটেড ভ্যানের উপর হইতে নামিবার চেষ্টা করিতে গিয়া যখন ব্যর্থ হন, তখন মাইকযোগে জনতার উদ্দেশে জনাব সোহরাওয়ার্দী সেদিন বলেন ঃ*

'ধন্যবাদ। আপনারা যে কষ্ট করে এখানে এসেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ দিচ্ছি।'

আমি একটা নীতির জন্যে দাঁড়িয়েছি। সেই নীতি পালন করতে হবে, সফল করতে হবে, কামিয়াব করতে হবে। অতীতে যা কিছু হয়েছে, সব আপনারা ভুলে যান। যা' ঘটেছে, তাকে ভালই বলতে হবে। কেননা, তার ফলেই দেশের মধ্যে এই জাগরণ এসেছে। দেশের মধ্যে আজ একতা এসেছে। ঝগড়া-ঝাটি সব মিটে গেছে।'

'নয় নেতা যে বিবৃতি দিয়েছেন, আমি তা' সম্পূর্ণ সমর্থন করি। নয় নেতা নয়—এই বিবৃতির ফলে দেশে আজ ৯ কোটি নেতার সৃষ্টি হয়েছে। দুনিয়ার মধ্যে নেতার এত প্রভাব কোথাও দেখা যায় না। এদের কথার উপর এখানে ও পশ্চিম পাকিস্তানে নতুন জাগরণ এসেছে। সত্য কথা বলতে কি, সারা পাকিস্তান আজ পূর্ব পাকিস্তানের পলিটিক্যাল লীডারশীপের-নেতৃত্বের জন্যে আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এতদিন পর নেতৃত্ব আপনাদের হাতে এসেছে। যেখান থেকে আমি আসছি (পশ্চিম পাকিস্তান), সেখানে নবজাগরণ এসেছে। সারা পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁরা ওখানেও একতাবদ্ধ হয়েছেন। একতাবদ্ধভাবেই যদি কাজ করি, কেউ আমাদের বাধা দিতে পারবেন না।'

'জেল থেকে মুক্তির পরই এখানে আসার ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ি। ডাক্তার এক সপ্তাহ পরে যেতে বললেন। তাতে দেরি হয়ে গেল।'

'আপনারা আমার প্রতি আস্থা জানাতে এসেছেন, আস্থার কথা এ নয়। আপনারা এখানে এসে আমাকে যে মহব্বত দেখিয়েছেন, যে প্রীতি দেখিয়েছেন, তা' আমি বুঝতে পেরেছি। আমিও আপনাদের সেই মহব্বত, সেই প্রীতি জানাচ্ছি। কতবার এখানে এসেছি, এতবড় অভ্যর্থনা আমি কখনও দেখিনি। কত বড় বড় লোক এখানে এসেছেন, গিয়েছেন; কিন্তু কখনও এমন হতে দেখিনি বা হয়েছে এমন শুনিনি।'

'আমার আরও অনেক কথা বলার আছে। ২১ তারিখে আমাকে অনেক লম্বা বক্তৃতা করতে হবে। তখন সব কথা বলব।'

www.pathagar.com

৪ঠা জুনের (১৯৪৮) দৈনিক আজাদ থেকে

[পূর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক ঢাকায় জনাব সোহরাওয়ার্দী আটকঃ বিশৃংখলা সৃষ্টি ও উভয় বঙ্গের পুনর্মিলন উদ্দেশ্যে প্রচারণার অভিযোগঃ প্রদেশ ত্যাগ করিলে আটকের নির্দেশ প্রত্যাহারে সরকারের ইচ্ছা]

ঢাকা, ৩রা জুন—অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও পাক গণপরিষদের সদস্য জনাব এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী অদ্য শুভেচ্ছা মিশনে বিমানযোগে ঢাকায় পৌঁছিলে তাঁহাকে পূর্ববঙ্গ নিরাপত্তা আইনে (১৯৪৮) আটক করা হয়।

অদ্য অপরাহ্নে প্রকাশিত পূর্ববঙ্গ সরকারের এক এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, পূর্ববঙ্গ সরকার রাষ্ট্রের স্বার্থ ১৯৪৮ সালের পূর্ববঙ্গ জননিরাপত্তা আইনের ১০ ধারা অনুসারে বাধ্য হইয়া জনাব এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দীকে আটক করিয়াছেন।

এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, অতীতে এই প্রদেশে জনাব সোহরাওয়ার্দীর পরিভ্রমণের যে আবশ্যকতাই থাক না কেন, বর্তমানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি ও পূর্ববঙ্গ হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগ বন্ধের উদ্দেশ্য লইয়া তিনি এই প্রদেশ পরিভ্রমণে আগমন করেন; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অনাহূত। পূর্ববঙ্গ সরকার আন্তঃ ডোমিনিয়ন চুক্তি অনুসারে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতি তাহাদের দায়িত্ব পালনের কাজে অগ্রসর হইতেছেন। এই গভর্নমেন্ট আশা করেন যে, শীঘ্রই সংখ্যালঘুদের সহায়তাকল্পে জেলা কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের জন্য প্রাদেশিক ও জেলা সংখ্যালঘু বোর্ড স্থাপন করা হইবে। বাস্তুত্যাগ শুধু বন্ধই হয় নাই; পরন্তু কোলকাতার হিন্দু পত্রিকাসমূহের স্বীকৃতি মতে বহু মুসলমান বাস্তুত্যাগী প্রতিদিনস্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। এই অবস্থায় জনাব সোহরাওয়ার্দীর পরিভ্রমণ শুধু অনাবশ্যকই নহে, পরন্তু এই পরিভ্রমণ এই প্রদেশে ও প্রদেশের বাহিরে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মকভাবে এই ধারণার উদ্ভব ঘটায় যে, এখানে সংখ্যালঘিষ্ঠরা অত্যাচারিত হইতেছে। এই ধারণার ফলে সম্পূর্ণ অনাবশ্যকভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি ও সংখ্যালঘুদের ক্ষতি হইতে পারে।

সে যাহাই হউক না কেন, যে জনাব সোহরাওয়ার্দী ভারতীয় ডোমিনিয়নের নাগরিক এবং যিনি ভারতীয় ডোমিনিয়নের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন, সেই জনাব সোহরাওয়ার্দীর এই প্রদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। জনাব সোহরাওয়ার্দীকে এই সকল বিষয় জানান হইয়াছিল এবং তাঁহাকে এই পরিদর্শন স্থগিত রাখার অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন।

গভর্নমেন্টের এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি ব্যতীত জনাব সোহরাওয়ার্দীর এই প্রদেশ পরিভ্রমণের সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্য বর্তমান। ইহা সত্যই আশ্চর্যের কথা যে, যদি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধিই তাঁহার উদ্দেশ্য হইত এবং যদি ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের প্রতি তাঁহার প্রকৃত দরদ থাকিত, তবে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানেরা উৎপীড়িত হইতেছে এবং তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া বাস্তুত্যাগ করিতে হইতেছে, এই কথা

www.pathagar.com

প্রথম স্বীকার করিয়াও জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেব এতদিনে পশ্চিমবঙ্গের একটিমাত্র জেলা পরিদর্শন করিবার সময় পাইয়াছেন।

প্রকৃত ঘটনা হইতেছে যে, সার্বভৌম স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের দিন হইতে এবং বিশেষ করিয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জনাব সোহরাওয়ার্দী বাংলার পুনর্মিলনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন। বাংলা ভাগ হইয়া যাইবার পর তিনি কয়েকবার এই প্রদেশ পরিদর্শন করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়া এই সকল পরিভ্রমণের আয়োজন করা হইলেও গভর্নমেন্টের হাতে এইরূপ প্রমাণ আছে যাহাতে উহাকে সাফাইরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ করা যায়। পূর্বাপর এই সকল পরিদর্শনের আসল উদ্দেশ্য হইতেছে রাষ্ট্রের শত্রুদের সহিত গোপন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই প্রদেশের জনসাধারণ ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করা। মূল উদ্দেশ্য আরও গভীরতর। উহা হইতেছে পূর্ববঙ্গ গভর্নমেন্ট ধ্বংস করিয়া পশ্চিমবঙ্গের সহিত উহার মিলন সাধন এবং পূর্ববঙ্গকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তকরণ। পূর্ববার পরিদর্শনকালে জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁহার কর্মীবৃন্দ ও পূর্ববঙ্গের কতিপয় সরকারী কর্মচারীর গোপন বৈঠকে পাকিস্তান, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও গভর্নমেন্টের নিন্দা করেন এবং বিশৃংখলা ও গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাদান করেন। এইরূপ অবস্থায় পূর্ববঙ্গ সরকার ইহা আর উপেক্ষা করিতে পারেন না।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব এই প্রদেশ পরিত্যাগে সম্মত হইলেই যে আটকবলে তাঁহাকে আটক করা হইয়াছে তাহা বাতিল করা হইবে। –এ.পি

৪ঠা জুনের (১৯৪৮) দৈনিক ইত্তেহাদ থেকে

[শহীদ সাহেবের নিকট খাজা নাজিমউদ্দীনের পত্র]

[পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ২রা জুন তারিখে মিস্টার শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন তাহার মর্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল]

বর্ধমান হাউস, ঢাকা, ২রা জুন, ১৯৪৮

প্রিয় সোহরাওয়ার্দী,

করাচী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার সফর তালিকা সংলগ্ন পত্রটি পাইলাম। আপনি অবগত আছেন যে, পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তুত্যাগ সম্পূর্ণ থামিয়া গিয়াছে, শুধু তাই নয়, অপর পক্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা যেভাবে প্রত্যাগমন করিতেছে তাহার ফলে কলিকাতা হইতে আগত ট্রেনে স্থান লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব, অথচ কলিকাতাগামী ট্রেনে প্রচুর স্থান পড়িয়া থাকে। দুইদিন পূর্বে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও স্বীকার করা হইয়াছে যে, বাস্তুত্যাগ মন্দা হইয়া আসিয়াছে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইতেছে। সংখ্যালঘুর প্রতি আচরণ সম্বন্ধে যে আন্তঃ ডোমিনিয়ন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহা কার্যকরী করিবার কার্যে আমরা স্বয়ং অগ্রসর হইতেছি। আমরা শীঘ্রই সংখ্যালঘু বোর্ড গঠন করিতে পারিব বলিয়া আশা করি। উক্ত বোর্ডই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থের তত্ত্বাবধান করিবেন। এমতাবস্থায় আমি আপনার সফরকে নিষ্প্রয়োজন মনে করি। এমনকি, তাহা যে এই সরকার ও এই প্রদেশের মুসলমান উভয়ের প্রতিই

অপরিসীম অবিচার, এইরূপ মনে করি। কারণ, আপনার সফর প্রদেশে ও বাহিরে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিবে যে, এই প্রদেশের সংখ্যালঘুর সহিত ভাল ব্যবহার করা হইতেছে না। অনুরূপ ধারণা সৃষ্টি করিয়া আপনি শুধু সংখ্যালঘু সমস্যাকে জীবন্ত রাখিতেই সহায়তা করিতেছেন, সমাধান করিতে নয়। অপরপক্ষে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের দুরবস্থার প্রতি আপনার পক্ষে কিছুটা মনোযোগ প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন। আমি একাধিকবার আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছি যে, আপনি পশ্চিমবঙ্গের কোনো জিলা সফর করেন নাই, বিশেষ করিয়া সেইসব স্থান যেখান হইতে মুসলমানরা তাহাদের ভিটামাটি প্রতিবেশীর দয়ার উপর ছাড়িয়া দিয়া পূর্ববঙ্গে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে।

আপনার সফর তালিকা হইতে আমি জানিতে পারিলাম যে, জনসভা ছাড়াও আপনি সন্ধ্যাবেলা কর্মীদের সভারও আয়োজন করিয়াছেন। আপনি অতীতে উক্ত প্রকার যেসব সভা করিয়াছেন সরকারী ও বেসরকারী সূত্র হইতে তাহার যে বিবরণ আমি লাভ করিয়াছি তাহা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আপনি অদ্যাবধি যেসব অঞ্চল সফর করিয়াছেন সেইসব স্থান হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, আপনার বক্তব্যের মর্ম হইতেছে পাকিস্তানের নিন্দা, পাকিস্তান সরকারের নিন্দা ও জাতীয় নেতাদের নিন্দা। উক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য হইতেছে, আমাদের ডোমিনিয়নের বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তিসমূহকে উস্কাইয়া দেওয়া এবং অখণ্ড বাংলা আন্দোলনের সমর্থকদিগকে প্ররোচিত করা। স্পষ্টতই ইহা এমন এক পরিস্থিতি বলিয়া আপনিও স্বীকার করিবেন, যাহার সম্বন্ধে পাকিস্তান সরকার আর অধিক ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারেন না।

তাহাছাড়া আমার অভিমত এই যে, যিনি ভারতীয় ডোমিনিয়নের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং নাগরিকও উক্ত ডোমিনিয়নের, অপর এক ডোমিনিয়নের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিবার তাঁহার কোনো অধিকার নাই। যাহাতে কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হইতে না হয় তদনুরূপভাবে কাজ করিতে আমি সচেষ্ট। সুতরাং আমি আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, আপনি আপনার সফর বাতিল করুন এবং ৩রা তারিখে যেন ঢাকায় না আসেন।

এত বিলম্বে আমাকে এই অনুরোধ করিতে হইতেছে বলিয়া আমি দুঃখিত; কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে উপরোক্ত বিষয়ে আমাকে গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইয়াছে।

ভবদীয়,
কে. নাজিমউদ্দিন।
–এ.পি

৫ই জুনের (১৯৪৮) দৈনিক আজাদ থেকে

[কলিকাতার পথে সোহরাওয়ার্দী ঃ সরকার কর্তৃক প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা]

ঢাকা, ৪ঠা জুন—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গে আটকের নির্দেশ পাইবার পর জনাব সোহরাওয়ার্দী কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনে সম্মত হইলে পূর্ববঙ্গ সরকার বিমানযোগে তাঁহার কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন। তবে পরে জনাব সোহরাওয়ার্দী পথে একটু আয়েস-আরামের জন্য স্টিমারযোগে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি চাহিলে সরকার তাহাতে সম্মত হন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে পূর্বেকার ব্যবস্থা বাতিল করিয়া শেষোক্তরূপ ব্যবস্থা করেন।

www.pathagar.com

জনাব সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় তাঁহার জনৈক বন্ধুর গৃহে গমন করেন। ঢাকায় ঘোরাফেরা সম্পর্কে তাঁহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল। আটককালে জনাব সোহরাওয়ার্দীর বন্ধুর গৃহে বা তাহার নিকটে কিংবা যাত্রাপথে কোনো পুলিশ প্রহরা মোতায়েন করা হয় নাই। স্টিমারে উঠিবার পূর্বে জনাব সোহরাওয়ার্দী ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এস. রহমতউল্লাহ ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জনাব এ. জেড. ওবায়দুল্লাহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দীকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য তাঁহারা স্টীমারঘাটে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রদেশ ত্যাগে সম্মত হওয়ায় সরকার তাঁহার উপর হইতে আটকের নির্দেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন।

'আমি কি চাই' ঃ জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জবাব

৬ই জুনের (১৯৪৮) দৈনিক আজাদ থেকে [পূর্ববঙ্গ সরকারের অভিযোগের উত্তরে জনাব সোহরাওয়ার্দী ঃ সাংবাদিক বৈঠকে পাকিস্তানের নেতাদের তীব্র সমালোচনা ঃ উভয় ডোমিনিয়নে শান্তিরক্ষার কার্য চালাইয়া যাওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত]

[স্টাফ রিপোর্টার]

গতকল্য (শনিবার) অপরাহ্নে ৪০, থিয়েটার রোডে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দী পূর্ববঙ্গে তাঁহার শান্তি মিশন এবং ঢাকায় তাঁহার প্রতি পূর্ববঙ্গ সরকারের আটকাদেশ সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ সরকারের নীতির সমালোচনা করেন।

পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাওয়াজা নাজিমউদ্দিন তাঁহার নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ঐ চিঠি আমি ২রা জুন রাত্রে পাই এবং তখন উহার উত্তর দেওয়া বা আমার সফর তালিকা পরিবর্তন করার সময় ছিলো না। ৩রা তারিখেই আমার সফর শুরু হইবার কথা ছিলো। চিঠিতে যে সমস্ত অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সত্যিই আজগুবি, প্রধানমন্ত্রীর চিঠি এবং সরকারী এশতেহারের বিষয়বস্তু প্রায় একই, কাজেই ঐ দুইটিরই আমি একসঙ্গে জবাব দিতেছি।

শান্তি-মিশনের প্রয়োজনীয়তা

পূর্ববঙ্গে আর সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রচারের দরকার নাই; খাওয়াজা নাজিমউদ্দিনের এই অভিমতের সঙ্গে আমি একমত নহি। ফেরার সময় আমি স্টিমারে আসিয়াছি। পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তুত্যাগ এখনও যে বেশ চলিতেছে, ঐ সময় তাহাও আমি দেখিয়াছি। অবশ্য ইহাও আমি জানি যে, বাস্তুত্যাগীরা ফিরিয়াও যাইতেছে। বাস্তুত্যাগ যাহারা করিতেছে তাহাদের সংখ্যা বেশি, না যে সব বাস্তুত্যাগী আবার স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতেছে তাহাদের সংখ্যা বেশি, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ যে পর্যন্ত না সাধারণভাবে বাস্তুত্যাগ করার নীতি গ্রহণ করিতেছে এবং দেশে ফিরিয়া না যাইতেছে সে পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রচারের যৌক্তিকতা আছে। পূর্ববঙ্গ সরকার আমার সফর বন্ধ করায় আমি দুঃখিত। কারণ ইহা হইতে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে যে, পূর্ববঙ্গ সরকার সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করিতে চাহেন না। আন্তঃ ডোমিনিয়ন চুক্তি কবে নাগাদ কথায় ও কাজে প্রতিপালিত হইবে, আমরা সেইদিনেরই প্রতীক্ষা করিতেছি।

www.pathagar.com

শান্তি-মিশনের উদ্দেশ্য

সাম্প্রদায়িক শান্তি-মিশনের উদ্দেশ্য হইল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সচেতন করা, যাহাতে তাহারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সহিত মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাষ্ট্রের সেবায় সমস্ত দেশবাসীকে নিয়োজিত করার সকল বাধা দূর করিতে পারেন। শান্তি প্রচার আজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, বিগত দিনের বিরোধের দরুন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ত মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে এতদিন হিন্দু-মুসলমান দুইটি শিবির হইতে পরস্পর লড়াই করিয়াছে। জনাব নাজিমউদ্দিন ভুল বুঝিয়াছেন যে, আমি যদি পূর্ববঙ্গে প্রচার চালাই তবে তাহাতে পূর্ববঙ্গ সরকারের নিন্দা করা হইবে। বরং পূর্ববঙ্গ হইতে আমি যেসব বিবৃতি দিয়াছি তাহা পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হইতেছে বলিয়া যে ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা দূর করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। আমি বার বার একথা বলিয়াছি যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনসাধারণ তথাকার হিন্দুদের প্রতি শুভেচ্ছা পোষণ করেন এবং এই মনোভাবকে সংগঠিত রূপ দিতে পারিলেই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

পূর্ববঙ্গে যাইবার কারণ

পূর্ববঙ্গকে আমার কর্মক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করিবার অন্য কারণও আছে। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ এলাকাই অমুসলমান শূন্য হইয়াছে, এমনকি সিন্ধুতে এই কথা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের বাস্তুত্যাগ বন্ধ করিবার কোনো উপায় নাই। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এখনও কিছু করিবার সময় আছে। যদি হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ বন্ধ করা না যায় এবং বাস্তুত্যাগীরা ফিরিয়া না যায় তবে স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তিক্ততা বাড়িবে। কারণ হিন্দুরা যদি অধিক সংখ্যায় বাস্তুত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে তবে ভারতে তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফলে মুসলমানদের পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। বস্তুত, বাস্তুত্যাগ একবার শুরু হইলে সমস্ত মুসলমানকেই ভারত ত্যাগ করিতে হইবে অথবা ধ্বংস হইতে, ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে বা হীন জীবন স্বীকার করিয়া বসবাস করিতে হইবে।

ইহা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, পাকিস্তান ভারতীয় ইউনিয়নের সব মুসলমানের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিতে পারে না—পূর্ববঙ্গ হইতে সমস্ত হিন্দু চলিয়া আসিলেও না। স্বভাবতঃই ভারতের মুসলমানদের ভবিষ্যৎ ভাবিতেও ভয় হয়। এই সমস্ত বিষয় ছাড়িয়া দিলেও মানবতার দিক হইলেও দাবি করা যায় যে, পাকিস্তানের হিন্দুদের সমস্ত নাগরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাসহ সসম্মানে বাস করার ব্যবস্থা করা উচিত এবং এই বিষয়ে পূর্ববঙ্গের প্রশ্ন যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তাহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমি কোথায় সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রচার করিব সে বিষয়ে জনাব নাজিমউদ্দিনের উপদেশ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না।

পাকিস্তান সরকারের কর্তব্য

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যাবতীয় অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব পাকিস্তান সরকারের। ভারতের ১০ কোটি মুসলমানের নিরাপত্তা বিধানের জন্যই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, শুধুমাত্র ৬ কোটি মুসলমানের জন্য নহে। আমরা বলিয়াছিলাম, সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হইবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া। ভারতীয় নেতাগণ

www.pathagar.com

বলিয়াছিলেন উহার উল্টা। কাজেই এইসব কারণে পাকিস্তানেই প্রথমে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত।

জনাব নাজিমউদ্দিন আমাকে পশ্চিমবঙ্গে শান্তি প্রচারের কাজে মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের জন্য আমি কি করিতেছি তাহা তাঁহারা জানেন। আমার মনে হয়, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করিয়া আমি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের স্বার্থই বেশি করিয়া রক্ষা করিতেছি। পূর্ববঙ্গে সফর করিয়া, না পশ্চিমবঙ্গের যত্রতত্র ঘুরিয়া আমি মুসলমানদের বেশি সেবা করিতে পারিব, তা বিচারের ভার আমারই।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়

আমি বিশ্বাস করি, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের শুভেচ্ছার উপরেই সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা এবং শান্তি অনেকাংশে নির্ভর করে। কাজেই মুসলমানদের উচিত পাকিস্তানের শান্তির জন্য কাজ করা এবং হিন্দুদের উচিত ভারতীয় ইউনিয়নে কাজ করা। ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমানদের প্রতি ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি একজন মহৎপ্রাণ হিন্দুনেতা সোচ্চারেই ঘোষণা করিয়াছেন। অনেক হিন্দুনেতা কেবল প্রতিশ্রুতিই দেন নাই, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রচারের জন্য বহু সভা-সমিতিতে বক্তৃতাও দিয়াছেন।

পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ঘটনার প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানে ভাল-মন্দ যাহাই ঘটুক তার প্রতিক্রিয়া ভারতীয় ইউনিয়নে দেখা দিবেই। কাজেই ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান শুধু একটি কাজই করিতে পারে। তাহা হইল পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রতি উদার ব্যবহার, যাহাতে হিন্দুরা পাকিস্তান ছাড়িয়া পালাইয়া আসিয়া ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমানদের ভাগ্যেই দুর্বিপাক ডাকিয়া না আনেন।

পাকিস্তানী মন্ত্রীদের কর্তব্য

পাকিস্তানের মন্ত্রীগণ যদি নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রচার করিতেন এবং সরকারী কর্মচারীদের সামনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের আশ্বাস দিতেন তবে পাকিস্তানের কোনো স্থানেই কোনো সভা-সমিতির আয়োজন আমি করিতাম না। আমি আমার আগের বিবৃতিতেই এই তাগিদ দিয়াছিলাম। কিন্তু কোনো ফল হয় নাই।

পূর্ববঙ্গ সরকারের অভিযোগ

জনাব নাজিমউদ্দিন তাঁহার কল্পনার বল্গা ছাড়িয়া দিয়া আমার নামে বহু অসত্য এবং উদ্দেশ্যমূলক অভিযোগ আনিয়াছেন। শান্তি মিশনের সফর বন্ধ করিবার মতো গর্হিত কাজের সাফাই দিবার জন্যই এইসব অপপ্রচার করা হইতেছে বলিয়া আমি মনে করি। নাজিম সরকারের এশ্‌তেহারে যে সব অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা আরও উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত। পাকিস্তানের ক্ষতি সাধন করা তো দূরের কথা, আমি বরং হিন্দুদের কাছে ইহাই অনুরোধ করিয়াছি যে, পাকিস্তানকে যেন তাঁহারা আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ দেন এবং পাকিস্তানে যেন তাঁহারা অনুগত নাগরিক হিসাবে বসবাস করেন।

পাকিস্তান সরকারের সহিত বহু বিষয়ে আমার মতভেদ থাকিতে পারে। ভারতেরই হউক আর পাকিস্তানেরই হউক, সরকারের সহিত মতবিরোধ সকলেরই কিছু না কিছু আছে। পাকিস্তানের যে সব নেতাকে জাতীয় নেতা বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইতেছে তাঁহাদের সকলের সহিত আমার সকল বিষয়ে মতৈক্য থাকিবে, এমন কোনো কথা নাই। যাহা হউক,

www.pathagar.com

এটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কথা হইল এই যে, সরকার আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হইলে দুই দেশেই সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ তাড়াতাড়ি আগাইয়া যাইবে। যাহা হউক, শান্তি প্রতিষ্ঠার যে কাজে আমি আত্মনিয়োগ করিয়াছি, বৃথা সমালোচনা করিয়া তাহাকে আমি ব্যাহত হইতে দিব না।

পাকিস্তানী নেতাদের সমালোচনা

আমার মনে হয়, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের মূল কারণ এই যে, আমি নাকি পাকিস্তানের নেতাদের নামে কুৎসা রটাইয়াছি। আমি এইসব অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। এইগুলি ভিত্তিহীন। পাকিস্তান সরকারকে আমি এই ফ্যাসিস্ট মনোভাব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করি। তাহা না হইলে আমাদের দ্রুত পতন অবশ্যম্ভাবী। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, আমি রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের উৎসাহ দিয়াছি, গোপনে তাহাদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছি, সরকার উচ্ছেদের জন্য জনসাধারণের মধ্যে ঘৃণা প্রচার করিতেছি এবং উভয় বঙ্গের পুনর্মিলন ও পূর্ববঙ্গকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি! এইগুলি সত্যিই গুরুতর অভিযোগ। কিন্তু ইহা এতই ভিত্তিহীন, মিথ্যা, অবিশ্বাস্য এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক যে, কোনো গবর্নমেন্ট এই রকম অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে, একথা ভাবিতেও বিস্মিত হইতে হয়। এই অভিযোগ যদি দশ ভাগের এক ভাগও সত্য হয় তবে তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া বা অন্য যে-কোন শাস্তি দেওয়া উচিত। খোদাই জানেন, কোথায় রাষ্ট্রদ্রোহীরা! পাকিস্তান সরকার মনে করেন, রাষ্ট্রদ্রোহীরা সর্বত্রই বিরাজমান। সমস্ত জিনিসটি এতই বাজে এবং উদ্ভট যে, সাধারণ জ্ঞান-বিশ্বাস মতে অভিযোগ অস্বীকার করা ছাড়া আর কিভাবে ইহার জবাব দেওয়া যায়, তাহা আমার জানা নাই। আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি পাকিস্তানবাসীর চোখে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই এই অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। অভিযোগ আনার আর একটি কারণ এই যে, আমি পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলমানদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছি, পাকিস্তানের মন্ত্রীদের সভার চেয়ে অনেক বেশি লোক আমার সভায় আসিয়াছে।

উভয় বঙ্গের পুনর্মিলন

আমি ভারত ও বঙ্গ বিভাগ মূলনীতি হিসাবে মানিয়া লইয়াছি এবং বহু জনসভায় ইহা বলিয়াছিও। ইহার পরেও আমি কতিপয় লোক লইয়া পুনর্মিলনের জন্য গোপনে কাজ করিব তাহা ভাবাও হাস্যকর। আমি কখনও প্রকাশ্যে বা গোপনে পুনর্মিলনের জন্য প্রচার করি নাই বা পুনর্মিলন সমর্থন করা হয়, এমন কোনো মতামতের প্রতিও সমর্থন জানাই নাই।

সর্বশেষে আমি জনাব নাজিমউদ্দীনের চিঠির বিষয়ে কিছু বলিব। বলা হইয়াছে, আমি অন্য ডোমিনিয়নের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিতে পারি না। আমি বলিতে চাই যে, আমি দুই ডোমিনিয়নেরই উন্নতি চাই। এক ডোমিনিয়নের প্রতি অনুগত হওয়ার অর্থ অন্য ডোমিনিয়নের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়া নহে। যে যাহাই বলুক না কেন, সরকার পরস্পরের সহিত যুদ্ধরত নহে। ইহাছাড়া নাগরিক অধিকার লাভ করা সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট নীতি এখনও গৃহীত হয় নাই।

ভারতীয় মুসলমানদের পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জন্য কিছু বলিবার নাই বলিয়া জনাব নাজিমউদ্দিন উল্লেখ করিয়াছেন। আমি পাকিস্তানের রাজনীতি হইতে দূরে সরিয়া আছি।

www.pathagar.com

তবে একথা সত্য যে, তাঁহার বিরুদ্ধে যখন বিরোধী দল খুব শক্তিশালী ছিলো তখন আমি যদি পাকিস্তানে যাইতাম তাহা হইলে তাহার মন্ত্রিসভা উল্টাইয়া যাইত। আমি যাই নাই, কারণ সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠাকেই আমি বড় কাজ বলিয়া মনে করিয়াছি।

আমার নিজের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, পাকিস্তানের হিন্দু এবং ভারতের মুসলমানদের জন্য সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনের কাজ আমাকে চালাইয়া যাইতে হইবেই বলিয়া আমি মনে করি। আমি এই আশায়ই অপেক্ষা করিতেছি যে, পাকিস্তান সরকার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিবেন এবং শান্তি মিশনের কাজ চালাইয়া যাইবার জন্য আমাকে সুযোগ দিবেন।

www.pathagar.com

সদ্য কারামুক্ত নেতা

বিপুল কর্মশক্তির অধিকারী এই মানুষটি– থামতে জানেননি, বিশ্রাম নিতেও নয়। কর্মহীন মুহূর্ত-বিলাসের অগৌরব যাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। কেননা, জীবনের উত্তাপে তিনি প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছিলেন একটি গোলাপ। বাঁচবার সাধনায় যে গোলাপ রক্তিম। যে গোলাপ শত কাঁটার লাঞ্ছনা সহ্য করেও জন্মগত অধিকার আদায়ের বাসনায় উজ্জ্বল।

ঈর্ষণীয় দৈহিক আর অগাধ মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন এই মানুষটি, অমিততেজা সিংহপুরুষ—

কিন্তু কারাগারের নিঃসঙ্গ কর্মহীন প্রহর তাঁকে কি দিয়েছে!

প্রগাঢ় আত্মবলে বলীয়ান ছিলেন এই মানুষটি, কোনো গর্ব আর ভীরুতা গ্রাস করেনি যাঁকে—

কিন্তু লৌহকপাটের নিরুদ্ধ বাতাস তাঁকে কোন্ কুহকের প্রচ্ছায়া দান করেছিলো!

তাঁর সে সব স্মরণীয় শক্তিনিচয় কোথায় হারালো এবং কেন?

মুক্তি পেলেন তিনি। তা কি সত্যিই মুক্তি? না অবসাদের ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন এ পৃথিবী' এ আকাশ? কোথায় নির্মল মুক্ত বায়ু, যার নিশ্বাস নিয়ে আবার প্রাণের সাগরে উদ্দাম বন্যা আর উত্তাল জোয়ার আসবে?

আসবে না। যেহেতু স্বৈরাচারী, অগণতান্ত্রিক সরকারের মিথ্যা করাল হাত তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে কারাগারে, লৌহকপাটের অন্তরালে, পরিয়েছে ছলনায় ভরা নিরেট শিকল। যেহেতু এই মিথ্যার শিকার হয়ে তিনি হারিয়েছেন দেহ আর মনের সকল ক্ষমতা, সকল শক্তি; প্রথম মৃত্যু ঘটেছে তাঁর।

তাই কারামুক্তির পর উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে যে মুক্তির পরম নিশ্বাসের আশা তিনি করেছিলেন, সে বাসনা হলো বিবর্ণ। চলার, বলার স্বাধীনতা এবং ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছেন তিনি, আর এদেশের স্বৈরাচার-নিপীড়িত জনগণ; কি করে মাথা উঁচু করে, অকুণ্ঠ সত্য আর বিশ্বাসে বলীয়ান হাত তুলে তিনি দাঁড়াবেন!

পথের মাঝখানে তাই দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। সামনের দিকে চাইতে গিয়ে চোখ বন্ধ করলেন তিনি; ধূসর শূন্যতা শুধু, দেশের প্রতিটি অঙ্গনে এবং তাঁর দেহে-মনে। ব্যথা, বিষাদ আর নিরাশা অবসন্ন করেছে তাঁকে।

সেদিন লোহার গরাদ পেরিয়েই তাঁকে বরণ করে নিতে হয়েছিল আরোগ্য

www.pathagar.com

নিকেতনের শয্যা। কারাগার অনেক দিয়েছে তাঁকে—নিঃশক্ত হবার নির্মম বেদনা, মৃত্যুর গোপন সংকেত, এক চির-অনারোগ্য ব্যাধি, আরোগ্য নিকেতনও যা থেকে তাঁকে মুক্ত করতে পারেনি, যেটুকু করেছিল তা কেবল সাময়িক মাত্র। তবু ···

তবু সব ব্যথা, বিষাদ আর নিরাশার অবসান ঘটলো; ফিরে পেলেন তিনি সেই সঞ্জীবনী শক্তি, যা তাঁকে নতুন করে এনে দিলো দুর্বার মানসিক গতি। এ শক্তি, এ গতি কোথায় পেলেন তিনি?

আরোগ্য নিকেতনের অবসাদ ভরা অলস শয্যা ছেড়ে সবুজ ঘাসে পা রাখলেন তিনি। দেখলেন, নিথর বেদনায় থমকে থাকা, অথচ কি আশার শিখায় প্রচ্ছন্ন প্রজ্বলন্ত দেশের অগণিত সাধারণ মানুষের মন আর চোখ। দুরন্ত আবেগে তিনি ফিরিয়ে আনতে চাইলেন সেই তিনিকে—বয়সের ভার যাঁর যৌবনকে ক্ষুণ্ন করতে পারে না, গতিহীন করতে পারে না।

লাখো মানুষের হৃদয়-আকাঙ্ক্ষার অংশীদার হলেন তিনি আবার; মন উজ্জীবিত হলো, উল্লসিত হলো অনিয়মতান্ত্রিকতায় অবসাদগ্রস্ত মানুষের মনে আবার নতুন আশা-দিগন্তের পট উন্মোচিত করার আগ্রহে, গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংগ্রামে সৈনিক হবার সৌভাগ্যে। প্রিয় দেশবাসীর প্রাণের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেবার, হৃদয়ের মাঝে বিলিয়ে দেবার সাধনা যাঁর আজীবনের, হাসি উদ্ভাসিত হলো তাঁর ক্লান্তি-মধুর অধরে, বিষণ্ন-প্রদীপ চোখের তারায়; হাসি ফুটলো দেশের মানুষের মুখে, আশা জাগলো তাদের বুকে।

তাই তাঁকে আবার দেখলো সবাই নিজেদের মাঝে; দেখলো, ঝঞ্ঝার বেগে দেশের শহর-বন্দর-গ্রামের অগণন মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মেলাতে। আবার তিনি আশা দিলেন, সোনালী সূর্যের আশ্বাস দিলেন, সংশয়ের সকল কাঁটা নিশ্চিহ্ন করার প্রতিশ্রুতি আনলেন সবার মনে।

শেষ প্রহরের স্বাক্ষর

কে. এ তালেব

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৩ সাল। সকালে উঠতে যেয়েই হঠাৎ দেখি ওঠার মতো অবস্থা নেই। ঘাড়ের ব্যথায় ঘাড় ফিরাবার বা সহজে উঠে চলাফেরা করার মতো অবস্থা আর আমার নেই। সুতরাং অফিসে অসুখের সংবাদ পাঠিয়ে ইজিচেয়ারে পড়ে রইলুম।

বেলা বোধহয় তখন পাঁচটা হবে। টেলিফোনে কোনো এক অপরিচিত, কিন্তু উদ্বিগ্ন কণ্ঠের প্রশ্ন এলোঃ 'শহীদ সাহেব নাকি মারা গেছেন?' জবাব দেবো কি? প্রশ্নটারই অর্থ বুঝতে পারলাম না। পাল্টা প্রশ্ন করলাম—*E*কি বললেন?' এবারেও সেই একই প্রশ্ন। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারিনে—তাছাড়া এই নিদারুণ সংবাদের জন্যে প্রস্তুতও ছিলাম না। তবু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, অফিসে ফাইভ সেভেন জিরো থ্রিতে.... কথা শেষ করার আগেই অন্য প্রান্ত বললো—সে নম্বর পাচ্ছি না। ··· ভদ্রলোককে তাঁর নাম্বার দিতে বললাম এবং প্রতিশ্রুতি দিলাম তাঁকে পরে জানাবো।

তারপর নিজের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। না, সে নম্বরও এনগেজড্। তারপর পর্যায়ক্রমে ঢাকার সব কয়টি পত্রিকা অফিসে ডায়াল করলাম। কিন্তু একই ফল। অবশেষে ইত্তেফাকের একাউন্টস ডিপার্টমেন্টের টেলিফোনের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারলাম—বৈরুতে শহীদ সাহেব মারা গেছেন। খবর সত্য। 'খবর সত্য' জেনে 'জগলুল পাশা' কবিতার গোড়ার লাইন দুটো স্বাভাবিকভাবেই মনে এসে গেলঃ

'প্রাচীর দুয়ারে শুনি কলরোল
সহসা তিমির রাতে।
মিশরের শের, শির শমশের
সব গেল এক সাথে।'

সত্যি আজ আমাদের সব গেল এক সাথে। পাকিস্তান সংগ্রামের অন্যতম নায়ক, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ বলেই শুধু নয়—পাকিস্তানে গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সিপাহসালার, লক্ষ-কোটি মানুষের প্রিয়তম নেতা, সারা পাকিস্তানের সর্বশেষ জননেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে সত্যিই আজ সব গেল এক সাথে।

আজ সোহরাওয়ার্দী সাহেব নেই—নেই বলেই আজ তাঁর চেহ্লাম। কিন্তু তাঁর সত্যিকারের মূল্যায়নের দিন আজও আসেনি। এখন শুধু উপলব্ধিবোধ জাগছে—আরও দিন যাবে—সত্যকার সংগ্রামে যখন পদে পদে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত জাতি নেতৃত্বের জন্য তাকাবে—সৈনিক যখন নির্দেশের জন্য সিপাহসালারের দিকে মুখ তুলে চাইবে—তখন এবং একমাত্র তখনই আমরা বুঝবো আমরা কি হারিয়েছি। তখনি বুঝবো, তিনি কি ছিলেন। অনায়াসলভ্য বাতাসের যে একটা মূল্য আছে তা যেমন আমরা তখনই বুঝি যখন কোনো কারণে সেই বাতাস আমাদের কাছে দুর্লভ হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

তাঁর চেহ্‌লাম উপলক্ষে আজ কত কথাই না মনে পড়ে। মনে পড়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলাদেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শহীদ সাহেবের ঝটিকা অভিযান! দুর্বার ঘূর্ণির মতো পাকিস্তানের মন্ত্র নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটে চলেছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। বাংলার প্রধানমন্ত্রী। সেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সার্থক হলো—সে কেবল সোহরাওয়ার্দীর জন্য। বাংলাদেশ কোটি কণ্ঠের গর্জনে সেদিন 'পাকিস্তান চাই' বলে ভীম ভৈরব আওয়াজ না তুললে পাঞ্জাব-সিন্ধু-সীমান্তের ক্ষীণ ধ্বনির পুঁজি নিয়ে কায়েদে আজমের পক্ষেও পাকিস্তান কায়েম করা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। আর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রাণপণ প্রচেষ্টা না থাকলে বাংলাও অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশের মতো বড়োজোর ক্ষীণকণ্ঠে কোনোমতে 'পাকিস্তান চাই' বলেই থেমে যেতো।

১৩ই জানুয়ারি, ১৯৬৪ সাল। পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানে পূর্ণ গণতন্ত্র ও মৌলিক-মানবিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামের সিপাহসালার, পাকিস্তানের ১০ কোটি মানুষের প্রিয়তম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চেহ্‌লাম। মৃত্যুর চল্লিশতম দিন।

'৬৪ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে স্বতঃই মন চলে যায় ১৯৬২ সালের জানুয়ারির শেষদিকে। ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৬২। জাতীয় নেতা—যাঁর ইন্তিকালে সরকার জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রেখেছিলেন—এই দিন তাঁকেই দেশদ্রোহের অভিযোগে করাচীর কারাগারে যেতে হয়। যে করাচীর বুকে প্রধানমন্ত্রী ভবনে থেকে একদিন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সারা দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছেন—সেই করাচীর কারা প্রাচীরের অন্তরালে এই দিনই তাঁকে বন্দী জীবন যাপন করতে হয়। ভাগ্যের পরিহাস!

তারপর এই করাচীর জেলে তাঁকে একটি একটি করে পুরো ২০২টি দিন কাটাতে হয়। ক্ষমতায় বা ক্ষমতার বাইরে থাকাকালে দৈনিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যাঁকে ২০ ঘণ্টাকালই দেশের জন্যে কাজ করতে হয়েছে, সেই সোহরাওয়ার্দীকে দেশবাসীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগের অভাবে তাঁর আদরের ময়নাটির সঙ্গে কথা বলে কাটাতে হয়েছে। কাজের অভাবে কারাগারে বসে শর্টহ্যাণ্ড শিখতে হয়েছে। কে জানে, এই শর্টহ্যাণ্ড শেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আয়ুষ্কালও 'শর্ট' হয়ে এসেছিল কিনা।

সাত মাসাধিককাল পরে ১৯৬২ সালের ১৯শে আগস্ট 'দেশদ্রোহী' সোহরাওয়ার্দীকে করাচীর কারাগার থেকে মুক্ত করা হলো। ভাঙ্গা বুক, ভাঙ্গা স্বাস্থ্য আর খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে (সেকি শাসক পক্ষের অসংখ্য খোঁচার প্রতীক?) দেশদ্রোহের অভিযোগভুক্ত হয়ে জননেতা করাচীর কারাগার ছেড়ে আবার মুক্ত আকাশের তলে বেরিয়ে এলেন। কারামুক্ত হলেও সেদিন তিনি কারাগারে অর্জিত রোগ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তাই জেল থেকে বেরোনোর মাত্র ৩ দিন পরেই তাকে করাচীর জিন্নাহ হাসপাতালে যেতে হয় এবং প্রায় মাসখানেক তাঁকে সেখানেই থাকতে হয়।

তারপর '৬২ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তিনি কারামুক্তির পর প্রথম ঢাকায় এলেন। ঢাকা সেদিন তার প্রিয়তম নেতাকে যে সম্বর্ধনা জানালো, সে গণসম্বর্ধনার একটি মাত্র নজিরই ঢাকার ইতিহাস জানে—আর সে নজিরও স্থাপিত হয় তাঁর—না তাঁর নয়, তাঁর লাশবাহী কফিনের ঢাকা আগমনের দিনে। সে এক ইতিহাস। সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আর হবে কিনা জানিনে, তবে যদি হয় তা ভবিষ্যৎ বংশধরেরাই দেখবে—আমরা নই।

www.pathagar.com

'৬২-র ১৬ই সেপ্টেম্বরে আবার ফিরে যাই। ঢাকা বিমানবন্দরে তিল ধারণের জায়গা নেই। সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে বিমানখানি তেজগাঁ বিমানবন্দর স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্রোত সব বাঁধ ভেঙ্গে বিমানের দিকে ছুটলো। ৮ মাস পরে তারা আবার তাদের প্রাণের নেতাকে দেখবে। মানুষের ভিড়ে এয়ারপোর্টের রানওয়ে পর্যন্ত ভরে গেল! আমরা সাংবাদিকরা সবাই সেই মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেলাম। শুধু আমরা নই, হারিয়ে গেলেন অন্যসব নেতা, এমনকি খোদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবও। বিমানে সিঁড়ি লাগানো সম্ভব হলো না। শেষ পর্যন্ত এয়ারপোর্টের বিশেষ ধরনের গাড়িতে (এলিভেটর) করে দূরে রানওয়ে থেকে তাঁকে নামিয়ে আনা হলো। কিন্তু সে গাড়ি থেকেও কি তিনি নিচে নামতে পারেন! তাঁকে শুধু একবার দেখার জন্যে, তাঁর মুখের একটা কথা শোনার জন্যে ঢাকা যেন সেদিন পাগল! সকলেই ভিড় করেছে তাঁর গাড়ির পাশে। নিচে নামার জায়গা কই!

অবশেষে বহুক্ষণ পরে মাইক নিয়ে তিনি নিজেই জনতাকে অনুরোধ করলেন পথ ছেড়ে দিতে, প্রতিশ্রুতি দিলেন ২১ তারিখে পল্টন ময়দানে তিনি তাঁর প্রিয়তম দেশবাসীকে তাঁর প্রাণের কথা বলবেন। তাঁর কথাতেই মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতো নম্রশির মানুষ তাঁর নামার পথ করে দিলো। তিনি নামলেন। তাঁর গাড়ি ধীরে ধীরে ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে চলতে লাগলো। আর সঙ্গে চললো ঢাকার অগণিত মানুষের মিছিল—অগণিত মানুষ নয়—যেন গোটা ঢাকা শহর। 'সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদের' লক্ষ কণ্ঠধ্বনিতে বিমানবন্দরের আকাশ-বাতাস মুখরিত হলো। পুষ্পমাল্য ও পুষ্প-বৃষ্টিতে শহীদ সাহেব ঢেকে গেলেন।

২১শে সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে বক্তৃতা করার প্রতিশ্রুতি কিন্তু শহীদ সাহেব রাখতে পারেননি। তাঁর ঢাকায় আসার পরদিনই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের শোভাযাত্রার ওপর গুলী চললো। রাজপথে অকালে ঝরে পড়লো আরও কয়েকটি সম্ভাবনাময় জীবন। লুটিয়ে পড়লো পথের ধুলোয় আরও কয়েকটি আদম-সন্তান। আর বৃষ্টির দরুন পল্টনেও আর জনসভা করা সম্ভব হলো না। ২২শে সেপ্টেম্বর তিনি আবার করাচী ফিরে গেলেন।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারলেও শহীদ সাহেব তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা ভোলেননি। যেমন ভোলেননি জীবনে কখনও এদেশের ১০ কোটি মূঢ়-ম্লান-মূক মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করার পবিত্র ব্রত। তাই ৭ই অক্টোবর আবার তিনি ঢাকায় ফিরে এলেন এবং সেদিনই পল্টন ময়দানে লক্ষ মানুষের জনসভায় এ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের দাবি বজ্রনির্ঘোষে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলোঃ পূর্ণ গণতন্ত্র আমরা চাই, আমরা চাই মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার। 'আলো চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু, সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।' সোহরাওয়ার্দী নয়—তাঁর কণ্ঠের ভেতর দিয়ে গর্জে উঠলো সারা পাকিস্তানঃ 'শাসনতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ন চাই।' সে কণ্ঠ আজ নীরব। কিন্তু সে কণ্ঠের আবেদন আজও পাকিস্তানের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত।

সেই সভায় জননেতা বললেন, দেশকে জাগতে হবে, জাগাতে হবে। দেশের সঙ্গে স্থাপন করতে হবে গণসংযোগ। তন্দ্রাচ্ছন্ন গণদেবতাকে জাগাতে হবে। যে গণদেবতা জাগলে কোনো শক্তির সাধ্য নেই তার দাবিকে অগ্রাহ্য করার, উপেক্ষা করার, স্তব্ধ করার।

তাই পল্টন ময়দানের ঐতিহাসিক জনসভার মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল সোহরাওয়ার্দীর গণসংযোগ অভিযান। ১১ই অক্টোবর যশোরের টাউন হল ময়দানে অনুষ্ঠিত

www.pathagar.com

হলো প্রথম গণসংযোগ জনসভা। সেদিন যশোরে যে বিপুল জনসমাগম হয়, যশোরের ইতিহাসে তার নজির নেই। লক্ষ লোকের সেই জনসভায় মেঘমন্দ্র কণ্ঠে সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করলেন, 'গোলামির অভিশাপমুক্তির জন্য গ্রামে গ্রামে আন্দোলন গড়ে তুলুন।' গর্জে উঠলো জনতাঃ 'গণতন্ত্র আমাদের চাই, মৌলিক অধিকার আমাদের জন্মগত অধিকার।' তার পরদিনই খুলনার সার্কিট হাউস ময়দানে জননেতা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেনঃ 'জনগণের সমর্থন ছাড়া দেশ শাসনের অধিকার কারও নেই।' পরদিন বরিশালের এ. কে. স্কুল ময়দানের বিরাট জনসভায় তিনি আবার ঘোষণা করলেন, 'গণতান্ত্রিক পথে অর্জিত পাকিস্তান গণতন্ত্রের মাধ্যমেই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হবে।'

১৪ই অক্টোবর চাঁদপুরে জনসভা। সোহরাওয়ার্দীকে দেখার আগ্রহ-আকুল বিরাট জনতার পদভরে সেদিন চাঁদপুর জেটির সেতু ভেঙ্গে গেল। সোহরাওয়ার্দীসহ সকল নেতাই নদীতে পড়ে গেলেন। কিন্তু খোদার রহমতে কেউ মারাত্মক আহত হননি। সেদিন সেতু ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে আমরা দেখেছিলাম জনগণের সঙ্গে জননেতার প্রাণের সেতু কি মজবুতভাবেই না বাঁধা হয়ে গেছে!

চাঁদপুরের বৃহত্তম জনসভায় সোহরাওয়ার্দীর কণ্ঠ সেদিনও গর্জে উঠেছিলঃ 'গণসমর্থনহীন সরকারের দেশ শাসনের অধিকার নেই।'

চাঁদপুরের সঙ্গে সঙ্গে গণসংযোগ অভিযানের প্রথম পর্যায় শেষ হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে এই সফর চললো রাজশাহী, রংপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, মাদারীপুর, সিলেট, নোয়াখালী, মাইজদী, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বগুড়া, দিনাজপুর, পাবনা ও সিরাজগঞ্জে। বিরাট বিরাট জনসভায় বক্তৃতার মাধ্যমে সেদিন জননেতা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে দেশবাসীকে জানিয়ে দেন—মৌলিক অধিকার তোমাদের জন্মগত অধিকার, গণতন্ত্র তোমাদের ন্যায্য দাবি। দেশ স্বাধীন করেছে তোমরা। স্বাধীন দেশের শাসনকার্য পরিচালনার হক তোমাদেরই।

দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষও সেদিন জনসভায় উপস্থিতির মাধ্যমে, হস্ত উত্তোলনের মাধ্যমে এবং বজ্রনির্ঘোষে 'গণতন্ত্র চাই' দাবির মাধ্যমে তাদের সমর্থনের কথা, অধিকার সচেতনতার কথা তাঁকে জানিয়ে দেয়। ৭১ বছরোত্তীর্ণ নেতাকে সেদিন ভগ্নস্বাস্থ্য উপেক্ষা করে যেভাবে দেশের মধ্যে গণজাগরণ আনার জন্যে আরাম-বিরাম ভুলে প্রাণের টানে এক জেলা হতে অন্য জেলা, এক জনসভা হতে অন্য জনসভায় উল্কার মতো ছুটে যেতে দেখেছি, আজ চেহলামের দিনে সে কথা বারবার মনে পড়ছে। তাঁর দিন যে সংক্ষেপ হয়ে এসেছে, প্রিয়তম দেশবাসীর সঙ্গে আর যে দেখা হবে না তা কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন? সেজন্যই কি তিনি জনমশোধ তাদের কাছে শেষ কথা জানিয়ে দেয়ার শেষ শপথ আদায় করার জন্যে পাগল হয়ে ছুটে বেড়িয়েছিলেন। মনে পড়ে, পল্টন ময়দানের জনসভায় সোহরাওয়ার্দী সাহেব বলেছিলেন, 'দেশে আজ নবজাগরণ এসেছে।' সে বক্তৃতা শুনেছিলাম, ইত্তেফাকে রিপোর্টও করেছিলাম, কিন্তু এই নবজাগরণ যে কি বস্তু, কি তার চেহারা, কতখানি তার গভীরতা, ঢাকায় থেকে তা অনুমানও করতে পারিনি।

সে জাগরণ দেখেছিলাম ১১ই অক্টোবর যশোর থেকে শুরু করে ৯ই ডিসেম্বর ('৬২) পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় সোহরাওয়ার্দী সাহেবের গণসংযোগ সফরের সময়। যে

www.pathagar.com

রাস্তা দিয়ে তিনি গেছেন, যে নদীর ওপর দিয়ে তাঁকে নিয়ে স্টিমার গেছে, সে পথে, সে নদীতীরে, সে স্টেশনে, সে ঘাটে আগ্রহ আকুল মানুষের সে কী ভিড়! কত দিনের কত খররৌদ্র, কত রাত্রির কত শৈত্য অগ্রাহ্য করে অসংখ্য মানুষকে রাস্তার ধারে, স্টেশনে, ঘাটে, তাঁকে শুধু এক নজর দেখার জন্য, শুধু একবার তাঁর দুটো কথা শোনানার জন্যে যে জেগে থাকতে দেখেছি! মনে হয়েছে, সারা বাংলা যেন সোহরাওয়ার্দীর কথা শোনার জন্যে উদগ্র আগ্রহ আর উদ্যত কর্ণ নিয়ে দিন-রাত জেগে আছে! মানুষের এই আকুল আগ্রহে কতবার তাঁর যাত্রা বিলম্বিত হয়েছে, কত জায়গায় তাঁকে হঠাৎ জমে ওঠা জনসভায় বক্তৃতা করতে হয়েছে, কত রাতে তাঁকে ঘুম থেকে জেগে উঠে গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে হয়েছে! কুমিল্লা থেকে রাত ৮টায় বেরিয়ে ফেনী যাবার পথে পর পর ছয়টা জনসভার বক্তৃতার পর রাত্রি দেড়টায় দেখেছি তীব্র শীতের মধ্যে ফেনীর মিজান ময়দানের জনসভায় তিনি বক্তৃতা করে চলেছেন। কী অসীম ধৈর্য, কী অসীম কষ্ট-সহিষ্ণুতা!

রেল-স্টিমার কোম্পানীকেও কম ঝক্কি পোহাতে হয়নি। যে ট্রেনে সোহরাওয়ার্দী সাহেব চলেছেন, যে স্টিমারে সোহরাওয়ার্দী সাহেব চলেছেন সেই ট্রেন, সেই স্টিমার অনিবার্যভাবে ‘লেট’ হয়েছে। সে লেট কখনো একঘণ্টা দু’ঘণ্টা। আবার কখনোবা ৫-৬ ঘণ্টা। তবু অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি কি ট্রেনযাত্রী, কি স্টেশনে সমবেত প্রতীক্ষমাণ জনতা কারো মনে বিরক্তি নেই। আর সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দর্শন পাওয়ার পর, তাঁর কথা শোনার পর যে উল্লাস ও আনন্দধ্বনিতে সমগ্র জনতা ফেটে পড়েছে তার তুলনা নেই। আর তাদের সেই আনন্দ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাদের প্রিয় নেতার মুখ স্নিগ্ধ অনাবিল গম্ভীর শান্তিতে।

এইসব দেখেছি আর বার বার শুধু ভেবেছি, কে কাকে বেশি ভালবাসে? সোহরাওয়ার্দী সাহেব জনতাকে, না জনতা সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে? এ প্রশ্নের কোনো জবাব আজও খুঁজে পাইনি। তবু এই ‘গণজাগরণ’ দেখেছি আর ভেবেছি—

‘জেগেছিস তোরা জেগেছে বিধাতা
নড়েছে খোদার কল।’

মনে হয়েছে ঃ

‘ওরে ভয় নাই আর ভয় নাই
জাগিয়া উঠেছে হিমালয় চাপা প্রাচী
গৌরী-শিখর তুহিন ভেদিয়া
জাগিছে সব্যসাচী।’

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খবর এলো, তিনি আসছেন....

রেজাউল মুস্তাফা
মুহম্মদ আসফউদ্দৌলা

অক্লান্ত পরিশ্রমী উদ্যমী নেতা কারাগার থেকে নিয়ে এসেছিলেন ভগ্নস্বাস্থ্য। কারাগারের অভিশাপ লৌহদৃঢ়চিত্তকে না ভাঙলেও ভেঙেছিলো তার বার্ধক্যে জীর্ণ দেহ। এ দেহের সুস্থতা যে আবার ফিরে পেতে হবে। মুমূর্ষু দেশ যে আর্ত চোখে তাঁরই দিকে চেয়ে আছে। তবু, রুগ্নদেহে তাঁর ঝটিকা সফরের ঝক্কি সইলো না। আবার সুস্থ হবেন, আবার দেশবাসীর সামনে এসে দাঁড়াবেন, ঝাঁপিয়ে পড়বেন সক্রিয় সংগ্রামে—বুকভরা এই আশা নিয়ে স্থান নিলেন তিনি করাচীর জিন্নাহ হাসপাতালে। কিন্তু সেখানেও ওরা তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিলো না।

কিন্তু গণতন্ত্রের উদ্যত নিশানকে অবনমিত করার জন্যে আবার কণ্ঠরোধ করলো শাসকগোষ্ঠী গণনেতার। দেহ-মনের ওপর বার বার এই নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেল। ভগ্নস্বাস্থ্য জীর্ণতর করে তুললো দেহকে, তাই প্রাণের চেয়ে প্রিয় দেশ ও দেশবাসীর শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদ নিয়ে আবার তাদেরই কোলে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষায় দেশবাসীর মনে প্রদীপ্ত আশার আলো জ্বালিয়ে চলে গেলেন তিনি বিদেশে স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় দূরে—বহুদূরে ভূমধ্যসাগরের তীরে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, অগণিত ভক্ত-অনুসারী দেশবাসীর থেকে বিচ্ছিন্ন বিদেশের এক হোটেলকক্ষে কাটতে লাগলো মাসের পর মাস। কালের পদচিহ্ন বয়োবৃদ্ধ নেতার দেহে কালো ছায়া ফেলছে; তবু আলোর অভিসারী সংগ্রাম করে চলেছেন কালব্যাধির সাথে কেবল অতুলনীয় মানসিক শক্তির সাহায্যে। সে শক্তির উৎস তাঁর দেশ ও দেশবাসীর প্রতি অফুরন্ত আন্তরিক প্রেম ও প্রীতি, ইতিহাস যার স্বাক্ষর রেখে গেছে স্বাধীনতা আন্দোলনের পাতায় পাতায় স্বর্ণ অক্ষরে। এই দুর্দমনীয় অটলচিত্ত শার্দুলকে বিদেশে বসেও বাণবিদ্ধ হতে হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের পক্ষ থেকে। তাঁকে বলা হয়েছে তিনি বিদেশের দালাল হিসেবে তাদের অর্থে বিদেশে অবস্থান করছেন। দেহকে ভেঙেছে, মনকেও ভাঙবার কি ঘৃণ্য প্রচেষ্টা! ... দেশবাসী জানে না এ নিদারুণ করুণ ইতিহাস। কেবল আশায় আশায় দিন গুণছে গণতন্ত্রের সর্বশেষ আশার অগ্নিমশালটির আলোর দিকে চেয়ে। আশায় বুক বেঁধে আছে নিরন্ন নির্যাতিত অগণিত জনতা। নেতার পদধ্বনির জন্য তারা উৎকর্ণ। 'ঐ মহামানব আসে দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে।'

বৈরুত থেকে মাঝে মাঝে খবর আসছে, জনাব সোহরাওয়ার্দীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে, তিনি স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাচ্ছেন, অমুক তারিখে তিনি দেশে ফিরছেন....আর সেই সাথে নেতার আগমন প্রতীক্ষ দেশবাসীর মন আশায় আশায় উদ্বেলিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

এমনি করে এক এক করে সাতটি মাস অতিবাহিত হলো। মাঝে মাঝে এঁর-ওঁর কাছে পত্রালাপ করে দেশের খবরা-খবরও নিচ্ছেন। চিঠিগুলো ব্যক্তিগত হলেও তার প্রতিছত্রই যেন কথা বলে। অল্প কথায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করছেন, নিজের অবস্থাও জানাচ্ছেন, এমন কি নিজের মামলা-মোকদ্দমার খবরা-খবরও নিচ্ছেন। দূর বিদেশে বসেও দেশের সবকিছু যেন তাঁর নখাগ্রে।

এমনি এক পর্যায়ে ২৯শে অক্টোবর (১৯৬৩) করাচীতে তাঁর জুনিয়র এ্যাডভোকেট হজরত আলীর কাছে তিনি লিখলেন ঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ

কন্টিনেন্টাল হোটেল, বৈরুত, (লেবানন)
২৯-১০-৬৩

প্রিয় হজরত আলী,

তোমার বিয়েতে অশেষ শুভাশিস ও মোবারকবাদ জানাই। কামনা করি, খুবই সুখী হও।

জানি না, কবে পাকিস্তানে ফিরবো। আমার অনুপস্থিতিতে সেখানে কোনো শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, এমনটা মনে হয় না। গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব এখন অন্যদের। আমি যথেষ্ট করেছি। কোনো পদের বা নেতৃত্বের ভার নেয়ার মতো অবস্থা আমার আর নেই। তাছাড়া, এখন আমাকে রুজি-রোজগার করে খেতে হবে। সুতরাং এখন আর দুই কূল সামলানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার স্বাস্থ্যের অবশ্য উন্নতি হচ্ছে, তবে ভয় হয় আবার যদি কখনো হৃদরোগে আক্রান্ত হই, তাহলে আমি হয়তো চিরদিনের মতো পঙ্গু হয়ে যাবো। তাই, খুব সতর্ক হয়েই আমাকে চলতে হবে।

কেউ যদি কাজ না করে, তবে কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। কেবল জনসভা করাই যথেষ্ট নয়। মুসলিম লীগকে গড়ে তুলতে কী পরিশ্রমই-না আমরা করেছি। আজো ঠিক সেভাবেই ব্যাপক খাটা-খাটুনির দরকার। আমাকে ছাড়াই আমার বন্ধুদের কাজ চালাতে শিখতে হবে।

আমার পাকিস্তানে ফেরা সম্পর্কে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছে—এখনো আমি কোনো তারিখ দিতে যাচ্ছি না। আমার জুনিয়রদের কাছ থেকে জানতে চাই, আমার মামলাগুলো কবে নাগাদ উঠতে পারে। স্টিমার কোম্পানীর বিরুদ্ধে আমার চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের মক্কেলরা (সংঘর্ষ মামলা) সুপ্রীমকোর্টে যে আপীল দায়ের করেছেন, কবে নাগাদ তা শুনানির জন্য উঠতে পারে, মোজাম্মিল হকের কাছ থেকে জেনে দিতে পারো কিনা, দেখো। পি-আই-ডি-সি'র দুটো মামলাও আমার হাতে আছে (মনে হয় লাহোরের মামলা)। এ মামলার এটর্নী কে ভুলে গিয়েছি, সম্ভবত আকরাম। (অবশ্য এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই)।

আমাকে দিয়ে সত্যিই যদি প্রয়োজন থাকতো তাহলে এখনই আমি আসতাম—তবে মনে হয় না যে, আমি গিয়ে অবস্থার কোনো উন্নতি করতে পারবো।

তোমাদের সকলের কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করি।

—স্নেহধন্য
শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

www.pathagar.com

এখানে আসার আগে যে মামলা চালিয়ে এসেছি, তাতে জিতলাম কিনা আর সে জমিটা হস্তান্তর হলো কিনা, জানতে ইচ্ছে হয়।

এরপর তাঁর আর একখানি পত্রে জানা গেল, তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে 'কোন্ খবিস শুয়ার' তাঁর বিরুদ্ধে এক জঘন্য প্রচারপত্র বিলি করেছে। আরো জানা গেল, তিনি ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ঢাকায় এসে পৌঁছাচ্ছেন। সেই অনুযায়ী পত্রিকায় খবরও ছাপা হলো যে, ৭ই ডিসেম্বর নাগাদ শহীদ সাহেব ঢাকা পৌঁছবেন। ১৩ই নবেম্বরের সে চিঠিতে তিনি ইত্তেফাক সম্পাদককে লিখলেন ঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ

কন্টিনেন্টাল হোটেল, বৈরুত, (লেবানন) ১৩-১১-৬৩

প্রিয় মানিক মিয়া,

আপনার পত্র পেয়ে খুশী হলাম। এখনো আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারিনি। কোনো রকম খাটুনির কিছু করতে বেশ কষ্ট হয়। আগামী ১৫ই তারিখে আমি জুরিখ যাচ্ছি, ফিরবো ২১ তারিখে; করাচী রওনা হবো নবেম্বরের শেষে বা ১লা ও ৩রা ডিসেম্বর নাগাদ। সেখান থেকে ঢাকা আসবো। ফিরে এসে আমি সারাক্ষণই আমার মক্কেলদের মামলার ব্যাপারে কাটাতে চাই। কেননা, দেনা-দায়িক ও ইন্‌কাম ট্যাক্স আমাকে শোধ করতেই হবে।

কোন্ খবিস শুয়ার এই মর্মে এক প্রচারপত্র বিলি করেছে যে, আমেরিকানরা আমাকে টাকা যোগাচ্ছে। অথচ বেচারা আহমদ আমার জন্যে এখান থেকে সেখান থেকে টাকা কর্জ করে মাসে মাসে আমার খরচ পাঠাতে পাঠাতে শেষ হতে বসেছে। ওদের আসল উদ্দেশ্য হলো আমাকে হেয় করা, আর আমার সম্পর্কে এই ধারণা প্রচার করা যে, একটি বিদেশী শক্তি আমাকে টাকা যোগাচ্ছে, ভাবখানা যেন আমেরিকানরা আমাকে টাকাও যোগাতে পারে, আর আমিও আমার ভরণপোষণের জন্যে অক্লেশে তাদের টাকা গ্রহণ করতে পারি।

আশা করি, আপনারা সকলেই ভালো। আমার জুনিয়রদের বলবেন যে, এ মাসের শেষেই আমি আসছি। এসেই মামলা পরিচালনার কাজ হাতে নেবো। কেবল সিঁড়িতে উঠার সময় আমাকে একটু ধরে নিয়ে যেতে হবে।

–স্নেহধন্য শহীদ।

ইত্তেফাক সম্পাদককে চিঠি লেখার চার দিন পর ১৭ই নবেম্বর তিনি জুরিখ থেকে তাঁর পুত্রতুল্য স্নেহের জামাতা জনাব আহমদ সোলায়মানকে জানালেন যে, ৭ই ডিসেম্বরের আগে করাচীতে পৌঁছতে পারবেন বলে তিনি মনে করছেন না। এই চিঠিতে অল্প কথার মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তিনি আলোচনা করলেন। সে আলোচনায় তাঁর বিশ্বাস ও মতামত সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠলো। তিনি লিখলেনঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ

এ্যাসকট হোটেল, জুরিখ , ১৭/১১/৬৩

প্রিয় আহমদ,

এই মাত্র তোমার তার (ঠিকানা ঃ কে/অব প্রফেসর রোসি) পেলাম, যাতে তুমি জানিয়েছো যে, আমার নবেম্বরের ভাতা পাঠিয়ে দিয়েছো; বলতে গেলে তা যাদুর মতোই

www.pathagar.com

শোনায়, নিশ্চয়ই এ টাকা পাঠাতে তোমাকে খুবই বেগ পেতে হয়েছে। জানি না, বৈরুত কবে ফিরবো—সব কিছু নির্ভর করছে প্রফেসর রোসি ও প্রফেসর ল্যাভার্ট (সব কিছু পরীক্ষার পর) কি বলেন, আর সার্জেনই বা কি বলেন তার ওপর। মনে হয়, এখানেই অপারেশন করানো সবচেয়ে ভালো। তবে তার আগে আমাকে দেখতে হবে, অপারেশন করাতে কত খরচ পড়বে।... মনে হয় না, আর রাজনীতি করার মতো মন আমার হবে। আয়কর আর দেনা-দায়িক মিটানোর জন্য সবকিছু ছেড়ে আমাকে টাকা আয়ে মন দিতে হবে। দেখো, আমরা যাঁরা আগের জামানার নেতা, তাঁরা কেবল নিয়মতান্ত্রিক পথেই চলতে জানি; কিন্তু তাতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। বিপদ হলো এই যে, এমন অনিয়মতান্ত্রিক নেতৃত্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, যা হয়তো দেশকেই ধ্বংস করে বসবে আর সেই সাথে আমাদেরও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। দুঃখ হয় এই জন্যে যে, প্রেসিডেন্ট—যিনি আর সব দিক দিয়েই বিরাট রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী—এসব দেখেও দেখেন না। তাঁর এমন সব বাজে উপদেষ্টা রয়েছেন, যাঁরা প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে যে ক্ষমতা, পদ বা সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন, তা-ই আঁকড়ে থাকতে চান, অথচ তাঁদের সে যোগ্যতাও নেই এবং গণতান্ত্রিক দেশে তাঁরা পাত্তাই পেতেন না।

যা হোক, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। খোদা পাকিস্তানের মঙ্গল করুন। বৈরুত যেতে আমার দেরি হচ্ছে, সম্ভবত ২৮শে যাচ্ছি বলে ৭ তারিখের (ডিসেম্বর) আগে করাচী ফিরতে পারবো বলে মনে হয় না। আমার মামলা-মোকদ্দমাগুলোর তারিখ সম্পর্কে আরো জানতে ইচ্ছে হয়। তোমরা সবাই ভালোবাসা নেবে।

—স্নেহের আব্বা।

দেশবাসী যখন আকুল আগ্রহে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করছে, ঠিক সেই সময় ৪ঠা ডিসেম্বর ইত্তেফাক সম্পাদক এক পত্রে জানতে পেলেন হার্নিয়া অপারেশনের জন্যে শহীদ সাহেব জুরিখ যাচ্ছেন এবং এজন্যে তাঁর দেশে ফেরা হয়তো জানুয়ারির আগে সম্ভব হবে না। বৈরুত থেকে লেখা ২৯শে নবেম্বরের এই পত্রখানিতে তিনি একান্তভাবে ইত্তেফাক সম্পাদককে হয়তো অভিমানের সুরেই ক'টি কথা বললেন। বললেন ঃ 'কেবল নিজের জন্যই যদি বাঁচা—তবে এ বাঁচার সার্থকতা কি?'

৪ঠা ডিসেম্বর পত্রখানি হাতে পেয়ে ইত্তেফাক সম্পাদক ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি যে, তাঁর এই একান্তের কথাগুলো সত্যিকার অর্থে অর্থবহ হয়ে দাঁড়াবে। নেতার এই অভিমানকে তিনি অভিমান হিসেবেই গ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনি কি জানতেন যে, পরদিনই (৫ই ডিসেম্বর) তাঁকে শুনতে হবে সেই মর্মান্তিক সত্যটি।

আর এ-ই হবে তাঁর শেষ চিঠি ঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ

বৈরুত, ২৯/১১/৬৩

প্রিয় মানিক মিয়া,

দেশ সেবার জরুরী তাগিদ দিয়ে শেখ মুজিবুর যে চিঠি দিয়েছেন, তার জবাবে লম্বা দু' পৃষ্ঠা যে চিঠি আমি পাঠিয়েছি, আশা করি তিনি তা পেয়েছেন। এ তাগিদের কোনো প্রয়োজন ছিলো না, কেননা, এ মাসের শেষনাগাদ দেশে ফেরার পুরো ইচ্ছাই আমার ছিলো, তবে জুরিখের ডাক্তারগণ এবং বিশেষ করে সার্জেন এবং প্রফেসর রোসিয়ার চাপ দিচ্ছেন

www.pathagar.com

যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশনটা (হার্নিয়া) করিয়ে নেয়াই উচিত। তার আগে প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহের প্রয়োজন রয়েছে, তাই টাকা চেয়ে আমি আহ্‌মদকে লিখেছি। ৭ই ডিসেম্বর আমি জুরিখ যাচ্ছি। সেখানে দশ থেকে সতোরো দিনের মতো হাসপাতালে থাকবো, তারপর এখানে কয়েকদিন কাটিয়ে যদি সবাই চায়, তবে ৩রা বা ৪ঠা জানুয়ারির নাগাদ করাচী এবং ৭ই নাগাদ ঢাকায় পৌঁছবো। তবে অপারেশন করাতে আমাকে যেতেই হবে। [তবে, একান্তভাবে কেবল তোমাকেই জানাইঃ মরলেই আমি সুখী হবো। বাঁচার আর কোনো অর্থ হয় না। কারো কাজে যখন আসবো না, আর কেবল নিজের জন্যই যদি বাঁচতে হয়, সে বাঁচার সার্থকতা কি?]

এছাড়া, স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে তেমন কিছু খারাপ বোধ করছি না। তবে মাঝে মাঝে হৃৎকম্পন বেড়ে যায়। মনে হয়, হার্নিয়ার জন্যই এমনটা হচ্ছে।

ঢাকা অধিবেশনে (জাতীয় পরিষদের) তেমন কিছু হবে বলে আশা করি না। খোদাই সব করনেওয়ালা।

–শহীদ।

তিনি এলেন...

৭ই ডিসেম্বর।···পাক-ভারত উপমহাদেশের পরাধীনতার শৃংখল মোচনের প্রায় শতাব্দীকাল সংগ্রামের অগ্রনায়ক অগ্নিপুরুষ, পাকিস্তানের গণতন্ত্রের অগ্রদূত দেশবাসীর প্রাণের শহীদ আসছেন, ফিরে আসছেন ঢাকায়, দেশের সন্তান দেশের মাটিতে, দেশনেতা দেশবাসীর বুকে।···

সেই দিন এগিয়ে আসছে, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত দিন—কালো রজনীর তমসা পেরিয়ে আলোকোজ্জ্বল সূর্যের হাসি ছড়িয়ে সূর্যনায়কের প্রত্যাগমনের দিন।

···মেঘমুক্ত আকাশের পানে তাকিয়ে যখন কোটি কোটি চোখ আশাদীপ্ত অভিনন্দনের বলাকা উড়িয়ে দিতে বিমান বন্দরে যাবে, এমন সময় ৫ই ডিসেম্বর হলো বিনামেঘে বজ্রাঘাত!...দুঃস্বপ্নের চেয়ে অবিশ্বাস্য! কালো মেঘে ছেয়ে গেলো দিনের সূর্য, আশার আলো ঢাকা পড়ে গেল চির অন্ধকারে।

সেই নির্ধারিত দিন, ৭ই ডিসেম্বরে তিনি এলেন, কিন্তু সত্যিই কি সেই তিনি, স্ফীতপ্রাণ, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, ব্যক্তিত্বস্ফুরিত অধর, বলিষ্ঠ পদক্ষেপে জীবনের পথে অগ্রগামী পথিক!

তিনি এলেন। দেশের অতি আদরের সন্তানকে করাচীর জনগণ সম্বর্ধনা জানালো, নীরব অশ্রুসিক্ত চোখে, বুকফাটা হাহাকারে। নেই অন্য কোনো গৌরবোজ্জ্বল দিনের মুখরতা, নেই উল্লাসের প্লাবন। নিশ্ছিদ্র হতাশার উন্মাদনা নিয়ে করাচীর জনসাধারণ দেশের নয়ন পুত্তলিকা বরণ করে নিলো বেদনায়, নিথর কান্নায়।

সেই ৭ই ডিসেম্বরেই তিনি এলেন, কিন্তু বাক তাঁর রুদ্ধ, দেহ অচল, শায়িত চির নিস্তব্ধতার গহ্বরে, পরম শান্তির ক্রোড়ে। আর তাঁর বজ্রকণ্ঠ বিচলিত করবে না প্রতিপক্ষকে, তাঁর লৌহকঠিন প্রবীণ-বৃদ্ধ যুবকোচিত দেহমনে উন্মথিত করবে না কোটি কোটি জনগণকে, তাঁর পরিহাস্যোজ্জ্বল মুখ উজ্জ্বল হবে না আর দীপ্ত হাসিতে।

···ওরা গেল দেশের নেতাকে ফিরিয়ে আনতে আশাহত ভাঙ্গা বুক নিয়ে, ওরা গেল

www.pathagar.com

অশ্রুসিক্ত চোখে, সহস্র মরহুমের মাতম নিয়ে, আকাশে-বাতাসে কেবল যাদের হাহাকার, চোখে কেবল সমুদ্রের অবিশ্রান্ত উত্তাল ঢেউ—শহীদ নাই, শহীদ নাই—'নাই নাই যতদূর চাই সে পথিক নাই।'

সেদিনের সব পথ অকস্মাৎ রুদ্ধ হলো, সব আলো নিভে গেলো, সব আশা শেষ হলো, শুধু রয়ে গেলো নেতার সমাধি বুকে অশ্রান্ত-অক্লান্তদেহী সংগ্রামী নেতার প্রাণহীন দেহ। আর রয়ে গেল তাঁর শেষযাত্রার ইতিহাস, সমগ্র দেশবাসীর ভেঙ্গেপড়া সমাধিক্ষেত্রের অতুলনীয় অবিস্মরণীয় ইতিহাস। আর গণতন্ত্রের জন্য শাহাদতের ইতিহাস।

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাই তুমি করে গেলে দান।'

শেষযাত্রা

'...শহীদ সাহেবই দেশবাসীকে বেশি ভালোবেসেছিলেন, না দেশবাসীই শহীদ সাহেবকে?'

'গাড়ি থেকে পিছনে যতদূর দৃষ্টি যায়, মনে হচ্ছিল সারা বাংলার মানুষ যেন ভেঙ্গে পড়েছে শোক-মিছিলে। তাই বুঝি এ জনসমুদ্রের কোনো খেই নেই, জনস্রোতের কোনো সীমা নেই, শেষ নেই'।

রোববার, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৩। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় আসছেন। তবে আগের মতো সে যুগ সৃষ্টিকারী মহাপ্রাণ সাথে নিয়ে নয়, যোদ্ধবেশেও নয় কিংবা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির উন্মত্ততা নিয়েও নয়। তিনি আসছেন রণশেষের শহীদী বীরের সাজে, নীরব-নিথর-নিস্তব্ধ ও নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির রূপ ধরে। স্বদেশ স্বদেশবাসী থেকে দূরে—বহু দূরে—উষর মরুর দেশ লেবাননের রাজধানী বৈরুতের কোনো এক হোটেলের নির্জন কক্ষে বাকি জীবনের নিঃসঙ্গ ও দুর্বিষহ দিনগুলো কাটিয়ে দিয়ে, পূর্ব পাকিস্তানের সবুজ-ঢাকা সোনার মাটির অঙ্গে চির-বিশ্রামের জন্যই তিনি আজ ঢাকায় আসছেন। তাঁর এ-চিরবিশ্রামের শয্যা রচিত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতে—হাইকোর্ট প্রাঙ্গণের একপাশে, সবুজ বনানীর ছায়াঘেরা এক উন্মুক্ত অঙ্গনে।

চিরবিশ্রাম গ্রহণের পথে পাকিস্তানের গৌরব-দুলাল ও মুক্তিপথের দিশারী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আজ শেষযাত্রা। পিআইএ'র বোয়িং বিমান তাঁর লাশ নিয়ে করাচী থেকে ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দরে আসছে। ভোর হতে না-হতেই তাই অসংখ্য অগণন মানুষ গোটা ঢাকা নগরকে উজাড় করে দিয়ে ছুটে চলেছে বিমান বন্দরের দিকে। শহর থেকে বিমান বন্দর পর্যন্ত প্রতিটি রাস্তায় শুধু মানুষ আর মানুষ। দেশের সর্বস্তরের, সব বয়সের ও সব পর্যায়ের মানুষ—আবালবৃদ্ধবনিতা, চাষী-মজুর, ছাত্র-শিক্ষক, রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীর পদভারে গোটা শহর প্রকম্পিত। 'পীচ' ও 'কংক্রিটের' প্রশস্ত রাজপথগুলোয় মানুষের ঢল যেন আর ধরে না। মানুষের বুকফাটা কান্না ও হৃদয়মথিত আহাজারিতে গোটা ঢাকা নগরীর আকাশ-বাতাস আগেই ছেয়ে গেছে। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার উত্তাল অথচ মন্দ-মন্থর ঢেউয়ের আকারে জনতা ছুটে চলেছে তেজগাঁও বিমান বন্দরের দিকে—চির-নিদ্রাতুর মহান

www.pathagar.com

নেতার প্রতি হৃদয়ের সবটুকু আকুতি, সবটুকু শ্রদ্ধা নিঃশেষে উজাড় করে দিতে। আজকের এ জনতার অযুত কণ্ঠের হাহাকার নেই, শিরে করাঘাত করে বুকফাটা কান্নার আওয়াজও নেই—নিষ্প্রাণ নেতার সাথে গোটা জাতিও যেন নিঃসাড় ও প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। সাংবাদিক জীবনের বিগত তের বছরে এবং তার আগেও ঢাকার বুকে বহু জনসমাবেশ ও নেতৃ-সম্বর্ধনার দৃশ্য দেখেছি—পল্টন ও রেসকোর্স ময়দানে জনসমুদ্রের সৃষ্টি হতেও দেখেছি। কিন্তু সে জনসমুদ্র জনতার মহাসমুদ্রে একাকার হয়ে যেতে দেখিনি; আরো দেখিনি নেতা ও জনতার এমনটি একাত্মতা—উজ্জ্বল হৃদয়াবেগপ্রবণ পরিবেশেও নেতার প্রতি এমনিতর সুশৃঙ্খল শ্রদ্ধা নিবেদনের দৃশ্য। সে দৃশ্য দেখে আজো মনের কোণে প্রশ্ন জাগে—শহীদ সোহরাওয়ার্দী দেশকে বেশি ভালোবেসেছিলেন, না দেশ ও দেশবাসী তাঁকে।

পিআইএ'র বোয়িং বিমান সোহরাওয়ার্দীর লাশ নিয়ে তখনো তেজগাঁও বিমান বন্দরে আসেনি। কিন্তু চারপাশের সমগ্র এলাকা নিয়ে বিমান বন্দর ততক্ষণে এক বিশাল জনসমুদ্রের রূপ ধারণ করেছে। শৃংখলাবদ্ধ অগুণতি জনতাকে ডানে, বামে ও সামনে রেখে অর্ধনমিত জাতীয় পতাকাসহ কালো পতাকায় মোড়া একখানি খোলা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে বিমান বন্দরের একপ্রান্তে। রাশি রাশি ফুল ছিটানো তার ওপর। মরহুমের লাশ রেসকোর্স ময়দানে নিয়ে যাবার জন্যেই ট্রাকটি প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বিমান থেকে আজাদী আন্দোলনের বীর সিপাহসালার, গণতন্ত্রের অগ্নিসাধক ও অতন্দ্র প্রহরীর লাশ নামিয়ে ট্রাকে উঠানোর জন্যে পাশেই প্রতীক্ষারত ব্যাগ্রাকুল রোরুদ্যমান নেতৃবৃন্দ; চারপাশে শোকে মুহ্যমান বিরাট জনসমুদ্র।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর লাশ বহনকারী পিআইএ বোয়িং বিমানখানি বেলা সাড়ে দশটায় তেজগাঁও বিমান বন্দরে নামলো। সঙ্গে সঙ্গে নিথর জনসমুদ্রে জাগলো উত্তাল ঢেউ। পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের বেষ্টনী ভেঙ্গে শোকার্ত জনতা বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো বিমান বন্দরের নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে বিমানটিকে ঘিরে ফেললো। কার সাধ্য তা রোখে? কার সাধ্য জনগণের নেতার লাশ জনগণের হাত থেকে আগে ছিনিয়ে নেয়? মুহূর্তের মধ্যে সারা বিমান বন্দরে যে হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হলো, তা ভাষায় প্রকাশের অতীত। বিমান বন্দরের এই শোকোদ্বেল পরিবেশে মুহূর্তের জন্য মনে পড়লো এক বছর আগের একটি ঘটনা। জনাব সোহরাওয়ার্দী জীবনের প্রথম কারাভোগের অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৬২) ঢাকায় এলেন। বিমানযোগে এসে এই তেজগাঁ বিমান বন্দরেই তিনি নামলেন। কিন্তু সেদিন আর আজকের মধ্যে কতো তফাৎ! তখন তিনি জীবিত; জনতার চাপে স্বাভাবিক উপায়ে বিমান থেকে নামতে পারেননি বলে বিশেষ পদ্ধতিতে এলিভেটরের সাহায্যে দূর রানওয়ে থেকে জনতার মাথার ওপর দিয়ে তাঁকে নামিয়ে আনতে হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনস্রোত ঠেলে বাইরে আসবার আগে আবেগ-উচ্ছল জনতাকে শান্ত করার জন্যে তাঁকে পনেরো মিনিট ধরে এলিভেটরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে হয়েছিল। কেবল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নেতৃত্বদানে, ওয়াদা আদায়ের পরই সেদিন জনতা তাঁকে পথ করে দিয়েছিল। কিন্তু আজ তাঁর কণ্ঠ শান্ত—স্তব্ধ। জনতার স্রোত ঠেলে আজ তাঁকে বাইরে যাবার পথ করে দেবে কে?

আজ করাচী থেকে লাশবাহী একই বিমানে এসেছেন মরহুমের কন্যা, একমাত্র পুত্র, ভগ্নী, নাতনী, জামাতা, ইত্তেফাক সম্পাদক, পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এবং

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব ওয়াহিদুজ্জামান। জনতার চাপে বিমান থেকে কফিনটি যখন কিছুতেই নামানো সম্ভব হচ্ছিলো না, তখন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী বিমানের সামনের দরজা দিয়ে বাইরে এসে শোকার্ত জনতাকে সামান্য সরে গিয়ে কফিনটি বের করে নির্দিষ্ট ট্রাকে উঠানোর সুযোগ দেবার জন্য হাতজোড় করে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে। বহু কষ্টে বিমানের মালবাহী কেবিনের দরজা খোলা হলো। পুষ্পাচ্ছাদিত কফিনটি চোখে পড়তেই সমবেত জনতার চোখে নামলো অশ্রুর ঢল। জনতার চাপা কণ্ঠ এবার বুকফাটা কান্নায় ফেটে পড়লো। পিতার মৃত্যুতেও এমন আহাজারি কে কখন করেছে? শোকাপ্লুত জনতা এবার মরিয়া হয়ে আরো বেশি করে ঝুঁকে পড়তে লাগলো বিমানের দিকে। কফিন বহনের জন্য নির্দিষ্ট ট্রাকখানিকে বিমানের দরজার কাছে নেয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। মরহুমের সহকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, পুলিশ ও নেতৃবৃন্দের সকল আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হলো। কে কার কথা শোনে! নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানোর আকুতিতে সবাই তখন দিশেহারা। প্রায় পনেরো মিনিটকাল কেটে যাবার পর বহু কষ্টে ঠেলাঠেলি করে ট্রাকখানিকে কোনোমতে বিমানের পেছনের দরজার কাছে নেয়া সম্ভব হলো। বহু কষ্টে কফিনটিকে ধরাধরি করে পুষ্পাচ্ছাদিত ট্রাকের ওপর নামানো হলো। সংগে সংগে জনসমুদ্রে ঢেউ জাগলো কালেমা শাহাদাৎ—আশা হাদয়াল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু···। লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত সে কালেমা আছাড়ি-বিছাড়ি খেয়ে সমগ্র বিমান বন্দর এলাকায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। আর সেইসাথে কফিনের ওপর ফুল গোলাপ পানি ও আতর ছিটানো শুরু হলো। সেও এক অভূতপূর্ব প্রতিযোগিতার দৃশ্য। কে কার আগে ফুল দিয়ে নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে তা নিয়েও কাড়াকাড়ি চললো। পূর্ব পাকিস্তান সরকার, সশস্ত্র বাহিনী, ই,পি,আর ও পুলিশের পক্ষ থেকেও কফিনে ফুলের মালা দেয়া হলো। কফিনের পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে দেখলাম মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব জহিরউদ্দীন, জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী কান্নায় ফেটে পড়ছেন। বাষ্পাকুল নয়নে পীর মুহসিনউদ্দীন ও কেন্দ্রীয় প্রচারমন্ত্রী জনাব এ.টি.এম. মুস্তাফা এঁদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেরাও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছেন। এই অবস্থায় পাগলপারা জনতার উত্তাল স্রোতে বাকি নেতৃবৃন্দের কে কোথায় ছিটকে পড়লেন, হারিয়ে গেলেন আর ঠাহর করা গেলো না।

এবার বিমান বন্দর থেকে বেরুবার পালা। আমার স্পষ্ট মনে আছে, জনাব সোহরাওয়ার্দীর লাশবাহী ট্রাকখানি বিমান বন্দরের ঐ অতটুকুন চত্বরের বাইরে আসতে প্রায় কুড়ি মিনিট সময় লাগে। শৃংখলা রক্ষাকারী পুলিশ, নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকদের শত অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও বিমান বন্দরের নির্দিষ্ট চত্বরের অভ্যন্তরে পাগলপারা শোকার্ত জন-সমুদ্রের উত্তাল ঢেউকে শান্ত করে কার সাধ্য? সে এক জটিল অথচ মর্মস্পর্শী অবস্থা। লাশ নিয়ে ট্রাকখানি সামনের দিকে বাড়তে যতই চেষ্টা করছে, প্রিয় নেতার শেষ দর্শনপ্রার্থী জনতার স্রোত চারদিক থেকে চেপে এসে ততই তার গতি শিথিল করে ফেলছে। সবার বুকে একই ব্যথা, সবার মুখে একই কথা—তারা শুধু একটিবার নেতার চির নিদ্রাচ্ছন্ন নীরব-নিস্তব্ধ লাশটি—লাশ তো নয় কফিনটি শেষবারের মতো দেখার সৌভাগ্য অর্জন করবে। ৫০-৫২ বছর বয়সের এক বৃদ্ধ লাশবাহী ট্রাকখানিকে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে টেনে ধরে গলা ছেড়ে চিৎকার করে কাঁদছে।

www.pathagar.com

বিমান বন্দরের চারদিক থেকে জনতার অস্বাভাবিক চাপ ঠেলে এবং প্রায় বিশ মিনিট ধরে সংগ্রাম করে জনাব সোহরাওয়ার্দীর লাশবাহী ট্রাকখানি বিমান বন্দরের চত্বরের বাইরে এসে ময়মনসিংহ রোডে পড়লো। এবার অবস্থা যা দাঁড়ালো, তা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন আর কারো পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নয়। বিমান বন্দরে ঠাঁই না পেয়ে অগুণতি নারী-পুরুষ-তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরী—এমনকি অবুঝ শিশুর দলও ময়মনসিংহ রোড, আশপাশের ঘরবাড়ি, বৃক্ষ ছেয়ে রেখেছে। তাই বিমান বন্দরের চত্বরের বাইরে এসে কফিনবাহী ট্রাকখানি আর সামনে বাড়তে পারলো না। শোকবিহ্বল জনতার কাছে বারবার মাইকযোগে আবেদন জানাবার পর শেষ পর্যন্ত কোনোরকমে ট্রাকখানিকে বিমান বন্দরের জনসমুদ্র থেকে টেনে বের করে ময়মনসিংহ রোডের জনসমুদ্রের মধ্যে ঠেলে দেয়া হলো। চারদিক থেকে কফিনবাহী ট্রাফের দিকে পুষ্পবৃষ্টি শুরু হলো। প্রায় দুই সহস্র ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবক জনসমুদ্র ঠেলে ধীরে ধীরে কফিনবাহী ট্রাকটিকে পথ করে দিতে লাগলো, আর ট্রাকখানি অতি মন্থর গতিতে বঞ্চিত, মজলুম গণমানুষের স্রোত কেটে এগিয়ে চললো। তাকে অনুসরণ করে চললো ঢাকা বেতারের গাড়িখানি। পেছনে অসংখ্য গাড়ি আর অগুণতি জনতার নজিরবিহীন শোকমিছিল। কোনো গাড়ির ওপর তার ড্রাইভার বা আরোহীর কোনো এখতিয়ার নেই। গাড়ি চলছে না। জনতাই ঠেলে নিয়ে চলেছে। ইঞ্জিনের সাহায্য ছাড়াই উদ্বেল উত্তাল জনসমুদ্রের বিরাম-বিশ্রামহীন ঢেউয়ের তালে তালে গাড়িগুলো ভেসে চলেছে। কোথাও গিয়ে জনতার চাপে থমকে দাঁড়াচ্ছে আবার জনস্রোতের ধাক্কায় সে গতি ফিরে পাচ্ছে।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর এই শেষযাত্রার দিনে তেজগাঁও বিমান বন্দর থেকে শুরু করে রমনার রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল, জাতির ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তার স্থান কি এবং কিভাবে সেই অধ্যায় রচিত হবে, আগত ভবিষ্যৎই তা সাব্যস্ত করবে। তবে সেদিনের সে দৃশ্য নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করেছে যে, পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণ বীরের মর্যাদা দিতে জানে, বীরের আসনও তাদের হৃদয়ে। তার প্রতিচ্ছবি সেদিন ভেসে উঠেছিল তেজগাঁও বিমান বন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথে আর পথের দু'পাশের বৃক্ষ ও গৃহশীর্ষে অগণন নারী-পুরুষের শোকমেলা আর পুষ্পবৃষ্টির ভেতর দিয়ে।

উত্তাল জন-সমুদ্রের ঢেউ কেটে কেটে মরহুম নেতার শবমিছিলটি যখন কাওরানবাজার রেলওয়ে ক্রসিংয়ের কাছে এসে পৌঁছালো, শোভাযাত্রাটি তখন একদম গতিহীন। চারদিক থেকে অতিরিক্ত জনতার অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হবার ফলে মূল জনসমুদ্রের স্বাভাবিক গতি যেন সেখানে এসে একেবারেই থেমে গেছে। ঢাকা স্টেশন থেকে বহির্গামী একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাত্রীশূন্য অবস্থায় পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনের যাত্রীসাধারণ নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে সেখানে ট্রেন থেকে নেমে জনসমুদ্রে মিশে গিয়েছে। শত সহস্র আর্দ্রকণ্ঠে উচ্চারিত কালেমা শাহাদাৎ ও শোকার্ত নারী-পুরুষের বুকচেরা কান্নার সকরুণ আওয়াজ গোটা পরিবেশকে যেভাবে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল, তা ভাষায় প্রকাশের অতীত। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। অগণন অসংখ্য মানুষের ঢেউ কেটে কেটে মরহুমের লাশবাহী ট্রাকখানি আবারো আগে বাড়তে লাগলো। ঢাকা বেতারের গাড়িখানিও প্রাণপণে তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে পেছন দিকের জনতার ধাক্কায় ভেসে চলেছে। গাড়ি থেকে পেছনে যতদূর দৃষ্টি যায়, মনে হচ্ছিল, সারা বাংলার মানুষ যেন ভেঙ্গে পড়েছে

www.pathagar.com

শোকমিছিলে। তাই বুঝি এ জনসমুদ্রের কোনো খেই নেই, জনস্রোতের কোনো সীমা নেই, শেষ নেই।

ট্রাকখানি ইস্কাটনের মোড়ে আসতেই শবমিছিলের গতি আবার রুদ্ধ হলো। পথিপার্শ্বে প্রতীক্ষমাণ শোকাকুল জনতার মধ্যে দেখা গেল ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব বি.এ. সিদ্দিকী ও বিচারপতি জনাব এ.এস. চৌধুরীকে। ভিড় ঠেলে ধীরপদে এগিয়ে এসে মরহুমের কফিনের ওপর তাঁরা পুষ্পমাল্য অর্পণ করলেন। একই সময়ে কাছে আসতে না পেরে পথিপার্শ্বস্থ অগুণতি নারী-পুরুষ দু'হাত ও আঁচল থেকে ফুল ও ফুলের মালা ছুড়ে দিতে লাগলো তাদের নির্বাক নেতার উদ্দেশে। বেশ কয়েক মিনিট ধরে পুষ্পবৃষ্টি চললো। সেই পুষ্পবৃষ্টির ভেতর দিয়ে সামনে দৃষ্টি ফেলতেই দেখা গেল পাশের একটি বাসভবনের ছাদে কালো স্যুট পরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে বিচারপতি জনাব মোর্শেদ মরহুমের প্রতি তাঁর শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন।

রেসকোর্স ময়দানের দিকে আরো একটু এগিয়ে যেতে রাজপথের ডানপাশে ঢাকার বৃহত্তম হোটেল শাহবাগ। বামদিকে গৃহচূড়ায় অর্ধনমিত জাতীয় পতাকাসহ ঢাকা বেতার ভবন। হোটেল শাহবাগের কাছে পৌঁছে যে দৃশ্য চোখে পড়লো, তা রাজধানী ঢাকার বুকে এই প্রথম। হোটেলে অবস্থানকারী বিদেশী নারী-পুরুষের দল বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে হোটেলের ছাদ অথবা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন টুপি খুলে, অবনত মস্তকে। মনের কোণে হয়তো তাঁদের অসংখ্য প্রশ্নের ভিড়।

গোটা পাকিস্তানের আপামর গণ-মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতার লাশ নিয়ে শোভাযাত্রাটি যখন আরো কিছুটা আগে বেড়ে রমনা রেসকোর্স ময়দানে মরহুমের জানাজার জন্যে নির্দিষ্ট জায়গার কাছাকাছি এসে পৌঁছলো, তখন আরেক হৃদয়বিদারক দৃশ্য নজরে এলো। সাবেক সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মরহুম সোহরাওয়ার্দীর একমাত্র কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান, নাতনী মুন্নী ও বোন বেগম শায়েস্তা একরামুল্লাহ মরহুমের শেষযাত্রার দৃশ্য দেখছেন আর বুকফাটা কান্নায় ফেটে পড়ছেন। তাঁদের শোকে সান্ত্বনা যোগাতে গিয়ে 'ইত্তেফাক' সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন স্বীয় চোখের পানি মুছছেন। ট্রাকখানি জানাজার নির্দিষ্ট জায়গার কাছাকাছি পৌঁছাতেই লাশ অনুসরণকারী জনসমুদ্রের একটি বিরাট অংশ কোণাকুণি পাড়ি দিয়ে ছুটতে শুরু করলো রেসকোর্স ময়দানের দিকে। মনে তাদের আশঙ্কা, কি জানি পাছে যদি স্থানাভাবে জানাজায় শরিক হতে না পারি। এ আশঙ্কা তাদের অমূলক ছিলো না। কারণ, সকাল থেকেই জানাজায় শরিক হবার বাসনা নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ আগে থেকেই রেসকোর্স ময়দানে জন-সমুদ্রের সৃষ্টি করে রেখেছে। পুলিশ বাহিনী আপ্রাণ চেষ্টা করেও জানাজার জায়গায় তিল ধারণের ঠাঁই আগলে রাখতে পারেনি। আর অগুণতি মানুষ দু'কূল ছাপিয়ে ময়মনসিংহ রোডও জনাকীর্ণ করে রেখেছে। এই অবস্থায় মরহুমের লাশ নিয়ে অগণন মানুষের শোক মিছিলটি মোট আড়াই ঘণ্টায় বিমান বন্দর থেকে মাত্র চার মাইল পথ অতিক্রম করে যখন রেসকোর্স ময়দানে এসে ঢুকলো, তখন মনে হলো, দু'দিক থেকে দু'টো জনসমুদ্র এগিয়ে এসে এক মহাসমুদ্রে মিশে গেল; আর সে মহাসুমদ্রের উত্তাল জনস্রোতে গোটা রেসকোর্স ময়দান সয়লাব হয়ে গেল। অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক এবং অশ্বারোহী ও হেলমেটধারী পুলিশের প্রাণপণ চেষ্টাও সে জনস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করতে

www.pathagar.com

পারেনি। নেতৃবৃন্দের আকুল মিনতি, স্বেচ্ছাসেবক, অশ্বারোহী ও পদাতিক পুলিশের আপ্রাণ চেষ্টার পর শোকোন্মত্ত জনসমুদ্র কিছুটা শান্ত মূর্তি ধারণ করার পর মরহুমের জানাজাপর্ব শেষ হলো। জনতার মহাসমুদ্রে জানাজা আদায়ের সর্বাঙ্গীণ সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হলো না। অনেককে মনে আফসোস্ নিয়ে ফিরতে হলো।

এবার হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে দাফনের জন্য লাশ আবার ট্রাকে তোলা হলো। কিন্তু সামনে এগোবে কি করে? শোকসাগরের সমগ্র জনস্রোত এসে মরহুমের লাশবাহী ট্রাকখানিকে ঘিরে আছাড়ি-বিছাড়ি খেতে লাগলো। অশ্বারোহী ও পদাতিক পুলিশ বাহিনী কোনোক্রমে অবস্থা আয়ত্তে আনতে না পেরে বাধ্য হলো ঝাঁপিয়ে পড়ে কিছু বল প্রয়োগ করে লাশবাহী ট্রাকখানিকে কবরস্থানে যাবার পথ করে দিতে। কিছুদূর এগিয়ে কবরস্থানের কাছাকাছি পৌঁছে ট্রাকখানি আর কিছুতেই সামনে বাড়তে পারলো না। বাধ্য হয়ে মরহুমের লাশ সেখানেই ট্রাক থেকে নামিয়ে কাঁধে নেয়া হলো। কিন্তু কারা কাঁধে নিলেন, খুব কাছে থেকেও তা ঠাহর করা গেলো না। মনে হলো, বিশাল জনতার মাথার ওপর দিয়েই মরহুমের লাশবাহী কফিনটি যেন আপনা-আপনিই কবরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; আর প্রিয় নেতার লাশের শেষ স্পর্শটুকু পাবার মানসে শোকসর্বস্ব অসংখ্য মানুষ ঊর্ধ্বে দু'হাত বাড়িয়ে রেখেছে। জনতার প্রচণ্ড চাপের মধ্যে সরু একফালি পথ বের করে স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশের গলদঘর্ম প্রচেষ্টায় মরহুমের লাশ যখন কবরের আরো পাশে নিয়ে আসা সম্ভব হলো, তখনকার অবস্থা একান্তই বর্ণনার অতীত। এতক্ষণের নিঃসাড় জনসমুদ্র অগণতি মানুষের বুকফাটা কান্নার ঢেউয়ের দোলায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। চারদিক থেকে মানুষ কবরের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো।

এই পর্যায়ে লাঠিধারী পুলিশ বাহিনী নিরুপায় হয়ে জনতাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হলো। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই যে অবস্থার সৃষ্টি হলো তাতে লাঠিধারী পুলিশ বাহিনীও তলিয়ে গেল সেই অথৈ জনসমুদ্রে। স্ফুট-অস্ফুট কান্নার আওয়াজে রমনা রেসকোর্স ময়দান থেকে শুরু করে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণ পর্যন্ত সমগ্র এলাকাটি যেন থমথমিয়ে উঠলো। আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয় নিঃসৃত মাতমের সুর আছাড়ি-বিছাড়ি খেয়ে আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। সেই হৃদয়বিদারী পরিবেশের মাঝখানে মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক অনুগামী-অনুসারী, ভক্ত ও সুহৃদবৃন্দ তাঁর লাশ ধরাধরি করে কবরে নামালেন। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর শেষযাত্রার সমাপ্তি এখানেই।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যে দেখা গেল হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁর দেশবাসীর অশ্রুসিক্ত সে মাটির অঙ্গে ফুলের স্তূপের নিচে চিরশয্যায় সমাহিত হলেন। তাঁর এই মহান সমাধিই হয়ে রইলো এদেশের কোটি কোটি বঞ্চিত ও মজলুম গণমানুষের অনাগত সংগ্রামী দিনের মশাল।

তারপর কখন যে কবরের ওপর মাটির আবরণ ছাপিয়ে গড়ে উঠলো ফুলের পাহাড়! শুধু ফুল আর ফুল! মনে হলো চির সবুজ পূর্ব পাকিস্তানের সকল বৃক্ষের ফুল যেন আজ অঝোরে ঝরে পড়েছে তাঁর কবরের ওপর।

www.pathagar.com

অন্তিম শয়ানে

ফররুখ আহ্মেদ

এখানে ঘুমায় সিংহ-হৃদয় সংগ্রামী মহাপ্রাণ,
শৌর্য-সাহসে অতুলন, শির উন্নত, মহীয়ান,
প্রাণাবেগে যাঁর জেগেছিল কোটি পঙ্গু মুসলমান
(আজাদী জঙ্গে পেল যার সাথে আজাদ পাকিস্তান),
গণতন্ত্রের উদ্‌গাতা– চির ভাস্বর, অম্লান;
এখানে ঘুমায় পাকিস্তানের সেই বীর সন্তান।

পাহাড় গিয়েছে ভেঙে

সিকান্দার আবু জাফর

আমাদের শত দুর্ভাবনার
কান্না-আড়াল-করা
পাহাড় গিয়েছে ভেঙ্গে,
আমরা এখন পরম নিরাশ্রয়।
আমাদের কালো আকাশে দীপ্ত
সূর্য-সম্ভাবনা
কালের প্রহারে মুহূর্তে হলো ক্ষয়।
নিথর মৃত্যু বন্দী করেছে
জীবন-ঊর্মিকেই;
হোসেন শহীদ নেই।

আমাদের চারিদিকে
কূট কুশলীর পীড়নের ফাঁদ পাতা,
ঊর্ধ্ব আকাশে হিংস্র গৃধিনী
সদা-উদ্যত শাণিত চঞ্চু মেলে,
আমাদের আশেপাশে
শব-প্রলুব্ধ শিবা-দন্তের সুচতুর তীক্ষ্ণতা
তবু তার মাঝে সরীসৃপের মতো
শত অপমান-গরল-তিক্ত
জীবনের বোঝা বয়ে
চির বিস্মৃত অতীত ভবিষ্যৎ
বর্তমানের পথ রেখাটুকু ধরে
আমরা চলছিলাম,
সে-চলার পথ মুহূর্তে মুছে গেল
পাথরের মতো স্থবির অন্ধকারে।

www.pathagar.com

আমাদের ছিলো স্ফুলিঙ্গ অগ্নির
আশা ছিলো প্রাণে কোনো একদিন শেষে
ধূমায়িত হবে—প্রদীপ্ত হবে শিখা
জ্বলন্ত বহ্নির।
প্রেতভীত-নিশি দিনের আকাশে
নিঃশেষে হবে লীন
সঙ্কোচ-নত ম্রিয়মাণ তৃণগুলি
মহীরুহ হবে বলিষ্ঠ প্রাণরসে।
নব প্রভাতের আলোকে রঙ্গিন
আসবে সে-শুভদিন।

সে-আলোর আশ্বাস
মাথার উপরে আকাশের সান্ত্বনা
মুহূর্তে ভেঙ্গে গেল।
কঠিন মৃত্যু ঢেকেছে আচ্ছাদনে
জীবন-সূর্যকেই
হোসেন শহীদ নেই।

যখন তিনি এলেন

মাহবুব তালুকদার

বাপজান! হোসেন শহীদের মৃত্যুর খবর পেয়ে তুমি বুকে হাত রাখলে
অন্তরের সব বেদনা অশ্রু হয়ে তোমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করলো।
তুমি বললে, 'আমি অন্ধ! আমরা সবাই অন্ধ!
আমাদের চোখের মণি অকস্মাৎ ছিঁড়ে গেছে,
কে আমাদের পথ দেখাবে? সামনে জ্বালবে আলো!
পরম প্রিয় সম্বলটুকুও আমরা হারিয়ে ফেলেছি।'

সবাই বলল, 'আমরা আমাদের পিতা হারিয়েছি',
তুমি বললে, 'তিনি আমাদের সন্তান,
যেহেতু আমাদের অন্তরের বাসনার তিনি ছিলেন প্রতীক,
সাধারণ মানুষের জীবনের ব্যর্থতায় তিনি ছিলেন সান্ত্বনা।'
তাঁকে হারিয়ে জাতি আজ সহায়-সম্বলহীন পিতার মতো আর্তনাদ করছে,
মাটির মায়ের কোল শূন্য করে তিনি চলে গেছেন অভিমানে।

তোমার কথামতো বাপজান, আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম,
লক্ষ লক্ষ মানুষের হাহাকার অপেক্ষা করেছিল তাঁর জন্যে;
জনতার মধ্যে মিশে তোমার দেওয়া ফুলগুচ্ছ নিয়ে
আমিও সবার মতো দাঁড়িয়েছিলাম; কখন তিনি আসবেন!
তাঁর ভালোবাসা আর প্রেমের মায়ার বিনিময়ে

www.pathagar.com

শোকাহত সমগ্র জাতি ভেঙ্গে পড়েছিল সেদিন।
যখন তিনি এলেন, তখন তাঁর নির্বাক নিঃশব্দ দেহকে ঘিরে
অগণিত মানুষের বেদনামথিত আর্তি করুণ হয়ে উঠলঃ
রমনার বিরাট মাঠ কে যেন আকাশের কালো পর্দায় ঢেকে দিলো
তিনি যখন দেশের মাটিতে পা ফেললেন;
শেষবারের মতো তিনি দেশের মাটিকে আলিঙ্গন করলেন—
দেশের মানুষকে এতকাল আলিঙ্গন করেছিলেন যিনি।

বাপজান, তোমার দেওয়া ফুলগুচ্ছ নিয়ে আমি হারিয়ে গেছি
হাজার লোকের ভিড়ে সামনে যেতে পারিনি তাঁর।
তুমি যে বলেছিলে, 'আমার পঙ্গু জীবনের আকাঙ্ক্ষার এই ফুল
তাঁর প্রীতির উত্তাপে আর ভালোবাসায় প্রস্ফুটিত। এগুলো তাঁকে আমার হয়ে দিও।'
আমি পারিনি বাপজান, তোমার সে ফুল তাঁকে দিতে; তাঁর সামনে যেতে
আপামর মানুষের ভিড়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া সাধ্য ছিলো না আমার;

তারপর নীরবে আমি আমার দু'চোখ ভরা অশ্রুমালা গেঁথে
তোমার হয়ে তাঁকে পরিয়ে দিয়ে এসেছি।
হাতের ফুলগুচ্ছ সেই বিরাট জনতার দিকে বাড়িয়ে বলেছিঃ
'তোমরা নাও আমার পঙ্গু পিতার বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষায় উজ্জ্বল এই ফুল।'
কারণ, এ ফুল তিনিই ফুটিয়েছিলেন—
তোমাদের মধ্যে যিনি আজ নেই; যিনি চিরদিন তোমাদের মধ্যে থাকবেন।

তুমি এক সোনার তপন

সিরাজুল ইসলাম

হাসিলে কাঁদিতে হয়, জন্মিলে মরণ হয় জানি;
তবুও তোমার কাছে সেই মৃত্যু গেছে হার মানি।
কেননা তোমার আলো মৃত্যুঞ্জয়ী, তোমার জীবন
ছিলো সত্য সাধনায় গড়া এক সোনার তপন।

যে সোনার ক্ষয় নেই, লয় নেই, হয় না মলিন,
যে সোনা অমূল্য আর যে সোনার অত্যুজ্জ্বল আলো
তীরের মতন ছুটে সবদিকে, কেটে ঘন কালো
আঁধার রাত্রির শেষে আনে এক শান্তি-শুভ্র দিন।
এ মূক মাটির ভাষা মন দিয়ে তুমি বুঝেছিলে,
আর তুমি প্রাণ দিয়ে মানুষকে বেসেছিলে ভালো।
নিঃশেষে বিলিয়ে তাই তোমার প্রাণের সব আলো,
বাড়ালে মাটির মান, মানুষেরে প্রাণ এনে দিলে।

অমৃত সন্তান তুমি—তুমি এক সোনার তপন,
আলোয় ভরেছো তুমি মন আর আঁধার ভুবন।

www.pathagar.com

তাঁর নাম

শাহ্‌রিয়ার

হৃদয়ের শামাদানে জ্বলে আজ প্রদীপ্ত বিভায়
একটি অমর নাম। তীব্র-তেজ সূর্যের মতন
দীপ্তিমান তাঁর নাম। অনির্বাণ আলোর শিখায়
জ্বলজ্বল করে ওঠে হৃদয়ের সুসুপ্ত স্বপন।

তাঁর নাম ঝড় তোলে আকাশের তারার সভায়,
তাঁর নাম প্রাণ আনে ম্রিয়মাণ মানুষের বুকে,
তাঁর নাম আলো দেয় অন্ধকার জাতির শিখায়
প্রত্যুষের হাসি আনে তাঁর নাম আমাদের মুখে।

তাঁর নাম লিখে গেছে আমাদের ইতিহাস নব
আমাদের আকাশেতে তাঁর নাম সুচিরভাস্বর,
অযুত হৃদয় মাঝে তাঁর নাম রবে সমুজ্জ্বল–
প্রখর জ্যোতির মতো দিন দিন হবে শুভ্রতর।

দীপ্তিমান তাঁর নাম, কোনোদিন মৃত্যু তাঁর নাই,
চিরন্তন তার নাম স্মরি আজ সালাম জানাই।

সে ছিলো

মীর নূরুল ইসলাম

... এবং সে ছিলো বীর অসীম সাহসী
মৃত্যুকে করেনি ভয়, জীবনে কখনো
পালিত পাখির মতো খাঁচার ভাষায়
ঝড়ের আভাস পেয়ে তুলি কলরব
গোপন করেনি চঞ্চু নরম পালকে।
সে ছিলো নায়ক এক, মূর্তিমান নয়া
ইতিহাস। তারপর সেই নাটকের
যবনিকা টেনে ধীরপদে চলে গেল
পর্দার আড়ালে। ঘুমের শিবিরে বন্দী
পরিশ্রান্ত সেনা আর ফিরে আসবে না।

সে ছিলো মহান নেতা যুগ চেতনার,
উন্মেষ তাহারই হাতে গণ-মানসের,
আপন প্রত্যয়ে দৃঢ় অনড় অটল

www.pathagar.com

হিমাচল; কিন্তু তার গলেছে হৃদয়
সূর্যগলা শিলাসম নীরবে নিভৃতে
অপরের দুঃখে, বঞ্চিতের বেদনায়।

সে ছিলো মশালবাহী ন্যায় ও নীতির;
অপূর্ব নিষ্ঠার সাথে এ-জাতিকে তার
দিয়ে গেছে বাকশক্তি, আত্ম-অধিকার
বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি পথের সন্ধান।

সে শহীদ চলে গেছে, জ্বেলে দিয়ে গেছে
এক অনির্বাণ শিখা। সে শিখার আলো
জাতিকে দেখায় পথ সকল প্রহরে।

সমাধি তীর্থে

মোজাফফর হোসেন

পুষ্পের মালিকা হাতে বেদনায় বিষণ্ন হৃদয়ে
আমরা দু'জন এসে দাঁড়ালাম তোমার শিয়রে।
নীরব সমাধিতীর্থে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে
বিশ্রাম নিয়েছে আজ, তবু জানি বিপুল জীবনে
আশার আলোক জ্বেলে প্রভাতের সূর্যের মতন
এঁকেছো সবুজ স্বপ্ন এবং তা অমর উজ্জ্বল।

তোমার স্মৃতির দীপ চিরদিন মানুষের মনে
জ্বলবে চন্দ্রের মতো, দুর্যোগের রাত্রির তিমিরে
চলার প্রেরণা পাবে অবিশ্রান্ত বিভ্রান্ত পথিক,
নিভবে না সে প্রদীপ কোনোদিন জাতির জীবনে।

ক্রন্দনে আকুল হয়ে অগণিত মানব সন্তান
তোমার শিয়র পাশে বোবা হয়ে দাঁড়ায় যখন,
তখন সুসিত-অশ্রু কালি হয়, হৃদয়ের পাতে
সে কালিতে লেখা হয় জীবনের নতুন খবর।
তাইতো তোমার মৃত্যু মৃত্যু নয়—তুমি যে অমর।
তোমার সমাধি পাশে এসে সব মানব সন্তান
প্রত্যেক মুহূর্তে পায় সুদিনের পথের সন্ধান।

আমরা দু'জন এসে পাশাপাশি সকলের সাথে
দাঁড়িয়ে তোমার কাছে অনির্বাণ আলোক পেলাম॥

www.pathagar.com

আমাদের পথের মশাল

দিলওয়ার

উদার আকাশ থেকে জ্যোতির্ময় সূর্যের মতন
সোনালী ঘোষণা তাঁর ঘুচিয়েছে তমিস্রার জাল;
তার দিব্যকান্তি তাই আমাদের পথের মশাল;
দীপ্ত তাঁর আশীর্বাদে এদেশের মানুষের মন।

তাইতো আমার চোখে অশ্রুর প্রবাহ হলো হারা;
সেখানে এখন জ্বলে সুদুর্লভ সূর্যকান্তমণি
প্রখর কিরণে যার সুলক্ষিত প্রত্যাশার খনি,
মৃত্যুহীন কণ্ঠ তাঁর—সে জীবন আলোকের ধারা।

মৃত্যুর সমুদ্র থেকে সে জীবন সূর্যের প্রতীক,
পাঠায় ঘোষণা তার আমাদের জাতির শিবিরেঃ
'অনৈক্যে আমরা মৃতঃ মৃত্যুহীন ঐক্যের শরীরে
এবং আমরা সত্য ন্যায় আর শান্তির পথিক।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আপন চোখে দেখা—
সোহ্‌রাওয়ার্দী ঃ একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য

এ. কে. ব্রোহী

ভবিষ্যতের কোনো নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত মন নিয়ে যখন পাকিস্তানের বর্তমান ইতিহাস রচনার কাজে হাত বাড়াবেন, তখন জাতীয় সম্মানের তালিকায় জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে তিনি যে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবশ্যই অভিষিক্ত করবেন, সে সম্পর্কে আমার মনে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বলতর জ্যোতিষ্ক; আর তাঁর সুস্পষ্ট ছাপ রয়ে গেছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পাতায় পাতায়। পাকিস্তানের গোড়াপত্তনের আগে ও পরে যে ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সকল মাপকাঠির বিচারে তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য একান্ত ব্যাপক ও অপরিসীম। প্রজ্ঞাসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত। দেশের গণমানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিলো অত্যন্ত নিবিড়। আত্মিক অনুভূতির সাহায্যে সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি নিখুঁতভাবে অনুধাবন করতে পারতেন। তাই, পাকিস্তানের মূল আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যে দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাধারার জীবন জোয়ার সৃষ্টি এবং সেটাকে সুসংহত করে সার্থক গণতন্ত্রের পথে পরিচালনার কাজেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, নিরঙ্কুশ গণতন্ত্রের যে রাজনৈতিক চিন্তাদর্শে তিনি বিশ্বাস করতেন, তা বাস্তবায়নের কাজে হাত বাড়াতেই তাঁকে উচ্চ ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে উপনীত হতে হয়। তার চেয়েও দুঃখ বা পরিতাপের বিষয় যে, দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি যে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেন, তার মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া দূরের কথা, সেটাকে ধ্বংসাত্মক বলে আখ্যাত করতেও কসুর করা হয়নি। রাজনীতির নামে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র যাদের বিশ্বাসের বস্তু, তারা কোনোদিনই জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে বরদাশ্‌ত করতে পারেননি। কিন্তু জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকার। রাজনৈতিক বিরোধীরা যাই বলুক এবং তাঁর বিরুদ্ধে ছাপার অক্ষরে যত কিছুই প্রকাশ করা হোক না কেন, তিনি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ বা মতবাদকে ভয়-ভীতি বা নৈরাজ্যের ভয়ে মুহূর্তের জন্যেও নুইয়ে পড়তে দেননি। তাঁর মহান রাজনৈতিক চরিত্রের এ এক বিরাট বৈশিষ্ট্য।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী আজ পরলোকবাসী। কাজেই আশা করা যায়, তাঁর সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের মনের সব জ্বালা ও তিক্ততার অবসান ঘটেছে। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী জীবনের শেষ অধ্যায়ে রাজনৈতিক কুজ্ঝটিকার মাঝখানে সীমাহীন দুর্যোগের ঘন কালো মেঘরাশি মাথায় নিয়ে বাকি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো অতিবাহিত করে গেছেন, তা নিয়ে আজ নিছক শোক প্রকাশ করেও লাভ নেই। আমাদের জাতীয় জীবনের সে দুর্যোগপূর্ণ

www.pathagar.com

মেঘমণ্ডলকে চাপিয়ে দিয়ে তাঁর মহান চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সকল সুরভি দেশের আকাশ-বাতাসকে ভরে তুলুক, এই কামনাই আমরা করছি।

প্রতিভাবান আইনজ্ঞ

আইনজ্ঞ হিসেবেও জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার আকর। যার পক্ষ সমর্থন করতেন, তার স্বার্থ রক্ষার তাগিদে আদালতকক্ষে তিনি আইনের যে ক্ষুরধার বাক-যুদ্ধ পরিচালনা করতেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। জনাব সোহরাওয়ার্দীর অনেক সমালোচককে প্রায়ই বলতে শুনেছি যে, তিনি (সোহরাওয়ার্দী) কোনো মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দল বা ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষার্থ তেমনটি মাথা ঘামাতেন না। আদালতে যে তিনি জয়ী হতেন, তা শুধু তাঁর রাজনৈতিক প্রভাবের গুণে। কিন্তু আমি তাঁর সমালোচকদের একথা আদৌ সমর্থন করি না। কারণ, দেখেছি আমার বিপক্ষে বহু জটিল মামলায় দাঁড়িয়ে তিনি এমন সব যুক্তি ও আইনগত প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, যেগুলো মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা ও নথিপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করা ছাড়া কোনো আইনজীবীর পক্ষেই সম্ভব নয়। পাকিস্তানের বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের মধ্যে যে ক'জনের বিপক্ষে আদালতে আমার দাঁড়াবার সুযোগ হয়েছে, জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনন্যসাধারণ। কোনো একটা বিশেষ প্রশ্ন অথবা সংশ্লিষ্ট মামলার কোনো বিশেষ দিককে আইনের যুক্তির আওতায় ফেলে তার প্রতি আদালতের সমর্থন আদায়ের প্রশ্নে তিনি যেন নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন, তা ভাষায় প্রকাশের অতীত। আইনের নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে নিজেকে সীমিত রেখেও তিনি যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করতেন, তাতে গোটা আদালতকক্ষে এক অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি হতো। তাঁর সে বক্তৃতা আদালতকক্ষের চার দেয়ালের মাঝখানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে যেন তাঁর সমর্থিত পক্ষের মামলার বিষয়-বস্তুর সত্যতার কথাই ঘোষণা করতো। নিজ পক্ষের মামলায় জয়কে করায়ত্ত করার কাজে আদালতে মামলা চলাকালে যে কোনো ছোট বা সাধারণ প্রশ্নকেও তিনি অত্যন্ত কৌশলের সাথে দ্রুত কাজে লাগাতে পারতেন। এ ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা ছিলো সত্যিই অসাধারণ।

জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন রাজনৈতিক চারণ। আইন ব্যবসায় ছাড়াও বড় বড় রাজনৈতিক জনসমাবেশে বক্তৃতা করা, রাজনৈতিক কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা এবং স্বীয় রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক ব্যাপারে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপক সফর প্রভৃতির মধ্যে তিনি সীমাহীনভাবে নিয়োজিত ছিলেন। যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করতে না পেরে চিঠিপত্র মারফত তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন, প্রতিদিন তাঁদেরও অগুণতি চিঠিপত্রের জবাব দিতে হতো জনাব সোহরাওয়ার্দীকে। এছাড়াও দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সংবাদপত্রগুলো কি ভাবে ও লেখে, তা যথার্থভাবে জানবার তাগিদে প্রতিদিনের সংবাদপত্রগুলোও গভীর মনোযোগের সাথে তাঁকে পড়তে হতো। তাঁর জীবনের এই কর্মময় ব্যস্ততার মাঝখানেও তিনি যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে গেছেন, তা শুধু অসাধারণ নয়, অচিন্ত্যনীয়ও বটে। আইন ব্যবসায়গত ধরাবাঁধা কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদনের বাইরে আর কিছুই করার নেই, তিনি এমন আইনজীবী কোনোদিনই ছিলেন না। বস্তুত তিনি ছিলেন এমন একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মহান ব্যক্তি—যিনি দেশের প্রতিটি জরুরী প্রশ্ন এবং বিশেষ করে দেশবাসীর

www.pathagar.com

ভাগ্য নির্ধারক ও দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রতিটি ঘটনার সাথে গভীর যোগসূত্র রক্ষা করে চলতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই সীমাহীন ব্যস্ততার মধ্যেও আইন ব্যবসায়ী হিসেবে সংশ্লিষ্ট মক্কেলের প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র অমনোযোগ অথবা অবহেলা প্রদর্শন করেননি। তিনি 'নেই সময়ের' মাঝখানেও সংশ্লিষ্ট মামলা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় করে নিতেন। তিনি যখন আদালতকক্ষে প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর গাম্ভীর্য ও পারিপাট্য সবাইকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতো এবং তিনি যেভাবে ও যে ভাষায় মামলা পরিচালনা করতেন, তাতে তাঁর বিপক্ষের আইনজীবীরাও বলতে বাধ্য হতেন—'সত্যিই, অদ্ভুত!' জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন আইনজীবী। পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য—তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই।

রাজনৈতিক প্রজ্ঞা

আমি যদিও জনাব সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলোাম না, তবু তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিলো যথেষ্ট। অনেক রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও তিনি আমার সাথে আলোচনা করতেন। আমি তাঁর সাথে একমত হতে পারতাম না। এজন্যে তিনি আমার প্রতি রুষ্ট বা বিতৃষ্ণ হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর সাথে আমার রাজনৈতিক মতবিরোধের প্রশ্নে আমি যেসব যুক্তির অবতারণা করতাম বা আমি যেভাবে তাঁর সমালোচনা করতাম, তিনি সেটাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। রাজনীতি নিয়ে যতবারই তাঁর সাথে আমি আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, ততবারই আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ দেশভক্ত মহাপ্রাণ এবং পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বার্থই ছিলো তাঁর লক্ষ্য। তিনি যা করতেন ও ভাবতেন, তার মধ্যে রাজনৈতিক লুকোচুরি বলতে কিছু ছিলো না।

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে প্রশংসনীয় দিক হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বার্থ আদায় অথবা নিজের ভবিষ্যৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হিসেবে বিপুল ধন ঐশ্বর্যের মালিকানার জন্যও তিনি তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাবকে কোনোদিন কাজে লাগাননি। তাই, জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি বরণ করেছিলেন নিঃস্বের মৃত্যু। নিজের বলতে তাঁর কোনো বাড়িও তিনি রেখে যাননি। শুধু তাই নয়, শেষ বয়সে অসুস্থ হয়ে স্বদেশ ও স্বদেশবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদেশে অবস্থানকালে তাঁকে চিকিৎসার ব্যয় সংকুলানের জন্য অপরের সাহায্যও নিতে হয়েছিল।

১৯৬৩ সালে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে লণ্ডনে জনাব সোহরাওয়ার্দীর সাথে আমার শেষ দেখা। লণ্ডনের ৫৭, ব্রুকল্যাণ্ড রাইজ-এর একটা ভাড়াটে বাড়িতে তিনি অবস্থান করছিলেন। দীর্ঘ তিনঘণ্টা যাবৎ গল্প-গুজবের পর আমি যখন তাঁর কাছে বিদায় চাইলাম তখন তিনি আমাকে হোয়াইট হল কোর্টস-এ পৌঁছে দেবার প্রস্তাব করলেন। তিনি আমাকে নিয়ে একখানি মোটর গাড়িতে বসালেন। জনাব সোহরাওয়ার্দীর ছেলে ঐ গাড়িখানা চালনা করছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, সে তখন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ ইতিহাসশাস্ত্রে গ্রাজুয়েট কোর্সের ছাত্র। যা হোক, গাড়িতে বসেও আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিলো। জনাব সোহরাওয়ার্দী কথাবার্তার মাঝখানে এক সময়ে আমাকে উদ্দেশ করে বললেনঃ 'মিস্টার ব্রোহী, আমি আমার রাজনৈতিক সংগ্রামে ক্ষান্ত দিয়ে এখন শান্তিতে মরতে চাই। কিন্তু পাকিস্তানের জনসাধারণ আমার প্রতি যে আস্থা ও ভরসা স্থাপন করেছে, তা যে

www.pathagar.com

কিছুতেই ভুলতে পারছি না। তাছাড়া আমার একমাত্র ছেলেটির কথাও আমাকে ভাবতে হচ্ছে। ছেলেটির জন্য রেখে যাবার মতো আমার যে কিছুই নেই। সে যে কি করে আরো লেখাপড়া করবে তাও বুঝতে পারছি না।'

স্বীয় জীবনের বহুমুখী অভাব-অভিযোগ ও দুশ্চিন্তার মাঝখানেও জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁর দেশবাসীর চিন্তাকে মন থেকে দূর করতে পারেননি। কি করে দেশের ও দেশবাসীর হিত সাধন করা যায়, এ চিন্তা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও তাঁকে অভিভূত করে রেখেছিল।

নিঃসঙ্গ ও বেদনাদায়ক মুহূর্ত

১৯৬৩ সালের জুলাই মাস। এথেন্সে বিশ্ব আইনজীবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনের অন্যতম অংশগ্রহণকারী হিসেবে আমি তখন এথেন্সে। জনাব সোহরাওয়ার্দীও সেখানে। তবে তিনি অসুস্থ। একদিন সারাটা বিকেল শহরতলির এক হোটেলের নিকটবর্তী এলাকায় আমরা দু'জন ঘুরে-ফিরে কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যার পর কাছেই এক রেস্তোরাঁয় গিয়ে দু'জনে রাতের খাওয়া খেয়ে নিলাম। এর কিছুদিন পর তিনি সামান্য হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এথেন্স শহরের কোনো এক নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত হলেন। আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, এই সময়ে ঘণ্টাখানেকের জন্যে একদিন তাঁর রোগশয্যার পাশে বসবার অবকাশ আমার হয়েছিল। তাঁর হাতের মধ্যে আমার হাত রেখে তাঁর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, বার বার যে কথাটি আমাকে পীড়া দিয়েছে তা হচ্ছে—'একটি কর্মময় জীবনে এ নিঃসঙ্গতা কেন?'

জনাব সোহরাওয়ার্দী তখন সত্যিই নিঃসঙ্গ ছিলেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে পৌঁছে স্বভাবতই মানুষ যখন আত্মীয়-স্বজন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ও সুহৃদদের পরিবেষ্টিত থাকতে চায়, জনাব সোহরাওয়ার্দী ঠিক সেই সময়টাই ছিলেন তাঁর প্রিয় দেশবাসী ও স্বদেশের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং একান্ত একাকী ও নিঃসঙ্গ। তার চেয়েও বেদনাদায়ক ঘটনা হচ্ছে—জনাব সোহরাওয়ার্দীর জীবন-প্রদীপ যে সত্যিই একান্ত নির্জনে নিভে গেছে, তাও আবিষ্কার হয়েছিল বৈরুতের কোনো এক হোটেলের টেলিফোন অপারেটরের সাহায্যে। প্রিয় দেশ ও দেশবাসী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সুহৃদ-সহকর্মী, ভক্ত ও অনুরক্ত—সবার থেকে দূরে, বিদেশের মাটিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগের মুহূর্তে তাঁর পাশে কেউ ছিলেন না; চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়ার আগে তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা ও একমাত্র পুত্রকে শেষ দেখাও দেখে যেতে পারেনি, এ দুঃখ লুকানোর ঠাঁই সত্যিই নেই।

আইনের শাসন

এথেন্সে অবস্থানকালে জনাব সোহরাওয়ার্দী একদিন আমায় বলেছিলেন যে, তিনি দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান। এজন্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক বিরোধী দল গঠনের এবং দেশে গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও আইনের শাসন কায়েম করার যাবতীয় পরিকল্পনা তিনি প্রণয়ন করেছেন।

জনাব হোসেন সোহরাওয়ার্দীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন প্রসঙ্গে আমি আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের একটা কথাও এখানে যোগ করতে চাই। অবিশ্যি আমি কোনো নিপুণ ভবিষ্যদ্দর্শী নই অথবা অনাগত ভবিষ্যতের পাতায় কি লেখা রয়েছে সে সম্পর্কে নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করার শাস্ত্রে আমার কোনো দক্ষতাও নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের চোখে যা দেখেছি এবং আজও

www.pathagar.com

দেখছি, মন দিয়ে যা অনুভব করেছি; সময়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি—তার থেকে আমার মনের স্থির বিশ্বাস, জাতির অবরুদ্ধ অধ্যায়কে উন্মোচন করতে সক্ষম, এমন কেউ আর আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমার আরো বিশ্বাস যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী বাহ্যত দেশবাসীর কাছ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেও কার্যত কবরে শুয়েই তিনি পাকিস্তান শাসন ও পরিচালনা করবেন। আমি স্থিরভাবে একথা বিশ্বাস করি যে, জনাব সোহরাওয়ার্দীর সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি; যে রাজনৈতিক আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য আজীবন তিনি সংগ্রাম করে গেছেন, তার কোনো ক্ষয় নেই—পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের চোখের সামনে সে আদর্শের জয় নিশ্চয়ই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। একথা বলা আদৌ অত্যুক্তি হবে না যে, শহীদ সোহরাওয়ার্দী জীবনভর সংগ্রাম করে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাদর্শের যতটুকু না বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, মৃত্যুর পর তার সবটাই বাস্তবায়ন হয়েছে। জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃতদেহ বিদেশ থেকে পাকিস্তানে আনার পর দেশে আপামর জনসাধারণ তাঁর প্রতি যে অভূতপূর্ব শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে, তা অতীতে খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটেছিলো এবং ভবিষ্যতে এতটা শ্রদ্ধা আর কারো ভাগ্যে জুটবেই—এমনটি বলা যায় না। জনাব সোহরাওয়ার্দীর শেষযাত্রার দিনে পাকিস্তানের বুকে যে অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা ঘটে তা থেকে মনে হয় যেন, তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই দেশব্যাপী জনমত যাচাইয়ের জন্যে এক গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অযুত লক্ষ মানুষ তাঁর জানাজায় শরিক হয়ে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে আল্লাহর রাহে দু'হাত তুলে যেন শহীদের জয়ের কথাই সেদিন নতুনভাবে ঘোষণা করছিল। সেদিনের সে হৃদয়-বিদারী দৃশ্য থেকে একথাই প্রমাণ হয়েছে যে, জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তানের প্রতিটি গণমানুষের প্রাণের শাসক। প্রাণ দিয়েই তিনি প্রাণকে শাসন করতেন, একাজে অস্ত্র বা অন্য কোনো কিছুর সাহায্য তাঁকে নিতে হয়নি।

ভবিষ্যতের কোনো নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক যখন দেশের রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের নথিপত্র নিয়ে বসবেন, তখন তিনি যে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য সম্মান দেবেন, আমার মনের সে স্থির বিশ্বাসের কথা শুরুতেই প্রকাশ করেছি। তারই জের টেনে একথাও বলার প্রয়োজন বোধ করছি যে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবনের অনবদ্য সাফল্যের মূলে ছিলো দেশের আপামর জনসাধারণের অন্তর নিঃসৃত নিরঙ্কুশ শ্রদ্ধা ও সমর্থন। জনাব সোহরাওয়ার্দী যে একান্তভাবেই জনসাধারণের মনের মানুষ ছিলেন, সে সম্পর্কে আজ আর কারো মনে সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি আজ তাঁর প্রিয় জনসাধারণের মধ্যে নেই; কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে মশাল তিনি জ্বেলে গেছেন; গণমানুষের প্রাণের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে 'ক্রুসেড' বা জেহাদ শুরু করে গেছেন, তাকে সমুন্নত ও অমলিন রাখার বজ্রকঠিন শপথ নিয়ে তাঁর কোনো যোগ্য অনুসারীরা এগিয়ে আসবেন, এই বিশ্বাস মনে ধারণ করেই আমি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য শেষ করছি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রসঙ্গে

আবুল ফজল

১৯৬১। মহাসমারোহে চট্টগ্রামে সপ্তাহব্যাপী রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী উৎসব চলছে। আমাকে করা হয়েছে মূল সভাপতি। অনুষ্ঠানের শেষদিন হঠাৎ দেখি সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব এসে হাজির। হয়তো তিনি চট্টগ্রাম এসেছেন, খবর পেয়ে উদ্যোক্তারাই তাঁকে নিয়ে এসেছেন। সেদিনের কর্মসূচীতে ছিলো 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়। আমাদের পাশে বসে শেষ পর্যন্ত যে অভিনয় তিনি দেখেছিলেন, অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওঠেননি। অভিনয় সম্বন্ধে মাঝে মাঝে দু' কোট মন্তব্য তিনি করছিলেন; তাতে তাঁর রসজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সেদিন আমি কিছুটা অবাক হয়েছিলাম। কারণ, তিনি ছিলেন রাজনীতিবিদ—সারাক্ষণের সব সময়ের রাজনীতিবিদ। সারাটা জীবনই তাঁর কেটেছে রাজনীতির কলকোলাহল ও দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের মধ্যে। শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে ভাববার অবসর কোথায়?

অনুষ্ঠান শেষে সেন্ট প্ল্যাসিড স্কুল প্রাঙ্গণে নির্মিত বিরাট প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে যখন গেটে এসে দাঁড়ালাম, তখন মিসেস ফাতেমা সালাম এসে বললেন ঃ আপনাকে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে এক গাড়িতে পাঠাবো। অপেক্ষা করুন, ভিড়টা একটু কমুক। শুনে খুব স্বস্তি বোধ করিনি।

কিন্তু উপায় নেই। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের মতো আমিও ওঁদের নিমন্ত্রিত এবং আমাকে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বও ওঁদের। মিসেস সালাম ঐ অনুষ্ঠানের কার্যনির্বাহক কমিটির এক বিশিষ্ট সদস্যা—সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া।

যতদূর মনে পড়ে সেবার সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব উঠেছিলেন আশকার দীঘির পূর্ব কোণে পাহাড়ের ওপর ইস্পাহানী বাংলোয়—ওখানে যেতে হলে আমার বাসার সামনের রাস্তা দিয়েই যেতে হয়। আমাদের উভয়কে একই গাড়িতে পাঠাবার কারণও ঐ।

পাকিস্তানে সম্ভবত সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবই একমাত্র রাজনীতিবিদ যিনি ক্ষমতাসীন কি ক্ষমতাহীন—সব অবস্থায় নেতা ছিলেন, সব অবস্থায় জনগণের এবং সহকর্মী ও অনুবর্তীদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও আনুগত্য সমানে পেয়েছেন। এমন দুর্লভ ভাগ্য আর কারো হয়নি। কাজেই অমন লোকের পাশে গিয়ে বসতে প্রথমে একটু অস্বস্তিবোধ করেছিলাম বইকি।

পেছনের সিটে মাঝখানে সোহ্‌রাওয়ার্দী, তাঁর দু'পাশে আমি আর মিসেস ফাতেমা সালাম। বসতেই আতরের গন্ধ পেলাম। বুঝলাম, সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব বের হওয়ার সময় আতর মেখেই বেরিয়েছেন। এটি তাঁর অভ্যাস কিনা, জানি না; কারণ এর আগে কি পরে তাঁর এত কাছাকাছি আসার সুযোগ আমার ঘটেনি।

মিসেস সালাম পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর আমি বললামঃ অপনি যখন প্রথম আওয়ামী লীগ সংগঠনের জন্য চট্টগ্রাম আসেন, তখন লালদীঘির ময়দানে আপনাকে যে সুদীর্ঘ

www.pathagar.com

অভিনন্দনপত্র দেয়া হয়েছিল তা আমারই রচনা। চট্টগ্রামের সংগঠককর্মী আজিজ আর জহুর আহমদ চৌধুরী এসে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন ওটা।

সময় সংকীর্ণ, কয়েক মিনিটেই তো পৌঁছে যাবো, গাড়ি আমার বাড়ির সামনে। তাই তাঁর উত্তর শোনার অপেক্ষা না করেই আমি বললাম, আপনার এমন সুদীর্ঘ ও বিচিত্র রাজনৈতিক জীবন, আপনার আত্মকথা লিখুন না, ওটা আমাদের এ-যুগের ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল হবে।

তিনি খুব উৎসাহ দেখালেন না। শুধু বললেন, সময় কোথায়? তবু আমি ফের আমার অনুরোধ জানালাম, বিলাতের খ্যাতনামা রাজনীতিবিদরা প্রায় সবাই আত্মকাহিনী লিখে গেছেন। তাতে ওঁদের জীবনের পরিচয় যেমন স্পষ্টতর হয়েছে, তেমনি ঐ দেশের রাজনৈতিক সাহিত্যও হয়েছে সমৃদ্ধ। আমাদের তো রাজনৈতিক সাহিত্য নেই বললেই চলে। বোধকরি, আমার আগ্রহ দেখেই তিনি শুধু আশ্বাসটুকুই দিলেন, দেখি সময় হয় কিনা। তারপর আজকের অভিনয় সম্পর্কে মিসেস সালামের সঙ্গে তর্ক শুরু করলেন। গাড়ি আমার ঘরের সামনে এসে পৌঁছলো।

॥ ২ ॥

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি যে 'ইত্তেফাক' সম্পাদককে লিখেছিলেনঃ বেঁচে থেকে আর কি লাভ? আমার জীবন কারো উপকারে তো আসছে না, আমিও পারছি না কারো কোনো উপকার করতে। মনে হয়, এ কথা কয়টির মধ্যেই ফুটে উঠেছে তাঁর জীবনের মূল সুর, লক্ষ্য ও আদর্শ। যেদিন থেকে তিনি জনজীবনে প্রবেশ করেছেন, সেদিন থেকেই তাঁর জীবন এ সুরেই বাঁধা পড়েছে। আমৃত্যু তাতে ছন্দপাত ঘটেনি।

সাম্প্রদায়িক অধ্যুষিত দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক বিপদ, অনেক বিপত্তি, বাধা-বিঘ্ন পদে পদেই। বিশেষত, রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তা প্রায় অত্যাচার-অবিচারে পরিণত হতে দেখা যায়, অবিভক্ত বাংলায় তা হয়েছিলও। দেশের তখনকার নাভিকেন্দ্র কলকাতাতে বসেই সোহরাওয়ার্দী এদৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছেন—নিজ সম্প্রদায়ের ও নিজের আশপাশের মানুষের এ অসহায়তা দেখেই তরুণ সোহরাওয়ার্দী রাজনীতিতে প্রবেশ করতে বাধ্য হন—না হয় সোহরাওয়ার্দী পরিবারের ঐতিহ্য ঠিক রাজনীতির ঐতিহ্য নয়। অবস্থার হেরফেরে পড়েই ঐ পরিবারের আরো দু'একজন সাময়িকভাবে পরিষদীয় রাজনীতিই করেছেন শুধু। একমাত্র শহীদই জনগণের হয়ে জনগণের রাজনীতিকে 'সারাক্ষণের' কর্তব্য হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। আসলে ঐ পরিবারের ঐতিহ্য হচ্ছে 'বিদ্যাচর্চা', বিশেষ করে 'প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা'। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 'প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা' ঐ পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যেসব রাষ্ট্র বা দেশ গণতান্ত্রিক কাঠামোয়—তার সীমা এবং চরিত্র যাই হোক শাসিত হয়, সেখানে রাজনীতি ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ ঐ রকম রাষ্ট্রে রাজনীতিই সব ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপকার করতে হলে রাজনীতি ছাড়া উপায় নেই, শিক্ষা শেষ করে দেশের মাটিতে পা দিয়েই সোহরাওয়ার্দী তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই পারিবারিক ঐতিহ্যের সীমা ছেড়ে সোহরাওয়ার্দী হয়ে পড়েন রাজনীতিবিদ।

কিন্তু সারা দেশের দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে সাম্প্রদায়িক, সেখানে সম্প্রদায় বিশেষের উপকার

www.pathagar.com

করতে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক। বিশেষত, জনমতের সব বাহন—সংবাদপত্র ও নানা সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান সবাই যেখানে অন্য সম্প্রদায়ের হাতে, সেখানে অকারণে আর বিনা দোষেরও দণ্ড ভোগ করতে হয়—নিন্দা আর কটূক্তির তো কথাই নেই।

অবহেলিত ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত মুসলমান সমাজের উপকার করতে গিয়ে সোহরাওয়ার্দীকে বহুবার বহু মূল্য দিতে হয়েছে।

বোধকরি ১৯২৪-এ কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি কলকাতা করপোরেশনে উন্নীত হয়। আর প্রথম মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন যথাক্রমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সে মাসের সুবিখ্যাত মাসিক 'ভারতবর্ষের' গোড়ায় আর্ট পেপারে উভয়ের পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি ছাপা হয়েছিল। প্রথমবারের মতো সে ছবিতেই তাঁকে আমরা দেখলাম। তখন তিনি তরুণ, সবেমাত্র রাজনীতিতে পদক্ষেপ করেছেন। যৌবনে, স্বাস্থ্যে, পোশাকের পারিপাট্য আর মেধা ও বুদ্ধির দীপ্তিতে তখন তাঁর সর্ব অবয়ব ঝলমল করছে। সে ছবির ভেতর দিয়ে তিনি সেদিন আমাদের মনে যে দাগ কেটেছিলেন, তা আজও আমার মনে স্মরণীয় হয়ে আছে। দেশবন্ধু ছিলেন সর্বভারতীয় নেতা—নানা রাজনৈতিক কাজে তাঁকে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হতো। ফলে, নামে মেয়র হলেও করপোরেশনের সভা-সমিতিতে তিনি প্রায়ই গরহাজির থাকতেন। সমস্ত ঝামেলা ও দায়িত্বভার ডেপুটি মেয়র শহীদকেই বহন করতে হতো। আকারে বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী—এলাকা যেমন তার বিরাট, লোকসংখ্যাও বিপুল, সমস্যাও তার জটিল ও অনন্ত। এসবেরই মোকাবিলা করতে হয়েছে সেদিন একা ডেপুটি মেয়র শহীদকেই। সেদিন তরুণ শহীদ যে যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার কোনো তুলনা নেই—এ কারণে সারা দেশের প্রশংসাভাজনও হয়েছিলেন তিনি। তবু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর মেয়র তাঁকে করা হলো না। এর অব্যবহিত আগে কলকাতায় এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। সোহারাওয়ার্দী নাকি ঐ সময় সংখ্যালঘু মুসলমানদের আত্মরক্ষায় সহায়তা করেছিলেন। ফলে, অন্যপক্ষ থেকে অভিযোগ উঠলো, তিনি সাম্প্রদায়িক! কে এক মীনা পেশোয়ারী নাকি সেদিন মুসলমান পক্ষে খুব লড়েছিলেন—অভিযোগ উত্থাপিত হলো, সে মীনা পেশোয়ারীকেই নাকি সোহরাওয়ার্দী আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের বাড়িতে ইত্যাদি বহুরকমের অভিযোগ। এ বিষয় তদন্ত করতে প্রাদেশিক কংগ্রেসের আহ্বানে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী সরেজমিনে কলকাতায় এলেন। সাম্প্রদায়িকদের চাপে পড়ে তিনিও সেদিন সোহরাওয়ার্দীর ন্যায্য দাবি নাকচ করে মেয়রের পদের জন্যে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকেই মনোনীত করলেন। এভাবে বাংলার রাজনীতিতে Triple crown কথাটার সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। অর্থাৎ এর ফলে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত হলেন একাধারে ত্রিমুকুটধারী—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি, স্বরাজ দলের দলপতি আর কলকাতা করপোরেশনের মেয়র। এ তিনটি পদ সেদিন প্রভূত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কেন্দ্র ছিলো। সমাজের নির্যাতিত মানুষের সেবা ও উপকার করতে গিয়ে রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই সোহরাওয়ার্দীকে ঐভাবেই দিতে হলো মূল্য।

ইংরেজ শাসনের নীতি হিসেবে সেযুগে কলকাতা হাইকোর্টে সব সময় একজন মুসলমান বিচারপতি নেয়া হতো। শহীদের পিতা জাস্টিস স্যার জাহেদ সোহরাওয়ার্দীর

www.pathagar.com

অবসর গ্রহণের পর শহীদের কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হওয়ার কথা উঠেছিল, সরকারি সিদ্ধান্তও নাকি প্রায় নেয়া হয়েছিল। তখন হঠাৎ কলকাতার সব বড় বড় কাগজে রব উঠলো, সোহরাওয়ার্দী সাম্প্রদায়িক। এমন সাম্প্রদায়িক লোককে কিছুতেই বিচারপতি করা যায় না। এমনকি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের মুখপত্র 'The Statesman' পত্রিকাও এ ধুয়ার সঙ্গে সুর মিলিয়েছিলো সেদিন। ফলে, সোহরাওয়ার্দী বিচারপতি হলেন না। তখন সাম্প্রদায়িকতার অর্থ ছিলো মুসলমান সমাজের উপকার ও তার স্বার্থরক্ষার চেষ্টারই নামান্তর। এ করতে গিয়ে সোহরাওয়ার্দীকে আবার মূল্য দিতে হলো।

কিন্তু, অন্য কথায় বলা চলে, তাঁর এই বিচারপতি না হওয়া জাতির জন্যে শাপে বর হলো।

॥ ৩ ॥

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁর অবদান সর্বজনবিদিত, সে কাহিনী অন্যরা হয়তো বর্ণনা করবেন। যে পাকিস্তানের তিনি অন্যতম স্রষ্টা, সে পাকিস্তানে তিনি এলেন একদম নিঃস্ব অবস্থায়, একরকম বিতাড়িত হয়েই—সঙ্গে নিজের প্রতিভাটুকু ছাড়া কিছুই নিয়ে আসতে পারেননি, হয়তো নিয়ে আসার মতো কিছু ছিলোও না। সম্ভবত এদেশে তিনিই একমাত্র রাজনৈতিক নেতা, রাজনীতি করে যিনি নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করেননি, রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নিজের সম্পদ বৃদ্ধির উপায় হিসেবে কোনোদিন ব্যবহার করেননি।

শুনতাম, কলকাতা করপোরেশনের কৌন্সিলার হতে পারাটাই ছিলো একটা পোয়াবারো ব্যাপার আর সোহরাওয়ার্দী তো ছিলেন ডেপুটি মেয়র। আগেই বলেছি, নামে ডেপুটি মেয়র, কার্যত প্রায় মেয়র—পরে অবিভক্ত বাংলার বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী, খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, পরিশেষে মুখ্যমন্ত্রী। এর যে কোনো একটার জোরেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া যায়, হয়েছেন এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। কিন্তু এত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও সোহরাওয়ার্দীর অবস্থার কোনো ইতর বিশেষ ঘটেনি। পাকিস্তানেও কম সুযোগ-সুবিধা কি তাঁর করায়ত্ত হয়েছিল? বিরোধী দলের নেতা, আইনমন্ত্রী, সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী, ইচ্ছা করলে কিনা করতে পারতেন? অথচ নিজের জন্য একটা বাড়িও করেননি। তাঁর নিজের কোনো আত্মীয়কে কোনো চাকরি দিয়েছেন, তেমন কথাও শোনা যায়নি। আশ্চর্য, এত সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও কোনো রাস্তা-ঘাট, পার্ক বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজের নামও জড়াননি। এরকম কোনো এক প্রস্তাবের উত্তরে সোহরাওয়ার্দী নাকি বলেছিলেন, I do'nt believe in this sort of immortatily. আর অন্য নেতা বা উপনেতাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেশের জন্যে, সমাজের জন্যে কোনো মূল্য যারা দেননি, স্বীকার করেননি কোনো ত্যাগ, ক্ষমতা হাতে পেতে না পেতেই তাঁরা জুড়ে দিয়েছেন নিজেদের নামে রাস্তা-ঘাট-পার্ক, স্কুল-কলেজ ও হাসপাতালের সঙ্গে। 'অমর' হওয়ার কী দুর্দান্ত অভীপ্সা! এখানে অবিভক্ত বাংলার মতো সাম্প্রদায়িকতার শিকার তাঁকে হতে হয়নি বটে; কিন্তু অন্য ধরনের শিকার তাঁকে হতে হয়েছে। ক্ষমতালোভীরা গোড়া থেকে—পাকিস্তানের সূচনা থেকেই সোহরাওয়ার্দীকে মনে করে এসেছেন তাঁদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী, সে ভয়ে তাঁরা পদে পদে তাঁকে বাধা দিয়েছেন, পাকিস্তানের রাজনীতিতে যাতে তিনি শিকড় গাড়তে না পারেন তার জন্যে। চেষ্টার ক্রুটি তাঁরা করেননি। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে তাঁর আদর্শনিষ্ঠা, প্রতিভা ও অসাধারণ সংগঠন

www.pathagar.com

শক্তির কাছে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা বারবারই পর্যুদস্ত হয়েছেন। নৈতিক পরাজয় হয়েছে আরো বেশি। তাঁর মতো রাষ্ট্রের অত বড় স্তম্ভকে বিনাবিচারে জেলে পাঠানো আর গত পাঁচ বছর ধরে তাঁকে যেভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে; তাতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের নৈতিক পরাজয় হয়েছে অধিকতর প্রকট। এ পরাজয়ের কালিমা ঢাকতেই কি তাঁর মৃত্যুতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়েছিল? ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে অনেক অন্যায় করা যায়, কিন্তু বিবেকের দংশন এড়ানো অসম্ভব।

গত পাঁচ বছর ধরে কত অপবাদই না তাঁকে দেয়া হয়েছে, কতভাবেই না রটনা করা হয়েছে তাঁর নিন্দা। আশ্চর্য, জনসাধারণ এর এক কানাকড়িও বিশ্বাস করেনি। জীবনে যেমন, মৃত্যুতেও কেউ তাঁকে জননেতার আসন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনি ছিলেন জনগণের স্বীকৃত নেতা।

প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেও তাঁর সহিষ্ণুতা ও উদারতার কোনো তুলনা নেই। তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের তুলনায় তিনি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ছিলেন। বিরুদ্ধপক্ষের কাজেও হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা তিনি করেননি কোনোদিন, পরম শত্রুকেও যাকে বলে 'নাভির নিচে আঘাত' কখনো করেননি। অবিভক্ত বাংলায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন যেমন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েও সে পথ অর্থাৎ প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার পথে তিনি কোনোদিন যাননি। এমন কি, যাঁরা একদিন লাঠি মেরে তাঁর সভা ভেঙ্গে দিয়েছেন, ক্ষমতায় বসে তাদের কাউকেও তিনি কোনোদিন জেলে পাঠাননি বা অন্যভাবে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করেননি। আমাদের রাজনীতির ইতিহাসে এমন উদারতার দ্বিতীয় নজীর আছে কিনা, সন্দেহ। তিনি সবসময় তাঁর বিরোধী পক্ষের নীতির সমালোচনা করেছেন, ব্যক্তির নয়। আর এও বোধকরি অনেকের জানা, তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনেককে তিনি অবধারিত দণ্ডের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন ব্যবহারজীবী হিসেবে তাঁদের পক্ষ সমর্থন করে—অনেক সময় কোনো ফি না নিয়েই। অথচ পরে এঁদের কেউ কেউ ক্ষমতায় বসে সোহরাওয়ার্দীর নিন্দায় হয়েছেন পঞ্চমুখ।

শুনেছি, ব্যক্তিগত জীবনেও সোহরাওয়ার্দী নির্লোভ ও পরোপকারী ছিলেন। যা এ যুগের রাজনীতিবিদদের জীবনে কদাচিৎ দেখা যায়। এখন রাজনীতিকে ব্যবহার করা হয় ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবেই। সোহরাওয়ার্দী প্রথম থেকে সফল ব্যবহারজীবী ছিলেন, কি কলকাতায়, কি পাকিস্তানে, সব সময় তিনি তাঁর পেশার সম্মুখের আসনে। বহু কেস করেছেন হাজার হাজার টাকা ফি নিয়ে, লাখ টাকার কথাও শোনা যায়। আবার বিনা ফিতেও করেছেন শত শত কেস। টাকা তাঁর পায়ে গড়াগড়ি গেছে, কিন্তু সঞ্চয় করে রাখেননি কিছুই—না নিজের জন্য না ওয়ারিশদের জন্য। দল-মত-নির্বিশেষে রাজনৈতিক কর্মীদের সাহায্যে এগিয়ে গেছেন সব সময়—অকাতরে তুলে দিয়েছেন এঁদের হাতে নিজের উপার্জিত অর্থ। হিসাব চাননি কোনোদিন।

তাঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় রেলে ছোটখাটো এক চাকরি করেন। বছর দুই আগের কথা। ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে। সোহরাওয়ার্দী ঢাকা এসেছেন শুনে উক্ত আত্মীয় দাওয়াত করতে গেছেন তাঁকে। প্রাথমিক আলাপের পর জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ের বিয়েতে তোমার কত খরচ পড়বে মনে করো?

www.pathagar.com

মেয়ের বাপ জানালেন, মোটামুটি হাজার পাঁচ-ছয় তো বটে।

ঃ কত যোগাড় হয়েছে?

আত্মীয়টি ঢোক গিলে বললেনঃ হাজার দুই।

সোহরাওয়ার্দী পকেট থেকে নোটের বাণ্ডিল বের করে বললেনঃ এইমাত্র আমার এক মক্কেল চার হাজার টাকা দিয়ে গেছে। কয়েকখানা নোট নিজের হাতে রেখে বাকিটা আত্মীয়টির দিকে ঠেলে দিয়ে যোগ করলেনঃ এ তিন হাজার তুমি নিয়ে যাও, এক হাজার আমার করাচী গিয়ে পৌঁছতে লাগবে। আমার হাতে আর টাকা নেই, থাকলে আমি আরো দিতাম। আর ফেডারেল কোর্টে কেস না থাকলে তোমার মেয়ের বিয়েতে হাজির থাকতাম।

এ কাহিনী উক্ত মেয়ের বাপের মুখ থেকেই আমার শোনা।

॥ ৪ ॥

সোহরাওয়ার্দী আজ নেই। তাঁর নশ্বর দেহ মাটির নিচে আশ্রয় নিয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর নাম ও স্মৃতি এ উপমহাদেশের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে, পাকিস্তানের ইতিহাসে তাঁর যে এক বিশিষ্ট স্থান, তা কোনোদিনই ভুলবার নয়।

পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর বিশিষ্ট ও অতুলনীয় ভূমিকার কথা আজ ইতিহাসের বস্তু। এ আন্দোলন যখন চরম পর্যায়ের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন আমাদেরই এক প্রবীণ ও জনপ্রিয় নেতার সঙ্গে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী তথা মুসলিম লীগের মতভেদ ঘটে এবং হয়ে যায় ভাঙ্গাভাঙ্গি। তিনি পাল্টা প্রতিষ্ঠান খাড়া করলেন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে। সেদিন সোহরাওয়ার্দী অকুতোভয়ে এ বিপদের মোকাবিলা না করলে পাকিস্তান আন্দোলনের মেরুদণ্ডই হয়তো ভেঙ্গে যেতো—মুসলিম সংহতিও হতো বিপন্ন। সে সংহতির ফলেই পাকিস্তান অর্জন সহজ হয়েছে। কলকাতা গড়ের মাঠে একই দিনে একই সময় পাশাপাশি পাল্টা দুই বিরাট মুসলিম জনসভার কথা বোধকরি আজও অনেকের স্মরণ আছে। সেদিন সোহরাওয়ার্দী যে নির্ভীক নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তারও কোনো দ্বিতীয় নজির নেই। বলা বাহুল্য, সেদিন বাংলার রাষ্ট্রীয় শাসনভার ছিলো মুসলিম লীগ বিরোধী দলের হাতে।

তাঁর নেতৃত্ব আরো কয়েকটি কারণে স্মরণীয়। কায়েদে আজমের পরে সহকর্মী ও অনুবর্তীদের এমন একনিষ্ঠ আনুগত্য অন্য কোনো নেতাই পাননি। ক্ষমতাসীন অবস্থায় অনেকে অনেকের আনুগত্য পেয়েছেন সত্য; কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আনুগত্য হাওয়ায় উড়ে যেতে এ সত্তর বছরে আমরা বহুবার দেখেছি। একমাত্র ব্যক্তিক্রম সোহরাওয়ার্দী। লিয়াকত আলী সাহেব ক্ষমতায় থাকতে থাকতেই মারা গেছেন—ক্ষমতাশূন্য অবস্থায় তাঁর দশা কি হতো সে পরীক্ষা চিরকালের জন্যে বাকি রয়েছে।

শুনেছি, সামরিক শাসনকালে এবং তার পরেও তাঁর অনুবর্তীদের প্রধান কয়েকজনকে ভাগাবার চেষ্টার ক্রটি হয়নি—ভয়, প্রলোভন আর জেল-জরিমানায়ও তাঁদের আনুগত্যে ফাটল ধরানো সম্ভব হয়নি। এসবে একদিকে যেমন তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তাঁর অনুবর্তীদের জন্যও এটা প্রশংসার কথা। আমাদের সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে এও বিরল নজির। তাঁকে দলে ভিড়াবার চেষ্টাও কম হয়নি, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই গণতন্ত্র নিয়ে তিনি আপোষ করতে রাজি হননি।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের দুই অংশের জনসাধারণের আনুগত্য তিনি পেয়েছিলেন। এটিও তাঁর দুর্লভ ভাগ্য। ভাগ্য বলা হয়তো ঠিক হলো না—তাঁর সম-সাময়িকদের মধ্যে এমন যোগ্যতাও কারো ছিলো না, কারো নেইও যিনি সমানে দুই অংশের আনুগত্য দাবি করতে পারেন। এ যাবৎ পাকিস্তানে তিনিই একমাত্র নেতা যিনি দুই অংশের জনসাধারণের ভাষায় কথা বলতে ও ওদের হৃদয়ের কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে পারতেন। ফলে দুই অংশের জনগণের সমস্যা সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন ওয়াকিফহাল। এমন দ্বিতীয় কোনো নেতা পাকিস্তানে এখনো দেখা দেয়নি। এটা পাকিস্তানের জন্য খুব আশাপ্রদ ভবিষ্যৎ নয়।

সোহরাওয়ার্দীর গণতান্ত্রিক আদর্শনিষ্ঠার কথা দ্বিতীয়বার বলার তোয়াক্কা রাখে না। বিরোধী দল ছাড়া গণতন্ত্র অর্থহীন ও অপূর্ণ। পাকিস্তানে এসেই তিনি দেখতে পেলেন এখানে গণতন্ত্রকে খোঁড়া ও পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। এক পায়ের ওপর গণতন্ত্র কিছুতেই খাড়া থাকতে পারে না। বলা বাহুল্য, গণতন্ত্র দুই পা-বিশিষ্ট। সরকার আর বিরোধী দল—এ দু'পায়ের এক পা ভেঙ্গে দিলে গণতন্ত্র যে শুধু খোঁড়া হয়ে পড়ে তা নয়, স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে তার তখন কোনো পার্থক্যও থাকে না। একজনের একনায়কত্ব যা, দশজনের ভাগাভাগি করা একনায়কত্বও তাই—উভয়ের স্বভাব এবং চরিত্র এক। সোহরাওয়ার্দী একক চেষ্টায় পাকিস্তানকে বিরোধী দল দিয়েছেন অর্থাৎ গণতন্ত্রকে পূর্ণাঙ্গ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। পাকিস্তান এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়েছিল; আর এক পা দিয়ে সোহরাওয়ার্দী তাকে সচলতা দিয়েছেন। এদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এ অবদান সত্যই অমূল্য। এজন্যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতেই তিনি বিমুখ হননি। নিজের শক্তি, সামর্থ্য, অর্থ, সময় ও মেধা—সবকিছুই এর জন্য ব্যয় করেছেন তিনি। প্রবল বাধার সম্মুখে তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা, সংগঠন-শক্তি ও সহিষ্ণুতা দেখে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরাই হয়েছেন সকলের চেয়ে বেশি অবাক। শুধু এ কারণেও পাকিস্তানের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। পাকিস্তানের প্রতি তাঁর সর্বোত্তম উপহার—বিরোধী দল।

পাকিস্তানের দু' অংশ—এ দু' অংশের মিল ও ঐক্যের ওপরই নির্ভর করছে সারাদেশ ও রাষ্ট্রের সংহতি ও নিরাপত্তা। এ সত্যও সোহরাওয়ার্দী বুঝতে পেরেছিলেন। বহু প্রদেশে ও প্রাদেশিক স্বার্থে দ্বিধাবিভক্ত পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিটের আওতায় নিয়ে আসা এ সংহতির প্রথম পদক্ষেপ, দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে দুই অংশের মধ্যে সংখ্যাসাম্য। শেষোক্ত সিদ্ধান্তের ফলে পূর্ব পাকিস্তান কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বৃহত্তর জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সংহতির খাতিরে এ মেনে নেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। এ নীতি যথাযথভাবে পালন হচ্ছে না বলেই আজ আমাদের দুঃখ; পালন হলে আমার বিশ্বাস, দুঃখের তেমন কারণ থাকবে না। এছাড়া পাকিস্তানের দুই অংশের ঐক্য ও সংহতির অন্য কোনো পথ আমার জানা নেই। জাতীয় সংহতির পথে তৃতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে—মুক্ত নির্বাচন। এ তিন সিদ্ধান্তের মূলে যে সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, কল্পনা ও চেষ্টা ছিলো, তা বোধকরি অনেকেরই জানা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সময় যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন, তাঁরা তাঁকে সামনে রেখে, তাঁর ব্যক্তিত্ব, প্রভাব ও সংগঠন-শক্তির সুযোগ নিয়ে জাতীয় সংহতির অনুকূল এ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো তাঁর সাহায্যে আইনসভায় পাস করিয়ে নিয়েছেন; কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে এগুলোকে একটা দৃঢ় ও সুসংহত রূপ দেয়ার সুযোগ তাঁকে দেননি।

www.pathagar.com

কারণ তাঁরা রাষ্ট্রীয় সংহতি থেকে যে কোনো প্রকারে নিজেরা ক্ষমতায় থাকাই বেশি মূল্যবান মনে করেছেন। তাই দেশের জনগণের আর পার্লামেন্টের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও তেরো মাসের বেশি তাঁকে ক্ষমতায় থাকতে দেয়া হয়নি। জাতীয় সংহতির মতো জটিল ব্যাপারে তেরো মাসে আর কতটুকু করা যায়?

যাই হোক, সোহরাওয়ার্দী আজ নেই; কিন্তু জাতীয় সংহতির পথে তিনি যে তিনটি পদক্ষেপ রেখে গেছেন, আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রবিদরা যদি সে পথে এগিয়ে যান তাহলে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সংহতি অর্জন আমাদের পক্ষে সহজ ও দ্রুত হবে। আমাদের তরুণ রাজনীতিবিদদের সামনে সোহরাওয়ার্দী একটি মহৎ উত্তরাধিকার রেখে গেছেন—সে উত্তরাধিকার হচ্ছেঃ রাজনীতি রাতারাতি বড়লোক বনা বা বাড়ি-গাড়ি আর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের মালিক হওয়ার পথ নয়, বরং জনসেবার, দেশ সেবার ও জাতি সেবারই পথ। নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যুবরণ অগৌরবের কথা নয়। পৃথিবীর বহু মহামানবই নিঃস্ব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। বরং রাজনীতির নামে জনসাধারণের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়াই লজ্জার কথা।

আমাদের নবীন রাজনীতিবিদরা সোহরাওয়ার্দীর এ উত্তরাধিকারটুকু যদি গ্রহণ করেন তাহলে 'বড়লোক' তাঁরা হয়তো হবেন না; কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর মতো পাকিস্তানের ইতিহাসে তাঁরাও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

www.pathagar.com

সমুদ্রের পরিমাপ যেমন সম্ভব নয়....

তফাজ্জল হোসেন

শহীদ সাহেব ইহজগতে নাই—একথাই আজ মন বিশ্বাস করতে চায় না। বিদেশে দেশবাসীর অগোচরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, ইহাই তার একমাত্র কারণ নহে। আমার মতো এদেশের অগণিত মানুষ আশা পোষণ করিত যে, শহীদ সাহেব অন্তত আরও দশ বৎসর বাঁচিয়াই থাকিবেন না, কর্মক্ষমও থাকিবেন; কায়েমী স্বার্থীদের টানাপোড়েনে পাকিস্তানের রাজনীতিতে অগণতান্ত্রিক শক্তির অভ্যুত্থানে গোটা দেশের রাজনীতি যে বিশৃংখলার পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে এবং জনসাধারণ তাহাতে যেভাবে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে তাহা হইতে শহীদ সাহেবের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতাই দেশকে উদ্ধার করিতে পারেন—এই ধারণা তাঁহার শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই পোষণ করিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তাঁহার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে জানিয়াও তাঁহার মৃত্যুর কথা এদেশের মানুষ চিন্তা করিতেও ভরসা পায় নাই। পাকিস্তান আন্দোলনকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং নানা ঝড়-ঝঞ্ঝার কালে বাংলার জনসাধারণ যেমনি শহীদ সাহেবের কর্মক্ষমতা ও সাহসিকতার ওপর অটল আস্থা স্থাপন করিয়া নির্বিঘ্ন থাকিত, জাতির বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণেও তাঁহার প্রতি পাকিস্তানীদের, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানীদের একই রূপ আস্থা ছিলো। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে আমাদের মধ্য হইতে কাড়িয়া নিয়াছে, মন না বুঝিলেও ইহাই রূঢ় সত্য।

শহীদ সাহেবের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়া এই বিশেষ সংখ্যায় বিভিন্ন লেখক এবং তাঁহার ভক্ত-অনুরক্তরা আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু গভীর সমুদ্র সম্পর্কে লেখনীর মারফতে যেমন সব কিছু তুলিয়া ধরা সম্ভব হয় না, তেমনি শহীদ সাহেবের চল্লিশ বৎসরের অধিক কর্মময় জীবনের খতিয়ান দেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

শহীদ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিলো ঃ তিনি কাজে বিশ্বাস করিতেন, প্রচারে নয়। জীবনে তিনি যাহা কিছু আয় করিয়াছেন, সেই লক্ষ লক্ষ টাকা মানুষকে বিলাইয়া দিয়াছেন; বলিতে গেলে, নিজের জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। বরং মৃত্যুকালে গ্রীন্ডলেজ ব্যাঙ্কে তেরো হাজার টাকা দেনা এবং জিন্নাহ হাসপাতালের বিল বাকি রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের সকলের পীড়াপীড়িতে তিনি ঢাকার ধানমন্ডি এলাকায় যে একখানি বাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাও কন্ট্রাক্টরের প্রাপ্য টাকার দায়ে এখনও ভাড়া রহিয়াছে।

কিন্তু তিনি তাঁহার দানের কথা কখনও মুখ খুলিয়া কাহারও নিকট বলেন নাই। এমনকি যে সকল লোক তাঁহার সাহায্যে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাদের মধ্যে যদি কেহ তাঁহার বিরোধিতা করিতেন তাহা হইলেও তিনি কখনও মুখ খুলিয়া বলেন নাই যে, অমুক লোক আমার নিকট হইতে এতভাবে সাহায্য গ্রহণ করিয়াও আজ আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। এইজন্যই তাঁহার অতি নিকটবর্তী লোক ছাড়া অনেকের পক্ষেই শহীদ সাহেবের বিশাল হৃদয়ের প্রকৃত খবর রাখা সম্ভব নহে। সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে তিনি

www.pathagar.com

আপন-পর, ভালো-মন্দের প্রশ্ন কখনও বিচার করেন নাই। তাঁহার হাতে অর্থ থাকিলেই সেই অর্থ মানুষকে বিলাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত তিনি যেন অস্বস্তি বোধ করিতেন। তাই তাঁহার এই উদার মনের সুযোগে অনেক সময় অপাত্রেও তিনি দান করিয়াছেন। গত বৎসরের একটি ঘটনা। আমি তাঁহার করাচীর বাড়িতে সাক্ষাতের জন্য বৈকালে গমন করি। কিছুক্ষণ পরে তিনি বাহিরে যাইতেছিলেন। আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিলাম, তিনিই গাড়ির চালক। গাড়িতে উঠিবার পরে তিনি একটি লোককে ডাক দিলেন এবং গাড়ির পিছনে বসিতে বলিলেন। ছেলেসহ মাঝারি বয়সের লোকটি জড়সড়ভাবে গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। গাড়ি চালাইতে চালাইতে তিনি বলিলেন, এই লোকটি বিশেষ অভাবগ্রস্ত। বাল-বাচ্চা নিয়া চরম আর্থিক দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। লোকটি বলে যে, সে দশ হাজার টাকা পাইলে ছোট-খাট কন্ট্রাক্টের কাজ করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ আপনি লোকটির পরিচয় জানেন?

তিনি উত্তর দিলেন ঃ কিছুটা চিনি, সে মোহাজের; তবে দেখো না, তার সঙ্গী ছেলেটির এত সুন্দর চেহারা। অথচ অন্নকষ্টে লোকটি কিভাবে কৃশ হইয়া পড়িয়াছে এবং সে কতখানি বিমর্ষ। আমি বুঝিলাম যে, শহীদ সাহেব এই লোক্‌টিকে সাহায্য করিতে চাহেন। কিন্তু লোকটি যাহাতে না বোঝে সেজন্য আমি তাঁকে বাংলায় জিজ্ঞাসা করিলামঃ স্যার, এই দশ হাজার টাকা নিয়াই কি লোকটি ক্ষান্ত হইবে? আমি জানিতাম, বহু লোক এইভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের কথা বলিয়া শহীদ সাহেবের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিয়াছে, আবার কিছুদিন পরে তাঁহার নিকট ধর্না দিয়াছে। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

কিছুদিন পর শহীদ সাহেব ঢাকায় আসিলেন। একদিন তিনি নিজস্ব ভঙিতে বলিলেন, আমার বহু টাকার দরকার। আমি বড় বড় কেস চাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, হঠাৎ আপনার টাকার এত প্রয়োজন কেন? গতবার করাচী যাওয়ার কালে এখান হইতে যে ছাব্বিশ হাজার টাকা নিয়া গেলেন তাহার কি হইলো?

তিনি বলিলেন ঃ ওসব আর নাই। ওখানে কত লোক হা করিয়া থাকে, তোমরা হয়ত তা জানো না। আমি ব্যাংক হইতে দশ হাজার টাকার ওভার ড্রাফট গ্রহণ করিয়াছি এবং ইনকাম ট্যাক্সের টাকাও বাকি। তাই আমার বহু টাকার প্রয়োজন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, স্যার ওই লোকটিকে কি আপনি দশ হাজার টাকা দিয়াছেন এবং সেই জন্যই কি ব্যাংকের দেনা?

শহীদ সাহেব নীরব রহিলেন। বলিলাম, স্যার, আপনি লোকটিকে টাকা দিয়াছেন। এভাবে অসংখ্য ঘটনা আমাদের চোখে পড়িয়াছে। যেদিন তাঁহাকে এবডো করার খবর পত্রিকাসমূহে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হইলো, সেইদিন একটি মামলা উপলক্ষে তিনি ময়মনসিংহ গমন করিয়াছিলেন এবং বৈকালে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় টাকার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। হাজার টাকার মতো বাড়ি ভাড়া বাকি পড়িয়াছে। পরিশোধ করিতে না পারিলে বাড়ি ছাড়িয়া যাইবার তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। আমি এবং মুজিব সাহেব তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি। লোকটি টাকার কথা বলিতেই আমরা এক প্রকার চটিয়া গেলাম। কারণ সেদিন তাঁহার মন খারাপ থাকিবার কথা। কিন্তু এবডোর মতো অপমানজনক, অত্যাচারমূলক ব্যাপারকেও তিনি সেদিন হাসিমুখে গ্রহণ

www.pathagar.com

করিতেছেন দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম। তিনি আমার স্ত্রীর নিকট হইতে তাঁহারই গচ্ছিত টাকা আনিয়া লোকটিকে দিয়া দিলেন।

মানুষ বড় হইলে সাধারণত গরীব আত্মীয়-স্বজনকে পরিচয় দেয় না। কিন্তু শহীদ সাহেবের ব্যাপার ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি গরীব আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজিয়া বাহির করিতেন। তাহাদের ভাঙাচুরা ঘরে গমন করিতে কিংবা তাহাদের সহিত খানাপিনা করিতে কখনও দ্বিধা করিতেন না। বরং অনেক সময় তাহাদের দুরবস্থা নিয়া আমাদের সহিতও আলাপ করিতেন এবং প্রচুর পরিমাণ সাহায্য করিতেন।

১৯৬১ সালের একটি ঘটনা। শহীদ সাহেবের এক খালাত বোন কলিকাতা হইতে ঢাকা আগমন করেন। শহীদ সাহেবের বড় ভাই শাহেদ সাহেবও তখন ঢাকায়। তিনি তাঁহার বোনকে বলিলেনঃ দেখো, বড় ভাইর কাছে কোনো সাহায্য চাহিবে না। যা পারি আমিই দিবো।

এই সময় তিনি স্বাস্থ্যের কারণে হাওয়া পরিবর্তন এবং চিকিৎসার জন্য ইউরোপ গমন করিতেছিলেন। আমার স্ত্রীর নিকট গচ্ছিত তাঁহার সকল টাকা সঙ্গে নিয়া যাইতেছেন। গাড়িতে উঠিয়া তিনি আবার ফিরিয়া আসিলেন। আমাকে বাথরুমের মধ্যে ডাকিয়া নিয়া মানিব্যাগ হইতে ষোল শত টাকা আমার হাতে দিয়া বলিলেনঃ দেখো, আমি বিদেশে যাইতেছি। সেই জন্য টাকা রাখিয়া যাইতে পারিতেছি না। কিন্তু তোমার যদি কোনো ঠেকাঠুকা হয়, সেইজন্য এই সামান্য টাকা রাখিয়া গেলাম।

আমি প্রথমে টাকা নিতে অস্বীকার করিলাম। বলিলামঃ বর্তমানে টাকার আমার কোনো প্রয়োজন নাই। তাঁহার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত আমি টাকা গ্রহণ করিলাম এই ভাবিয়া, যাহাতে তাঁহার মনে এই ধারণার সৃষ্টি না হয় যে, অল্প টাকা বলিয়া আমি গ্রহণ করিতেছি না।

তিনি একাধিকবার একটি রেফ্রিজারেটরের প্রয়োজনের কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। আমি এই সুযোগে শহীদ সাহেবের প্রদত্ত টাকার সহিত আরও কিছু টাকা যোগ করিয়া একটি রেফ্রিজারেটর কিনিয়া ফেলিলাম। শহীদ সাহেব চলিয়া যাইবার পর বৈকালে আমার স্ত্রী শহীদ সাহেবের বোনের ঠিকানা জানিতে চাহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? তিনি বলিতে চাহিলেন না। পরবর্তীকালে জানা গেল যে, শহীদ সাহেব তার জন্য পাঁচ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেকথা কাহারও নিকট বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা গত চার বৎসরে আমার দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। টাকাকে তিনি টাকা গণ্য করেন নাই। ইহার দ্বারা যদি মানুষের এতটুকুও কল্যাণ বিধান করা যায়, তাহাই ছিলো তাঁহার নিকট টাকার সার্থকতা। কলিকাতা থাকিতেও তিনি এই একই কাজ করিতেন। প্রতি মাসের প্রথম দিকে দেখা যাইত, তাঁহার বাড়িতে বহু 'অজানা-অচেনা' লোকের ভীড়। তিনি তাদেরকে একে একে তাঁহার কামরায় ডাকাইয়া পাঠাইতেন। পরে জানা যায় যে, তিনি এই সকল লোককে মাসিক সাহায্য প্রদান করিতেন। ইহাদের মধ্যে ছিলো সাধারণত গরীব ছাত্র, বস্তি এলাকার দুঃস্থ লোকজন। কলিকাতার মুসলিম বস্তি এলাকাগুলিতে তিনি নিজেই ঘোরাফিরা করিয়া তাহাদের অবস্থা অনুসন্ধান করিতেন। তাদের অসুখ-বিসুখে চিকিৎসার জন্য নিজেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন এবং ঔষধপত্র ও ডাক্তারের টাকা তিনিই পরিশোধ করিতেন। এক কথায়, সাধারণ মানুষের আপদে-বিপদে তিনি সর্বদাই তাহাদের পাশে দাঁড়াইতেন।

www.pathagar.com

কলিকাতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর 'রাজনৈতিক দুর্গ' বলিয়া পরিচিত ছিলো তাঁহার চেহারা দেখিয়া নহে, মানুষের প্রতি দরদ এবং সেবাকার্যের জন্যই। শহীদ সাহেব অভিজাত বংশের লোক হইয়াও কলিকাতার বস্তি এলাকার লোকজনের সহিত রাস্তার পার্শ্বে টুলে বসিয়া চা ইত্যাদি পান করিতেন লোক দেখাইবার জন্য নহে, তাহাদেরকে সংগঠিত করিবার জন্য এবং তাদের আত্মমর্যাদা সৃষ্টির কারণে। কলিকাতার মানুষ যে তাঁহার কথায় জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারিতো তাহার মূল কারণও ছিলো এখানেই।

তাঁহার যোগ্যতা এবং গুণাবলীর জন্য শিক্ষিত সমাজের যেমনি তিনি আদরণীয় ছিলেন, তেমনি তাঁহার নীরব সেবা এবং মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদের কারণেই তিনি ১৯৩৭ সালের এবং ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে কলিকাতা এবং চব্বিশ পরগণার দুই দুইটি আসন হইতে একরূপ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন। শেরে বাংলা ফজলুল হক ছাড়া পাক-ভারত উপমহাদেশের কোনো মুসলিম রাজনীতিকের পক্ষে এইরূপ জয়লাভ সম্ভব ছিলো না।

দেশবাসী তাঁহার প্রতি যেরূপ আস্থা রাখিতেন, তিনিও দেশবাসীর ওপর একই রূপ আস্থা এবং দরদ পোষণ করিতেন। কায়েমী স্বার্থের ষড়যন্ত্রের ফলে বাংলা যখন বিভক্ত হয় তখন তিনি অন্তত কলিকাতাকে পূর্ব পাকিস্তানে সামিল রাখিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার যুক্তি ছিলো যে, রাজধানী কলিকাতা পূর্ব বাংলার সম্পদ দ্বারাই গড়িয়া উঠিয়াছে এবং যেহেতু বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায় বাংলা বিভাগ চায় না, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই বাংলা বিভাগ দাবি করিতেছে, সেইহেতু রাষ্ট্রীয় কানুনের বিধান মতেও সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিচ্ছিন্ন (Seceding) অংশ রাজধানী পাইবার অধিকার নয়। বাংলার তদানীন্তন গভর্নর মিস্টার বারোজকেও তিনি এই যুক্তি অনুধাবন করাইতে সক্ষম হন এবং তাঁহার মন্ত্রিসভার তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী মরহুম মোহাম্মদ আলী এই মর্মে এক বিবৃতিও প্রচার করেন। কিন্তু আমাদের মধ্যেকারই একদল লোক সূক্ষ্মপথে ইহার বিরোধিতা করিতে থাকেন। তাঁহারা বলিতে শুরু করেন যে, কলিকাতার কোনো ভবিষ্যৎ নাই। বাঙালী মুসলমানেরা এখান হইতে চলিয়া গেলে এবং চট্টগ্রাম পোর্ট সম্প্রসারিত হইলে কলিকাতার কোনো বাণিজ্যিক প্রতিপত্তি থাকিবে না, কলিকাতার পোর্টের গুরুত্ব নষ্ট হইবে এবং কলিকাতায় এমনি সমস্যা দেখা দিবে যাতে কলিকাতা শেষ পর্যন্ত পাতিশিয়ালের বাসস্থানে পরিণত হইবে। তাহারা আরও কানাঘুষা করিতে লাগিলেন যে, নিজস্ব স্বার্থের জন্যই শহীদ সাহেব কলিকাতাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত রাখিতে চাহেন। কিন্তু দুনিয়া জানিত যে, কলিকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গে শহীদ সাহেবের নিজস্ব স্বার্থ বলিয়া কিছু ছিলো না। কলিকাতায় তাঁহার কিংবা তাঁহার বংশের কারও একখানা নিজস্ব বাড়িও ছিলো না। ৩ নম্বর ওয়েলসলি ফার্স্ট লেন কিংবা ৪০ নম্বর থিয়েটার রোডে তাঁহার বাসস্থানটি ভাড়া করা বাড়ি ছিলো। কলিকাতার প্রতি তাঁহার দরদের দুইটি কারণ ছিলো। প্রথম কারণ হইলো যে, ইহা প্রধানত পূর্ব পাকিস্তানের অর্থ ও সম্পদ দ্বারাই গড়িয়া উঠিয়াছিলো এবং সংখ্যালঘুদের বাংলা বিভাগের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আইনতও রাজধানীর ওপর তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ ছিলো, পাকিস্তান সংগ্রামে কলিকাতার মুসলমানেরাই অগ্রভাগে ছিলেন বা থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' উপলক্ষ করিয়া কলিকাতায় যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার

www.pathagar.com

সূত্রপাত হয় তাহাতে কলিকাতার মুসলমানদেরই অধিকাংশ ক্ষয়ক্ষতি পোহাইতে হয় এবং জীবনে আত্মাহুতি দিতে হয়। এই কারণেই ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট তারা স্বাভাবিকভাবেই দুশমনে পরিণত হয়। শহীদ সাহেবের এই দরদ যে মেকী ছিলো না তাহার প্রমাণ শেষ পর্যন্ত কলিকাতা পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইলেও তিনি অন্যদের মতো পাকিস্তানে ছুটিয়া না আসিয়া দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর সহিত শান্তি-মিশনে অবতীর্ণ হন। এই সময় তাঁহার জীবনের ওপর কতবার আক্রমণ চলিয়াছিলো, তাহা অনেকেরই জানা আছে। একদা রাত্রে বেলিয়াঘাটা গান্ধী ক্যাম্পে গমনকালে বেলিয়াঘাটা পুলের ওপর তাঁহার গাড়ির প্রতি একটি তাজা বোমা নিক্ষেপ করা হয়। বোমার আঘাতে তাহার গাড়ির হুটটি উড়িয়া যায়। কিন্তু খোদার অসীম অনুগ্রহে আশ্চর্যজনকভাবে তাঁহার জীবন রক্ষা পায়। তাঁহার জীবনের ওপর এই ধরনের আক্রমণের পরেও তিনি এক মুহূর্তের জন্য থমকাইয়া দাঁড়ান নাই কিংবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই।

শুধু কলিকাতাতেই নয়, তিনি দিল্লি, পাতিয়ালা, নাভা, কর্পুরতলা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে গান্ধীজীর সহিত গমন করেন। উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি যে আট-দফা কর্মসূচি রচনা করেন, তৎকালীন উত্তেজনার মুহূর্তে তাহা গৃহীত না হইলেও ১৯৫০ সালে নেহেরু-লিয়াকত প্যাক্টে তাহার অনেকগুলিই স্থান পায়। তফাৎ, এই বিলম্বিত ব্যবস্থা বাঞ্ছিত ফললাভে সক্ষম হয় না। তিনি যখন ভারতীয় মুসলমানদের, বিশেষত কলিকাতার মুসলমানদের জান-মাল রক্ষার পবিত্র ব্রত নিয়া ব্যস্ত ছিলেন, তখন কায়েদে আজম বা মরহুম লিয়াকত আলী খান তাঁহাকে পাকিস্তানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি বিনয়ের সহিত সব কিছু প্রত্যাখ্যান করেন।

ইহাতে তাঁহার সম্পর্কে পাকিস্তানের শাসক মহল ভুল ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস পায়। কিন্তু তাঁহার মনোভাব ছিলো অতি পরিষ্কার। সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধানের প্রচেষ্টাকেই তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং মহৎ বলিয়া গণ্য করিতেন। তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য মন্ত্রিত্ব বা অন্য কোনো পদের পরোয়া করিতেন না। তা ছাড়াও গান্ধীজীর সহিত শান্তি-মিশন পরিচালনায় সিদ্ধান্ত যখন গৃহীত হয়, তখন তিনি গান্ধীজীর অনুরোধে এই ওয়াদা প্রদান করিয়াছিলেন যে, শান্তি-মিশন সম্পূর্ণভাবে সাফল্য অর্জন না করা পর্যন্ত তিনি অন্য কোথাও গমন করিবেন না বা অপর কোনো দায়িত্বও গ্রহণ করিবেন না। শান্তি মিশনে কোনো আমোদ-ফুর্তি কিংবা নেতৃত্বের প্রশ্ন ছিলো না। দিল্লির বিড়লা হাউসে অবস্থানকালে শহীদ সাহেবের জীবননাশের যে প্রচেষ্টা চলিয়াছিলো, গান্ধী হত্যাকারী গডসের মামলায় তা প্রকাশ পায়। এদের ধারণা ছিলো যে, শহীদ সাহেবই গান্ধীজীর ওপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাকে হিন্দু স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত করাইয়াছেন। অতএব শহীদ সাহেবকে হত্যা করাই ছিলো তাহাদের প্রধান লক্ষ্য।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও গান্ধীজীর নিকট প্রদত্ত ওয়াদা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। গান্ধীজী জীবিত থাকা পর্যন্ত তিনি শান্তি-মিশনের কাজ করিয়াই গিয়াছেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তিনি পাকিস্তানে গমন করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পাকিস্তানের শাসনকর্তারা শহীদ সাহেবের গণ-পরিষদের আসনটি পর্যন্ত কাড়িয়া নিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, পাকিস্তানে

www.pathagar.com

আগমনের পর তাঁহার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার জন্য গোটা শাসনযন্ত্র এবং দেশের সংবাদপত্রকে তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। তাঁকে ভারতের দালাল, পাকিস্তানের দুশমন প্রমাণিত করিবার জন্য শাসক শ্রেণীর উদ্যমের অভাব ছিলো না। তিনি নীরবে সবকিছু সহ্য করিয়াছেন এবং হাজার প্রতিবন্ধকতার মুখেও বিরোধী দল গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, পাকিস্তানকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে সেইখানে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল গঠন অপরিহার্য। তাঁহার বিরুদ্ধে 'যুক্ত বাংলার' অভিযোগ আনয়ন হইতে শুরু করিয়া পূর্ব পাকিস্তানে সভা-সমিতি এবং সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করিলেও তাঁহার বক্তৃতা-বিবৃতিতে কোথাও ব্যক্তি-বিদ্বেষ বা গালাগালি অথবা অপরের দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এত অপপ্রচার সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি মানুষের আস্থা কখনও শিথিল করা সম্ভব হয় নাই, ইহাই ছিলো তাঁহার প্রধান সান্ত্বনা।

প্রসঙ্গত যারা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হইয়া গেলে কলিকাতার গুরুত্ব কমিয়া যাইবে, কলিকাতা একপ্রকার জনমানবশূন্য হইয়া যাইবে তাহাদের আজ কলিকাতা গিয়া দেখা উচিত, কলিকাতার জনসংখ্যা আজ কি পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে (প্রায় এক কোটি)। কলিকাতা আজ ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। ভারত সরকারের আয়কর বিভাগের আয়ের অর্ধেক না হইলেও প্রায় কাছাকাছি জোগায় বৃহত্তর কলিকাতা। পাকিস্তানের রাজনীতিতে গোড়া হইতেই যে দূরদর্শিতার অভাব এবং সুযোগসন্ধানী নীতি লক্ষ্য করা গিয়াছে তাহারই পরিণতি হিসাবে পাকিস্তান বহুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কলিকাতা বাবদ ক্ষতিপূরণও আদায় করা সম্ভব হয় নাই। সুবিধাবাদী রাজনীতির সেই জের অধিকতর কদর্য আকারে প্রতিভাত হইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানের পার্লামেন্টারি নেতা নির্বাচনের প্রশ্নেও একই পরিস্থিতি দেখা দিয়াছিলো। পরিষদ সদস্যদের ভোটে নেতা নির্বাচিত হইবেন, তাঁহারা দায়িত্বশীল লোক। অতএব নেতা নির্বাচনের প্রশ্নে তাঁহাদেরকে টানাটানি করিবার, এমনকি ক্যানভাস করিবার প্রয়োজনীয়তাও শহীদ সাহেব বোধ করিতেন না। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগে একদল পরিষদ সদস্য মন্ত্রিত্ব, পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি এবং বিভিন্ন পদ নিয়া দর কষাকষি শুরু করেন। ষোল সদস্যবিশিষ্ট সিলেট গ্রুপ এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা তৎপর ছিলেন। তাহারা অন্তত দুইটি মন্ত্রিত্ব, স্পীকারশীপ এবং কয়েকটি পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির পদ দাবি করিলেন। শহীদ সাহেব স্পষ্ট 'না' জবাব দিলেন। তিনি বলিলেন, আমি কাহাকেও এই প্রকার ওয়াদা দিতে পারিবো না। তবে এটুকু বলিতে পারি যে, সিলেট যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হইতেছে, মন্ত্রিসভায় তাহাদের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে। ইহার অধিক আর কিছু তিনি বলিতে সম্মত হইলেন না। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া মরহুম মোহাম্মদ আলী, খাজা নসরুল্লাহ এবং ডাক্তার মালেক শহীদ সাহেবকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন যে, অন্তত তাঁহারা যে সব পদে অধিষ্ঠিত আছেন—এই পদগুলি সংশ্লিষ্ট সদস্যদের প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়া নেতা নির্বাচনে জয়ী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু শহীদ সাহেব ইহাতেও অসম্মত হইলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে, পাকিস্তান একটি নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র হইতে চলিয়াছে, সেখানে শুরুতেই এই ধরনের পদ বিতরণের প্রতিশ্রুতি দিয়া ক্ষমতার রাজনীতি শুরু করা হইলে দেশে সৎ

www.pathagar.com

রাজনীতির মূলেই কুঠারাঘাত করা হইবে। তাই নেতা নির্বাচনের পূর্বদিন রাত্রে হোটেল বিল্টমোর হইতে সিলেটের পরিষদ সদস্যদের অন্যত্র স্থানান্তরিত হইতে দেখা গেল এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারাই নেতা নির্বাচন পর্বের মোড় ঘুরাইয়া দিলেন। পরাজিত হইবার পরে শহীদ সাহেবকে এক মুহূর্তের জন্য বিমর্ষ হইতে দেখি নাই। কিন্তু আজ দৃঢ়ভাবে বলা চলে যে, শহীদ সাহেব যদি তখন পূর্ব পাকিস্তানে পার্লামেন্টারি নেতা নির্বাচিত হইতেন তাহা হইলে দেশের সমাজ ব্যবস্থার কতদূর কি হইত জানি না। তবে পাকিস্তানে গণতন্ত্র বিকাশের বিশেষ সম্ভাবনা ছিলো। কারণ, তিনি শুধু মুখেই গণতন্ত্রের কথা বলেন নাই, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে কার্যক্ষেত্রেও তাহা পরিণত করিয়াছেন। ১৯৪৬ সালের মে মাসে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া তিনি বিনাবিচারে আটক সকল রাজবন্দীর মুক্তি প্রদান করেন। এমনকি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরও মুক্তি দেন।

পার্লামেন্টে নিজের ক্ষুদ্র দল লইয়া কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায়ও যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী হইলেন তখনও তিনি এই নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দলের ক্ষমতাসীন হইবার পরে বিনাবিচারে আটক সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা পর্যন্ত কাহাকেও নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয় নাই। এশিয়া-আফ্রিকার আর কোনো দেশে ইহার নজির নাই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতেই যদি এই নীতি পূর্ব পাকিস্তানে অনুসরণ করা হইতো তবে পশ্চিম পাকিস্তানেও শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতো এবং গোটা রাজনীতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়া সুষ্ঠুরূপ পরিগ্রহ করিত, এইরূপ ধারণা পোষণ করা কল্পনাবিলাস নহে।

রসিদ আলী দিবস

১৯৪৫ সালের জুন মাস। বাংলা দেশে ৯৩ ধারার গভর্নর শাসন চলিতেছে। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু কর্তৃক গঠিত আইএনএ বাহিনীর বিচার শেষ হইয়াছে। ক্যাপ্টেন রসিদ আলীকে সাত বৎসরের কারাদণ্ড প্রদান করা হইয়াছে। ইহার প্রতিবাদে কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড, ব্লক, এমনকি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পরিচালিত হিন্দু মহাসভা পর্যন্ত আন্দোলন শুরু করিয়াছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জনসভা অনুষ্ঠানের পর বিরাট গণমিছিলো বাহির করা হইয়াছে। এস্প্ল্যানেড ও ধর্মতলার মোড়ে পুলিশ মিছিল আটক করিয়াছে। এসপ্ল্যানেড ও ডালহৌসী স্কোয়ার সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করিয়া ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। মিছিলকারীরা সংরক্ষিত অঞ্চলে গমন করিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু পুলিশ বাহিনীর সম্মুখে তাহারা আগাইতে পারিতেছে না। ইট-পাটকেল ছোড়াছুড়ি চলিতেছে। মিছিলকারীরা ছত্রভঙ্গ না হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে।—এই খবর মুসলিম লীগ মহলে পৌছিলো।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আইএনএ'র অভিযুক্তদের মধ্যে একমাত্র রসিদ আলী মুসলিম লীগের নিকট তাঁহার পক্ষ সমর্থনের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন; মেজর শাহনওয়াজসহ অন্য আইএনএ বন্দীরা কংগ্রেসকে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের অনুরোধ জানান। স্পেশাল কোর্টে মুসলিম লীগ রসিদ আলী পক্ষ সমর্থন করে বটে; কিন্তু তাঁহাকে শাস্তি প্রদানের পর তাঁহার মুক্তির আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই। এই কারণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগও নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু ইত্যবসরে কংগ্রেস এবং অন্যান্য দল কলিকাতায় আইএনএ দিবস ঘোষণা করে। যাই হউক, ধর্মতলায় মিছিলের খবর পাইয়া

www.pathagar.com

লীগ মহল সক্রিয় হইয়া ওঠে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে লীগ নেতৃবৃন্দ তিন নম্বর ওয়েলেসলি ফার্স্ট লেনে অফিসের ছাদে পরামর্শ সভায় মিলিত হন। জনাব সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম সাহেব মিছিলে যোগদানের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা যুক্তি দেখান যে, এই আন্দোলনে মুসলিম লীগেরই উদ্যোগী হওয়া উচিত ছিলো। কারণ, রসিদ আলী মুসলিম লীগ হাইকমান্ডের নিকট তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য অনুরোধ জানান। তাঁহারা আরও যুক্তি দেখান যে, এই আন্দোলনে লীগ যোগদান না করিলে পাকিস্তান ইস্যুর ওপর যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে তাহাতে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হইবে।

কিন্তু মুসলিম লীগের উপস্থিত অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া মিছিল পরিচালনায় রাজি হইলেন না। অতঃপর জনাব সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম সাহেব সদলবলে এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন। এই প্রথমবার মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মিলিতভাবে মিছিল পরিচালনায় আগাইয়া আসিলেন।

এই খবর প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা মহানগরীতে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইলো। মিছিলের পুরোভাগে রহিয়াছেন শহীদ সাহেব, হাশিম সাহেব, শরৎ চন্দ্র বসু, সৌরেন্দ্রমোহন বসু, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। কার সাধ্য এই মিলিত শক্তিকে তখন বাধা দেয়? দেখিতে দেখিতে অগণিত মানুষের মিছিল 'সংরক্ষিত এলাকা' অতিক্রম করিয়া চলিল। মহানগরীর এখানে-ওখানে 'সাদা-চামড়া'র ওপর আক্রমণ শুরু হইলো। পুলিশ শান্তি রক্ষার জন্য শহীদ সাহেবের শরণাপন্ন হইলো। তিনি লালবাজার কন্ট্রোল রুমে গমন করিয়া প্রকৃত অবস্থা জানিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার লালবাজার গমন উপলক্ষ করিয়া গুজব ছড়াইয়া পড়িলো যে, শহীদ সাহেবকে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

এই খবর ছড়াইয়া পড়িতেই কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত পার্ক সার্কাস, কলুটোলা, জাকারিয়া ষ্ট্রীট, রাজাবাজার, চাঁদনী চক, এমনকি খিদিরপুর পর্যন্ত পুলিশ এবং শ্বেতকায় নারী-পুরুষের ওপর আক্রমণ চলিল, শহরের বহু স্থানে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হইলো। শহীদ সাহেবের নিকট এই খবর পৌঁছিতেই তিনি একখানি জীপযোগে মাইক নিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। শহীদ সাহেবকে সশরীরে সম্মুখে দেখিবার পরেই বিভিন্ন অঞ্চলে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল এবং আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যেও বৃটিশ বিরোধী মনোভাব গড়িয়া ওঠে। তাহারা প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। তারপর বোম্বাইতে নৌ-বিদ্রোহ বৃটিশ শাসকদের চূড়ান্তভাবে ঘাবড়াইয়া তুলিলো। রাজনৈতিক পর্যালোচকদের ধারণা যে, ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টের কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পিছনে এক বিশেষ শক্তির হাত ছিলো। এই সময় কলিকাতার মুসলমানদের কিংবা মুসলিম নেতৃবৃন্দের আদৌ দাঙ্গা বাধাইবার যে কোনো অভিপ্রায় ছিলো না তার প্রমাণ উক্ত দিবসে শিশু-সন্তান নিয়া মুসলমানেরা দলে দলে ময়দানে প্রতিবাদ সভায় যোগদান করিয়াছিলো। দাঙ্গা বাধাইবারই যদি তাদের পরিকল্পনা থাকিতো তাহা হইলে ঘরে পরিবার-পরিজনকে সম্পূর্ণ নিঃসহায় রাখিয়া তাহরা মাঠে গমন করিত না।

দাঙ্গা চলাকালে শহীদ সাহেব এবং মুসলিম লীগের ওপর যতই অপবাদ দেওয়া হউক না কেন, দাঙ্গা কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে, ১৬ই আগস্ট দাঙ্গার শুরু হইতেই শহীদ সাহেব পুলিশ হেডকোয়ার্টার লালবাজার গমন করিয়া পরিস্থিতির ভয়াবহতা জ্ঞাত হইবার

www.pathagar.com

পরক্ষণেই সামরিক বাহিনী তলব করেন। কলিকাতায় তখন সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা ছিলো মাত্র বারো শতের মতো এবং কলিকাতা মহানগরীর জনসংখ্যা ছিলো ৬০ লক্ষেরও ওপর। তাই বারো শত সশস্ত্র পুলিশ ব্যাপক দাঙ্গার ক্ষেত্রে যে আদৌ কোনো কাজে আসিতে পারে না তাহা উপলব্ধি করিয়াই তিনি সামরিক বাহিনী তলব করার জন্য বৃটিশ গভর্নরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি সামরিক বাহিনী তলবের অধিকার ছিলো না। কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষ দাঙ্গার তিনদিন পরে সামরিক বাহিনী নিয়োগ করেন।

দাঙ্গা কমিশনের সম্মুখে হেডকোয়ার্টারের ভারপ্রাপ্ত তদানীন্তন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার মিস্টার নর্টন জোনস্ যে সাক্ষ্য প্রদান করেন তাহাতে তিনি স্বীকার করেন যে, দাঙ্গার প্রথমদিনেই প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সামরিক বাহিনী তলব দিবার পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তিন দিন ব্যাপক দাঙ্গার ফলে হিন্দু-মুসলিম তিক্ততা চরমে পৌঁছে; ইংরেজদের তৎকালীন মুখপত্র 'স্টেটসম্যান' 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' শিরোনামায় সম্পাদকীয় ফাঁদিয়া হিন্দু-মুসলিম বিরোধ তীব্রতর করিয়া তোলে। রসিদ আলী দিবসে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এবং বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব ধূলিসাৎ হইলে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষে রূপান্তরিত হইলো।

শহীদ সাহেব নিজের সাফল্য কিংবা কার্যক্রম সম্পর্কে নিজে কখনও গর্বোক্তি করিতেন না। বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইবার মাত্র তিন মাসের মধ্যে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হইলো। তিনি দেখিলেন যে, কলিকাতার বারোশত সশস্ত্র পুলিশের মধ্যে মাত্র ৬৩ জন মুসলমান এবং কলিকাতার একজন ডিসি এবং একটি থানায় মুসলমান অফিসার-ইন-চার্জ ছাড়া বাকি সকলে অমুসলমান।

সাম্প্রয়িকতা তখন দেশে এমনি ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, সরকারি কর্মচারিরাও আর সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে নাই। এই অবস্থায় সোহরাওয়ার্দী পাঞ্জাব হইতে বারো শত ট্রেনিংপ্রাপ্ত সিপাহী সশস্ত্রবাহিনীতে নিয়োগ করিয়া সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। বিরোধী দলীয় লোকেরা উহাতে বাধা প্রদান করিলেন এবং গভর্নরের নিকট পর্যন্ত প্রতিবাদ জানাইলেন। গভর্নর প্রথমত এই পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখিবার অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু শহীদ সাহেব ইহাতে সম্মত না হওয়ায় গভর্নর পাঞ্জাবীর পরিবর্তে বাঙালি সিপাহী নিয়োগের পরামর্শ দিলেন। তার উত্তরে শহীদ সাহেব বলিলেন যে, ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক বাঙালির মধ্যে পাওয়া যাইবে না। অথচ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য তাঁহার এক্ষণেই প্রয়োজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকের। তারপরও তিনি বলিলেন যে, কলিকাতার সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে বাঙালি হিন্দুও নাই; রহিয়াছে গুর্খা, রাজপুত, শিখ এবং জাঠ। তাদের বরখাস্ত করিয়া সমসংখ্যক বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান নিয়োগের ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হইলে তিনি তাহাতে সম্মত আছেন। কিন্তু ইংরেজ গভর্নর তাহাতে রাজি হইলেন না এবং পাঞ্জাবী ট্রেনিংপ্রাপ্ত সিপাহী নিযুক্ত না করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। এই ইস্যুর ওপর পদত্যাগ করিবার দৃঢ়তা প্রকাশ করিবার পরই গভর্নর বারোজ প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিলেন। অতঃপর তিনি কলিকাতার বাইশটি থানার একুশটিতে মুসলমান অফিসার-ইন-চার্জ নিযুক্ত করিলেন এবং কন্ট্রোলরুমের

www.pathagar.com

চার্জে একজন মুসলমান ডিসি নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আয়ত্তে আসিল এবং পরিস্থিতি শান্ত হইলো। মুসলিম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এই ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বলা সম্পূর্ণ ঠিক হইবে না। কলিকাতার মুসলমানরা সংখ্যালঘু—এই কারণেই সংখ্যালঘু অধিবাসীর নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থে এবং যুক্তিতে তিনি উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মুসলিম লীগ কর্মী এবং নেতাদের অনেকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও নোয়াখালীতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে সোহরাওয়ার্দী গান্ধীজীকে নোয়াখালী সফর এবং তথায় অবস্থানের অনুমতি প্রদান এবং সকল প্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি এক শ্রেণীর অদূরদর্শী মুসলিম লীগারের নিকট যথেষ্ট অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেদিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

নোয়াখালীতে হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিলো। তাই যে ব্যবস্থায় তারা নিরাপদ বোধ করে তাহা গ্রহণ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। কলিকাতার দাঙ্গাকালে সোহরাওয়ার্দী কিভাবে বারে বারে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াছেন তাহাও সকলের জানা আছে। দেশবিভাগের পরেও তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়িয়া তুলিবার, বিশেষত উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়াও এবং কোনো কোনো মহলে ভুল ধারণার সৃষ্টি ও তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের বিপর্যয় ঘটিতে পারে জানিয়াও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যেখানে আজ ভারতের সহিত যৌথ দেশরক্ষা ব্যবস্থা গড়িবার কেহ প্রস্তাব দিলেও 'অপরাধ' বলিয়া গণ্য হয় না, সেখানে উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধানের সুপারিশ করিয়া সেদিন তিনি পাকিস্তানের একশ্রেণীর সুবিধাবাদী রাজনীতিকের নিকট হইতে 'ভারতের এজেন্ট', 'ভারতের কুকুর' এবং 'যুক্তবাংলার ষড়যন্ত্রকারী' বলিয়া কত অপবাদ কুড়াইয়াছেন। কিন্তু এই ধরনের কুৎসা রটনা বা গালাগালিতেও তিনি কোনোদিন তাঁহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই এবং ধৈর্য হারাইয়া আক্রমণকারীকে অশোভন ভাষায় প্রতি আক্রমণ করেন নাই।

রাজনৈতিক জীবনে আগাগোড়া সোহরাওয়ার্দী এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। কলিকাতার দাঙ্গা উপলক্ষ করিয়া বিরোধীদলীয় হিন্দু সদস্যরা এবং সংবাদপত্রগুলি যখন তাঁহার প্রতি চরম আক্রমণ চালান, তখনও তিনি যুক্তি এবং তথ্য দ্বারা তাঁহাদের অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছেন, প্রতি-আক্রমণ দ্বারা নহে।

মরহুম লিয়াকত আলী খান ১৯৫০ সালের ১৪ই আগস্ট বেতার ভাষণে তাঁহাকে তীব্র ও অশোভন ভাষায় আক্রমণ করিলেও তিনি যে সংযম এবং বিনয়ের সহিত তাহার জবাব প্রদান করিয়াছিলেন, দেশবাসীর আজও তা স্মরণ আছে। প্রতিপক্ষ তাঁহার সম্পর্কে যতই প্রচার করুক না কেন, তাঁহার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি মানুষের অন্তরে যে গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তা ব্যাপকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি জীবনে অসংখ্য বক্তৃতা বিবৃতি দিয়াছেন, কিন্তু কখনও ভাবালুতার দ্বারা প্রভাবিত হন নাই, কিংবা তিনি যাহা করিতে পারিবেন না, এইরূপ ওয়াদাও কখনও করেন নাই। আজ তাঁহার সম্পূর্ণ বিবৃতি-বক্তৃতা ঘাঁটিয়াও কেহই দেখাইতে পারিবেন না যে, তিনি বিরোধীদলে থাকাকালে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার খেলাফ করিয়াছেন।

www.pathagar.com

রাষ্ট্র চালনার অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক নীতিজ্ঞান থাকার দরুনই তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা করিলেও আবোল-তাবোল কথা কিংবা অবাস্তব প্রতিশ্রুতি কখনও দেন নাই। এই ব্যাপারে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষা গ্রহণের যথেষ্ট উপাদান রহিয়াছে।

রাজনীতিতে 'রুল অব গেইম' পালন করা না হইলে এবং সহনশীলতার মনোভাব না থাকিলে গণতন্ত্র বিকশিত হইতে এবং শিকড় গাড়িতে পারে না। ইহাই ছিলো শহীদ সাহেবের রাজনৈতিক দর্শন এবং ইহাই গণতন্ত্রের মূলকথা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার অর্থ জনগণের তরফ হইতে রাষ্ট্র চালনার ম্যানেজারি করা। যে পর্যন্ত জনগণের কল্যাণ বিধান করা যায় এবং যে পর্যন্ত জনসমর্থন থাকে সেই পর্যন্ত ব্যক্তি বা দলবিশেষের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবার অধিকার রহিয়াছে। ইহা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন। জনগণ যদি ভুল করিয়াও কোনো ব্যক্তি বা দলবিশেষের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে তাহা হইলে ক্ষমতা হইতে সরিয়া দাঁড়ানোই একমাত্র পথ।

পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইবার পরে শহীদ সাহেব দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের যতগুলি উপনির্বাচন অবশিষ্ট ছিলো সেইগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু যে প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতান্ত্রিক শক্তি ইতিপূর্বে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলো, তাঁদের কারসাজিতে দেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হইলো না, বরং তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রিত্ব হইতে বিদায় নিতে হইলো। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন এবং গণভোট কিংবা সাধারণ নির্বাচনের মারফতে দেশবাসীর মতামত যাচাই করাই ছিলো তাঁহার প্রধান দাবি ও লক্ষ্য।

জেল হইতে বাহির হইবার পরে সোহ্‌রাওয়ার্দী ঢাকার পল্টন ময়দানে এক অভূতপূর্ব জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন আজও সেইগুলি কানে বাজে। তিনি বলিয়াছিলেন, জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য যাহাদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে, তাহাদের হাতে পুলিশ আছে, সরকারি শাসনযন্ত্র আছে, অনুগ্রহ বিতরণের সুযোগ-সুবিধা আছে, আরও আছে অর্থ। পক্ষান্তরে, আমাদের অর্থও নাই, কাউকে কিছু দিবারও নাই।

জনতাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু আপনাদের নিকট একটি অস্ত্র আছে—সেটি হইলো ঐক্য। আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকিলে দুনিয়ার কোনো শক্তি আপনাদের দাবি না মানিয়া পারিবে না। অবশ্য এই ঐক্য নিষ্ক্রিয়তার ঐক্য নয়; কাজের জন্য ঐক্য চাই।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার দৃষ্টিতে মরহুম সোহরাওয়ার্দী

আবুল হাশিম

মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ১৯৩৭ সাল থেকে। ১৯৪৩ হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে তাঁর সহকর্মী হিসেবে মুসলিম লীগ সংগঠন ও পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এসময়ে তাঁর সাথে আমার অহর্নিশ মেলামেশার সুযোগ হয়। উত্তরকালে যদিও কোনো কোনো রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে আমরা একমত হতে পারিনি, তবু আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিলো। আমি নিজে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর প্রকাশ্য সমালোচনা করেছি; কিন্তু অন্য কেউ তাঁর সমালোচনা করলে তা বরাবরই আমার কাছে দুঃসহনীয় মনে হতো। আমাকে স্বীকার করতেই হয় যে, এ ব্যাপারে আমার চেয়ে তাঁর সংযম ছিলো অনেক বেশি। তিনি নিজে কোনোদিন আমার বিরুদ্ধে কোনোরূপ কটূক্তি করতেন না এবং আমার সম্পর্কে অন্যের কোনোরূপ কটূক্তি বরদাশ্‌ত্‌ও করতেন না।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর যেসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল এবং তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ ও তাঁর সাফল্যের মৌল কারণ বলে মনে করি, তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করবোঃ

অর্থের প্রয়োজন সকলের জীবনেই রয়েছে—তাঁরও ছিলো। কিন্তু অর্থের মোহ তাঁর ছিলো না। তাঁর অর্থের প্রয়োজন হতো ব্যয়ের জন্যে—সঞ্চয়ের জন্যে নয়। জীবনের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের ঔৎসুক্য আমি কোনোদিনই তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করিনি। টাকা-পয়সা ব্যাংকে রাখার কোনো প্রবণতাই তাঁর মধ্যে ছিলো না। আমি দেখেছি, তাঁর টাকা-পয়সা থাকতো হয় বালিশ বা বিছানার নিচে; না হয় কাপড় বা বইয়ের আলমারিতে। এই কারণেই আমরা দেখেছি তাঁর মৃত্যু শূন্যহস্ত শরিফ ফকিরের মতো এবং সমাধিস্থ হলেন সম্রাটের মতো।

এ সম্পর্কিত একটি কাহিনীঃ

তখন শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার আমল। মরহুম সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিত্ব করেন না—ওকালতি করেন। একদিন তাঁর এক মক্কেল তাঁকে একটি ফৌজদারি মোকদ্দমা পরিচালনার ভার দেয় এবং তাঁর ফি বাবদ নগদ পাঁচ হাজার টাকা তাঁর টেবিলের ওপর রেখে চলে যায়। পূর্বাহ্নে তাঁর এক কন্যাদায়গ্রস্ত দূর সম্পর্কের আত্মীয় কন্যার বিবাহের জন্যে তাঁর কাছে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান এবং সেখানে বসেই বারবার নানাভাবে তিনি মরহুম সোহরাওয়ার্দীকে তাঁর প্রার্থনা জানান। কিন্তু দেখা গেল, জনাব সোহরাওয়ার্দী সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বিকার। এ ব্যাপারে প্রার্থীর সাথে তিনি কোনো বাক্যালাপও করলেন না। যখন অন্যরা সব বিদায় নিলেন, তখন জনাব সোহরাওয়ার্দী তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ 'আপনি এখানে বসে আমাকে অনর্থক বিরক্ত করছেন কেন?' টেবিলের ওপর রাখা পাঁচ

www.pathagar.com

হাজার টাকা দেখিয়ে বললেনঃ 'দেখতে পাচ্ছেন না যে আপনার ভাগ্যে লেখা পাঁচ হাজার টাকা ওখানেই জমা আছে—দয়া করে তুলে নিয়ে ঝটপট সরে পড়ুন। আমাকে কাজ করতে দিন।' বাস্তবত ঘটলোও তাই। ভদ্রলোক টাকা পাঁচ হাজার তুলে নিয়ে বিদায় নিলেন। এ ধরনের ছোটখাটো ঘটনা আমি দিনরাতই দেখেছি।

মরহুম সোহরাওয়ার্দীর চরিত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মৃত্যুভয় বলে কোনো বস্তু তাঁর মনে ছিলো না। এর প্রথম পরিচয় আমি পাই কোলকাতার মহাম্মদ আলী পার্কে ১৯৪৪ সালে নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনের সভামঞ্চে। তখন বোমাবর্ষণের যুগ। হঠাৎ সাইরেনধ্বনি শোনা গেল। মাথার ওপরে ক্ষিপ্রগতি বোমারু বিমানের আবির্ভাব দেখা গেল। প্রাণভয়ে সকলেই এয়ার শেল্টারে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু দেখা গেল, একমাত্র জনাব সোহরাওয়ার্দীই সেই বিরাট মঞ্চের ওপর একাকী বসে নির্ভয়ে কাজ করে চলেছেন।

১৯৪৫ সালে গোপালগঞ্জে দেখেছিলাম, মুসলিম লীগের এক জনসভায় দুইটি বিবদমান শিবিরের মধ্যে ঢাল-সড়কি, রামদা ইত্যাদিসহ লড়াই চলছে। জনাব সোহরাওয়ার্দী ধীর পদক্ষেপে মঞ্চ থেকে নেমে যুধ্যমান জনতার মধ্যে গিয়ে হাজির হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই উন্মত্ত জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শান্ত ও সুশৃংখল হলো। ১৯৪৬ সালে কোলকাতার রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বারবার নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তিনি মানবতার যে সেবা করেছেন তা সকলেরই জানা আছে। নিজের গাড়ি চালকের জীবন যাতে বিপন্ন না হয়, সেজন্য তিনি নিজেই দিনে-রাতে গাড়ি চালিয়ে কিভাবে সারা কোলকাতায় টহল দিয়েছেন, তা-ও কারো অবিদিত নয়।

মরহুম সোহরাওয়ার্দীর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁর শিশুসুলভ আচরণ। পাঁচ-ছয় বছরের সরল শিশুরা যেমন দুষ্টুমিপ্রিয়, তিনিও তেমনি দুষ্টুমিপ্রিয় ছিলেন। অনেক সময় দেখা গেছে, বহু লোক গুরুতর আলোচনার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে উপস্থিত অথচ তিনি শিশুর মতো বিড়াল, কুকুর বা তোতাপাখির সাথে লাফালাফি করে খেলায় ব্যস্ত। এমনও দেখেছি, তাঁর কাছে তাঁর খুবই পরিচিত এক ব্যক্তি হাজির হলে এমন অঙ্গ-ভঙিতে তিনি তাকিয়েছেন যে, কোনোদিন তার সাথে কেনো পরিচয়ই যেন তাঁর ছিলো না; এবং তাকে তিনি এমন সব প্রশ্ন শুরু করেছেন, যেরূপ প্রশ্ন দুষ্টু বালক ছাড়া কেউ করতে পারতো না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এক সকালে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র—যাকে তিনি আশৈশব বিলক্ষণ চিনতেন—তাঁর সাথে দেখা করতে গেছে ঢাকার রমনা রেষ্ট হাউসে। মরহুম সোহরাওয়ার্দী তখন বসেছিলেন খাবার কামরায়। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন আছো, তোমার আব্বা-আম্মা কেমন আছেন ইত্যাদি। এরপর খাবার কামরা থেকে তিনি গেলেন শয়ন কক্ষে। আমার পুত্রও তাঁর পেছনে পেছনে গেল। এমন সময়ে তিনি তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তুমি কে? কি চাও?'

আমার পুত্র জওয়াব দিলো, 'আমি জনাব আবুল হাশিমের পুত্র।'

তিনি পাল্টা পশ্ন করলেন,'কোন্ আবুল হাশিম?'

এরপর একদিন জনাব সোহরাওয়ার্দী আমার বাসায় উপস্থিত হলেন এবং দেখলাম, তাঁর হাতে তাঁর অষ্টপ্রহরের সাথী একটি ক্যামেরা। ক্যামেরাটি নিয়ে তিনি আমার ছেলেমেয়েদের এবং পোষা কুকুরটির সাথে লাফালাফি করে ছবি তোলা আরম্ভ করে দিলেন। তাঁর চরিত্রের এদিকটি আমার কাছে কখনো কখনো বিরক্তিকর হলেও খুবই ভালো লাগাতো।

www.pathagar.com

মরহুম সোহরাওয়ার্দীর সাথে আমার শেষ দেখা হয় করাচীতে, তাঁর বাসভবনে। সঙ্গে আমার স্ত্রীও ছিলেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী এক প্লেট মিষ্টান্ন এনে নিজের হাতে তুলে আমাকে খাওয়াতে লাগলেন এবং সেইসঙ্গে মাটিতে পা ঠুকে খুশিতে যেন নৃত্য করতে লাগলেন। এ সময়ে আমি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রধান সংগঠক।

তিনি আমাকে বললেন, 'কি মিয়া, তুমি তো আমার সাথে লড়াই শুরু করলে।'

আমি বললাম, 'হ্যা তা তো করলামই।' তিনি বললেন, 'লড়াই করো, কিন্তু আমার জন্যে দোয়া করো।'

আমি বললাম, 'আপনার জন্যে দোয়া আমি সব সময়েই করি—এখনো করছি।'

এ সাক্ষাতের পর তিনি গেলেন বৈরুত, আমি ফিরলাম ঢাকা। মনে আশা ছিলো, তিনি সুস্থ শরীরে বৈরুত থেকে ফিরবেন এবং আমার সাথে হবে তাঁর লড়াই। তখন আমি ভাবতেও পারিনি যে, বৈরুত থেকে ফিরে আসবেন তিনি নন, তাঁর মৃতদেহ আর আমাকে যেতে হবে বিমানবন্দরে তাঁর সে মৃতদেহকে সসম্মানে গ্রহণ করার অনুষ্ঠানে শরিক হবার জন্যে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যে মহান নেতা হারাইলাম

আবুল মনসুর আহমদ

জনাব সোহরাওয়ার্দীর আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে দেশের কতখানি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিতে দেশবাসীর বেশ সময় লাগিবে। সেই বিচারের মেয়াদ নির্ভর করে নেতৃত্বের বিরাটত্ব ও বিশেষত্বের অনুপাতের ওপর। শহীদ সাহেবের জানাজায় অভূতপূর্ব জন-সমাবেশ হইতে তাঁর জনপ্রিয়তা পরিমাপ করা চলে, কিন্তু এতে তাঁর নেতৃত্বের বিরাটত্ব ও মহানত্বের বিচার চলে না। সেই বিচার চলিবে জাতির জীবনে দিনের পর দিন। আমাদের জাতীয় জীবনে যেখানে যেখানে যখন যখন শহীদ-নেতৃত্বের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিব, যে সব সমস্যার সম্মুখীন হইয়া আমাদের শাসক ও নেতারা বলিতে বাধ্য হইবেনঃ 'আজ শহীদ-নেতৃত্বের দরকার ছিলো' শুধু সেইদিনই আমরা উপলব্ধি করিবো আমরা কি হারাইয়াছি। তাঁর ভক্তদের মধ্যে আমরা যারা স্বভাবতই আত্মীয়-বিয়োগের বেদনা অনুভব করিতেছি, তাহাদের অনেকেই শুধু মনকে তসল্লি দিবার আশায় বলিতেছিঃ শহীদ-জীবনের মিশন সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। কিন্তু এটা মনের ওপর চোখঠারা মাত্র। ইতিহাসে অবশ্যই এমন নজির অনেক আছে যেখানে জাতীয় নেতারা তাঁদের জীবনের মিশন পূর্ণ করিয়াই পরলোকগমন করিয়াছেন। এঁদের মিশনের চেয়ে কঠিন মিশন তাঁদের, যাঁরা তাঁদের মিশন অপূর্ণ রাখিয়াই পরলোক গমন করিয়াছেন। শহীদ সাহেব এই শ্রেণীর জাতীয় নেতা। জাতির জীবনে তাঁর নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিলো যখন সবচেয়ে বেশি, গোটা জাতি যে সময় পরম উৎকণ্ঠা ও আশায় তাঁর দিকে চাহিয়াছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি ইন্তিকাল করিয়াছেন।

জাতীয় নেতৃত্ব বহুমূল্য বস্তু। অনেক দামে এটা কিনিতে হয়। জীবনের আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি, অর্থ-বিত্ত, যশ-খ্যাতি, তারিফ-প্রশংসা সমস্তের বিনিময়ে জাতীয় নেতৃত্ব খরিদ করিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে সর্বস্ব খোয়াইয়াও কুলায় না, জীবন দিতে হয়। কেহ দেন তা আততায়ীর হাতে, কেহ দেন রোগের হাতে। গান্ধী-জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী-চিত্তরঞ্জন, লিংকন-কেনেডী, লিয়াকত-শহীদ সবাইকে এই দাম দিতে হইয়াছে। দৃশ্যত ভিন্ন হইলেও আসলে একই রকমে এ দাম পরিশোধ করা হইয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে শহীদের রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি হইয়াছিল। এটা ঐতিহাসিক এক্সিডেন্ট, না এতে অদৃষ্টের অদৃশ্য হাত আছে, আজই তা বলা কঠিন। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, উপরোক্ত সমস্ত নেতার মধ্যে চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বের সাথেই শহীদ নেতৃত্বের সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ মিল আছে। উভয় নেতৃত্বের তাৎপর্য এক। উভয়ের জীবন-মিশনের উচ্চতা ও মহানত্ব একই স্তরের।

চিত্তরঞ্জনের মিশন ছিলো ভারতের হিন্দু-মুসলিমের রাজনৈতিক ঐক্য। সে মিশন সফল হইলে ভারতবর্ষ ভাগ হইতো না। শহীদ-নেতৃত্বের মিশন ছিলো দুই পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঐক্য। দেশবন্ধুর অকাল আকস্মিক মৃত্যুতে ভারতবর্ষে যে দুর্ভাগ্য নামিয়া

www.pathagar.com

আসিয়াছিল, শহীদ সাহেবের অকাল আকস্মিক মৃত্যুতে পাকিস্তানের বরাতে সে দুর্ভাগ্য নামিয়া আসিবে কিনা, ভবিতব্যই তার বিচার করিবে।

দুই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বৈষম্য সম্পর্কে আমি যত গলাবাজি ও কলমবাজি করিয়াছি, তৎকালে আর কেহ তেমন করেন নাই। পক্ষান্তরে আমার নেতা শহীদ সাহেব এ সম্পর্কে যত কম কথা বলিয়াছেন, তেমন কম কথা আর কেহ বলেন নাই। এই হইতে এমন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক এবং হইয়াছেও অনেকের, যে শহীদ সাহেব নিখিল পাকিস্তানী মনোভাবের মধ্যে এমন ডুবিয়া থাকিতেন যে, বিশেষভাবে এবং এককভাবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের কথা আমাদের মতো তীব্রভাবে অনুভব করিতেন না। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। এটা যে ভুল, তা আমরা যেমন জানি, আর কেহ তেমন জানে না। তাঁর ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য ছিলো শুধু এইঃ আমরা গলাবাজি ও কলমবাজি করিতাম, তিনি নীরবে কাজ করিয়া যাইতেন। পূর্ব পাকিস্তানকে তিনি যেমন ঘনিষ্ঠভাবে চিনিতেন, আমরা ততটা চিনি নাই। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তিনি যেমন অন্তর দিয়া ভালোবাসিতেন, তেমন আমরা পারি নাই। পূর্ব-বাংলার অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজনের নিখুঁত খুঁটিনাটি তিনি যত জানিতেন, আমরা তার শতাংশের একাংশও জানি না। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে পূর্ব-বাংলার কৃষক ও পাটচাষীর সর্বনিম্ন ও ক্ষুদ্রতম প্রয়োজনের তালিকা ছিলো তাঁর নখাগ্রে। পূর্ব পাকিস্তানের যে কোনোও দাবির ব্যাপারে অনেকদিন চিন্তা-ভাবনা ও পড়াশোনা করিয়া নেতাকে সমঝাইবার উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে কথা বলিতে গিয়া আমি প্রতিবার লজ্জায় হটিয়া আসিয়াছি। দেখিয়া তাজ্জব হইয়াছি, ও সব কথাই তাঁর জানা আছে এবং অনেক বেশি গভীরভাবেই জানা আছে। তা সত্ত্বেও তিনি কোনো দিন নিজের জ্ঞানের বড়াই ও আমাদের অজ্ঞতার নিন্দা করেন নাই। তাঁর অল্পকালস্থায়ী শাসনামলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কি কি করিয়াছেন, তার বিচার করিবে ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাসের রায়ের অপেক্ষা না করিয়া আজই আমি জোরের সঙ্গে একথা বলিতে পারি যে, যা কিছু তিনি করিয়াছেন, গণভিত্তিক জাতীয় নেতার উপযুক্ত পন্থাতেই করিয়াছেন। এই ধরনের বহু কাজে তাঁর কুশাগ্রবুদ্ধি জাতীয় নেতৃত্ব বিজলী চমকের মতোই আমাদের চোখ ঝলসাইয়া দিয়াছে। এমন ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে। আমার প্রায়-সমাপ্ত অপ্রকাশিত 'আত্মজীবনী' হইতে এমনি একটা ঘটনার বিবরণের কয়েক পাতা এখানে উদ্ধৃত করিলাম ঃ

'মাত্র ১২জন আওয়ামী লীগ মেম্বর লইয়া লীডার প্রায় পঞ্চাশজনের কোয়েলিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। কোয়েলিশনের অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানী।

সুতরাং ইহাদের দয়ার ওপরই আমাদের মন্ত্রিসভা একান্তভাবে নির্ভরশীল। এঁদের প্রায় সকলেই অল্পদিন আগে পর্যন্ত মুসলিম লীগের ছিলেন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্যার প্ররোচনায় এঁরা মুসলিম লীগ ছাড়িয়া রিপাবলিকান পার্টি গঠন করিয়াছেন। স্পষ্টতই প্রেসিডেন্ট মির্যার প্রভাব এঁদের ওপর অসীম। ইস্কান্দর মির্যার কুনযরে পড়িলেই আমাদের মন্ত্রিত্ব খতম। তেমন দুর্ঘটনা যে কোনো সময়ে ঘটিতে পারে। সে সম্বন্ধে আমরা গোড়া হইতেই সচেতন ছিলাম। প্রধানত যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে যথাসম্ভব সত্বর সাধারণ নির্বাচন করাইবার উদ্দেশ্যেই লীডার মন্ত্রিত্ব গঠনের দায়িত্ব নিয়াছিলেন। আমি লীডারের সহিত একমত হইয়াও বলিয়াছিলাম যে, ঐভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করাইতে হইবে ঠিকই, কিন্তু কিছু কিছু কাজ না

www.pathagar.com

করিলে জনগণ আমাদেরে ভোট দিবে কেন? লীডারের নীরব সমর্থন লাভ করিয়া আমি কাল-বিলম্ব না করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প এলাকা সফর করিলাম। শিল্প-বৈষম্যের মোটামুটি একটা ধারণা হইলো।

শাসনতন্ত্র অনুসারে বিশেষ ধরনের কতিপয় শিল্প ছাড়া সব শিল্পই প্রাদেশিক বিষয়। কিন্তু শাসনতন্ত্র প্রয়োগের আট মাস পরেও সমস্ত শিল্প কার্যত আগের মতোই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই আছে। বাণিজ্য কেন্দ্রীয় বিষয়। কাজেই আমদানী-রফতানীর ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানীদের করাচীর দিকেই চাহিয়া থাকিতে হইতেছে।

সফর শেষ করিয়া লীডারের নীরব অনুমোদন ধরিয়া লইয়া ঘোষণা করিলামঃ অতঃপর আমাদের শিল্পায়ন পূর্ব পাকিস্তানমুখী হইবে। নয়া সব শিল্প পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত হইবে; পশ্চিম পাকিস্তানে আর কোনোও নয়া শিল্প স্থাপিত হইবে না।'

এরপর প্রথম সাক্ষাতেই লীডার আমাকে বলিলেনঃ এসব কি পাগলামি শুরু করিয়াছ তুমি?'

লীডারের সামনেই দু'চারজন পশ্চিম পাকিস্তানী মন্ত্রী ও অফিসার বসা ছিলেন। আমি ঈষৎ হাসিয়া জবাব দিলামঃ ইলেকশনের জন্য প্রস্তুত হইতেছি, স্যার। যেন মাটির নিচে হইতে সুড়ঙ্গ বাহিয়া একটা আওয়াজ হইলোঃ হুম্‌ম্‌। এই বিশাল আওয়াজকে আমার কাজে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিবাদ মনে করিয়া ওঁরা সবাই দৃশ্যতই খুশি হইলেন। আমি কিন্তু আমার নেতার মুখে কোনোও বিরক্তি আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। মুখে তিনি ও সম্বন্ধে কিছু বলিলেনও না আমাকে। অতএব আমি নির্ভয়ে নিজের কাজ করিয়া চলিলাম। শিল্প-দফতরের তৎকালীন সেক্রেটারি জনাব আব্বাস খলিলীর পরামর্শে, উৎসাহে ও সহযোগিতায় আমি শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে একটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সম্মিলনী ডাকিলাম আমাদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের দুই মাসের মধ্যে। কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্য দফতরের সেক্রেটারিদ্বয়সহ অন্য অফিসাররা, প্রাদেশিক শিল্প-বাণিজ্য দফতরের মন্ত্রীদ্বয়সহ অফিসাররা এই সম্মিলনীতে যোগ দিলেন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দফতরে এই সম্মিলনী বসিল! কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী হিসাবে আমিই এই সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করিলাম। পরম হৃদ্যতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার আন্তরিক আগ্রহের আবহাওয়ার মধ্যে সম্মিলনীর কাজ চলিলো। অনেক ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইল। অধিকার দেওয়া-নেওয়ায় অত্যাবশ্যক উদারতার দ্বার খুলিয়া গেল। শাসনতান্ত্রিক অনেক দুঃসাধ্য সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান বাহির হইয়া পড়িলো। সম্মিলনীতে যে কয়টি প্রস্তাব গৃহীত হইলো, তার মধ্যে এই কয়টা প্রধানঃ

(১) শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ শিল্প ছাড়া আর সব শিল্পের পূর্ণ ও একক কর্তৃত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেওয়া হইলো।

(২) আমদানী-রফতানীর ব্যাপারে করাচীস্থ চীফ কন্ট্রোলারের অফিসের কর্তৃত্বের অবসান করা হইলো। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য চাটগাঁও, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য লাহোরে এবং ফেডারেল অঞ্চলের জন্য করাচীতে তিনটি স্বাধীন ও অন্য-নিরপেক্ষ আমদানী-রফতানী কন্ট্রোলার-অফিস স্থাপিত হইলো।

(৩) পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন ও সরবরাহের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় সাপ্লাই এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের চাটগাঁ শাখা আপগ্রেড করিয়া একজন এডিশনাল ডাইরেক্টর

www.pathagar.com

জেনারেলের পরিচালনাধীনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজন মিটাইবার চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইলো।

(৪) ব্যবস্থা হইলো, বৈদেশিক মুদ্রার দুই প্রদেশের ও করাচীর অংশ পূর্বাহ্নে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে এবং চাটগাঁর কন্ট্রোলার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের, লাহোর কন্ট্রোলার পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের এবং করাচী কন্ট্রোলার কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দফতরের সহিত পরামর্শ করিয়া লাইসেন্স বিতরণ করিবেন।

এইসব সিদ্ধান্তের সব কয়টাই নীতি-নির্ধারক বিধায় এবং ওসবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার ও এলাকা সঙ্কুচিত হইতেছে বলিয়া নিয়মানুসারে ওতে ক্যাবিনেটের অনুমোদন দরকার। আমি সে অনুমোদন চাহিলাম। ক্যাবিনেটের বিশেষ বৈঠকে আমার প্রস্তাব পেশ করা হইলো। সে ক্যাবনেট মিটিং-এর কথা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের ক্যাবিনেট রুমে এই বৈঠক। মিটিং শুরু হইবার আগেই আমরা অনেকে হাজির হইয়াছি। পশ্চিম পাকিস্তানী সহকর্মীদের অনেককেই দেখিলাম গম্ভীর। সেদিনকার আলোচ্য লইয়া আমাকে কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, 'আপনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী না প্রাদেশিক মন্ত্রী তা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।' বুঝিলাম, ঝড় উঠিবার পূর্ব লক্ষণ। আমাকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। এঁদের সাথে একহাত লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

কিন্তু ক্যাবিনেট মিটিং-এ আমার ওপর হামলা হইলো সম্পূর্ণ আশঙ্কাতীত দিক হইতে। কেহ কিছু বলিবার আগে প্রধানমন্ত্রীই আমাকে হামলা করিলেন। বুঝিলাম, শত্রুপক্ষের সেনাপতিত্ব নিয়াছেন স্বয়ং আমার নেতা। এজন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলোম না। হামলাও কি যেমন তেমন? দক্ষ তীরন্দাজের ক্ষিপ্রতায় ও কৌশলে লীডার আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করিতে লাগিলেন। বড়ই বেকায়দায় পড়িলাম। তিন ঘণ্টাব্যাপী ক্যাবিনেট মিটিং তো নয়, দস্তুরমতো সেশন আদালত। আমি যেন আসামীর কাঠগড়ায়। চার্জ যেন নরহত্যা বা হত্যার চেষ্টা। সোহরাওয়ার্দীর মতো কুশাগ্র-বুদ্ধি সুদক্ষ ব্যারিস্টার মার্কিন বা ফরাসী আইন মোতাবেক আসামীকে জেরা করিতেছেন। সে জেরায় আমার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা, শাসনতান্ত্রিক বাধানিষেধ, পাকিস্তানের অখণ্ডতা, শক্তিশালী ঐকিক কেন্দ্র বনাম ফেডারেল কেন্দ্রের তুলনামূলক গুণাগুণ, কিছুই বাদ গেল না। এমনকি আমার অখণ্ড পাকিস্তানী দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ পর্যন্ত হইয়া গেল। আমি সাধ্যমত সব কথার জবাব দিতে লাগিলাম। কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর জেরার সামনে সম্বিৎ রাখা চলে কতক্ষণ? আমার জিভ ও গলা শুকাইয়া আসিতে লাগিল। প্রথমে অপমানে, তার পরে অভিমানে, আরও পরে রাগে আমি ফুলিতে লাগিলাম। কিন্তু তবু লীডারের দয়া হইলো না। মাঝে মাঝে জেরার ফাঁকে ফাঁকে আমি ক্যাবিনেটকলিগদের দিকে নজর ফিরাইতে লাগিলাম। পূর্ব পাকিস্তানী মন্ত্রীদের সকলের মুখেই দরদ ও সহানুভূতি দেখিলাম। আমার বিপদে তাঁদের মুখ শুকনা। পক্ষান্তরে পশ্চিমা ভাইদের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল। তাঁরা সবাই শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষপাতী; সুতরাং শক্তি বিকেন্দ্রীকরণের বিরোধী। আমার লীডারের মতও তাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। প্রধানমন্ত্রীর হাতে তাঁদের স্বার্থ নিরাপদ বলিয়া তাঁরা নিশ্চিন্ত। কাজেই আমার নিজের লীডারের হাতে আমি নাকানি-চুবানি খাইতেছি দেখিয়া তাঁরা নিশ্চয়ই ব্যাপারটা উপভোগ করিতেছেন।

www.pathagar.com

বিকেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে তাঁদের যা যা বলিবার ছিলো, যেসব কথা অহরহ তাঁদের মুখে শুনিয়াছি, সে সব কথাই প্রধানমন্ত্রী তাঁদেরই মতো করিয়া তাঁদেরই ভাষায়, তাঁদের চেয়েও অনেক জোরালোভাবে বলিতে লাগিলেন। এমনকি যেসব কথা তাঁরা কোনোদিন বলেন নাই, হয়তো ভাবেনও নাই, সে ধরনের কথারও তিনি অনেক বলিলেন। কত কথা তুলিয়া তুলিয়া তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেনঃ 'এ সম্বন্ধে তোমার কি বলিবার আছে?' 'এ প্রশ্নের তোমার উত্তর কি?' 'এ সমস্যায় তোমার সমাধান কি?' 'এ আপত্তি তুমি খণ্ডাও কি করিয়া?' ইত্যাদি ইত্যাদি। যে সব বেকায়দার আতেক্কা প্রশ্নের জবাব আমি তাড়াতাড়ি দিতে পারি নাই, সে সব ক্ষেত্রে তিনি ধমকের সুরে 'তুমি কি বলিতে চাও?'-- বলিয়া আমার মুখে উত্তর যোগাইয়া দিলেন। আমি তাতে সাহায্য পাইলাম বটে কিন্তু বিষম অপমানও বোধ করিলাম। আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবে, বহুক্ষণ আগেই তা বুঝিয়া ফেলিয়াছিলাম। এতক্ষণে সম্মানটুকুও গেল। মনে মনে ঠিক করিলাম, ক্যাবিনেট মিটিং-এর পর গোপনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করিয়া পদত্যাগ করিয়া চুপে চুপে দেশে ফিরিয়া যাইবো। মাত্র দুইমাস মন্ত্রিত্ব করিয়াই মন্ত্রীগিরির সাধ আমার মিটিয়াছে। কাজেই অতঃপর বেপরোয়াভাবে কথা বলিতে শুরু করিলাম। পশ্চিমা বন্ধুরা আমার রাগ দেখিলেন, কিন্তু কোনোও কথা বলিলেন না। আমাকে তাঁরা একটি প্রশ্নও করিলেন না। তার দরকারই ছিলো না। তাঁদের সব কথাই তো প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বলিতেছেন। তবু যদি তাঁদের মধ্যে কেউ কখনো-সখনো কোনোও কথা বলিতে বা আমাকে কোনো প্রশ্ন করিতে চাহিয়াছেন তৎক্ষণাৎ প্রধানমন্ত্রী মুচকি হাসিয়া হাতের ইশারায় তাঁকে নিরস্ত করিয়াছেন। ভাবটা এইঃ 'তোমরা আর কি করিবে? আমিই একে ফিনিশ করিতেছি।' ফলে কেউ কিছু বলিলেন না। তিন ঘণ্টাব্যাপী ক্যাবিনেট মিটিং কার্যত হইয়া গেল প্রধানমন্ত্রী ও আমার মধ্যে কথা কাটাকাটির বৈঠক। তার পরিণামও সকলেরই একরূপ জানা। কাজেই সবাই নীরব।

আমাকে এমনভাবে নাস্তা-নাবুদ করিয়া নাকানি-চুবানি খাওয়াইয়া হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী চেয়ারটা পিছনে ঠেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আমরাও সকলে দাঁড়াইলাম। হাতের ইশারায় আমাদিগকে বসিতে বলিয়া তিনি ক্যাবিনেট রুমের এটাচ্‌ড বাথরুমের দিকে অগ্রসর হইলেন। বাথরুমের দরজার হ্যান্ডেল ঘুরাইয়া দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন। বলিলেন, 'আবুল মনসুর, তুমি আমাকে কনভিনসড্ করিতে পারিয়াছ। এইবার তুমি তোমার কলিগদের কনভিনস করিবার চেষ্টা করো।' বলিয়াই তিনি বাথরুমে ঢুকিয়া পড়িলেন।

আমি স্তম্ভিত হইলাম। প্রধানমন্ত্রী কনভিনস্‌ড হইয়াছেন? আমার লীডারকে আমি কনভিনস করিতে পারিয়াছি? বিশ্বাস হইলো না। আমাকে বিদ্রূপ করিলেন না তো?

দ্বিধায় পড়িলাম। লীডারের স্বভাব তো তা নয়। তবে এটা কি? কলিগদের কনভিনস করিতে তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন কেন? কাদের কথা বলিয়াছেন, বুঝিলাম। কিন্তু কনভিনস করিবো কি? আমি মাথা তুলিয়া কারোর দিকে চাহিতেই পারিলাম না। ঘাড় সোজা না করিয়া চোখ যতটা কপালের দিকে তোলা যায় তা তুলিয়া কলিগদের মুখ-ভাব দেখিবার চেষ্টা করিলাম। সবাই পাশের লোকের সাথে কানাকানি ফিসফাস করিতেছেন। কেহ কোনোও কথা বলিলেন না। আমাকে কোনো প্রশ্নও করিলেন না। প্রশ্ন আর কি করিবেন?

www.pathagar.com

কে করিবেন? পশ্চিমা বন্ধুরা? তাঁরা তো জিতিয়াই গিয়াছেন। আমার মতো পরাজিত পর্যুদস্ত ভূলুণ্ঠিত আহত সৈনিকের গায় 'মড়ার ওপর খাড়ার ঘা' মারিয়া লাভ কি? কাজেই তাঁরা কানাকানি করিয়াই চলিলেন। আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না।

এমনিভাবে দশ-পনেরো মিনিট কাটিয়া গেল। বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ পাইলাম। সকলে সেদিকে চাহিলাম। প্রধানমন্ত্রী তোয়ালিয়ায় চোখ-মুখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইলেন। ঐ অবস্থায় প্রশ্ন করিলেন, 'আবুল মনসুর, তুমি কি তোমার কলিগদের কনভিনস করিতে পারিয়াছ?' এ প্রশ্নের আমি কি জবাব দিবো? কনভিনস করিবো কি, আমি যে ইতিমধ্যে একটি কথাও বলি নাই। কাজেই নিরুপায় সহায়হীনের একটুখানি জোর করা শুষ্ক হাসি হাসিলাম মাত্র। প্রধানমন্ত্রী চোখ-মুখ ও হাত মুছা শেষ করিয়া ঈষৎ পিছন হেলিয়া হাতের তোয়ালিয়াটা বোধহয় বাথরুমের টাওয়েল স্ট্যাণ্ডে রাখিলেন এবং যেন কতই চিন্তা করিতেছেন এমনিভাবে ধীরে ধীরে আসিয়া নিজের আসনে বসিলেন। আমরা সবাই দাঁড়াইয়াছিলাম। আমরাও বসিলাম। প্রধানমন্ত্রী আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিশেষ করিয়া পশ্চিমা বন্ধুদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আমি মনে করি, আবুল মনসুর যদি এই-এই কয়টা সংশোধনী গ্রহণ করে, তবে আমরা তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারি।'

এই বলিয়া তিনি নিতান্ত মামুলি ভাষিক ও ব্যাকরণিক কয়েকটা সংশোধনী পেশ করিলেন এবং পশ্চিমা বন্ধুদের দিকে চাহিয়া বলিলেনঃ 'কি বলেন আপনারা?'

তাঁরা আর কি বলিবেন? প্রধানমন্ত্রী এতক্ষণ তাঁদের সমর্থন করিয়াছেন, এখন তাঁদের কর্তব্য প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করা। প্রধানমন্ত্রী আমাকে বকিয়া তাঁদেরে খুশি করিয়াছেন, এইবার তাঁদের উচিত প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করা। সকলে একবাক্যে বলিলেন, 'আপনি যা ভালো বোঝেন।'

প্রধানমন্ত্রী এতক্ষণে ঘাড় ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিলেন। বলিলেনঃ 'দেখো, যদি তুমি এই-এই সংশোধনী গ্রহণ করো তবে ক্যাবিনেট তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করিবে। বুঝিলে আমার কথা? তুমি এতে রাজি?'

এতক্ষণে আমি যেন লীডারকে কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছিলাম। তাঁর চোখ যেন আমাকে ইশারা করিলঃ 'সহজে রাজি হইও না।' আমি সে ইশারা মানিলাম। মাথা নাড়িলাম। আপত্তি করিলাম। ওসব সংশোধনী গ্রহণ করিলে আমার স্কীমগুলিই অর্থহীন বেকার হইয়া পড়ে, এমনি ভাব প্রকাশ করিলাম। ঝাঁকাঝাঁকি করিলাম। নৈরাশ্য দেখাইলাম। আমার স্কীমগুলি অবিকৃত গ্রহণ করিবার অনুরোধও করিলাম। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অটল-অনড়। ভাবটা যেন 'হয় গ্রহণ, নয় বর্জন'।

অগত্যা শেষ পর্যন্ত আমি হার মানিলাম। আমার প্রস্তাব গৃহীত হইলো। আমার ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। লীডার আমাকে কংগ্রেচুলেট করিলেন। দেখাদেখি সকলেই করিলেন। এতক্ষণে আমি বুঝিলাম, তেমন কড়া শীতের মওসুমেও আমার জামা-কাপড় ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট রুম হইতে বাহির হইয়া সোজা দোতলায় উঠিবার লিফটে চড়িলেন। আমাদের কাউকে কিছু বলিবার সুযোগ দিলেন না। তাঁর সাথে লিফটে উঠিবার জন্য আমাদের কাউকে ডাকিলেন না। লিফট একলাফে দোতলায় উঠিয়া গেল। আমরা

www.pathagar.com

সকলে গাড়ি বারান্দার দিকে চলিলাম। আশাতীত জয়ের পুলকানন্দে আমি একরূপ বাহ্যজ্ঞানহীন। হঠাৎ কার হাত আমার কাঁধে পড়িলো। আমার চমক ভাঙিলো। দেখিলাম, অর্থ সচিব সৈয়দ আমজাদ আলী। তাঁর সুন্দর মুখের স্বাভাবিক মিষ্টি হাসি ক্রূর ভ্রূ-ভঙিতে বিকৃত করিয়া দুষ্টামিপূর্ণ ভাষায় বলিলেনঃ 'অভিনয়টা পারফেকট হইয়াছে। সারারাত ধরিয়া রিহার্সেল দিয়াছিলেন বুঝি?'

আমি বরাবরই অল্প-বুদ্ধি লোক। বন্ধুবরের রসিকতা ভালো বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু আন্দাজ করিলাম। তবু বোকার মতো তাঁর দিকে চাহিয়া রহিলাম। এবার তিনি সহজ-সুন্দর মিষ্টি হাসিটি ফিরাইয়া আনিয়া বলিলেন' 'প্রাইম মিনিস্টার ও আপনি যে মক-ফাইটটা করিলেন, তার কথাই আমি বলিতেছি। কাজ তো হইয়াই গিয়াছে। এখনও অভিনয় চালাইয়া যাওয়ার দরকার কি?'

লীডারের তিন তিন ঘণ্টাব্যাপী পারফরমেন্সের আগাগোড়া ছবিটা নূতন রূপের চাকচিক্যে আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। সত্যই তাই নাকি? তাই তো কত জায়গায় তাঁর কত প্রশ্নের জবাব তিনি নিজেই আমার মুখে তুলিয়া দিয়াছেন!

পুলক-আনন্দ-গর্ব-অহংকার ও বিনয়-কৃতজ্ঞতার ঢেউ-এর নিচে আমি তলাইয়া গেলাম। হে মহান নেতা, এমন করিয়া তুমি আমাকে জিতাইয়া দিয়াছ?

আমাকে নীরব দেখিয়া বন্ধুবর আমার হাত ধরিয়া টানিয়া নিতে নিতে বলিলেনঃ 'ভয় নাই, আমি কাউকে বলিয়া দিবো না। কেউ বোঝেন নাই। প্রধানমন্ত্রী সবাইকে হিপনোটাইসড্ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।'

একটু থামিয়া আবার তিনি বলিলেনঃ 'আপনি যাই মনে করেন ভাই সাহেব, প্রধানমন্ত্রী অমন না করিলে আপনার প্রস্তাব পাসের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিলো না।'

কথায় কথায় আমরা বিশাল লাউঞ্জটা পার হইয়া গাড়ি-বারান্দার সামনে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। আমার গাড়িটা আগে আসিয়া গাড়ি-বারান্দাটা আটকাইয়া রাখার দরুন আমজাদ আলীর গাড়িটা দূরে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি হাত উঠাইয়া আমাকে সালাম করিয়া হাসিমুখে হন হন করিয়া নিজের গাড়ির দিকে ছুটিলেন।

একদৃষ্টে অথবা দৃষ্টিহীনভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আবার আমি বাহ্যজ্ঞান হারাইলাম। প্রাইভেট সেক্রেটারি অথবা বডিগার্ডের ডাকে আমার চমক ভাঙ্গিলো। আমি গাড়িতে চড়িবার জন্য সিঁড়িতে পা দিবার আগে একবার ছাদের দিকে ভক্তিভরে তাকাইলাম। ঠিক ওপরেই প্রধানমন্ত্রীর বেডরুম।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শহীদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

আতাউর রহমান খান

মহামানবের জীবন প্রায়ই মহাসাগরের মতো—বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল, অগাধ, অসীম। কখনো অশান্ত, কখনো প্রশান্ত।

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার অধিকারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নশ্বর দেহ আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে বিলীন। 'মাটির দেহ মাটিতে মিশে যাবে'; কিন্তু তাঁর জীবনাদর্শ, দর্শন, চিন্তাধারা ও কর্মপ্রেরণা চিরকালের জন্যে অম্লান, অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। তাঁর অমর আত্মা চিন্তায়, জ্যোতির্ময় রূপে প্রদীপ্ত হয়ে থাকবে মানুষের মনে-প্রাণে।

বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগমানব রাজনৈতিক দর্শন ও চিন্তাধারায় বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেছেন। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন দূর বিদেশে; যে দেশ তিনি সৃষ্টি করেছেন, সে দেশের মাটিতে নয়, যে জাতি তিনি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তার মাঝে নয়।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতিভা ছিলো বহুমুখী—বিভিন্ন ও বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের, চিন্তা ও ভাবধারার অপূর্ব সংমিশ্রণ। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা ছিলো সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, বহু উর্ধ্বে। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজে কাউকে তাঁর নাগালের বাইরে রাখেননি। তাঁর প্রতিভার পরশে সবাইকে মহিমান্বিত করেছেন। সবাই হয়েছে ধন্য।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চরিত্রের বিকাশও ছিলো বহুমুখী—কোমল-কঠোর, স্নিগ্ধ-রুদ্র, সরল ও জটিলের বিচিত্র সমাবেশ। বাইরের দিকটা যেমন কঠিন ও গম্ভীর, অন্তরের দিকটা তেমনি মধুর ও কোমল। যারা তাঁর সাথে প্রথম দেখা করতে গিয়েছে তারা হঠাৎ চমকে উঠেছে এবং ভুল বুঝেছে।

বেলুচিস্তানের নেতা আবদুস সামাদ আচকজাই খুব হন্তদন্ত হয়ে একদিন আমাদের কাছে এসে বললেন, কেমন করে আপনারা এমন নেতার সাথে কাজ করেন, কথাই বলতে চান না—ভয়ানক গম্ভীর। আমাদের কথার জবাবই দিলেন না। নিরতিশয় তাচ্ছিল্যভরে দু'একটা হু-হা করেই আমাদের বিদায় দিলেন।

খুব রাগ করেই নেতার কাছ থেকে চলে এসেছেন অনুমান করলাম।

হেসে বললাম প্রথম দর্শনে সবারই মনে এই ধারণা জন্মে। এটা তাঁর বাইরের রূপ। আরও কাছে গিয়ে বাইরের আবেষ্টন ভেদ করে ভেতরে ঢুকে দেখতে পাবেন স্নিগ্ধ-শান্ত সরল-কোমল মানুষের রূপ।

কলকাতার দাঙ্গার সময় যে সিংহপুরুষ সোহরাওয়ার্দীকে মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে উপদ্রুত এলাকায় একা ঘুরতে দেখেছি, বুকে কঠিন সঙ্কল্প আর অদম্য সাহস নিয়ে সেই সোহরাওয়ার্দীকে বন্যা ও বাত্যা-বিধ্বস্ত এলাকায় রিক্ত সর্বহারা মানুষের মাঝে ঘুরতে দেখেছি চোখের পানি ফেলে কোমল অন্তর নিয়ে।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক জীবনের তাঁর প্রতিভা ছিলো সূর্যের মতো প্রখর। তাঁর কর্মক্ষমতা অফুরন্ত। কোনো বিপদ, কোনো বাধাকে তিনি ভয় করেননি। বিপদ যতই গুরুতর রূপে দেখা দিয়েছে, তাকে জয় করার মনোবৃত্তি তাঁর ততই কঠিন ও দৃঢ় হয়েছে।

মানুষকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন। তাই, মানুষের সার্বিক অধিকার আদায়ের লৌহ্-কঠিন সঙ্কল্প গ্রহণ করে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অটল রয়েছেন। ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্ন তাঁর মনে কোনোদিন ওঠে নাই।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন নিরহঙ্কার, নিরভিমান ও নিঃস্বার্থ। পদ, মান, অর্থ, গৌরব—কোনো কিছুর লোভই তাঁকে কোনোদিন বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। রাজনৈতিক জীবনে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে কিংবা ক্ষমতা অধিষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর চিন্তা ও কর্মে কোনো তারতম্য লক্ষ্য করিনি। একইভাবে উভয় অবস্থায় তিনি দেশের ও মানুষের কল্যাণ সাধনায় দিবা-রাত্র কাজ করে গেছেন। তিনি ক্ষমতা লাভের জন্যে সবকিছু করেন বলে কোনো কোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল যে তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়েছে সেটা কত মিথ্যা তা তারা চিন্তা করেনি, বুঝতেও পারেনি।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মন এত উদার ছিলো যে, ছোট-বড় কোনো লোভ-লালসাই তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। তিনি জেলে থাকাকালে আমরা বাষট্টি সালের জুন মাসে আমাদের কর্তব্য স্থির করে যে বিবৃতি দিয়েছিলাম সারা দেশ তাতে আলোড়িত হয়েছিল। জেল থেকে বের হবার পর তিনি আমাদের বিবৃতি সমর্থন করবেন কিনা, এ বিষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চললো কয়দিন। ঢাকা বিমানঘাঁটিতে এসে তিনি ঘোষণা করলেন শুধু তাঁর সমর্থনই নয়—তিনিও যে আমাদের একজন হয়ে কাজ করবেন এই তাঁর সঙ্কল্প।

তারপর তিনিই সিদ্ধান্ত নিলেন, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করার—আমাদের সবাইকে নিয়ে। সব দলের নেতৃবৃন্দ তাতে যোগ দিলেন। দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত সবাই একযোগে কাজ করবো। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পুনর্গঠিত বা পুনরুজ্জীবিত হবে না যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিল করতে না পারি। জীবনের শেষ পর্যন্ত এই সঙ্কল্পে তিনি অটল ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তাঁর এই সঙ্কল্প শিথিল করার চেষ্টা করা হয়েছিল; কিন্তু তিনি কিছুতেই মত পরিবর্তন করতে রাজি হননি।

ছাপান্ন সালের শেষভাগে যখন পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিত্ব গঠনের ডাক এলো আমার কাছে, তখন ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। দারুণ দুর্ভিক্ষ সামনে, লক্ষ লক্ষ লোক মরে যাবে আর আমি—আমরা নিমিত্তের ভাগী হবো! কিন্তু নেতা সোহরাওয়ার্দী ব্রজকণ্ঠে নির্দেশ দিলেন, দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে, বিপদ যতই কঠিন হোক না কেন। নতুবা জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। দুর্দিনেই তো তোমাদের কর্মশক্তির পরীক্ষা হবে।

তিনি সাহস দিলেন, প্রেরণা দিলেন, সর্বক্ষণ আমাদের সাথে থেকে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন, সে প্রতিশ্রুতিও দিলেন। বুকে সাহস পেলাম। দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। কয়দিন পর তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার সাথে সাথেই অকাতরে মঞ্জুর করলেন কয়েক কোটি টাকা পূর্ব পাকিস্তানের আসন্ন দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করার জন্যে। তিনি অমনভাবে সাহায্য না করলে যে কি ভয়াবহ অবস্থা হতো তা আজ কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে।

www.pathagar.com

কয়দিন পর ঢাকা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কাজ -কর্ম কেমন চলছে?

বললাম, কাজে নেশা ধরে গেছে। এ নেশা যেন না কাটে সেদিকে আপনি লক্ষ্য রাখবেন। নেশা কেটে গেলে কিন্তু আমাকে দিয়ে আর কিছুই হবে না।

বললেন, কাজ করে যাও। নেশাগ্রস্ত করে রাখার দায়িত্ব আমার রইলো।

অনেক জীবিত ও মৃত নেতাকে দেখেছি অনুগামী বা সহগামীদের গৌরব-বৃদ্ধির আশঙ্কায় কিছুটা ভীত-চঞ্চল হয়ে পড়েন; এমন কি কিছুটা ঈর্ষান্বিতও হয়ে পড়েন। কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দেখেছি সম্পূর্ণ উল্টো। তাঁর অনুসারীদের গৌরব-বৃদ্ধি দেখলে গর্বে-আনন্দে তাঁর বুক ফুলে উঠতো। বারবার তিনি তার উল্লেখ করে একটা আনন্দময় আবহাওয়া সৃষ্টি করে তুলেছেন।

সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আমি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। এক সময়ে সফরে গিয়ে জনসভায় বক্তৃতা করেছি। তিনি আমার এত প্রশংসা করেছেন যে, তাঁর আবেগ সামলাতে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। তিনি যেন কিছুই নন, আমিই সব, সব চাবি-কাঠি আমার হাতে, এ সব কথাও আকারে-ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। কোনো নেতার এত উদার মন—এত বড় বুকের পাটা হতে পারে?

গণপরিষদে এক ইউনিট বিলের পর এক লম্বা বক্তৃতা ঝাড়লাম। নেতা পরিষদ-গৃহে ছিলেন না। তাঁর অনুপস্থিতির জন্যে মনটা উসখুস করছিল—কোনোখানে কি বলে ফেলি। বক্তৃতা শেষ করে লবিতে গিয়ে দেখি তিনি চোখ বুজে বসে আছেন। সাথে সাথে তিনি যেন লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, কি চমৎকার বক্তৃতা করেছো আমিও এত সুন্দর করে বলতে পারতাম না।

লজ্জাবনত মুখে হেসে বললাম, তাহলে শেষ পর্যন্ত গুরু-মারা বিদ্যা শিখলাম।

বললেন, না না, সত্যিই অদ্ভুত বলেছে।

কত বড় মহাপ্রাণ হলে এমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারেন?

শহীদ সোহরাওয়ার্দী শুধু মহান নেতাই ছিলেন না। তাঁর অনুসারীরাও ভবিষ্যতে নেতৃত্বের আসন লাভ করতে পারে, সেদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিলো। তিনি পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছেন। এবং তাঁর তিরোধানের পূর্বে দেশে বেশ কিছু নেতা সৃষ্টি করে যাবেন, একথা ও তিনি মাঝে মাঝে বলতেন।

সভায় বক্তৃতা করার কালে অনেক নেতাকে দেখেছি অন্য বক্তা ভালো ভালো কথা বলে ফেললে বলবার বিশেষ কিছু থাকবে না, এই আশঙ্কায় বক্তার পিছন দিকে পিরহানে টান মেরেছেন—তাঁকে বসিয়ে দেবার জন্যে। শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দেখেছি সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বক্তার মুখে ভালো ভালো কথা, যুক্তিতর্ক—যা হয়ত তিনি নিজেই বলতে চেয়েছেন—তুলে দিতেন, আর মওকা পেলেই নিজে হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিতেন।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অদম্য কর্ম-দক্ষতার কথা দেশে প্রবাদে পরিণত হয়েছে। কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি ওকালতি ব্যবসায়ে, তিনি দিন-রাত একভাবে খেটে যেতে পারতেন। কোনো ক্লান্তিবোধ নাই। চুয়ান্ন সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁর সাথে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা জীবনে ভুলবার নয়।

রাতের বেলায় কাজ করে যাচ্ছেন—এগারোটা, বারোটা, একটা বেজেই চলেছে।

www.pathagar.com

খাওয়ার বস্তু ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একবার বললাম, খেয়ে নিতে হয়। কাজের মাঝে ডুব দিয়ে আছেন। বললেন, কাজ আগে, খাওয়া পরে। তোমাদের দরকার হলে খেয়ে নাও। এই করে করে ভোর রাতের দিকে উঠে মুখে যা হয় কিছু দিয়ে শুয়ে পড়তেন। ভোর হতে হতেই আবার উঠে কাজ শুরু করে দিতেন।

এই পালা একদিন দু'দিন নয়, কয় মাস ধরে চলেছে।

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের উদ্যোগে সারা পাকিস্তান সফরে বের হয়ে গেলেন—সঙ্গে আমরা অনেকেই। গাড়ি, জাহাজ, মোটরে চলার পথে যেখানেই লোক সমাবেশ হয়েছে, নেতা বক্তৃতা দিয়েছেন, কখনও মাইকে কখনও এমনিই। সারা রাস্তায় বিরাম নাই। একবার ট্রেনে রাজশাহী থেকে রংপুর আসার পথে রাত এগারোটায়, একটায় ও চারটায় তিন স্টেশনে বক্তৃতা করলেন। আমরা পাশের কামরায় গভীর ঘুমে। রাত পাঁচটায় সবাইকে ডেকে উঠাতে বললেন, আর বক্তৃতা করার দায়িত্ব নিতে বললেন। কুমিল্লা থেকে ফেনী আসার পথে রাস্তায় রাত এগারোটায় এক সমাবেশে বক্তৃতা করলেন। তারপর ফেনী পৌঁছে রাত সাড়ে বারোটায় ফেনী মাঠে বক্তৃতা করলেন। তারপর রাজনৈতিক কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনায় বাকি রাত কাটিয়ে ভোর ছ'টার ট্রেনে আবার চাটগাঁও রওনা হয়ে গেলেন।

এমনি আরো কত! কোনোদিন তাঁকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দেখি নাই। ঘড়ির কাঁটা ধরে ঘুমাতে পারতেন, আবার ঠিক উঠতেও পারতেন। এক স্টেশনে পৌঁছতে কুড়ি মিনিট বাকি, বললেন, বারো মিনিট ঘুমিয়ে নেই, তারপর আট মিনিটে রেডী হয়ে যাবো। করলেনও তাই।

এমন অদ্ভুত কাজ করতে পারতেন নেতা। সময়কেও যেন এমনি গোলাম করে নিয়েছিলেন।

এত বড় প্রতিভাশালী মনীষীর অন্তর ছিলো শিশুর মতো সরল ও কোমল। কোনো চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, কুচক্রে তিনি বিশ্বাস করতেন না। কোনো কথায় রসিকতার বিন্দুমাত্র গন্ধ থাকলে তিনি উল্লাসভরে তা উপভোগ করতেন।

একদিন গল্পচ্ছলে বললাম, যখন স্কুলে পড়ি তখন রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটির পাস করা আমার এক আত্মীয় আমার বই পড়ার সময় বলেছিলেন, 'তুমি যখন বাংলা পড়ো তখন মনে হয় ইংরেজি পড়ছো, আর ইংরেজি পড়লে মনে হয় বাংলা পড়ছো।'

নেতা খাটে শোয়া ছিলেন। গল্প শুনে হো হো করে হাসতে হাসতে উঠে বসে পড়লেন। হাসি আর থামে না। আমি বেকুব বনে গেলাম—এত হাসির কি আছে? তিনি খাট থেকে মেঝেয় নেমে প্রায় নৃত্যের তালে হা হা করে হাসতে লাগলেন। ঘর ভরা লোকও সাথে সাথে হাসতে লাগলো।

শুধু তাই নয়। অনেকদিন পর্যন্ত এই ঘটনার সূত্র তিনি টেনে চলেছেন। আমি ইংরেজি বললেই বলতেন, 'ওহে বাংলা বলছো না কি?' আর বাংলা বললেই বলতেন, 'এটা কিন্তু ইংরেজির মতো লাগছে' বলেই হাসির রোল।

আমরাও মাঝে মাঝে তাঁর বাংলা উচ্চারণ নিয়ে খুব রসিকতা করতাম। ছোট-খাট রসিকতা ও গল্পে তিনি এমনই স্বভাবসুলভ উল্লাস প্রকাশ করতেন। একটা আনন্দমুখর

www.pathagar.com

পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলতেন, আর তার ছোঁয়া লেগে যেত সবার মনে-প্রাণে।

আজ তিনি নেই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের কত বড় ক্ষতি হয়েছে তা নির্ণয় করা কঠিন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সব বিষয়ে গগনচুম্বী বৈষম্য, আচার-ব্যবহার, ভাষা-সংস্কৃতির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন এই দুই অংশের সম্ভাব্য মিলনের একমাত্র সেতু। সেতু আজ সরে গেছে, এ যোগাযোগ ও মিলন সম্ভব হবে কিনা তা শুধু ভবিষ্যৎই বলতে পারে। অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা কল্পনা করাও আজ কঠিন হয়ে পড়েছে।

অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে শহীদ সোহরাওয়ার্দী রুখে দাঁড়িয়েছেন। আজ যে দেশে ভয়াবহ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাজমান, তিনি এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন। স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে মানুষের হৃত অধিকার ফিরিয়ে এনে তাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

তিনি চলে গেছেন, কিন্তু কাজের ভার দিয়ে গেছেন জাতির ওপর। এ দায়িত্ব আজ সবার নিতে হবে। তাঁর আরব্ধ কর্মপন্থা আমাদেরই সমাপ্ত করতে হবে। তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার আমাদের। এ কাজে শৈথিল্য করা তাঁর স্মৃতির প্রতি অবমাননারই নামান্তর। এ কাজ অসম্পূর্ণ রাখলে কিংবা তাঁর নির্ধারিত নীতি লংঘন করলে দেশ ও জাতির প্রতি ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

www.pathagar.com

চিরঞ্জীব

আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ

বিপন্ন-অসহায় জাতির একমাত্র সম্বল, সর্বস্বত্যাগী নিঃস্বার্থ নেতা, গণতন্ত্রের প্রদীপ্ত ভাস্কর, মরহুম সোহরাওয়ার্দীকে সেদিন চির অন্ধকার মাটির তলে নিজ হাতে লুকাইয়া আসিলাম; কিন্তু হায়, আজ পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারিলাম না—সত্যি কি তিনি আমাদিগকে এত অসহায় রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন? অবুঝ মন কাঁদিয়া বলে—না, তিনি যান নাই—আমাদিগকে এ হেন অবস্থায় রাখিয়া যাইতে পারেন না। শোন অবুঝ মন।

'কুল্লু মান আল্লায় হাফফান ইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বেকা জুল-জালালে ওয়াল ইকরাম।'—স্রষ্টা মাত্র অবশিষ্ট থাকিবেন, আর সবই লয় হইবে। বৃথা খেদ ও হতাশা তাঁহার অমর আত্মাকে শান্তি দিতে পারিবে না।

বিশ্ব করুণা মোহাম্মদ সালামের মহাপ্রয়াণে মহা বাহু ফারুকে আজম ধৈর্য হারাইয়া ফেলিলেন—অসি উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন—'যে আখেরী নবীর মৃত্যু হইয়াছে বলিবে—তাহার শিরশ্ছেদ করিবো।'

কে তাঁহার সামনে কথা বলে। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সিদ্দিকে আকবর বলিলেন—'হে ওমর, তুমি যদি মোহাম্মদের (দঃ) পূজা করিয়া থাকো—তবে শোন, তিনি আর ইহজগতে নাই; কিন্তু তিনি যে সত্যের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা অমর চিরঞ্জীব—'হুয়াল হাইউল কাইউম।'

মহান নেতা গণতন্ত্র কায়েমের জন্য সর্বস্ব, এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত কোরবানী করিলেন—সত্য তিনি শহীদ হইয়াছেন। আল্লাহর পথে যাঁহারা জীবন দান করেন—তাঁহারা অমর—চিরঞ্জীব।

অতএব প্রিয় নেতার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের পথে তাঁহার অগণিত ভক্ত, সহকর্মী, গুণমুগ্ধ বন্ধুগণ সর্বোপরি তাঁহার প্রিয় দেশবাসী আসুন পাকিস্তানে গণতন্ত্র কায়েম করিয়া মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে চিরঞ্জীব করিয়া রাখুন।

www.pathagar.com

নেতাকে যেমন দেখিয়াছি

শেখ মুজিবুর রহমান

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে এত বেশি বিরল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল যে, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গেলে কয়েক খণ্ড পুস্তক রচনার প্রয়োজন। সুদীর্ঘ প্রায় এক চতুর্থাংশ শতাব্দীকাল তাঁহার সংস্পর্শে থাকার ফলে আমার মনের কোণে তাঁহার যে ছবিটি অঙ্কিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা কোনো সাধারণ মানুষের নহে, একজন প্রায় অতিমানবের। তাঁহার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মহৎ গুণের যে সমাবেশ ঘটিয়াছিল তাহাই তাঁহাকে একজন বিরাট ব্যক্তিত্বশালী মানুষে পরিণত করিয়াছিল।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর অন্যতম বিশিষ্ট চারিত্রিক গুণ ছিলো এই যে, তিনি কোনো ব্যাপারেই ধানাই-পানাই বা লুকোচুরিতে বিশ্বাস করিতেন না। প্রত্যেকটি জাতীয় সমস্যাকেই তিনি সরল-সোজা দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতেন। ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইলেও তিনি উচ্চ নৈতিক আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতেন না, বরং যে কোনো অবস্থাতেই তিনি নিজ নীতিতেই অবিচল থাকিতেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর জীবনে এইরূপ ঘটনার অভাব নাই। নিম্নবর্ণিত ঘটনা হইতেই পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যাইবে যে, ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের চাইতে নীতি তাঁহার নিকট কত বড় ছিলো। ১৯৪৭ সালের জুন মাস। সিলেট গণভোটের ঠিক অব্যবহিত পরের ঘটনা। নবগঠিত পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন করার জন্য মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা কাহাকে নির্বাচন করা হইবে, উহা লইয়া তোড়জোড় চলিতেছে। ঐ সময় জনাব সোহরাওয়ার্দী যুক্ত বাংলার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী। সিলেটের ১৭ জন পরিষদ সদস্য মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টিতে যোগ দিলেন। তাঁহারা জনাব সোহরাওয়ার্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহাদেরকে তিনটি মন্ত্রিত্ব ও তিনটি পার্লামেন্টারি সেক্রেটারির পদ দান করা হইলে নেতা নির্বাচনে তাঁহারা তাঁহাকেই সমর্থন করিবেন। বরাবরের ন্যায় এক্ষেত্রেও জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁহার নীতিতে অবিচল রহিলেন এবং সিলেটি সদস্যদের জানাইয়া দিলেন যে, পূর্বাহ্নে তিনি কাহাকেও অনুরূপ কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারিবেন না।

বিফল মনোরথ হইয়া তাঁহারা নেতৃত্বের অপর প্রার্থী খাজা নাজিমউদ্দিনের নিকট গমন করিয়া উক্ত প্রতিশ্রুতি দাবি করিলেন। খাজা সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উহাতে রাজি হইয়া গেলেন এবং নিজের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পথ নিশ্চিত করিলেন। মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচনে খাজা সাহেব বিজয়ী হইয়া পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান) প্রথম মুখ্যমন্ত্রী পদে সমাসীন হইলেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দী দেশ বিভাগের পর ভারতে ফেলিয়া আসা অসহায় মুসলমানদের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা একদিকে যেমন তাঁহার উচ্চমানের কর্তব্যবোধের পরিচায়ক,

www.pathagar.com

অন্যদিকে তেমনি অপরিসীম ত্যাগের প্রমাণ। অসহায় মুসলমানদের রক্ষা করার মহান উদ্দেশ্য সাধন করিতে যাইয়া তাঁহাকে কায়েদে আজমের একটি নয়, দুইটি নয়, পাঁচ-পাঁচটি উচ্চপদ গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে হয়। কায়েদে আজম তাঁহাকে (১) ভারতে পাকিস্তানী হাইকমিশনার, (২) পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্ব, (৩) পাঞ্জাবের গর্ভনর পদ, (৪) জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধির পদ এবং সর্বশেষ (৫) বিদেশে কায়েদে আজমের ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূতের পদ গ্রহণের প্রস্তাব দিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের অসহায় মুসলমানদের রক্ষার চাইতে তিনি কোনো উচ্চপদকেই বড় মনে করেন নাই। তাই কোনো পদ গ্রহণে অসম্মতি জানাইয়া তিনি ভারতে থাকিয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়িয়া তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং একে একে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার লীলাভূমি কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থান, পূর্ব পাঞ্জাব, আলওয়ার, ভরতপুর, দিল্লি ও যুক্ত প্রদেশ সফর করিলেন। এই সকল স্থানের কোনো কোনোটায় তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে গিয়াছিলেন, আবার কোনো কোনো স্থানে একাকীই গিয়াছিলেন। তবে সব জায়গাতেই তাঁহার জীবন বিপন্ন ছিলো।

শুধু ভারতে নহে, তিনি পূর্ববাংলাও সফর করিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতি করিয়া মানুষের নিকট পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশের স্বার্থেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিলেন। এই শান্তি-মিশনে জনগণের অভ্যর্থনা, অভিনন্দন ও সাড়ার মাধ্যমে তাঁহার অচিন্তনীয় জনপ্রিয়তার যে চিত্র ফুটিয়া উঠিলো, তদ্দৃষ্টে ক্ষমতাসীনদের বুক কাঁপিয়া উঠিলো। তাই তাঁহারা সাত-তাড়াতাড়ি স্টিমারযোগে টাঙ্গাইল রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে বাদামতলীঘাটে তাঁহার ওপর বহিষ্কার আদেশ জারি করিলেন। এই সময় পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দিন।

জনাব সোহরাওয়ার্দীকে কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে হইলো এবং সেখানে গিয়া তিনি পুনরায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। গান্ধীজীর সহায়তায় তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা কলিকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশ, আসাম ও ভারতের পাকিস্তান সন্নিহিত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে মুসলমানদের পাকিস্তান পাড়ি রোধ করিতে সক্ষম হইলেন। এইভাবে তিনি এই নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে কোটি কোটি মোহাজেরের চাপজনিত গুরুতর বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিলেন। অন্যথায় এই নবীন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি এবং অসংগঠিত ও টলটলায়মান অর্থনীতি এবং প্রশাসন ব্যবস্থা সেই সময়েই চুরমার হইয়া যাইতো। সুতরাং জনাব সোহরাওয়ার্দীর দূরদৃষ্টি এমন এক সময় পাকিস্তানকে রক্ষা করিলো যখন কেন্দ্র ও এখানকার সরকার তাঁহাকে একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবে প্রচার করিতে ব্যস্ত।

একজন দুঃসাহসিক মানুষ

জনাব সোহরাওয়ার্দীর সাহসের কথা সর্বজনবিদিত। শত বিপদ-আপদেও তিনি অটল ছিলেন, অথচ ইহার যে কোনোটিতে তাঁহার জীবন খতম হইতে পারিতো। কিন্তু কোনো পরোয়া নাই। তাঁহার খোদা ভীরুতাই ইহার একমাত্র কারণ।

শত্রু অধ্যুষিত এলাকায় রওয়ানা হইলে আমরা যখন বাধা দিতাম, তখন সোহরাওয়ার্দী বলিতেন 'খোদাতায়ালা যে সময় নির্ধারণ করিয়াছেন তৎপূর্বে কেহই আমাকে হত্যা করিতে

www.pathagar.com

পারিবে না।' এই প্রসঙ্গে আমি তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্বাপণ প্রচেষ্টার কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ১৯২৬ সালে কলিকাতার সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার সময় কিভাবে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, জনাব সোহরাওয়ার্দীর নিজ মুখেই আমি তাহা শুনিয়াছি। একবার তিনি শুদ্ধি আন্দোলনের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কিভাবে রক্তক্ষয় বন্ধ করা যায়, এ সম্পর্কে তাঁহারা দুইজন রাস্তার ওপর দাঁড়াইয়া আলাপ-আলোচনা করিতেছিলেন। ঠিক এই সময় এক ব্যক্তি পিছন হইতে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দী ইহা লক্ষ্য করেন নাই। আততায়ী তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করিবে ঠিক সেই মুহূর্তে স্বামীজী উহা দেখিতে পাইয়া জড়াইয়া ধরিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীকে একপাশে ঠেলিয়া দেন। আততায়ীর লক্ষ্যচ্যুতি ঘটিল। স্বামীজী জনাব সোহরাওয়ার্দীকে মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া ঐস্থান ত্যাগ করিতে বলিলেন এবং জনাব সোহরাওয়ার্দীও একাকী গাড়ি চালাইয়া চলিয়া গেলেন।

আরেকটি ঘটনা। ১৯৪৬ সালের কলিকাতা দাঙ্গার সময় গাড়িতে চড়িয়া একাকী জনাব সোহরাওয়ার্দী এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গিয়া অসহায় লোকদের সাহায্য ও সাম্প্রদায়িক শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ এক সময় তাঁহার গাড়িতে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হইলো এবং উহার বিস্ফোরণও ঘটিল। সামান্য আহত হইলেও তাহাতে জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিশেষ কোনো ক্ষতি হইলো না। তিনি লাফ দিয়া গাড়ির বাহিরে আসিয়া প্রাণে বাঁচিলেন।

দেশ বিভাগের পর কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকার সময় জনাব সোহরাওয়ার্দী গান্ধীজীর সঙ্গে বেলিয়াঘাটার একটি জরাজীর্ণ বাড়িতে অবস্থান করিতেন। তখনও কলিকাতার মুসলিম নিধনযজ্ঞ পুরাদমে চলিতেছিল। একদিন প্রায় বিশ সহস্র লোকের একটি জনতা তাহাকে হত্যা করিতে আসিল। কিন্তু ভয় পাওয়ার পাত্র তিনি নন। তাই তিনিও বুক ফুলাইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তোমরা যদি আমাকে হত্যা করিতে চাও, তবে এখনই করো। কিন্তু তৎপূর্বে আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, আমার পরে তোমরা আর কোনোও মুসলমানকে হত্যা করিবে না।'

শোরগোল শুনিয়া গান্ধীজীও বাহির হইয়া আসিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীর পাশে দাঁড়াইলেন এবং উন্মত্ত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'তোমরা যদি শহীদকে খুন করিতে চাও, তাহা হইলে প্রথমে আমাকে খুন করো।' জনতার ওপর যাদুমন্ত্রের ন্যায় কাজ করিল এবং তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া চলিয়া গেল।

তাঁহার জীবনের ওপর আঘাত হানার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে দিল্লিতে। তখন জনাব সোহরাওয়ার্দী গান্ধীজীর সহিত নয়াদিল্লিতে বিড়লা ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাকে হত্যা করার কাজে নিয়োজিত জনৈক ব্যক্তি গৃহের ভেন্টিলেটরের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রতি পিস্তলের লক্ষ্য স্থির করে; কিন্তু বিছানায় জনাব সোহরাওয়ার্দীর স্থলে একজন কানা লোককে শায়িত দেখিয়া একটু পরে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসে। প্রকৃত ব্যাপার হইলো এই যে, কোনো ব্যাপারে চিন্তামগ্ন থাকার সময় জনাব সোহরাওয়ার্দী সর্বদা একচোখ বন্ধ করিয়া রাখিতেন। পরে লোকটি তাহার অপরাপর সহযোগীর গালমন্দ শোনে।

www.pathagar.com

সৌভাগ্যবশত জনাব সোহরাওয়ার্দী পরেরদিনই কলিকাতার উদ্দেশ্যে দিল্লি ত্যাগ করেন। এই সমগ্র ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছিল গান্ধী হত্যা মামলার বিচারকারী আদালতে একজন রাজসাক্ষী (Approver) তাহার সাক্ষ্যে। সে আরও প্রকাশ করিয়াছিল যে, তাহাদের লক্ষ্য ছিলো তিনজনকে হত্যা করা—গান্ধীজী, জনাব সোহরাওয়ার্দী ও মিস্টার জওয়াহেরলাল নেহরু।

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর ভারত সরকার জনাব সোহরাওয়ার্দীর ওপর বিপুল পরিমাণ আয়কর ধার্য করিলেন এবং তাহার কিছুদিন পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন । সেই সময় ভারতের সাম্প্রদায়িক দিগন্তে শান্তি বিরাজ করিতেছিল। তাই জনাব সোহরাওয়ার্দী বসবাসের উদ্দেশ্যে করাচী চলিয়া আসিলেন এবং তাঁহার শ্বশুর মরহুম স্যার আবদুর রহিমের ১৩, করাচী রোডস্থ বাড়িতে বসবাস করিতে শুরু করি। ইহা ছিলো একতলা একখানা দালান। সেইখানেও একদিন রাত্রে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে হত্যা করার জন্য জনৈক ব্যক্তি উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁহার শয্যাকক্ষে প্রবেশ করে। সৌভাগ্যবশত জনাব সোহরাওয়ার্দী তখনও ঘুমাইয়া পড়েন নাই। লোকটি তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করিতে যাইবে ঠিক এই সময় জনাব সোহরাওয়ার্দী বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া লোকটির ওপর ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং তাহার হাতের কব্জা ধরিয়া ফেলেন। জনাব সোহরাওয়ার্দীর চিৎকারে গৃহের চাকর বাকর আসিয়া লোকটিকে পাকড়াও করিয়া আটক করে। তখন লোকটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকে। তাঁহার কান্নায় দয়ার সাগর সোহরাওয়ার্দীর মন গলিয়া গেল। তিনি লোকটিকে বিচারের জন্য পুলিশের হাতে সোপর্দ করিবার পরিবর্তে সেই গভীর রাত্রেই মুক্ত করিয়া দিলেন।

তাঁহার জীবনের ওপর সর্বশেষ হামলা হয় ১৯৬২ সালে পশ্চিম পাকিস্তান সফরের সময় গুজরানওয়ালা রেল স্টেশনে। আমি নিজে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। জনাব সোহরাওয়ার্দীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য প্ল্যাটফরমে প্রায় পাঁচ শত লোকের সমাগম হইয়াছিল। জনাব সোহরাওয়ার্দী গাড়ির কামরা হইতে বাহিরে আসামাত্র রিভলবারের একটি গুলি তাঁহারই পার্শ্বে দণ্ডায়মান চেরাগ আলী নামক একজন আওয়ামী লীগ কর্মীকে বিদ্ধ করে। রিভলবারের এই গুলির লক্ষ্যস্থল যে জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু কিভাবে ঘটনাটি চাপা দেওয়া হইয়াছে তাহা অনেকের নিকটই অজ্ঞাত নহে। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই অলৌকিক উপায়ে আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

সাধারণ মানব নহেন–

আমি কোনোদিনও তাঁহাকে কাহারো ওপর, এমনকি তাঁহার রাজনৈতিক শত্রুর ওপরও ব্যক্তিগত আক্রোশ অথবা রাজনৈতিক কারণে প্রতিশোধ নিতে দেখি নাই। সুদূর বৈরুতে তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিয়াছেন কিনা তাহা একমাত্র আল্লাহতায়ালাই জানেন। তবে তিনি আর আমাদের মধ্যে নাই; কিন্তু একজন সাধারণ কর্মী, অনুসারী ও ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে দীর্ঘ ২৩ বৎসর কাল আমি তাঁহার মধ্যে যে মানুষটির পরিচয় পাইয়াছি তিনি সাধারণ মানব নহে.ন—অতিমানব।

দানশীল সোহরাওয়ার্দী

একজন দীপ্তিমান আইনজীবী হিসাবে জনাব সোহরাওয়ার্দী লক্ষ লক্ষ টাকা আয়

www.pathagar.com

করিতেন; কিন্তু আবার ব্যয়ও করিতেন দরাজ হস্তে। তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য চাহিতে আসিয়া কোনোদিনও কেহ খালি হাতে ফিরিয়া যাইতো না। তবে তাঁহার দানের বিরল বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, তিনি কোনো সময় অন্য কাহারও নিকট নিজের দানের কথা অথবা দানপ্রাপ্তদের কথা প্রকাশ করিতেন না। আমি জানি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বহু ছাত্র তাঁহার অর্থে লেখাপড়া শিখিত।

এ প্রসঙ্গে আমি আমার নেতার দানশীলতার একটি নজির উল্লেখ করিতেছি। আমাদের দলের অনেকেই জানেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী যখনই ঢাকা আসিতেন তখনই চল্লিশোর্ধ বয়সের জনৈক ব্যক্তি ঢাকা আসিয়া উপনীত হইতো এবং জনাব সোহরাওয়ার্দীর অবস্থানকালে সবসময় সে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচারক হিসাবে কাজ করিত। একদিন আমি ও জনাব সোহরাওয়ার্দী বাহিরে গেলাম। রুমে রাখিয়া গেলাম কেবলমাত্র সেই লোকটিকে। সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখা গেল জনাব সোহরাওয়ার্দীর তহবিলে ৩০০০ টাকা নাই। সেই লোকটিই যে এই কাজ করিয়াছে তাহা বুঝিতে আমাদের মোটেই কষ্ট হইলো না। জনাব সোহরাওয়ার্দীও তাহাতে নিঃসন্দেহ ছিলেন।

আমি থানায় টেলিফোন করিয়া লোকটিকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করিলাম। আমি চলিয়া যাওয়ার পর রাত্রে জনাব সোহরাওয়ার্দী থানায় টেলিফোন করিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার কোনোরূপ অভিযোগ নাই। সুতরাং পুলিশ লোকটিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলো।

পরেরদিন সকালে দেখা গেল লোকটি পূর্ববৎ জনাব সোহরাওয়ার্দীর সেবায় নিয়োজিত। আমি ও মানিক ভাই (ইত্তেফাক সম্পাদক) লোকটিকে চলিয়া যাইতে এবং কোনোদিনও আর সেখানে না আসিতে বলিলাম। তারপর হইতে লোকটি প্রত্যেকদিনই আমাদের অনুপস্থিতির সময়ে জনাব সোহরাওয়ার্দীর নিকট আসিত এবং প্রতিদিন জনাব সোহরাওয়ার্দী তাহাকে কিছু না কিছু টাকা দিতেন।

একদিন আমরা লোকটিকে জনাব সোহরাওয়ার্দীর নিকট দেখিয়া ফেলিলাম। সঙ্গে সঙ্গে জনাব সোহরাওয়ার্দী আমাদের শুনাইয়া তাহাকে আর না আসিতে বলিলেন। আমাদের খুশী করা ও নাজুক অবস্থা হইতে রেহাই পাওয়ার জন্যেই যে জনাব সোহরাওয়ার্দী লোকটিকে আর আসিতে নিষেধ করিলেন তাহা বুঝিতে আমাদের বাকি রহিলো না। ইহার পর একদিন ঐ লোকটির হাতেই জনাব সোহরাওয়ার্দীকে ৮০০ টাকা দিতে দেখিয়া আমি রীতিমত স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। আমার কিছু বলার আগেই জনাব সোহরাওয়ার্দী বলিতে শুরু করিলেন যে, গরীব লোকটির একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে তিনি তাহাকে এই শেষ দান করিলেন। ইহা জনাব সোহরাওয়ার্দীর জীবনের অনুরূপ শত শত ঘটনার মধ্যে একটি মাত্র।

দেশ বিভাগের পূর্বে আমি ঘটনাক্রমে একদিন নেতার ৪০, থিয়েটার রোডস্থ বাসভবনে একটি 'কালো খাতা' দেখিয়া ফেলিলাম। ঐ খাতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কতকগুলি পেনশনভোগী লোকের একটি তালিকা ছিলো। তাহাদের তিনি মাসিক সর্বমোট ৩০০০ টাকা পেনশন দিতেন। তালিকাভুক্ত এই লোকদের মধ্যে ছিলো জাতিধর্ম নির্বিশেষে পুরাতন চাকর-বাকর, নাপিত, শ্রমিক, কর্মী, কিছু সংখ্যক প্রবীণ লেখক ও রাজনৈতিক কর্মী। এই খাতাটি তিনি কোনোদিনও কাহাকেও দেখাইতেন না। আমার প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিলো বলিয়াই এই খাতাটি দেখার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

www.pathagar.com

অসংখ্যবার মফস্বল সফরের সময়ও আমি তাঁহাকে অনেক মানুষকে সাহায্য করিতে দেখিয়াছি। একথা বলার প্রয়োজন রাখে না যে, দেশ বিভাগের পূর্বে ও পরে নিজ দলের অধিকাংশ ব্যয়ই তিনি নিজে একাই বহন করিতেন ।

গুজরানওয়ালার জনসভা ব্যতীত জীবনে আর কোনো সময় কেহ তাঁহাকে শত শত্রুতার মুখেও কোনো কাজ হইতে বিরত করিতে পারে নাই। তিনি কোনো বিপদকেই গ্রাহ্য করিতেন না। শত্রুদল যত সুসংগঠিতই হউক না কেন, জনাব সোহরাওয়ার্দী কোনোদিনও তাঁহার নির্ধারিত জনসভায় বক্তৃতাদান হইতে পিছপা হইতেন না। বরং অসীম সাহসের সহিত তিনি পরিস্থিতি মোকাবিলা করিতেন এবং তাঁহার মোহনীয় বক্তৃতার মাধ্যমে যাদুমন্ত্রের ন্যায় শত্রুদেরকেও বশীভূত করিয়া ফেলিতেন।

কুচক্রীদের শিকার কেন হইলেন

জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁহার সারাজীবনে কোনোদিন রাজনীতিক বা জনসাধারণকে ধাপ্পা দিয়াছেন তাঁহার বিরুদ্ধে এমন অপবাদ তাঁহার শত্রুরাও দিতে পারিবে না। সম্ভবত এই কারণেই তিনি পাকিস্তানে রাজনৈতিক কুচক্রের শিকারে পরিণত হইয়াছেন। তিনি কোনোদিনও গুজগুজ রাজনীতি, গোপন কারসাজি, ধাপ্পাবাজী ও চক্রান্তে বিশ্বাস করিতেন না; তিনি কেবল আইনের অনুশাসনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রেই বিশ্বাস করিতেন। তিনি খোলাখুলি রাজনীতিতে বিশ্বাস করিতেন। তিনি কোনোদিনও কাহাকে মিথ্যা আশা দেন নাই। বরং কাহাকেও সাহায্য করার প্রয়োজন বোধ করিলে তিনি নির্ধারিত গণ্ডি অতিক্রম করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের খোঁজ-খবর ও কাজ-কর্মের তত্ত্ব-তালাশ করিতেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবেই কর্মীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন এবং তাহাদের পরিবারের খরচ প্রদান করিতেন। আমি কলিকাতা ও ঢাকা—এই উভয় স্থানেই তাঁহাকে কিছুসংখ্যক যক্ষ্মা আক্রান্ত রাজনৈতিক কর্মীর চিকিৎসা ও তাহাদের পরিবারের খরচা প্রদান করিতে দেখিয়াছি।

অদ্বিতীয়

পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে সম্ভবত তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি রাজপ্রাসাদ হইতে গরীবের কুটির পর্যন্ত সর্বত্র নিজকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিতেন। প্রয়োজনবোধে তিনি মাইলের পর মাইল পায়ে হাঁটিতে ও দিনের পর দিন ছোট্ট নৌকায় চলিতে পারিতেন। অনেক সময় মফস্বল সফরের সময় তাঁহাকে রাতদিন কিছু না খাইয়াই কাটাইতে দেখা গিয়াছে। তিনি কোনোদিনও ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশকে রাজনৈতিক, সামাজিক বা রিলিফ কাজের চাইতে বেশি গুরুত্ব দিতেন না। কাজই ছিলো জীবনে তাঁহার নিকট সবচেয়ে বড় জিনিস। এখানে আমি একটিমাত্র নজির উল্লেখ করিতে চাই।

১৯৪৫ সাল। আমাদিগকে সিন্দিয়াঘাট হইতে দেশী নৌকায় গোপালগঞ্জে যাইতে হইবে—দূরত্ব প্রায় বিশ মাইল। সঙ্গে আমাদের কোনোও খাবার দ্রব্য নাই। রাত্রেই আমাদের গোপালগঞ্জ পৌছার কথা। কারণ, সকালে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে জনমত যাচাই করিতে হইবে। আমাদের যাত্রাও শুরু হইয়াছে পূর্ব নির্ধারিত তারিখের এক দিন পরে। দলে আমরা প্রায় পনোরো জন কর্মী। তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্য মাঝিদের কেহ কেহ নৌকার গুণ টানিতেছিল আর বাকি

মাঝিদের লইয়া আমরা দাঁড় টানিতেছিলাম। সাতপার বাজারে (একটি ক্ষুদ্র গ্রাম্য বাজার) পৌঁছার পর জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী আমাদিগকে অল্পক্ষণের জন্য নৌকা থামাইতে বলিয়া নিজে নিচে নামিয়া গেলেন এবং নিজ হাতেই কিছু 'চিড়া ও খেজুরের গুড়' কিনিয়া আনিলেন। অথচ আমরা কেহ তাঁহাকে খাবার জিনিস কেনার কোনো কথা বলি নাই। তারপর তিনি মাঝি ও আমাদের মধ্যে ঐ চিড়া বিতরণ করিয়া দিলেন এবং নিজেও অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত উহা খাইলেন। ঐদিন সারারাত্র তিনি ও আমরা আর কোনো খাবারের মুখ দেখি নাই। অনুরূপ শত শত ঘটনার কথা আমার জানা আছে।

কাজের মানুষ সোহরাওয়ার্দী

কাজই ছিলো জনাব সোহরাওয়ার্দীর মূলমন্ত্র। কঠোর পরিশ্রম করাই ছিলো তাঁহার অভ্যাস। সাধারণত তিনি দৈনিক আঠারো হইতে বিশ ঘণ্টা খাটিতেন। জরুরী অবস্থার সময়ে সামান্য টিফিন খাইয়া তাঁহাকে দিবারাত্র বিনা নিদ্রাতেই কাজ করিতে দেখা যাইতো। এই সময় দিনের পর দিন তিনি দাড়ি কাটারও সময় পাইতেন না। যুক্ত বাংলার সরবরাহ মন্ত্রী এবং যুক্ত বাংলার ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আমি তাঁহাকে অনুরূপভাবেই খাটিতে দেখিয়াছি। সবচেয়ে বেশি জটিল প্রশাসনিক সমস্যাও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিতো না এবং তিনি মুহূর্তের মধ্যেই ঐ সকল সমস্যার সঠিক সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি ফাইল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ দেখিতেন, কোনোদিনও অন্ধের ন্যায় অফিসারদের নোটিং-এর ওপর 'ডিটো' মারিতেন না। তিনিই বাংলার প্রথম শ্রমমন্ত্রী যিনি শ্রমিকদের সর্বমুখী স্বার্থ সংরক্ষণে উপযোগী উন্নতমানের শ্রম আইন প্রবর্তন করেন। তাঁহার এই সকল আইন পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতে প্রচলিত হয়। ১৯৪২-৪৩ সালের সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর পরই জনাব সোহরাওয়ার্দী বাংলার খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় টাকা দিয়াও খাদ্য পাওয়া যাইতো না। বাংলার চাউলের বেশি অংশ আসিত বর্মা হইতে। সেই বর্মা জাপানী দখলে চলিয়া যাওয়ার ফলে পরিস্থিতি অধিকতর জটিল হইয়া পড়ে। একদিকে বৃটিশ সরকারের যুদ্ধ নীতির প্রত্যক্ষ ফল আন্তঃ জেলা কর্ডন প্রথা অপরদিকে স্যার আজিজুল হকের স্থলে সদ্য নিযুক্ত ভারতীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীনিবাসের অসহযোগিতামূলক মনোভাব জনাব সোহরাওয়ার্দীর খাদ্য সংগ্রহের পথে আরও প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইলো। সামরিক লোকজনের জন্য ইতিমধ্যেই বিপুল পরিমাণ খাদ্য গুদামজাত করা হইয়াছিল। জাহাজের অভাব ও বোমা ভীতির ফলে খাদ্য সংগ্রহ দুরূহ হইয়া উঠিলো। সামরিক কর্তৃপক্ষের 'ডিনায়েল পলিসি' অনুসারে সমগ্র প্রদেশের, বিশেষভাবে সীমান্ত অঞ্চলের সমস্ত দেশী নৌকা ও অন্যান্য যানবাহন হয় নষ্ট করা হইয়াছে নতুবা সৈন্যবাহিনীর জন্য রিকুইজিশন করা হইয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমার নেতা পরিস্থিতির নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন না; করার মতো লোকও তিনি ছিলেন না। তিনি কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে সরকারি গুদাম ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে বেসরকারি জনগণের জন্য খাদ্য দিতে বাধ্য করিলেন। আর নিজে শাসনতন্ত্রকে সংগঠন করিলেন, দেশব্যাপী রেশনশপ খুলিলেন, সর্বত্র খিচুড়িখানা চালু করিলেন ও অতিরিক্ত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিলেন। এইভাবে তিনি সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করিয়াছিলেন। তাঁহার চরম সমালোচকও স্বীকার করিবেন যে, জনাব

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দীর সুযোগ্য ও সুনিপুণ পরিচালনা না হইলে বাংলার সেই দুর্ভিক্ষে অনেক বেশি লোক প্রাণ হারাইতো।

নিয়মিতভাবে কলিকাতা ক্লাবে যাওয়া জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর একটি 'হবি' ছিলো। কিন্তু কাজের চাপে দুর্ভিক্ষের সময় দীর্ঘ ষোল মাসকালের মধ্যে তিনি একদিনও কলিকাতা ক্লাবে যান নাই। আমি কোনোদিন তাঁহাকে রাত্রি এগারোটার পূর্বে অফিস হইতে বাসায় ফিরিতে দেখি নাই। কোনো সময়ে আমরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিলেই তিনি বলিতেন, 'রাত্রিতে এসো তার আগে আমার সময় হবে না।'

১৯৪৬ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচন

আমি তাঁহাকে বিখ্যাত নাটোর ও বালুরঘাট উপনির্বাচনে কাজ করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার সংগ্রাম-নিপুণতাই ঐ সকল নির্বাচনে জয়লাভের কারণ। আমি তাঁহাকে পাকিস্তান ইস্যুতে অনুষ্ঠিত ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনেও কাজ করিতে দেখিয়াছি। এমন কোনো স্থান বা জায়গা ছিলো না যেখানে তিনি যান নাই। তিনি প্রদেশব্যাপী জনমত সংগঠন করেন এবং নির্বাচনী অভিযান এমনভাবে পরিচালিত করেন যাহাতে সর্বাধিক দক্ষতা হইতে সর্বাধিক ফল পাওয়া যায়। সমগ্র ভারতের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই 'মুসলিম লীগ' শতকরা ৯৭টি আসন লাভ করিয়াছিল। তাঁহার ঝটিকা সফর, কর্মী ও ছাত্রদের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সংযোগ ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে নিয়োগের ফলেই এই অভাবিতপূর্ব বিজয় সম্ভব হইয়াছিল।

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনকালে তিনি কিভাবে কাজ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের অনেকেরই জানা আছে। ঐ সময়ে তিনি যুক্তফ্রন্টের 'সিমসন' রোডস্থ অফিসে অবস্থান করিতেন। সেখানে তিনি একজন সাধারণ লোকের মতো খাটিয়ার ওপর রাত্রি যাপন করিতেন। সময় সময় হোটেল হইতে তাঁহার খাবার আসিতো। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আমি প্রধানমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারি জনাব এ. এ. শাহকে রাত্রি এগারোটার সময় ফাইলপত্র লইয়া জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাত্রি তিনটার সময় বাহির হইতে দেখিয়াছি।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশগুলিকে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দেওয়া হইলেও জনাব সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিত্বের সম্মুখে কিছুই দাঁড়াইতে পারিতো না। একবার কোনো এক বিভাগীয় সেক্রেটারি জনৈক সিনিয়র আই.সি.এস অফিসার কি 'নোট'সহ একটি ফাইল লইয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীর কাছে আসিলেন। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী উক্ত নোটগুলি, বিশেষভাবে 'নোটে'র ভাষা অনুমোদন করিলেন না এবং অনুরূপ নোট লেখার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসারকে তিরস্কার করিলেন। তিনি বিষয়টি গভর্নরের গোচরে আনিলেন এবং গভর্নর একদিন আলাপ প্রসঙ্গে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে বলিলেন যে, অফিসারটি শুধু সিনিয়র আই.সি.এস অফিসারই নহেন, অক্সফোর্ডের একজন এম.এ.ও।

উত্তরে জনাব সোহরাওয়ার্দী বলিলেন, 'আমিও অক্সফোর্ডের একজন এম.এ এবং প্রত্যেক ইংরেজ ভালো ইংরাজি জানে না।' ইহার পর গভর্নর বলার কিছু পাইলেন না।

কলিকাতার দাঙ্গা

প্রত্যক্ষ কর্ম-পন্থার পর কলিকাতা রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইলো। মুসলমানরা শহরের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ মাত্র এবং তাহাদের

www.pathagar.com

অধিকাংশ ছিলো বস্তিবাসী। পরিস্থিতির মোকাবিলার পক্ষে কলিকাতা পুলিশের শক্তি যথেষ্ট ছিলো না। তৎকালীন যুক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী জনৈক ইউরোপীয় অফিসারের নিকট হইতে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন এবং সেখানে বসিয়া দাঙ্গা দমনে সব ব্যবস্থা নিজেই পরিচালনা করেন। অসহায়দের রক্ষা করার জন্য যে তিনি স্বয়ং দাঙ্গা-পীড়িত এলাকায় দৌড়াইয়া গিয়াছিলেন, এমন নজির শত শত আছে। কেহ সাহায্য চাহিলে তাহাদের উদ্ধারের ব্যাপারে তিনি সাহায্যকারী পুলিশ পাঠান নাই এমন অভিযোগ কেহই করিতে পারিবেন না। এ ব্যাপারে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করিতেন না। এই প্রসঙ্গে আমি একটি ঘটনা বিবৃত করিতেছি।

একবার শত্রুভাবাপন্ন একদল মুসলমান কর্তৃক নারিকেলডাঙ্গা এলাকায় একটি হিন্দু মহল্লা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে। টেলিফোন কল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনাব সোহরাওয়ার্দী গাড়ি চালাইয়া ঘটনাস্থলে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সাধারণ বা সশস্ত্র রক্ষীদের কাহাকেও নিলেন না। তিনি উত্তেজিত মুসলমান জনতার সম্মুখীন হইলেন এবং তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ হইতে বাধ্য করিলেন। তারপর নিজে সেখানে থাকিয়া সমস্ত হিন্দু অধিবাসীকে অন্যত্র নিরাপদ স্থলে অপসারণের যাবতীয় ব্যবস্থা করিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ দাঙ্গায় নেতার ভূমিকা সম্পর্কে অমুসলমানদের মধ্যে আজও বিতর্কমূলক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।

একজন শাসন পরিচালক ও পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে তাঁহার যে অসীম দক্ষতা ছিলো তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পার্লামেন্টে তাঁহার বাচনভঙ্গি ছিলো অতি চমৎকার। শাসনযন্ত্রের সমস্ত সমস্যা ছিলো তাঁহার নখদর্পণে। ১৯৫৬ সালে আমরা যখন পূর্ব পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করি, তখন চাউলের মূল্য ছিলো মণ প্রতি ৭০ টাকা। এখানে সেখানে মানুষ না খাইয়া মরিতেছিল। সরকারি গুদামে খাদ্যদ্রব্য ছিলো না বলিলেই চলে। জনাব সোহরাওয়ার্দী কালবিলম্ব না করিয়া ভারত, বর্মা, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আনয়নের ব্যবস্থা করিলেন এবং সুদূর পল্লী অঞ্চলেও খাদ্যদ্রব্য পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য বিশেষ বিমান বহরের ব্যবস্থা করিলেন।

প্রদেশের সামগ্রিক খাদ্য নীতি ছিলো তাঁহারই পরিকল্পনাপ্রসূত। তিনি ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে হাজার হাজার লোক অনাহারে মারা যাইতো। তিনি ‘ টেস্ট রিলিফ’ কাজেরও উদ্যোগ গ্রহণ করিলেন এবং তজ্জন্য প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে কোটি কোটি টাকা প্রদান করিলেন। তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্বের কালে তিনি পাকিস্তানের উপেক্ষিত অঞ্চলসমূহের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া পূরণ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এই জন্যই কতিপয় শক্তিশালী আমলাতন্ত্রীসহ দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাঁহার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগে। তিনি যখন যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে দেশে সত্বর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখন কায়েমী স্বার্থবাদীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠে এবং তিনি প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ হইতে অপসারিত হন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত প্রধানমন্ত্রী জনাব ফিরোজ খান নূনকে মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের কোনো সদস্যের অন্তর্ভুক্তি ব্যতীতই কেবল ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে যুক্ত নির্বাচন প্রথায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের শর্তে সমর্থন দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলে পুনরায় সেই কায়েমী স্বার্থী মহলের অন্তর কাঁপিয়া ওঠে এবং তাঁহারা তৎপর হন। তাঁহারা দেশে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া

www.pathagar.com

সামরিক আইন জারি করেন। কেবলমাত্র তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলেই সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং কাহাকেও রাজনৈতিক কারণে নির্যাতিত করা হয় নাই। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সমান হারে উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বের অনেক জাতির মনেই পাকিস্তানের প্রতি শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্বের ভাব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট চীন, তারপরে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান সফরে যান। তিনি রাশিয়াসহ বিভিন্ন কমিউনিস্ট দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং চীন ও রাশিয়ায় পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অপর ব্লক অর্থাৎ আমেরিকার নেতৃত্বে পরিচালিত ব্লকের সহিতও বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে কম তৎপর ছিলেন না। তাঁহার আমন্ত্রণক্রমেই চীনের প্রধানমন্ত্রী মিস্টার চৌএন লাই পাকিস্তান সফরে আসেন। এভাবেই জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁহার বিঘোষিত পররাষ্ট্র নীতি 'সকলের সহিত বন্ধুত্ব এবং কাহারো প্রতি বৈরিতা নয়' এর বাস্তব রূপ দান করেন।

মুসলিম লীগ

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানরা পাকিস্তান চায় কিনা এই প্রশ্নের ভিত্তিতে ১৯৪৬ সালে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে একমাত্র বাংলা দেশেই মুসলিম লীগ শতকরা ৯৭টি মুসলিম আসন দখল করে। পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ অথবা বেলুচিস্তানের কোথাও মুসলিম লীগ সংখ্যাধিক্য আসন লাভ করিতে পারে নাই। যে ক্ষেত্রে সিন্ধুর মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ জন ছিলো মুসলমান সেখানে মুসলিম লীগ মাত্র একটি আসনের সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াছিল। বাংলার এই নির্বাচন-সাফল্যের কৃতিত্ব কাহার? একমাত্র জনাব সোহরাওয়ার্দীর সাংগঠনিক প্রতিভার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পাকিস্তানের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মুসলমান জনসাধারণকে সুসংগঠিত করিয়াছিলেন এবং একদল একনিষ্ঠ কর্মী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, যাহার ফলে এই যুদ্ধজয় সম্ভব হইয়াছিল। তিনি একেকটি সফরে কোনো বিশ্রাম গ্রহণ না করিয়াই পর্যায়ক্রমে ২৫/৩০টি জনসভায় বক্তৃতা করিতেন এবং এছাড়াও তিনি রাত্রে কর্মীসভায় বক্তৃতা করিতেন।

আওয়ামী লীগ

আমার পরিষ্কার মনে আছে, ১৯৫২ সালে আওয়ামী লীগ সংগঠনে বাহির হইয়া তিনি এক সফরে একাধারে ২৭টি সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, মাঝখানে তিনি একদিনের জন্যও বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই। তৎকালীন সরকার যে তাঁহার প্রতি কত বৈরীভাবাপন্ন ছিলো, জনাব সোহরাওয়ার্দীর নির্ধারিত বহু জনসভাস্থলে ১৪৪ ধারা জারি করা হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। তাঁহার অবিশ্বাস্য সাংগঠনিক দক্ষতাই ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের এবং ১৯৫৪ সনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ ছিলো।

দু'টি ঘটনা

১৯৫৪ সালে আমার পল্লীভবন হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে জনাব সোহরাওয়ার্দী এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। জনসভার শেষে আমরা পদব্রজে আমাদের বাড়ি যাই। তখন পথিমধ্যে আমাদিগকে একটি খাল অতিক্রম করিতে হয়। তখন উহা শুষ্ক ছিলো। শহীদ সাহেব আমাকে খালটির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, খালটিতে পানি না থাকায় মানুষকে অনেক দুর্ভোগ পোহাইতে হয়।

www.pathagar.com

১৯৫৭ সালে আমি যখন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্য, তখন একদিন হঠাৎ শহীদ সাহেব আমাকে বলিলেন, 'মুজিব ১৯৫৪ সালে তোমার বাড়ির কাছে আমি যে শুকনা খালটি দেখিয়াছি, তাহার তুমি কতদূর ঠিক করিয়াছো? তুমি এখন ক্ষমতাসীন। মানুষ কি এখনো পানির অভাবে কষ্ট পাইতেছে?'

আমি সানন্দে তাহাকে বলিলাম যে, আমি সেই খালটি পুনঃখননের ব্যবস্থা করাইয়াছি। ইহা শুনিয়া তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। ইহা হইতে বোঝা যায় তাঁহার স্মরণশক্তি কত প্রখর ছিলো এবং মানুষের কথা তিনি কত ভাবিতেন।

আর একটি ঘটনা। ১৯৪৫ সাল। আমরা প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি নিখিল ভারত মুসলিম কনভেনশনে যোগদানের জন্য দিল্লি যাইতেছিলাম। আমাদের জন্য স্পেশাল ট্রেন রিজার্ভ করা হইয়াছিল। আমাদের বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য স্টেশনে সমাগত পঞ্চাশ জনেরও বেশি ছাত্র টিকিটের প্রয়োজন নাই দেখিয়া আমাদের সংগে গাড়িতে উঠিয়া দিল্লি রওয়ানা দিলেন। দিল্লি পৌঁছার পর এই অতিরিক্ত লোকের থাকা-খাওয়া, আশ্রয়ের সমস্যা প্রকট হইয়া দেখা দিলো। পরনের কাপড়-চোপড় ছাড়া তাহাদের কাছে আর কিছুই ছিলো না। টাকা-পয়সার কথা তো না বলিলেই চলে। আমরা বিষয়টি জনাব সোহরাওয়ার্দীকে জানাইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মরহুম জনাব লিয়াকত আলী খানের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাহাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

কনভেনশনে জনাব সোহরাওয়ার্দী যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা আজও আমার কানে বাজে। কনভেনশন শেষে জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁহার দিল্লির কতিপয় বন্ধুর নিকট হইতে টাকা কর্জ করিয়া ছাত্রদের প্রত্যেককে কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের জন্য পঁচিশ টাকা করিয়া দেন। কর্মী ও ছাত্রদের স্থান যে জনাব সোহরাওয়ার্দীর অন্তরে কত উচ্চে ছিলো, এ ঘটনা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ধনীর দুলাল হইয়াও গরীবের বন্ধু

একটি কৃষ্টিবান ও ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও জনাব সোহরাওয়ার্দী এদেশের দরিদ্র জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের পশ্চাদপদ জনগণের স্বার্থে ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ ত্যাগ করিয়া রাজনীতিতে নামিয়া পড়েন। তবে সংখ্যাগুরু অমুসলিম সম্প্রদায়ের সহিত তিনি সর্বদা বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসায় আসিতে চেষ্টা করিতেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন সম্পর্কে পরলোকগত মিস্টার চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে জনাব সোহরাওয়ার্দী যে 'রাজনৈতিক বন্ধুত্ব' করিয়াছিলেন, তাহা এবং সোহরাওয়ার্দী-দাস চুক্তি আজও একটি গৌরবের বস্তু হিসাবে পরিগণিত। দেশবন্ধুর জীবিতকালে এই চুক্তি একবারও ভঙ্গ করা হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর মিস্টার সুভাষ চন্দ্র বসু ও জনাব সোহরাওয়ার্দী উহা রিনিউ করেন। ইহাই সোহরাওয়ার্দী-বোস চুক্তি নামে পরিচিত। প্রথমোক্ত চুক্তি অনুযায়ী দেশবন্ধু কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও শহীদ সাহেব ডেপুটি মেয়র হন। এই চুক্তি অনুসারেই প্রতি তিন বৎসরে একবারের জন্য কর্পোরেশনের মেয়র পদ মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত করা হয়।

তিনি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা প্রত্যাখ্যান করিয়া আসন সংরক্ষণের ভিত্তিতে যুক্ত নির্বাচন প্রথার নীতিতে প্রণীত 'নেহরু ফর্মুলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মরহুম মওলানা মহম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী ও ডাক্তার

www.pathagar.com

আনসারীসহ তৎকালীন আর অন্য কোনো মুসলিম নেতা নেহরু ফর্মুলার বিরোধিতা করেন নাই। সেদিন যদি জনাব সোহরাওয়ার্দী নেহরু ফর্মুলার বিরোধিতা না করিতেন আর যদি তাহা গৃহীত হইয়া যাইতো, তাহা হইলে উহা মুসলমানদের ভবিষ্যৎ তথা পাকিস্তান আন্দোলনের মূলেই কুঠারাঘাত করিত।

আবার তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি খণ্ডিত পাকিস্তানে খণ্ডিত বাংলার কুফল উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার ফলে উদ্ভব হইয়াছিল বৃহত্তর বাংলার 'সোহরাওয়ার্দী-বসু. চুক্তি (জনাব সোহরাওয়ার্দী ও মিস্টার শরৎচন্দ্র বসুর নামানুসারে)। এই পরিকল্পনার প্রতি কায়েদে আজমেরও আশীর্বাদ ছিলো, কিন্তু মিস্টার বল্লভ ভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে পরিচালিত চরমপন্থী-কংগ্রেস মহল এবং মিস্টার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ন্যায় সাম্প্রদায়িকতাবাদীগণ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করিতে দেন নাই।

দুঃখের বিষয়, জনাব সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক প্রতিবাদীরা পরিকল্পনাটিতে ভিন্ন উদ্দেশ্য আরোপ করিয়া উহা জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে মূলধন হিসাবে লাগাইতে এখনও চেষ্টা করেন। আমি নিশ্চিত যে, পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হইলে তাহা কত ভালো হইতো, জনগণ আজ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে। এই স্বল্পপরিসর জায়গায় পরিকল্পনাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব নহে। আমি শুধু এটুকুই বলিতে চাই যে, এই পরিকল্পনায় উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা ছাড়াও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতার বিধান ছিলো। সর্বোপরি বাংলা, আসাম এবং বিহার, উড়িষ্যার বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলগুলিকে লইয়া প্রস্তাবিত রাষ্ট্রটি গঠিত হইলে উহা সম্পদের দিক দিয়া বিশ্বের মধ্যে অন্যতম ধনী ও সম্পদশালী রাষ্ট্র হইতো।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অতি মানবীয় দক্ষতাকে অনেকেই ভয় করিতেন। সেইজন্যই অবিভক্ত ভারতে এবং পাকিস্তানে, বিশেষ করিয়া মুসলিম লীগ মহলের অনেকেই তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত ও তাঁহার বিরুদ্ধে সদা-সর্বদা চক্রান্তের খেলায় লিপ্ত ছিলেন। জনগণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগী নেতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জানাইবার মতো ভাষা আমার নাই। মৃত্যুকালে তিনি ব্যাংকে তেরো হাজার টাকা ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীদের ইহা শোধ করিতে হইবে। অথচ তিনি শুধুমাত্র আইন ব্যবসায়ের দ্বারাই অতি সহজে কোটি কোটি টাকার সম্পদ গড়িতে পারিতেন। যদি তাঁহার মতো এত বড় ব্যক্তিত্বশালী ও যোগ্যতাসম্পন্ন নেতা কোনো উন্নত দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি যুগের পর যুগ ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি যে এ দুর্ভাগা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন!

www.pathagar.com

একটি নক্ষত্রের পতন

মোস্তফা কামাল বার-এট-ল

আমাদের রাজনীতির আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন হয়েছে—রাজনীতিক ছাড়াও যাঁর অন্য বহু পরিচয় আছে এবং সকল পরিচয়েই যিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো ভাস্বর।

তাঁর আকস্মিক তিরোধানে গণতান্ত্রিক শিবিরের বিপুল ক্ষতি হলো, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তার চেয়েও বোধহয় বেশি ক্ষতি হলো একটি বর্ণালী ব্যক্তিত্বের অপসারণে, এমন একটি মানুষের দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য হওয়াতে। বিগত কয়েক যুগ থেকে যিনি এ উপমহাদেশের রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার খেলায় অন্যতম মহানায়কের ভূমিকা নিয়েছিলেন।

এদেশে সোহরাওয়ার্দীর মতো এমন বহুমুখী প্রতিভা ও যোগ্যতার সনদ নিয়ে খুব কম লোকই রাজনীতিতে নামেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতায় তিনি পৃথিবীর যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্যে সাদরে সম্মানিত হতেন। আইনজীবী হিসেবে তিনি একটি বিরল উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন। বড় রাজনীতিকেরা একবার আইন ব্যবসায় ত্যাগ করার পর আর সেখানে ফিরে আসার সুযোগ পাননি বা পেলেও পূর্ব গৌরবে ফিরে যেতে পারেননি। যাঁরা পেরেছেন, তাঁরা আবার রাজনীতিতে আগের মতো সাফল্য ও নিপুণতা বজায় রাখতে পারেননি। সোহরাওয়ার্দী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আইন ও রাজনীতি দু'টিতেই সমান পারদর্শিতা, সমান কৃতিত্ব ও সমান একনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। পৃথিবীর বহু আইনজ্ঞ রাজনীতিকের সাথে এখানেই তাঁর তফাৎ। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করলেন তার বহু আগে থেকেই দেশ তাঁকে এ উপমহাদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ হিসেবে স্বীকার করেছে, অথচ মৃত্যুকালেও রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী—পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা ছিলো পথিকৃতের। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দলমত নির্বিশেষে গণতন্ত্রকামী পাকিস্তানের মানুষ তাঁরই নেতৃত্বের প্রতীক্ষা করছিল। বর্তমান ও ভবিষ্যতের অল্পক্ষম ও স্বল্পক্ষম রাজনীতিকদের সামনে এমন বিরল যুগল কৃতিত্বের জীবন্ত কোনো দৃষ্টান্ত আপাতত আর সামনে রইলো না।

তারপর সোহরাওয়ার্দী বাগ্মীতা। এই গুণটি অধুনা রাজনীতিকদের ভেতর থেকে প্রায় লোপ পেতে বসেছে। অথচ সোহরাওয়ার্দীর যে সময় রাজনীতিকের জীবন শুরু, সে সময় বাংলা তথা ভারতে বাগ্মীতার স্বর্ণযুগ চলেছে। সেই যুগেই শেরে বাংলা, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ দিকপালের পাশে সোহরাওয়ার্দী নিজের উজ্জ্বল আসনটি অধিকার করে নেন। মোটামুটি পাক-ভারতের সব আইন পরিষদেই এখন বাগ্মীতার মান অতি নিম্নস্তরের। কিন্তু প্রাক-স্বাধীনতা যুগে বঙ্গীয় আইন পরিষদে বক্তৃতার মান ছিলো অত্যন্ত উঁচুতে এবং সেখানে সমবেত হিন্দু বাগ্মীতার মোকাবিলায় সোহরাওয়ার্দী যেভাবে

www.pathagar.com

বছরের পর বছর সতেজে বিভিন্ন সরকার পরিচালনা করেছেন, তা আজ ইতিমধ্যেই বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবীকালের মানুষ তাঁর বাগ্মীতার পরিচয় পাবে হয়তো আইন পরিষদের কীটদষ্ট কার্যবিবরণীতে; কিন্তু যে চলন্ত মানুষটি গভীর স্বরে স্তোত্রপাঠের গাম্ভীর্যে গর্জন করে উঠতেন, তাঁকে আর আমরা সামনে পাবো না।

সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত প্রবল ছিলো বলেই হয়তো তাঁর সাথে জড়িত সকল দলকেই ব্যক্তিসর্বস্ব বলে ভুল করা হয়ে থাকে। অথচ তাঁর রাজনীতির একটা সাধারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কোনো সময়ই তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বটুকু পুঁজি করে তিনি কোনো ব্যক্তিবাদী প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাননি। প্রাক বিভাগ আমলে মুসলিম লীগের আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি যেভাবে অসীম সাহসিকতার সাথে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছেন, তা শুধু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রসার ও স্বীকৃতির জন্যে নয়। সেখানে মুসলিম জনসাধারণের জন্যে একটি দরদী মন কাজ করে গিয়েছে। আবার, বিভাগের পর যখন তাঁকে গান্ধীজীর শিবিরে দেখা গেলো, তখন সেটাও তাঁর ব্যক্তিবাদী ভূমিকা নয়। ভারতে ঠিক সে সময়টিতে যাঁদের মুসলমান হিসেবে থাকার দুর্ভাগ্য হয়েছে, তাঁরা জানেন সোহরাওয়ার্দী মুসলিম জনসাধারণকে উন্মত্ত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই তাঁর প্রাক বিভাগ যুগের সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে গান্ধীজীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। কারণ, গান্ধীজী তাঁর সমস্ত কপটতা সত্ত্বেও সে সময়কার ভারতে ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি—যিনি সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিরুদ্ধে ভারতীয় সরকারের বিরুদ্ধতাতেও একাকী সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিতে কোনো মন্ত্রীপদ বা উচ্চ সম্মানের লোভে সোহরাওয়ার্দী গান্ধীজীর পাশে দাঁড়াননি। যাদের পরিত্যাগ করে আমাদের নেতা-উপনেতারা পাকিস্তানের মসনদে আসীন হলেন, সোহরাওয়ার্দী সেই ভারতীয় সংখ্যালঘু মুসলমানের নিরাপত্তায় বিচলিত হয়েই নিজের রাজনীতি জীবনকে ভারতে বিসর্জন দিলেন।

পাকিস্তানে বিরোধী দল গঠন করার ব্যাপারেও সোহরাওয়ার্দীর একটা আদর্শপ্রিয়তা ছিলো। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দল থাকার অর্থ হচ্ছে এই যে, সরকারি জোট কোনো সময়ই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পাবে না, কাজেই ক্ষমতার অপব্যবহারও চলবে না এবং নিয়মিত নির্বাচন হলে জনসাধারণ সব সময়ই তাদের মতামত ব্যালট ভোটে প্রকাশ করতে পারবে। তাতে কোথাও দীর্ঘদিন চাপা বিক্ষোভ জমা হয়ে থাকবে না—হত্যা, বিপ্লব, ষড়যন্ত্র, প্রাসাদ-কারসাজি ইত্যাদি অগণতান্ত্রিক প্রথায় ক্ষমতা দখলের কোনো স্পৃহা কারুর হবে না, যদি এই নিয়মতান্ত্রিক পথে সরকার পরিবর্তনের পথ খোলা থাকে। এমন একটি সময় যখন ধর্মগ্রন্থ, রাষ্ট্র, সরকার, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল ও একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে এক এবং অভিন্ন করে দেখা হতো, তখন এই রকম মতবাদ প্রচার করা ছিলো অসীম সাহসিকতার কাজ। তাঁকে এজন্য কি সব বিশেষণে বিভূষিত হতে হয়েছিল, কি কি অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল তা আজ ইতিহাসের অন্তর্গত। এরপরও তাঁর দল গঠনকে পুরোপুরি ব্যক্তিসর্বস্ব রাজনীতি হিসেবে ব্যাখ্যা দেয়া অন্যায়। একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, সোহরাওয়ার্দী অনেক সময় সংগ্রামের মধ্যপথে এসে পরিশ্রান্ত পথিকের মতো আপোষের ছায়াতলে বিশ্রাম নিয়েছেন; কিন্তু বারেবারেই আপোষের সুশীতল ছায়ায় এসে তিনি দেখতে পেয়েছেন ছায়া অপসারিত, ঊর্ধ্বে প্রজ্বলিত অগ্নিসূর্য।

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দীর মস্ত গুণ এই যে, বারংবার বেপথু হবার পরও তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি; তাই জীবনের প্রথম ও শেষ কারাবরণও তাঁকে পরাস্ত করতে পারেনি; মৃত্যুর আগে পর্যন্তও তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অজেয় সৈনিক।

তারপর তাঁর মানবিক গুণ, যেটি আজকালকার রাজনীতিকদের ভেতর একরকম অনুপস্থিত বলা যেতে পারে। সোহরাওয়ার্দী ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জনে উদ্যোগী হলে প্রচুর বিত্তবান হতে পারতেন। পারিবারিক উত্তরাধিকারেও তিনি বিত্তশালী থাকতে পারতেন। কিন্তু জীবনের সকল সঞ্চয়, সকল আহরণকে তিনি অকাতরে দলের জন্যে, কর্মীদের জন্যে অনাত্মীয় অপরিচিতদের জন্যে উজাড় করে গেছেন। বোধহয় এই কারণেই রাজনীতিক্ষেত্রে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী তাঁর সমর্থক তথা দেশবাসীর কাছ থেকে এমন নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য ও সেবা পেতেন যা অন্য বহু নেতার ভাগ্যে জোটেনি। মানুষ হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্বের কোনো একটি দিক এমনই মধুর ও আকর্ষণীয় ছিলো, যার জন্যে বহু ঝড়-ঝঞ্ঝাতেও তাঁর অনুগামী ও সমর্থকেরা তাঁকে পরিত্যাগ করেনি।

ক্ষমতাসীনের পিছনে কাতারবন্দী হওয়াটা এদেশে নেহাৎই বরাবরের ঘটনা, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; কিন্তু সোহরাওয়ার্দী যে সময় নিঃসন্দেহে ক্ষমতাচ্যুত এবং ক্ষমতালাভের আশাও যে সময় সুদূরপরাহত সে সময় তাঁর কর্মী, সমর্থক ও অনুরাগীরা যেভাবে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন তেমন সমর্থন পাকিস্তানের রাজনীতিতে কোনো ক্ষমতাহীন রাজনীতিক কোনোদিন পাননি।

সোহরাওয়ার্দী তুমুল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ভেতরেও সহজ বিশ্রাম নিতে পারতেন এটাও তাঁর এক মস্ত গুণ ছিলো। তাঁর একটানা পরিশ্রম করার ক্ষমতা সুবিদিত; অথচ তারই ফাঁকে ফাঁকে তিনি শরীর ও মনকে যেভাবে অবসাদমুক্ত করে আনতেন, সে রকম ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে। রাজনীতির জয় ও পরাজয়কে সমান নিরাসক্তভাবে গ্রহণ করারও একটি আশ্চর্য নৈর্ব্যক্তিক ক্ষমতা তাঁর ছিলো। মনকে তিনি রাজনীতি ছাড়াও আরও কিছু আমোদের ভেতর ছড়িয়ে দিতে পারতেন এবং সেসব আমোদের সত্যিকার রস গ্রহণ করতে পারতেন। বিপুল জনতা তাঁর বক্তৃতা শুনতে এসেছে, তিনি তাঁর গাম্ভীর্য বজায় রেখেই সেসব সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন, আবার তারই ফাঁকে ফাঁকে তাঁর একটি রসামোদী মনও কাজ করে গেছে। যে সভায় তিনিই সবার আর্কষণের বস্তু, সেখানে আসন পরিত্যাগ করে তিনি মুভি ক্যামেরায় জনসমাগমের ছবি তুলেছেন। অবসর সময়ে গান শুনেছেন, কবিতা আবৃত্তি করেছেন, রসালাপ করেছেন—এই নিরঙ্কুশ জীবনোপভোগের ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি আছে আমাদের ক'জন রাজনীতিকের?

সকল মানুষ ও প্রতিটি রাজনীতিকের মতো সোহরাওয়ার্দীর চরিত্রেও মহৎ গুণের সাথে অল্পবিস্তর ত্রুটির সংমিশ্রণ ঘটেছে, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই কীর্তিমান পুরুষকে জীবিতাবস্থায় এমন সব বিরূপ প্রচারণার সম্মুখীন হতে হয়েছে যা তাঁর চরিত্রের প্রতি কেনোমতেই আরোপ করা চলে না। এসব মিথ্যা ও ঈর্ষাপরায়ণ প্রচারণার সামনেও তিনি মনোবল হারাননি। স্পর্শকাতর রাজনীতিকের মতো দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণায় উত্তেজিত হয়ে কথায় কথায় মানহানির মামলা আনেননি। বিরুদ্ধ শিবিরের উদ্দেশ্যমূলক প্ররোচনা তিনি আশ্চর্য সহনশীলতায় স্তব্ধ করে গেছেন।

www.pathagar.com

জীবিতাবস্থায় যে লাঞ্ছনা ও অপমান সোহরাওয়ার্দীকে সহ্য করতে হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। তাঁর ব্যক্তিত্বকে অত্যাচারিতের মর্যাদা দিয়েছে, এতে তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি খর্ব হওয়া দূরে থাক, জীবনাবসানে এই উৎপীড়নগুলোই তাঁর শিরোপা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইতিহাসে সোহরাওয়ার্দী নিশ্চিত স্থান নিয়েছেন। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, ঈর্ষা বা রাজনৈতিক কারণে তাঁর ভূমিকাকে খর্ব করা যেতে পারে, কিন্তু মহাকালের বুকে তিনি অক্ষয় পদচিহ্ন রেখে গেছেন। যারা তাঁর কৃতিত্বকে অস্বীকার করেন তাদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিঃ 'আসলে আমরা সর্বদাই অক্ষম দুর্বলহীনের যা ধর্ম তাই অবলম্বন করি, সব বড়কেই সব মহৎকেই টেনে ধুলোয় নামিয়ে ধূলিসাৎ করলেই আমাদের আনন্দ, সবাইকে অবিশ্বাস্য ও হেয় প্রমাণ করতে পারলেই আমাদের উল্লাস। এই দুর্ভাগা দেশে কোনো দিক দিয়ে বড় যাঁরা হয়েছেন যেমন করে হোক তাঁদের ছোট প্রমাণ করতে না পারলে আমাদের স্বস্তি নেই।'

www.pathagar.com

বাংলার জাতীয় জাগরণ ও সোহ্‌রাওয়ার্দী

কামরুদ্দীন আহ্‌মদ

১৯১৯ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত বাংলার আইন পরিষদে 'হুইপিং বিলের' ওপর বিরোধী দলের সদস্য হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর বক্তৃতা আমাদের যুব ও ছাত্রসমাজে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। বৃটিশ সরকারকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া সেদিন তিনি বলিয়াছিলেন 'ভারতবাসী পশু নয়, তাহারা সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের মতোই মানুষ। তাহাদের দেহে ঠিক ততখানি বেদনাবোধ আছে যতখানি আছে ইংরেজের দেহে। দুনিয়ার যে কোনো সভ্য মানুষের আত্মসম্মানবোধের মতোই তাহাদেরও আত্মসম্মানবোধ আছে। শক্তির দম্ভে মত্ত হইয়া মনোনীত সরকারি সদস্যদের সাহায্যে সরকার যদি এই আইন পাস করিয়া লয় তবে তাহা হইবে মানবতাবিরোধী আইন। আমরা গোলাম নই। ইংরেজের পশুশক্তির নিকট পরাজিত হইয়া আজ আমরা পরাধীন হইয়াছি বটে কিন্তু সভ্যতার মাপকাঠিতে অতীতে আমরাও শ্রেষ্ঠতর ছিলাম বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।'

সোহ্‌রাওয়ার্দী পরিবারের প্রায় সকলেই সেইযুগে 'স্যার' উপাধি ভূষিত ছিলেন; কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দী ভিন্ন পথ বাছিয়া লইলেন। তিনি বৃটিশ কারখানায় তৈয়ারি নেতা হইতে চাহেন নাই। স্বীয় কর্মশক্তি ও সমাজসেবা দ্বারা জনগণের অন্তরে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

মানবতার সেবায়

১৯৩১ সালে। উত্তরবঙ্গের বন্যায় বহু লোকের বাড়ি–ঘর সব ভাসিয়া গিয়াছে। আমরা কলেজ হইতে বেশ কিছু ছাত্র বন্যার তাণ্ডব দেখিতে গিয়াছি আর সেখানেই শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে কাজ করিবার সৌভাগ্য আমাদের প্রথম। ভাষার বাধা কাটাইয়া এমনভাবে দুঃস্থ গ্রাম্য সাধারণ লোকের সঙ্গে তিনি মিশিয়া গেলেন, মনেই হইলো না যে, তিনি বাংলা জানেন না বা বাংলার গ্রাম-জীবনের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় অতি সামান্য।

তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমি

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার পর রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হই, কিন্তু মুসলিম সমাজে তখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি চলিতেছিল। অবশ্য তাহা ছিলো স্বাভাবিক। কারণ, পরাধীন দেশের লোকের রাজনীতির গণ্ডি সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য। তাদের পক্ষ হইতে বৃহৎ জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিবার মালিক বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসক সম্প্রদায়। সেই জন্যই দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া পরাধীন যুগের রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে বিরল। ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় তাহাদের স্বাধীনতার জন্য একটা জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল; কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতারা সে আন্দোলনে জাতিকে প্রবুদ্ধ করিতে পারেন নাই। কারণ, মুসলমানরা এই শিক্ষাই পাইয়াছিল যে, তাহারা শুধুই মুসলমান, সমস্ত দুনিয়াই তাহাদের দেশ, খাস করিয়া তাহাদের কোনো

www.pathagar.com

জন্মভূমি নাই, সুতরাং তাহার প্রতি কোনো দায়িত্বও তাহাদের নাই। জন্মভূমির আকাশ, বাতাস বা মাটির জন্য তাহাদের বিশেষ কোনো অনুভূতি ছিলো না। তুরস্কের সুলতানের জন্য খেলাফত আন্দোলন করিয়া কারাবরণ করিতে তাঁহারা পারিতেন; কিন্তু নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে চাহিতেন না। জাতীয়তাবাদের কোনো উন্মেষ বা চেতনা তাহাদের মধ্যে দেখা দেয় নাই। আলীগড় আন্দোলনের ভিত্তি হইলো বৃটিশের তাঁবেদারী ও হিন্দু বিরোধিতা। কে কাহার আগে নওয়াব, নাইট, খান বাহাদুর হইবেন কেবল তাহারই প্রতিযোগিতা। কারণ, এই খেতাবের ওপরই নির্ভর করিতো তাহাদের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা। ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল মৌলানা মোহাম্মদ আলী, জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও অন্য কয়েকজনের মধ্যে। গোড়াতে তাঁহাদের প্রত্যেকেই কংগ্রেসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচন

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বৃটিশরাজ ভারতের সঙ্গে একটা আপোষ-মীমাংসা করিবার জন্য গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন, যাহার ফলে ১৯৩৫ সালের ভারত-আইন বৃটিশ পার্লামেন্টে পাস হয়। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সেই আইনের বৈশিষ্ট্য। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে একটা সুষ্ঠু রাজনীতি গড়িয়া তোলা যায় কিনা, তাহার জন্য নেতারা সচেষ্ট হইলেন। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নেতাদের ঘন ঘন বৈঠক চলিতে লাগিলো। কিন্তু বাংলার মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইলো। স্যার নাজিমউদ্দিন ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। অন্যদিকে জনাব ফজলুল হক কৃষক-প্রজা পার্টি গঠন করিয়া নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করাইলেন।

নাজিমউদ্দিনের পরাজয়

স্বতন্ত্র প্রার্থী ছাড়া অন্য প্রার্থীরা হয় মুসলিম লীগ না হয় কৃষক-প্রজার মনোনয়ন লাভ করিয়া নির্বাচন অভিযানে নামিলেন। জনাব ফজলুল হক ঘোষণা করিলেন যে, লীগ নেতা স্যার নাজিমউদ্দিন বাংলার যেকোনো কেন্দ্রে দাঁড়াইবেন সেখানেই তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। সুতরাং সবচেয়ে নিরাপদ কেন্দ্র মুসলিম লীগ খুঁজিয়া পাইলেন বরিশাল জেলায় পটুয়াখালী কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি ছিলো স্যার নাজিমউদ্দিনের জমিদারিভুক্ত। জনাব ফজলুল হকও ঐ কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র দাখিল করিলেন। আমরা স্যার সলিমুল্লাহ হল হইতে বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র লইয়া পটুয়াখালী কেন্দ্রে উপস্থিত হইলাম। প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছুই হইলো না। ফজলুল হক বিপুল ভোটাধিক্যে নাজিমউদ্দিনকে পরাজিত করিলেন। মুসলিম লীগ দল চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইলো। এই অবস্থায় কি করিতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া সকলেই কলিকাতায় শহীদ সাহেবের বাড়ি উপস্থিত হইলেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলিকাতার দুইটি কেন্দ্র হইতেই নির্বাচনে জয়ী হইয়াছিলেন। তিনি নাজিমউদ্দিনের জন্য নিজের একটি আসন ছাড়িয়া ফজলুল হক সাহেবকে আহবান জানাইলেন নাজিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে প্রার্থী হইবার জন্য। অপরপক্ষ হইতে কোনো সাড়া না আসায় উপ-নির্বাচনে নাজিমউদ্দিনের জয় হইল। সোহরাওয়ার্দী যদি সেদিন পার্টির সম্মানের দিকে না চাহিতেন তবে স্যার নাজিমউদ্দিনকে চিরদিনের জন্য বাংলার রাজনীতি হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে হইতো এবং বাংলার মুসলিম

www.pathagar.com

লীগে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিতো না।

পটুয়াখালী কেন্দ্রে নাজিমউদ্দিনের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন যে, বাংলাদেশে রাজনীতি করিতে হইলে বা বাঙালির নেতৃত্ব করিতে হইলে বাংলা ভাষাকে ঘৃণা বা অবহেলা করিলে চলিবে না। পুরুষানুক্রমে বাংলার মাটিতে বাস করিবো অথচ বাংলা ভাষা শিখিব না, ইহা কখনো চলিতে পারে না। বাঙালির সঙ্গে বাংলা ভাষায় কথা না বলিয়া বাঙালির হৃদয়ে আসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যাঁহারা বাংলাদেশে উর্দু বা আরবী ভাষায় ইসলাম প্রচার বা শিক্ষা দিতে চান, তাঁহারা সেই যুগের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মতোই বাংলার বুক হইতে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিতে অবশ্যই সমর্থ হইবেন এবং তাহাই হইতে চলিয়াছে।

স্যার নাজিমউদ্দিনের পরাজয়ে তিনি এই শিক্ষাই গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, বাংলা তাঁহাকে শিখিতে হইবে, বাঙালির সঙ্গে বাংলায় কথা বলিতে হইবে, মনে-প্রাণে নিজেকে বাঙালি বলিয়া ভাবিতে হইবে এবং বাংলার মাটিকে ভালোবাসিতে হইবে। 'আমি মুসলমান এই কথা যেমন সত্য আমি বাঙালি তাহা আরও বড় সত্য। আমরা আরব মুল্লুক হইতে এই দেশে আসি নাই, এই দেশেই আমাদের জন্ম আর এই দেশের মাটিতেই আমাদের মিশিয়া যাইতে হইবে।' এই আদর্শায়িত উক্তি হইতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কোনোদিনই বিচ্যুত হন নাই।

বাংলার মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকার

১৯৩৬ সালে জনাব ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করিলেন এবং তাঁহার নেতৃত্বে বাংলায় মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হইলো। ১৯৪০ সনের ২৩শে মার্চ তারিখে সর্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগ অধিবেশনে জনাব ফজলুল হক পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব গ্রহণের পর হইতে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়। বাংলার মুসলিম সমাজ আলোর সন্ধান পায়। বাংলাদেশে পাকিস্তান আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। মূলত ইহার কোনো ধর্মীয় রূপ ছিলো না।

মুসলিম লীগ সংগঠনে শহীদ সোহরাওয়ার্দী

পাঁচ বছরের মধ্যেই জনাব ফজলুল হকের সঙ্গে জিন্নাহ সাহেবের মতবিরোধ আরম্ভ হয়—যাহার ফলে ফজলুল হক মুসলিম লীগ ত্যাগ করিয়া কংগ্রেস-হিন্দু মহাসভা-কৃষক প্রজা কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। মুসলিম লীগ পরিষদে বিরোধী দল হিসাবে কাজ করিতে থাকে। এই সময় শহীদ সাহেব বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়কে সুসংবদ্ধ করিবার জন্য বাংলার গ্রামে গ্রামে মাঠে মাঠে সভাসমিতি করিতে লাগিলেন।

ছাত্র ও যুবসমাজ তাঁহার সঙ্গে এই সংগঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ছাত্রদের ওপর পুলিশ ও সরকারের ভাড়াটিয়া গুন্ডাদের অত্যাচার আরম্ভ হয়। একটি ঘটনা মনে পড়ে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কুমিল্লা সফরকালে মুসলিম ছাত্র সম্প্রদায় তাঁহাকে কালো নিশান দেখাইবার জন্য স্টেশনে সমবেত হয়। পুলিশের বাধানিষেধ গ্রাহ্য না করায় পুলিশ লাঠিচার্জ করে। তাহাতে বহু ছাত্র ভীষণভাবে আহত হয় এবং শতাধিক ছাত্র গ্রেফতার হয়। জনাব জাকির হোসেন তখন কুমিল্লার পুলিশ সুপার। মুসলিম অফিসারের কাছে সুবিচার পাওয়া যাইবে এই ভরসায় আমি এবং জনাব বদরুদ্দীন সিদ্দিকী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ঢাকা হইতে কুমিল্লা যাই। বিচার পাওয়া দূরের কথা কোনো সহানুভূতিও তিনি

www.pathagar.com

দেখান নাই। বরঞ্চ পাকিস্তান আন্দোলনকে একটা হাস্যাস্পদ প্রয়াস বলিয়া অভিহিত করেন।

শহীদ সাহেবের নিকটে এই ঘটনার উল্লেখ করিলে তিনি আমাদের বলিলেন যে, সরকারি কর্মচারিদের নিকট হইতে আমরা ইহার বেশি কিছু আশা করিতে পারি না। তাহারা কেবল টাকা ও চাকুরির উন্নতি ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। অন্তর যাহাদের শুষ্ক মরুভূমি হইয়া গিয়াছে, মানুষের প্রতি সহানুভূতি তাহাদের কাছে আশা করা বৃথা। কূপমণ্ডুকের পক্ষে বৃহত্তর জীবন সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব নয়। সরকারি কর্মচারিরা একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত। তাহাদের কোনো ধর্মাধর্ম নাই। তাহারা যখন যাহার চাকুরি করে তখন তাহারই জয়গান গায়।

প্রায় তিন বৎসর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বাংলার মুসলিম লীগ অত্যন্ত শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। মুসলমান জনসাধারণের চাপে ফজলুল হকের সরকারি দল হইতে মুসলিম সদস্যরা একে একে মুসলিম লীগে যোগদান করিতে থাকেন। ফলে ফজলুল হককে পদত্যাগ করিতে হয়।

মুসলিম লীগ সরকার ও পঞ্চাশের মন্বন্তর

ফজলুল হকের পদত্যাগের পর স্যার নাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে বাংলায় মুসলিম লীগ সরকার গঠিত হয়। বাংলাদেশের ওপর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়িয়াছে, জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় বৃটিশরাজ বাংলার খাদ্যশস্য বিহারে পাচার করিয়া দিয়াছে, বার্মা জাপানীদের অধীনে যাওয়ার ফলে চাউল আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খাদ্যশস্যের যোগাড় হইলেও তাহা গ্রামে পৌঁছানো সম্ভব ছিলো না, কারণ জাপানীদের ভয়ে সমস্ত নৌকা ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে—রেলে ও জাহাজে কেবল গোরা সৈন্যের ভিড়—যুদ্ধের প্রয়োজনে এইসব যানবাহন লাগান হইয়াছে। মন্ত্রিত্ব গঠনের দুইদিন পরে কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে শহীদ সোহরাওয়ার্দী একটি মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'দুর্ভিক্ষ বাংলার ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাকে রোধ করিবার কোনো উপায় নাই। লক্ষ লক্ষ লোক, বিশেষ করিয়া গ্রামে যাহারা বাস করে তাহাদের বাঁচানো সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আমরা ওয়াদা করিতেছি যে, আমাদের সাধ্যানুসারে কর্তব্য করিয়া যাইব। আল্লার মেহেরবানীতে কোটি কোটি লোককে বাঁচাইতে পারিব বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ওপর ভরসা করিয়া আমরা মন্ত্রিসভা গঠন করিতে রাজি হইয়াছি এবং আমি নিজে খাদ্য দপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়াছি। আমরা আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করি।'

এই সময় শহীদ সাহেব দৈনিক আঠারো হইতে বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত পরিশ্রম করিতেন। চাউল ও আটা যাহাতে ঠিকমতো সরবরাহ হয়, তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিয়াছেন আবার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লঙ্গরখানা পরিদর্শন করিতেছেন। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এমনকি মুসলিম লীগের কতিপয় নেতা এই ভয়ানক দুর্ভিক্ষকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে শহীদ সাহেবের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছেন। মানুষের এই চরম দুর্দিনে তাঁহারা কালোবাজারি ও মুনাফাখোরিদের প্রশ্রয় দিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোনো কিছু ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহার কর্তব্য করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে লন্ডনে তাঁহার প্রিয় পুত্রের মৃত্যু

www.pathagar.com

হয়—কিন্তু তাহাতে কেহ তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখেন নাই। তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে যেভাবে রেশন প্রথা চালু করেন এবং বেসামরিক সরবরাহ বিভাগটি গঠন করেন তাহাতে অভিজ্ঞ ইংরেজ সিভিলিয়ানরাও বিস্মিত হইয়াছিলেন।

পাকিস্তানের সংগ্রামে শহীদ সোহরাওয়ার্দী

১৯৪৫ সালে। পাকিস্তান ইস্যুর ওপর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সেক্রেটারি করিয়া বাংলার মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠিত হয়। জনাব এ.কে. ফজলুল হক, ঢাকার নবাব বাহাদুর, কৃষক-প্রজা ও কংগ্রেসের নেতা ও উপনেতারা এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীদের বিরোধিতা করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী ও জনাব আবুল হাশিম বাংলার মাঠে-ঘাটে উল্কার মতো ছুটিয়া বেড়াইতে থাকেন। প্রতি জেলায় নির্বাচন অফিস খোলা হইলো এবং প্রত্যেক জেলার শ্রেষ্ঠ কর্মীকে এই অফিসের ভার দেওয়া হইলো। প্রতি রাত্রে শহীদ সাহেব টেলিফোনে এইসব জেলা অফিসের নিকট হইতে রিপোর্ট গ্রহণ করিতেন এবং উপদেশ দিয়া যাইতেন। গভীর রাতেও তাঁহার কাছ হইতে আমরা টেলিফোন পাইয়াছি।

ঢাকা-ময়মনসিংহ কেন্দ্র হইতে মুসলিম লীগ মনোনয়ন দিয়াছে মৌলভী তমিজউদ্দিন খানকে অথচ এই দুই জেলার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ কোনো রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিলো না। তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন রাজনীতিতে সুপরিচিত স্যার আবদুল হালিম গজনবী। গজনবী সাহেব ময়মনসিংহ জেলারই একজন জমিদার। আমি ও ময়মনসিংহ জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মী জনাব শামসুল হক দুইজনেই কিছু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। জনাব ফজলুর রহমানকে সঙ্গে করিয়া যখন তমিজউদ্দিন সাহেব ঢাকায় আমাদের অফিসে আসিলেন তখন দেখিলাম তিনি আমাদের চেয়েও বেশি ভীত এবং সন্ত্রস্ত। আমি তাঁহাকে ময়মনসিংহ যাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম—কারণ সেখানেই ভোটার সংখ্যা বেশি।

তমিজুদ্দীন সাহেব যেদিন চলিয়া গেলেন সেইদিন রাত্রে শহীদ সাহেব টেলিফোন করিয়া আমাকে জানাইলেন যে, জনাব ফজলুল হক ও ঢাকার নবাব বাহাদুরকে সঙ্গে লইয়া স্যার আব্দুল হালিম পরের দিন ঢাকা পৌঁছিবেন,—নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে যেন তাঁহাদিগকে বিরূপ সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। এমন বিরাট আয়োজন করিতে হইবে যেন তাঁহারা ঢাকার নির্বাচন অভিযান বাতিল করিতে বাধ্য হন। শত শত কর্মীরা সারারাত ঘুরিয়া হাজার হাজার কালো নিশান তৈয়ার করিলো এবং পরদিন চাষাড়া স্টেশন হইতে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত কেবল কালো নিশান দেখা গেল। যাহা আশা করা গিয়াছিল তাহাই হইলো। স্যার আব্দুল হালিম আর সাহস করিয়া ঢাকা জেলায় পদার্পণ করেন নাই।

হিন্দু-মুসলমানের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা

সাধারণ নির্বাচনে আমাদের জয়-জয়কার হইলো। আমরা বাংলাদেশে মুসলিম আসনের শতকরা ৯৭টি আসন দখল করিলাম—যাহা ভারতের আর কোনো প্রদেশেই করা সম্ভবপর হইলো না। একমাত্র বাংলায়ই মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সমর্থ হইলো। ভারতের ইতিহাস দ্রুত পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিলো। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস প্রতিপালিত হইবে। কিন্তু ১৬ই তারিখে কলিকাতায় ও তাহার তিনদিন পরে ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ হইল। কলিকাতা শহরে শতকরা ১৫ জন মুসলমান আর

www.pathagar.com

ঢাকায় শতকরা ৩৫ জন মুসলমান। শহরে হিন্দুরা বরাবরই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো, তাই মুসলমানদের ওপর অত্যাচার হইলো বেশি। সারা ভারতে আগুন জ্বলিয়া উঠিলো। বিহার হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারতে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি-সংযোগ চলিতে লাগিলো। উত্তর ভারতে সংখ্যায় মুসলমানরা ছিলো অত্যন্ত কম, সুতরাং তাহারা পালাইবার পথ পাইলো না।

লর্ড ওয়াভেল কলিকাতায় আসিলেন—মেডিকেল কলেজের সম্মুখে তাঁহার বিরূপ সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হইলো—ফেস্টুনে, পোস্টারে রাস্তাঘাট ছাইয়া গেল—লালকালিতে লেখা 'ভারতের মাটি রক্তে রাঙ্গা করিয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম করা যাইবে না', 'হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার জন্য দায়ী—লর্ড ওয়াভেল', শ্লোগান চলিলো, 'ওয়াভেল ফিরিয়া যাও।'

লর্ড ওয়াভেল ঢাকায় আসিলেন—আমরা পাঁচজন পূর্ববঙ্গের মুসলমানের পক্ষ হইতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া একই সুরের পুনরাবৃত্তি করিলাম।

লর্ড ওয়াভেল শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে জানিতে চাহিলেন যে, তাঁহাকে (লর্ড ওয়াভেলকে) কিভাবে এই দাঙ্গার জন্য দায়ী করা হইতেছে?

শহীদ সাহেব তাঁহাকে বুঝাইতে সমর্থ হইলেন যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মুসলিম লীগের প্রতিনিধি না থাকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর চরম অত্যাচার চলিতেছে এবং সকলেই মনে করে যে, কেবল কংগ্রেসের হস্তে সকল ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যই ছিলো হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করা। এই দাঙ্গা তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

লর্ড ওয়াভেল শহীদ সাহেবকে একটা সমঝোতায় পৌঁছিতে সাহায্য করিতে বলেন। শহীদ সাহেব তখন কয়েকবার দিল্লি ও বোম্বাই যাতায়াত করিয়া কায়েদে আজম ও লর্ড ওয়াভেলকে একটা আপোষ-মীমাংসায় পৌঁছাইতে সক্ষম হন। মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করে।

শান্তির দূত শহীদ সোহরাওয়ার্দী

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস। ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা আগত। চারিদিকে চলিয়াছে আজাদী উৎসবের প্রস্তুতি। কিন্তু দুই দেশের কোটি কোটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রাণভয়ে ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করিতেছে। ভারত ও পাকিস্তানের রাজধানীতে আনন্দ উৎসব। কিন্তু দিল্লিতে গান্ধীজী নাই আর করাচীতে নাই শহীদ সোহরাওয়ার্দী; অথচ দুইটি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বোধহয় এই দুইজনের দানই সবচেয়ে বেশি। গান্ধী ও সোহরাওয়ার্দী সেইদিন কলিকাতার বেলেঘাটায় একটি দরিদ্র মুসলিম বস্তিতে সময় গনিতেছেন। উগ্রপন্থী হিন্দুরা শহীদ সাহেবকে হত্যা করিবার জন্য বস্তির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর ভিতরে গান্ধীজীর প্রার্থনা চলিতেছে ঃ

'পশুপতি রাঘব রাজারাম
সবকো সম্মতি দে ভগবান।'

স্বাধীনতা আসিল বটে, কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে যে পশুত্ব জাগিয়া উঠিয়াছিল—তাহা শীঘ্র কমিলো না। শহীদ সাহেব সাম্প্রদায়িক শান্তির জন্য প্রচার চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ দুই দেশ হইতেই তাঁহার ওপর হামলা চলিতে লাগিলো—কখন যে প্রাণ হারাইবেন, কেহ জানে না। আমরা তাঁহাকে ধরিয়া পড়িলাম,

www.pathagar.com

বলিলাম, 'আপনার কথা কে শুনিতেছে? আপনি ক্রমাগত মৃত্যুর মুখে চলিয়া যাইতেছেন।' তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিলেন ঃ

'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস;
বিদায় নেবার আগে তাই
সকলেরে ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।'

আমরা আর কিছু বলি নাই। তিনি তৃতীয়বার যখন শান্তি-মিশন লইয়া ঢাকা আসেন তখন পূর্ববঙ্গ সরকার তাহার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং তাহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হয়। পাকিস্তানের স্রষ্টা যিনি, পাকিস্তানের কথা বলিবার অধিকার তাঁহার নাই-ভাগ্যের পরিহাস ছাড়া ইহাকে আর কি বলা যায়! স্বাধীন ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নিরাপত্তা ছিলো না, আর স্বাধীন পাকিস্তানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথা বলিবার অধিকার ছিলো না। কিন্তু শহীদ সাহেব এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে কৃতসংকল্প হইয়াই ভারত ছাড়িয়া পাকিস্তানের অধিবাসী হইলেন।

তাহার পরবর্তী ইতিহাস সকলেরই জানা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নির্ভীকতাই তাঁহার আমানত

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আন্তর্জাতিক শহর বৈরুতে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কেহই তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন না। তাঁহার এভাবে মৃত্যুবরণ একদিকে মর্মান্তিক অন্যদিকে তাঁহার জীবন-দর্শনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন একজন বিশ্বনেতা। তিনি কোনো দেশবিশেষের নেতা ছিলেন না; সমগ্র বিশ্বই ছিলো তাঁহার দাবিদার। ১৯৩৭ সালের পূর্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কোনো সুযোগ আমার হয় নাই। তবে আমি তাঁহাকে পরলোকগত চিত্তরঞ্জন দাসের একজন সহকর্মী হিসাবে জানিতাম। আমি তাঁহাকে আরও জানিতাম কলিকাতা শহরের নির্যাতিত শ্রমিকদের অবস্থা-উন্নয়নের সংগ্রামে আত্মনিয়োগকারী একজন কর্মী হিসাবে। ইহা হইতেই মানুষটির পরিচয় ফুটিয়া ওঠে।

১৯৩৭ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আমিও সেইবার ত্রিপুরা জেলা হইতে একই পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হই। পরিষদে সেইবার সরকার পক্ষ ও বিপক্ষে অনেক প্রতিভাবান লোকের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। একজন তার্কিক, পার্লামেন্টারিয়ান ও বাগ্মী হিসাবে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। পরলোকগত তুলসিচরণ গোস্বামী, শরৎচন্দ্র বসু, ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, প্রমথনাথ ব্যানার্জী ও নলিনাক্ষ সান্যাল প্রমুখ বাগ্মীর সহিত তুলনীয় সরকারি দলে তিনিই ছিলেন একমাত্র লোক। সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন একটি প্রতিভা। এমন কোনো বিষয়ই ছিলো না—যাহার জবাব তিনি দিতে পারিতেন না। একটি বনেদী পরিবারে লালিত পালিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সকল বক্তৃতায় লক্ষ—কোটি নিপীড়িত দারিদ্র্যেরই মনের কথা ফুটিয়া উঠিত।

জমিদারদের নিপীড়ন হইতে রক্ষার জন্য প্রজাসাধারণকে অধিকার দিয়া সেই পরিষদে অনেক আইন পাস হইয়াছিল। মহাজনদের কবল হইতে দরিদ্র খতিবদের রক্ষাকল্পেও সেই পরিষদে আইন পাস হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দীই মহাজনী আইনের বিলটি পরিষদে উত্থাপন করিয়াছিলেন। এ প্রসঙ্গে আমি একটি ব্যক্তিগত বিষয়ের অবতারণা না করিয়া পারি না। ১৯৩৭ সালের বাজেট অধিবেশনেই আমি পার্লামেন্টারি জীবনের প্রথম বক্তৃতা দেই এবং এই বক্তৃতার জন্য তিনিই একমাত্র লোক—যিনি আমাকে অভিনন্দন জানাইতে আগাইয়া আসিয়াছিলেন। এ ঘটনাটি আমি আজও সগৌরবে স্মরণ করি।

একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, পাকিস্তান ইস্যুর ভিত্তিতে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনী সংগ্রাম পরিচালিত হয় এবং তাঁহারই সাংগঠনিক ক্ষমতাবলে মুসলিম লীগ প্রায় সব কয়টি মুসলিম

www.pathagar.com

আসন অধিকারে সমর্থ হয়। ১৯৩৭ সালে এই অভিযান শুরু হয় এবং তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়া মুসলিম লীগ সংগঠন করেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন মহান। তাই নিজেকে অন্যের দ্বারা ভুল বোঝার ঝুঁকি নিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টের সেই মর্মান্তিক ও অমানুষিক ঘটনাবলীর জন্য হিন্দু-সাধারণ তাঁহার অনেক সমালোচনাই করিয়াছে। সেইদিন কলিকাতা শহরে যে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব ঘটিয়াছে আমি তাহার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। এইসব ঘটনার জন্য যে কে দায়ী তাহা বিতর্কের বিষয়। ১৯৪৭ সালে কলিকাতার বুকে আসন্ন মহাদুর্যোগ নিরসনে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন আমি তাহা উল্লেখ না করিয়া পারি না। ইহা হইতেই সত্যিকারের মানুষটি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

আজাদী লাভের পর পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের নেতা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। তিনি নির্বাচিত হন নাই; নির্বাচিত হইয়াছিলেন খাজা নাজিমউদ্দিন। কিন্তু সেইদিন যদি জনাব সোহরাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে নেতা নির্বাচিত হইতেন তাহা হইলে পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসই ভিন্নরূপ হইতো।

আজাদী অর্জনের পরই মুসলিম লীগের প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করিলেন। ঠিক একইভাবে কংগ্রেসের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে বলিয়া মহাত্মা গান্ধী মনে করিলেন। তাই গান্ধী কংগ্রেস এবং জনাব সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগ ভাঙিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করেন।

তাঁহাদের মতে আজাদী অর্জনই ছিলো এইসব প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য। আর আজাদী উত্তর দেশের লক্ষ্য হইলো জনগণকে অভাব-অনটন ও রোগ-শোক মুক্ত করিয়া জাতির জন্য অর্থনৈতিক আজাদী বিধান করা। এইজন্য সহকর্মীরা তাঁহাকে ভুল বুঝিলেন এবং তাঁহার গণপরিষদ সদস্যপদ খারিজ করিয়া দিলেন।

নিরুৎসাহ হওয়ার পাত্র তিনি নন। তিনি কাজ করিয়া চলিলেন এবং সাফল্যের সহিত আওয়ামী লীগের ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন।

জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন একাধারে একজন অসাধারণ বাগ্মী, পার্লামেন্টারিয়ান, রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনৈতিক দ্রষ্টা। তাছাড়া তিনি ছিলেন দীপ্তিমান আইনজীবী ও আইনজ্ঞ। নির্ভীকতাই তাঁহার আমানত।

www.pathagar.com

সোহ্‌রাওয়ার্দীর তিরোধানে

এম এ খুরো

বর্তমান সঙ্কটজনক মুহূর্তে এই নশ্বর দুনিয়া হইতে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আকস্মিক তিরোধানে আমাদের দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। ১৯৪২ সাল হইতে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে জানার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। মরহুম কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার গতিশীল নেতৃত্বে সেই সময় মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি অর্থাৎ পাকিস্তানের পক্ষে যৌথ দাবি তুলিবার জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমানদিগকে সুসংগঠিত করিতেছিল। মরহুম জনাব সোহরাওয়ার্দী বাংলার মুসলমানদিগকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পতাকাতলে ও মরহুম কায়েদে আজমের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ করার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৪৬ সালের কুখ্যাত কলিকাতার দাঙ্গার সময়ে দরিদ্র ও নিরপরাধ মুসলমানদের নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেন ইতিহাসে চিরদিন তাহা ভাস্বর হইয়া থাকিবে। এই বিরাট বিপর্যয়ের সময় তাঁহার খেদমতের কথা উপমহাদেশের মুসলমানরা কোনোদিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্য তিনি ছিলেন শক্তির স্তম্ভস্বরূপ। ১৯৪৩ হইতে ১৯৪৭ সালের মধ্যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ও উহার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কমিটির বৈঠক উপলক্ষে আমাকে প্রায়শই দিল্লি ও বোম্বাইয়ে যাইতে হইতো। সেখানে প্রায়শই তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইতো।

জনাব সোহরাওয়ার্দী অদম্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন যে, ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ। তাছাড়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রয়োজনের সময় বাংলার মুসলমানদের খেদমতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করেন নাই। নিখিল ভারত মুসলিম লীগকে সমর্থন ও সংগঠনের ব্যাপারে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি যখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন প্রদেশে মুসলমানরা নামেমাত্র (শতকরা ৫ ভাগ) সংখ্যাগুরু ছিলো। কাজেই ব্যবস্থা পরিষদেও তাহাদের নামমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলো। এতদসত্ত্বেও তিনি নির্ভয়ে এবং সাহসিকতার সঙ্গে কর্তব্য করিতেন। তিনি একজন শক্তিশালী বক্তা ছিলেন। ব্যবস্থা পরিষদ ও বাইরের সভাসমূহে তাঁহাকে একজন শীর্ষস্থানীয় বক্তা বলিয়া গণ্য করা হইতো। গণপরিষদ এবং পরে জাতীয় পরিষদে সব সময় মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করা হইতো। তিনি বিরোধী দলের সর্বাপেক্ষা সমর্থ ও সাফল্যমণ্ডিত নেতা ছিলেন। বিরোধী দলকে যখন তিনি পরিচালনা করেন তখনই তাঁহার কর্মক্ষমতার সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় পাওয়া যায়।

দেশে একটি কার্যকরী ও সম্মিলিত বিরোধী দল গঠনের ব্যাপারে তাঁহার প্রয়োজন পূর্বাপেক্ষা বর্তমানে অনেক বেশি ছিলো। কার্যকরী বিরোধী দল না থাকিলে গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করিতে পারে না এবং জনগণের স্বার্থেরও যথাযথ নিরাপত্তা বিধান করা যায় না। কার্যকরী বিরোধী দলের মতামত দেশের ক্ষমতাসীন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কখনও উপেক্ষা করিতে পারে না।

কিন্তু আল্লাহতায়ালার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে এবং নশ্বর মানুষকে তাহা ধৈর্যের সাথে মানিয়া লইতে হইবে।

সবার মতো আমিও প্রার্থনা করি তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক।

www.pathagar.com

সোহ্‌রাওয়ার্দী স্মরণে

বেগম রোকাইয়া আনোয়ার

জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে আজ পাকিস্তানের এবং বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের আকাশে-বাতাসে এক দারুণ অভাবের ও বেদনার সুর ধ্বনিত হচ্ছে। এই অভাব শীঘ্র মোচনের নয়। এই বেদনার সুর বাজতে থাকবে অনেকদিন, অনেক বছর ধরে। যাঁদের মধ্যে সামান্যতম রাজনৈতিক চেতনাবোধ আছে, তাঁরা সবাই আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন যে, শহীদ সাহেবের মৃত্যুর ফলে এদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। একথা আজ স্পষ্টরূপে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, সমগ্র পাকিস্তানে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতার আখ্যায় ভূষিত ছিলেন। আজ তাঁর তিরোধানের পর গণতান্ত্রিক আন্দোলন থমকে দাঁড়িয়েছে। কারণ, আজকে এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যাঁকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানবাসী সমভাবে গ্রহণ করতে পারে। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি পৃথিবীর সর্বত্রই পরিচিত ছিলেন; কিন্তু তাঁর চরিত্রের আরও একটা দিক ছিলো, সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের দরদী বন্ধু সোহ্‌রাওয়ার্দী ।

আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিলো বহুকাল থেকেই। আমার শৈশবকালে কয়েকবার তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। কারণ, সেই সময় আমার আব্বার সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্যতা ছিলো। সেই সময়কার ঘটনাগুলো খুব পরিষ্কার মনে না থাকলেও স্মৃতির পাতায় যে ধোঁয়াচ্ছন্ন চিত্রের প্রকাশ ঘটে, তাতেই ছোটখাট দু'একটি ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

সঠিক বলতে না পারলেও খুব সম্ভব সেটা ১৯৩৩-৩৪ সালের ঘটনা। সিরাজগঞ্জের সম্পূর্ণটাই বন্যায় ডুবে রয়েছে। সেই দুর্দিনে গরীবের দরদী শহীদ সাহেব খেলাফত কমিটির পক্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণে কাপড়-কম্বল, চাল-ডাল প্রভৃতি সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলেন বন্যায় প্রপীড়িতদের সাহায্যার্থে। শহীদ সাহেব আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। তাই আমাদের বাড়িতেই রিলিফের প্রধান কেন্দ্র ছিলো। সিরাজগঞ্জের জনসাধারণ সে সময় তাঁর কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছিল, সেকথা আজও সিরাজগঞ্জবাসীরা ভুলতে পারে না। যেভাবে তিনি রিলিফের কাজ পরিচালনা করেছিলেন, আর যেভাবে ছোট ডিঙ্গি নৌকায় চড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে রিলিফ বন্টন করেছেন প্রাণের দরদ না থাকলে কোনো মানুষের পক্ষেই সেটা সম্ভব নয়।

ক্লান্তিহীন, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এই শহীদ সাহেবকেই দ্বিতীয়বার দেখেছি ১৯৪২ সালে যখন সিরাজগঞ্জে কায়েদে আজম পদার্পণ করেন। বাংলাদেশের যে স্থানে কায়েদে আজম সর্বপ্রথম পদার্পণ করেন সেই স্থান হচ্ছে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ—তাই সেই দেশের অধিবাসী হিসেবে আমিও নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।

কায়েদে আজমের আগমনকে উপলক্ষ্য করে শহরে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য জেগেছে আর তাঁর যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানানোর তোড়জোড় চলছে পুরাদমে। জনাব শহীদ সাহেব এই সকল উদ্যোগ ও আয়োজনের পুরোভাগে থেকে তাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন।

www.pathagar.com

মানুষ সোহরাওয়ার্দীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল আরও পরে। ১৯৪৫ সালে তাঁকে দেখেছি কায়েদে আজমের বিশ্বাসী সহকারী হিসেবে কাজ করে চলেছেন তিনি। বাংলাদেশে মুসলিম লীগ আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করবার জন্যে কত পরিকল্পনা আর কি কঠোর পরিশ্রমই না তিনি করেছেন। পাকিস্তান আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে তিনি দক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন তার ফলে পাকিস্তান সত্যতায় পরিণত হলো, বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করলো। যদি কখনও প্রকৃত জাতীয় ইতিহাস রচিত হয় তাহলে তাঁর সেই সময়কার কথা যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার কঠোর সঙ্কল্প নিয়ে তিনি কাজ করেছেন আর সেই সঙ্কল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করে ছেড়েছেন।

অত্যন্ত সাধারণ লোকদের প্রতিও তাঁর সহানুভূতিশীল মনোভাবের কথা অনেকেরই জানা নেই। কারণ, রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই তিনি পরিচিত ছিলেন এবং সেই মাপকাঠিতেই সকলে তাঁকে বিচার করেছে। সাধারণ লোকদের কথা চিন্তা করে তাদের সাহায্য করতে গিয়ে যে তিনি আপন স্বার্থের কথাও ভুলে যেতেন একথা আজ বিশ্বাস করানো কঠিন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুণ্ঠন ও হত্যার তাণ্ডবলীলা চলছে কলকাতার বুকে এটা হলো ১৯৪৬ সালের শেষার্ধে। এই সময় শহীদ সাহেব আপন প্রাণকে তুচ্ছ করে নির্যাতিত অসহায় মুসলমানদের উদ্ধার করেছেন দিনের পর দিন। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে, বারবার আপন প্রাণকে তুচ্ছ করে, বিপন্ন করে সব উপদ্রুত এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। যেখানেই তাঁর স্বজাতির ওপর নির্যাতন হয়েছে, সেখানেই তিনি উপস্থিত হয়েছেন। নিজেকে চরম বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে সামান্য কুণ্ঠাও জাগেনি তাঁর মনে। প্রাণের দরদ না থাকলে এইভাবে আপন প্রাণকে তুচ্ছ করে অন্যের সাহায্যে কয়জন এগিয়ে যেতে পারে? বিশেষভাবে সেই সঙ্কটময় সময়ে যখন কিনা তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত গোষ্ঠী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। ভবিষ্যৎ জীবনের ফল ভোগ ও দায়িত্বভার থেকে তিনি বঞ্চিত হচ্ছেন একথা জানবার পরও তিনি আপন স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে রাজি হননি। তাই সব হারাতে বসেছেন জেনেও তিনি অসহায়দের সাহায্যের জন্যই ছুটে গিয়েছেন। বঞ্চনার মধ্যে পড়েও তিনি দুঃখ পাননি। গান্ধীজীর সঙ্গে স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণ করেছেন, সাধারণ লোকদের সঙ্গে বাস করেছেন, সাধারণ খাবার খেয়েছেন, আর নির্যাতিতদের মধ্যে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন।

কোনো গরীব-দুঃখী সোহরাওয়ার্দীর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করে কখনও বিফল হয়নি। পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাতে যা উঠেছে অকাতরে দান করেছেন। কখনও গুনে দেখার চেষ্টা করেননি। অর্থ বা মূল্যবান সামগ্রী কোনোটার প্রতিই তিনি সাবধানী ছিলেন না এবং তাঁর এই অসাবধানতার সুযোগ গ্রহণ করেছে দুষ্টজনেরা। বহুবার তাঁর অর্থ, মূল্যবান ক্যামেরা প্রভৃতি খোয়া গিয়েছে; কিন্তু তার জন্য তাঁকে কখনও আফসোস করতে দেখা যায়নি। আজ থেকে এক বছর পূর্বে যখন সারা পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বাণী প্রচার করার কাজে তিনি লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় তাঁকে দেখেছি শারীরিক অসুস্থতাকে তুচ্ছ করে বাংলার জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়েছিল; কিন্তু সেই অসুস্থতাকে তিনি মোটেই আমল দেননি। যেখান থেকে আহ্বান এসেছে তিনি সাড়া দিয়েছেন। অনেকেই স্বাস্থ্যের কথা জানিয়ে তাঁকে সতর্ক করেছে; কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করেননি। জনসাধারণের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন উল্কার মতো এক স্থান থেকে আর এক স্থানে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দী ও পাকিস্তান

মালিক সরফরাজ

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন প্রথম লাহোর আসেন তখন আমি ছাত্র। একদল ছাত্রের সঙ্গে মিলে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম এবং তাঁকে আমাদের কলেজে একটা বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করেছিলাম। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানে সেই ছিলো জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রথম বক্তৃতা এবং সে বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন লাহোরের এম.এ.ও. কলেজে। এরপর জনাব সোহরাওয়ার্দী আর একবার লাহোরে আসেন এবং সেবার আসেন জনাব মামদোতের 'প্রোডা' (PRODA) মামলার কৌঁসিলী হিসেবে। এ দফায় তিনি মামদোত ভিলায় অবস্থান করতে থাকেন। এর বছর দু'য়েক পরে যে সোহরাওয়ার্দী আমার প্রিয় নেতার আসন অধিকার করেছিলেন, এখানে আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসি। আমি জিন্নাহ মুসলিম লীগের কর্মী ছিলাম এবং জনাব সোহরাওয়ার্দী সে সময় আওয়ামী লীগ গঠন করেন। জিন্নাহ মুসলিম লীগ সে সময় পাঞ্জাবের জনপ্রিয় বিরোধী দল বলে গণ্য হতো। এরপর জিন্নাহ মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগ একত্র করার সিদ্ধান্ত করা হয় এবং এই সিদ্ধান্তের ফলে লাহোরের মোচি গেটে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে উভয় প্রতিষ্ঠানকে একত্র করা হয়। জিন্নাহ মুসলিম লীগের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। জনাব সোহরাওয়ার্দীকে নিখিল পাকিস্তান জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগের কনভেনর নির্বাচনের মাধ্যমে সম্মেলন সমাপ্ত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্টিতে জনাব মামদোতকেই পাঞ্জাবের তরুণ কর্মীদের নেতা বলে বিবেচনা করা হতো। এর অব্যবহিত পরেই পাঞ্জাবে ১৯৫১ সালের নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়। আর এই নির্বাচনী অভিযানেই জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রকৃত তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঞ্জাবে সেই ঝটিকা সফরে আমি জনাব সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে ছিলাম। পাঞ্জাবের সুদূর পল্লী অঞ্চলের কর্মীদের নামও তিনি মনে রাখতে পারতেন এবং চেহারা দেখেই তাদেরকে চিনতে পারতেন জেনে আমি তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিলাম। আওয়ামী লীগ সংগঠন করতে যেয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দী এসব কর্মীকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন। কর্মীদের সাথে তাঁর ব্যবহারেই আমি প্রকৃত বিস্ময় বোধ করতাম; বিস্মিত হতাম দিন বা রাত্রির যে কোনো সময় জনসাধারণের খেদমতে হাজির হওয়ার ব্যাপারে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা দেখে। আচার-আচরণে এমন ঘনিষ্ঠ, আলাপ-আলোচনায় এমন সরল, রাজনৈতিক প্রশ্নে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ এবং জনগণের সংস্পর্শে আসার ব্যাপারে এতো তৎপর একজন রাজনৈতিক নেতাকে তখনও পাঞ্জাবের কর্মীরা দেখেননি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পাঞ্জাবের সকল মতের নেতৃত্বই ছিলো অভিজাত শ্রেণীর। তাই কর্মীদেরকে তাঁরা সর্বদাই নিজেদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। আমার বিশ্বাস, সহজাত কারণেই এটা তাঁরা না করে পারতেন না। কিন্তু পাঞ্জাবে তখন অনেক

www.pathagar.com

কিছুই ঘটতে বাকি ছিলো। আর জনাব সোহরাওয়ার্দীর পক্ষেও এটাই শেষ কথা নয়।

রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নিজের দক্ষতা ও মহত্ত্বের ছাপ রেখে যাবার সামর্থ্য জনাব সোহরাওয়ার্দীর ছিলো। কিন্তু যে বিশেষ স্থান অধিকার করলে নেতার মুখে উচ্চারিত প্রত্যেকটি বাণী জনগণের জন্যে আইন হয়ে দাঁড়ায়, সে স্থান তখনও তিনি অধিকার করতে পারেননি। খাজা নাজিমউদ্দিনের মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট এবং তৎকালীন প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র অনুসারে যে জাতীয় পরিষদ (পার্লামেন্ট) নির্বাচিত হবার কথা, তাতে বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে তখন বেশ হৈ-চৈ চলছে এবং পাঞ্জাবে তা সর্বাধিক বিতর্কমূলক আকার ধারণ করেছে।

জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন সবসময়ই গণতন্ত্রের নিশানবরদার। তিনি প্রস্তাব করলেন, দু'টি পরিষদের পরিবর্তে কেন্দ্রে একটিমাত্র পার্লামেন্ট থাকবে এবং তাতে জনসংখ্যার অনুপাতে পাকিস্তানের প্রত্যেকটি প্রদেশের প্রতিনিধি থাকবে। সংক্ষেপে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে বাংলার প্রতিনিধির সংখ্যা হবে মোট প্রতিনিধি সংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে এমন সময়ে এই মন্তব্য করলেন, যখন মরহুম লিয়াকত আলী খান ও খাজা নাজিমউদ্দিনের সরকার সর্বশক্তি প্রয়োগে এই মর্মে বিদ্বেষাত্মক প্রচারণা চালিয়ে পাঞ্জাবের জনসাধারণের মনে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী জাতীয় নেতা নন বলেই তিনি পাকিস্তানের জনসাধারণকে এক বলে মনে করতে পারেন না; তাছাড়া তিনি বাঙালি বলে পাকিস্তানের রাজনীতিতে বাংলার প্রভাব যেকোনো প্রকারে সুনিশ্চিতভাবে কায়েম করতে চান। আমার বিশ্বাস, এই ধরনের ব্যাপক ও মিথ্যা প্রচারণা এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বাংলায় যে আন্দোলন চলছিল তা একসঙ্গে মিলে পাঞ্জাবের জনসাধারণের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল। আমার মনে পড়ে, এই ধরনের তুমুল বিতর্ক চলতে থাকাকালে আমি জনাব সোহরাওয়ার্দীর সাথে সাক্ষাৎ করে পাঞ্জাবের মনোভাব তাঁর সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, তাঁরই (জনাব সোহরাওয়ার্দীর) উক্তি মতে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে বাংলা সর্বদাই সুনিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতে সমর্থ হবে এবং সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ও পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো ছোটখাট প্রদেশকে খুশি করে বাংলা সর্বদাই কেন্দ্রে সরকার গঠন করতে সক্ষম হবে।

আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে যে, একথা শুনে জনাব সোহরাওয়ার্দী কিছুটা ব্যথা পেলেন। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'মালিক সরফরাজ, আমি তোমার সরলতার প্রশংসা করি। কিন্তু তুমি শুনে রাখো, নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দলসমূহই পাকিস্তানে সরকার গঠন করবে—কোনো প্রদেশ নয়।' তিনি আরও বললেন যে, পাকিস্তানকে যদি আমাদের সুসংহত করতে হয় এবং পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে হয়, তাহলে আমাদেরকে প্রদেশের ভিত্তিতে চিন্তা করলে চলবে না। বরঞ্চ পাকিস্তানী জনসাধারণের মনে-প্রাণে এক জাতির মর্মবাণী সঞ্চার করে দিতে হবে।

কিন্তু কোনো নেতার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেই সব সময় সবকিছু হয়ে ওঠে না। সুতরাং সময় যত যেতে লাগলো, জনাব সোহরাওয়ার্দীও ততই অনুভব করতে লাগলেন যে,

www.pathagar.com

উপরোক্ত প্রচারণা এবং এর জন্যে পাঞ্জাবে বাংলার প্রস্তাব সম্পর্কে যে ভীতি সঞ্চার হয়েছিল, তা অমূলক হলেও এটা শিকড় গেড়ে বসেছে যে তার একটা সমাধা করা দরকার, আর তিনি নিজেই তা করলেন। আর আজ তাই আমার মনে হয়, একমাত্র জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মতো নেতা ছাড়া আর কারো পক্ষেই পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে সংখ্যা-সাম্যের নীতিতে রাজি করানো সম্ভব ছিলো না।

কিন্তু এই ধরনের প্রচারণার কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা করার পূর্বেই জিন্নাহ্ আওয়ামী লীগের জমিদার শ্রেণীর নেতৃত্ব সেই প্রচারণার আড়ালে থেকে দলে একটি ভাঙ্গন সৃষ্টি করলেন আর তারই ফলে নওয়াব মামদোত বহিষ্কৃত হলেন। অধিকাংশ কর্মীর মতো আমিও বিশ্বাস করি যে, মামদোত ও তাঁর দল পার্টিতে যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিলেন, তার কারণ মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মনোভাব নয়, তার কারণ অন্য কিছু। আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁরা জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক আচরণ অর্থাৎ কর্মীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা, সবার কাছে তাঁর সহজাধিগম্যতা এবং ঘন ঘন জনসংযোগ ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁরা ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর লাহোরে অবস্থান এই পর্যায়ে শেষ হলে তিনি করাচী চলে গেলেন এবং নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে সেখানে তাঁর কন্যা বেগম আখতার সোলায়মানের সাথে বসবাস করতে লাগলেন। কিন্তু পাঞ্জাবে কর্মমুখর অবস্থানকালে পাকিস্তানে বিরোধীদল গঠনের জন্যে তিনি যে ঝটিকা সফর করেছিলেন, তাঁর স্বাস্থ্যের উপর তার দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই সময়েই তিনি প্রথমবার করোনারী থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হলেন এবং চিকিৎসার জন্যে জুরিখ চলে গেলেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি বিরোধী দলের নেতা এবং কার্যত পাকিস্তানে জনগণের নেতারূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি যখন জুরিখে আরোগ্য লাভ করছেন, তখনই আমলাদের কোটারীর এক প্রাসাদী চক্রান্তের ফলে পাকিস্তানের গণতন্ত্রের ওপর প্রথম গুরুতর আঘাত নেমে এলো। আর এরই ফলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দিগন্তে অভ্যুদয় ঘটলো ইস্কান্দার মির্জার আর তার জন্যে দায়ী হচ্ছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ঔদাসীন্য।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী আইন সচিব হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করলেন। কিন্তু এত সহজে তিনি এ পদে যোগদান করতে সম্মত হননি। তাঁকে ভয় দেখানো হলো যে, তিনি যদি এ পদে যোগদান না করেন, তাহলে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আর তাই তাঁকে এতে সম্মত হতে হলো।

এরই মধ্যে আমার আইন অধ্যয়ন শেষ হয়েছে এবং আমি তখন আইন ব্যবসায়ে রত হয়েছি। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী আমাকে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে মনোনীত করলেন এবং আমাকে ও আমার তরুণ বন্ধুদেরকে পাঞ্জাবের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা ও রাস্তায় পার্টি সংগঠন করতে নির্দেশ দিলেন। আমার বিশ্বাস যে, অত্যন্ত চমৎকারভাবেই আমরা এ কাজ করেছিলাম এবং নিষ্ঠাবান কর্মীর সমাবেশে পাঞ্জাবে এটা অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

দল পুনর্গঠনের কাজ তখনও পুরাদস্তুর চলছে; ঠিক এমনি সময় চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পদত্যাগ করলেন এবং জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী (বিরোধী দলের নেতা) কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা

www.pathagar.com

গঠনের জন্য আমন্ত্রিত হলেন। রিপাবলিকানদের সাথে কোয়ালিশন করে তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দী যখন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন বিশ্বে পাকিস্তানের মর্যাদা সর্বনিম্ন স্তরে নেমে এসেছিল। কিন্তু শীঘ্রই তিনি এক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব ছাপ রাখতে সমর্থ হলেন। পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মিস্টার কর্নেলিয়াসের ভাষায় বলতে গেলে 'পাশ্চাত্য দেশসমূহে তাঁর প্রতিপক্ষরা শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে, পাকিস্তানে এখন এমন একজন মানুষ আছেন যিনি তাঁদের সাথে সমান শর্তে কথা বলতে পারেন।' আর তিনি করেছিলেনও তাই। কারণ সেই প্রথমবার কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে পণ্ডিত নেহরুকে বেশ মাথা ঘামাতে হয়েছিল আর বিশ্ব জনমতের কাছে তাঁর মুখোশও উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জনাব সোহরাওয়ার্দীর সাফল্য এতই উল্লেখযোগ্য যে, যে ট্রাইব্যুনাল তাঁর এবডো মামলার বিচার করে শেষ পর্যন্ত তাঁর অযোগ্যতার রায় দিয়েছিলেন, তারাও তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। তাঁর মামলার রায় সম্বলিত ছাপানো পুস্তিকার শেষ পৃষ্ঠায় পাকিস্তান সংগ্রামে জনাব সোহরাওয়ার্দীর গৌরবজনক খেদমতের প্রশংসা করা হয়েছে। টাইব্যুনাল আরও বলেন যে, পাকিস্তানীদের কাছে একান্ত সুপরিচিত জনাব সোহরাওয়ার্দী এমনই একজন মানুষ যাঁকে বিশ্বের বিশিষ্ট রাজনীতিকদের সমকক্ষ বলা যেতে পারে।

কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সাথে মিলে আমি একবার মরহুম কায়ানীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন 'আমি বিচারপতি চেঙ্গিস খানকে বলেছি যে, জনাব সোহরাওয়ার্দীর 'এবডো' মামলার শুনানি তাঁর নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করেছে।'

মরহুম বিচারপতি কায়ানী আরও বলেন যে, তিনি বিচারপতি চেঙ্গিস খানকে ঠাট্টা করে বলেছেন যে, তাদের যদি সাহস না থাকে তাহলে তিনি নিজেই বিচারপতির (কায়ানী) রায়টি লিখে দিতে প্রস্তুত আছেন।

প্রধানমন্ত্রী থাকার শেষ দিনগুলোতে একবার পশ্চিম পাকিস্তান সফরসূচি জনাব সোহরাওয়ার্দী আমাকে দিয়েছিলেন। তিনি প্রায়শই আমাকে তাঁর সফরতালিকা সরবরাহ করতেন। যা হোক, সেবার আমরা এবোটাবাদ ও কাকুলে গমন করি। সেখানে আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'স্যার, এবারে আপনি লাহোরের ছাত্রদের কোনো সভায় বক্তৃতা করছেন না কেন?' তিনি তখনি এতে সম্মত হয়ে আমাকে বললেন, 'তোমরা এর ব্যবস্থা করতে পারো কিনা।'

আমি এ সম্পর্কে মরহুম মৌলভী গোলাম মহিউদ্দীন কাসুরীকে টেলিফোন করলাম। তিনি আমাকে জানালেন যে, তিনি আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের একটি সমাবেশের ব্যবস্থা করবেন।

আমরা লাহোরে ফিরে এলাম। বেলা ১১-৩০ মিনিটে ছাত্র সমাবেশ। সেদিনটিতে অত্যন্ত গুমোট পড়েছিল। বাবা (শ্রদ্ধাবশত আমরা জনাব সোহরাওয়ার্দীকে 'বাবা' বলেই ডাকতাম) লাহোর গভর্নমেন্ট হাউসের দোতলায় রিপাবলিকান নেতাদের সঙ্গে একটা সম্মেলনে ব্যস্ত ছিলেন। আমি নিচেরতলায় অপেক্ষা করছিলাম। এক এক মিনিট করে সাড়ে এগারোটা বারোটা তারপর সাড়ে বারোটা বেজে গেলো। আমি একটু বিরক্ত হলাম আর

www.pathagar.com

ঠিক সেই সময় দেখি বাবা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন। বিরক্তির ভাবটা চাপা দিতে না পেরে আমি বললাম, 'স্যার, আপনি অনেক দেরী করে ফেললেন।'

তিনি রেগে উঠে চিৎকার করে বললেন, 'মালিক সরফরাজ, তুমি অত্যন্ত ঔদ্ধত হয়ে উঠতে শুরু করেছো।' তাঁর কথা শেষ হবার আগেই আমি জবাব দিলাম এবং অনুতাপ করে বললাম, 'শ্রদ্ধার সঙ্গেই বলছি স্যার, আপনার একঘণ্টা দেরী হয়ে গেছে, আর ছেলেরা প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।'

ততক্ষণে তিনি নেমে এসে গাড়িতে বসেছেন এবং আমাকে কিছু না বলেই চলে গেলেন। পিছনে পিছনে আলাদা গাড়িতে ইসলামিয়া কলেজে গেলাম। সেখানেই ছাত্রসমাবেশ হবে। জনাব সোহরাওয়ার্দী স্বভাবসিদ্ধ চমৎকার বক্তৃতা দিলেন। গভর্নমেন্ট হাউসে আবার যখন ফিরে এলাম, তখন সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কিছু মনে করো না।'

তিনি বললেন, 'ওপরে কি হচ্ছিলো জানো। ওরা আমাকে একটা ষড়যন্ত্রে জড়াতে চায়। আমি ওর মধ্যে নেই।'

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, এক ইউনিটের তৎকালীন গোঁড়া সমর্থক রিপাবলিকানরা পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁদের মন্ত্রিত্ব রক্ষার জন্যে এক ইউনিট ভেঙে দেবার প্রশ্নে জি.এম. সৈয়দ গ্রুপের সঙ্গে একটা রফা করে ফেলেছিল। জনাব সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগ-রিপাবলিকান সরকারের প্রধানমন্ত্রী, কাজেই জি. এম. সৈয়দ তাদেরকে জনাব সোহরাওয়ার্দীর মুখ বন্ধ করতে বললেন। সুতরাং রিপাবলিকানরা এক ইউনিট ভেঙ্গে দেবার প্রশ্নে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে তাঁদের সাথে শামিল হতে বললেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী উত্তরে জানালেন যে, তিনি প্রকাশ্যে কথা দিয়েছেন। এতে রিপাবলিকানরা বললেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁরাও এক ইউনিট ভেঙ্গে দেবার পক্ষপাতী নন। তবে তাঁরা জনাব সোহরাওয়ার্দীকে আপাতত এই কথা বলতে বলছেন যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁদের সঙ্কটকালটা তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেন।

এতে বাবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং তাঁদেরকে বললেন যে, তিনি এই ধরনের ষড়যন্ত্রে শরিক হবেন না।

রাজনীতিতে জনাব সোহরাওয়ার্দীর এটাই ছিলো বৈশিষ্ট্য। তিনি নিয়মতান্ত্রিক যুক্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের ছিলেন একান্ত বিরোধী। প্রধানমন্ত্রিত্বের বিনিময়ে হলেও তিনি এই নিয়ম পালন করে চলতেন। লাহোর থেকে আমরা ঝং-এ একটা সভায় যোগদানের জন্য গেলাম। আমি সবেমাত্র বক্তৃতা শেষ করেছি। শিক্ষামন্ত্রী জনাব জহিরুদ্দীন মাইকের সামনে গেলেন।

বাবা চেয়ারে বসেছিলেন। একটি লোক মঞ্চে এসে আমাকে পাশে ডেকে নিয়ে বললেন, একটি লোক প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে চান। সেই ব্যক্তি বাবার একজন বন্ধু ছিলেন। তিনি এই কথা জানাতে এসেছিলেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দীকে বরখাস্ত করার জন্যে রিপাবলিকানরা ইসকান্দার মীর্জাকে বলেছে।

বেলা ১২টায় সভা শেষ হলো। আমরা অবিলম্বে জওহরাবাদ রওয়ানা হলাম। পথে যেতে যেতে বাবাকে একথা বললাম। কিন্তু তাঁকে বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন মনে হলো না।

www.pathagar.com

একটু থেমে তিনি বললেন, 'তোমরা তো জানো এর ওপর আমার কোনো লোভ নেই। প্রধানমন্ত্রিত্ব চলে যাবে যাক, আমি জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না।' আর তাই তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করলেন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'নয়া শাসনতন্ত্র অনুসারে পাকিস্তানের জনসাধারণ যাতে নিরপেক্ষ নির্বাচনে শরিক হতে পারে এবং পাকিস্তানে প্রথমবার অবাধে তাদের স্বাধীন মত প্রকাশ করতে পারে, তাই দেখাই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমার লক্ষ্য।'

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর পদত্যাগের পর ইস্কান্দার মীর্জা ডাক্তার খান সাহেবের মাধ্যমে বিপ্লবী পরিষদ গঠনের গুজব ছড়িয়ে দিলেন। ইস্কান্দার মীর্জা যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুমতি দিলেন না এবং নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের আগে সামরিক বাহিনী যে শাসনভার গ্রহণ করবে, এটা সে সময় সাধারণ আলোচনার বিষয় ছিলো।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে সামরিক আইন জারি হলো। নভেম্বরে আমি বিয়ে করলাম। বাবা আমাকে লিখলেন, 'তোমার বিয়ে করার এটাই উপযুক্ত সময়।'

১৯৫৯ সালের নভেম্বর মাসে তিনি আমাকে লাহোরে একটি অফিস স্থাপন করতে বললেন। এভাবে আইন ব্যবসায়ে আমি তাঁর জুনিয়র হলাম। পরবর্তী তিন বছরে একমাত্র লাহোর অফিস থেকে যে আইন ব্যবসায় পরিচালিত হয়, তা থেকেই তিনি প্রায় পাঁচ লাখ টাকা উপার্জন করেছিলেন। লাহোর ছাড়াও করাচী এবং ঢাকাতেও তাঁর আরও দু'টি অফিস ছিলো।

১৯৬২ সালে তিনি গ্রেফতার হয়ে করাচী জেলে নীত হন। জেলে বাবার সাথে দেখা করতে গিয়ে আমি বেবীর (বেগম আখতার সোলায়মান) সাথে দেখা করি। রশীদ সোহরাওয়ার্দীকে টাকা পাঠাবার জন্যে বেবী তখন বাবার 'জেফায়ারখানা' বিক্রি করার সিদ্ধান্ত করেছেন জেনে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পড়েছিলাম।

দুই তিন বছর আইন ব্যবসা চালিয়ে তিনি এই যে কয়েক লাখ টাকা উপার্জন করেছিলেন, তার কি হয়েছিল তা কেউ জানে না। কিন্তু জনাব সোহরাওয়ার্দীকে যাঁরা নিকট থেকে জানেন, তাঁরাই বলতে পারেন, জনাব সোহরাওয়ার্দী এ টাকা দিয়ে কি করতে পারেন। অভাবী লোক—তা সে পুরুষই হোক আর স্ত্রীলোকই হোক, আর কোনো কর্মীই হোক, তার কেবল মুখ দিয়েই বেরুতে দেরী। অমনি বাবা তাঁর থলি খালি করে দিতেন। আবার আইন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যেসব মক্কেলকে দিয়ে তাঁর টাকার থলি ভর্তি হতো তাঁদের চেয়ে তাঁর এই ধরনের মক্কেলের সংখ্যাই ছিলো অনেক বেশি।

১৩-১২-৬৩ তারিখে একটা টেলিগ্রাম পেলাম যে, বাবা ঐদিনই লাহোরে আসছেন।

আমিই তাঁকে বিমান ঘাঁটিতে অভ্যর্থনা করলাম। মিস্টার ওয়াটসন বলে তাঁর একজন বন্ধু মোটরে করে তাঁকে তাঁর বাংলোতে নিয়ে এলেন। মিস্টার ওয়াটসনের বাংলোতে তাঁর জন্যে একটা ঘর নির্দিষ্ট ছিলো। পরেরদিন সকালে আমি সেই ঘরে তাঁর সঙ্গে বসে আছি। এমন সময় মিস্টার ওয়াটসন উঁকি মেরে বললেন, 'সোহরাওয়ার্দী সাহেব, আপনাকে কে একজন ডাকছে।' নিয়মমতোই তিনি বললেন, 'তাঁকে আসতে বলুন।'

মিস্টার ওয়াটসন চলে গেলেন। কিন্তু ফিরে এসে বললেন, লোকটি আড়ালে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়।

বাবা ওয়াটসনের সাথে চলে গেলেন। আমি সেখানেই বসে রইলাম। পরদিন লাহোর

www.pathagar.com

হাইকোর্টে একটা মামলা ছিলো। তাই নিয়ে আমি তাঁর সাথে আলাপ করছিলাম। কিছুক্ষণ পরে বাবা ফিরে এসে বেশ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যার লোকটি কে?' তিনি বললেন, 'মার্শাল ল' সরকারের প্রস্তাবিত নয়া শাসনতন্ত্র সম্পর্কে একটা লোক আমার মতামত চাচ্ছে।' তিনি আরও বললেন, 'আমি তাকে বললাম, আমি তো এবডোভুক্ত হয়ে আছি। আমার মতামত চাচ্ছেন কেন?' তিনি এরপর বললেন, 'লোকটি এতে বলল, আপনার মতামত প্রেসিডেন্টের দরকার। আমি তাকে বলেছি যে, সেক্ষেত্রে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের মত কি, সেটা আমাকে বলুন।' এরপর বাবা বললেন, 'লোকটা এখন চলে গেছে।'

সন্ধ্যায় আমি বাবার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি বললেন, 'লোকটা আবার এসেছিল।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে কি বলছিল স্যার?' বাবা বললেন 'সে বললো' প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সময় এসেছে।' বাবা আমাকে বললেন, 'আমি তাঁকে বলেছি যে, যেক্ষেত্রে তিনি (প্রেসিডেন্ট) ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করুন; কারণ, সেটা এই অজুহাতে বাতিল করা হয়েছিল যে, পাকিস্তানে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। আর এখন যদি তিনি (প্রেসিডেন্ট) মনে করেন যে, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা হলে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রও পুনঃপ্রবর্তন করা উচিত। কারণ, পাকিস্তানের জনসাধারণ ও রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক এই শাসনতন্ত্র মোটামুটিভাবে গৃহীত হয়েছিল।'

বাবা বললেন 'আমি তাঁকে এ কথাও বলেছি যে, সেই শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্টকে তো যথেষ্ট ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।'

১৮ই ডিসেম্বর তিনি ঢাকা রওয়ানা হলেন। আমি যেমন সাধারণত জিজ্ঞেস করতাম তেমনি করেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি আবার কবে লাহোরে আসবেন। তিনি বললেন 'সরফরাজ' প্রেসিডেন্টকে আমি কি জবাব দিয়েছি, তুমি জানো। আমার মনে হয়, আর একবার এখানে আসার আগেই আমি গ্রেফতার হবো।'

বাবা যা বলেছিলেন, তাই হলো। আর একবার লাহোর আসার আগেই করাচীতে তিনি গ্রেফতার হলেন। তাঁর গ্রেফতারের খবরে পাকিস্তানের জনসাধারণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। গ্রেফতার সম্পর্কে যে প্রেসনোট দেওয়া হয়েছিল, তার ভাষাই যে কেবল নোংরামীতে পূর্ণ ছিলো, তা নয়। রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কার্যকলাপের অভিযোগ ছিলো বলে এটা উত্তেজনাকরও হয়েছিল।

আমি ব্যথিত হলাম। ভাবলাম, আমার নেতার সম্মানকে অবশ্যই তুলে ধরতে হবে আমাকে। প্রথম দু'দিন পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোনোই খবর পেলাম না। তখনও সামরিক আইন বলবৎ ছিলো। এর প্রতিবাদে কোনো বিবৃতিই খবরের কাগজে গ্রহণ করা হলো না। কোনো জনসভা অনুষ্ঠানেরও অনুমতি ছিলো না।

যাহোক, বাবার আটকাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আমি ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ৪৯১ ধারা অনুসারে হাইকোর্টে এক আবেদন পেশ করলাম। আমার এক বন্ধু সে সময় হাইকোর্টে আমার সহকর্মী ছিলেন। বাবার গ্রেফতারে বিরক্তি প্রকাশ করে তিনি বললেন যে, প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র অনুমোদন না করে তিনি (জনাব সোহরাওয়ার্দী) ঠিকই করেছেন। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, ৪৯১ ধারার আবেদন যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে

www.pathagar.com

হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন করতে হবে। কিন্তু পরে যখন জানলাম যে, এই পরামর্শদাতা ও সহানুভূতি প্রদর্শনকারীই প্রাদেশিক মন্ত্রী হয়েছেন এবং পরে তাঁকে প্রেসিডেন্টের মন্ত্রিসভায় প্রমোশন দেওয়া হয়েছে আর তার প্রতিদানে তিনি এই শাসনতন্ত্রের গোঁড়া সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তখন আমি হতবাক হয়ে পড়েছিলাম।

সুদীর্ঘ সাত মাস বাবা করাচী জেলে ছিলেন। এ সময় করাচী জেলে আমি প্রায়ই তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর এটর্নীর সাথে সাক্ষাৎ করতাম। এই সাক্ষাৎকালে আমি দেখতাম যে, যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কারাবরণ করেছিলেন তা হাসিলের জন্যে অর্থাৎ দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে যতদিন দরকার ততদিনই সেখানে থাকতে তিনি সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলেন। জেলে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি প্রায়ই আমাকে বলতেন, 'মালিক সরফরাজ, এইসব আবেদন আর রিট নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো কেন? আমি জানি, দশ বছরের জন্যে আমি এখানে এসেছি। তাতে আমি কিছু মনে করি না। আমাকে এখানে থাকতে দাও।'

আর প্রেসিডেন্টের কাছে তিনি যে স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন, তাতেও তিনি ঠিক এই কথাই লিখেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, তা খণ্ডন করে তিনি এই স্মারকলিপি প্রেরণ করেছিলেন।

জেলে থাকতে তিনি এরই স্মারকলিপি আমার হাতে দিয়েছিলেন। স্মারকলিপির শেষ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং তার আগে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে আমি যে খেদমত করেছি, তা সত্ত্বেও যদি আমাকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করা হয় তাহলে জেল থেকে বেরুবার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।

তিনি প্রেসিডেন্টকে আরও লিখেছিলেন, প্রেসিডেন্ট সাহেব, আপনি আমাকে চিনেন না এই কারণে যে, আপনি ছিলেন একজন সৈনিকমাত্র। তাছাড়া পাকিস্তান সৃষ্টির জন্যে যে বাংলায় আমি আমার বিনীত দান দিয়েছিলাম সেখান থেকে বহু দূরবর্তী দেশের একটি অংশে আপনার নিবাস। আর তাই আপনি আমাকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারেন। কিন্তু আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, আমার জনসাধারণ পাকিস্তানী জনসাধারণ একথা কখনও বিশ্বাস করবে না।

এই ছিলো বাবার প্রকৃত পরিচয় আর এই ছিলো তাঁর হৃদয়। জনসাধারণের জন্যে তিনি জন্মেছিলেন, জনসাধারণের জন্যে তিনি বেঁচেছিলেন। সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে তিনি যা কিছু করেছেন, সবই তাদের কল্যাণের জন্যে। দেশের রাজনৈতিক কার্য পরিচালনার একমাত্র শক্তি হিসেবে তিনি জনসাধারণের ওপরই নির্ভর করতেন। জনসাধারণ তাঁকে ভালোবাসতো এবং তারাই তাঁকে বাবার আসন দান করেছিল—তাঁর খেদমতের জন্যে এটা তাঁর আকাঙ্ক্ষিত হলেও একে তাঁর ন্যায্য পুরস্কার বলা যেতে পারে।

আটকের সপ্তম মাসে বাবাকে যখন মুক্তি দেওয়া হলো, আমি তখন করাচীতে ছিলাম। মুক্তির এক সপ্তাহ আগে তাঁর মুক্তি সম্পর্কে তাঁর ও সরকারের মধ্যে কি ঘটেছিল আমি অন্যত্র সে সম্পর্কে আলোচনা করবো।

জনসাধারণের অন্তরে নায়কের মর্যাদা নিয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দী বেরিয়ে এলেন। বিমানঘাঁটি, রেলস্টেশন যেখানেই তিনি গেলেন সেখানেই লাখো লাখো লোক সমবেত হলো। দেশের তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তান বীতশ্রদ্ধ ও পশ্চিম

www.pathagar.com

পাকিস্তান বিভ্রান্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছিল। এই তিক্ততা ও অসন্তোষ, বিভ্রান্তি ও হতাশা সত্ত্বেও জনাব সোহরাওয়ার্দী গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে জনসাধারণের মধ্যে একটি আন্দোলনের পরিচ্ছন্ন রূপদান করলেন এবং দেশকে উচ্ছন্নে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষার প্রচেষ্টায় সাহসিকতার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। আমার মতে এজন্যে সরকারের তাঁকে ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিলো।

কিন্তু সুদীর্ঘ সাত মাস নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের মর্মযাতনা তাঁর শরীরের ওপর দারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল ও কারাগারে তাঁর সেলের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের জন্যে তাঁর অল্প অল্প জ্বর হতে শুরু করেছিল। এর ওপর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ঝটিকা সফরের পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি দিলেন নিজের জীবনটা আর পাকিস্তানের জনসাধারণকে দিতে হলো তাদের একমাত্র প্রিয় নেতাকে। ভাগ্যের পরিহাস এই যে, এই দেশের প্রতিষ্ঠায় যে মানুষটি প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে সংগ্রাম করেছেন, তিনি মৃত্যুবরণ করলেন বিদেশের মাটিতে! সরকারি ভাষ্য মতে ৪ঠা জানুয়ারি ভোর রাত্রি ৩টার সময় বাবা বৈরুতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রেসিডেন্টের আদেশে মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দাফনের দিনে সমগ্র দেশে পাকিস্তানের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। এই পতাকাই উড়েছিল সেই জেলের সেলের ওপরে তার সকল গরিমা নিয়ে, বাবাকে যেখানে রাখা হয়েছিল অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসেবে। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রদ্রোহী বলে অভিযুক্ত রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে।

পাকিস্তানের জনসাধারণ কেঁদেছিল কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জন্যে, কাঁদবে কায়েদে পাকিস্তান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্যে—জীবনভর। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, একজন মহান নেতাকে হত্যার জন্যে ভাবী বংশধরগণ এ যুগের লোকদের ওপরই দোষারোপ করবে।

কায়েদে পাকিস্তান, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জিন্দাবাদ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সোহ্‌রাওয়ার্দী সান্নিধ্যে

এম. মসিয়ুর রহমান (এডভোকেট, যশোর)

আইনজীবী হিসেবে আইন বিষয় ছাড়া কোনোদিন লেখনী ধরিনি। লিখবার এই সীমিত শক্তি নিয়ে জানি না, আমার বক্তব্য কতখানি সুব্যক্ত ও সার্থক হবে। দেশের কিছু কিছু সমস্যার ওপর মাঝে মাঝে কিছু বিবৃতি দিয়েছি, একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে অভিমত জানিয়েছি। পরিচিতজনের মৃত্যুতেও জানাতে পেরেছি দুটো শোকবাণী। কিন্তু যে মহান নেতার সান্নিধ্যে এসে জীবনপথের মোড় ঘুরে গিয়েছিল, তাঁর মৃত্যুতে সামান্য দুটো কথাও বলতে পারিনি। আমাকে ভাষাহারা মূক হতে হয়েছিল।

যে অনুভূতি অতীতের রোমন্থনে সর্বদাই বিমুগ্ধ তাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আমিও নই। তাই লিখতে বসে বিগত দিনগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারছি না। আমার বহির্জীবনের একটি অংশের স্মৃতিতে শুধু একজনই বড় বেশি উজ্জ্বল, যাঁর কথা বলতে গেলে তা শুধু জীবনীই হবে না, হবে বিভাগ-পূর্ব বাংলার ইতিহাসের এক নয়া অধ্যায়, যা কালের ইতিহাসে স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকবে। তিনি হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। প্রায় বিশ বছর আগে, কোলকাতার ছাত্রজীবনে অনেক সাধ্য-সাধনা করেও সোহ্‌রাওয়ার্দীর সান্নিধ্য লাভ করতে পারিনি। তিনি তখন অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগ সভাপতি—বাস করতেন ৪০ নম্বর থিয়েটার রোডে। এবং সারা মুসলিম সমাজ তখন পাকিস্তান আন্দোলনে মুখর। অবিভক্ত বাংলার প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি স্বাধীনতাকামী মানুষের মনে তখন পাকিস্তান প্রাপ্তির স্বপ্নে কী বিপুল উৎসাহ, কী অদম্য উদ্দীপনা আর কী সে অভূতপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্য। মুমূর্ষু, নির্জীব সে বাঙলার মুসলিম প্রাণে কে এনে দিয়েছিলো এ ঐক্য ও সংহতির প্রেরণা? আমরা জানি, সেদিনের সকল অনুপ্রেরণার উৎসস্থল ছিলো মাত্র দু'টি ব্যক্তিত্ব। একজন তদানীন্তন সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আর একজন এই বাঙলার মৃত্যুঞ্জয়ী নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী।

তখন পর্যন্ত মুসলিম লীগ গ্রাম-বাঙলার সুসংগঠিত দৃঢ়ভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায়নি। সংগঠনের এ দুর্বলতার কথা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন এবং তিনি জানতেন যে, যদি পাকিস্তান আন্দোলনকে সার্থক করতে হয়, তবে সেই আন্দোলনের একমাত্র বাহন মুসলিম লীগকে সুদৃঢ় কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু প্রতিটি জেলায় তখন যারা মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় বলে পরিগণিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বিশেষ বিশেষ কারণে তখনকার মুসলিম সমাজের প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাঁদের অনেকের কাছে অযাচিতভাবেই এসে গিয়েছিল, যদিও রাজনৈতিক মত ও পথ হিসেবে তাঁদের মধ্যে অনেকেই কোনোও নির্দিষ্ট পথের অনুসারী ছিলেন না এবং তদানীন্তন কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন না। তার কারণও অতি স্পষ্ট। বিভিন্ন জেলার খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রায় সবাই ছিলেন তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের খেতাবধারী।

www.pathagar.com

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জনাব সোহরাওয়ার্দী তাই আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপেই মুসলিম লীগকে 'আরামকেদারার' মধ্য থেকে বাইরে টেনে আনতে চেষ্টিত হলেন। কিন্তু পূর্ব হতে নেতৃপদে সমাসীন এক শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত মর্যাদায় আঘাত না করে সুচিন্তিত পন্থায় এগোলেন। অন্যথায় সে ক্ষেত্রে অহেতুক শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো এবং সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির মর্যাদায় আঘাত করা ভীমরুলের চাকে আঘাত করারই শামিল ছিলো। তাই তাঁদের নেতৃত্বের প্রতি আপাতদৃষ্টিতে কোনোও প্রকার কটাক্ষ না করেই জনাব সোহরাওয়ার্দী অবিভক্ত বাঙলার প্রতিটি জেলায় একটি করে মুসলিম লীগ কর্মী শিবির গড়ে তুললেন সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব প্রচেষ্টায় ও নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে। সে সময় এমন ব্যাপকভিত্তিক কর্মী শিবির গড়ে তোলা, সুসংবদ্ধভাবে কার্য পরিচালনা, বিরোধী ও প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবিলা—আমরা নিজস্ব অভিজ্ঞতায় জানি এবং বিগতদিনের কর্মীরা আজো যারা বেঁচে আছেন, জানেন, সে কত দুরূহ ছিলো। পূর্ব বাংলা আজ যে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে—দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলা যায়, অনন্যসাধারণ কর্মবীর জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাংগঠনিক ক্ষমতাবলেই। তরুণ কর্মীদের ভার দিলেন কর্মী শিবির পরিচালনার। নির্দেশ রইলো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহযোগিতা গ্রহণের। এবং কর্মসূচী প্রণয়নের ভার রাখলেন নিজের হাতে। যার ফলে কোনো জেলায় দুর্বল নেতৃত্ব সেদিনের আন্দোলনকে ব্যাহত করতে পারেনি।

এই সময় থেকেই যশোর জেলার কর্মী শিবিরের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি যে গর্বযোগ্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে, তাঁর মৃত্যুতেও তা ছিন্ন হয়নি এবং কার্যক্ষেত্রে তাঁর শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন পরিশ্রমে বিস্মিত হয়েছি; নিজেকে সর্বদাই অযোগ্য মনে করেছি। ১৯৪৫ সালের শেষভাগ হতে ১৯৪৬ সালের নির্বাচন পর্যন্ত তাঁর সেই ৪০ নম্বর থিয়েটার রোডের দ্বিতলস্থ বাসভবনে প্রায়ই প্রয়োজনীয় নির্দেশ গ্রহণের জন্যে যেতে হতো। লেখকের প্রতি হয়তো তাঁর যথেস্ট স্নেহদৃষ্টি থাকায় তাঁর দ্বিতলস্থ সিঁড়ির সম্মুখে নির্দিষ্ট কামরার ভেতর বিনা অনুমতিতে ও বিনাদ্বিধায় প্রবেশ করেছি। যতবার যতদিন গিয়েছি তাঁকে ঠিক একইভাবে একই অবস্থায় তাঁর ঘরের খাটের ওপর উপবিষ্ট দেখেছি। সকাল ন'টা থেকে রাত তিনটে-চারটে পর্যন্ত যখনই তাঁর কামরায় গিয়েছি, ঠিক একই অবস্থায় তাঁকে দেখেছি। তাঁর সেই ক্ষুদ্র কামরা ঐ সময়ে বিভাগ-পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন জেলার নেতা ও কর্মীদের এক অপূর্ব সমাবেশে মহান পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

এই ভিড়ের মাঝে সবচেয়ে দুর্ভোগ হতো আমাদের মতো ক্ষুদ্র প্রাণীদের। যশোর থেকে সকালের ট্রেনে কোলকাতায় গিয়েছি তাঁর সঙ্গে দেখা করে প্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ে নির্দেশ নিয়ে পুনরায় যশোরে সন্ধ্যার আগেই ফিরবো আশায়। কিন্তু কোনোদিনই তা হয়ে ওঠেনি। একদিন বেলা তিন-চারটার সময় সাক্ষাৎকালে যখন তাঁর মতামত জানতে চেয়েছি তিনি কিছুক্ষণের নীরবতার পর হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে নির্দেশ দিলেনঃ 'Come at 2' (o'clock).

অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্তভাবে পুনরায় বলেছি, 'আর একদিন থাকতে হলে যে অসুবিধা হবে, কাল সকাল ন'টায় এলে কি হবে না?' তিনি কৃত্রিম রাগের ভাব দেখিয়ে আরও চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'তোমার মাথায় কিছু নাই।' 'তোমাকে তো আরও আগে আসতে বলেছি।' সত্যই তাঁর এ সময় নির্দেশকরণে আমি বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম, নিশ্চয়

www.pathagar.com

তিনি পরেরদিন বেলা দুটোর কথাই বলেছেন। তাই আমাকে নিরুত্তর ও ইতস্তত করতে দেখে তিনি আবার বললেন 'Come at 2 in the night'. আচ্ছা, তুমি না হয় একটু আগেই এসো।

সেদিন তিনি আসতে বলেছিলেন রাত দুটোর আগেই, অন্যদিন আরো আগে আসতে হতো, তাঁরই নির্দেশে। তবে কোনোদিন এসেই চলে যেতে পারিনি। অনেক দর্শনপ্রার্থী আমারও আগে এসেছেন তাদের সাথে আলাপ শেষ না হলে আমাদের উঠবার অধিকার—হ্যাঁ অধিকারই নেই। আমার পরেও অনেকে আসছেন এবং একে একে সোফাতেই আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি। শেষে কখন যেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বিশ্বস্ত ভৃত্য শিবু এসে জাগিয়ে দিয়ে বলতো, 'সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন না?' বাড়িতে দেখতাম, কোনোদিন রাত দুটো কোনোদিন তিনটে। অতো রাতেও বিভিন্নমুখী সমস্যা নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, বিজ্ঞ ও সুষ্ঠু সমাধানও দিয়েছেন। এমনি করে যদিও ভোর হতো প্রায়ই, তবু আবার তাঁকে একই নিয়মে পাওয়া গেছে তাঁর সেই ড্রয়িং-ডাইনিং-বেড্ অফিস রুমে, একই অবস্থায়। এমন একদিন নয়, সপ্তাহ নয়, মাসের পর মাস সোহরাওয়ার্দী বিশ ঘন্টারও বেশি অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজ করে গেছেন।

ঐ সময় বিভিন্ন জেলায় সভা-সমিতি উপলক্ষে প্রায়ই তাঁকে কলকাতার বাইরে যেতে হতো। যে সমস্ত জেলায় ও স্থানে মোটরযোগে যাতায়াত করা সম্ভব ছিলো, সেখানে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'প্যাকার্ড' গাড়িখানি নিজেই ড্রাইভ করে যেতেন।

যশোরের কথাই বলি। কোলকাতার আশেপাশের জেলা হিসেবে নিকটতম জেলাগুলোর মধ্যে যশোরও অন্যতম। মাত্র ৭৫ মাইলের ব্যবধান। তাই খুব সহজেই অসংখ্যবার সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁর সেই সাদা গাড়িখানি চালিয়ে সোজা যশোরে চলে আসতেন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেবার জন্যে কিংবা আমাদের কাজ তদারক করার জন্যে।

১৯৪৬ সালের কথা। সাধারণ নির্বাচন শুরু হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষে এ জেলায় নির্বাচন পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন এ জেলারই সন্তান জনাব সৈয়দ নওশের আলী। তিনি নিজেও নির্বাচন প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন জেলার দু'টি নির্বাচন কেন্দ্র থেকে। জনাব নওশের আলী একসময় জমিদার অধ্যুষিত এ জেলার জেলা বোর্ডকে জমিদারদের কবল থেকে মুক্ত করে নির্বাচনের মাধ্যমে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। এমন সময়ও ছিলো যখন এ জেলার প্রতিটি মানুষের কাছে তিনি রাজনৈতিক যাদুকর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। শুধু তাই নয়—কেউ কেউ এমনও বিশ্বাস করতেন যে, তিনি কোনো ঐশী শক্তিতে বলীয়ান ছিলেন। আবার বহুলোকের নিকট তিনি পীরের সম্মান লাভ করতেন। একথা অত্যন্ত সত্য যে, জনাব নওশের আলীর পূর্বে বা পরে এ জেলার অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতা তাঁর তুল্য ভক্তি, শ্রদ্ধা আজও অর্জন করতে সক্ষম হননি। ১৯৩৭ সালে এ. কে. ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তাঁরই মন্ত্রিসভার শ্রমমন্ত্রী ছিলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেব আর তাঁরই সহকর্মী হিসাবে জনাব নওশের আলী উক্ত মন্ত্রিসভার স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। এককালের সহযোগী জনাব নওশের আলী যখন তাঁর অসীম জনপ্রিয়তার সম্পদ নিয়ে নির্বাচনী ময়দানে অবতীর্ণ হন তখন জেলাবাসী মুসলিম

www.pathagar.com

লীগ প্রার্থীর পরাজয় বরণের আশঙ্কায় সত্যই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। তৎকালে যদিও সাধারণভাবে বলতে গেলে মানুষ অজানা পাকিস্তান প্রাপ্তির আশায় মরিয়া হয়ে উঠেছিল, তবুও বাংলাদেশে এমন কয়েকজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন যাঁদের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও দলীয় মতবাদের ঊর্ধ্বে স্থান পেতো। স্বল্পসংখ্যক সেই রকম কয়েকজনের মধ্যে নওশের আলী সাহেবও ছিলেন অন্যতম। এ সত্যটি সোহরাওয়ার্দী সাহেব যশোরে পদার্পণ করেই অনুধাবন করেছিলেন। তাই দেখেছি, নির্বাচনী এলাকাগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে যশোরের দিকে তাঁর নজর ছিলো তীক্ষ্ণতর। নির্বাচন ঘনিয়ে আসার প্রাক্কালে একবার তিনি দশদিন যশোরে একটানা কাটিয়ে দেন। ঐ সময়ে জনাব নওশের আলী সাহেবের নির্বাচনী এলাকায় তাঁকে মুসলিম লীগ প্রার্থীর পক্ষে দৈনিক দুই/তিনটি করে সভায় বক্তৃতা করতে হতো। কখনও কখনও ছোট একটি লঞ্চেও নদীবক্ষে কতদিন কাটাতে হয়েছে। এ নির্বাচনী প্রচারে সে সময় সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে দিবারাত্র একসঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সেদিনের ছোট্ট একটি ঘটনা স্মরণে পড়ছে।

লঞ্চযোগে তখন আমরা নড়াইল মহকুমার গ্রাম-গ্রামান্তরের নির্বাচন কেন্দ্রে ঘুরাফিরা করছি। দুপুর ও রাত্রির আহারের ব্যবস্থা যাহোক এখানে-সেখানে হয়ে যাচ্ছিলো; কিন্তু সকালের নাশতার আর কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। এ ব্যাপারটি একটি নগণ্য ব্যাপার হলেও সোহরাওয়ার্দী নিজেই লঞ্চযাত্রী কর্মীদের কাছে একটি বিরাট সমস্যারূপে দেখা দিলেন। কিন্তু একটি অতি সহজ সমাধান সোহরাওয়ার্দী সাহেব নিজেই করে দিলেন। তিনি বললেন, 'আচ্ছা, তোমাদের এখানে খেজুর গুড়ের কেক পাওয়া যায় না?' জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্যার, আপনি কি খেজুর পাটালির কথা বলছেন? যথেষ্ট পাওয়া যায়।' তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুড়ি কি পাওয়া যাবে?' তারপর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী একটিন মুড়ি ও কিছু পাটালি গুড় যোগাড় করে লঞ্চে রাখা হলো। তারপর সকালবেলা দেখা গেল, তিনি নিজেই খবরের কাগজ বিছিয়ে নিয়ে তাতে মুড়ি ও পাটালি গুড় ঢেলে সকলকে খেতে বললেন ও নিজেও তাই দিয়ে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে সকালের নাশতা সারলেন। তার আগে আমাদের ধারণা ছিলো না যে, পাক-ভারত উপমহাদেশের যে স্বনামধন্য পরিবারের সন্তান জনাব সোহরাওয়ার্দী এবং তদানীন্তনকালের মুষ্টিমের বি.সি.এল-এর মধ্যে যিনি অন্যতম, তিনি শুধু মুড়ি-পাটালি দিয়ে তাঁর প্রাতঃরাশ সমাপ্ত করতে পারেন।

জনাব নওশের আলী সাহেবের নড়াইল মহকুমার নির্বাচনী প্রচার ও প্রতিটি সভা-সমিতিই এক একটি ওয়াটারলু'র যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। কারণ প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁর ব্যক্তিগত ভক্তের দল বিভিন্ন আকারে ও প্রকারে আমাদের সভা-সমিতিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। চিন্তা করলেও শিহরিত হয়ে উঠতে হয় যে, ভাড়াটে গুন্ডাদের লাঠি, সড়কি, ছোরা, রামদা ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের বিভিন্ন হামলার মধ্যদিয়ে কিভাবে সেদিন জীবন হাতে নিয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিতে হতো। একবার তো একটি সভাস্থলে আক্রমণ সম্পর্কে কর্মীরা পূর্বাহ্নে জানতে না পারলে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের জীবনের কি পরিণতি হতো বলা যেতো না। তাঁর নিরাপত্তার জন্যে কর্মীরা তাঁকে অনুরোধ করলো যে, তিনি যেন অতঃপর নদীর মধ্যস্থল থেকে আয়োজিত সভার উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে, সেটাই হতো পরাজয়ের প্রথম সোপান।

www.pathagar.com

তাই তিনি নিজের জীবনের নিরাপত্তার প্রতি কোনোরূপ ভ্রূক্ষেপ না করেই অবলীলাক্রমে সর্বস্তরের, সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে দ্বিধাহীনচিত্তে অবাধ ও সহজ মেলামেশার মাধ্যমে কর্মীদের মনে অধিকতর মনোবল ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করতেন। নিঃসন্দেহে আমি একথা আজও বিশ্বাস করি, একমাত্র জনাব সোহরাওয়ার্দীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও নির্বাচনী প্রচার ব্যতীত ঐ সময় জনাব নওশের আলীকে পরাজিত করার ক্ষমতা আর কারোও ছিলো না।

এমন উদাহরণ আরো অনেক দেয়া যাবে, তাই বাংলার মানুষ চিরকাল নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করে যে, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ব্যতীত বাংলায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া একটি দুঃস্বপ্ন ছিলো আর বাংলার নির্বাচনের অভূতপূর্ব বিজয় ব্যতীত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই সম্ভব হতো বলে মনে হয় না।

জনাব সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে যাঁরা বলেন যে, তিনি পাকিস্তানের 'অন্যতম স্রষ্টা' তাঁরা প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করে সত্যের অপলাপ করেন। তিনি অন্যতম স্রষ্টা নন। বরং এ প্রশ্নে কায়েদে আজমের পাশেই তাঁর স্থান। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, যে মানুষটির অক্লান্ত পরিশ্রমে ও আত্মত্যাগের ফলে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি পেলো তাঁর দিকে তাকাবার অবসর কারো হলো না; পাকিস্তান অর্জনের পর পাকিস্তানের তৎকালীন শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের সমাধি রচনার প্রতিবাদে যখন স্পষ্ট ভাষণের আওয়াজ তিনি তুলেছিলেন তখন তাঁকেও 'ভারতীয় কুকুর' গাল শুনতে হয়।

দেশ বিভাগের অল্প কিছুদিন পরেই জনাব সোহরাওয়ার্দী গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা মারফত সে খবর পড়ে তদানীন্তন প্রাক্তন কর্মীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। যশোর থেকে আমি ও সিরাজুল ইসলাম সাহেব (তৎকালীন গণপরিষদের সদস্য ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য) তাঁকে দেখার জন্যে কলকাতায় তাঁর সেই ৪০ নম্বর থিয়েটার রোডের বাসভবনে বহুদিন পর পুনরায় সন্ধ্যার সময় হাজির হয়েছিলাম। আমরা সোজাসুজি আমাদের সেই পরিচিত কামরায় প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম, জনাব সোহরাওয়ার্দী অসুস্থ অবস্থায় শায়িত ও তাঁর শয্যাপার্শ্বে রয়েছেন ডাক্তার এ. মালিক, বগুড়ার মরহুম মোহাম্মদ আলী, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কন্যা বেবী (বেগম আখতার সোলায়মান) প্রমুখ। ঢুকেই বুঝতে পারলাম তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও পূর্ব বাঙলার সমস্যা নিয়ে নিজেকে তখনও ব্যস্ত রেখেছেন। যতদূর মনে পড়ে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও সে আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিলো।

এরও কিছুদিন পরের কথা। তখনও তিনি কলকাতার নিঃসহায় মুসলমানদের ছেড়ে পাকিস্তানে আসেননি। তিনি তখনও কলকাতায় আছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় তিনি আসতেন সাম্প্রদায়িক সখ্যতা প্রতিষ্ঠার মানসে পাক-ভারতের শান্তির দূত হিসেবে। মনে পড়ে, তদানীন্তন সরকার তাঁর কলকাতা থেকে পাকিস্তানে এ আগমনকে মোটেই পছন্দ করতেন না। এই সময়ে আমার জীবনে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা সংঘটিত হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি যশোর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই। তদানীন্তন সরকার আমার এই নির্বাচন আদৌ পছন্দ করেননি। কারণ তাঁরা জানতেন যে, আমি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থাবান ছিলাম এবং আমি তাঁরই একজন অনুরক্ত ও ভক্ত। তাই নির্বাচনের পরমুহূর্ত থেকে আমাকে জেলা বোর্ড থেকে অপসারণের

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা চলতে লাগলো।

গান্ধীজী আততায়ী কর্তৃক নিহত হওয়ার পর আমাদের তদানীন্তন সরকারও আবিষ্কার করে ফেললেন যে, কায়েদে আজমকেও হত্যার একটি ষড়যন্ত্র নাকি এখানে চলছিল এবং তাদের এই হত্যা ষড়যন্ত্রের প্রথম দুষ্কৃতকারী তারা আমাকে স্থির করে নেওয়ায় আমার বিরুদ্ধে তখন একটি উচ্চপর্যায়ে তদন্ত শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথমত আমি এই তদন্তের বিষয় কিছুই জানতে পারিনি। কিন্তু শান্তিদূত হিসেবে খুলনা হয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ছোট্ট একটি লঞ্চযোগে যখন যশোরের অন্তর্গত আকরা ঘাটে উপস্থিত হন, আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে একটি জীপযোগে সেখানে হাজির হই। আমি লঞ্চে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেব অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আমাকে প্রশ্ন করেন, কেন আমি কায়েদে আযম সম্পর্কে ঐ মর্মে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছি?

আমি প্রথমে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। কিন্তু পরমুহূর্তে আমার বিরুদ্ধে সরকারি পর্যায়ে যে অভিযোগ আনীত হয়েছিল তিনি তা আমাকে জানান। অভিযোগটি ছিলো এই যে, গান্ধীজীর হত্যার পর আমি নাকি প্রকাশ করেছিলাম যে, কায়েদে আযমও হয়তো একদিন ঐ একই পথে একইভাবে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন।

অভিযোগটির অভিনবত্বে বিস্মিত হতে হয়। ঐ সম্পর্কে আমার যা বক্তব্য ছিলো স্বল্পকথায় আমি তাঁকে তা বুঝিয়ে বলি। আমার বক্তব্য শেষ করতেই তিনি হুঙ্কার ছেড়ে জনৈক অতি উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারকে আহবান করলেন লঞ্চের কেবিন থেকে বাইরে আসার জন্যে এবং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সেই অফিসারটিকে ভর্ৎসনা করলেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমার কাছ থেকে তার আর কিছু শুনবার বা জানবার আছে কিনা। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন আমার সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসিত মন্তব্য করলেন। লঞ্চে উঠবার পূর্ব পর্যন্ত আমি জানতাম না, যে লঞ্চে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ছিলেন সেই লঞ্চটি পুলিশের একজন ডিআইজি'র এবং ঐ লঞ্চে তিনি আমারই বিরুদ্ধে তদন্ত করবার জন্যে যশোর আসছিলেন। ঐ অভিযোগ থেকে সেদিনের মতো আমি রেহাই পেলেও পরবর্তীকালে আমার বিরুদ্ধে EBDO-এর যে নোটিস হয়েছিল তাতেও ঐ অভিযোগটি নিম্ন আকারে ছিলো।

'That on 30-3-48 You remarked in the presence of some persons that the Quide-E-Azam should be killed and his body kept hanging in a public place'.

তাই মাঝে মাঝে ভাবি, সদ্য স্বাধীনতার কাল আর আজ এ দুয়ে এমন কী তফাৎ?

www.pathagar.com

সোহ্‌রাওয়ার্দীকে যেমন দেখেছি

মাহমুদ নূরুল হুদা

১৯৩৪ সালের কথা। আমি তখন কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ি। তখন আমার তিনটি প্রধান সখ ছিলো—খ্যাতনামা অধ্যাপকদের বক্তৃতা শোনা, বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদেরকে চেনা আর ফুটবল খেলা দেখা।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের নাম শুনেছিলাম। জাস্টিস স্যার জাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর পুত্র, স্যার হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র, জাঁদরেল ব্যারিস্টার, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সহকর্মী, কলকাতা করপোরেশনের ডেপুটি মেয়র, খিলাফত কমিটির সক্রিয় নেতা। কিন্তু তাঁকে দেখিনি কখনো—পরিচয়ের সুযোগ হয়নি।

আমার বন্ধু বুলবুল চৌধুরী তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। একদিন দুই বন্ধুতে পরামর্শ করে ১, ওয়েলেসলী ফার্স্ট লেনে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমরা ছাত্র, সুতরাং তাঁর বসার ঘরে প্রবেশ অবারিত।

বইপত্রে ঠাসা ঘরে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব বসেছিলেন। কলকাতার খিলাফত কমিটির অনেক নেতৃস্থানীয় কর্মীর সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই চোগা-চাপকান পরা বয়স্ক ভদ্রলোক। তাঁরা ঘিরে বসে আছেন যে তরুণ আধুনিক কেতাদুরস্ত ব্যক্তিকে, আমরা তাঁরই দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

আমাদের সঙ্গে হেসে কথা বললেন, পরিচয় জানলেন। মুসলমান ঘরের ছেলে হয়েও বুলবুল নৃত্য-গীতের চর্চা করে শুনে তাঁর সাহসের প্রশংসা করলেন। আমি ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিই শুনে মৃদু হাসলেন।

খানিকক্ষণ আলাপের পর আমরা চলে এসেছিলাম। কিন্তু ঐ পরিবেশকে ভুলতে পারিনি। অতিথিদের পোশাকের বৈচিত্র্য শুধু নয়, বইয়ের সমারোহ, বিলিতি কুকুর, উড়ে চাকর দেখেও নয়। তাঁর বাড়ির একাংশে দেখেছিলাম বেশ কয়েকজন দরিদ্র মুসলমান ছাত্র রয়েছেন। জানলাম কেবল এদের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা নয়, লেখাপড়ার খরচও আসে ঐ তরুণ ব্যারিস্টারের উপার্জন থেকে। উত্তরকালে এদের অনেকেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের ব্যক্তিত্ব ছিলো স্বপ্রকাশ। সে ব্যক্তিত্ব এড়িয়ে যাওয়া চলতো না। অন্যকে শুধু বিস্মিত করতো না, মুগ্ধও করতো। আমিও তার ব্যতিক্রম ছিলাম না। তাই একদিন কৌতূহলবশত হাইকোর্টে গিয়েছিলাম ব্যবহারজীবী সোহ্‌রাওয়ার্দীর পরিচয় জানতে।

মামলার বিষয় আজ মনে নেই। প্রধান বিচারপতির এজলাসে চলছিল মোকদ্দমা। একদিকে সোহ্‌রাওয়ার্দী, অন্যদিকে শরৎচন্দ্র বসু। সোহ্‌রাওয়ার্দীর বক্তৃতার স্ফুলিঙ্গ সেদিন মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। শুধু আমার নয়, যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের সবারই। স্তব্ধ হয়ে সারা এজলাস সেই প্রতিভাদীপ্ত তরুণ ব্যারিস্টারের যুক্তি পরম্পরার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

আদালতের এলাকার বাইরে ভারতীয় রাজনীতিতে তখন নানা আলোড়ন চলছে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে লীগপন্থীদের বিরোধ ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। লীগ-

www.pathagar.com

কংগ্রেসের অমিলও তীব্র হয়ে উঠছে। অন্যদিকে মুসলিম ছাত্র আন্দোলন যথেষ্ট সক্রিয় ও সংগঠিত রূপ ধারণ করছিল।

মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্যে তখন সোহরাওয়ার্দী সাহেব বদ্ধপরিকর হয়েছেন। খিলাফত কমিটির অবিসংবাদিত নেতারূপে তিনি মুসলমানদেরকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-ঘটিত মামলায় নিরপরাধ মুসলমানের পক্ষ সমর্থন করছেন আদালতে। মুসলিম লীগের সঙ্গে নিজের রাজনৈতিক ভাগ্য জড়িত করছেন।

এ সময়েই তাঁর কাছাকাছি আসার সৌভাগ্য হয়। তাঁর অসাধারণ গুণ সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম। নেতা সোহরাওয়ার্দী ও কর্মী সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে কোনো ভেদ ছিলো না। এজন্যই তিনি অত জনপ্রিয় হতে পেরেছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিলো এক সহজাত আভিজাত্যবোধ—যাকে অহংকার বললেও ভুল হবে না। কিন্তু কোনো মানুষকেই তিনি কোনোদিন হেয় জ্ঞান করেননি, মানুষ হিসেবে তার মূল্য দিতে কার্পণ্য করেননি। তাই সর্বশ্রেণীর মানুষের বুকভরা ভালোবাসা তিনি পেয়েছিলেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী পর বছর সারাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগের মনোনয়নক্রমে সোহরাওয়ার্দী সাহেব চব্বিশ পরগণা ও উত্তর কলকাতার কেন্দ্র দু'টি থেকে নির্বাচনপ্রার্থী হলেন। নির্বাচনের সময় এগিয়ে এলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর ফলে তাঁর পক্ষে কোনো কেন্দ্রেই যাওয়া সম্ভব হয়নি। পরে দেখা গেল, উভয় এলাকা থেকেই তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। আর উত্তর কলকাতা এলাকায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সেবারই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল তাঁর প্রতি লোক সাধারণের অনুরাগ কত গভীর!

নির্বাচনের পর বাংলাদেশে লীগ-কৃষক প্রজা কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলো। শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী ও খাজা নাজিমউদ্দিন স্বরাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত হলেন আর শ্রম দফতরের ভার পড়ল সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ওপর। ঐতিহ্যবাহী অভিজাত পরিবারের বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত সন্তান সোহরাওয়ার্দী এর বহু আগে থেকেই শ্রমিকদের কল্যাণের জন্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শ্রম দফতরের মন্ত্রী হিসেবে তিনি তাই তাদেরই আপনজন ছিলেন।

এ সময়েই মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে এই সর্বভারতীয় সংগঠনকে ব্যাপকভিত্তিতে পুনর্গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলায় মুসলিম লীগের পুনরুজ্জীবনের ভার নিলেন সোহরাওয়ার্দী। তাঁর চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও ছাত্র আন্দোলন ও শ্রম আন্দোলনের বিষয়ে তিনি বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকাশ করেন এবং এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেন মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা পায়, সে বিষয়ে সাফল্যজনকভাবে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেন।

একালে জনাব সোহরাওয়ার্দী আরেকটি প্রচেষ্টাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে যে সকল সন্ত্রাসবাদী জড়িত ছিলেন, তাঁরা তখনো দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। তাঁদের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী এক আন্দোলন গড়ে ওঠে। মুসলিম লীগের একাংশ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই মুক্তি আন্দোলনে শরিক হন। মুসলিম লীগের মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ চৌধুরী (বাহার) ও কমিউনিস্ট পার্টির জলু সেন এই আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব কেবল এঁদেরকে সমর্থন

www.pathagar.com

দান করেননি, তিনি অচিরেই এঁদের পুরোভাগে এসে দাঁড়ান। এই আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলেই এই নির্যাতিত দেশপ্রেমিকের দল কিছুকাল পর মুক্তিলাভ করেন।

পাকিস্তান দাবির ভিত্তিতে মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো। এ সময়ে আরেকবার দেখেছিলাম যে, নেতা ও কর্মী সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তিনি, দুর্বার বেগে ছুটে চলেছেন এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। নির্বাচনের শেষে দেখা গেল, বাংলাদেশে মুসলিম লীগ শতকরা সাতানব্বইটি আসন দখল করেছে। লীগের এই বিরাট সাফল্যের পেছনে অনেক কর্মীর ত্যাগ ও পরিশ্রম নিহিত ছিলো, সন্দেহ নেই; কিন্তু এককভাবে যাঁর দান সর্বাধিক, তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাঁর ব্যক্তিত্বের এমন আকর্ষণ ছিলো যে, এই নির্বাচনের সময়ে আমি দেখেছি, অনেক অমুসলমানও সোহরাওয়ার্দীর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের যুক্তি স্বীকার করে নিয়ে মুসলিম লীগের নির্বাচনী তহবিলে অকুণ্ঠ র্থদান করেছেন।

নির্বাচনের পর সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে লীগ-মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। কিন্তু অল্পকাল পরই কলকাতা শহরের বুকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা নেমে এলো। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সোহরাওয়ার্দী হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেও মানুষের মর্যাদা দিতে তিনি কখনো কুণ্ঠিত হননি। তাই শুরু থেকেই দৃঢ়হস্তে এই হানাহানি বন্ধ করার জন্যে তিনি দৃঢ়সংকল্প হলেন। বিপদসংকুল কলকাতার রাস্তায় অনেক সময়ে বিনা প্রহরায় তিনি নিজের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন—একবার কন্ট্রোল রুমে একবার উপদ্রুত এলাকায় ছুটে বেড়িয়েছেন সকল পরামর্শ অগ্রাহ্য করে। প্রহরা নিয়ে বের হওয়াও তখন বিপজ্জনক ছিলো। একবার বৌবাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন নিজের গাড়িতে। হঠাৎ সশস্ত্র গুন্ডার দল তাঁর গাড়ি ঘিরে দাঁড়ালো। তাঁর দেহরক্ষীরা গুলি ছুড়তে যাচ্ছিলো—তিনি তাদেরকে নিরস্ত করেন। মুহূর্তে গাড়ি খুলে তিনি নেমে এসে গুন্ডাদের মুখোমুখী দাঁড়ালেন। বললেনঃ আমাকে মারলে যদি সমস্যার সমাধান হয়, তবে মারো। কিন্তু জেনে রেখো এতে তোমরা লাভবান হবে না বরং নিজেদের বিপর্যয় ডেকে আনবে।

তাঁর সাহস ও তেজোদৃপ্ত ভাষণের সামনে উদ্যত অস্ত্রকে অবনত হতে হলো।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর সোহরাওয়ার্দী ফিরে আসছিলেন গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভা থেকে—যেখানে সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সোহরাওয়ার্দী তখন বিভিন্ন এলাকায় শান্তি-মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। সোহরাওয়ার্দীর গাড়ি বি.এল.এ. ২০০০কে লক্ষ্য করে একদল লোক হাতবোমা নিক্ষেপ করলো। চলন্ত গাড়িতে বোমা লক্ষ্যে পৌছায়নি—কিন্তু গাড়ির অগ্রভাগ বোমার আঘাতে উড়ে গেল। প্রহরীদেরকে গুলি চালাতে নিষেধ করে নির্ভয়ে সোহরাওয়ার্দী আক্রমণকারীদের দিকে এগিয়ে গেলেন। আবার বললেন তাঁর কথা। অবনত মস্তকে দুর্বৃত্তের দল পালিয়ে গেল। এই ঘটনার বিবরণ শুনে গান্ধীজী এক বিবৃতি দেন এবং সোহরাওয়ার্দীর প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তখন দুর্বৃত্ত দল গান্ধীজীর কাছে এসে তাদের অপরাধের জন্যে মার্জনা ভিক্ষা করে।

এই সাম্প্রদায়িক হানাহানির দিনে সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিগত সেবক ছিলো তাঁর উৎকলবাসী ভৃত্য শিবু। ১৯৪৩ থেকে ৪৬ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী সাহেবের রাজনৈতিক সেক্রেটারিরূপে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। আসলে শিবু ছিলো

www.pathagar.com

তাঁর সচিব—সে যেমন প্রভুভক্ত, তেমনি বিশ্বাসী। তার কাছে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সকল অর্থ গচ্ছিত থাকতো। এমন কি মুসলিম লীগ তহবিলের টাকা যা তাঁর হাত দিয়ে খরচ হতো—তাও থাকতো শিবুর তত্ত্বাবধানে। সে ছিলো গোঁড়া হিন্দু। কাজের শেষে স্নান করে সে স্বপাক অন্ন খেত, অন্যের রান্না ছুঁতো না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে অনেকে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে উপদেশ দিলেন শিবুকে বিদায় করে দিতে। এসব কথার জবাবে তিনি শুধু মৃদু হাসতেন। শিবুকে বললাম, 'সকলে তো বলছে তোমার এখন চলে যাওয়া উচিত।' সে বললঃ 'সাহেবকে ছেড়ে কোথাও যাব না।' কোথা থেকে এক রামদা জোগাড় করে এনে শিবু তার সাহেবকে পাহারা দিতো। সে যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ সাহেবের নিরাপত্তার দায়িত্ব তারই।

এর পরবর্তীকালের ঘটনা প্রায় সকলেই জানেন। দাঙ্গা থামলো, স্বাধীনতাদানের ঘোষণা করা হলো, মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি দলের সভায় পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রিসভার নেতৃত্বভার সোহরাওয়ার্দীর পরিবর্তে খাজা নাজিমউদ্দিনের ওপর অর্পণ করা হলো। সোহরাওয়ার্দী রয়ে গেলেন কলকাতায় যেখানে আরো বহু মুসলমান রয়ে গিয়েছিল। অনতিকাল পরে ভারতে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলো। এবারে গান্ধীজীর সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী বের হলেন শান্তি-মিশনে। একথা সবাই জানেন যে, গান্ধীজীর শান্তি-মিশনে সোহরাওয়ার্দীর অন্তর্ভুক্তি ভারত সরকার পছন্দ করেননি। আরো দুঃখের ঘটনা ঘটলো শান্তি মিশন নিয়ে তিনি যখন পূর্ব পাকিস্তান সফরে বের হলেন। যশোর, খুলনা, বরিশাল সফর শেষে আমরা যাচ্ছি টাঙ্গাইলে। সরকারি নির্দেশে সোহরাওয়ার্দী সাহেব এবং আমাদের সকলকেই টাঙ্গাইল যাবার পথে বাধা দেওয়া হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হলো সীমান্তের অপর পারে। কিন্তু সেদিন সকলেই একথা বুঝেছিল যে, এই লোকটি ছিলেন সকল ধর্মবিরোধের উর্ধ্বে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব যতদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন, ততদিন এখানে আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো সাম্প্রতিক ঘটনাও ঘটতো না।

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের তিনটি প্রধান শখ ছিলো। ছবি তোলা, বই পড়া এবং রেকর্ডে যন্ত্র বা কণ্ঠসঙ্গীত শোনা। সাহিত্য-সঙ্গীতের প্রতি এই অনুরাগ তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। তাঁর অগ্রজ শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গীতানুরাগ সর্বজনবিদিত। কলকাতায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গীতানুরাগ সর্বজনবিদিত। কলকাতায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বাড়িতে মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও কাওয়ালীর আসর বসতো।

তিনি যে দরিদ্র ছাত্রদের স্বগৃহে রেখে পড়াতেন, সেকথা বলেছি। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যেকোনো দরিদ্র ব্যক্তির পুত্র-কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কিংবা স্বজনের মৃত্যু উপলক্ষে তিনি অকাতরে সাহায্য করেছেন। কবি-সাহিত্যিকেরাও তাঁর অর্থ সাহায্য থেকে বঞ্চিত হননি, এঁদের মধ্যে যে দু'জনের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করা যায়, তাঁরা হলেন কবি নজরুল ইসলাম ও কবি শাহাদাৎ হোসেন। দলমতনির্বিশেষে রাজনৈতিক কর্মীরাও তাঁর সাহায্য লাভ করেছেন। তাঁরা জানতেন যে, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ভাণ্ডার শূন্য না হলে তাদের পরিবারবর্গের অনশনে মৃত্যু হবার সম্ভাবনা নাই।

কলকাতায় বুলবুল চৌধুরীর অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী একাধিকবার সাহায্য করেছেন। এমন কি ১৯৫০ সালে বুলবুল যখন পশ্চিম পাকিস্তান সফরে যান তখন সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাকে পাঁচশ' টাকা দিয়ে সাহায্য করেন।

www.pathagar.com

নৃত্যসঙ্গীতের প্রতি সোহরাওয়ার্দীর আন্তরিক অনুরাগের জন্য এবং বুলবুলের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহের জন্যে বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই আমরা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করি। তিনি যখন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা তখন এই একাডেমী পরিদর্শন করতে আসেন। পরিদর্শকের খাতায় তিনি নিজ হাতে লিখলেন-

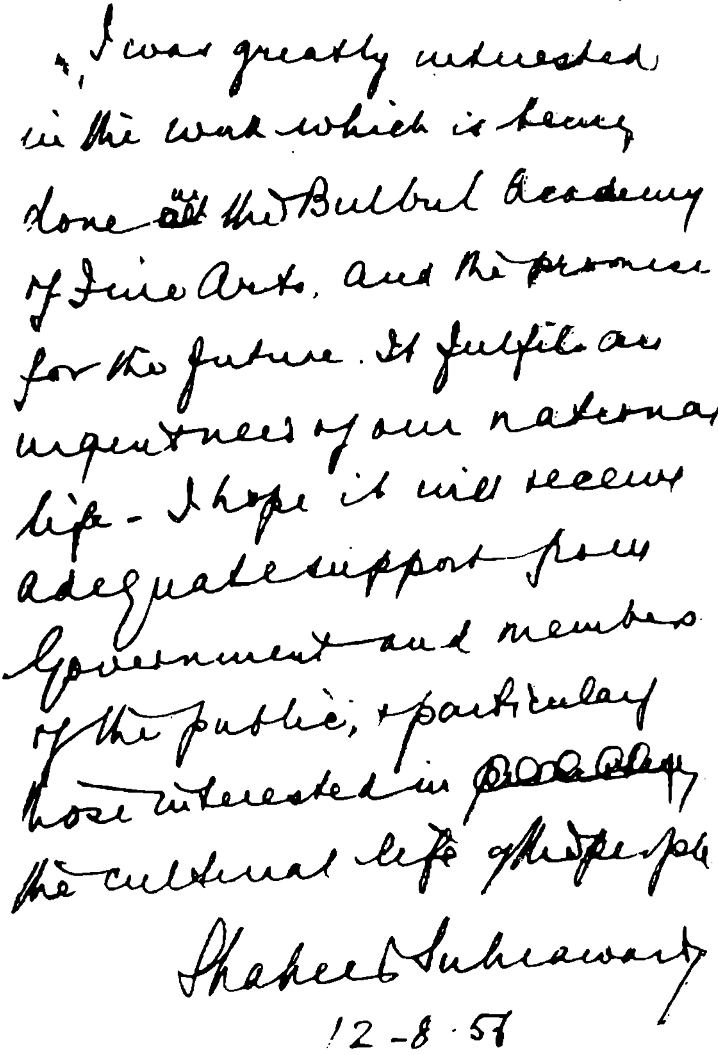
I was greatly interested in the work which is being done at the Bulbul Academy of Fine Arts, and the promise for the future. It fulfils an urgent need of our national life. I hope it will receive adequate support from Government and members of the public, & particularly those interested in the cultural life of the people.

Shaheed Suhrawardy

12-8-57

আসলে সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে যে গতিশীল ব্যক্তিত্বটি বাস করতো, তা ছিলো সর্বব্যাপী। শ্রমিকের কুটির থেকে নবাবের প্রাসাদে, রাজনীতির মঞ্চ থেকে সঙ্গীতের আসরে, গ্রন্থাগার থেকে ক্রীড়াক্ষেত্রে—সর্বত্রই তা ছিলো সঞ্চরণশীল। এদেশের মানুষ তাঁকে কোনোদিন ভুলবে না। মনে হয়, আজ তাঁর এই গতিশীলতা একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। জীবনের সীমানা পেরিয়ে লোকান্তরে তাঁর সহজ আসন করে নিয়েছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের ইতিহাসের যোগ্যতম প্রতিনিধি মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দী

নূরুদ্দিন আহমদ

জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের সহিত আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম। জনাব সোহরাওয়ার্দীর সহিতও আমার পরিচয় ছিলো। জনাব সোহরাওয়ার্দীর সহিত আমার পরিচয়ের যে খণ্ড খণ্ড স্মৃতি আমার মনে আছে, তাঁহার ভাবী জীবনীকারকের পক্ষে তাহা কাজে লাগিতে পারে, এই আশায় আমি তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছি।

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার এক বিশিষ্ট মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে পরিবারটি একটি বিশেষ ঐতিহ্যের অধিকারী ছিলো। তাঁহার নানা মরহুম মৌলভী ওবায়দুল্লাহ (আল-ওবায়দী) পশ্চিমবঙ্গের হুগলী কলেজে আরবীর অধ্যাপক ছিলেন। সেখান হইতেই ১৮৭৩ সালে তাঁহার মূল্যবান গ্রন্থ 'এ গ্রামার অন এ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ' প্রকাশিত হয়। তৎকালীন বৃটিশ ভারতের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজসমূহের ছাত্রদের জন্য তিনি এই পুস্তক রচনা করেন এবং এইভাবে ছাত্রদের বহুদিনের একটি অভাব পূরণ করেন। এই বিখ্যাত মনীষীকে ইহার পর ঢাকা মাদ্রাসায় উহার সুপারিন্টেন্ডেন্টরূপে বদলি করা হয়।

তাঁহার কন্যা খুজেস্তা আখতার বানুর (শহীদ সাহেবের আম্মা) বিবাহ হয় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে। শহীদ সাহেবের আব্বা মরহুম জনাব জোহাদুর রহিম জাহেদ স্যার জাহিদ সোহরাওয়ার্দী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি নাইট স্যার খেতাবে ভূষিত হন এবং পরে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন।

মরহুম জাহিদ সোহরাওয়ার্দী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম.এ পাস করিয়া এল.এল.বি ডিগ্রী গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি অবিভক্ত বঙ্গের বৃহত্তম জেলা চব্বিশ পরগণার জেলা আদালতের উকিল হিসেবে আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন। সেখানে চারি বৎসর আইন ব্যবসায়ের পর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের আপীল আদালতে উকিল হিসাবে তালিকাভুক্ত হন। এখানে কয়েক বৎসর তিনি আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় কোনো ভারতীয় হাইকোর্টে কেহ কিছুকাল উকিল হিসাবে কাজ করিলে বিলাতের ইন্‌গুলিতে যোগদানের ব্যাপারে তাঁহার ক্ষেত্রে শর্তাবলী কিছুটা শিথিল করা হইতো। শহীদ সাহেবের আব্বা জনাব জোহাদুর রহিম জাহেদও এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পড়িতে যান। নিজের ইংল্যান্ড যাত্রার কিছুকাল পূর্বে তিনি নিজের দুই পুত্র হোসেন শাহেদ ও শহীদকে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে প্রেরণ করেন।

www.pathagar.com

জনাব জোহাদুর রহিম জাহেদ ডিস্টিংশনসহ ব্যারিস্টারি পাস করিয়া বহু মূল্যবান পুরস্কার লাভ করেন। অতঃপর তিনি পারিবারিক 'সোহরাওয়ার্দী' উপাধি গ্রহণ করেন এবং ব্যারিস্টার হিসাবে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ইহার পর তিনি কলিকাতা স্মল কজেস কোর্টের জর্জ নিযুক্ত হন। এই পদে ইস্তফা দিয়া তিনি পরে রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হন। এই সময় মরহুম নওয়াব স্যার শামসুল হুদা কে.সি.আই.ই কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে অবসর গ্রহণ করিলে একজন মুসলমান বিচারপতির পদ খালি হয়।

জনাব সোহরাওয়ার্দী এবং হাইকোর্ট বারের অপর কতিপয় ব্যক্তি এই পদে নিয়োগের উপযুক্ত ছিলেন এবং প্রধান বিচারপতি স্যান্ডারসন তাঁদের মধ্য হইতে কাহাকেও এই পদে নিয়োগের জন্য মনোনীত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি কোনো মুসলিম আইনজীবীকে এই পদে নিয়োগে অসম্মতি জানাইলেন। হিন্দু সহকর্মীদের প্রভাবে তিনি মুসলমানদের কিছুতেই ভালো চক্ষে দেখিতে চাহিতেন না। ইহার অল্প কিছুদিন আগেই তিনি বিখ্যাত আইনজীবী ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী স্যার রাসবিহারী ঘোষের বৈমাত্রেয় ভাই পরলোকগত মিস্টার বিপিনবিহারী ঘোষকে হাইকোর্টের আপীল কোর্টে নিযুক্ত করেন। স্যান্ডারসন তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড একটি বড় রকমের অবিচার বন্ধের জন্য প্রধান বিচারপতির মনোনয়ন বাতিল করিয়া দেন। বাংলার তৎকালীন গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের সুপারিশক্রমে তিনি বিশিষ্ট আইনজ্ঞ জনাব স্যার শামসুল হুদাকে এই পদে নিযুক্ত করেন। ঘটনাক্রমে স্যান্ডারসনের পূর্ববর্তী প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিনস নবাব স্যার শামসুল হুদাকে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি মনোনীত করেন। কিন্তু লর্ড হার্ডিঞ্জের নির্দেশে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের একজিকিউটিভ সদস্যের পদ গ্রহণ করিবার ফলে তাঁহাকে উক্ত পদের দাবি ত্যাগ করিতে হয়। নবাব শামসুল হুদা ইতিমধ্যে ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিল হইতেও অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুন তিনি হাইকোর্ট বেঞ্চেও বেশিদিন কাজ করিতে পারেন নাই।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, লর্ড হার্ডিঞ্জ নবাব শামসুল হুদাকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি ভাইসরয়ের কাউন্সিল হইতে অবসর গ্রহণের পর সর্বপ্রথম কলিকাতা হাইকোর্ট বেঞ্চের যে পদটি খালি হইবে, তাহা তাঁহাকেই দেওয়া হইবে। ভাইসরয় এই মর্মে একটি মন্তব্যও রাখিয়া যান। ইতিমধ্যে লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিনস যিনি তাঁহাকে বিচারপতি পদের জন্য মনোনীত করেন, ভারত ত্যাগ করেন এবং তাঁহাদের স্থলে লর্ড চেমসফোর্ড ভাইসরয় এবং স্যার ল্যান্সেলট স্যান্ডারসন প্রধান বিচারপতি হইয়া আসেন। লর্ড চেমসফোর্ড এ সকল বিষয় অবহিত ছিলেন না। তাহা ছাড়া স্যান্ডারসনও নবাব শামসুল হুদার নিয়োগের বিরোধিতা করেন। স্বভাবতই লর্ড চেমসফোর্ড নবাব শামসুল হুদার নিয়োগে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এই কারণে নবাব শামসুল হুদা ইংল্যান্ডে লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট একখানি পত্র লেখেন এবং যে অবস্থায় তাঁহাকে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ অনতিবিলম্বে এই পত্রের জবাবে জানান যে, এ বিষয়ে তিনি স্বরাষ্ট্র দফতরে একটি মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার সেক্রেটারি ডু বুলে—যিনি তখনও ভারতে ছিলেন—এ বিষয় অবহিত আছেন।

www.pathagar.com

নবাব শাসমুল হুদা লর্ড কারমাইকেলকে এইসব বিষয় অবহিত করিলেন। লর্ড কারমাইকেল সমস্ত বিষয়টি হাতে লইলেন এবং দৃঢ়ভাবে জানাইয়া দিলেন যে, ভাইসরয় হয় তাঁহাকে (কারমাইকেল) রাখিবেন, আর না হয় প্রধান বিচারপতি স্যান্ডারসনকে রাখিবেন। শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাদ্বয়ের মধ্যে বেশ একটি গোলমাল বাধিয়া গেল। অবশেষে শাসন বিভাগই এ ব্যাপারে জয়ী হইলো এবং নবাব শামসুল হুদা বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন।

নবাব শামসুল হুদার অবসর গ্রহণের পর বিচার ও শাসন বিভাগের মধ্যে আবার অনুরূপ বিরোধ দানা বাঁধিয়া উঠিলো। স্যান্ডারসন আবারও কোনো মুসলমানের বদলে বিপিন বিহারী ঘোষের পক্ষেই সুপারিশ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে স্যার আবদুর রহিম মাদ্রাজ হাইকোর্ট হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বাংলার তদানীন্তন গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। তিনি নিজের প্রভাব প্রয়োগ করিয়া লর্ড রোনাল্ডসকে দিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে সুপারিশ করাইয়া লইলেন—যদিও তার অল্প কিছুদিন আগে স্যান্ডারসনের খপ্পরে পড়িয়া লর্ড রোনাল্ডস জনাব সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে সুপারিশ করিতে অসম্মতি জানাইয়াছিলেন।

ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড ভারত সরকারের তদানীন্তন গ্রীষ্মকালীন সদর দফতর সিমলায় বসিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীকে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করিলেন। ইহার পর তিনি যখন কলিকাতায় আসিলেন তখন স্যান্ডারসন জনাব সোহরাওয়ার্দীর নিয়োগ প্রতিরোধ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি ভাইসরয়কে জানাইলেন যে, প্রধান বিচারপতির মতের বিরুদ্ধে কখনও কাহাকেও বিচারপতি নিযুক্ত করা হয় না। এই ধরনের নিয়োগে বিচার বিভাগের প্রধান হিসাবে তাঁহার সম্মানের ক্ষতি হইবে। কিন্তু ভাইসরয় বলিলেন যে, তিনি জনাব সোহরাওয়ার্দীকে আগেই নিয়োগ করিয়া ফেলিয়াছেন। ঘটনাক্রমে জনাব সোহরাওয়ার্দী ইহার পূর্বে কলিকাতা স্মল কজেস কোর্টের একজন বিচারক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পদটি প্রথমে একজন নবীন আইন ব্যবসায়ীকে প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তিনি উহা গ্রহণে অসম্মতি জানান। বাংলার তৎকালীন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল জনাব শামসুল হুদার সুপারিশেই জনাব সোহরাওয়ার্দীকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। জনাব শামসুল হুদা সেই সময় গভর্নরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় সদস্য ছিলেন।

যাহা হউক, নিরপেক্ষ বিচারে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী জর্জ হিসাবে, নিজের সামর্থ্যের দ্বারা তাঁহার নিয়োগের যৌক্তিকতা প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সরলতা ও সুষ্ঠুতাই ছিলো তাঁহার রায়ের বৈশিষ্ট্য। মুসলিম আইনের প্রশ্নে তিনি কতিপয় মূল্যবান রায় দান করিয়াছেন। বেঞ্চ হইতে অবসর গ্রহণ করার সময় তাঁহাকে প্রচলিত নিয়মে নাইট খেতাবে ভূষিত করা হয়। ফার্সীতে তিনি একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি যখন যশের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন তখনই তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁহার পত্নী, মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আম্মা একজন অসাধারণ গুণবতী রমণী ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি 'আয়না-ই-ইবরাত' নামে একখানি অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক রচনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তকখানিকে পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদন করে। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নারী শিক্ষার পথ

প্রদর্শনকারিণীদের তিনি ছিলেন অন্যতমা। মুসলমান বালিকাদের জন্য কলিকাতায় তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধরনের স্কুল সম্ভবত ইহাই প্রথম। মুসলিম নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি জীবনব্যাপী আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অত্যন্ত সুশীলা, দানশীলা ও দয়াবতী রমণী বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিলো। গরীব-দুঃখীদের প্রতিও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীলা।

তাঁহার ভ্রাতা (শহীদ সাহেবের মামা) মরহুম ডক্টর আবদুল্লা সোহরাওয়ার্দী কলিকাতা হইতে এম.এ পাস করিয়া ইংল্যান্ডে আইন অধ্যয়ন করিতে যান। সেখানে তিনি ডক্টরেট লাভ করেন এবং ইংল্যান্ডের আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন। ইসলামের এই অধ্যবসায়ী সন্তান সেখানে থাকাকালেই মরহুম জামালউদ্দিন আফগানির প্যান-ইসলামিক আন্দোলনের প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার এই কার্য সুলতান আবদুল হামিদের মতো লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ডক্টর আবদুল্লাকে মজিদিয়া উপাধিতে ভূষিত করেন। বৃটেন হিংসাবশে সুলতান আবদুল হামিদকে ইউরোপের 'পীড়িত ব্যক্তি' আখ্যা দান করে।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কিছুকাল লাহোরের ইসলামিয়া কলেজের প্রিন্সিপালের পদে কাজ করেন। তারপর এই পদ ত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া আইন ব্যবসায় শুরু করেন। কিন্তু তিনি আইন ব্যবসায়ে কোনোদিন টিকিয়া থাকেন নাই। আইন এবং আরবীর অধ্যাপক ও পরীক্ষক হিসাবে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'টেগোর ল' প্রফেসর নিযুক্ত করেন। মোটামুটি রকম পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা থাকায় পদটি সবার জন্যই অত্যন্ত লোভনীয় ছিলো। স্বীয় জেলা মেদিনীপুরের জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং পরে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও সর্বোচ্চ আইন পরিষদের সদস্যরূপে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। রাজনৈতিক দিক হইতে তিনি অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় আইনসভার কোনো নির্বাচনেই তিনি কোনোদিন প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে পরাজয় বরণ করেন নাই। বৃটিশ সরকার তাঁহাকেও নাইট খেতাবে ভূষিত করেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও স্পষ্টভাষী ছিলেন। সারল্য ও নিষ্ঠা ছিলো তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ, আজকালকার যুগে যা চোখেই পড়ে না। অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

এক্ষণে গোড়ার কথায় আসা যাউক। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরবীতে এম.এ ডিগ্রী গ্রহণ করিয়া ইংল্যান্ডে গমন করেন এবং সেখানে আইন অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি বিসিএল ডিগ্রী লাভ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। সেই সময়কার একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ছিলেন মিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস। তিনি একজন বিখ্যাত আইনজীবীও ছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের তিনি ছিলেন নির্বাচিত মেয়র। স্থানীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এই করপোরেশনের তখন বিরাট প্রভাব ছিলো।

জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী চিত্তরঞ্জন দাসের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং চিত্তরঞ্জন দাসের প্রচেষ্টায় তিনি করপোরেশনের ডেপুটি মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হন। চিত্তরঞ্জনন দাস ও তাঁহার হিন্দু অনুগামীদের সাহায্য না পাইলে সে সময় কোনো মুসলমানের পক্ষে এই পদে নির্বাচিত হওয়ার আশা ছিলো না। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে এইভাবে প্রথমে

www.pathagar.com

অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ রাজনীতিতে এবং পরে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে প্রবেশ করিতে হয়।

ইতিমধ্যে মিস্টার দাসের মৃত্যু হইলো এবং মিস্টার গান্ধী বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে প্রবেশ করিলেন। মিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস অত্যন্ত দূরদর্শী রাজনীতিক ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, মুসলমানদের ওপর ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার না করিলে এবং দেশের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে আইনসঙ্গত অংশ না দিলে দেশের রাজনৈতিক মুক্তি সাধন সম্ভব হইবে না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিলো সাধু। ছল-চাতুরী বা ধোঁকাবাজির কোনো স্থান ছিলো না তাঁহার মনে। এজন্য তিনি মুসলমানদের আস্থাও অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশ বিষাক্ত হইয়া উঠিলো। আল্লার অনুগ্রহে এই সংকটক্ষণে একজন সুদক্ষ নেতার আবির্ভাব হইলো। মিস্টার গান্ধীর চাতুরী বুঝিবার মতো পর্যাপ্ত বিচক্ষণতার অধিকারী ছিলেন তিনি। মোহাম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলমানদের সাথে আলাপ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে হিন্দুরা মিস্টার গান্ধীকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়া বসিয়াছিল। মুসলমানরা এই সময় হতাশ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়ে। বৃটিশ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিপক্ষ এই সময় যে ষড়যন্ত্র চালাইয়া যাইতেছিল, তাহার সহিত মুসলমানরা কোনোক্রমেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এই সময় দ্রুত মুসলমানদিগকে সংগঠিত করিতে লাগিলেন। হিন্দুদের মধ্যে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো। কিন্তু তিনিও তাঁহাদের ছল-চাকরী বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের প্রভাব কাটাইয়া উঠিলেন। স্বভাবসিদ্ধ উদ্যম ও কর্মশক্তি লইয়া তিনি কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং কায়েদে আজমের একজন বিশ্বস্ত সেনানীতে পরিণত হইলেন। কায়েদে আজমের প্রেরণাময় নেতৃত্বে তিনি অন্যান্য মুসলমান নেতার সমবায়ে মনেপ্রাণে কাজ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে জয়ী হইয়া পাকিস্তান হাসিল করিলেন।

কলিকাতার হিন্দুরা যখন মুসলিম নিধন অভিযান চালায় তখন জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া একটি বিপজ্জনক এলাকা হইতে অপর বিপজ্জনক এলাকায় ছুটিয়া যান এবং নিজের বিপদ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া বিপজ্জনক এলাকাসমূহ হইতে সমস্ত মুসলমানকে উদ্ধার করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দীর পত্নী অতি অল্প বয়সেই মারা যান। তাঁহার গর্ভে জনাব সোহরাওয়ার্দীর একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মলাভ করে। পুত্রটি অতি অল্প বয়সেই মারা যায়। কন্যাটি হইতেছেন বর্তমানের বেগম আখতার সোলায়মান। একটি সুপ্রাচীন পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী সংকটজনক সময়ে অবিশ্রান্তভাবে কাজ করেন এবং এজন্য তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জনাব সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক কর্মজীবন কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়। যাহা হউক, ১৯৪৯ সালে তিনি পাকিস্তানে আগমন করেন এবং অবিলম্বে স্বভাবসিদ্ধ উদ্যমসহকারে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে তাঁহার রাজনৈতিক সংগঠনের কাজ শুরু করেন। 'মুসলিম' শব্দটি অবশ্য পরে দলের নাম হইতে বাদ দেয়া হয়। অতঃপর তিনি মরহুম জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হকের সহিত হাত মিলান। কৃষক-শ্রমিক পার্টি নামে জনাব ফজলুল হকের অপর একটি রাজনৈতিক দল ছিলো। অতঃপর এই দুই নেতা যুক্তফ্রন্ট

www.pathagar.com

নামে একটি কোয়ালিশন গঠন করেন এবং ১৯৫৪ সালে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করেন। এই নির্বাচনে জয়ী হইয়া জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তান ও কেন্দ্রে ক্ষমতা লাভ করেন।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা ও পরিশ্রম সম্পর্কে যাঁহারা অবহিত আছেন তাঁহাদের কাছে বৈরুতে তাঁহার মৃত্যু বিস্ময়কর মনে হয় নাই। পাক-ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ নেতার মতোই তিনি স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন এবং তাঁহার সকল শক্তি রাজনৈতিক সাধনায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত হওয়ার পূর্বেই হাসপাতাল ত্যাগ করেন।

এজন্য তাঁহার দেহ ও মনের পূর্ণ বিশ্রামের আবশ্যক ছিলো। কিন্তু ইহা না করিয়া তিনি বিমানযোগে ইংল্যান্ড এবং পরে সেখান হইতে বৈরুত যাত্রা করেন। সেখানেও তিনি কোনো বিশ্রাম পান নাই। কারণ, দল এবং রাজনীতি সম্পর্কে পরামর্শ ও আলাপ আলোচনার জন্য তাঁহার অনুসারীরা সেখান পর্যন্ত গমন করিতে দ্বিধা করেন নাই।

করুণাময় আল্লাহ্‌ তাঁহার আত্মার মাগফিরাত করুন। আমিন।

www.pathagar.com

শহীদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান সফর

সাংবাদিক-জীবনের একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতা

এম. আর. আখতার মুকুল

সাবেক পাঞ্জাব প্রদেশ সফরের শেষপর্যায়ে আমরা এসে হাজির হলাম মন্টগোমারিতে। মাত্র একদিনের প্রোগ্রাম—তাও আবার কোনো জনসভার আয়োজন করা হয়নি। তাই একটানা কর্মব্যস্ত সফরের বেশ কিছুকাল পরে এবার আমরা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। সকাল দশটার দিকে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্থানীয় বার লাইব্রেরিতে গেলেন। আর আমরা দরজা বন্ধ করে বসলাম তাস খেলতে। আমাদের সঙ্গে লাহোরের দু'জন তরুণ এ্যাডভোকেটও শরিক হলেন। বেশ কিছুক্ষণ আমরা চুটিয়ে তাস খেললাম।

দুপুরের খাওয়ার সময় শহীদ সাহেবকে বেশ গম্ভীর দেখলাম। কোথা দিয়ে কি হলো কিছুই বুঝতে পারলাম না। বিকেলে শুনলাম, ওই দু'জন এ্যাডভোকেটকে লাহোরে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তাস খেলার শাস্তি হিসেবে এঁরা জনাব সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সাবেক সীমান্ত প্রদেশ সফর থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অথচ এঁরা দু'জনই শহীদ সাহেবের বিশেষ স্নেহভাজন ব্যক্তি। জানতে পারলাম, সফররত পূর্ব পাকিস্তানী সাংবাদিকদের আরো অভিজ্ঞতা লাভের ব্যাপারে সাহায্য না করে তাস খেলায় ব্যস্ত রাখার খেসারত হিসেবে এঁদের প্রতি এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে, আমরাও নিজেদেরকে শুধরে নিয়েছি এবং তারপর এই সফরকালে আর কখনও আমরা তাস খেলতে বসিনি কিম্বা অযথা সময় নষ্ট করিনি।

পরদিন সকালে আমরা থল মরুভূমির মধ্যদিয়ে রওয়ানা হলাম ডেরা ইসমাইল খানের পথে। মোট ছ'খানা মোটর আর একখানা জীপ নিয়ে আমাদের গাড়ির বহর তৈরি হলো। এই মরুভূমিই সাবেক পাঞ্জাব আর সীমান্ত প্রদেশকে পৃথক করে রেখেছে। থল মরুভূমির বুক চিরে চমৎকার পাকা রাস্তা বেরিয়ে গেছে। আর সেই রাস্তায় আমাদের গাড়িগুলো উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলেছে গন্তব্যের পথে। শীতের তখন শুরু। তাই উপজাতীয়দের কাফেলা কড়া শীত পড়বার আগেই নেমে আসতে শুরু করেছে সমভূমির দিকে। মাঝে মাঝে এরা তাঁবু গেড়ে রাত্রি যাপন করছে কিন্তু সুযোগ পেলেই এরা পথচারীদের সর্বস্ব লুটপাট করে নিচ্ছে। অনেক সময় পথচারীদের হত্যা করতেও এরা দ্বিধা করে না। এদেরই একাংশ আফগানিস্তানের লস্কর নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটায় এই লস্করদের পাকিস্তান প্রবেশ একসময় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

পড়ন্ত বেলায় আমরা গিয়ে পৌছলাম বাখ্খারে। এটাকে একটা ধুলোর শহর বললেও সম্পূর্ণ বলা হয় না। সামরিক শাসনামলের প্রখ্যাত বিচারপতি মরহুম কায়ানী তাঁর 'চাঞ্চল্যকর' বক্তৃতাগুলোর একটাতে এই শহরের উল্লেখ করেছিলেন। বাখ্খারে আমরা কোনোরকম বিশ্রাম না নিয়েই চলে আসলাম দরিয়া ইয়ারখানে। ছোট রেল স্টেশনের

www.pathagar.com

ওয়েটিং রুমে আমরা মুখ-হাত ধুয়ে এক কাপ চা খেতে বসেছি। কিন্তু পাঞ্জাবি স্টেশন মাস্টার তাতে বাদ সাধলেন। মিনিট কয়েকের মধ্যেই তিনি রাজসিক খাবারের আয়োজন করলেন। তখন আর আমাদের না বলবার সময় ছিলো না। সমস্ত দিনের ধকলের পর ক্ষুধার্ত মানব সন্তানের দল নিমেষে সবকিছু সাবাড় করে দিলো।

মেহমানদারির জন্য পাঠানদের সুনামের অন্ত নেই—এ ব্যাপারে অবশ্য বাঙালিরাও গর্ব অনুভব করে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পাঞ্জাবিরা যে পিছিয়ে নেই, তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আমরা এই সফরে পেয়েছি। জানি না, তাদের মনের গহনে কি লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, আমাদের প্রতি ওদের ব্যবহার, কৌতূহল আর মেহমানদারি তুলনাহীন। অথচ আমাদের দলেই একজন ছিলেন, যিনি পাঞ্জাব সফরকালে কোনো পাঞ্জাবির বাসায় কোনোরকম আহার্য পর্যন্ত গ্রহণ করেননি। রোজ দেখেছি এই অবাঙালি ভদ্রলোক দোকান থেকে পাউরুটি কিনে এনে নিজ হাতে স্যাণ্ডুইচ বানিয়ে খেয়ে দিন কাটিয়েছেন। ভদ্রলোক জাতিতে গোয়ানিজ।

যাক, যা বলছিলাম। আবার আমাদের কাফেলা রওয়ানা হলো। পেছনে ফেলে এলাম দরিয়া ইয়ার খান। এবারে আমরা চলেছি সিন্ধুর তীর এলাকার মাঝখান দিয়ে। কোথাও পানির নিশানা পর্যন্ত নেই। চারদিকে খালি ধুলো আর ধুলো—এরই ওপর খড় পেতে মোটর যাওয়ার জন্য মাইল কয়েক রাস্তা করা হয়েছে। কিন্তু মজা হচ্ছে, একটা মোটর যাবার অন্তত মিনিট দশেকের মধ্যে সে রাস্তায় আর কারও এগোবার উপায় নেই। যা হোক, শেষ পর্যন্ত আমরা এসে হাজির হলাম ডেরা ইসমাইল খানে—একেবারে পাঠান মুলুকে। শহর থেকে মাইল কয়েক দূরে জাকোরীর পীর সাহেবের বাড়ি। আমরা তাঁরই মেহমান হলাম। ইনি শুধু পীরই নন, রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে জনাব সোহরাওয়ার্দীর সমর্থক এবং পাকিস্তান আন্দোলনে এঁর দান যথেষ্ট।

মুখ-হাত ধুয়ে বিশ্রাম নেবার সময় শুনলাম শহীদ সাহেব রাত ন'টায় ডেরা ইসমাইল খানে এক জনসভায় বক্তৃতা করবেন। রাতে জনসভা? শুনে আমরা সব ক'জন বাঙালি সাংবাদিকই অবাক হয়ে গেলাম। ঠিক হলো, রাতের খাওয়া সেরে আমরা সভায় যাবো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খেতে যাওয়ার ডাক পড়লো। ডাইনিংরুমের মেঝেতে খানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে এক এলাহী ব্যাপার! গোটা চারেক আস্ত রোস্ট করা দুম্বা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে দস্তরখানের ওপর আর তার পাশে বিরাট বিরাট গামলা ভর্তি থিক্কা কাবাব সাজানো রয়েছে। ক্ষুধায় তখন পেট দাউ দাউ করে জ্বলছে। তাই, ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সবাই খেতে বসলাম। খাওয়ার শেষ পর্যায়ে খেয়াল হলো, তাইতো, শহীদ সাহেবকে তো দেখছি না! তাহলে তাঁর জন্যে কি আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে?

খেয়ে উঠে শুনলাম আমাদের কাফেলার জীপ গাড়িটা এখানো এসে পৌছায়নি। ঐ জীপে ড্রাইভার ছাড়াও একজন আওয়ামী লীগ কর্মী রয়েছেন। বহু আগেই ওঁদের পৌছানোর কথা। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব জানিয়েছেন, ওঁরা না এসে পৌছানো পর্যন্ত তিনি কিছু গ্রহণ করতে পারবেন না। সত্যিই সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন ওঁদের জন্যে। মরুভূমির মধ্যে ওরা যদি উপজাতীয়দের হাতে পড়ে থাকে, তবে তো আর রক্ষা নেই। এছাড়া মরুভূমির ধূলিঝড়ে ওঁরা রাস্তাও ভুল করতে পারেন। এই জীপটা একবারও আমাদের কাফেলার

www.pathagar.com

কাছাকাছি আসতে পারেনি। কেননা, যেখানে আমাদের গাড়িগুলোর গতি ছিলো ঘণ্টার প্রায় পঞ্চাশ মাইলের মতো সেখানে একটা জীপের পাল্লা দেওয়ার কোনো কথাই উঠতে পারে না।

এতক্ষণ পর্যন্ত শহীদ সাহেব অন্যধারের বারান্দায় একমনে পায়চারি করছিলেন। এবার তিনি এগিয়ে এসে উর্দুতে বললেন, 'এখানে কি দু'জন লোক পাওয়া যাবে না যারা ওদের খুঁজতে যেতে পারে?' মিনিট দুইয়ের মতো কারো মুখে কোনো শব্দ নেই। এমন সময় বছর পঁচিশের এক পাঠান যুবক সদর্পে এগিয়ে এসে এই কঠিন দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে হাত ওঠালেন। তখন আবার মুশকিল দেখা দিলো, যুবকটি মোটর ড্রাইভিং-এ একেবারেই অনভিজ্ঞ। কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম যখন দেখলাম, আমাদের মোটরের বছর পঞ্চাশ বয়সের পাঞ্জাবি ড্রাইভার এই দুঃসাহসিক অভিযানে যেতে সম্মত হলো। এবার সোহরাওয়ার্দী সাহেব নিজে এদের যাবার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিতে লাগলেন। প্রথমে এদের গাড়ির পেট্রোল ট্যাংক ভর্তি করে গাড়িতে আরও আট গ্যালন অতিরিক্ত পেট্রোল দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর শহীদ সাহেব এদের জন্যে দুটো রাইফেলের ব্যবস্থা করে কিছু উপদেশ দিলেন। তিনি ওদের বুঝিয়ে বললেন তারা যেন বাখখার থেকে মরুভূমির ভেতর একঘণ্টায় যতদূর যাওয়া যায় ততদূর পর্যন্তই খোঁজ নেয়। এর বেশি যাওয়ার দরকার নেই। সোহরাওয়ার্দী সাহেব দু'জনকে বুকে জড়িয়ে ধরে 'বিসমিল্লাহ' বলে রওয়ানা হতে বললেন। রাত সোয়া ন'টায় আমরা সভাস্থলে এসে পৌছলাম। বিরাট শামিয়ানা টাঙ্গান হয়েছে—নিচে বসবার জন্যে মোটা মোটা সতরঞ্জি বিছানো হয়েছে। এরমধ্যে কেউ কেউ বিরাট তাকিয়ায় অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছেন। বৈদ্যুতিক আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। এক কথায় বলতে গেলে আজিমুশ্‌শান জলসার ব্যবস্থা হয়েছে। ডায়াসের একদিকে দেখলাম, 'জরুরী অবস্থা'র জন্যে গোটা পঁচিশেক হেজাক আর ডে-লাইট রাখা হয়েছে। শুনলাম এসব এলাকায় রাজনৈতিক দলগুলোর এক একটা জনসভা করতে দশ বারো হাজার টাকার নিচে খরচ হয় না। কেননা, যে পার্টি যত বেশি টাকা খরচ করে মিটিং-এর আয়োজন করবে সে মিটিং-এ তত বেশি লোক হবে। মোটকথা, ব্যাপারটা রাজসিক হতেই হবে। এছাড়া নামকরা নেতা না হলেও চলতে পারে, কিন্তু যাঁরা বক্তৃতা দেবেন, তাঁদের চেহারা আর পোশাকের ওপর সভায় জনসমাগমের সংখ্যাটা নাকি অনেকটা নির্ভরশীল হয়। ভালো করে লক্ষ্য করতেই দেখলাম, ডায়াসের উপরের চাঁদোয়ায় মখমলের ওপর জরির কাজ করা ঝালর শোভাবর্ধন করছে। এছাড়া, কর্তা শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্যে পানের কুলুকদান, কয়েক পদের শরবত—এসব আয়োজন তো রয়েছেই।

যে সময়ের কথা বলছি তখন সোহরাওয়ার্দী সাহেব সবেমাত্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। চারদিকে রাজনৈতিক আবহাওয়া খুবই গরম। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্বেষ; পাঞ্জাবি ও অ-পাঞ্জাবিদের মধ্যে মনোমালিন্য; প্রেসিডেন্ট ভবনে ইস্কান্দার মীর্জার ষড়যন্ত্রের রাজনীতি; পূর্ব পাকিস্তানে বেকার সমস্যা আর ছাত্র-অসন্তোষ; সীমান্তে পাখতুনিস্তান আন্দোলন আর সর্বোপরি নির্বাচনের প্রশ্ন—এ সবকিছু মিলে তখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশে এক দুর্যোগের ঘনঘটা বিরাজ করছে। এমনি এক সময়ে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এসেছেন পশ্চিম পাকিস্তান সফরে। জনাব সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সাবেক পাঞ্জাব প্রদেশ সফর করার সময়ে লক্ষ্য করেছি, প্রতিটি

www.pathagar.com

জনসভাতেই—সেটা মুলতানেই হোক বা গুজরানওয়ালাতেই হোক, শহীদ সাহেব যখনই যুক্ত নির্বাচন সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন—তখনি এক ধরনের লোক তাঁর বক্তৃতায় বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টির জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। পরে জানতে পেরেছি এরা ছিলেন একটি রক্ষণশীল রাজনৈতিক দলের কর্মী। দলীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই এই কর্মীরা সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রতিটি জনসভাতেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেছেন।কিন্তু সাবেক পাঞ্জাবের প্রতিটি জেলা শহরে জনাব সোহরাওয়ার্দীর আগমন উপলক্ষে জনসাধারণের যে স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনা আর তাদের মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছি তা তুলনাহীন। মনে হয়েছিল প্রতিটি শহরের মধ্যেই যেন একটা প্রতিযোগিতা চলছে, কারা শহীদ সাহেবকে কত বড় সম্বর্ধনা জানাতে পারে।

ডেরা ইসমাইল খানে জনসভা শেষ করে যখন আমরা জাকোরীর পীর সাহেবের বাড়িতে ফিরে এলাম, তখন রাত একটা। কারো চোখে ঘুম নেই। আমরা সবাই 'ওয়াচ টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। পাঠান মুলুকে প্রতিটি বাড়িতেই (শহর ছাড়া) ওয়াচ টাওয়ারের' ব্যবস্থা রয়েছে। কেননা, এই টাওয়ারের ওপর থেকে বহুদূর পর্যন্ত লোকের যাতায়াত লক্ষ্য করা আর শত্রুর গতিবিধির ব্যাপারে সঙ্কেত দেয়া সম্ভব।

রাত দুটোর সময় ওয়াচ টাওয়ারের সংকেতে আমরা সবাই আশান্বিত হয়ে উঠলাম। টাওয়ারের লোক দূরে মোটরের আলো লক্ষ্য করেছে। যে গাড়িটাকে নিখোঁজ জীপটার সন্ধানে পাঠানো হয়েছিল, সেটা মিনিট কয়েকের মধ্যেই এসে হাজির হলো। এরা থল মরুভূমির ভিতরে প্রায় মাইল পঞ্চাশেক গিয়েছিল। কিন্তু জীপের কোনো সন্ধানই করতে পারেনি। জীপের লোক দু'জনার কথা চিন্তা করে এক অজানা আতঙ্কে সবার মন ভরে উঠল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন পর্যন্ত কোনো কিছু খাওয়া তো দূরের কথা, বিশ্রাম পর্যন্ত করতে যাননি। তিন একমনে বারান্দায় পায়চারি করে চলেছেন আর তাঁর পেছন থেকে জাকোরীর পীর সাহেব ও উর্দু সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি আগা শোরেশ কাশ্মীরী তাঁকে কিছু খেয়ে বিশ্রাম নেবার জন্য বারবার অনুরোধ করছেন। কিন্তু তিনি অটল রয়েছেন তাঁর সিদ্ধান্তে। জীপের আরোহীদের ভাবনাই তাঁর মনের দিগন্তে তখন সবকিছুকে ছাড়িয়ে উঠেছে। দুশ্চিন্তায় তাঁর সারা মুখ ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে। মনে হলো, বুঝি বা শহীদ সাহেবের একমাত্র সন্তান ওই জীপে রয়েছেন, তাই পিতা হয়ে তার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কোনো মুখে আহার গ্রহণ করবেন আর বিশ্রাম নেবেন!

সোবেহ্ সাদেকের দিকে ওয়াচ টাওয়ার থেকে আবার সঙ্কেত হলো—দূরে একটা মোটরের হেডলাইট দেখা যাচ্ছে। হুড়মুড় করে আমরা সবাই এসে জমায়েত হলাম টাওয়ারের নিচে। হ্যাঁ, ঠিকই একটা জীপ গাড়ি এগিয়ে আসছে। জীপের ড্রাইভার আর তার আরোহী যখন নেমে এলো, তখন তাদের আর মানুষ বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না। চোখ দুটো ছাড়া তাদের গোটা শরীরটাকে ধুলোর এক একটা স্তূপ বলে মনে হচ্ছিল। শহীদ সাহেব সেই অবস্থাতেই তাদের জড়িয়ে ধরে দোয়া করলেন। এতক্ষণে তিনি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ওদের দু'জনকে এবার মুখ-হাত ধুয়ে আসতে বললেন। এর মধ্যেই দেখি, নাস্তার পুরো এন্তেজাম হয়েছে। কেননা, আমরা সকাল সাতটার মধ্যেই আবার বান্নুর পথে রওনা হবো। এতক্ষণে শহীদ সাহেবও আমাদের সঙ্গে নাস্তা খেতে বসলেন। খেতে খেতে

www.pathagar.com

জানতে পারলাম, ওরা মরুভূমিতে রাস্তা ভুল করে প্রায় আশি মাইল দূরে ডেরা গাজী খানে চলে গিয়েছিল। আর ডেরা গাজী খানে না পৌঁছানো পর্যন্ত তারা বুঝতেই পারেনি যে, তারা ভুল রাস্তায় এগিয়ে চলেছে। মন্টগোমারী থেকে যে পিচ ঢালা রাস্তা থল মরুভূমির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে, তাতে মাত্র একটা জায়গাতেই টার্নিং রয়েছে। সে টার্নিং দিয়ে ডেরা গাজী খানে যাওয়া যায়। রাস্তটা এমনিতে সোজা বাখখারের ওপর দিয়ে দরিয়া ইয়ার খানে পৌঁছেছে। জীপের ড্রাইভার আর আরোহী ঠিক ওই একটা জায়গাতে গণ্ডোগোল করেছে। শুধু তাই নয়, ডেরা গাজীতে পৌঁছানোর পর ওরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে একটা জরুরী টেলিগ্রাম পাঠালে কিংবা ট্রাঙ্ককল করলে আমরা সবাই সমস্ত রাত্রির দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেতাম। কিন্তু তা না করে ওরা দু'জন যখনি বুঝতে পেরেছে যে, ওরা ডেরা গাজী খানে পৌঁছেছে, তখনি আবার আরো আশি মাই পেছনে ফিরে ডেরা ইসমাইল খানের দিকে রওয়ানা হয়েছে। সত্যি বেচারাদের জন্য মায়া হচ্ছিল। কিন্তু এই একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে কর্মীদের প্রতি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের যে অকৃত্রিম দরদ ও হৃদয়-নিঃসৃত ভালোবাসার নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলাম, আমার মনে তা চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কর্মীরা শহীদকে পিতার মতোই জানিতো

জসীমউদ্দিন আহ্‌মদ, সিলেট

জনগণের মাথায় পা রাখিয়া অথবা জনসাধারণ হইতে সভয়ে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিয়া যাঁহারা নেতৃত্ব করিতে চাহেন, জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী সেই দলের ছিলেন না। তিনি ছিলেন জনসাধারণের একান্ত আপনার লোক, বিশ্বস্ত বন্ধু এবং দরদী নেতা।

১৯৫৭ সালের প্রথমদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জনাব সোহরাওয়ার্দী সিলেট আগমন করেন। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী, জনসাধারণের প্রিয় নেতা সোহরাওয়ার্দী সিলেটে আসিবেন—তাই সমস্ত জেলা জুড়িয়া সাড়া পড়িয়া গেল। তাঁহার আসার দিন সিলেট শহর লোকে লোকারণ্য। সালুটিকর বিমানবন্দর সিলেট শহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে গাড়িতে করিয়া, বাসে করিয়া, পায়ে হাঁটিয়া প্রখর রোদের মধ্যে হাজার হাজার লোক বিমানবন্দরের দিকে চলিলো নেতার দর্শন লাভের আশায়—তাঁহার মুখের একটি কথা শুনিবার জন্য।

জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে আমরা কয়েকজন আওয়ামী লীগের সহকারী সেক্রেটারি জনাব সফিক আহমদের জীপে করিয়া সালুটিকর বিমানবন্দর অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। বিমানবন্দরে গিয়া দেখি, এলাহীকাণ্ড। সারা এলাকাটি লোকে লোকারণ্য! শহরের ব্যবসায়ী হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের চাষী, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সর্বস্তরের সব বয়সের লোক মিলিয়া বিমান বন্দরটিকে যেন জনসমুদ্রে পরিণত করিয়াছে।

বেলা বারোটার সময় বিমানখানির পৌঁছার কথা। কিন্তু একটা বাজিয়া গেল, তখনো বিমানের দেখা নাই। গরমের দিনে প্রখর রৌদ্রের মাঝে জনতা অধীর আগ্রহে দাঁড়াইয়া আছে। কাহারও মুখে এতটুকু কষ্টেরও কোনো চিহ্ন নাই। অবশেষে একটা পনেরো মিনিটে বিমান আসিয়া অবতরণ করিল। আমরা কয়েকজন আগাইয়া গেলাম। পুলিশ বেষ্টনী রচনা করিয়া বিমানটিকে ঘিরিয়া রাখিল। একটু পরেই জনাব সোহরাওয়ার্দী সারামুখ হাসিতে উদ্ভাসিত করিয়া বিমান হইতে নামিয়া আসিলেন। পরনে ছিলো তাঁহার সাদাসিধা পোশাক, হাতে মুভি ক্যামেরা। তাঁহার অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই জনতা পুলিশ কর্ডন ভেদ করিয়া নেতাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ফুলের মালা তাঁহার গলায় স্তূপাকার হইয়া উঠিল। ক্ষণে ক্ষণে গগন বিদারী আওয়াজ ধ্বনিত হইতে লাগিল 'শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ।'

এই জনসমুদ্র হইতে কিভাবে তাঁহাকে বাহির করিয়া আনা যায়, সেইটাই এই মুহূর্তে আমাদের সবার প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু শহীদ সাহেবের সেই দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি কাহারও সঙ্গে আলাপ করিতেছেন, কাহারও পিঠ চাপড়াইয়া দিতেছেন। কখনও কখনও মুভি-ক্যামেরায় আলোকচিত্র গ্রহণ করিতেছেন। মনে হইলো যেন একান্ত আপনারজনদের মাঝে অনেকদিন পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রায় অর্ধঘণ্টা এইভাবে কাটিয়া গেল। আমি কাছে গিয়া বলিলাম, 'স্যার, অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। সমগ্র প্রোগ্রাম যে নষ্ট হয়ে যাবে।' তিনি বলিলেন, 'তোমার প্রোগ্রাম নষ্ট হয়ে গেলে আমি কি করবো?

www.pathagar.com

লোকে ছাড়লে তো তবে যাব।' যাহা হউক, অনেক কষ্টে জনতা ভেদ করিয়া তাঁহাকে জীপের কাছে নিয়া আসিলাম।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী জীপে উঠিতে যাইবেন, এমন সময় ডেপুটি কমিশনার আসিয়া বলিলেন, 'স্যার, আপনার জন্য সরকারি গাড়ি নিয়ে এসেছি। সেই গাড়িতেই আপনি যাবেন।' মুচকি হাসিয়া শহীদ সাহেব বলিলেন, 'এরা যে রাগ করবে; এদের সঙ্গেই যাই। আপনি সরকারি গাড়ি নিয়ে চলে যান।'

জীপের পিছনের সিটে জেলা আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী এবং আরো কয়েকজন উঠিয়া গেলেন। শফিক আহমদ ড্রাইভার-এর আসনে বসিলেন। তিনি নিজেই ড্রাইভ করিবেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পাশে। আমি ইতস্তত করিতেছি কি করিবো, এমন সময় শহীদ সাহেব বলিলেন, 'তুমিও আমার পাশে বসে যাও।' অগত্যা আমি তাঁহার পাশে বসিয়া গেলাম। জনাব শেখ মুজিবুর রহ্‌মানও আসিয়াছিলেন। তিনি অন্য গাড়িতে উঠিলেন।

আমরা শহরের দিকে রওয়ানা হইলাম। রাস্তায় আসিয়া দেখি, দুই দিকে অসংখ্য লোক সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিমানবন্দর হইতে সার্কিট হাউস পর্যন্ত মানুষের ভিড়ে তিল ধারণের স্থান নাই। প্রিয় নেতাকে একটিবার দেখিয়া লওয়ার জন্য মানুষের সে কি আগ্রহ।

সার্কিট হাউসে আসিয়াই জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী সরকারি কর্মচারি এবং জনসাধারণের মধ্য হইতে যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে জেলার নানা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সামান্য বিশ্রামের তিনি প্রয়োজন বোধ করিলেন না। ইহার পর জনসভার সময় আসিলে সরাসরি মাঠে চলিয়া গেলেন। অপরাহ্ন চারটার মধ্যেই রেজিস্টারি মাঠ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। কেবল মানুষ আর মানুষ! যেইদিকে চোখ যায় কেবল মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না—যেন সারা জেলার লোক আসিয়া মাঠে জমা হইয়াছে।

সভাপতিত্ব করিবার দায়িত্ব আমার ওপর পড়ায় আমাকে কিছু পূর্বেই সভাস্থলে পৌঁছিতে হইলো। সভামঞ্চ হইতে কিছু দূরত্ব বজায় রাখিয়া দড়ি বাঁধিয়া কর্ডন করা হইয়াছে। সরকারি ব্যবস্থা মতে স্থানে স্থানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়, যাহাতে কেহ মঞ্চের কাছে যাইতে না পারে। মঞ্চের সম্মুখভাগে বুক পর্যন্ত ইস্পাতের দেয়াল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শহীদ সাহেব সভামঞ্চে আসিতেই জনতা উল্লাসে ফাটিয়া পড়িলো। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর হইয়া উঠিল। আসিয়াই তিনি ইস্পাতের দেয়াল নামাইয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। জনতা হাততালি দিয়া উঠিল। ইহার পর জনতার দিকে হাত নাড়িয়া তিনি কি ইঙ্গিত করিলেন। জনতা কর্ডন ভেদ করিয়া সভামঞ্চ ঘিরিয়া দাঁড়াইলো। শহীদ সাহেব জনতাকে বসিয়া যাইতে বলিলে হাজার হাজার লোক দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলো।

বক্তৃতা আরম্ভ হইলো। মিশেলী অথচ সকলের বোধগম্য আশ্চর্য গতিশীল বাংলায় তিনি বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। এত লোক, তবু টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নাই। বিশাল; জনসমুদ্র তাঁহার প্রতিটি কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনিতে লাগিল। তাঁহার বাচনভঙ্গিতে কি যাদু আছে, কে জানে। এমন সরস, এমন গতিশীল এবং এমন ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক বক্তৃতা শহীদ সাহেব ছাড়া আর কে

www.pathagar.com

দিতে পারেন? বেশ কিছু সময় পর একদিকে গোলমাল আরম্ভ হইলো। ভীষণ হৈচৈ। সবাই হাত নাড়িয়া যেন কি বলিতে চাহিতেছে। পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী তৎপর হইয়া উঠিল। অবশেষে বোঝা গেল, সেইদিকের মাইক বিকল হইয়া গিয়াছে। লোকে শুনিতে পাইতেছে না। মাইকের মালিক ভৌমিক সেইখানেই ছিলেন। তাহাকে ডাকা হইলো। হঠাৎ সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'এই ভৌমিক মিয়া, জলদি মাইক ঠিক করে দাও'। জনতা হাসিয়া উঠিল। হৈচৈ গোলমাল থামিয়া গেল। জনতার হাসার কারণ, ভৌমিক হিন্দু ভদ্রলোক—তাহাকে শহীদ সাহেব মিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু কাজ যাহা হইবার তাহা এই একটিমাত্র রসিকতাপূর্ণ উক্তিতেই হইয়া গেল। সভায় আর গোলমাল রহিলো না।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর বক্তৃতা শেষ হইলে তিনি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। এমন সময় চারিদিক হইতে প্রশ্ন আরম্ভ হইলো, 'সার কারখানা কোথায়ে হবে? সার কারখানা কি সিলেটে হবে না?'

সিলেটের হরিপুরে যে গ্যাস আবিষ্কার হইয়াছিল, সেই গ্যাস দিয়া পূর্ব পাকিস্তানে একটি সার কারখানা স্থাপনের কথা ছিলো। ইতিমধ্যে গুজব শোনা যাইতেছিল যে, সেই কারখানা ঢাকা জেলার কোনো একস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাতে সিলেটের লোকের ক্ষোভের অন্ত ছিলো না। সার্কিট হাউসে অবস্থানকালে তাঁহাকে সিলেটবাসীর সেই ক্ষোভের কথা জানানো হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তখন নীরব ছিলেন। এবার আর মৌন থাকা সম্ভব হইলো না। শহীদ সাহেব মাইকে গিয়া বলিলেন, 'আপনারা যা বলতে চাচ্ছেন, তা আমি বুঝতে পারছি। আপনারা চান, সিলেটে আবিষ্কৃত গ্যাস দিয়ে সিলেটেই কারখানা করা হোক।'

জনতা একবাক্যে বলিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সার কারখানা আমরা সিলেটেই চাই।'

এইবার নেতা বলিলেন, 'আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করছি, পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও যদি সার কারখানা স্থাপিত হয়, সেটা সিলেটেই হবে।' জনতা আনন্দে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া উঠিল।

সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জে অবস্থিত প্রাকৃতিক গ্যাস-সার কারখানা নেতার সেই প্রতিশ্রুতিরই বাস্তব নিদর্শন। সিলেটবাসী জানে, শহীদ সাহেব না হইলে এই কারখানা সিলেটে স্থাপন করা হয়তো সম্ভব হইত না।

ইহার পর পল্লীকবি আবদুল করিম তাঁহার স্বরচিত একটি পল্লীগীতি মাইকযোগে গাহিতে আরম্ভ করিলেন। অপূর্ব সুরের লহরী বাতাসে ভাসিয়া ভাসিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তকে অভিভূত করিয়া তুলিল। জনতা নীরব নিস্তব্ধ হইয়া একমনে গান শুনিতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলাম, শহীদ সাহেব বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া গায়কের দিকে চাহিয়া আছেন। গান শেষ হইলে তিনি নিজ পকেটে হাত দিয়া টাকা-পয়সা যাহা ছিলো, সমস্তই উজাড় করিয়া কবি আবদুল করিমকে পুরস্কার হিসাবে দান করিলেন।

সভার শেষে নেতার সঙ্গে হাত মিলাইবার জন্য দলে দলে লোক আগাইয়া আসিল। কেহই বিফল মনোরথ হইলো না। 'শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়া জনতা সভাস্থল ত্যাগ করিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর সার্কিট হাউসে শেখ মুজিবুর রহমান এবং স্থানীয় কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে শহীদ সাহেব আলাপ করিতেছিলেন, এমন সময় সার্কিট হাউসের গেটে গোলমাল শোনা

www.pathagar.com

গেল। কার্যরত পুলিশ কর্মচারি আসিয়া বলিলেন, 'আওয়ামী লীগের কর্মীরা এসে হৈ চৈ শুরু করেছে। তারা সবাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

শহীদ সাহেব বলিলেন, 'আসুক না ওরা।' কিন্তু পুলিশ অফিসার ইতস্তত করিতেছেন দেখিয়া তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'ভয় নেই, আমাকে কেউ মারবে না। ওদের আসতে দিন।' মুহূর্তের মধ্যে সারা সার্কিট হাউস লোকে ভর্তি হইয়া গেল।

ফিরতি পথে তিনি ট্রেনে যাইবেন। আমিও কুলাউড়া পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গেলাম। ট্রেনে উঠিয়াই দেখি, প্রধানমন্ত্রীর সেলুনে থরে থরে ফাইল সাজানো। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফাইল নিয়া বসিয়া গেলেন। মনে হইলো, যেন কাজ তাঁহার ধর্ম, কাজই তাঁহার জীবন। শেখ মুজিবুর রহমান বলিলেন, 'করাচী হতে রাশি রাশি ফাইল নিয়ে এসেছেন। সব শেষ করে যাবেন। রাত ২-৩টা পর্যন্ত কাজ করবেন।'

কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের সঙ্গে তিনি কথা বলিতে লাগিলেন। ট্রেন কুলাউড়া স্টেশনে আসিয়া থামিলো। স্টেশনে দেখা গেল বিরাট এক জনসমুদ্র। তাহারা শহীদ সাহেবের কথা শুনিবে। কর্মীরাও মাইক প্রস্তুত রাখিয়াছে। শুনিয়াই তিনি ফাইল বন্ধ করিয়া দিলেন। চটি পায়ে নামিয়া গেলেন বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। আনন্দে জনতা চিৎকার করিয়া উঠিল 'শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী জিন্দাবাদ'।

ইহার পর জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় ঢাকায় ১৯৫৭ সালের শেষদিকে। সিলেটে 'খাজনা আন্দোলন' তখন পুরোদমে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মোকাবিলা একটি ফয়সালা করার জন্য আতাউর রহমান সরকারের সঙ্গে আলোচনায় ব্যর্থকাম হইয়া আমরা জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর শরণাপন্ন হইলাম। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী তখন প্রধানমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া ঢাকায় সার্কিট হাউসে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব নূরুর রহমানসহ আমি ও দেওয়ান ফরিদ গাজী তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম।

ঘরে গিয়া দেখি, শহীদ সাহেব একমনে দৈনিক পত্রিকা পড়িতেছেন। এমন তন্ময়ভাবে পত্রিকা পড়িতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। প্রায় আধঘণ্টা পর তিনি আমাদের দিকে চাহিলেন। জনাব নূরুর রহমান আমার পরিচয় দিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'I know him, I know him', ইহার পর জনাব ফরিদ গাজীর পরিচয় দিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'Young secretary, how many primary committees are there in your district?'

দেওয়ান ফরিদ গাজী বলিলেন, 'About......শব্দটি উচ্চারণের সংগে সংগেই জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী গর্জন করিয়া উঠিলেন, 'About! About!! What do you mean?' আমরা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলাম। আমাদের অবস্থা দেখিয়া হয়তোবা তাঁহার কিঞ্চিৎ দয়া হইলো। কিছুক্ষণ পরে মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন 'তুমি ফাঁকি দিচ্ছিলে। ফাঁকি দিতে নাই—না জনসাধারণকে, না অন্য কাউকে। যেটুকু কাজ করবে, ভালোভাবেই করবে।'

ইহার পর আমরা যে বিষয়ের জন্য গিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হইলো। আমরা খাজনা কমানোর ব্যাপারে নানা যুক্তি দেখাইলাম, তিনিও পাল্টা যুক্তি দেখাইলেন। অবশেষে যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের সঙ্গে তিনি একমত হইলেন, সেইগুলি নিজের নোটবুকে লিখিয়া নিয়া সেক্রেটারিকে টাইপ করিয়া জনাব আতাউর রহমানের কাছে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন।

www.pathagar.com

দেশের ওপর সামরিক শাসনের কালো ছায়া নামিয়া আসিল ১৯৫৮ সালে অক্টোবর মাসে। দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দকে একে একে গ্রেফতার করা হইলো। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীও বাদ গেলেন না। তাঁহাকে বন্দী করিয়া করাচীর জেলে আটক রাখা হইলো। জেল হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি ঢাকায় আসিলেন। আমাদেরও ডাক পড়িলো। ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন সাহেবের বাসায় বৈঠক বসিবে। ঘরের মেঝেতে কার্পেটের ওপর আমরা সকলে বসিয়া আছি। শহীদ সাহেব তাঁহার চিরাচরিত সাদাসিধা পোশাকে সভায় আসিলেন। মুখে সেই চেনা হাসিটি লাগিয়াই আছে। তিনি বলিলেন, 'আমি ভাবছি, আপনাদের বলবো—এখন গণতন্ত্র হাসিল করার জন্য সংগ্রাম করা ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নাই।'

তাঁহার পাশ হইতে কে একজন বলিলেন, 'স্যার, গণতন্ত্রের সঙ্গে আমরা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনও চাই।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, সে সম্বন্ধে কথাই নাই।' হাসিয়া জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী বলিলেন।

পিছন হইতে আর একজন বলিয়া উঠিলেন, 'ওদের সঙ্গে কি স্যার আমাদের বনিবনা হবে?'

শহীদ সাহেবের মুখখানা মলিন হইয়া গেল। ম্লানমুখে তিনি বলিলেন 'যখন সারা দুনিয়া একতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা কেমন করে বনিবনার কথা বলি! আমি বিশ্বাস করি, পাকিস্তানের দুই অংশকে একতাবদ্ধ করে এক মহান জাতি গড়ে তোলা সম্ভব এবং যতদিন আমি জীবিত আছি সেভাবেই কাজ করে যাব। আপনার কথা নিছক অভিমানের কথা। অভিমান করতে গেলে প্রকৃত কাজ হয় না।'

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টা বলিয়া গেলেন। তাঁহার শেষ কথা হইলো গণতন্ত্র হাসিল করিতে না পারিলে দেশের অগ্রগতি সম্ভব নহে। সুতরাং দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে এক হইয়া সম্মিলিত হইয়া ইহার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে।'

গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হইলো। সব দলের নেতাসহ জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী চারণের মতো সারাদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

১৯৬২ সালের ৭ই ডিসেম্বরের কথা। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী সিলেট আসিয়াছেন। রেল স্টেশন হইতে খোলা ট্রাকে করিয়া ব্যান্ড পার্টিসহ মিছিল করিয়া নেতাকে সার্কিট হাউসে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। সুরমার পুলের কাছে আসিয়া পিছন দিকে চাহিয়া দেখিলাম, হাজার হাজার লোক মিছিলে শরিক হইয়াছে। মিছিলের পিছন দিক কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে, ঠাহর করিতে পারিতেছিলাম না।

সার্কিট হাউসে সকল দলের কর্মীরা আসিয়া ভিড় করিলেন। তিনি সকলের সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করিতে লাগিলেন। এক সময় ন্যাপ কর্মী তৈয়বুর রহমান আসিয়া বলিলেন, 'স্যার, বাহিরে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী অপেক্ষা করে আছে। তারা আপনাকে গার্ড অব অনার দেবে।' জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী দাঁড়াইয়া গেলেন। আমরা অনেক কষ্টে তাঁহার পথ করিয়া দিতে লাগিলাম। আগে তৈয়বুর রহমান, পিছনে শহীদ সাহেব। ছেলেমানুষের মতো তিনি কেবল তৈয়বুর রহমানের পিঠে মৃদু ঘুষি চালাইতে লাগিলেন, 'পথ করে দাও! পথ করে দাও!' আমরা সকলে হাসিয়া উঠিলাম।

www.pathagar.com

বিকালে সভা আরম্ভ হইলো। রেজিস্টারি মাঠে তিল ধারণের স্থান নাই। অসংখ্য অগণন মানুষ তাহাদের প্রিয় নেতাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার কথা শোনার জন্য জমায়েত হইয়াছে। এতবড় জনসমাবেশ সিলেটে আর হয় নাই। ঢাকা হইতে আগত নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা দেওয়ার পর জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী বক্তৃতা দিতে উঠিলেন। সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা অথচ কি মাধুর্যময়। শ্রোতৃবৃন্দ তন্ময় হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল। কিভাবে দেশ হইতে গণতন্ত্র উচ্ছেদ করা হইয়াছে এবং কিভাবে গণতন্ত্র হাসেলের জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে তিনি বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবার আগেই মাগরেবের নামাজের সময় হইয়া আসিল। তিনি বিশাল জনসমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা গণতন্ত্র চান কিনা। মুহূর্তে হাজার হাজার হাত উপরে উঠিল। আর সেই প্রসঙ্গে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ উঠিলঃ 'আমরা গণতন্ত্র চাই।'

সভা শেষ হইয়া গেলে আমি পিছনে পড়িয়া গেলাম। জনতার ভিড়ের মধ্যে আগাইয়া যাওয়া মুশ্‌কিল। সার্কিট হাউসে গিয়া দেখি, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী সেইখানে নাই। তিনি কোথায় গিয়াছেন কেহই বলিতে পারিলো না। পরে খোঁজ করিয়া জানিলাম, তিনি জনাব নূরুর রহমানের বাসায় গিয়াছেন। সেইখানে গেলাম। গিয়া দেখি, জনাব নূরুর রহমান বিছানায় শুইয়া আছেন। আর শহীদ সাহেব তাঁহার শিয়রে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সভায় মানুষের অত্যধিক চাপ আর অসহ্য গরমের ফলে নূরুর রহমান সাহেব অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। পূর্ব হইতেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। সংবাদ পাইয়াই তাঁহাকে দেখার জন্য জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছুটিয়া আসিয়াছেন।

শহীদ সাহেবকে বিদায় দেওয়ার জন্য আমরা রেল স্টেশনে গেলাম। কর্মীরা শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়া প্ল্যাটফর্মে জটলা করিতেছিল, শহীদ সাহেব আমাকে একান্তে তাঁহার কামরায় ডাকিয়া নিয়া গেলেন। পূর্বের রাত্রে ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে একটা ব্যাপারে কিছুটা বচসা হইয়াছিল। সেই সংবাদ তাঁহার কানে গিয়াছে। আমার নিকট হইতে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'এটা ঝগড়া করার সময় নয়। সকলে মিলেমিশে একসংগে কাজ করার চেষ্টা করো। সবাই একযোগে কাজ না করলে আমাদের মক্‌সুদ হাসিল হবে না। আমাদের প্রতিপক্ষ খুব শক্তিশালী, মনে রাখবে মিলিতভাবে কাজ করলে আমরা পরস্পরের নিকটে আসবো এবং ভবিষ্যতে আমরা এক দলই হয়ে যেতে পারি।'

তাঁহার সঙ্গে সেই ছিলো আমার শেষ দেখা। ব্যগ্রাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ভালো হইয়া দেশে আসিবেন, বর্তমান সঙ্কটময় মুহূর্তে দেশকে সঠিক নেতৃত্ব দিবেন। দেশ, জাতি এবং আমাদের সকলের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের সকল আশা, সকল প্রতীক্ষা এক অসহনীয় মর্মন্তুদ বেদনায় পর্যবসিত হইলো। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুসংবাদ সিলেটে পৌঁছিলে সারা শহরে শোকের কালো ছায়া নামিয়া আসে। সকলের মুখেই থমথমে ভাব, যেন তাহাদের একান্ত আপনজন সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। আওয়ামী লীগ কর্মীদের তো কথাই নাই। অনেক কর্মীকে নেতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিতে দেখিয়াছি। কর্মীরা সত্যিই জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে পিতার মতোই ভালোবাসিত।

www.pathagar.com

সোহ্‌রাওয়ার্দীকে যেমন দেখেছি

চৌধুরী শামসুর রহ্‌মান

পাক-ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক গগনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অকস্মাৎ খসে পড়েছে। দেশবাসীর প্রিয় নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আর ইহ্‌জগতে নেই। দীর্ঘ প্রায় একাত্তর বছরব্যাপী কর্মক্লান্ত জীবনের অবসানে দেশ-জননীর এই কৃতী সন্তান তাঁর শেষ আশ্রয় রচনা করেছেন কবরের কোলে। মাটির মানুষের প্রিয় সুহৃদ মাটিতেই বিছিয়েছেন তাঁর শেষশয্যা। দেশ আজ শোকে মুহ্যমান। জনগণের মধ্যে চারদিকে শোনা যাচ্ছে নিদারুণ আহাজারি। শোকার্ত মানুষের অযুত কণ্ঠে মাগফেরাতবাণী ধ্বনিত হচ্ছে ঃ 'হে আল্লাহ্‌, আমাদের প্রিয় নেতার রুহের কল্যাণ করো তুমি; তোমার করুণা বর্ষিত হোক তাঁর ওপর অজস্র ধারায়। মানুষের কল্যাণে জীবনপাত করেছেন তিনি, তাঁর রুহ্‌কে তুমি আশ্রয় দাও তোমার ফিরদৌসের অমরায়। তোমার রহ্‌মত নাজিল করো তাঁর ওপর হে করুণায় রহ্‌মানুর রহীম!'

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর তিরোধানে আমাদের রাজনীতি ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, শিগগির তা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও একদিন হয়তো অমন সুদিন সত্যিই আসবে যখন কোনো যোগ্য নেতা এসে তাঁর পরিত্যক্ত স্থানে গণতন্ত্রের দিশারী হবেন। বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আইনজীবী এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রতিভার অধিকারী নাগরিকও হয়তো যুগে যুগে, কালে কালে আরো অনেক আসবেন। কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসীর মনের নিভৃতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, বিয়োগ ব্যথার আঘাতে তাদের অন্তর মথিত করে যে নাই নাই ধ্বনি রণিয়ে উঠেছে, কোনোদিনই কি আশ্বাসের প্রলেপে সে শূন্যতাকে, সে রিক্ততাকে দেশবাসী ভরে তুলতে পারবে? হয়তো তারা তা পারবে না, হয়তো তা সম্ভবপরও নয়। দেশবাসীর মনের সিংহাসনে সোহ্‌রাওয়ার্দীর আসন ছিলো ভালোবাসার বুনিয়াদে গড়া এমনি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এই মহান মানুষটির সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের প্রথম সুযোগ লাভ করি আমি ১৯২৯-৩০ সালে। তখন আমি 'হানাফী' পত্রিকার সম্পাদক আর সাংবাদিক হিসেবেই নেতা সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে পরিচয়ের এই স্বাভাবিক সুযোগ আমি লাভ করেছিলাম। কিন্তু আমার সৌভাগ্য, সাংবাদিকের এই আনুষ্ঠানিক পরিচয়ের সম্পর্কই নেতার সহৃদয়তার গুণে ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিগত হৃদ্যতায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠে এবং তারপর থেকে গত ত্রিশ বছরকাল ধরে তাঁর সান্নিধ্যের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছি আমি। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কাছে থেকে তাঁকে দেখার যে সুযোগ পেয়েছি, বিভিন্ন কাজের ভেতর দিয়ে তাঁর বিরাটত্বের যে মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং তাঁর বিশাল অন্তরের যে মমতা নিবিড় স্পর্শ লাভ করে আমি ধন্য হয়েছি, চিরকাল আমার জীবনের মহান সঞ্চয়রূপেই সেসব স্মৃতি বিরাজ করবে।

সোহ্‌রাওয়ার্দীকে দেখেছি দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে। কোনোও ঘটনার পরিণতি পরে কি হতে পারে, এ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিলো বরাবরই সুস্পষ্ট। কোনো সময়েই এদিক দিয়ে

www.pathagar.com

বিচার-বিবেচনায় তাঁকে কোনো রকম ভুল করতে দেখা যায়নি। তাঁর মতো অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাঁর সমসাময়িক রাজনীতিকদের আর কারো মধ্যে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অবশ্য বর্তমানের কাসেম সাহেবের (মৌলভী আবুল কাসেম) মধ্যেও এককালে (১৯২১-২৭ সালে) একজন অসাধারণ ক্ষুরধার রাজনীতিজ্ঞকে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু কাসেম সাহেব আর সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক প্রতিভার পার্থক্য এখানেই যে, দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও সোহ্‌রাওয়ার্দী যেখানে নিজের অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে গেছেন, কাসেম সাহেবের রাজনীতি ছিলো সেখানে একান্তই দেশের মধ্যে সীমিত। এঁরা দু'জনেই ছিলেন ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী; কিন্তু একজন নিজের অসাধারণ প্রতিভার দীপ্তিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন, আর অন্যজনের ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটেনি। সোহ্‌রাওয়ার্দীকে এদিক দিয়ে ভাগ্যবান বলা চলে; কিন্তু একথাও সত্যি যে, স্বীয় প্রতিভা ও যোগ্যতার গুণেই তিনি নিজের জন্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের এই আসন রচনা করতে পেরেছিলেন। প্রতিভার বরপুত্র তিনি—সকল দিক দিয়েই তিনি ছিলেন অসাধারণ।

আইনজীবী হিসেবেও সোহ্‌রাওয়ার্দীর স্থান ছিলো সাধারণত্বের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক ওপরে। হাইকোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণের জন্য বহুবার তাঁকে আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু নিশ্চিন্ত আরামের এ চাকরি তাঁকে প্রলোভিত করতে পারেনি। আইন-ব্যবসায়কে কেবল অর্থ-উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে তিনি কোনোদিনই বিবেচনা করেননি। এজন্যই দেখেছি জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে এবং বহু স্থাসে ব্যক্তিগত মোকদ্দমায় পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনা-পারিশ্রমিকে তিনি দুর্বলতর পক্ষের তরফ থেকে মামলা পরিচালনা করেছেন।

১৯৩৫ সালের কথা। রাজশাহী জেলার খোর্দ-গোবিন্দপুর নামক গ্রামে অনুষ্ঠিত এক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মামলায় দায়রা আদালতের বিচারক মারাঠী হিন্দু সিভিলিয়ান মিস্টার হাতিয়ানগদী কয়েকজন মুসলমান আসামীকে দ্বীপান্তর দণ্ড এবং আরো প্রায় কুড়িজনকে সাত থেকে চৌদ্দ বছর মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলে 'হানাফী' পত্রিকায় এই বিচারাদেশের বিরুদ্ধে আমি কঠোর ভাষায় এক সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেছিলাম। এই মন্তব্যের জন্যই পরে আমাকে আদালত অবমাননার আসামী হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী তখন ব্যারিস্টার। শুধু বিনা-পারিশ্রমিকেই তিনি আমার তরফ থেকে মামলা পরিচালনা করেননি, সম্পূর্ণ নিজের খরচে মামলার নথিপত্র পর্যন্ত তৈরি করে দিয়েছিলেন। শুধু আমার কথাই বা বলি কেন, অনুরূপভাবে অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজসেবকের পক্ষ সমর্থনে বিনা পারিশ্রমিকে মামলা পরিচালনা করে তিনি প্রমাণ দিয়ে গেছেন যে, অর্থোপার্জন তাঁর আইন ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য কোনো সময়েই ছিলো না। তাঁর মতো মানবতাবোধসম্পন্ন সমাজ-দরদী আইনজ্ঞ প্রকৃতই একান্ত দুর্লভ। আমাদের সমাজের সৌভাগ্য যে, তাঁর জন্ম হয়েছিল এ সমাজে।

সোহ্‌রাওয়ার্দীর ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে একজন সমাজ-দরদী মহান মানুষকে লক্ষ্য করার সুযোগ বরাবরই পাওয়া গিয়েছে। কোলকাতা খেলাফত কমিটির প্রধান হিসেবে তরুণ ব্যারিস্টার সোহ্‌রাওয়ার্দী শুধু যে তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তা নয়—তাঁকে সে সময়ে কোলকাতার মুসলমানদের দরদী নেতার ভূমিকা পালন করতেও

www.pathagar.com

দেখা গেছে। মুসলমান নাগরিকদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সংগে দেন-দরবার করা এবং যেমন করে হোক, তাদের স্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টায় কোনোদিনই তাঁকে পিছপা হতে দেখা যায়নি। মহানগরী কলকাতার মুসলমান নাগরিকরা তাদের এই দরদী নেতার এমন অন্ধ-অনুসারী হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, তাঁর আহ্বানে দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে গড়ের মাঠে লক্ষ লোকের সমাবেশ হওয়ার বিচিত্র দৃশ্য অবাক-বিস্ময়ে সবাই বারে বারে প্রত্যক্ষ করেছে। সোহ্‌রাওয়ার্দী অন্তরের দরদ দিয়ে মানুষের ভালো-মন্দের কথা ভাবতেন বলেই তাঁর কথায় মানুষ সাড়া না দিয়ে পারতো না। আর এভাবেই তিনি কোলকাতার মুসলমানদের স্বাভাবিক নেতারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

সোহ্‌রাওয়ার্দী চরিত্রের আর একটা বিরাট বৈশিষ্ট্য এই ছিলো যে, সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গেই সমভাবে তিনি মিশতে পারতেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে এবং অভিজাত মহলে যেরূপ অবাধে তিনি মিশতে পারতেন, ঠিক অনুরূপভাবেই গরীব-দুঃখীদেরই একজন হয়ে সাধারণ মানুষের সমাজেও তিনি অকৃত্রিমভাবে মেলামেশা করতে পারতেন। এককথায় বলা চলে, মনের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন একাধারে অভিজাত ও সাধারণ মানুষ এবং তাঁর এ দ্বৈতসত্তার মধ্যে কোনো সময়েই কোনোরূপ বৈসাদৃশ্য বা আত্মবিরোধ দেখা যায়নি। ইউরোপীয় ক্লাবের সভায় বা রাজ-রাজড়াদের দরবারে তাঁকে যেরূপ স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করতে দেখা গিয়েছে, ঠিক অনুরূপভাবেই রাজাবাজার বা বেলিয়াঘাটার গরীব বস্তিবাসীদের সঙ্গেও অবাধে তিনি মেলামেশা করেছেন—এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায়নি। সকল সমাজের বরণীয় মানুষ সোহ্‌রাওয়ার্দী এজন্যেই ছিলেন সকলের প্রিয়।

গরীবদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন বলেই হয়তো সোহ্‌রাওয়ার্দীর মধ্যে 'গরীবের বন্ধু' হিসেবে একটা স্বতন্ত্র সত্তার বিকাশ ঘটেছিল স্বাভাবিকভাবেই। বিপন্ন অভাবগ্রস্ত মানুষের জন্য তাঁর অন্তরে সঞ্চিত ছিলো সীমাহীন সহানুভূতি এবং এজন্যেই দেখা গিয়েছে যে, গরীব-দুঃখীদের সাহায্যের বেলায় বরাবরই তিনি ছিলেন দরাজ-হস্ত। তাঁর আর্থিক সাহায্যে কত লোক যে কতভাবে উপকৃত হয়েছে, সে সম্বন্ধে অনেক কাহিনী গল্পকথার মতোই বহুলোকের জানা আছে। বিশেষত, আমার মতো আরো যাঁরা তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁর এহেন মুক্তহস্তে দানের অনেক ঘটনা তাঁরা অবগত আছেন এবং নিশ্চয় করেই একথা বলা চলে যে, তাঁর এই ধরনের সহৃদয়তাই অনেককে মুগ্ধ করে এনে তাঁর পশ্চাতে দাঁড় করিয়েছিল।

সোহ্‌রাওয়ার্দী চরিত্রের আর একটি বিরাট বৈশিষ্ট্য এই ছিলো যে, চাল-চলন, আচার-আচরণে তিনি ছিলেন পুরাদস্তুর মুসলমান। কাপড়-পোশাকের কথাই ধরা যাক। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের যুগে আমরা তাঁকে বরাবরই খদ্দরের শেরওয়ানী ও পায়জামা পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। এটা ছিলো তাঁর পোশাকী লেবাস; বাড়িতে তিনি সকল সময়ে পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরিধান করতেন। পরবর্তীকালে বাইরে তাঁকে পাশ্চাত্য পোশাক পরতে দেখা গেলেও ঘরে সবসময়েই তাঁর পোশাক ছিলো পায়জামা-পাঞ্জাবি। ঈদ প্রভৃতি উৎসবের দিনে কিংখাবের শেরওয়ানী আর জরিদার টুপি পরিহিত অবস্থায় সুদর্শন তরুণ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা সত্যি মুগ্ধ না হয়ে পারেননি। মনে হয়েছে—মোগল যুগের একজন শাহজাদাই যেন সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এরূপ উৎসব-অনুষ্ঠানের দিনে

www.pathagar.com

তিনি ইসলামী আদব-কায়দা মাফিক ছোটবড় নির্বিশেষে সবার সংগে কোলাকুলি করতেন এবং মুরুব্বীদের কদমবুছি করতেও তাঁকে দেখা গেছে। এমনি এক ঈদের দিনে আমি তাঁকে জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হককে কদমবুছি করতে দেখে পরে তাঁকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'তুমি জানো না, তিনি আমার মামা হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের ভায়রা ভাই এবং সেই হিসেবে আমার মুরুব্বী।' বিলাতফেরত ব্যারিস্টার সোহ্‌রাওয়ার্দীর এহেন মুরুব্বী-জ্ঞান যে তাঁর পারিবারিক ইসলামী তাহ্‌জিবের স্বাভাবিক ফল, তা না বললেও চলে।

সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব যখন অবিভক্ত বাঙলার প্রধানমন্ত্রী, সে সময়ে তাঁর বাড়িতে এক মৌলবী সাহেবকে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা কোরআন তেলাওয়াত করতে দেখা যেতো। মাসের শেষে মৌলবী সাহেব মোটা রকম বখ্‌সিস পেতেন এবং আমরা দেখেছি কোনো সময়েই জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী একশত টাকার কম বখ্‌সিস মৌলভী সাহেবকে দিতে পারেননি। তাঁর বাড়িতে এভাবে নিয়মিত কোরআন পাঠ করে মৌলভী সাহেবের পক্ষে বখ্‌সিস আদায় করা যে সম্ভবপর হয়েছে, তাতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি মনের দিক দিয়ে পুরাদস্তুর মুসলমান ছিলেন এবং ইসলামে তাঁর বিশ্বাস ছিলো প্রগাঢ়। তাঁর বাড়ির মার্কামারা নাশ্‌তা 'কাবাব-রুটি' নিয়ে অনেকে রহস্য করতেন। কিন্তু এই 'কাবাব-রুটি' যে তাঁর বাড়ির মুসলমানী পরিবেশেরই পরিচায়ক, একথাও কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। এককথায় বলা চলে, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন মনে-প্রাণে সত্যিকার মুসলমান এবং তাঁর আচরণে সর্বক্ষণ এই মুসলমানত্বেরই প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

ত্রিশ বছরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মধ্যে আর যে একটা বিশিষ্ট গুণের সমাবেশ দেখেছি, তা হচ্ছে তাঁর অসাধারণ বন্ধুপ্রীতি ও অনুগতজনের প্রতি গভীর সৌহার্দ্য ও অকৃত্রিম ভালোবাসা। যাঁকে একবার তিনি বন্ধু বলে গ্রহণ করেছেন, তাঁর জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে তিনি সর্বক্ষণ প্রস্তুত ছিলেন। যাদের তিনি অনুগত প্রিয়জন বলে মনে করতেন, তাদের কল্যাণ সাধনের জন্য তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিলো না। অনেক সময় দেখা গেছে কোনো বিষয়ে ত্রুটির জন্যে অনুগত কোনো কর্মীকে তিনি হয়তো ধমকাচ্ছেন, 'ইডিয়ট' বলে গাল দিচ্ছেন। কিন্তু সবাই জানতো এই 'ইডিয়ট' শব্দটা আদৌ তাঁর গালি ছিলো না এটা ছিলো তাঁর বুলি। কাজেই গাল খেয়েও কোনো কর্মীকে কখনো মনঃক্ষুণ্ন হতে দেখা যায়নি। তারা জানতো যে, যাদের সোহ্‌রাওয়ার্দী অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন, যাদের তিনি একান্ত 'আপনার জন' বলে মনে করেন, শুধু তাদের জন্যেই এই 'ইডিয়ট' বিশেষণটা রিজার্ভ করা ছিলো এবং এই গালি বা বুলির ভেতর দিয়েই অনেক সময় কর্মীদের প্রতি তাঁর কল্যাণাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটতো। অনেক সময় এমনও দেখেছি, কাকেও 'ইডিয়ট' নামে অভিহিত করে আবার পরক্ষণেই তাকে কাছে ডেকে পিঠ চাপড়ে তিনি বলেছেন—'কি ভায়া, রাগ করেছ? তুমি আস্ত বোকা—একদম বুরবক।' এমন মজার মানুষের ভক্ত না হয়ে কি কেউ পারে?

সোহ্‌রাওয়ার্দী আজ আর নেই। আর তিনি আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন না। কিন্তু দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ, প্রথিতযশা আইনজীবী, সমাজ-দরদী নেতা এবং গরীবের বন্ধু মহান সোহ্‌রাওয়ার্দীর স্মৃতি মানুষের অন্তরলোকে চিরকাল ভাস্বর হয়ে বিরাজ করবে।

www.pathagar.com

জনদরদী শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী

মতিন উদ্‌দীন আহমদ

১৯৪৩ কি '৪৪ সালে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব এবং সিলেটের স্বনামধন্য মুসলিম লীগ নেতা মরহুম আবদুল মতিন চৌধুরী মুসলিম লীগের কাজে তখনকার অবিভক্ত সিলেটের অন্যতম মহকুমা শহর করিমগঞ্জে এক সভায় জনগণের কাছে ভাষণ দেন, আমি তখন সে শহরে ছিলাম। সে সভায় সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব বলেছিলেন, আরেকবার যখন আপনাদের কাছে বক্তৃতা দিতে আসবো তখন সিলেটী বাংলায় বক্তৃতা দেবো। কিন্তু সে মওকা আর আসেনি। রেডক্লিফ্ রোয়েদাদে মুসলমান বাসিন্দা সংখ্যাগুরু থাকা সত্ত্বেও ত্রিপুরা রাজ্যকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত রাখার মতলবে করিমগঞ্জ শহরসহ সাড়ে তিন থানা ভারতকে দিয়ে দেয়া হয়।

পাকিস্তান হাসিল হওয়ার আগে হামেশাই শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, প্রশাসনিক দক্ষতা, অমিত সাহস, অকুতোভয় প্রাণ, মজলুমের জন্য উৎসর্গীত সবকিছু এবং আরো আরো বহু বিশিষ্ট গুণের জন্য আমরা গর্ববোধ করতাম।

তাঁর খুব কাছে আসার মওকা হয়েছিলো একটা বিশেষ ঘটনার দরুন। বছর কয়েক আগে কর্ণফুলী কাগজের কলের শ্রমিকেরা চন্দ্রঘোনায় একটা হাঙ্গামা করে। হাঙ্গামার স্থানটি অংশত চাটগাঁ জেলায় এবং অংশত চাটগাঁর পার্বত্য অঞ্চলে পড়ে। বিচারের সময় সেটা চাটগাঁর পার্বত্য অঞ্চল জেলায় পড়েছে ধরে নিয়ে চাটগাঁ ডিভিশনের কমিশনার তখনকার আইনমতো দায়রা জজ হিসেবে আসামীদের বিচার করেন এবং তখনকার আইনমতো দায়রা জজের রায়ের বিরুদ্ধে কোনো আপীল করলে পর সেই একইব্যক্তি (চাটগাঁ ডিভিশনের কমিশনার) তাঁর নিজের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শোনার অধিকারী ছিলেন, হাইকোর্টের কোনো হাত ছিলো না এর ওপর। শুধু তিনি কোনো আসামীর মৃত্যুদণ্ড দিলে হাইকোর্টের অনুমোদন নিতে হতো। ইংরেজ সরকার চাটগাঁর পার্বত্য অঞ্চলবাসীদের জন্য তাদের (ইংরেজদের) সুবিধা ও মনের মতো এ অস্বাভাবিক আইন তৈরি করে রেখেছিল। যে কমিশনার চন্দ্রঘোনা মোকদ্দমার আসামীদের বিচার করেছিলেন দায়রা জজ হিসেবে তিনি নিজেই এর আগে এমনি আরো এক মওকায় মন্তব্য করেছিলেন যে, নিজের রায়ের বিরুদ্ধে নিজে আপীল শোনা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার।

চন্দ্রঘোনা মোকদ্দমা যখন দায়রায় চলছে তখন আসামীগণ যাতে সুবিচার পান এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতে প্রয়োজন হলে আপীল করতে পারেন, তার জন্য চেষ্টা শুরু করলাম আমি এবং আমার আরো এক সঙ্গী। দেশে যে আইন তখন চালু, সে আইনমতে দায়রা আদালতে শাস্তি হলে পর সেই একই জজের কাছে আসামীদের আপীল করতে হবে এবং তিনিই হাইকোর্টের স্থলবর্তী হয়ে সে আপীল শুনবেন। বহু আইনজ্ঞের কাছে এ থেকে রেহাই পাওয়ার একটা সুরাহা জানতে ছুটোছুটি করলাম। আমাদের কথা ছিলো সাক্ষ্য-

www.pathagar.com

প্রমাণে যা পাওয়া যাবে, আসামীদের প্রতি সে অনুযায়ী আইন মোয়াফিক ব্যবস্থা করা হোক, কিন্তু তাঁরা যদি নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করতে চান, তবে যেন সে অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, কারণ সব আসামীই ছিলেন পাকিস্তানী এবং কায়েদে আজমের বাণীই ছিলো পাকিস্তানী সব নাগরিক সমান অধিকার ও মর্যাদার দাবিদার। অধিকন্তু চাটগাঁর পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ইংরেজ যে আইন করেছিল, সে আইন শুধু এক টেকনিক্যাল কারণে প্রয়োগ করা হচ্ছিল পার্বত্য অঞ্চল বহির্ভূত পাকিস্তানের অধিবাসীদের ওপর। কারণ একজন আসামীও পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন না, শুধু ঘটনাটা ঘটেছিল অংশত সে অঞ্চলের এলাকায়।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত হতভাগ্য আসামীদের জন্য সুবিচার পাওয়ার পথ বের করতে গিয়ে কতোজনের কাছে গিয়ে তখন ধন্না দিয়েছি, কিন্তু কোথাও পথের দিশা পাইনি। শেষে সোজা চলে গেলাম মরহুম শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর কাছে। আমাদের সৌভাগ্য ছিলো, গিয়ে দেখলাম তিনি একা। পরিচয় দিয়ে আমরা আমাদের যাওয়ার উদ্দেশ্য বলতেই বসতে বললেন। 'বসতে বললেন' বললে পুরো কথাটা বলা হয় না। এমনভাবে বললেন যাতে আমাদের মনে হল তিনি আমাদের অনেকদিন থেকে চেনেন, জানেন এবং আমরা একটা বিপদে পড়ে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশায় বুক বেঁধে গিয়েছি, আর তিনি যে যথাসম্ভব সাহায্য আমাদের করবেন, সে আশ্বাসও যেন আমরা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলাম। তাঁর ব্যবহার এবং তাতে আমাদের মনের ওপর যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেটা অনুভব করার জিনিস, বর্ণনা করার নয়।

তাঁকে আদ্যোপান্ত সবকিছু বললাম, ঘটনার বিবরণ যতটুকু জানতাম, আইনের—বিশেষ করে চাটগাঁর পার্বত্য অঞ্চলের জন্য যে রেগুলেশন চালু ছিলো, তা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকে নিয়েছিলাম—সেগুলোও পড়ে শোনালাম। তিনি চুপ করে সব শুনলেন, তারপর একটুখানি ভেবে নিয়ে মুখ খুললেন। প্রথমে রেগুলেশন বর্বরতার ওপর ধিক্কার দিয়ে কথা শুরু করলেন। আফসোস করে বললেন যে, এখন পর্যন্ত এ অস্বাভাবিক কানুন বাতিল করা হয়নি, সেটা এক তাজ্জব ব্যাপার।

এ পর্যন্ত শুনেই আমরা নিরাশ হয়ে গেলাম। তখন তিনি বললেন যে, একমাত্র উপায় হচ্ছে দায়রা জজ হিসাবে চাটগাঁ ডিভিশনের কমিশনার যে বিচার করবেন, তার আপীল ঢাকা হাইকোর্টের কাছে শুনানি হবে।—এমন আইন করে নিতে হবে।

কিন্তু সে কাজ যে অত্যন্ত কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ! অথচ তা না করা হলে কমিশনারই সে আপীল শুনে বসবেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সে আইন করার জন্য কি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং বললাম যে, তিনি ছাড়া আর কেউ-ই সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না।

উত্তরে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব আমাদের বলে দিলেন, আমাদের দিক থেকে কিভাবে কানুন মোয়াফিক কি কি কাজ করতে হবে এবং সেটুকু করে দিলে পর আসল কাজ যা করবার তা তিনিই করবেন।

এখানে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা রয়েছে বলবার। আমরা যে দু'জন তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, দু'জনেই তখন সরকারি কর্মচারি এবং সে পরিচয়ও তাঁর কাছে দিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে আমাদের কি স্বার্থ কিম্বা কেন এত গরজ, সে কথাটি তিনি একবারও জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করেননি। আর দেশের চালু একটা কানুন বদলাবার জন্যে তিনি আমাদের করণীয় যে কাজের দায়িত্ব বলে দিয়েছিলেন তাতে আইনের খেলাফ কিছু করার নামগন্ধও ছিলো না। শুধু মজলুমদের সাহায্য করার জন্যে, তাদের জন্যে সুবিচারের দোর খুলে দেয়ার প্রয়োজনে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন দুঃখীর দুঃখে দরদী প্রাণ নিয়ে।

যে কাজের ভার আমাদের ওপর দিয়েছিলেন আমরা হুবহু তাঁর কথামতো তা সম্পাদন করে তাঁর কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম। সে সব কথা বিস্তারিতভাবে এখানে উল্লেখ করার দরকার মনে করছি না। এর কিছুদিন পরেই সোহ্রাওয়ার্দী সাহেব পাকিস্তানের উজিরে আজম হয়ে যান। চাটগাঁ ডিভিশনের কমিশনার দায়রা জজ হিসেবে বিচার শেষ করে আসামীদের অনেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে বিভিন্ন সময়ের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে।

পাকিস্তানের উজিরে আজম হিসেবে সোহ্রাওয়ার্দী সাহেব ঢাকায় এলেন। আমরা সেই দুইজন আবার এক রাতে গেলাম তাঁর কাছে। সেবার তিনি লাটভবনের 'মানুক-হাউসে' উঠেছিলেন। বহু কাজ নিয়ে তখন স্বভাবতই ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পরে বাইরের থেকে ফিরে এলেন। আরো বিশিষ্ট ভদ্রলোক কয়জন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কি জানি সুযোগ না পাই, তাই তিনি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আমি কাছে গিয়ে বিনা ভূমিকায় বললাম, জনাব, চন্দ্রঘোনা-মোকদ্দমার কথা হয়তো আপনার মনে আছে—

বাধা দিয়ে বললেন, না কিচ্ছু মনে নেই, গোড়া থেকে বলো।

আমি গোড়া থেকে শুরু করে অর্ধেক বলার পরই বললেন, হয়েছে, আর বলতে হবে না। দু'টি কাজ তোমাদের করতে হবে, বাকি আমি করবো। কাল ভোরে করাচী চলে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। যা বলে দিলাম তা করো।

এ দু'টি কাজও এমন ফরমায়েশ দিলেন যেগুলো করে দিলে পর উজিরে আজম হিসেবে তিনি কানুন মোয়াফিক বিষয়টি হাতে নিতে পারেন। ক্ষমতা হাতে আছে বলে নিয়ম ও শৃংখলার গণ্ডী ভেঙ্গে না চলে কানুন মোয়াফিক চলার জন্য তিনি এ প্রারম্ভিক কাজের ফরমায়েশ দিয়েছিলেন।

রাত তখন অনেক। আমরা বিদায় নিয়ে চলে এলাম এবং পরদিনই তাঁর ফরমায়েশ আদায় করে দিলাম।

যথাসময়ে পাকিস্তান গভর্নমেন্ট, চাটগাঁর কমিশনার দায়রা জজ হিসেবে বিচার করলেও তার আপীল ঢাকা হাইকোর্টে করতে হবে এই কানুন জারি করলেন। কমিশনারের আদালতে শাস্তিপ্রাপ্ত আসামীগণ ঢাকা হাইকোর্টে আপীল দায়ের করলেন। হাইকোর্টের বিচারে কোনো কোনো দণ্ডিত আসামী খালাস পেলেন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত একজন আসামীও খালাস পেলেন। দুঃখীর দুঃখে দরদী শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী সাহেব হস্তক্ষেপ না করলে হয়তো ঐ বেচারাকে এখনো কারা-অন্তরালে জীবন যাপন করতে হতো, তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণকে অকূল পাথারে পড়ে থাকতে হতো। বড় কথা, সুবিচারের দোর বন্ধই থেকে যেতো।

মরহুম শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর রুহের মাগফেরাতের জন্য এরকম বহু মজলুমদের দোয়া হামেশা কায়েম আছে।

www.pathagar.com

হিমালয়ের পাদদেশে

নূরুল ইসলাম

মহানায়কের সংস্পর্শে যতখানি এসেছি এবং এই সুমহান প্রতিভাকে যতখানি বুঝতে পেরেছি এখানে আমি সেটাই অকপটে বলবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার এ দেখা অনেকটা হিমালয়ের পাদদেশে থেকে সেটাকেই বুঝবার চেষ্টা করার মতো। তবুও লিখছি এজন্যে যে, এতে হয়তো হিমালয়ের কিছুটা অনুভব করা যাবে।

সবেমাত্র অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছি। রাজনীতি বোঝার মতো বয়স হয়নি। শুধু শুনছি—মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য পাকিস্তান চাই। এই সময়ে একদিন শুনতে পেলাম, অবিভক্ত বাংলার বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী ও নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী যোগাযোগ ব্যবস্থায় পশ্চাৎপদ বরিশাল জেলার অনুন্নত মহকুমা শহর পিরোজপুরে শুভাগমন করছেন। ছোটবেলায় বড়দের কাছে শোনা যে মহান নেতার কথা রূপকথার কাহিনীর মতো মনে হয়েছে তাঁকে দেখতে ও তাঁর কথা শুনতে পাওয়ার সুযোগ লাভের আনন্দে মন ভরে উঠলো। ছোট শহরটি মেতে উঠলো সোহ্‌রাওয়ার্দী সম্বর্ধনার প্রস্তুতিতে। এতে ছাত্রদের উদ্যোগ-আনন্দ সবচেয়ে বেশি। আর নিজেও মিশে গেলাম নেতা-সম্বর্ধনার প্রস্তুতিতে।

দেখতে দেখতে নেতার শুভাগমনের বাঞ্ছিত দিনটি এসে গেল। ছোট শহরটি নেতা-বরণে নানা বর্ণে সজ্জিত হলো। আনন্দমুখর হয়ে উঠলো পথ-ঘাট, আকাশ-বাতাস। ছোট নদী ধলেশ্বরের পাড়ে জড়ো হলো হাজার হাজার নারী-পুরুষ, ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-মজুর।

বেলা আড়াইটা নাগাদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে নিয়ে লঞ্চটি পিরোজপুরে পৌঁছলে ন্যাশনাল গার্ড বাহিনী ঘোড়ায় চড়ে অভিবাদন জানালো নেতাকে, আর উপস্থিত হাজার হাজার জনতা অন্তরনিঃসৃত শ্রদ্ধা জানালো তাদের একান্ত প্রিয়জনকে।

আকাশ-বাতাস মুখরিত করা জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে লঞ্চ থেকে নেমে এলেন জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী। সাথে ছিলেন নবাবজাদা নসরুল্লা খান। জনতা ভেঙ্গে পড়লো নেতা-দর্শনে। বহু কষ্টে জনতার ভিড় ঠেলে নেতাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সভামণ্ডপের দিকে। তদানীন্তন এম.ই স্কুল এবং এখনকার টাউন স্কুল প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপ। মানুষের ভিড়ে অনেক পিছনে পড়ে গেলাম। শুধু দুঃখ হলো সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে ভালো করে দেখতে না পারার জন্যে। তাই ক্ষুণ্ন মনে সভামণ্ডপের দিকে ছুটে যাচ্ছিলাম অন্য পথ ধরে। জনতার আগেই সভামণ্ডপে পৌঁছলাম। ওটার বেশ কাছাকাছি সুবিধামতো জায়গায় বসে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তদানীন্তন মহকুমা মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ সমভিব্যাহারে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী সভামঞ্চে আরোহণ করলেন। আকাশ-বাতাস আবার মুখরিত হলো জিন্দাবাদ ধ্বনিতে। হঠাৎ তদানীন্তন মহকুমা মুসলিম লীগ সভাপতি জনাব আফতাব উদ্দীন আহমদ ডাক দিয়ে বললেন, নুরু এখানে এসো, সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে মালা পরাতে হবে।

www.pathagar.com

আনন্দে বুক ফুলে উঠলো। একটু আগেও যাঁর সান্নিধ্যে না যেতে পেরে মন ভেঙ্গে পড়েছিল, এখন তাঁর একান্ত নিকটে যেতে পারার আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলাম। কর্মসূচি অনুযায়ী মালা পরিয়ে দিলাম শহীদ সাহেবকে। তিনি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায়—কি নাম, কি পড়ি? জবাব নিয়েই আবার জিজ্ঞেস করলেন—কেন পাকিস্তান চাই?

আমার মনে মনে গড়া পাকিস্তানের ব্যাখ্যার সুযোগ পেয়ে একদিকে যেমন আনন্দিত হলাম, তেমনি শঙ্কিত হলাম আমার ব্যাখ্যা তাঁর মনঃপুত না হওয়ার আশঙ্কায়। কিন্তু এই ভেবে সাহস সঞ্চয় করলাম—আমার ব্যাখ্যা তাঁর মনঃপুত নাও হতে পারে। তবে আমার কথা আমি বললে তিনি হয়তো খুশী হবেন। তাই একনাগাড়ে বলে চললাম, পাকিস্তান পেলে আমরা বৃটিশের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবো, মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারবো, ধনিক-বণিকের শোষণের অবসান হবে, গরীবদের কষ্ট কমে যাবে, তারা খেতে-পরতে পারবে, জমিদার-মহাজনদের চোখ রাঙানি বন্ধ হবে, আমাদের মনোনীত লোক দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করবে।

আমার কথা শেষ হতে-না-হতে মাইকে ঘোষণা করা হলো জনাব সোহ্রাওয়ার্দীর বক্তৃতা করার কথা। তিনি আমার পিঠে আবার হাত বুলিয়ে বক্তৃতা করতে উঠে গেলেন। একাগ্রমনে বক্তৃতা শুনলাম। বক্তৃতা শুনে মনে মনে গর্ব অনুভব করলাম এই ভেবে যে, আমার স্বপ্নে গড়া পাকিস্তানের মধ্যে সোহ্রাওয়ার্দী সাহেবের পাকিস্তানের কোনো পার্থক্য নেই।

জনাব সোহ্রাওয়ার্দীর বক্তৃতার আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম, তিনি কারো বিরুদ্ধে কিছু বললেন না। নিজের কথাই বললেন। এর আগে অনেক নেতার বক্তৃতা শুনেছি—তা শুধু কুৎসা ও বিরূপ সমালোচনায়ই ভরপুর থাকতো। কংগ্রেসী নেতারা লীগ নেতাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ ও গালাগাল দিতেন আর লীগ নেতারা কংগ্রেসী নেতাদের গালাগাল দিতেন এবং নানারূপ মন্তব্য করতেন। একমাত্র সোহ্রাওয়ার্দী সাহেবকেই দেখলাম কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা বললেন না, নিজের কথাই বলে গেলেন শুধু। এতে শহীদ সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেল।

সভা শেষে শহীদ সাহেব ছাত্রলীগ অফিস ও মুসলিম লীগ অফিসে কর্মীদের সাথে আলোচনা করলেন। ছাত্রলীগ অফিসে কর্মীদের লক্ষ্য করে বললেন—কাজ করে যাও, বাধা অনেক আসবে, তা অতিক্রম করতে হবে। অপরের নিন্দাবাদে সময় নষ্ট না করে নিজের কাজ করে যাবে। তোমাদের কর্তব্য পালন করবে—লোকে কি বললো-না-বললো তা নিয়ে বাদানুবাদ করে সময় ও শক্তি নষ্ট করবে না।

তারপর শহীদ সাহেব চলে গেলেন। কিন্তু দিয়ে গেলেন প্রেরণা, প্রাণচাঞ্চল্য।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনী অভিযান

তারপর শহীদ সাহেবকে দেখলাম ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান ইস্যুর ওপর নির্বাচনী অভিযানে। অপূর্ব কর্মশক্তির অধিকারী, অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধারূপে। শত বাধা-বিপত্তি, বিক্ষোভ-আন্দোলন উপেক্ষা করে নির্বাচনী অভিযান চালাচ্ছিলেন শহীদ সাহেব বাংলার গ্রামে, শহরে, বন্দরে ও গঞ্জে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে সম্ভবত বরিশাল জেলাই ছিলো মুসলিম লীগের জন্য সর্বাপেক্ষা অসুবিধাজনক। তাই লীগের উর্ধ্বতন বহু নেতাকে বোম্বে ও

www.pathagar.com

দিল্লী থেকে আমন্ত্রণ জানান হলো বরিশাল মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে। হাজার হাজার তারবার্তা প্রেরিত হলো তাঁদের উদ্দেশে। কিন্তু কোনো সাড়াই এলো না তাঁদের কাছ থেকে। বরিশালের মুসলমানরা তখন চরম হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। শহীদ সাহেব এলেন হতাশার অন্ধকারে আশার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে।

বরিশাল নদী আর খালের জেলা। একটি লঞ্চ নিয়ে যাত্রা শুরু হলো শহীদ সাহেবের বরিশালের গঞ্জ-গ্রামে। নির্ধারিত সভা ছাড়াও নদীর দুই ধারে ছোট ছোট জনসভার আয়োজন করার জন্য কর্মীরা ছড়িয়ে পড়লো গ্রামে গ্রামে। লঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে মাইকযোগে তিনি বক্তৃতা করতেন এই সকল খুদে সভায়।

নির্ধারিত সভার মধ্যে নলছিটির সভার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেদিন শহীদ সাহেবের অসীম সাহস দেখে প্রতিপক্ষ পর্যন্ত হতবাক হয়ে গিয়েছিল। শহীদ সাহেবের আগমনের কথা শুনে প্রতিপক্ষ তাঁর আগমন প্রতিরোধ করার সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত হাজার হাজার লোক, উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে শত শত খাকছার একত্র করা হলো শহীদ সাহেবের পথরোধ করার জন্যে। শহীদ সাহেবের লঞ্চটি দেখামাত্র বিরূপ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠল। লঞ্চের সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। কয়েকজন সাহসী কর্মী নৌকাযোগে তীরে যাবার চেষ্টা করলেন, পথিমধ্যে নৌকাটি আক্রান্ত হলো এবং ডুবিয়ে দিয়ে কর্মীদের ওপর মারপিট করা হলো, জনাব জুবেরীর দাঁত ভেঙ্গে গেল। লঞ্চের চালক ভয়ে কাঁপতে লাগলো, শুধু শহীদ সাহেবকে দেখলাম লঞ্চের সম্মুখভাগে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি লঞ্চ চালককে শুধু বললেন ঃ 'আমাকে না মেরে তোমাদের কেউ স্পর্শ করতে পারবে না, লঞ্চ পাড়ে নিয়ে যাও।'

লঞ্চটিকে পাড়ে ভিড়তে দেখে কয়েক শত লোক ঝাঁপিয়ে পড়লো, ঠিক এই সময় শহীদ সাহেব একটা বাঁশে ভর করে জনতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতে শুরু করলেন, 'আমি আপনাদের মেহমান আছি। শুনেছি বরিশালের লোক খুব মেহমানদারি করে, কিন্তু এটা কি মেহমানদারি হলো? এটা কি মেহমানদারির রেওয়াজ হলো?'

জনতা হতবাক হয়ে গেলো, শহীদ সাহেব পথ ধরে সভামণ্ডপের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলেন। পথে উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে খাকছার বাহিনীর লোক পথ রোধ করে দাঁড়ালো, শহীদ সাহেব গর্জন করে উঠলেন ঃ 'কিসকো রোখতা হ্যায় জানতি হো।' খাকছারদের তলোয়ার সরে গেল, তিনি সোজা যেয়ে সুসজ্জিত একটি সভামঞ্চে উঠলেন। অবশ্য মঞ্চটি শহীদ সাহেবের জন্য তৈরি করা হয়নি। করা হয়েছিল অপর এক নেতার জন্যে। সেখানে অনেকক্ষণ ধরে শহীদ সাহেব বক্তৃতা করলেন। সশস্ত্র বিরুদ্ধবাদী জনতাকে শান্ত করতে সক্ষম হলেন।

এর কয়েকদিন পর শহীদ সাহেব পিরোজপুরে এলেন। তারপর বেরোলেন দক্ষিণাঞ্চলে সফরে। তুষখালী যাওয়ার পথে শহীদ সাহেব আমার নিজগ্রাম বোথলায় এক জনসভায় বক্তৃতা করবেন বলে স্থির হলো। আমার বাড়ির সকলে ভাবলেন—বাড়ির সামনে যখন শহীদ সাহেব আসছেন তখন তাঁর জন্যে একটু মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা দরকার। তাই আব্বা আমার জন্যে লোক পাঠালেন তুষখালীতে (নির্বাচনী কাজে আমি তখন সেখানে) কি করা যায় তা জানার জন্যে। আমি জানালাম তাঁর সাথে আলাপ না করে কোনো ব্যবস্থা করা ঠিক হবে না। কেননা, আমি জানতাম কাজের সময়ে শহীদ সাহেব কাজ ছাড়া আর কিছুই

www.pathagar.com

বোঝেন না। তবুও আব্বা যাঁরা আসলেন তাঁদের জন্যে সামান্য আয়োজন করলেন। বেলা দেড়টার সময়ে শহীদ সাহেবের আমাদের গ্রামে পৌঁছার কথা। তাই বারোটার দিকে আমি গ্রামে ফিরে এলাম। লোকজন নদীর পাড়ে নেতার বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু পথে পথে নদীর পাড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জড়ো হয়ে নেতার বক্তৃতা শোনার গভীর আগ্রহ প্রকাশ করায় কয়েক জায়গায়ই তাঁকে বক্তৃতা করতে হলো। তাই আমাদের গ্রামে পৌঁছতে সাড়ে তিনটা বেজে গেল। এসেই লঞ্চে দাঁড়িয়ে শহীদ সাহেব উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা করলেন। আমি শুধু ভাবছিলাম কি করে আমাদের সামান্য আয়োজনের কথা বলি। সাহস পাচ্ছিলাম না। কেননা, জানতাম কাজের সময়ে কোনো প্রকার আতিথেয়তা তিনি পছন্দ করেন না। তবুও সাহসে বুক বেঁধে বললাম। প্রথমে গর্জে উঠলেন। বললেন, জানো, আরও কত জায়গায় কত লোক অপেক্ষা করছে? তুমি কিনা বলছো মেহমানদারি হবে। ননসেন্স।

লঞ্চে খাবার ব্যবস্থা না থাকার কথা বলে তাঁর অনুমতি চাইলাম যেন আহারাদি লঞ্চেই নিয়ে আসা যায়। তিনি লঞ্চ ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন—তোমার আব্বাকে ডাকো। আব্বা লঞ্চের কাছেই ছিলেন, আব্বাকে শহীদ সাহেব বললেন—আমার জন্যে যা আয়োজন করেছেন কর্মীদের খাইয়ে দিন, তাতেই আমার খাওয়া হবে। সুযোগ পেলে পরে এসে বেশি করে খাবো। খোদা হাফেজ, পাকিস্তানের জন্য কাজ করুন, তাতেই আমি খুশী।

ইতিমধ্যে লঞ্চ অনেক দূর চলে এসেছে। দেখা যাচ্ছিলো তেলীখালীতে সামিয়ানা টানিয়ে লোক জড়ো হয়েছে। এরই মধ্যে বাবুর্চী এসে বললো ভাত হয়েছে; আলু সিদ্ধ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু লঙ্কা ও তেল নেই। লঞ্চে শহীদ সাহেবের কামরার বাইরে বসে এসব কথা হচ্ছিল, তবুও তিনি শুনতে পেয়ে বললেন, 'তেল-লঙ্কার দরকার নেই। যা আছে ওতেই চলে যাবে। নিয়ে এসো, বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে, ঐতো দেখা যাচ্ছে লোক জড়ো হয়েছে, ওখানেও তো বলতে হবে, তাড়াতাড়ি করে নিয়ে এসো।'

দেখলাম তেল ও লঙ্কা ছাড়া আলুর চাটনি দিয়ে কয়েক মুঠো ভাত তাড়াতাড়ি মুখে দিয়ে উঠে পড়লেন এবং বললেন বেশ মজাদার, জলদি করে তোমরা খেয়ে নাও, আলু খেতে খুব ভালো, বেশ মজা। তারপর দেখলাম চিনি ও দুধ ছাড়াই এক কাপ চা খেয়ে শহীদ সাহেব কি যেন লিখতে বসলেন।

কিছুক্ষণ যেতে-না-যেতেই তেলীখালী পৌঁছে গেলাম। শহীদ সাহেব লঞ্চে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতা শেষে তুষখালী যাত্রা করা হলো। সেখানে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। ইতিমধ্যেই তুষখালীর নদী শুকিয়ে গিয়েছে। তাই সাড়ে তিন মাইল দূরে লঞ্চ রেখে শহীদ সাহেব হাঁটতে শুরু করলেন। কিছু দূর যেতে না যেতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমাদের বিরোধীরা এই সুযোগে ঢিল ছুড়তে লাগলো আমাদের লক্ষ্য করে। শহীদ সাহেব তার মধ্যে হন হন করে হেঁটে চললেন। একবার ভ্রূক্ষেপও করলেন না বিরোধীদের বিদ্রূপ ধ্বনিও ঢিলাবৃষ্টির দিকে। তুষখালীর সভা শেষ করে রাত্রে পুনরায় যাত্রা শুরু হলো। এভাবেই সমগ্র বাংলার পল্লীতে পল্লীতে তাঁর একক নির্বাচনী অভিযান পরিচালনার ফলেই মুসলিম লীগ শতকরা ৯৭টি আসন দখল করলো। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের তিনটি প্রদেশে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সকল নেতা ও কর্মীকে

www.pathagar.com

সমাবেশ করে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও কোথাও মুসলিম লীগের পক্ষে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

মন্ত্রিসভা গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গি

নির্বাচন শেষে মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব প্রধানমন্ত্রী। তাঁরই নির্বাচন অভিযানকালে আমাদের বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের করেছিলেন আমাদের প্রতিপক্ষ। মামলায় সরকারি কর্মচারিদের কয়েকটি 'নিরীহ' ছেলেও আসামী ছিলো, কিন্তু বিভিন্ন কার্যকারণের চাপে মামলা প্রত্যাহার করানোর চেষ্টা করতে হলো আমাদের। ভাবলাম, প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করলেই এটা সম্ভব। তাই ছুটে গেলাম কোলকাতায়। থিয়েটার রোডের বাড়িতে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে দেখা করে মামলা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানালাম। তিনি সরাসরি প্রশ্ন করলেন—'আমি শুধু তোমাদের প্রধানমন্ত্রী না, সমগ্র বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানের প্রধানমন্ত্রী? প্রধানমন্ত্রী হবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আমি মুসলিম লীগের লোক ছিলাম; কিন্তু শপথ নেবার পর থেকে আমি আর তোমাদের নেই। আমি সমগ্র বাঙালির প্রধানমন্ত্রী। আমার কাছে তুমিও যা আর রাজনীতিক্ষেত্রে আমার চরম দুশমনও তাই। তোমরা মামলা চালিয়ে যাও, নিরপরাধ হলে জিতবে। ভালো উকিল দিতে হয় ব্যবস্থা করে দেবো।

অবশ্যি কিছুদিন পরে প্রতিপক্ষ মামলার প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়ে মামলা তুলে নিয়েছিলেন।

সোহ্‌রাওয়ার্দী ও সরকারি কর্মচারি

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর নখদর্পণে ছিলো সরকারের বিভিন্ন বিভাগের খুঁটিনাটি বিষয়। প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে তিনি এত বেশি ওয়াকিফহাল থাকতেন যে, সরকারের পদস্থ কর্মচারিরা কোনো সময়েই তাঁকে যেন-তেনভাবে বুঝ দিতে পারতেন না। সেজন্য সরকারি কর্মচারিরাও প্রতিটি ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিবেচনা করতে বাধ্য হতেন।

তাছাড়া সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের মধ্যে আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, তিনি কোনো কিছুই অপরের জন্য ফেলে রাখতেন না। কোনো মন্ত্রী কি করলেন কি করলেন না, কোন সেক্রেটারি কোনটা চাপা দিয়ে রাখলেন তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন তিনি। বলতে গেলে সকল দফতরের কাজ তিনি একাই চালাতেন। যেজন্যে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে অন্যান্য মন্ত্রীর তেমন কোনো ভূমিকা থাকতো না।

বিভিন্ন দফতরের বিভিন্ন সেক্রেটারিকে একই সাথে 'ডিক্টেশন' দিতে দেখেছি শহীদ সাহেবকে। যা অপর কোনো প্রধানমন্ত্রী হয়তো কল্পনাও করতে পারতেন না।

নীতির প্রশ্নে আপোষহীন মনোভাব

১৯৫৭ সালে নিখিল পাকিস্তান ছাত্রলীগের আহ্‌বায়ক হিসেবে ছাত্রলীগের সংগঠনী সফর ব্যাপদেশে পশ্চিম পাকিস্তান গিয়েছিলাম। লাহোরে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। পাঞ্জাবের শেরশাহে শহীদ সাহেবের সম্মানার্থ পশ্চিম পাকিস্তানের জমিদাররা এক সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কাজ না থাকলে বেড়াতে যাবো কিনা। জমিদারদের সম্বর্ধনা নিশ্চয় খুব জাঁকজমক হবে; যাবে তো যেতে পারো। অবশ্যি তোমার যদি কাজের ক্ষতি না হয়।

www.pathagar.com

পরেরদিন কোনো কাজও ছিলো না। তাই সম্মতি জানালাম।

পরেরদিন দশটা নাগাদ শেরশাহে পৌঁছলাম। আয়োজন দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম—সম্বর্ধনার জন্য এত অর্থ ব্যয় করে এখানে। এ অর্থ যদি প্রজাকল্যাণে ব্যয় করা হয় তবে হয়তো শহীদ সাহেব অনেক খুশী হতেন।

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম জমিদারি প্রথা সম্পর্কে শহীদ সাহেবের নীতির ব্যাপারে তাঁরা আলোচনা করার জন্যেই এই সম্বর্ধনার আয়োজন করেছেন। বেলা এগারোটা নাগাদ একদল জমিদার প্রতিনিধি শহীদ সাহেবের সাথে আলাপ শুরু করলেন। আমি বাইরের এক ঘরে কয়েকজন জমিদারের সাথে গল্প করছিলাম। তাঁরা আমাকে বোঝাতে চাইলেন যে, শহীদ সাহেব জমিদারি প্রথা সম্পর্কে নীরব থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল জমিদার তাঁকে সমর্থন করবে না। আর জমিদারদের সমর্থনের অর্থ শতকরা ৮০টি ভোট শহীদ সাহেবের পক্ষে যাওয়া।

উক্ত যুক্তির সত্যতা অবশ্যি ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করেছি। মুলতানে এক সভায় এক ব্যক্তির সাথে আলাপ হয়েছিল। তিনি শহীদ সাহেবের খুব প্রশংসা করছিলেন। কিন্তু যখন ভোটের কথা জিজ্ঞেস করলাম, তখন সরাসরি জবাব দিলেন, জমিদারের কথা ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের ভোটদাতারা ভোট দিতে অপারগ। কেননা জমিদারদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার অর্থ ভিটামাটি হতে উৎখাত হওয়া।

বেলা একটার দিকে জমিদার প্রতিনিধিরা আলোচনা শেষ করে বাইরে এলেন। কিন্তু তাদের চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই আমি শহীদ সাহেবের কামরায় গিয়ে দেখলাম শহীদ সাহেব চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন। আমি ঢুকতেই বললেন, নূরুল ইসলাম, এরা আমাকে কি বললে জানো? আমি বললাম জানি না, তবে কিছুটা অনুমান করতে পারছি।

তিনি বিদ্রূপের সুরে বললেন, খুব বুঝদার হয়েছো তো। বড় নেতা হয়ে গেলে দেখছি।

আমিও একটু হাল্কাভাবে বললাম, আমরা নেতা হলে, স্যার, আপনাদের উপায় হবে কি? তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি কিছু বোঝনি। কিচ্ছু বোঝনি।

তিনি বললেন, এরা আমাকে 'ম্যাকিয়াভেলী' হতে বলছেন। এঁরা বলছেন—জমিদারি উচ্ছেদের প্রশ্নে আমাকে নীরব থাকতে। তবেই তাঁরা আমাকে সমর্থন করবেন। না হলে আমাকে সমর্থন করতে তাঁদের অসুবিধা। আমি 'শহীদ সাহেব' বলে দিলাম অসুবিধা থাকে তো সমর্থন করবেন না। নীরব থাকতে আমারও অনেক অসুবিধা আছে। ব্যস, আলোচনা শেষ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যেই মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য ডাক পড়লো। শহীদ সাহেব উঠে ভোজসভায় যাত্রা করলেন। আমরা তাঁর অনুসরণ করলাম। যাওয়ার পরে আমি বাইরে বসেছিলাম, কয়েকজন জমিদারও ছিলেন। তাঁরা আমাকে বললেন, শহীদ সাহেব শুনেছি ছাত্রদের খুব ভালোবাসেন। তাই আপনি একটু আলাপ করুন এবং পূর্ব পাকিস্তানে গেলে ছাত্র নেতাদের দিয়ে শহীদ সাহেবকে অনুরোধ করান, যাতে করে জমিদারি উচ্ছেদ সম্পর্কে তিনি অন্তত নীরব থাকেন। তা হলেই আমরা একযোগে শহীদ সাহেবকে সমর্থন করবো এবং আমাদের সমর্থনের অর্থ শহীদ সাহেবের চিরস্থায়ী প্রধানমন্ত্রিত্ব।

তাঁরা আরও বললেন, শহীদ সাহেবের মতো নেতা না হলে দেশ গোল্লায় যাবে। তাই

www.pathagar.com

তাঁকে আমরা চাই। অন্তত এখন জমিদারি উচ্ছেদ প্রশ্নে শহীদ সাহেব নীরব থাকুন। নির্বাচনের পরে পরিষদ সদস্যদের মত পরিবর্তন করে জমিদারি উচ্ছেদ করতে পারলে আমাদের কোনো বক্তব্য থাকবে না। ইত্যাদি।

এতক্ষণ আমি চুপ করে শুনছিলাম। তারপর বললাম—শহীদ সাহেবকে নীতি হতে দূরে সরিয়ে নিতে পারে এমন সাধ্যি কারো নাই। তাছাড়া ক্ষমতার জন্যে কেউ তাঁকে এ অনুরোধ করতেও রাজি হবে না। আর এ অনুরোধ তিনি কোনোদিনই শুনবেন না। এর মধ্যে শহীদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎকারিগণ কয়েকদফা দেখা করেছেন এবং অনেক আলোচনাও করেছেন।

সন্ধ্যার পর জনসভা। শহীদ সাহেব সভায় গেলেন। বক্তৃতা শুরু করলেন। যা বললেন, তার সারমর্ম হলো ঃ জমিদাররা আমাকে এত বড় সম্বর্ধনা দিলেন সেজন্য আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁরা যে অনুরোধটি করেছেন সেটি রাখতে না পারায় দুঃখিত। তাঁরা আমাকে নীতি বর্জন করতে বলেছেন। কিন্তু ওটা হবে না। আমি প্রধানমন্ত্রী হলে জমিদারি উচ্ছেদ করার চেষ্টা করবোই। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি মেহেরবানী করে আমাকে নীতি বর্জনের কথাটি বলবেন না।

বক্তৃতা শুনে জমিদাররা হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন, শহীদ সাহেব জনসভায় হয়তো এত স্পষ্ট করে কথাটা বলবেন না।

শহীদ সাহেবের রাজনৈতিক দর্শন

শহীদ সাহেবের রাজনৈতিক দর্শন ও লক্ষ্য সম্পর্কে অনেক মতবিরোধ দেখা গিয়েছে। বিভিন্ন লোক তাঁর রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করতেন। তাই বহুদিন ধরে এ ব্যাপারে তাঁর সাথে আলাপ করার একটা বাসনা ছিলো। যেহেতু ছাত্র আন্দোলন করতাম, সেহেতু তাঁর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করার সুযোগ হয়ে উঠেনি। পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গিয়ে সে সুযোগ হয়েছিল। শেরশাহ হতে লাহোর যাবার পথে হঠাৎ শহীদ সাহেব প্রশ্ন করলেন, কতদিন আর ছাত্র ছাত্র করবে, অনেক দিন তো হলো।

আমি জবাবে বললাম, কি করবো স্যার।

তিনি বললেন, অন্য কিছু করো। যদি রাজনীতি করতে চাও তবে কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারো।

আমি বললাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসেবে রাজনৈতিক দল এদেশে খুঁজে বের করা মুশকিল। তিনি বললেন, কেন? মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, আওয়ামী লীগ, আরো তো আছে।

আমি বললাম, মাফ করবেন, এগুলোকে রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকার করে নিতে কেমন যেন ঠেকছে। এগুলোকে বরং বিভিন্ন মতের লোকদের শিথিল প্ল্যাটফরম বলা যেতে পারে।

প্রথমে তিনি একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন। কিন্তু আমি যখন একই মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলাম তখন তিনি বললেন, তবে নিজেরা একটা দল করো না কেন?

বললাম, আমরা এত ক্ষুদ্র, আমাদের উপকরণ এত কম যে, আমাদের পক্ষে এখন কোনো দল গড়া সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, তাহলে কি করবে? আমি তো একটা দল গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন করলাম, আপনার দলের লক্ষ্য কি?

তিনি বললেন, গণতন্ত্র।

বললাম, স্যার, গণতন্ত্র এখন এমন হয়েছে যে, গণতন্ত্রের একনম্বর দুশমনও গণতন্ত্রের দোহাই পাড়ে। যিনি গণতন্ত্র মুছে দিতে সর্বক্ষণ প্রচেষ্টা চালান তিনি গণতন্ত্রের কথাই বলেন। তাই স্যার, গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। আপনার গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা জানতে পারলে বাধিত হতাম।

তিনি এককথায় জবাব দিতে চাইলেন এবং বললেন, নির্ভেজাল গণতন্ত্র।

বললাম, রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞানের একজন অতি সাধারণ ছাত্র হিসেবে আপনার জবাবে সন্তুষ্ট হতে না পারায় দুঃখিত। তাছাড়া গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা না জানতে পারলে সন্তুষ্টই বা হই কি করে।

শহীদ সাহেব তাঁর চিরাচরিত পন্থায় চক্ষু বুজে রইলেন। আমি নাছোড়বান্দা, তাই বললাম, সকলকে সমান সুযোগ দান গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে জানি। এ ব্যাপারে আপনার মত কি?

তিনি জবাব দিলেন, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সকলেই এ কথা মেনে চলবে।

আমি বললাম, সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে নিলে কি সকলকে সমান সুযোগ দান সম্ভব?

তিনি চক্ষু বুজেই একটু মুচকি হাসলেন। আর বললেন, Naughty boy. আমাকে দিয়ে তুমি কি বলাতে চাও? আমার অনেক বিরুদ্ধবাদী রয়েছে।

ঠোঁটের ওপর তর্জনি রেখে শুধু বললেন, আমি আর কথা বলছি না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আজো মনে পড়ে
আজিজুর রহমান

শহীদ সাহেব অত্যন্ত পরিচিত ও একটি প্রিয় নাম। আরেকটি নাম সোহরাওয়ার্দী সাহেব। পাক-ভারতে এমন একটি লোকও নেই—যিনি শহীদ সাহেব বা সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব, এই দু'টি বিদ্যুৎময় নাম শোনেনি বা এই নামের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে পরিচিত নন।

বোধহয় ইংরেজি ১৯২৬ সাল, কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা চলছে। গ্রাম-বাংলার সুদূর প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়ছে কলকাতার সেই দাঙ্গার সম্ভব-অসম্ভব নানা রকমের খবর ও গুজব।

সে সময় সকলেই নিত্যনতুন পরিস্থিতি জানবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকতো আর অবাক হয়ে শুনতো শহীদ সাহেব প্রাণপণ চেষ্টা করে মুসলমানদের রক্ষা করছেন। এই সময়েই শহীদ সাহেবের নাম বেশি করে ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। তখনকার দিনের ওই তরুণ মুসলিম নেতাই ক্রমে ক্রমে রূপকথার নায়ক হয়ে উঠছিলেন সবার কাছে।

আর এর কারণ হচ্ছে দাঙ্গা পরবর্তী আরেকটি ব্যাপার। তখন অভিযুক্ত আসামীদের পক্ষ সমর্থন করছিলেন ব্যারিস্টার শহীদ সাহেব। দিনের পর দিন আদালতে বিখ্যাত ইংরেজ ব্যারিস্টার মিস্টার ল্যাংফোর্ড জেমসের মোকাবিলা করতেন অপূর্ব বাগ্মীতায় ও আইনজ্ঞানের সাহায্যে। সবাই বলাবলি করতো ব্যারিস্টার শহীদ সাহেব বড়, না ল্যাংফোর্ড জেমস বড়। মুরুব্বী মহলেও এই আলোচনা চলতো। আমাদের কিশোর মন এসব আলোচনায় শহীদ সাহেবের ব্যক্তি-প্রতিভার দিকে ক্রমশই আকৃষ্ট হচ্ছিল।

কিন্তু সবার এত আশা সবই বিফল হলো। অন্যান্য মুসলিম আসামী খালাস পেলো, কিন্তু একজনের হলো ফাঁসির হুকুম। সবাই খুশী হয়েও হতে পারলো না। মুসলিম বাংলার মন সেই হতভাগ্য আসামীর প্রতি সমবেদনায় ভরে উঠলো। এমনি সময় খবর এলো, শহীদ সাহেব হাইকোর্টে আপীল করেছেন। আবার সবার অধীর আগ্রহে ফলাফলের আশায় চেয়ে থাকলো। দিন যায়, ঔৎসুক্য আরো বাড়তেই থাকে; কিন্তু অবশেষে শোনা গেলো, আপীল মঞ্জুর হয়নি; তবে শহীদ সাহেব বলেছেন, 'যেমন করে হোক ফাঁসির হুকুম তিনি রদ করবেনই।

কেউ বলে, কি আর হবে? কিন্তু শহীদ সাহেব জেদী বটে; যতটুকু চেষ্টা করলেন তিনি, এতটুকুইবা কে করে। কেউ বা নিরাশ; কেউ বা হাল ছেড়ে দিলেন। কেউ মনে মনে অপেক্ষা করতে থাকলেন, দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কি হয়।

এমনি সময় হঠাৎ একদিন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো ফাঁসির হুকুম রদ হয়েছে। গ্রামের লোক, বন্দরের লোক, শহরের লোক সবার মুখে ঐ এককথা 'ফাঁসির আসামী খালাস'। মোটকথা, ফাঁসির আসামী খালাস করে ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ সেকালে যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁর সেই খ্যাতিকেও শহীদ সাহেব অতিক্রম করেছিলেন। ব্যারিস্টার হিসেবে এত বড় নাম মনোমোহন ঘোষ, সি. আর. দাশ এবং শহীদ সাহেব ছাড়া আজ পর্যন্ত এদেশে কেউ অর্জন করতে পেরেছেন বলে জানা যায় না।

আমাদের কিশোর মনে তখন থেকেই সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব হয়ে থাকলেন এককথায়

www.pathagar.com

রোমান্টিক নায়ক। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর নেহরু রিপোর্ট নিয়ে মুরুব্বীরা আলোচনা করতেন। আমরা অতশত না বুঝলেও সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব মুসলমানদের জন্য যা ভালো তাই করেছেন ও করছেন, এটা বেশ পরিষ্কারভাবে ধরে নিয়েছিলাম। উত্তরবঙ্গের বন্যায় সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব দুর্গতদের সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন। দাঙ্গা-পীড়িত কলকাতা আর বন্যা-পীড়িত উত্তরবঙ্গের দুর্গতদের সাহায্যই শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে আরো প্রিয় এবং আরো পরিচিত করে তুলেছিলো তখনকার দিনের বাংলাদেশের প্রতিটি লোকের কাছে।

তারপর ঘটনার স্রোত বয়ে চললো রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়—বিভিন্ন ধারায়। স্বতন্ত্র মুসলিম পার্টিকে মুসলিম লীগে সংগঠিত করা হলো। তারপর বাংলাদেশে মুসলিম লীগের বিজয় অভিযান। এসব যেমন অলৌকিক তেমনি ঐতিহাসিক। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তা মনে হবে রূপকথা। ভেবে বিস্মিত হতে হয়, কি করে গ্রামের কৃষকদের কাছেও তিনি মুসলিম লীগকে পরিচিত ও প্রিয় করে তুলতে পেরেছিলেন তখন! আরো অবাক হতে হয়, যিনি বাংলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত করে পাকিস্তান হাসিল করলেন, পরবর্তীকালে আবার তারই পাল্টা প্রতিষ্ঠান 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে তিনি সেই মুসলিম লীগের হাত থেকে মন্ত্রিত্ব ছিনিয়ে নিলেন। কত বড় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, কতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করলে তবে একই হাতে গড়া জিনিসকে আবার ভেঙ্গে গড়ার এই শক্তি আয়ত্তে আসে, আর দুনিয়ায় সৃষ্ট এ-ই হচ্ছে তুলনাবিরল উদাহরণ। মনে হয় সেখানেই রয়েছে শহীদ নেতৃত্বের প্রকৃত তাৎপর্য ও মূল বৈশিষ্ট্য।

আমাদের মনে ক্রমশ গড়ে ওঠা ধারণার সঙ্গে রক্ত-মাংসে গড়া শহীদ সাহেবের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম কলকাতায়। তখন অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। শহীদ সাহেব নিয়েছেন শ্রম ও বাণিজ্য দফতরের ভার। ওয়েলেসলি ফার্স্ট লেনে সাহেবী ধাঁচের বিরাট একটি কুঠিবাড়িতে মন্ত্রী হওয়ার আগে থেকেই তিনি থাকতেন। উনিশ শতকী স্থাপত্যরীতির সুপরিস্ফুট ছাপ ছিলো সে বাড়ির অনন্য বৈশিষ্ট্য। ঐ কুঠির মধ্যেই তাঁর নিজস্ব বয়, বাবুর্চি, খানসামা, ধোপা, চাকরদের ছিলো আলাদা কামরা। ওপরতলার একপাশে কয়েকটি রুমে থাকতেন শহীদ সাহেব নিজে ও অন্যপাশের রুমগুলো নিয়ে থাকতেন শহীদ সাহেবের জনৈকা বৃদ্ধা আত্মীয়া। শহীদ সাহেব তাঁকে ফুফুআম্মা বলে ডাকতেন। সেই বৃদ্ধা মহিলাই অপত্যস্নেহে শহীদ সাহেবের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ও বাবুর্চি-খানসামাদের ওপর খবরদারি করতেন।

নিচেরতলায় গাড়িবারান্দার সামনের হলঘরের দুপাশে অনেকগুলো কামরা ছিলো, তার একপাশের কামরাগুলোতে থাকতেন অনেকগুলো মেধাবী ছাত্র। তারা পাস করে কর্ম সংস্থান নিয়ে চলে গেলে আবার অন্য ছাত্ররা আসতেন, তাদের কর্ম সংস্থানও শহীদ সাহেব নিজেই করে দিতেন। সব ছাত্রের জন্য আলাদা বাবুর্চি ও বয় ছিলো, সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন শহীদ সাহেব নিজেই আর এটা ছিলো তাঁদের খান্দানী প্রথা। অপর পাশের কামরাগুলোতে থাকতেন স্থায়ী-অস্থায়ী অতিথিরা। দু'জন ইউরোপীয়ান ভদ্রলোককেও অনেকদিন থাকতে দেখেছি।

মুন্সী সাহেব নামে অভিহিত জনৈক কলকাতিয়া মুসলমান ভদ্রলোক শহীদ সাহেবের সাংসারিক ব্যাপারে তদারক করতেন। একেবারে সেই সাবেক জমিদারি বনেদীয়ানা। শহীদ সাহেবের পৈত্রিক জমিদারি ছিলো মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। মাঝে মাঝে অনেক লোক আসতো সেখান থেকে। তাদের অনেকে আবার শহীদ সাহেবের আত্মীয় বলেও পরিচয় দিতো।

www.pathagar.com

দ্বিতলের প্রশস্ত হলঘরটি সব সময় থাকতো সুসজ্জিত। দেয়ালে আরবী তোগরা অক্ষরে চমৎকার রংয়ে আঁকা কালামে পাক ও দোয়া দরুদ সুন্দর সুন্দর ফ্রেমে বাঁধাই করে সাজানো। দামী কার্পেট বিছানো সেই হলঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড একখানি টেবিল, চারপাশে চেয়ার আর দেয়াল ঘেঁষে থাকতো সারি সারি সোফা। পাশেই শোবার ঘর—শহীদ সাহেব ওখানে বসেই কাজ-কর্ম করতেন। তাঁর শোবার পুরু গদীওয়ালা খাটখানাই হতো তখন টেবিল।

সকালে দারোয়ান গেট খুলে দিতেই একে একে দুধ, রুটি, মাখন, সব্‌জিওয়ালারা জিনিসপত্রগুলো নিয়মিত দিয়ে দামের কোনো প্রশ্ন না তুলে চলে যেতো, আর সপ্তাহ শেষে বিলের দিনে মুন্সী সাহেবের কাছ থেকে তারা বখসিস সমেত দাম পেতো।

অতি প্রত্যুষেই সারাটা বাড়ি যেন সহসা রূপকথার রাজপুরীর মতো জেগে উঠতো। চাকরেরা গৃহ ও আসবাবপত্রাদি সাফ-সাফাই আর সাজানো গোছানো শুরু করতো। কুঞ্জ ধোপা ময়লা কাপড়গুলো নিয়ে পরিষ্কার কাপড়চোপড়, পর্দা, টেবিল ঢাকা চাদর, তোয়ালেগুলো দিয়ে যেতো। ঠিক তার একটু পরেই নাপিত নগেন শীল ক্ষুর, কাঁচি ও কামানোর সরঞ্জাম নিয়ে সোজা দোতলায় শহীদ সাহেবের শোবার ঘরে উঠে যেতো। মুন্সী সাহেব গাড়িবারান্দায় পায়চারি করতেন আর তাকিয়ে সবকিছুই লক্ষ্য করতেন, সবই ঠিকমতো হচ্ছে কিনা। কখনো কখনো 'এই' বলে হাঁক দিতেন আর অমনি সকলেই সন্ত্রস্ত হতো।

যে সময়ের কথা আলোচনা করছি, সে সময়ে কুষ্টিয়ার তিনজন ছাত্র শহীদ সাহেবের বাসায় ছিলেন, তার মধ্যে একজন আমার গ্রামবাসী।

এই মুন্সী সাহেব ছিলেন একেবারে নিখুঁতভাবে ফিটবাবু—পরতেন সরুপাড় মিহিন ধুতি, সুন্দর করে কোঁচানো। সাপের ফণার মতো কোঁচার মাথাটি মেঝে স্পর্শ করতো। চলবার সময় কোঁচাটি তিনি বাম হাতে ধরে চলতেন। হাইকলার কফওয়ালা শার্টের নিম্নভাগ ধুতির নিচে নামিয়ে পরতেন—ঠিক প্যান্টের নিচে শার্ট পরার কায়দায়। তারপর সেই শার্টের ওপর পরতেন সাহেব বাড়ির তৈরি ওপেন ব্রেস্ট কোর্ট। মুন্সীজী গোঁফের দু'টি কোণা জার্মানীর কাইজারের কায়দায় ছুঁচলো করে রাখতেন। কলপ দেওয়া কালো চুলে প্রিন্স আলবার্টের মতো করে কাটতেন আলবার্ট টেরী সিঁথি। কথাবার্তা চালচলনে অতি মার্জিত ছিলেন তিনি। শহর কলিকাতার আদি বাসিন্দাদের এই বংশধরটি ছিলেন ছিপছিপে অথচ স্বাস্থ্যবান পুরুষ। মাথার সিঁথিটা দেখা যায়, এমনিভাবে কায়দা করে একটু হেলিয়ে পরতেন কালো ভেলভেটের চামড়ার ফিতে লাগানো ক্যাপ, কখনো কখনো বা টুপি আর এই পোশাকেই তাকে বেশ মানাতোও। মুন্সী সাহেব শহীদ সাহেবের ব্যারিস্টারি সেরেস্তাও পরিচালনা করতেন। শহীদ সাহেবের একেবারে আম মোক্তার গোছের এবং শহীদ সাহেবও তার সংসারের ব্যয়ভার বহন করতেন। তার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে চাকরি অবশেষে নিজ খরচায় বিয়েও দিয়ে দিয়েছেন শুনেছি।

শহীদ সাহেবের ওয়েলেসলির সেই কুঠি এবং শহীদ সাহেবের বনেদীয়ানা, আর তাঁর খাস মুন্সী, যে মুন্সী সাহেব এবং যার চালচলন উনিশ শতকী কলিকাতা কালচারের ঠিক যেন একখানা জীবন্ত ছবি—তখনকার দিনের চলমান ছায়া এসে পড়তো—যা আজো শহীদ সাহেবের কথা মনে পড়লেই মনের চোখে জেগে ওঠে।

এই সময়ে কুষ্টিয়ার যে তিনজন ছাত্র থাকতেন শহীদ সাহেবের সেই ওয়েলেসলি ফার্স্ট লেনের কুঠিতে তাদের একজন বি.এ. পাস করে একটি ভালো চাকরি পেয়েছেন শহীদ

www.pathagar.com

সাহেবের চেষ্টায়। আর দু'জন তখনও পড়ছেন। তারা ছিলেন আমার নিবিড়তম বন্ধু। আমি প্রায়ই তখন তাদের কাছে যেতাম। এমনি যশোরের দু'জন ছাত্র আর অন্য জেলার ছাত্ররাও ছিলেন আমার পরিচিতির গণ্ডির মধ্যে।

একদিন মুন্সী সাহেব এসে আমায় বেশ তাজিমের সঙ্গে বললেন, শহীদ সাহেব আপনাকে ডেকেছেন।

হঠাৎ যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করলাম। অতবড় একজন মাননীয় ব্যক্তি, যাঁর সঙ্গে আমার তখন পর্যন্ত একটি কথাও হয়নি তাঁরই সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কেমন করে কি বলবো—বেশ খানিকটা ভীত-চকিত ভাব নিয়ে চললাম মুন্সী সাহেবের সাথে।

পর্দা উঠিয়ে মুন্সী সাহেবের পিছু পিছু শহীদ সাহেবের কামনায় ঢুকে আদাব জানালাম। শহীদ সাহেব বললেন, 'বসুন।' কথাটি বলেই তিনি খুব মনোযোগসহকারে একটি চিঠি পড়তে লাগলেন। আমি বসলাম। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই শহীদ সাহেবের কামরায় ঢুকলেন মান্যবর হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী সাহেব। তাঁর কাছে তখন শহীদ সাহেব বাংলা শিখতেন। অন্যান্য দু'একটি কথার পর বাহার সাহেব আমাকে বললেন, তারপর এখানে কি মনে করে?

বললাম, শহীদ সাহেব ডেকেছেন। কাগজ পড়তে পড়তেও শহীদ সাহেব আমার ও বাহার সাহেবের কথাবার্তা লক্ষ্য করছেন তা বেশ বোঝা গেল। কারণ শহীদ সাহেব বাহার সাহেবকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে বাহার সাহেব আগে থেকেই চেনেন কিনা। শহীদ সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি তো প্রায়ই আসেন।

আমি বললাম, জ্বী হাঁ।

শহীদ সাহেব বললেন, আপনার বলার কথা আমাকে বলুন। কয়েকদিন ফিরে গেছেন মনে হয়।

আমি বললাম, জ্বী না, আমার বলবার কিছুই নেই।

আবার শহীদ সাহেব বললেন, কিন্তু আপনি যে প্রায়ই আসেন।

তখন আমি তাঁর বাসায় থাকা কুষ্টিয়ার সেই ছাত্রদের কথা বললাম। কথাগুলো শুনে আবার শহীদ সাহেব বললেন, আপনি কি করেন?

আমি বললাম, কিছুই না।

বাহার সাহেব তখন আমার মতো নগণ্যের সামান্য পরিচয় তাঁকে দিলেন। শহীদ সাহেব আবার আমাকে বললেন, আপনি কেমন কবিতা লেখেন—টেগরের মতো না নজরুলের মতো। আমি বললাম, কারুর মতোই নয়। শহীদ সাহেব একটু হেসে বললেন, তবে আর কি লিখছেন?

এই সাক্ষাৎ ও সামান্য কথা কয়টির পর তাঁর সঙ্গে আরো অনেকবারই দেখা হয়েছে, আমার অনেক কথাও হয়েছে এবং অনেক উপকারও পেয়েছি—যা জীবনে কোনোদিনই ভুলতে পারবো না এবং সম্ভবও নয়। তারপর একবার কলকাতায় গিয়ে শহীদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। সেদিনের একটি সামান্য ঘটনা আজো আমার মনে অসামান্য হয়ে রয়েছে।

শীতের এক সকালে সাক্ষাৎপ্রার্থীরা আসতে শুরু করেছেন। মুন্সী সাহেব তাঁর সেই বনেদী কায়দায় সবাইকে অভ্যর্থনা করছেন; হলঘরের কোণের দিকের একটি জায়গায় খটখট করে টাইপ করে চলেছেন শহীদ সাহেবের মাদ্রাজী স্টেনো-টাইপিস্ট। শহীদ সাহেব মন্ত্রী হওয়ার পর কেবলমাত্র দু'তিনজন আর্দালী ও এই মাদ্রাজী টাইপিস্ট ছাড়া আর সব চাকর-বাকর, বয়-খানসামা, মেথর, নাপিত-ধোপা সবই অনেক আগে থেকেই তাঁর ছিলো।

www.pathagar.com

অপেক্ষা করছি সাক্ষাতের জন্যে, শহীদ সাহেবের প্রিয় খানসামা ইস্‌তিয়াক বেরিয়ে আসতেই জানা গেল, শহীদ সাহেবের নাস্তা খাওয়া শেষ হয়েছে। একটু পরেই দেখা হতে পারে।

শহীদ সাহেবের নাস্তার বর্ণনা যা শুনেছিলাম, তা উল্লেখ না করে পারছি না। আটখানা ঘি-চপ্‌চপ্‌ পরোটা, একটি বড় মোরগের রোস্ট, মুরগির ডিম সিদ্ধ দশটি, দুটো আপেল ও অন্যান্য ফল এবং একগ্লাস আঙ্গুরের রস—এই ছিলো তাঁর প্রাত্যহিক প্রাতঃরাশ।

শহীদ সাহেব এক্ষণি সাক্ষাৎদান শুরু করবেন ভেবে মনে মনে তৈরি হচ্ছি, এমনি সময় শহীদ সাহেবের ভারী কণ্ঠের আওয়াজ এলো, বাবু। তখনি সেই টাইপিস্ট মাদ্রাজী ভদ্রলোক ইয়েস স্যার বলেই দিলেন ভোঁ-দৌড় আর তার ধাক্কায় একখানা চেয়ার উল্‌টে পড়লো আর দু'একটার ওপরে।

অবশেষে যখন তিনি শহীদ সাহেবের কামরায় ঢুকলেন, তখন দেখা গেল দরজার পর্দাটা মাদ্রাজী চাদরের মতো সেই মাদ্রাজী ভদ্রলোকের কাঁধের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। আর সেই সঙ্গে একটা হাতওয়ালা চেয়ারের বাঁকানো হাতা তার প্যান্টের পাস পকেটের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বাঁধনের গাঁটছড়া বেঁধে একেবারে শহীদ সাহেবের খাস কামরায় ঢুকে পড়েছে। শহীদ সাহেবের গম্ভীর কণ্ঠ আবার গর্জে উঠলো—'হোয়াট ইজ দিস, বাবু'?

মাদ্রাজী ভদ্রলোক তো কাঁচুমাচুঁ হয়ে 'আইয়্যাম ভেরী ভেরী সরি স্যার' বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে থাকলেন।

চকিতে শহীদ সাহেবের চোখেমুখে চাপা হাসির ছায়া ঝলকে উঠলো, কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা লুকিয়ে নিয়ে আবার শান্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ঠিক আছে—আপ জলদি ইঠো টাইপ করকে লাইয়ে।' আবার সেই বিপর্যয়, তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে এটা ফেলে দিয়ে ওটা উল্টে দিয়ে তারপর নিজের টেবিলে গিয়ে বসে কাজ শুরু করলেন।

এই মহাব্যস্ত মাদ্রাজী টাইপিস্ট যেমন ছিলেন কাজের লোক আর ততোধিক ছিলেন শহীদ সাহেবের প্রিয়পাত্র। তার দ্বারা এ ধরনের ব্যাপারের প্রায়ই পুনরাবৃত্তি হতো। শহীদ সাহেব ধমকের সুরে বরং প্রশ্রয়ই দিয়ে রসোপভোগ করতেন।

বসে আছি, লোকের পর লোক দেখা করে চলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কেউ পর্দা সরালে তাকিয়ে দেখছি, তিনি আমার দিকেও তাকাচ্ছেন অথচ ডাকছেন না। নিজেই এগিয়ে গেলে শহীদ সাহেব বললেন, কী খবর আপনার?

বললাম, খবর কিছুই নেই। শরীর খারাপ তাই ডাক্তার দেখাতে এসেছি। তারপর কোথায় উঠেছি, কোনো ডাক্তারকে দেখাচ্ছি সংক্ষেপে সবই বললাম।

শহীদ সাহেব বললেন, আপনি বরং এক কাজ করুন, আমার এখানে চলে এসে নিচেরতলার ঘরে থাকুন, তারপর দেখা যাক কী করা যায়। এর বেশ কয়েকদিন পর শহীদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, মুন্সীজী বললেন, আজ দেখা হওয়া তো মুশকিল হবে, কবি নজরুল ইসলাম এসেছেন। আরো উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কাজী সাহেব এসেছেন, ব্যাপার কি?

মুন্সীজী বললেন, ব্যাপার আবার কি? আগে তো কবি প্রায়ই আসতেন, এখন শহীদ সাহেব মন্ত্রী হওয়ার পর আর আসেন না।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

মানে হচ্ছে, এখন এলে বাইরের লোকের ক্ষতি হয়। শহীদ সাহেব তো কাজী

www.pathagar.com

সাহেবকে পেলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে যান। সাক্ষাতেচ্ছুদের ভিড় জমে, অথচ শহীদ সাহেব কাজী সাহেবকে ছাড়তে চান না, কাজী সাহেবও উঠতে চান না। কাজ-কর্মে দেরি হয়, তাই। শহীদ সাহেবের বাসায় কবি শাহাদৎ হোসেন, কবি মহিউদ্দিন মাঝে মাঝে কবি ফররুখ আহমদও যেতেন। কিছুদিন পরে কবি বেনজীর আহমদ সাহেবকেও প্রথম দেখেছিলাম ওখানে। কবি বেনজীর আহমদ সাহেব তখন খুব সম্ভবত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যকরী পরিষদের সদস্য এবং মুসলিম লীগের গোপন সশস্ত্র বৈপ্লবিক শাখার অন্যতম নেতা। বহু কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিককে শহীদ সাহেবের কাছে আসতে দেখেছি। কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকেরা ছিলেন শহীদ সাহেবের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-সম্মানের পাত্র।

দুই-তিনদিন পর কবি ওয়ালিউল্লাহ এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন শহীদ সাহেবের কাছে। শহীদ সাহেব আমাকে বললেন, আপনি বরং এক কাজ করুন। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি কর্নেল চোপরার কাছে যান, হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসিত হন। তাহলে মূল রোগটিও ধরা পড়বে, চিকিৎসাও হবে আর খাওয়া-দাওয়া, সেবা-শুশ্রূষা সব ব্যাপারেই একটা ভালো বন্দোবস্তের মধ্যে থাকবেন।

কর্নেল চোপরা ও মেজর প্যাসরিচার সুচিকিৎসায় আমি রোগমুক্ত হয়েছিলাম।

শহীদ সাহেব অনেকবার কুষ্টিয়ায় এসেছেন। কুষ্টিয়াবাসী ছিলো তাঁর প্রিয় এবং কুষ্টিয়াবাসীরও তিনি ছিলেন প্রিয়। একবার এসেছিলেন তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে, সঙ্গে ছিলেন দেশপ্রসিদ্ধ গায়ক আব্বাসউদ্দিন। সভায় গান গাওয়ার পর আব্বাসউদ্দিন বললেন, 'আমি নৈশভোজ সভায় যাবো না, শরীরও ভালো নেই, ওসব খাবারও আমার সহ্য হবে না। কাজেই আমার জন্য সাদাসিধে খাবার আর নিরিবিলি বিশ্রামের বন্দোবস্ত করুন'। শিল্পীর অভিপ্রায় অনুসারে মাগুর মাছ, টমেটোর সুপ, আলু ভর্তা, বেগুন ভাজি, ফুলকপির ডালনা ইত্যাদি সবই তৈরি হতে থাকলো। কিন্তু শিল্পী বিশ্রাম না করে তাঁর কোনো এক বন্ধুর আত্মীয় মোহিনী মিলের যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাড়িতে গেলেন বেড়াতে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানার মতো তিনি শুরু করলেন গানের পর গান—যা নাকি অজস্র অনুরোধেও তিনি করতে চাইতেন না। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাসায় তাঁর গানের মন হয়ে গেল একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে অবারিত। অথচ এদিকে সারা কুষ্টিয়া শহরে তখন ছুটছে জীপ, ট্যাক্সি আর সাইকেল—শিল্পী গেলেন কোথায়? শহীদ সাহেব শিল্পীর অপেক্ষায় কিছুতেই খানা খাচ্ছেন না, আর সেজন্যই অন্য কেউও খাচ্ছে না। সবাই খানার টেবিলে অপেক্ষা করছেন। সরকারি লোকেরা বহু খোঁজ করে অবশেষে ওখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

ব্যাপার শুনে শিল্পী আমাকে পাঠিয়ে দিলেন শহীদ সাহেবের কাছে। শহীদ সাহেব তখন আমার মুখে শিল্পীর বক্তব্য শুনে আবার আমাকে বললেন, 'আপনি গিয়ে শিল্পীকে আমার কথা বলুন, সে যদি এসব খাবার না খেতে চায় তবু এর যে কোনো খাবার একবার তাকে মুখে দিতেই হবে। তা না হলে আমার খাওয়াই হবে না।'

এদিকে শহীদ সাহেব না খেলে সেই ডিনার পার্টির কোনো মেহমানই খাবেন না। আবার আমাকে গাড়ি নিয়ে শিল্পীকে আনতে যেতে হলো। তারপর শিল্পীকে খানার টেবিলে বসিয়ে তবে রক্ষা। শহীদ সাহেব খেতে খেতে আব্বাসউদ্দিনকে ইংরাজিতে জিজ্ঞেস করলেন কেমন খাচ্ছ? শিল্পীও ইংরাজিতে বললেন, বেশ ভালোই। শহীদ সাহেব হাসতে হাসতে শিল্পীকে তখন বাংলায় বললেন—'তবে দুষ্টুমি করছিলে কেন?'

www.pathagar.com

শিল্পীও খেতে খেতে হাসতে লাগলেন। তখন শহীদ সাহেব আবার বললেন, 'আব্বাসকে ডবল প্লেটে দিন আপনারা, ভালো করে খাওয়ান।' শহীদ সাহেবের এই কথায় ভোজসভার সবাই হেসে উঠলেন।

১৯৪৬-এর আগস্ট। কলকাতার সেই মারণ উৎসব। স্টেটসম্যান পত্রিকার কথায়, 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এ আটকে পড়লাম। তিনবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে তারপর একটু সাবধানই হতে হলো। থিয়েটার রোড ও রডন স্ট্রীটের মোড়। প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং শ্রম ও বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব শামসুদ্দিন আহমদ সাহেবের বাসা প্রায় পাশাপাশি বলা চলে। জনাব শামসুদ্দিন সাহেব আমাকে বললেন, তুমি কিন্তু আমার বাসাতেই থাকবে।

সে সময় কুষ্টিয়ার গিরী মহারাজ এবং আরো দু'একজন হিন্দু ভদ্রলোক, মালদহের ভূপেন বাবু প্রমুখ ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জনাব শামসুদ্দিনের নিচের তলায় ছিলো রেড এড কিওর হোম হাসপাতাল।

শহীদ সাহেবের বাসায় বহু হিন্দু আশ্রয় নিয়েছিলেন। স্থান সংকুলান না হওয়ায় একটু কাছেই একটি সুরক্ষিত জায়গায় অন্য হিন্দুদের থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। তার মধ্যে ছিলো প্রায় ৯০/৯৫ জন হিন্দুস্থানী গোয়ালা। আর এসব বন্দোবস্ত শহীদ সাহেবের সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং ব্যক্তিগতভাবে এরা সবাই শহীদ সাহেবের মেহমান হিসেবেই ছিলো। আশ্রয়প্রাপ্তদের মধ্যে ছিলো সপরিবারে জনৈক হিন্দু কেরানী ভদ্রলোক; শহীদ সাহেবের নিজস্ব ধোপা কুঞ্জ রজক, নাপিত নগেন শীলকে তো আমি আগে থেকেই চিনতাম। ওরা সপরিবারে শহীদ সাহেবের বাসাতেই উঠেছিল।

মহল্লার মুসলমানদের সবচেয়ে আক্রোশ ছিলো এই গোয়ালাদের প্রতিই। বেশ কয়েকদিন পরে শহীদ সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গোয়ালাদের ভবানীপুরের দিকে যাওয়ার বিলি ব্যবস্থা করে দিচ্ছিলেন। আমরা প্রায় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সেই ভীত-সন্ত্রস্ত বিপন্ন মানুষের মিছিল দেখছিলাম, তাদের মুখে-চোখে যেন কৃতজ্ঞতা উছলে পড়ছে, সবাই দূরে দাঁড়ানো শহীদ সাহেবকে যুক্ত করে নমস্কার করতে করতে থিয়েটার রোড অতিক্রম করছিল। সেই মিছিলের কেউ কেউ শহীদ সাহেবকে উদ্দেশ্য করে জিন্দাবাদ গোছের জয়ধ্বনি ঘোষণা করতেই শহীদ সাহেব বজ্র-গর্জনে ধমকে উঠলেন, এই চিল্লাও মৎ।

বন্দী হয়ে আছি। শহীদ সাহেবের বৈঠকখানায় যাওয়া; রেড এড কিওর হোমে গিয়ে বসা—এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এবাড়ি থেকে ওবাড়ি পৌঁছতে হলেও আগে থেকে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখে তারপর সাঁ করে দৌড়ে পৌঁছতে হয়। কারণ কোনো সময় যে আততায়ীর জীপ এসে পড়বে তার ঠিক নেই। এ অঞ্চলে আবার শিখদের দৌরাত্ম্যই ছিলো তখন বেশি। তাদের নম্বরবিহীন গাড়িগুলো তীরতীব্র গতিতে চিলের মতো ছোঁ মেরেই উড়ে আসতো। সে সময় কয়েকদিন থেকে একজন সশস্ত্র ইউরোপীয়ান ভদ্রলোককে শহীদ সাহেবের বাসায় ঢুকতে আবার অল্পক্ষণ পরেই বেরিয়ে চলে যেতে দেখা যাচ্ছিল।

এর মধ্যে একদিন শহীদ সাহেবের বৈঠকখানায় গিয়েছি, ঠিক এমনি সময় সেই শশব্যস্ত ও সশস্ত্র ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক এসে দ্রুতগতিতে একেবারে ভেতরের দিকে চলে গেলেন।

ভাবছি কে ইনি আর প্রবেশপথের পাশের দেয়ালের ছবিগুলো দেখছি দাঁড়িয়ে। এমন সময় সেই শশব্যস্ত কণ্ঠে বিরক্তিভরা বজ্রগর্ভ আওয়াজ —'আরে সাব, সরে দাঁড়ান না।'

www.pathagar.com

কী আশ্চর্য! এযে একেবারে হুবহু শহীদ সাহেবের কণ্ঠ! তারপর সেই শশব্যস্ত মূর্তি প্রায় দৌড়ে একখানা সরকারি ওয়েপন ক্যারিয়ারে উঠলো। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিয়েই রেখেছিল। গাড়িখানা তীব্রগতিতে ভবানীপুরের দিকে ছুটে চলে গেলো। একটু পরেই সেই প্রহেলিকার অবসান হলো। শুনলাম, 'শহীদ সাহেব।' কিন্তু তখন আবার মনে জাগলো তাঁর নিখুঁতভাবে ইউরোপীয়ানের মেক-আপ নেয়ার কথা। জনাব শামসুদ্দিন সাহেবকে পরে নিভৃতে জিজ্ঞেস করেছিলাম শহীদ সাহেবের এই ইউরোপীয়ান মিলিটারী অফিসারের ছদ্মবেশের কথা।

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, কেন, তা কি বুঝিয়ে বলার দরকার করে? নিজেই বুঝবার চেষ্টা করো। সেই সময়ে আহার, নিদ্রা, ভয়ের অতীত ছিলেন শহীদ সাহেব। তিনি যেভাবে দুর্গত হিন্দু আর দুর্গত মুসলমানকে রক্ষা করেছেন এবং তাদের সেবা করেছেন সেসব কথা এখন প্রায় অলৌকিকতার পর্যায়ে পড়ে। সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো কিন্তু উন্মোচিত হয়নি এখনো এবং সেখানেই রয়েছে শহীদ চরিত্রের মহত্ত্ব।

কিছুদিন আগে শহীদ সাহেব প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কবিবন্ধু ফররুখ আহমদ একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন। মরহুম কবি শাহাদৎ হোসেন দেশভাগের কিছুকাল পর কোলকাতা থেকে ঢাকায় এসে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে কাজ করছিলেন। একদিন রাতে বেতার ভবনের একটি নিভৃত কক্ষে একা বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী কি যেন লিখছিলেন। ঢাকা রেডিওর একজন কর্মচারি, তিনি কবি শাহাদৎ হোসেন সাহেবকে দাদু বলে ডাকতেন এবং কবিও তাকে খুব ভালোবাসতেন। সেই ভদ্রলোক কবির সামনে দিয়ে যতবার যাওয়া আসা করেছেন; কিন্তু কবি ভ্রূক্ষেপহীন, লিখেই চলেছেন। সেই কর্মচারি ভদ্রলোকের তখন মনে জাগলো গভীর ঔৎসুক্য। তাই তিনি চুপ করে লিখনরত কবির পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগলেন। কবি লিখছেন শহীদ সাহেবকেঃ

'আমি এখন ঢাকা রেডিও থেকে প্রায় তিনশো টাকা পাচ্ছি। মাস দু'য়েক আগেও তা আমি আপনাকে জানিয়েছি। তবু আপনি গতমাসে এবং এ মাসেও আমাকে টাকা পাঠিয়েছেন। দয়া করে আপনি আর আমাকে টাকা পাঠাবেন না। অত কৃতজ্ঞতার ঋণ আমার পক্ষে অসহ ও দুর্বহ।'

কথাগুলো শেষ করে ফররুখ আহমদ বললেন, আজকের দিনে এমনি আরেকটি নমুনা দেখাতে পারিস?

বললাম, হ্যাঁ, পারি।

কবিবন্ধু বললেন, বলতো কে?

বললাম, ঐ শহীদ সাহেবই। শহীদ সাহেবের মুন্সীর কাছে শুনেছি, অনেক কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের কাছে নিয়মিতভাবে তাঁর পাঠানো মনিঅর্ডার যেতো।

সে চুপ করে শুনলো।

আমি বললাম, তাঁদের মধ্যে এখনো অনেকেই জীবিত।

ফররুখ আহমদ শুধু বলল, হ্যাঁ।

বললাম, তার অনেকে এখন এই ঢাকা শহরেই আছেন✳।

✳ লেখকের 'আমার দেখা লোক' বইয়ের পান্ডুলিপি থেকে।

www.pathagar.com

হায় কারাগার!

আবদুল হামিদ মজুমদার, (চাঁদপুর)

৫ই ডিসেম্বর, ৬টা বেজে আরো কয়েক মিনিট। চট্টগ্রামাভিমুখী ট্রেনের একটি কামরায় কুমিল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের জনৈক অধ্যাপক, অপর দুজন যাত্রী ও আমি বসে আছি। হঠাৎ একটি পানবিড়ি বিক্রেতা যুবক ট্রেনের দরজায় এসে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে উঠলো, 'সোহ্‌রাওয়ার্দী সাব নাই? হায় হায় রে, আমরা এতিম হইলাম।' অবিশ্বাসীর মন নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে পানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি বলছো?'

পানওয়ালা উত্তর দিলো, 'রেডিওতে বলছে, সোহ্‌রাওয়ার্দী সাব মারা গেছেন।'

মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো, স্তব্ধ হয়ে গেলাম। অধ্যাপক সাহেব স্তম্ভিত হয়ে বললেন, আমাদের একমাত্র সূর্য ডুবে গেল। এতোদিন পরে এই লেখা লিখতে বসেও সেই বিমূঢ় অবস্থাকে কাটিয়ে উঠতে পারছি না। হয়তো সেজন্যেই অবরুদ্ধ স্মৃতি এমন করে আলোড়িত হচ্ছে। মনে পড়লো, কলকাতার হত্যাকাণ্ডের সময় যখন তথাকথিত নেতারা শুধু নিজেদের বাঁচাতেই কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, তখন নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন করেও জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী হাজার হাজার মুসলমানের জানমাল রক্ষা করেছিলেন এবং শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। কলকাতার হত্যাকাণ্ডের পর যখন নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় শিখ সৈন্যদের বন্দুকের গুলিতে ও সঙ্গীনের খোঁচায় যখন মুসলমানরা মৃত্যুবরণ করছিল তখন তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে বহু কষ্ট সহ্য করে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সুদূর পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করে কাটিয়েছিলেন। মনে পড়লো, বৃহত্তর পূর্ব পাকিস্তানের জন্য তাঁর পরিকল্পনা ও আপ্রাণ চেষ্টার কথা, পাকিস্তানে সুষ্ঠু রাজনীতির খাতিরে তাঁর বিরোধী দল গঠনের কথা। আর পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য তাঁর সংগ্রামের কথা, পাকিস্তানের সংহতির খাতিরে তাঁর এক ইউনিট ও যুক্ত নির্বাচনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টার কথা, পাকিস্তানের গতানুগতিক বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন সাধন করে চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের কথা।

আরো মনে পড়লো সেই কারাগারের কথা। ১৯৫৪ সালে ৯২ (ক) ধারার আমলে মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও আমাদের মতো নগণ্য শত শত কর্মী নিক্ষিপ্ত হলো কারাগারে। আমাকে কুমিল্লা সেন্ট্রাল জেল থেকে সবেমাত্র ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জেলজীবনে নতুন এবং অনভ্যস্ত বলে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'মজুমদার সাহেব, কোনো চিন্তা করবেন না। বাকস্বাধীনতা যে দেশে নেই সেখানে সারা দেশটাই যে জেলখানা; তফাৎটা এই যে, আমরা এখানে একটা প্রাচীরের অন্তরালে আছি। তবে এ প্রাচীরের মধ্যে সরকার কতদিন রাখবে! আমি ৩০ বছরের যুবক। যদি আমাকে আরও দশ বছর জেলে থাকতে হয় তথাপি ৪০ বছর

www.pathagar.com

বয়সেও এ দেশের রাজনীতির মোড় ফিরাবার সংগ্রাম থেকে আমি বিরত হবো না, যদি আমাদের নেতা জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর দোয়া থাকে।'

৯২ (ক) ধারার অভিশাপ থেকে দেশ মুক্ত হলো, নেতারা ও কর্মীরাও মুক্তি পেলেন। ..... কিন্তু আবার করাচী থেকে আরম্ভ হলো কুটিল চক্রান্তের দাবা খেলা—যার পরিণতি সামরিক শাসন; গণতন্ত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

আবার কারাগার ভরে উঠলো। কিন্তু হায় কারাগার! তোমার প্রাচীরের আবেষ্টনীর মধ্যে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর রেখে তুমি তিলে তিলে জীবনীশক্তিকে ক্ষয় করেছ অনেক বীর পুরুষের, অনেক কর্মীর। ক্ষণিকের মধ্যে হত্যা করলে লোকনিন্দা হবে হয়তো, এই ভয়েই তাঁদের তোমার আবেষ্টনীর মধ্যে রেখে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিয়েছ। কিন্তু হায়! জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর ন্যায় যে পুরুষসিংহ এককালে পাক-ভারতের মুক্ত ভূমিতে উন্নত মস্তকে বিচরণ করেছিলেন, যিনি পাকিস্তানের মুক্ত ভূমিতে উদাত্ত কণ্ঠে মজলুম জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায় ও পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়াজ তুলেছিলেন, যাঁকে পাকিস্তানের নর-নারী, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল, সত্তর বছর বয়সে সেই পুরুষসিংহকেও তুমি তোমার নির্মল আবেষ্টনীর মধ্যে দীর্ঘ ছয়টি মাস আবদ্ধ রেখে তাঁর অমূল্য জীবনীশক্তিকে তিলে তিলে ক্ষয় করে তাঁকেও মৃত্যু পথে এগিয়ে দেবে—এ কথা কে জানতো? কে জানতো যে, তুমি জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সবল-সাবলীল জীবন-প্রবাহে অপ্রত্যাশিতভাবে এমন প্রচণ্ড আঘাত হানবে, যে আঘাত তাঁর মন-প্রাণ, উৎসাহ-উদ্যম, স্বাস্থ্য-সবকিছুকে নিঃশেষ করে দেবে এবং অবশেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে।

হায় কারাগার! তুমি কি দেখনি, ৮ই ডিসেম্বরের জনসমুদ্রের জোয়ার! তুমি কি অনুভব করোনি, সে সমুদ্রের অনেক গভীরে কেন্ স্রোত আবর্ত তুলেছে।

www.pathagar.com

সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রসঙ্গ

মোহাম্মদ আবু সিদ্দিক (উজানচর, ফরিদপুর)

শোনা যায় যে, শেরে বাংলা মরহুম আবুল কাসেম ফজলুল হক সাহেবকে নাকি অস্ত্রের মুখে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। কিন্তু একথা শুনি নাই যে, কোনো স্টেনগান মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে লক্ষ্যচ্যুত হতে বাধ্য করেছিল; অথচ বিভাগ-পূর্বের রাজনীতি কত কণ্টকাকীর্ণ দুর্যোগপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুল ছিলো। একদিকে ইংরেজ, অপরদিকে কংগ্রেস—এই দুই বৃহৎ শক্তির মোকাবিলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল কায়েদে আজম মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌কে। কায়েদে আজম যে সমস্ত পরিকল্পনা করতেন তার বাস্তব রূপায়ণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। ন্যায়নীতির খাতিরে এবং পাকিস্তানের শপথ দিয়েই বলতে হয় যে, মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন কায়েদে আজমের দক্ষিণ হস্ত।

সারা ভারতব্যাপী নির্বাচনে যখন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অবস্থা দোদুল্যমান তখন এই বাংলাদেশই রচনা করেছিল নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অপূর্ব সাফল্য-স্তম্ভ এবং তাঁর নেতৃত্ব দিয়াছিলেন অসম সাহসী, ধীশক্তিসম্পন্ন বাংলার কৃতী সন্তান জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। যে সাফল্যের জন্যে কায়েদে আজমও ছুটে এসেছিলেন বাংলায়। ঘোষণা করেছিলেন 'বাংলাদেশে মুসলিম লীগের ভবিষ্যৎ ও সাফল্য সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত।'

কায়েদে আজম ঘোষণা করেছিলেন, Direct action. অর্থাৎ ইংরেজ ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন পালন করতে হবে। একমাত্র বাংলা ছাড়া সারা ভারতবর্ষের কোথাও সেদিনটি সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। একমাত্র হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর অসীম সাহস, নির্ভীক কর্তব্যনিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই বাংলাদেশ বার বার রচনা করেছিল নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অপূর্ব সাফল্য। স্বয়ং কায়েদে আজম, কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলী খান উপস্থিত থেকেও পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশে লীগ মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখতে বা গঠন করতে সমর্থ হননি, অথচ বাংলা এককভাবে সারা ভারতবর্ষের মোকাবিলা করেছিল সেদিন। যখন অন্যান্য প্রদেশে লীগ মন্ত্রিসভার পতন ঘটে গেল তখন বাংলার লীগ মন্ত্রিসভা পতন ঘটাবার জন্য ভারতীয় কংগ্রেস ঊর্ধ্বতন মহলে তোলপাড় আরম্ভ করে দিলো। মাত্র দু'টি বাংলা পত্রিকা ছাড়া সমস্ত পত্রিকাতে কতই না সংবাদ পরিবেশন করা হতো হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে—এই বুঝি সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতন ঘটলো কিংবা প্রদেশে গভর্নর শাসন প্রবর্তিত হলো—বড়লাট আসছেন সোহ্‌রাওয়ার্দীকে উচিত শিক্ষা দিতে ইত্যাদি কতই না অভিযোগ!

বড়লাট এলেন কলকাতায়। ফিরে গেলেন দিল্লি—কিন্তু কি আশ্চর্য সোহ্‌রাওয়ার্দী এখন ক্ষমতায়! বড়লাট আইন ভঙ্গ করতে রাজি হননি বোধহয় তাঁর প্রতি বাংলার পরিষদের আস্থার কথা ভেবেই।

অবশেষে একদিন হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দীকে দিল্লিতে আহবান জানালেন বড়লাট। দু'টি পত্রিকা ছাড়া সমস্ত পত্রিকাতেই, বিশেষভাবে কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করা হয়েছে শহীদ

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দীকে বন্দী করার জন্যে দিল্লিতে ডাকা হয়েছে। অগ্নিশপথ নিলো মুসলমানেরা—সেদিন কলকাতার প্রতিটি মহল্লায় মোনাজাত অন্তে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, যদি হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দী ফিরে না আসেন, যদি তাঁকে বন্দী করা হয় তবে ভাগীরথীর পানি রক্তে পরিণত হবে। শুধু তাই নয়, ঘর-বাড়ি, এমনকি রাজপথের ইট-পাথরও ভাগীরথীর গর্ভে নিক্ষিপ্ত হবে। একদল প্রতিনিধি গেলেন বগুড়ার মরহুম মোহাম্মদ আলীর নিকট, যেহেতু সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁর ওপর সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করে দিল্লি গিয়েছিলেন। ঘর হতে বের হয়ে মোহাম্মদ আলী সাহেব সবাইকে দেখে কেঁদে ফেললেন। প্রতিনিধি দল তাদের সিদ্ধান্ত মোহাম্মদ আলীর নিকট জানালেন। তাঁকে অত্যন্ত বিষণ্ন দেখাচ্ছিল, তথাপি তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বললেন, আল্লাহর ওপর আস্থা রাখুন—মোনাজাত করুন, আমাদের নেতা যেন শীঘ্র ফিরে আসেন। আমি সর্বদা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর নির্দেশ মতো কাজ করছি। স্থির জানুন, আল্লার মেহেরবানীতে তিনি নিশ্চয় ফিরে আসবেন।

সংবাদপত্র মাফরত জানা গেল, বড়লাটের সঙ্গে তিনঘন্টার এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সোহারাওয়ার্দী সাহেব নির্বিঘ্নে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। আল্লাহর রহমতে কংগ্রেসের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সুস্থভাবেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রইলেন। বাংলার লীগ মন্ত্রিসভা অক্ষতই রয়ে গেল। আর তা একমাত্র জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অপূর্ব দক্ষতা, আইনে গভীর জ্ঞান ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের গৌরব অক্ষুণ্ন রয়ে গেল।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ভাগ্যাকাশে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আবির্ভাব যেমনই বিস্ময়কর তেমনই গৌরবোজ্জ্বল। এই বাংলাদেশই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সৃষ্টি করে ইতিহাস রচনা করেছিল; সেই বাংলাদেশেরই অকৃত্রিম জনদরদী, গণতন্ত্রের মহাসাধক, জাতির মানসপুত্র জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মর্যাদা কখনও ক্ষুণ্ন বা ম্লান হতে দেননি। গান্ধীজীর এক সভায় সংবাদপত্রের মতে সাত লক্ষ জনসমাবেশ হয়েছিল। আমিও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলাম। সাত লক্ষ জনতার গুঞ্জন কোলাহল কিছুতেই থামে না। বহু কংগ্রেস নেতার আবেদন-নিবেদন জনতা গ্রাহ্যই করলো না, গান্ধীজীও বক্তৃতা করতে পারেন না। অবশেষে গান্ধীজী হাতের ইশারায় সবাইকে চুপ করতে বললেন, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হলো না। বাধ্য হয়ে গান্ধীজী মাইক নিজেই নিয়ে জনতাকে গোলমাল না করতে অনুরোধ জানালেন। এমন কি তাতেও জনতা নীরব হলো না। অবিসংবাদিত দেশবরেণ্য নেতা মহাত্মা গান্ধীর আবেদনেও মানুষ চুপ করে না, এ-ও কি সম্ভব!

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন গান্ধীজীর পাশে। বোধহয় গান্ধীজীর কথা জনতা উপেক্ষা করায় তিনি খুব বিরক্ত হয়ে গান্ধীজীর সম্মুখ হতে মাইক টান দিয়ে নিয়ে বজ্রকঠোর স্বরে বলতে লাগলেন, আপনারা যাঁরা বক্তৃতা শুনতে না চান, বের হয়ে যান এই সভা হতে; এই মুহূর্তে যাঁরা শুনতে চান চুপ করে শুনুন। কোনো গোলমাল আমরা বরদাশ্‌ত করবো না।

সাত লক্ষ লোকের জনসমুদ্র সাধারণত দেখা যায় না। একমিনিটও হয় নাই। অত বড় বিরাট জনসমুদ্র নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল, মনে হলো এই বিরাট বিশাল জনতার মুখে কে যেন হঠাৎ চাবি বন্ধ করে দিয়েছে। মহাত্মা গান্ধী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর দিকে বিস্মিত চোখে চেয়ে রইলেন। হয়তো ভাবছিলেন, কি অলৌকিক শক্তি ধারণ করে এই শহীদ

www.pathagar.com

সোহ্‌রাওয়ার্দী। ভারতের অদ্বিতীয় নেতার পক্ষে যা সম্ভব হলো না, এই লোকটি তা অনায়াসে সমাধা করে দিলো। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব যখন বসতে গেলেন, গান্ধীজী তখন তাঁর পিঠ চাপড়ালেন, দেখেছিলাম। কি বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞার অধিকারী তিনি।

সংবাদপত্রে দেখেছি কায়েদে আজম গভর্নর জেনারেল হয়ে প্রথম, কি দ্বিতীয় সাংবাদিক সম্মেলনে (বোধহয় প্রথমই হবে) কোনো এক ভারতীয় সাংবাদিক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, যে ভদ্রলোক পাকিস্তান আনয়ন করতে আপনাকে সর্বাপেক্ষা বেশি সাহায্য করেছেন, যাঁর অবদান ভুলবার নয়, তাঁকে আপনি বাইরে রাখলেন কেন?

কায়েদে আজম উত্তর দিয়েছিলেন, কে সে জন?

সাংবাদিকগণ বলেছিলেন, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী।

কায়েদে আজম পুনরায় উত্তর দিয়েছিলেন, এত বড় বিরাট রাজনীতি আপনারা চিন্তা করতে যাবেন না।

সাংবাদিকগণ পুনরায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁকে বাইরে রাখলেন, কেন?

কায়েদে আজম আবার উত্তর দিয়েছিলেন, আপনাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

এই অংশের মধ্যে কি গূঢ় রহস্য নিহিত ছিলো তা সকলের অজ্ঞাত, এমনকি স্বয়ং মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবও জীবিতকালে তা প্রকাশ করেছিলেন কিনা, আমার জানা নেই তবে তিনি পল্টন ময়দানে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, কায়েদে আজম তাঁকে চারবার আহবান জানিয়েছিলেন। অবশ্য আমরা সংবাদপত্র মারফত দেখেছিলাম, কায়েদে আজম তাঁকে তিনবার আহবান জানিয়েছিলেন। দুঃখ হয়, যে ব্যক্তি প্রাক-স্বাধীনতাকালের বহু সমস্যাকে দূর করে স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করেছিলেন, স্বাধীনতা পরবর্তীকালের সমস্যা সমাধানে তাঁকে বাইরে রাখা হলো। আর তার অর্থ সমস্যাকে আরো জটিল করে তোলা হলো—তাঁকে দেশ ও জাতির সেবার সুযোগ দেয়া হলো না।

তিনি যখন এ দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন, বিচারপতি কর্নেলিয়াসের কথায়, তখনি পৃথিবী বুঝতে পারলো, পাকিস্তানে একজন ব্যক্তি আছেন। কিন্তু স্বার্থবাদী মহল তাঁকে দেশ সেবার পরিপূর্ণ সুযোগ দেয়নি। আর তার ফল যা হয়েছে তার নিরসন কোনোদিন হবে কিনা, কে জানে।

মরহুম চুন্দ্রীগড় সাহেবের সভাপতিত্বে যখন পূর্ব বাংলার নেতার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখনই সন্দেহ হয়েছিল, পাকিস্তানের রাজনীতির ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা হয়তো দেখা দিতে পারে। তখন তা অনুমান ছিলো মাত্র; কেউ ভাবতেই পারেনি যে, তা কোনোদিন সত্য হবে। এইরূপ নির্বাচন অন্য কোনো প্রদেশে হয়েছিল কিনা জানি না, যদি না হয়ে থাকে তবে নিঃসন্দেহে এই নির্বাচন দুঃখজনক।

বর্তমানে যে কয়জন রাজনীতিক পাকিস্তানে আছেন তাঁদের কর্মপন্থা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর কর্মপন্থা বা চিন্তাধারা কেউই অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। আমার মনে হয়, কায়েদে আজম ছাড়া কোনো নেতাই মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর তীক্ষ্ণ রাজনীতির ধারা বুঝতে পারেননি—কিংবা বুঝতে পারলেও নিজেদের স্বার্থে তাঁকে দূরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। নচেৎ দেশ আজ পর্বতপ্রমাণ সমস্যাসঙ্কুল জটিল পরিবেশে কেন বিব্রত ও জড়িত—জাতি আজ সর্বহারা, দিশেহারা কেন? সমগ্র জাতি যে ভুল করেছে, সেই ভুলের মাশুল কিন্তু সারাজীবন ধরে সেই জাতিকেই বহন করতে হবে—পলাশী তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শুকতারা তিনি

বদিউস সালাম

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন একাধারে নির্ভীক সংকল্প-অটল, গতিমান, নিবেদিতচিত্ত, বিনয়-নম্র, সদানন্দ ও বুদ্ধিদীপ্ত মহান পুরুষ এবং সর্বোপরি তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক ও গণতন্ত্রমনা। তাঁর বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব হৃদয় ও মস্তিষ্কের অসংখ্য গুণরাজীতে সমুজ্জ্বল। চরিত্রের গতিশীলতা এবং উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতায় আশীর্বাদপুষ্ট সোহ্‌রাওয়ার্দী যেকোন পরিবেশেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারতেন। শিশুর সারল্য নিয়ে তিনি যেমন সহজেই ছেলেদের খেলার সাথী হতে পারতেন, তেমনি অনায়াসে তিনি সূক্ষ্ম-বুদ্ধি কূটনীতিকের ভূমিকাও গ্রহণ করতে পারতেন। রাজনীতি ছিলো তাঁর জীবনের হবি। তাই রাজনৈতিক পরিমণ্ডল হতাশায় ও অনিশ্চয়তায় অন্ধকার হয়ে এলে তিনি ব্যথিত হতেন।

সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন একজন মহান পুরুষ। তাঁর কর্মময় জীবনের মহত্ত্বর গুণাবলী চিরদিনই গণমনে ভাস্বর হয়ে থাকবে। কিন্তু বহু ছোটখাট, এমন কি তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেও যে তাঁর চরিত্রের মহত্তর বৈশিষ্ট্য স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে, সে সম্পর্কে অবশ্য খুব বেশি লোক অবহিত নন। কিন্তু এসব ছোটখাট ঘটনার মধ্যেই তাঁর চিন্তার মহীয়ান দিক এবং গণমানুষের জন্যে তাঁর হৃদয়-প্রীতি অত্যন্ত স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ ও গুণমুগ্ধ সহযোগী হিসেবে আমার মত এই যে, বিভিন্ন ছোটখাট ব্যাপার সম্পর্কে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই তাঁর মহত্ত্ব অধিকতর প্রোজ্জ্বল।

মনে পড়ে, একদিন আমি তাঁর সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী এবং তার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। ঠিক সে সময় একজন অজ্ঞাত পরিচয় লোক এসে তাঁর কাছে কয়েকশত টাকা সাহায্য চাইলো। সে বললো, তার পীড়িত স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যে তার টাকার বড় প্রয়োজন।

মহান হৃদয় সোহ্‌রাওয়ার্দী লোকটির দিকে একবার তাকালেন এবং তারপরেই কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে তাকে চারশ' টাকা দিয়ে দিলেন। লোকটি আনন্দাশ্রু বিগলিত নেত্রে বিদায় নিলো। এরপর সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখো, গরীব লোকটির সত্যি টাকার প্রয়োজন ছিলো'।

আর একবারের কথা। সাল তারিখ ঠিক মনে নেই। সম্ভবত ১৯৫৫ সালেরই কথা। মোটরে করে আমরা ঢাকার নওয়াবপুর সড়ক দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম। কিছু কোনোকাটাই ছিলো আমাদের উদ্দেশ্য। রাস্তায় চলমান লোকজনের প্রতি তাকিয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে বললেন ঃ 'আমরা রাজনীতিকরা সত্যই অপরাধী, গরীব জনসাধারণের জন্য আমরা কিছুই করছি না। তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখো কি দুঃখ, তাদের মুখে হাসির কোনো চিহ্নমাত্র নেই। আমরা যদি সকলের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের সুব্যবস্থা করতে না পারি, তাহলে শুধু বড় বড় শহরে বিরাট বিরাট ইমারত গড়ে লাভ কি?

www.pathagar.com

আমাদের শিগগিরই কিছু করতে হবে, নইলে দেশ বিশৃঙ্খলার পথে এগিয়ে যাবে।' বক্তব্যের শেষের দিকে তিনি প্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। ফলে তাঁর চিন্তার খেই হারিয়ে যায় এবং তিনি নীরব হয়ে যান।

শেষবারের মতো তিনি যখন চাটগাঁ যান, তখন একদিন আমার ঘরে আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তিনি খেলা করছিলেন। তখন তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছিল না, গায়ে জ্বর ছিলো এবং তাঁকে হতাশা ও বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। আমার স্ত্রী তাঁর জন্যে খাবার নিয়ে এলেন। তিনি বিশেষ কিছুই খেলেন না। কিন্তু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা শুরু করে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাসিঠাট্টায় এতই মশগুল হয়ে পড়লেন যে, আমাদের ড্রইংরুমে যে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী উপস্থিত, সে কথাই আমরা বেমালুম ভুলে গেলাম।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হলে তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহচর বিদেশে নিযুক্ত কোনো একজন পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার জন্যে জেদ ধরেন। কারণ, অতীতে সেই ভদ্রলোক জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব তাদের অনুরোধ রক্ষা করতে অসম্মতি জানিয়ে বললেন ঃ 'প্রতিশোধ নেবার চিন্তা করো না, একজন নিচ হলো বলেই যে তুমি মহৎ হবে না, এটা কোনো যুক্তির কথা নয়।'

তাঁর দরাজ দিল এবং জনগণের প্রতি তাঁর ভালোবাসার দরুনই তাঁর প্রতি আমি অধিকতর অনুরক্ত হই। তাঁর জীবনের ছোট ছোট ঘটনায় আমি যত মুগ্ধ হয়েছি, বড় বড় কৃতিত্বের দরুন ততখানি আকর্ষণ অনুভব করিনি।

সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন মজলিশী মানুষ। জীবনে লোকের সান্নিধ্য ছাড়া তাঁর সময় কাটেনি, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, বিদেশ বিভুঁইয়ে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়—দূরদেশ বৈরুতে মরণকালে তাঁর শয্যাপার্শ্বে কথা বলারও একজন লোক ছিলো না। এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কি হতে পারে।

অন্যদিকে আর এক রূপে চিন্তা করলে তাঁর জীবন কতই-না মহীয়ান। যে ব্যক্তি হাজার হাজার টাকা উপার্জন ও ব্যয় করেছেন, মরণকালে ব্যাঙ্কে তাঁর কোনো গচ্ছিত অর্থ ছিলো না। এমন কি কাফনের কাপড় ক্রয়ের পয়সাও তাঁর সঙ্গে ছিলো না। একমাত্র ছেলের শিক্ষার জন্যও তিনি কোনো অর্থ রেখে যেতে পারেননি।

মরণশীল সকল জীবের মতোই অবশেষে মরণের হিম-শীতল স্পর্শ জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে তাঁর প্রিয় দেশবাসীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তাঁর স্মৃতির সৌরভ চিরদিনই বেঁচে থাকবে, তাঁর গুণরাজী শুকতারার মতোই থাকবে চির উচ্চে এবং তা ভাবীকালের বংশধরদের করবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত।

জাতির উচিত, তাঁর স্মরণে একটা উপযুক্ত স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা।

www.pathagar.com

সোহ্‌রাওয়ার্দী স্মরণে

মোহাম্মদ কাসেম (সাবেক সদস্য, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি)

আমি মুসলিম লীগের সদস্য ছিলাম না। কংগ্রেস সদস্য হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন নগণ্য কর্মী ছিলাম মাত্র। কিন্তু যে দলই হোক না কেন, দেশ ও সমাজকর্মীদের জন্য জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর অত্যন্ত দরদ ও মমতা ছিলো। কোনো দেশসেবক বিপদে পড়িয়া তাঁহার কাছে গেলে তিনি প্রয়োজন মতো সাহায্য করিতে কখনও দ্বিধা করিতেন না।

আমি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি।

১৯২৪ সালের প্রথমদিকে কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে অধিকাংশ কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী জয়লাভ করিয়াছেন। ফলে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মেয়র। জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। অপরদিকে মিস্টার সুভাষ চন্দ্র বসু চীফ একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন।

কংগ্রেস ঐ সময় কিছুসংখ্যক মুসলমান কর্মীকে কর্পোরেশনে চাকরি দেয়ার সিদ্ধান্ত করে। বলা বাহুল্য, তখন কর্পোরেশনে মুসলমান কর্মচারি আদৌ ছিলেন না।

মফস্বলের কতিপয় মুসলমান কর্মীকে কলিকাতা পৌঁছার অনুরোধ জানানো হয়। ঠিক ঐ সময় সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন ও আহমদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক বৈঠক আহূত হয়। ফলে চাকরিতে মুসলমান কর্মী নিয়োগ বিলম্বিত হয়। যাহা হউক জুলাই মাসে মুসলমান কংগ্রেসকর্মী নিয়োগের প্রশ্ন আলোচিত হয় এবং ছোট-খাটো চাকরিতে যাহাদিগকে নিয়োগ করা হইবে তাহাদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু ডেপুটি একজিকিউটিভ অফিসার নিয়োগের ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয়। কারণ এই পদের বেতন, দায়িত্ব ও মর্যাদা অত্যন্ত বেশি।

বাংলাদেশের মুসলমান কর্মী এবং নেতাগণও ডেপুটি একজিকিউটিভ অফিসার নিয়োগের ব্যাপারে দ্বিমত হইয়া পড়েন। একদল নোয়াখালীর হাজী আবদুর রশীদ খাঁ এবং অপর দল যশোরের জনাব সৈয়দ মজিদ বখ্‌শকে সমর্থন করেন। মুসলমান কর্মীদের এক বৈঠক হয় এবং কলিকাতায় অবস্থানরত বাংলার অধিকাংশ মুসলমান কংগ্রেস কর্মী এই বৈঠকে যোগদান করেন। এই বৈঠকে যশোরের জনাব সৈয়দ মজিদ বখ্‌শকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর এই নিয়োগ সম্পর্কে আমার নামে আনন্দবাজারে এক খোলা চিঠি প্রকাশিত হয়। উহাতে কংগ্রেসের উপদলীয় আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ ও স্বজনপ্রীতির কতকটা বিবরণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই চিঠিতে সৈয়দ মজিদ বখ্‌শকে সমর্থন করা হয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মিস্টার সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র (ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সাবেক স্পীকার) প্রমুখ নেতা হাজী আবদুর রশীদ খাঁকে সমর্থন করিতেন।

খোলা চিঠি তখনকার যুগের প্রভাবশালী পত্রিকা আনন্দবাজারে প্রকাশিত হওয়ায় আমার প্রতি তাঁহারা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া পড়েন।

বলা বাহুল্য, আমি তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য। এই সকল কারণে ডেপুটি একজিকিউটিভ অফিসার নিয়োগ বিলম্বিত হইয়া

www.pathagar.com

পড়ে। ইতিমধ্যে কিছুসংখ্যক মুসলমান কংগ্রেস কর্মীকে কর্পোরেশনে ছোটখাটো পদে নিয়োগ করা হয় এবং আমাকে কর্পোরেশনের কোনো চাকরিতে নিয়োগ করা হইবে না বলিয়া পরোক্ষভাবে জানাইয়া দেওয়া হয়। ঐ সময় কলিকাতায় কংগ্রেস মহল ব্যতীত কেহ আমার পরিচিত ছিলেন না। অথচ তাঁহারা প্রায় সকলেই আমাকে সাহায্য করিয়া কংগ্রেস নেতাদের কোপানলে পড়িতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আমি যখন এইরূপ বিপদে হাবুডুবু খাইতেছিলাম, তখন জনৈক কংগ্রেস নেতা আমাকে জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পরামর্শ দেন।

তখন জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সহিত আমার পরিচয় ছিলো না। মাঝে মাঝে সভা-সমিতিতে তাঁহার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হইতো মাত্র। তাছাড়া তিনি খোলা চিঠি প্রকাশ সম্পর্কেও হয়তো অবগত আছেন! এমতাবস্থায় তাঁহার দ্বারা আমার কি উপকার হইতে পারে! এইরূপ দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে একদিন সকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই হাসিখুশী মেজাজে বলিলেন, 'কি ব্যাপার মিস্টার কাসেম?'

আমি তাঁহার নিকট সমস্ত বলিলাম। তিনি তাহা শুনিয়া বলিলেন, 'রোজ তুমি একবার আমার কাছে আসিবে এবং খোরাকীর পয়সা লইয়া যাইবে।'

আমি রোজ তাঁহার বাসায় যাইতাম। তিনি আমাকে প্রত্যহ খোরকীর টাকা দিতেন। এইভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন তিনি বলিলেন, 'মিস্টার কাসেম, কর্পোরেশনে তোমার চাকরি ঠিক হইয়াছে।'

আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি পুনঃ বলিলেন, 'বাঙ্গাল, তুমি বুঝিতে পারো নাই? কর্পোরেশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তোমার মাস্টারী চাকরি ঠিক করিয়াছি। একটি দরখাস্ত লিখিয়া দিব। ক্ষিতীশের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হইয়াছে।' ঐসময় মিস্টার ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তিনি আমাকে কুমিল্লার বাঙ্গাল বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সেইদিনই দরখাস্ত লইয়া ক্ষিতীশ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং আধঘণ্টার মধ্যে নিয়োগপত্র পাইলাম।

দীর্ঘদিন যাবৎ আমি এই শিক্ষকতা চাকরির খবর কাহাকেও জানাই নাই। কারণ কংগ্রেস মহল হয়তো আমার চাকরির ক্ষতি করিতে পারে।

চাকরি পাওয়ার পরও মাঝে মাঝে আমি সোহরাওয়ার্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। অনেক সময় মহল্লায় কোনো বৈঠক হইলে আমাকেও তিনি সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তারপর নানা কারণে তাঁহাকে কংগ্রেস ছাড়িতে হয়। আমি অবশ্য কংগ্রেসেই রহিয়া গেলাম। রাজনৈতিক ব্যাপারে মতভেদ থাকিলেও আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ ও দরদ হ্রাস পায় নাই। মাঝে মাঝে দেখা হইলে তিনি আমাকে কুমিল্লার বাঙ্গাল বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পুনরায় তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিবার প্রয়োজন হয়। তখন দেখিয়াছি যে, দীর্ঘদিন পরেও তিনি আমাকে ভোলেন নাই, আমার প্রতি তাঁর পূর্ব আচরণের কোনো পরিবর্তন হয় নাই।

আজ তিনি এই দুনিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনা বিজড়িত তাঁহার স্মৃতি আজও মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারি নাই। অনেক সময় ভাবি, তখন যদি চরম দুর্দশার সময় তাঁহার সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইতাম, হয়তো আমার জীবন অন্য কোনো পথ অবলম্বন করিতো।

আজ আমার অন্তর দিয়া রহমানুর রহিমের নিকট মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীর অমর আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছি। আমিন।

www.pathagar.com

দিনাজপুরের মাটিতে সোহ্‌রাওয়ার্দী

মেহ্‌রাব আলী

দিনাজপুরবাসীর সঙ্গে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাক্ষাৎ-সংযোগ কোনোরূপ ব্যক্তিস্বার্থ নির্ভর ছিলো না। তিনি এখানে এসেছিলেন মানুষের বন্ধুরূপে, এসেছিলেন দেশবাসীকে আজাদীর জন্য সংহতি ও সংগ্রামের আহ্বান জানাতে।

১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি প্রথম এখানে আসেন। তাঁর আগে তিনি কখন দিনাজপুরে এসেছিলেন, জানা যায় না। তাঁর সেই দিনাজপুর আগমনের উদ্দেশ্য ছিলো পাকিস্তানের জন্যে রাজনৈতিক প্রচার ও 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করা। সোহ্‌রাওয়ার্দীকে কেন্দ্র করে তখন বাংলার মুসলমানরা পাকিস্তান হাসিলের জন্যে সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। সেনানায়ক সোহ্‌রাওয়ার্দী মৌলানা আকরাম খাঁ, খাজা নাজিমউদ্দিন প্রমুখ নেতাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন দিনাজপুরে। সেই উপলক্ষে গোরাশহীদ ময়দানে বিরাট জনসমুদ্রে ভাষণ দান করে তিনি জেলাবাসীকে উদ্দীপ্ত করেন। সেবার প্রথম দিনাজপুরবাসী তাঁর প্রাণের প্রত্যক্ষ সংযোগ লাভ করে।

১৯৪২ সালের এক উপ-নির্বাচনে তদানীন্তন মুসলিম লীগ প্রার্থীর পক্ষে জনমত সংগ্রহ করার জন্য সোহরাওয়ার্দী বালুরঘাটে এসেছিলেন। তাঁর আগমনে বালুরঘাটে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। মাত্র দু'টি বক্তৃতায় তিনি মানুষের মন জয় করেন।

১৯৪৩ সালে সরবরাহমন্ত্রী হিসেবে তিনি দিনাজপুরে আসেন বস্তুতপক্ষে পাকিস্তানের জন্য সংহতির আবেদন জানাতে। সেবারও গোরাশহীদ ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'আমি সরবরাহমন্ত্রী বলে আপনারা জানেন, আসলে আমি সর্বহারাদের মন্ত্রী। মানুষের সেবা করার জন্যে আল্লাহর কাছে আমি শক্তি কামনা করি।' তাঁর সারা জীবনের সারমন্ত্র এই উক্তিগুলোর মধ্যেই নিহিত বললে অত্যুক্তি হয় না।

১৯৪৪ সালে সোহরাওয়ার্দীর দিনাজপুর আগমন বিশেষ কারণে স্মরণীয়। গোরাশহীদ ময়দানে তিনদিনব্যাপী বিরাট এক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। বাংলার প্রধান প্রধান মুসলিম নেতা এখানে সম্মিলিত হন। প্রধান অতিথি শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী অসাধারণ মেধা, কর্মশক্তি ও নেতৃত্বের পরিচয় দান করেন এখানে। দেশ-বিভাগের পূর্বে এত বিশাল জনসভার আয়োজন দিনাজপুরে আর কখনও হয়নি বলে জানা যায়। এই সভায় সবারই দৃষ্টি ছিলো একটি মানুষের দিকে। সেই মানুটি ছিলেন মহান ব্যক্তিত্বে বলীয়ান, মানব মন বিজয়ী বীর শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী।

১৯৪৬ সাল। সোহ্‌রাওয়ার্দীর কর্মমুখর জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাংলার মুসলিম রাজনীতির প্রতীক হয়ে তিনি জোর কদমে এগিয়ে চলছেন সংগ্রামের পথে। পাকিস্তানের আদি পরিকল্পনায় বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোনো উল্লেখ ছিলো না। বস্তুত সোহ্‌রাওয়ার্দীরই নেতৃত্বে সপ্রমাণ হয় যে, বাংলা ও আসাম ছাড়া পাকিস্তান অর্জন

www.pathagar.com

অবোধের স্বপ্ন কল্পনা। এজন্য অকুণ্ঠচিত্তে বলা চলে, বাংলা ও আসামের অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার সকল ও সফল কৃতিত্ব শহীদ সাহেবের। এজন্য তিনি উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করেছেন মানুষের কাছে। তখন তাঁর ঘুমের সময় ছিলো না, আর ছিলো না আহারের অবকাশ। অফুরন্ত সংগঠনের কাজে নিমগ্ন তিনি।

সেবার নভেম্বর মাসে জনাব সোহরাওয়ার্দী আসলেন দিনাজপুরে। কর্মী ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সংযোগ সাধন করলেন। ছাত্রদের নিয়ে বসলেন আলাদা বৈঠকে। ছাত্রদেরকে বললেন, 'যদি বাঁচতে চাও, পাকিস্তানের জন্যে প্রচার করো। যদি মা-বাপ ও ভাই-বোনদের সুখী করতে চাও, তবে পাকিস্তান কায়েমের জন্যে এগিয়ে আসো। গ্রামে গ্রামে যাও। নিদ্রিত জনতার কানে কানে পাকিস্তানের গান শোনাও। পাকিস্তান ব্যতীত মুসলিম ভারতের মুক্তি নাই।' সেই উপলক্ষে শহরে জনসভা হলো। বিরল হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বিশাল জনসভায় তিনি আয়োজিত সুসজ্জিত ডায়াসে না বসে বসলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। যেমনি বক্তৃতায়, তেমনি কাজে ও ব্যবহারে তিনি মানুষের মন জয় করে দেশবাসীকে করেছিলেন পাকিস্তানমুখী। তারপর ঠাকুরগাঁ, চিরির বন্দর—নানা জায়গায় জনসভা হয়েছিল। বিরামহীন, বিশ্রামহীন কর্মমুখর সোহ্‌রাওয়ার্দীকে দিনাজপুরবাসী সেবার বুঝতে পেরে নির্বাক বিস্ময়ে প্রাণের শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। তাঁর সেই কর্মযোগে প্রত্যক্ষ ফল ছিলো ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রতিটি প্রার্থীর অভাবনীয় জয়লাভ।

তারপর ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান ঘোষণার দিনই জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (পাকিস্তান অর্জনে কায়েদে আজমের পর একমাত্র ব্যক্তি) ষড়যন্ত্রের দ্বারা রাজনীতির শিকারে পরিণত হলেন। চক্রান্তের বেড়াজাল দিয়ে তাঁকেই কি-না রেখে আসা হলো পাকিস্তানের বাইরে রাজনৈতিক বনবাস দিয়ে!

তারপর মুসলিম লীগ শাসনে অতিষ্ঠ দেশবাসী যখন সকরুণভাবে শহীদ নেতৃত্বের অভাব অনুধাবন করে, তখনই আবার সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সামিল হতে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। তাঁরই নেতৃত্বে প্রথম দেশের রাজনীতিতে বিরোধী দল সৃষ্টি হলো। তিনি কয়েক বছরের মধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৯৫৭ সালে দিনাজপুরে শুভাগমন করলে সেদিন দিনাজপুরবাসী উচ্ছ্বসিত আবেগে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। জেলাবাসী আর কোনো নেতাকে এমন অকুণ্ঠ অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ আর পায়নি। এ জেলার প্রধান যান গরুর গাড়ির এক বিরাট মিছিল সেদিন শহরের পথে পথে এক অভূতপূর্ব রূপের সৃষ্টি করে দেশের নেতাদের সম্মান ও সম্বর্ধনার ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম কাহিনী রচনা করেছিল। এরপর কয়েক বছরের ইতিহাসে সোহ্‌রাওয়ার্দীর জীবনে বিরামহীন কাজ। তিনি জড়িয়ে পড়েছেন দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের কাজে। দিনাজপুরে আসার তাঁর শত ইচ্ছা থাকলেও তিনি আর আসতে পারেননি।

তারপর এলো ১৯৬২ সাল। সামরিক শাসনের অবসানে দেশব্যাপী গণমনে তখন গণতান্ত্রিক চেতনার নতুন অভ্যুদয়। সারা পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের সংগে সংগে দিনাজপুরবাসীও রাজনীতির স্বাভাবিক অধিকার আদায়ের সুষ্ঠু পথ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের সন্ধান করছে। 'নয় নেতা' একত্রিত হয়ে দেশ সফরে বেরিয়েছেন সোহ্‌রাওয়ার্দীর অধিনায়কত্বে। অসুস্থ শরীর নিয়ে আহার-নিদ্রা ও বিশ্রাম সবকিছু উপেক্ষা করে হোসেন শহীদ এলেন

www.pathagar.com

দিনাজপুরেও। ৬ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার গোরাশহীদ ময়দানে বিশাল জনসভায় তিনি জেলাবাসীর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমরা দলমত ভুলে গিয়ে এক হয়েছি। এখন আমাদের একটিই পরিচয়। দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে সরকার আমাদের পূর্ণ মর্যাদায় বাঁচতে দিন—এই-ই আমাদের দাবি। বিশেষ কারো মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকা চলবে না। আপনাদের নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্যে আপনারা সংঘবদ্ধ হোন—দাবি তুলুন-নিজেরাই নিজেদের নেতা হয়ে এগিয়ে যান। পশ্চিম পাকিস্তানেও আমি দেখেছি জনমনে অভূতপূর্ব সাড়া। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে আমি একই সাড়া দেখেছি। এখানে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বোত্তর জেলাটিতে এসেও আমি আমার প্রিয় ভাইদের মনের মধ্যে সেই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেছি। আমার স্থির বিশ্বাস, আমরা একসঙ্গে আওয়াজ তুললে আমাদের সুস্থ, সমৃদ্ধ জীবন আমরা পাবোই।'

আজ সেই প্রিয় নেতা আর ইহজগতে নেই। ১৯৬২ সালের ৬ই ডিসেম্বর, আর ১৯৬৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর—কি আশ্চর্য পার্থক্য দুটো দিনে! সেদিন হাজার হাজার দিনাজপুরবাসী প্রাণস্ফূর্ত আনন্দ কোলাহলে পথে বেরিয়ে এসেছিল তাদের নেতাকে নিয়ে আনন্দ মিছিল করার জন্যে। আর এদিনে ছিলো দিনাজপুরের পথে পথে শোকসন্তপ্ত মানুষের করুণ হাহাকার।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সোহ্‌রাওয়ার্দী ও এদেশের তরুণেরা

আলতাফ হোসাইন

৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৩। এককালীন মুসলিম ভারতের আজাদী আন্দোলনের প্রধান নেতা, পরবর্তীকালে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পুরোধা, বাঙালি মুসলমানের মুক্তিপথের অগ্রসেনা, গণতন্ত্রের সিংহশাবক জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর শহীদ দিবস এই দিন। ১৯৬৩ সালের এই দিনে মানুষকে ভালোবাসার অপরাধে সুদূর লেবাননের হোটেলে রাত্রি শেষে নিঃসঙ্গ অবস্থায় শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মানুষের হৃদয়ের গভীরে চির আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া শত্রুমিত্র সবাইকে শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রাণপ্রিয় মানুষের অশ্রুসিক্ত মাটিতে চিরশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন।

যে বাংলাদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে বাংলাদেশের আলো-বাতাসে বিচরণ করিয়া তিনি নিজের জীবনকে দুর্জয় সংগ্রামী করিয়া তুলিয়াছিলেন সেই জন্মভূমি বাংলার মাটিতে তাঁহার মৃত্যু হইতে পারিতো। কিন্তু ভাগ্যের এমনি বিড়ম্বনা যে, কেবলমাত্র মানুষকে ভালোবাসার অপরাধে ৭০ বৎসরের স্থবির বয়সেও তাঁহাকে জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে হইলো। পাকিস্তানের এককালীন প্রধানমন্ত্রী ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ এবং এদেশের কোটি কোটি প্রাণের মূর্ত প্রতীক জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইলো। আর তারই জের অনুযায়ী জেল থেকে আক্রান্ত রোগের চিকিৎসার জন্য বিদেশ-ভূমিতে পাড়ি দিয়ে তিনি আর দেশে ফিরলেন না। নিয়তির নিষ্ঠুর হস্ত এদেশের পুরুষসিংহকে তাঁহার প্রিয় দেশবাসীর মধ্য থেকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী চিরবিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছেন। ......

যে মহাবৃক্ষের বিশাল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এদেশের কোটি কোটি মুসলমান নিজেদের কর্মচঞ্চল জীবনে ছোট ছেলেটির মতো নির্ভাবনায় নিদ্রিত ছিলো, সেই মহীরুহের অনভিপ্রেত পতন শেষে, হে দেশের তরুণেরা, আপনারা জাগ্রত হউন। বাঙ্গালা চিরকালেই ঠকিয়াছে। আজাদী আন্দোলনে তাহাদের অবদান সকলের চাইতে অধিক হইলেও তাহাদের দানের প্রতিদান তাহারা পায় নাই। পাকিস্তান বাংলাদেশের হাজার হাজার মুসলমানের তাজা রক্তের ফল। তাই স্বভাবতই পাকিস্তান সৃষ্টির পর সকলেই মনে করিয়াছিল গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও জনগণের সরকারই পাকিস্তানে কায়েম হইবে। কিন্তু দেখিল, নেতারা তাঁহাদের স্বার্থ চরিতার্থের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। পাকিস্তানের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কেহ মোটেই চিন্তা করিল না। ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা দন্তনখর প্রসারিত করিয়া আগেকার শুভ্রসূচি আবরণ ত্যাগ করিল। ফলে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে অতি সন্তর্পণে ষড়যন্ত্রের বীজ ঢুকিয়া পড়িলো। যাঁহাদের সংগ্রামে, যাঁহাদের ত্যাগে, যাঁহাদের রক্তে, যাঁহাদের প্রকৃত নেতৃত্বে পাকিস্তান আসিয়াছিল তাঁহাদিগকে দেশ ও জাতির দুমশন বলিয়া গণ্য করা হইলো। ধৃষ্টতার সীমা লংঘন করিয়া জনাব হোসেন শহীদ

www.pathagar.com

সোহ্‌রাওয়ার্দীর মতো লোককে নানা ভাষায় গালমন্দ দিতে ও ভারতের চর বলিয়া আখ্যা দিতে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করা হইলো না।

অবশেষে বাঙালি মুসলমানদের চির গর্ব জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তানে প্রবেশ করিলেন। গোটা দেশের সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিল। কিন্তু শহীদ সাহেব নিজের জনপ্রিয়তার কথা চিন্তা না করিয়া দেশকে সর্বনাশা তদানীন্তন স্বেচ্ছাচারী একদলীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবই একমাত্র ব্যক্তি—যিনি প্রথম পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াই এদেশে একটি নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল গঠনে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং সরকারকে দুই জাতির বুলি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিলেন।

পাকিস্তানের গণতন্ত্র আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিরোধী দল অপরিহার্য এটা সকলেই স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। তাঁহার জীবনকালে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার অনুসৃত নীতিকে অবলম্বন করিয়া এদেশের তরুণেরা একদিন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবে। সারাজীবনের সাধনা দিয়া জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী যে দীপ জ্বালাইয়া গিয়াছেন কালের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তাহা জ্বলিবেই জ্বলিবে।

হোসেন শহীদের নেতৃত্বে এদেশে ছাত্র-জনতার যে শক্তিশালী কাফেলার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার অগ্রগতিকে রোধ করিয়া রাখার মতো শক্তির জন্ম এদেশে আজও হয় নাই। দেশের জনগণের আধানিভন্ত চোখের আগুন একদিন মুখের ভাষায় ফুটিবেই ফুটিবে, সেইদিন তাহাদের দাবি কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিয়া লইবে।

এদেশের জনগণের জীবন গড়িয়া তোলার বিরামবিহীন সংগ্রামে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। তাঁহার বিরাট কর্মময় জীবনে যাহাদের সত্য অধিকার দানের জন্যে তিনি বীরের ন্যায় মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া সংগ্রাম করিতে করিতে প্রাণপাত করিলেন, দেশের তরুণগণ, যাহারা দেশের আগামীদিনের আশা-ভরসা তাহারা সবাই ইস্পাত কঠিন সংকল্প গ্রহণ করুন—আমরা আমাদের জীবনের বিনিময়ে আমাদের প্রিয় নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর অসমাপ্ত কাজ সমাধা করিবো। যে মহিমাময় মহাপুরুষ সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের রাজনৈতিক জীবনে নিজের আলোকে দিগদিগন্ত আলোকিত করিয়াছিলেন সেই মহাআলোকস্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া হে দেশের তরুণেরা, আপনারা দেশের অসাড় ও জড়তাপূর্ণ বাঙালিদের জীবনে আলোক দান করার সংকল্প গ্রহণ করুন। আজও দেশ এবং জাতি তরুণদের ত্যাগের দিকে তাকাইয়া আছে। জীবিতকালে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থ যে মহাপুরুষের সিংহ গর্জনে সুদূর শ্বেতদ্বীপে বৃটিশের সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল বিলাতের গোলটেবিল বৈঠক, দূর অতীতে ১৯২০ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজাদীপ্রাপ্তির পর পর্যন্ত যে মহাপুরুষ নিজের জীবনের ওপর বিরাট ঝুঁকি নিয়া এদেশের কোটি কোটি মুসলমানের জান ও মাল রক্ষা করিয়াছেন, মুসলমানদের ভীষণ সঙ্কটময় মুহূর্তে যিনি পাগলের মতো ছোটাছুটি করিয়া বিপন্ন পরিবার পরিজনদের উদ্ধার করিয়াছেন, যে ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, ভারত বিভাগের পর যিনি গান্ধীজীর সহিত শান্তি মিশন গঠন করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষা

www.pathagar.com

করিয়াছেন, অন্যদিকে কলিকাতার লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জান ও মাল পাহারা দিয়াছেন তাঁহার অবসান শেষে, হে তরুণেরা আপনারা আপনাদের বিরুদ্ধে সৃষ্ট সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান। দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরোধী দল গঠনের অপরাধে যাহারা প্রিয় নেতার পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য পদটিও কাড়িয়া লইয়াছিল, এদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করার অপরাধে যাহারা তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছিল তাহাদের স্বরূপ এদেশের সচেতন সন্তানদের অজানা নাই।

প্রিয় নেতার তিরোধান হইয়াছে, বেঈমান, কুচক্রী ও ক্ষমতালোভীদের নিন্দাগ্লানি থেকে অনেক উর্ধ্বে তিনি শহীদের স্বর্গসুখ বরণ করিতেছেন। তাঁহার নশ্বর দেহ মাটিতে লয় হইয়া গিয়াছে। মানুষের চক্ষুও ক্রমে অশ্রুমুক্ত হইবে কিন্তু আঘাতের প্রতিক্রিয়া কোনোদিনই থামিবে না। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে জনগণ শহীদের নীতিকে চিরঞ্জীব করিবে। দেশ ও জাতি সেইদিনের অপেক্ষায় আছে। জন্মিলেই মরিতে হয়। মরণ জন্মেরই পরিণতি। তাই শহীদ সাহেবও মরিয়াছেন। কিন্তু জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর জীবনে স্বাভাবিক মৃত্যু আসিল না। বিদেশভূমির আপনজনহীন পরিবেশে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। কিন্তু কেন? ইহার উত্তর একদিন ইতিহাসের পাতায় লেখা হইবে। আর তাহাই হইবে এদেশের সত্যিকারের ইতিহাস।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দী স্মরণে

আসাদুজ্জামান খান

১৯৫৩ সাল। নভেম্বরের শেষ থেকেই শুরু হয়েছে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন পরিবহনের কার্য প্রস্তুতি। পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামে গ্রামে, প্রান্তরে প্রান্তরে গণতন্ত্রের স্পন্দন ও নব-জীবনের হিল্লোল অনুভূত হচ্ছে। কেননা স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দীর্ঘ আট বছর পরে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তাই আজও মনে পড়ে তখনকার গণজীবনের প্রাণ-প্রাচুর্য ও উল্লাসের কথা। কারণ স্বাধীন পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ও রাজনীতির গতিধারা নিয়ন্ত্রিত হবে এই নির্বাচনে। দেশের আপামর সাধারণ মানুষ চায় বুর্জোয়া শাসনের পরিবর্তে সুষ্ঠু রাজনীতি ও গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ হোক। পরিপূর্ণভাবে তা বিকশিত হতে পারে শুধু নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত ও গণতান্ত্রিক সরকারের মাধ্যমে। অতীতের সংগ্রাম প্রতিষ্ঠার পুণ্যভূমি ও গণতন্ত্রের ধারক-বাহক এই পূর্ব পাকিস্তানই হলো সেই স্বপ্নময় সোনালী যুগের আবিষ্কর্তা। সেদিন সিন্ধু থেকে শুরু করে সুদূর পশ্চিমের মানুষ চেয়েছিল পূর্ব দিগন্তে, নতুন দিনের সন্ধান পেতে ও নবারুণে আলোকিত হতে। আর সেই আলোকময় বর্তিকা হাতে নিয়ে যাঁরা এগিয়ে গেলেন, পথের যাঁরা দিশা দিলেন, মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মহানায়ক।

মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীর নাম আগে অনেক শুনেছি এবং কিছু কিছু তাঁর সম্বন্ধে পড়েছিও। কিন্তু চোখে দেখিনি তখনও। নিজের সামনে দেখার ভাগ্য আমার হলো, যখন তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় বিক্রমপুরের রিকাবীবাজারে এক জনসভায় বক্তৃতা করতে এলেন (তখন আমি কলেজে মাত্র প্রথম বর্ষের ছাত্র)। সেদিনের সে স্মৃতি, তাঁর মুখাবয়বের কি এক অপূর্ব দীপ্তি যা চিরদিন আমার মনের মণিকোঠায় জাগরুক হয়ে থাকবে। মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীর তখনকার সে বেশ ছিলো যেন কঠোর যোগাসনের ভাস্বর মূর্তি। মন ছিলো অনাগত বিজয় সম্ভাবনার গর্বে রোমাঞ্চিত, মুখে ছিলো স্মিতহাস্য, বুকে ছিলো দুর্জয় সাহস আর অফুরন্ত আশা। মুহুর্মুহু জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে লঞ্চঘাটের ছোট্ট সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে তিনি নিচে নেমে এলেন। ছাত্রদের থেকে কয়েকজনে মিলে একটি ছাতা দিয়ে রোদ থেকে তাঁর মাথা বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছেন সভামণ্ডপের দিকে। তাঁর ডানপার্শ্বে রয়েছেন তৎকালীন মহকুমা আওয়ামী লীগের সম্পাদক মরহুম জনাব ইসহাক চাকলাদার (পরে তিনি প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যও হয়েছিলেন) এবং জনাব কোরবান আলি। সোহ্‌রাওয়ার্দী সম্পর্কে এত শুনেছি যে, তাঁর স্মৃতি-শক্তি ও অদম্য কর্মস্পৃহা আর নির্ভয় সাহসিকতার কথা সাধারণ্যে যেন রূপকথার মতোই ছড়িয়ে রয়েছে। এহেন মহান নেতাকে কাছে পেয়ে যেন নিজেকে তখন খুবই গৌরবান্বিত মনে করেছি।

সভার প্রারম্ভে উদ্বোধনী বক্তৃতায় মরহুম সম্পাদক সাহেব উল্লেখ করেছিলেন, 'বিক্রমপুরে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের এই প্রথম শুভ-পদার্পণ।' কিন্তু জনাব

www.pathagar.com

সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব অভিভাষণ দিতে উঠেই বল্লেন, 'চাকলাদার সাহেবের হয়তো স্মরণ নাও থাকতে পারে যে, বিক্রমপুরে এ আমার প্রথম আগমন নয়, এর আগেও বিক্রমপুরের লৌহজঙ্গে আমি এসেছিলাম, সেও অনেকদিনের কথা।' প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী বলে সর্বজনবিদিত এই মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে মন চমৎকৃত হলো।

সুন্দর রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশ, অগণিত শ্রোতা, সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ, কান পেতে রয়েছে। নীরব আগ্রহে, নেতার কথা শুনবে বলে। বলেওছিলেন তিনি দীর্ঘ সময়। তারপর সভার কাজ শেষ হলো। কিন্তু পরক্ষণেই ঝড়ের বেগে আবার তাঁদের যাত্রা শুরু হলো ওখান থেকে দশ মাইল দূরবর্তী গ্রাম রাজদিয়ার এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দিতে হবে বলে। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম কর্ণধার মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও শামিল হয়েছিলেন এ জনসভায়। বিপুল সম্বর্ধনা ও উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে জনসভা শেষ হলো। জনতার অবিচ্ছেদ্য বন্ধু, দেশ নিবেদিতপ্রাণ এই মহাপুরুষ ওখানে রাতে অবস্থানের পর অতি প্রত্যুষেই আবার রওনা হলেন মওলানা সমভিব্যাহারে বিক্রমপুরে আরো কয়েকটি জনসমাবেশে অংশগ্রহণ করে জনসাধারণকে ধন্য করতে। প্রত্যেকটি অভিভাষণেই মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব ঐতিহাসিক প্রয়োজনে যে যুক্তিপূর্ণ ও উদ্দীপনাময়ী বাণী দিয়েছিলেন, বিক্রমপুরবাসীদের কাছে তা চিরকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দী বাংলার এক বিদগ্ধ ও অভিজাত পরিবারের আদুরে সন্তান হিসেবে প্রতিপালিত হয়েও অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কত সহজে যে মিশে যেতে পারতেন এবং তাদের হাসি-কান্নায়, শোকে-দুঃখে, তাদের জীবন-যাত্রায় নিজেকে বিলিয়ে নিতে পারতেন, তার প্রকাশ দেখেছি মরহুমের তখনকার দিনগুলোতে। জীবনে যাঁরা মহৎ, কর্মে তাঁরা পরান্মুখ নন—এই সত্য মূর্ত হয়ে ফুটে উঠতে দেখেছি মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রতিটি পলকে। কোনো রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ ছিলো তাঁর নীতি বিরুদ্ধ এক সাধারণ ধর্ম। অন্তত এমন অপবাদ তাঁর কোনো শত্রুর কাছ থেকেও শুনিনি কোনোদিন! খুব নিকট থেকে তাঁকে জানার সুযোগ আমার হয়নি, কিন্তু দূর থেকে যতটুকুই তাঁকে জানতে পেরেছি, তারই স্মৃতি রোমন্থন করতে পারলে নিজেকে জীবনে ধন্য মনে করবো।

১৯৫৪ সাল। নির্বাচন আগতপ্রায়। দলীয় মনোনয়ন দানের ব্যাপারে যুক্তফ্রন্ট নেতাদের মধ্যে কিছুটা অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ পাচ্ছিলো দিন দিন। মওলানা ভাসানী ভাবাবেগে উদ্বেলিত আর মরহুম জনাব এ. কে. ফজলুল হক স্বীয় দলীয় কর্মীদের তোষামোদে নিপতিত। কূল রাখি কি শ্যাম রাখি, ঈর্ষা-দ্বন্দ্বের পূর্বাভাস। এমনি দু'মুখো টানা-পোড়েনের প্যাঁচে পড়ে চূড়ান্ত মনোনয়ন বাছাই একরকম ব্যাহত হতে চলেছে। মরহুম জনাব ফজলুল হক শেষের দিকে একটু স্তিমিত হয়েই পড়লেন। কিন্তু মশাল জ্বালিয়ে রেখেছিলেন কে? সে কথাও কি আজ জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে? তিনিই শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী যাঁকে দেখা গিয়েছে দিনরাত ঐ ২৫ নম্বর সদরঘাট রোডের দ্বিতল বাড়িটার একটা অপরিসর প্রকোষ্ঠে বসে আগামীদিনের ইতিহাস রচনা করতে। আর সে ইতিহাস ছিলো গণতন্ত্রের উপক্রমণিকা মাত্র।

প্রদেশের দূর-দূরান্তর থেকে আগত কর্মী-জনতা-ছাত্র-বুদ্ধিজীবী সবারই সঙ্গে পরম সহিষ্ণুতার সাথে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে কখনো তিনি ক্লান্তি বোধ করেননি।

www.pathagar.com

দিনের বেলায় এসব কাজ শেষ করে, রাতের নীরবতায় তিনি মনোনিবেশ করতেন মনোনয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় বিচার-বিবেচনায়। ঠিক এভাবেই তিনি মনোনয়ন ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটালেন এবং পরবর্তীকালে কোনো নেতা বা উপনেতারা এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে শোনা যায়নি। এত নিখুঁত ছিলো তাঁর কর্মদক্ষতা। আত্মবিশ্বাসে ও আপন যুক্তির সারবত্তায় যে মহাপুরুষ অটল-অনড় তাঁর কাছে কোনো সমস্যাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় না।

মুন্সীগঞ্জ মহকুমার কোনো একজন প্রার্থীর দলীয় মনোনয়ন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে স্থানীয় ছাত্র-জনতার এক প্রতিনিধিদল এসেছিল সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। তাদের দাবি ছিলো—যার হয়ে তারা এসেছে, সে কর্মী হিসেবে একনিষ্ঠ এবং মানুষ হিসেবে সৎ ও উচ্চাভিলাষী।

সব শুনে মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব অর্ধসঙ্কুচিত চোখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন এবং সহাস্যে বললেন, 'আল্লাহ এমন লোককেই তো ভালোবাসেন।' পরমুহূর্তে প্রতিনিধিদলকে তিনি বিদায় দিলেন। বলা বাহুল্য, সে প্রার্থী মনোনীত হয়ে নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যেই জয়লাভ করেছিলেন। পরম করুণাময়ের ওপর শুকরিয়া ও নির্ভরশীলতার পুরস্কার কি এ নয়?

কিন্তু দেশের যারা গণদুশমন, জাতির যারা কলঙ্ক তারা সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের নামে অপপ্রচার—নির্লজ্জ মিথ্যার বেসাতি ও অসৌজন্য মন্তব্য প্রকাশে কার্পণ্য করেনি। অথচ কত আশ্চর্য উদার ছিলো মানুষ সোহ্‌রাওয়ার্দীর হৃদয়। কত মার্জিত ছিলো তাঁর আচরণ ও কত বিশাল ছিলো তাঁর পৌরুষ। বন্ধুসুলভ ব্যবহার ও সরলতার সুযোগ নিয়ে কত স্বার্থান্বেষী পাপিষ্ঠ ও ক্ষমতালিপ্সুরা তার সঙ্গে বেঈমানী করেছে, সাফল্য লাভের পথে তাঁর ভরাডুবি করেছে; কিন্তু তিনি তাদের প্রতি নারাজ হননি, নাখোশ হননি, হাসিমুখে তিনি তাদের ক্ষমা করতে পেরেছেন, ভাই বলে কাছে ডেকে নিয়েছেন। লজ্জায় আর আত্মগ্লানিতে আজ মাথা নত হয়ে আসে যে, গণতন্ত্রকামী পাকিস্তানের দশ কোটি মানুষের পেশোয়ায়ে ইমাম মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী বিনিময়ে কি পেয়েছেন? তাঁর প্রিয়তম দেশ ও দেশবাসীর সেবা করা থেকে কেন তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছিল? প্রধানমন্ত্রিত্বের আসন থেকেই বা কেন তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল? তার কারণ অনেক, বিশ্লেষণ ভয়াবহ। থাক সে প্রসঙ্গ।

বিক্রমপুরের বালিগাঁয়ের জনসভায় সত্তরোত্তর এক বৃদ্ধের চোখে দেখেছিলাম অবিরল অশ্রুর ধারা। মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীকে দেখতে এসে তাঁর সে কি কান্না! বৃদ্ধের চোখে ছানি পড়েছে, দৃষ্টি তাঁর ঝাপসা। তবুও আপনজন সোহ্‌রাওয়ার্দীকে মোবারকবাদ জানাবার সে কি আকুল আর্তি! জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম, ১৯৪৬ সালের কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বৃদ্ধের ৩০ বছরের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণ হারিয়েছিল আর তারই অনুজ মহান নেতার কল্যাণেই কেবল জীবন নিয়ে দেশে ফিরে এসেছিল। এমন হাজার হাজার দাঙ্গাভুক্ত মানুষের যিনি বন্ধু তাঁর 'নিকট আমায় একটু নিয়ে চলো তোমরা, চোখে তো আর দেখতে পাইনে, শুধু দু'হাত দিয়ে তাঁকে একটু স্পর্শ করবো, ছালাম জানাবো।' জোয়ারের মতো জনতার প্রবল চাপের ভার বাঁচিয়ে তাঁকে নিয়ে নেতার কাছ অবধি আর পৌঁছা যায়নি, বৃদ্ধের সাধ পূর্ণ হয়নি।

বহুমুখী প্রতিভা ও অশ্রুতপূর্ব গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল এই মহামানবের জীবনে।

www.pathagar.com

অনাবশ্যক ও বৃথা স্তুতিবাদ তিনি অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেন। পরিপূর্ণভাবে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। অতীতের অনেক নেতার গালভরা বুলি আমরা শুনেছি, শুনেছি একাধিকবার কাশ্মীর সমস্যার কল্পিত সমাধানের কাহিনী। কিন্তু ক্ষমতার বাইরে কিংবা ক্ষমতা হাতের মুঠোয় পেয়েও মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীকে আমরা দেখেছি বাস্তবতার স্বরূপে। এপ্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে ঢাকার প্রথম জনসমাবেশে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসেবে পাকিস্তানের সম্পদ হয়েই থাকবে।

পরিশেষে এই মহামানবের জীবনেও এক করুণ অধ্যায়ের সংযোজন হলো। স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রাধিনায়ক, পাক-ভারত উপমহাদেশের মুক্তিসেনাদের শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দুর্লভ পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মশহুর নেতাকেও শেষে কারাবরণ করতে হলো। জাতির ললাটে এই কলঙ্কের কালি শুধু মসীলিপ্ত হয়েই থাকবে না, তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসকেও ভারাক্রান্ত করে তুলবে। এই হঠকারিতা, এই অপবাদ ও প্রতারণার ইতিহাস কি খুব সহজেই মুছে যাবে? এই চোরা-পথের পাপের কি কোনো প্রায়শ্চিত্ত আছে?

গণতন্ত্রের পাহারাদার, মুক্তিসংগ্রামের সিপাহসালার আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, চলে গেছেন অনন্তলোকে, যেখান থেকে কোনোদিনই আর তাঁকে ফেরানো যাবে না। তাই আমরা তাঁকে বিদায় দিয়েছি কান্নার ভেতরে, নিরাশার সাগরে; কেননা সত্যিই আমরা এতিম হয়েছি।

www.pathagar.com

মৃত্যু নয়, নবজাগরণ

জাফর আহমদ

'মরিতে পারিলেই আমি সুখী হইব', এমন একটি অদ্ভুত কথা সেইদিন কাহার মুখে এবং কখন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আজ আর সারা পাকিস্তানবাসীর অজানা নহে। মৃত্যু মানুষের জীবনে একটি কঠিন সত্য। দিনের পর দিন সকলকেই এই ধরার মায়া ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু মৃত্যু যতই কঠিন সত্য হউক না কেন, মানুষ কোনোদিন উহাকে সাদরে গ্রহণ করিতে পারে না। তাই মৃত্যু মানুষের নিকট অতি কুৎসিত এবং ভয়ঙ্কর। যে মৃত্যুর কথা শুনিয়া মানুষের শরীর শিহরিয়া ওঠে, সেই মৃত্যুকে কেন সেদিন আমাদের প্রিয় নেতা মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব স্বাগত জানাইয়াছিলেন! একটা অসহায় জাতিকে চরম সঙ্কট মুহূর্তে ছাড়িয়া মৃত্যুর মাঝে সুখ লাভের প্রত্যাশা কেন তাঁহার জাগিয়াছিল! আজ প্রতি মুহূর্তে আমাদের অন্তরে এই প্রশ্নটিই জাগিয়েছে যে, মৃত্যুর মাঝে সুখ লাভের অন্তর্নিহিত ভাব বা অর্থটি কি? ঐরকম একটা অস্বাভাবিক ইচ্ছার কি সার্থকতা ছিলো? এই পৃথিবী এত সুন্দর, এত মনোমুগ্ধকর যে, ইহাকে ছাড়িয়া কেহই বিদায় নিতে চাহেন না।

তাই আজ আমাদের মনে জাগে মানুষের মাঝে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কি আমাদের পরলোকগত নেতার এতটুকুও ইচ্ছা ছিলো না? যদি তিনি জানিতেন, মৃত্যুর মাঝেই শান্তি, সুখ ও আনন্দ তবে কেন বারবার চিকিৎসার জন্য দেশ হইতে দেশান্তরে ছোটাছুটি করিতেন? বস্তুত বাঁচিবার সাধ সবারই থাকে, তেমনি আমাদের প্রিয় নেতারও ছিলো। তবে কেন তিনি মরিয়া সুখী হইতে চাহিয়াছিলেন তার জবাব তাঁর বিরাট কর্মময় জীবনের মাধ্যমে বিদ্যমান। তিনি ছিলেন জাতির কর্ণধার। তাঁহার প্রচেষ্টা ছিলো জনসাধারণের বাঁচিয়া থাকিবার দাবি আদায় করার। তাঁহার সংগ্রাম ছিলো কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে। তিনি চাহিয়াছিলেন স্বৈরতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিতে। তাই তিনি রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন একনায়কত্ববাদের বিরুদ্ধে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অসীম সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তিনি পাকিস্তানের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশাকে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন। যে মহান পুরুষ জনসাধারণের দুর্দশায় ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর মাঝে সুখ লাভ করার অর্থ আজ আমাদের নিকট অতি সরল এবং সুস্পষ্ট। তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, পঙ্গু হইয়া বাঁচিয়া থাকার চাইতে মৃত্যু অনেক শ্রেয়। যাঁর জীবন শুধু পরের জন্য উৎসর্গিত হইয়াছিল, যিনি পরের বাঁচিবার দাবি নিয়া নিজের সুখ, ব্যক্তিগত শান্তি বিসর্জন দিয়াছিলেন তাঁহার নিকট অকেজো হইয়া বাঁচিয়া থাকা কাপুরুষতার পরিচয়। তিনি নিজের জন্য বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার ভিতরের লোকটি হয়তো তখন তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিত। কারণ নতি স্বীকার করা এবং অন্যায় মানিয়া নিয়া দুর্বলের মতো বাঁচিয়া থাকিবার সাধ তাঁহার ছিলো না বলিয়াই মৃত্যুর মাঝে সুখ লাভ করিতে

www.pathagar.com

চাহিয়াছিলেন। সে কারণেই তিনি বলিয়াছিলেন ঃ 'কেবল নিজের জন্য যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় সে বাঁচার আর লাভ কি?'

এখানেই মরহুমের মহত্ত্বের প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করা কোনোদিন তাঁহার অন্তরে স্থান পায় নাই বলিয়াই তিনি বিদায় নিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই মহৎপ্রাণ যখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অন্যায়ের রাজত্বে সত্য বিকাশের কোনো পথ নাই, তখনই কঠোর আঘাত লাগিয়াছিল তাঁহার অন্তরে। তাই তাঁহার কাম্য হইয়াছিল মৃত্যু।

তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন এবং এই ব্যর্থতাই টানিয়া আনিয়াছে তাঁহার মৃত্যু। কিন্তু কিসে তিনি ব্যর্থ? তাঁহার ব্যর্থতা ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারে নয় সারা পাকিস্তানের মজলুম জনসাধারণের স্বার্থের। তাঁহার নিকটই পাকিস্তানীরা সান্ত্বনা পাইয়াছিল এবং তাঁহার মুখেই জনসাধারণের মনের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাই জনসাধারণের জন্যই তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন কারণ জীবিত থাকিয়া অন্যায় জুলুম সইতে পারিবেন না বলিয়াই বিদায় নিবার ইচ্ছা তিনি করিয়াছিলেন। একদিন মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আলী বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন যে, যদি স্বাধীনতা তিনি আনিতে না পারেন, তবে আর পরাধীন দেশে ফিরিয়া আসিবেন না। করুণাময় তাঁহার ইচ্ছাই পূরণ করিলেন। তেমনি আমাদের শহীদ সাহেবও যেন আর অগণতান্ত্রিক দেশে জীবিত অবস্থায় ফিরিলেন না। কিন্তু আজ একটি কথা স্মরণ করিলে আমরা দুঃখ মোচন করিতে পারি না। তিনি যে কয়টি কথা শেষবারের মতো বলিয়া গিয়াছেন, তার মাঝে একটা বিরাট আঘাতের চাপ রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, 'আমি আর কাহারো কাজে আসিব না।'

তবে কি সত্যই তিনি অকেজো হইয়া গিয়াছিলেন, না তাঁহার মুখের ভাষা রুদ্ধ করিয়া তাঁহার সংগ্রামকে চাপা দিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার যাতনা, লাঞ্ছনা দিয়া স্বৈরাচারী সরকার তাঁহাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অকেজো করিয়াছিল! বস্তুত তিনি এমনি অবস্থায় পৌছাননি যে, তাঁহার উক্ত কথার সাথে আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিছু প্রমাণ করিতে পারি। এখানেই আমরা চিন্তা-ধারণার খেই হারাইয়া ফেলি।

কিন্তু আজ আর দুঃখ করিয়া লাভ নাই। তাঁহার আদর্শকেই যদি আজ আমরা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তবেই তিনি ধন্য হইবেন। এখানেই তাঁহার সংগ্রামের সার্থকতা পরিস্ফুটিত হইবে। হয়তো সাফল্য লাভ করিবার পূর্বেই তিনি বিদায় নিয়াছেন, কিন্তু আজ যদি আমরা তাঁহার সেই মহান আদর্শকে সার্থক করিতে পারি তবেই তাঁহার আত্মা শান্তি পাইবে। তাঁহার মৃত্যুকে তাই এক অর্থে নব জাগরণের ইশারা বলিয়া মানিতে পারি।

www.pathagar.com

অশ্রু দিয়ে গাঁথা

পূর্ব পাকিস্তান

মওলানা আকরম খাঁ

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এক শোকবাণীতে বলেন, জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে আমি ব্যক্তিগতভাবে যতখানি দুঃখিত ও মর্মাহত হইয়াছি, তাহার চাইতেও অধিক বিচলিত হইয়াছি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ চিন্তায়। দেশের বর্তমান অন্ধকার অবস্থার অবসানের জন্য যাঁহাদের ওপর নির্ভর করিতেছিলাম, তাঁহারা একে একে সরিয়া পড়িতেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে দুইটি অসাধারণ প্রতিভার জন্ম হইয়াছিল, তাঁহারা হইতেছেন জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হক ও জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তাঁহারা আজ আর জীবিত নাই। আর আমাকেও এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করিতে হইতেছে।

মওলনা ভাসানী

সাবেক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বেগম আখতার সোলায়মানের নিকট প্রেরিত শোকবাণীতে বলেন, তিনি জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে মর্মাহত ও শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বলেন, 'আপনার আব্বাজান পাকিস্তানের সবচাইতে জনপ্রিয় জাতীয় নেতা এবং যোদ্ধা ছিলেন।' মওলানা সাহেব বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানান।

মওলানা তর্কবাগীশ

সাবেক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ তাঁহার শোকবাণীতে বলেন, প্রিয় নেতা ও পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর দুঃখজনক আকস্মিক মৃত্যু শুধু আমার প্রতিই নহে, বরং সমগ্র জাতির প্রতিই এক মারাত্মক আঘাতস্বরূপ। যখন সমগ্র জাতি তাঁহার বলিষ্ঠ ও উদ্যমশীল নেতৃত্বের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ই নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁহাকে আমাদের মধ্য হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আশাহত জাতির শেষ ভরসাস্থলও আর রহিলো না।

নূরুল আমীন

'মরহুম পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন। গণদাবি আদায়ের জন্য তিনি সংগ্রাম করেন বলিয়াই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে আকস্মিক আঘাত সহ্য করিতে হয়। শাসনতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ণের জন্য জনমত সংগঠনের উদ্দেশ্যে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী সারাদেশে ব্যাপক সফর করেন। ফলে, তাঁহার স্বাস্থ্যে ইহার বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে তিনি মৃত্যুবরণ করিলেন। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী একটি আদর্শের জন্যই মৃত্যুবরণ করিলেন।'

www.pathagar.com

আতাউর রহমান খান

'জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যু সকলের নিকট দুর্বিষহ ও মর্মান্তিক বলিয়া বোধ হইতেছে। আমরা হতবুদ্ধি ও শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। এই মহান নেতা যে আর নাই, সেকথা চিন্তা বা বিশ্বাস করাও আজ কষ্টকর। তিনি আজ চলিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অমর আত্মা তাঁহার লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অন্তরে অনির্বাণ রহিয়াছে। মানবজাতির এই মহান নেতা, মহান দেশপ্রেমিক, বীর সৈনিক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই নির্ভীক সংগ্রামীর মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইলো, তাহা পূরণ করার মতো আর কেহই আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট নাই। আমাদের তথা তাঁহার অনুবর্তীদের নিকট তিনি ছিলেন পরম আদর্শপুরুষ আর দেশবাসীর নিকট তিনি ছিলেন একাধারে সাহস, ধৈর্য ও দৃঢ়চিত্ততার প্রতীক। রাজনৈতিক জীবনে তাঁহাকে গুরু হিসাবে লাভ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি আর দেশবাসীও প্রকৃত নেতা হিসাবে তাঁহাকে পাইয়া গর্ব অনুভব করিয়াছে। দেশের বাহিরে তাঁহার মৃত্যু আঘাতকে আরও মর্মান্তিক করিয়া তুলিয়াছে।'

খাজা নাজিমউদ্দীন

'ইহার চাইতে অতি বড় দুঃখের বিষয় কিছু হইতে পারে না।······আমরা যখন কেমব্রিজ এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, তখন হইতে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সহিত আমার বন্ধুত্ব হয় এবং ভারত বিভাগ হওয়া পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে কাজ করি। কলিকাতার মুসলমানদের জীবনে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর যে অবদান, তাহা ভোলা যায় না এবং তাহাদের ওপর তাঁহার এমন অধিকার ছিলো যে, ১৯২০ সালে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী নির্বাচিত হওয়ার পর হইতে কোনোদিন কেহ তাঁহাকে নির্বাচনে পরাজিত করিতে পারেন নাই। অত্যল্প সময়ের জন্য তিনি কংগ্রেস দলভুক্ত থাকিলেও সর্বদাই তিনি মুসলমানদের জন্যই সংগ্রাম করিয়াছেন। পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি পুরোভাগে ছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে এবং পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি অক্লান্তভাবে সারাদিন পরিশ্রম করিয়াছেন। পরিষদে কংগ্রেসের বহু সংখ্যক বক্তার মুখোমুখি মুসলিম লীগের পক্ষে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং আবদুর রহমান সিদ্দিকীই একমাত্র বক্তা ছিলেন।'

শেখ মুজিবুর রহমান

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শেখ মুজিবুর রহমান প্রিয় নেতার মৃত্যুতে এতই মর্মাহত হন যে, তখন শোকবাণী প্রদানের অবস্থা তাঁর ছিলো না। তারপর সাংবাদিকেরা তাঁহাকে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সহিত তাঁহার দীর্ঘদিনের কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন, ইহা ব্যাখ্যা করিয়া কি বলিব। শুধু আমার রাজনৈতিক জীবন নহে, আমার সকল কিছু জুড়িয়া বিরাজমান ছিলেন আমার নেতা সোহ্‌রাওয়ার্দী। আজ তিনি নাই। এই না-থাকা আমার নিকট কতটুকু তাহা বুঝাইবার শক্তিও আমার নাই।

আবুল মনসুর

আমাদের প্রিয় নেতা আর নাই। সংবাদটি এত বেশি বেদনাদায়ক যে, শোকবাণী দেওয়ার মতো শক্তিও আমার আর অবশিষ্ট নাই। আজ সমগ্র দেশ যখন কাঁদিতেছে, তখন কে কাহাকে সান্ত্বনা দিবে! শহীদের ইন্তেকালে যদিও আমাদের অনেকের যে ব্যক্তিগত ক্ষতি হইয়াছে, তবুও তাহা জাতির অপূরণীয় ক্ষতির তুলনায় একান্তই নগণ্য। দেশ যখন তাঁহার

www.pathagar.com

আগমনের আশায় অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিল এবং দেশ যখন তাঁহার নেতৃত্বেরই বেশি প্রত্যাশা করিতেছিল, তখনই তিনি আমাদের ছাড়িয়া গেলেন।

হামিদুল হক চৌধুরী

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর তিরোধান আমাদের সকলের এবং দেশবাসীর পক্ষে গুরুতর আঘাতস্বরূপ। জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে তিনি ইন্তিকাল করায় সমগ্র দেশ আজ শোকাভিভূত ও শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অতঃপর তাঁহার মতো একজন নির্ভীক, সাহসী এবং অক্লান্ত যোদ্ধা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইবে। সম্পূর্ণভাবে অক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তিনি একটি দিনের জন্যও বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই। কারান্তরালে থাকাকালেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। উহার পর কোনোদিনই তিনি আর সুস্থ হইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুজনিত ক্ষতি তাই আজ অপূরণীয়।

আবুল হাশিম

হৃদয় ও মস্তিষ্কের বিরল গুণরাজিতে সমৃদ্ধ এক মহান ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মময় জীবনের ইতি হইলো। রাজনৈতিক জীবনে আমরা কখনও ঐকমত্য, আবার কখনো বা ভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার উদারচিত্ত, মূল্যবোধ এবং সহিষ্ণু মনোভাব সমকালীন দুনিয়ার মানসরাজ্যের দুর্লভ স্মৃতিরূপে বাঁচিয়া থাকিবে। পাকিস্তানের স্বাধীনতাপ্রিয় জনসাধারণ তাহাদের সংগ্রামে মরহুমের জীবন ও কর্ম হইতে মূল্যবান প্রেরণা লাভ করিবে।

সৈয়দ আজিজুল হক

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী সৈয়দ আজিজুল হক জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে মহান পুরুষ ও পাকিস্তানের মহান নাগরিক হিসাবে অভিহিত করিয়া বলেন, 'তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে সমগ্র জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ আজ চলিয়া গেলেন। এক মহান পুরুষ ও মহান নেতার তিরোধান ঘটিল। সমগ্র দেশ তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে মর্মাহত ও শোকার্ত হইবে।'

মাহমুদ আলী

সাবেক প্রাদেশিক 'ন্যাপে'র জেনারেল সেক্রেটারি জনাব মাহমুদ আলী বলেন, 'জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর আকস্মিক মৃত্যুর খবর শুনিয়া আমি হতবাক হইয়া গিয়াছি। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে আমাদের জাতীয় নেতার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইলো, তাহা কখনও পূরণ হইবে না। যে মুহূর্তে তাঁহার দেশ সেবার সবচাইতে প্রয়োজন ছিলো, সেই মুহূর্তে তিনি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। দেশ আজ গণতন্ত্রের একজন মহান যোদ্ধাকে হারাইল।'

জনাব আবদুল খালেক

সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব আবদুল খালেক এক শোকবাণীতে বলেন, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন আজাদী আন্দোলনের বীর সেনানী এবং পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। তাঁহার শূন্যস্থান পূরণ করা বাস্তবিকই কষ্টকর হইবে।

নূরুল হুদা

বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর সম্পাদক জনাব মাহমুদ নূরুল হুদা বলেন, দেশের মহৎ সন্তান, স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানী এবং পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম পুরোধার

www.pathagar.com

বিয়োগে সমগ্র জাতি আজ গভীর শোকে অভিভূত। সুদক্ষ আইনজ্ঞ, প্রবীণ রাজনীতিবিদ, মহান বক্তা ও দরিদ্রের বন্ধু জনাব এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইলো। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী দেশে সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং বুলবুল ললিতকলা একাডেমী তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা ও সক্রিয় সমর্থন লাভে গর্ববোধ করিয়াছে।

জনাব দেলদার আহমদ

সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব দেলদার আহমদ এক শোকবাণীতে বলেন, 'জাতীয় বীর ও পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টার মৃত্যু একটি সত্যিকারের জাতীয় ক্ষতি। কোনো ভাষাই তাঁহার শোক জ্ঞাপনের জন্য যথেষ্ট নহে।'

জনাব ফজলুর রহমান

সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান তাঁহার শোকবাণীতে বলেন, তাঁহার অটল সংকল্প, আত্মত্যাগের স্পৃহা এবং আদর্শের জন্য কঠোর পরিশ্রমের বাসনা প্রকৃতই অপূর্ব। তিনি মানুষকে ভালোবাসিতেন এবং মানুষও তাঁহাকে ভালোবাসিত। যে সময় দেশ এক সঙ্কটপূর্ণ সময়ের মধ্যদিয়া আগাইয়া চলিয়াছে এবং যে সময় তাঁহারই প্রয়োজন ছিলো সর্বাধিক, তখনই আল্লাহ্ তাঁহাকে আমাদের মধ্য হইতে উঠাইয়া লইলেন। আল্লাহ্ তাঁহার আত্মাকে শান্তি দিন, এই প্রার্থনা করি।

আবদুর রহমান খান

অবিসম্বাদিত জননেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্তির পর সাবেক প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব আবদুর রহমান খান এক বিবৃতিতে বলেন, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যু পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর বজ্রপাতস্বরূপ। তাঁহার আকস্মিক তিরোধান পাকিস্তানের মুক্তি-পাগল জনসাধারণকে এতিম করিয়া দিয়াছে।

মনোরঞ্জন ধর

সাবেক প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী মিস্টার মনোরঞ্জন ধর মহান জননেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যু-সংবাদ লাভের পর এক তারবার্তায় গভীর শোক প্রকাশ করিয়া বলেন যে, মহান নেতার মহাপ্রয়াণে আজাদী, প্রগতি ও গণতান্ত্রিক শক্তির বিরাট ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

তিনি বলেন, সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে রাজনৈতিক গগন হইতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইয়াছে এবং বিশ্ববাসী একজন অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত আইনজ্ঞকে হারাইয়াছে।

পুলিন দে

সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য মিস্টার পুলিন দে এক তারবার্তায় গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া বলেন যে, মহান জননায়ক জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর তিরোধানের ফলে জাতির এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

পশ্চিম পাকিস্তান

মমতাজ দৌলতানা

সাবেক পাঞ্জাবের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা মিয়া মমতাজ দৌলতানা বলেন, জাতির ইতিহাসে এতখানি শ্রদ্ধাস্পদ, বিশ্বস্ত, সর্বজনপ্রশংসিত এবং প্রিয় জাতীয় নেতা যুগ যুগ পর কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। জননেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন হিরো। তাঁহার সাহস ছিলো অসীম, দেশপ্রেম ছিলো প্রশ্নাতীত, দৃষ্টি ছিলো মহান, আত্মবিশ্বাস ছিলো অটুট আর হৃদয় ছিলো যেমনি সংবেদনশীল, তেমনি উদার।

যে মহত্তম আদর্শ হাসিলের জন্য তিনি ডাক দিয়াছিলেন, তহা বাস্তবায়নের দায়িত্ব আজ আমাদেরই কাঁধে আসিয়া বর্তাইলো। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, ইহার শ্রেষ্ঠতম মুক্তিযোদ্ধা, আমাদের ভবিষ্যতের একমাত্র আশা-ভরসা আর সর্বশেষ প্রতিভাদীপ্ত নেতা। জাতীয় জীবনের সর্বাধিক প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁহার অভাবে আজ আমরা কাহার দিকে তাকাইব?

চৌধুরী মোহাম্মদ আলী

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বলেন, অকস্মাৎ মৃত্যুর করাল হস্ত আমাদের মধ্য হইতে একজন মহান দেশপ্রেমিক ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্বশালী নেতাকে সরাইয়া নিলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী দুঃসাহসিকতার সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং সমগ্র জাতি তাঁহার নিকট অনেক আশা-ভরসা রাখিয়াছিল।

মাহমুদাবাদের রাজা

আজাদী সংগ্রামে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর অন্যতম সহকর্মী মাহমুদাবাদের রাজা সাহেব বলেন, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুসংবাদে তিনি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি মাত্র তিন সপ্তাহ পূর্বে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সহিত বৈরুতে সাক্ষাৎ করি। ১৯৩৭ সাল হইতেই আমি তাঁহাকে আজাদী সংগ্রামের পুরোভাগে দেখিয়াছি। বৈরুতে আমি কয়েকবারই তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করি। ঐ সময় জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী আমাকে জানান যে, শীঘ্রই তিনি স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জুরিখ গমন করিবেন এবং নভেম্বরের শেষদিকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিবেন। কিন্তু আমাদের সে আশা আর পূরণ হইলো না।

কাইয়ুম খান

'মরহুম স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের এক মহান যোদ্ধা ছিলেন, আবালবৃদ্ধবণিতা নির্বিশেষে দেশের সবাই তাঁহাকে অন্তর দিয়া ভালোবাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুর ফলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা পূরণ করা বড় কঠিন হইবে।

চৌধুরী খালেকুজ্জামান

কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রধান সংগঠক চৌধুরী খালেকুজ্জামান বলেন, 'জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন নির্ভীক সৈনিক এবং তিনি গভীর নিষ্ঠার সহিত জনগণের সেবা করিয়া গিয়াছেন।'

www.pathagar.com

তিনি মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং পরলোকবাসী মহান জননেতার শোকার্ত পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের আন্তরিক সমবেদনা জানান।

আইয়ুব খুরো

সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব খুরো এক শোকবাণীতে বলেন যে, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মহাপ্রয়াণে পাকিস্তান একজন মহান নেতাকে হারাইয়াছে।

মিয়া জাফর শাহ

সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মিয়া জাফর শাহ্ বলেন যে, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী এমন এক সময় ইন্তিকাল করিলেন যখন গোটা দেশবাসী অধীর আগ্রহে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সহিত খেলাফত আন্দোলনের সময় হইতে একসাথে কাজ করিয়া আসিয়াছি। তখন আমরা উভয়েই তরুণ ছিলাম।

আজম খান

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ আজম খান এক শোকবাণীতে বলেন যে, জনাব এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দীর আকস্মিক ও হৃদয়বিদারক তিরোধানের ফলে জাতীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি বিরাট ও অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হইলো। এমন এক সময় তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন, যখন দেশের জন্য আর জাতির জন্য তাঁহার প্রয়োজন ছিলো সর্বাধিক। পাকিস্তান আজ এমন একজন দেশবরেণ্য নেতাকে হারাইল—যিনি ছিলেন নির্ভীক এবং সংকল্পে অটল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠতম প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তি। আল্লাহ তাঁহার আত্মাকে শান্তি দান করুন।

মওলানা মওদুদী

'দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংগ্রামে নেতৃত্বদান করিবেন বলিয়া জনসাধারণ যখন তাঁহার জন্য অধীর আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই সময় কে জানিত যে, এই জগতের কার্যসম্পন্ন করিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছেন।'

জনাব জেড. এইচ. লারী

সাবেক হাইকোর্ট বিচারপতি ও করাচী কাউন্সিল লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব জেড. এইচ. লারী এক বাণীতে বলেন, 'মরহুম জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যকার 'সেতুবন্ধ'। পূর্বাঞ্চলের অপর কোনো লোকের প্রতি পশ্চিমাঞ্চলের অপর কোনো লোকের এত শ্রদ্ধা ও আস্থা আছে বলিয়া আমি মনে করি না। তাঁহার মহাপ্রয়াণে যে শূন্যের সৃষ্টি হইলো তাহা পূরণ করা অসম্ভব।

'জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন। ১৯৪৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে তিনি যে তেজোদীপ্ত বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা আজও আমার কানে বাজিতেছে।'

কাজী মোহাম্মদ ঈসা

পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাবেক জেনারেল সেক্রেটারি কাজী মোহাম্মদ ঈসা জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যু-সংবাদে বলেন, 'ইহা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের দেশে

www.pathagar.com

জীবদ্দশায় কেহ তাহার মূল্য পায় না। যে মানুষকে আমরা নিন্দা করি এবং দাবাইয়া রাখিতে চাই, মৃত্যুর পর সেই মানুষকেই আবার শতকণ্ঠে প্রশংসা করিতে যাই।'

মাহমুদুল হক ওসমানী

'জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে একটি যুগের অবসান ঘটিল। দেশে যখন সামরিক আইন জারি করা হয়, তখন এবং উহার পরবর্তী আমলে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীই ছিলেন গণতন্ত্রের প্রতীক। পাকিস্তান আন্দোলনে কায়েদে আজমের পরই জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর দান ছিলো। তিনি একজন মহান দেশপ্রেমিক ছিলেন।'

কে. এইচ. খুরশীদ

আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট জনাব কে. এইচ. খুরশীদ এক বিবৃতিতে বলেন, 'উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, পাকিস্তান আন্দোলন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবির একজন মহান যোদ্ধাকে আমরা হারাইলাম। আমরা যারা এখনও কাশ্মীরের মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত রহিয়াছি, কায়েদে আজমের নেতৃত্বে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাহসিকতাপূর্ণ ও উৎসাহব্যঞ্জক সংগ্রাম চিরকাল স্মরণ করিবো।'

চৌধুরী গোলাম আব্বাস

প্রবীণ কাশ্মীরী নেতা চৌধুরী গোলাম আব্বাস বলেন, 'জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা এবং একজন দুঃসাহসিক রাজনীতিক।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জাতীয় পরিষদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

'প্রখ্যাত আইনজ্ঞ, মহান পরিষদবেত্তা (পার্লামেন্টারিয়ান), গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী, স্বাধীনতা সংগ্রামের অজেয় যোদ্ধা, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, মুসলিম লীগের অন্যতম প্রবীণ নেতা এবং পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর বেদনাময় ইন্তেকালে এই পরিষদ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে।'

'তাঁহার মৃত্যু এক বিরাট জাতীয় ক্ষতি এবং এই পরিষদ তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবার এবং জাতির শোকে গভীরতম সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।'

অভিজাত, সাধারণ মানুষ

জাতীয় পরিষদের স্পীকার এবং তদানীন্তন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট পরিষদে প্রেরিত এক শোকবাণীতে বলেন, 'মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রতি আমরা আজ যখন আমাদের শেষ অর্ঘ্য এবং সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শন করিতে সমবেত হইব, সেই দিনটিতে পরিষদে উপস্থিত থাকিতে না পারায় আমি বেদনা বোধ করিতেছি। পাকিস্তান হাসিলে তাঁহার অবদান এবং তাঁহার জীবনের সকল মহৎ ও ভাস্বর দিকগুলি আজ আমি রোমন্থন করিতেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৈনিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম এবং সর্বদাই সকল ভয়-ভীতিকে ভ্রূকুটি করিয়া এবং বিপদের ঝুঁকি লইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে অবস্থান করিয়াছেন। তাঁহার মূলনীতি ছিলো অজেয় আর শক্তি ছিলো অপরিসীম। যে কোনো মানেই বিচার করা যাক না কেন, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী শুধু একজন রাজনীতিকই ছিলেন না, তিনি অপরিসীম প্রজ্ঞারও অধিকারী ছিলেন। আইনজ্ঞ হিসাবে, পণ্ডিত হিসাবে, পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে তাঁহার গতিশীল ব্যক্তিত্বের এবং পাণ্ডিত্যের মেধা সমসাময়িক সকলেই উপলব্ধি করতেন। একদিকে তিনি ছিলেন অভিজাত, অন্যদিকে ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ; একদিকে ছিলেন প্রবীণ, অন্যদিকে নবীন, একদিকে ছিলেন রক্ষণশীল, অন্যদিকে উদার মানবিক ব্যক্তিত্বে বিরল গুণাবলীর এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল তাঁহার ব্যক্তিত্বে। পাক-ভারতের ইতিহাসে এক বিরাট অংশ জুড়িয়া ছিলেন তিনি এবং সর্বদাই তাহা থাকিবেন।'

'পূর্ব ও পশ্চিমের যোগসূত্র ছিন্ন হইলো'

জাতীয় পরিষদের তদানীন্তন অস্থায়ী স্পীকার জনাব আফজাল চীমা বলেন, 'মহান জাতীয় বীর' মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বেই পাকিস্তানে সর্বপ্রথম সার্থক বিরোধী দল সৃষ্টির চেষ্টা হয়। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর নির্বাচনী সফর স্মরণ করিয়া তিনি বলেন যে, তিনি যে কোনো পরিস্থিতি দ্রুত অনুধাবনে সক্ষম ছিলেন। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মহান ব্যক্তিত্ব বিচিত্র গুণে উদ্ভাসিত ছিলো। তাঁহার তিরোধানে অতীত ও বর্তমানের এবং পূর্ব ও পশ্চিমের যোগসূত্র ছিন্ন হইলো।

www.pathagar.com

জাতির জন্যই জীবন বিসর্জন দিয়াছেন

অন্যতম ডেপুটি স্পীকার জনাব আবুল কাসেম বলেন যে, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর বিয়োগজনিত ক্ষতির কথা প্রকাশের মতো ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন কাজের মানুষ এবং তিনি জাতির জন্য স্বীয় জীবন বিসর্জন দিয়াছেন।

বিশ্বাস হয় না—সোহ্‌রাওয়ার্দী নাই

জাতীয় পরিষদের সরকারি দলের নেতা জনাব আবদুস সবুর বলেন, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর জীবনাবসানের বেদনাদায়ক সংবাদ তাঁহার সহকর্মী এবং অনুগামীদের নিকট হতভম্বকারী আঘাত হিসাবে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী নাই—এই কথা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। সমগ্র জাতি তাঁহার মৃত্যুতে সুকঠিন আঘাত পাইয়াছে এবং বিদায়ী নেতার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছে। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী শুধু একজন মহান রাজনীতিজ্ঞই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন জন্মগত নেতা। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর হৃদয় ও মস্তিষ্কের গুণাবলীই শুধু অতুলনীয় ছিলো না, সময়ে সময়ে তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্বের বিকাশ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া গিয়াছি। তিনি ছিলেন অপূর্ব ক্ষমতাসম্পন্ন দার্শনিক এবং মানবতার একজন মহান সেবক।

পাকিস্তান ইস্যু লইয়া অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুসলিম লীগ শতকরা ৯৭ ভাগ ভোট পায় এবং ভোটপ্রাপ্তির সকল কৃতিত্বই জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রাপ্য। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন জনসাধারণের এক মহাবান্ধব।

'ভাগ্যে কি ঘটিবে, ভাবিলে চক্ষু মুদিয়া আসে'

সম্মিলিত বিরোধী দলের তদানীন্তন নেতা সরদার বাহাদুর খান বলেন যে, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর ইন্তেকালে দেশ হইতে গণতন্ত্রের শেষ আভা বিলীন হইয়া গিয়াছে। দেশবাসী অত্যন্ত সঠিকভাবেই জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সহিত তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গ্রথিত করিয়াছিল। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর অবর্তমানে আমাদের ভাগ্যে যে কি ঘটিবে, তাহা ভাবিলে চক্ষু মুদিয়া আসে। আমি ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া এই কথা বলি না। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী গণতন্ত্রের যে ধ্বজা উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সমুন্নত রাখার মতো আজ দেশে যে আর কেহ নাই, ইহা ভাগ্যেরই পরিহাস। জীবদ্দশায় যাঁহারা তাঁহার সহিত অনেক বিষয়েই একমত হইতে পারেন নাই, তাঁহারাও যখন আজ তাঁহার প্রতি গৌরবাত্মক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন, তখনই মনে হয় যে, ব্যক্তিত্বের কতখানি কৌলিন্য জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর ছিলো।

জাতি আজ নিঃসহায়

বিরোধী দলের নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ্ খান বলেন, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর ইন্তিকালে আশার শেষ আলোক রশ্মিটুকুও মিলাইয়া যাওয়ায় জাতি আজ নিঃসহায় হইয়া পড়িয়াছে। মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব মওলানা মোহাম্মদ আলী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত তাঁহার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই ন্যায় তিনিও জন্মভূমির বাহিরে তাঁহার শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। মওলানা মোহাম্মদ আলী যেমন বলিয়াছিলেন যে, বিদেশীর পদানত জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন অপেক্ষা স্বাধীন কোনো দেশে মরণও তাঁহার নিকট শ্রেয়, তেমনি শহীদ সাহেবও দেশে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে মনে করিয়া বৈরুতেই আপন মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

গণঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মাহুতি

বিরোধী দলীয় পাক পিপলস্ গ্রুপের নেতা জনাব রমিজউদ্দিন আহ্মদ বলেন, জনাব সোহ্রাওয়ার্দী সমগ্র জীবনে গণতন্ত্রের পথ হইতে প্রতিবন্ধক অপসারণের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করিয়াছেন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি আত্মাহুতি দিয়াছেন।

সোনালী যুগের অবসান

বিরোধী দলের সদস্য জনাব ফরিদ আহ্মদ বলেন, 'জনাব সোহ্রাওয়ার্দী যখনই যে পরিষদের সদস্য ছিলেন, তখনই তিনি ঐ পরিষদের প্রভুত্ব অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি প্রশংসামূলক সম্মান প্রদর্শনের উপযুক্তও আমরা নহি।..... যদি জনাব সোহ্রাওয়ার্দী দেশে বিরোধী দল সংগঠিত না করিতেন, তবে এতদিনে পাকিস্তানে পুরাদস্তুর একনায়কতন্ত্র কায়েম হইয়া যাইতো। জনাব সোহ্রাওয়ার্দীর ইন্তেকালের সহিত মুসলিম সোনালী যুগেরও অবসান ঘটিয়াছে।'

'দেশবাসীকে বলো, আমি বিশ্বাসঘাতক নই'

সম্মিলিত বিরোধীদলের সম্পাদক জনাব কামরুজ্জামান বলেন, জনাব সোহ্রাওয়ার্দী সংগ্রামী জীবনের প্রারম্ভে যে গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই গণতন্ত্রের জন্যই সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। জনাব সোহ্রাওয়ার্দী সম্মুখ সংগ্রামে বিশ্বাস করিতেন; কোনোদিন তিনি খিড়কির দরজা দিয়া ক্ষমতাসীন হন নাই। .... যে মহামনীষী পাকিস্তান কায়েম করেন তাঁহাকেই সেই দেশেরই কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইহার চাইতে ভাগ্যের পরিহাস আর কি হইতে পারে! সেদিন মরহুমের চোখে অশ্রু দেখা গিয়াছিল। দুঃখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'আজ আমাকেই পাকিস্তানের দুশমন বলিয়া চিহ্নিত করা হইতেছে।' সেইদিন জনাব সোহ্রাওয়ার্দী আমাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন, 'কামরু, দেশ ও দেশবাসীকে গিয়া বলো আমি বিশ্বাসঘাতক নই, পাকিস্তান ও পাকিস্তানবাসীদের আমি ভালোবাসি।'

সোহ্রাওয়ার্দীর সেবা ভুলিবার নয়

কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আবদুল্লাহ্ আল মাহমুদ আবেগপূর্ণ ভাষায় জনাব সোহ্রাওয়ার্দীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন এবং মরহুমকে আজাদী সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা এবং একাধারে সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ মানুষ বলিয়া অভিহিত করেন। জনাব মাহ্মুদ ১৯৩১ সালে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বন্যার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সে সময় বন্যাদুর্গত মানুষের সেবায় জনাব সোহ্রাওয়ার্দী যেভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইবার নয়।.... ১৯৪৩ সালে জনাব সোহ্রাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার খাদ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। বাংলাদেশে সে সময় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং জনাব সোহ্রাওয়ার্দী তখন লঙ্গরখানা খুলিয়া এবং নানাভাবে সাহায্য দিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

সকলে অভাব অনুভব করিবে

পাকিস্তানের অর্থসচিব জনাব মোহাম্মদ শোয়েব বলেন, জনাব সোহ্রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে এ দেশের রাজনৈতিক জীবনে বিরাট ক্ষতি সাধিত হইলো। তিনি দেশের প্রধানতম পদে আসীন ছিলেন এবং বিপুল সংখ্যক অনুসারীর মনে চিরস্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। প্রত্যেকেই তাঁহার অভাব অনুভব করিবে।

www.pathagar.com

যে কোনো মানের বিচারে তিনি মহাপুরুষ

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জনাব খুরশীদ বলেন, 'মতপার্থক্য যাহাই হউক না কেন, যে কোনো মানের বিচারে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন একজন 'মহাপুরুষ' এবং তাঁহার মৃত্যুতে পাকিস্তান একজন 'মহান জাতীয় নেতাকে হারাইল। .... জনাব খুরশিদ বলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী জাতির জন্য যাহা করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকিবে।'

শূন্য আসন পূরণ করিবে কে?

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, 'জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুসংবাদ আমার নিকট একটা বিরাট আঘাতস্বরূপ। তিনি ছিলেন একজন মহান নেতা, প্রাজ্ঞ আইনজীবী ও বিরাট ব্যক্তিত্বশালী ব্যক্তি। পাকিস্তান সৃষ্টিতে তাঁহার ছিলো বিরাট ভূমিকা। তাঁহার এই শূন্য আসন সহজে পূরণ হইবার নহে।'

সকল মহলের ওপর সমান প্রভাব

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জেড. এ. ভুট্টো বলেন, 'জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন একজন অতীব ব্যক্তিত্বশালী নেতা। সাহস, সংকল্প এবং বিজ্ঞতা প্রভৃতি যে সমস্ত অপরিহার্য সহজাত গুণ একজন জাতীয় নেতার থাকা আবশ্যক, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর তাহা ছিলো। জনগণের হৃদয়ে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করিলেও ইহাতে বুদ্ধিজীবী মহলের ওপর তাঁহার প্রভাব এতটুকু ক্ষুণ্ন হয় নাই। আপোষহীনকেও আপোষ-মীমাংসায় রাজি করানোর ক্ষমতার মধ্যেই তাঁহার শক্তির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য নিহিত ছিলো। সর্বোপরি সকল অবস্থাতেই তিনি সকল মহলের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন।'

তাঁহার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিতে হইবে

বিরোধী দলের সদস্য জনাব মাহবুবুল হক বলেন, 'যে আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য মহান নেতা জীবন-ভর সংগ্রাম করিয়াছেন, সেই আদর্শকে কার্যে পরিণত করার জন্য আমরা পুনরায় আত্মোৎসর্গ করিবো। আমরা মহান নেতার সম্পর্কে যাহা কিছু চিন্তা করি, সবকিছুই বাস্তবায়িত করিতে হইবে। .... নেতৃবৃন্দের মৃত্যুর সঙ্গে গণতন্ত্রের সংগ্রামের অবসান হইবে না। দেশের বর্তমান রাজনীতিকগণ নিজেদের পারস্পরিক বিভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হইলে আজও মহান নেতার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে।

চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে হইবে

বিরোধীদলীয় সদস্য সৈয়দ আবদুস সুলতান বলেন, গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের জন্য জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী যে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শহীদ নামের সার্থকতা অর্জিত হইয়াছে। দেশের সর্বাধিক মূল্যবান সন্তান, হৃদয় ও মস্তিষ্কের অপূর্ব গুণের অধিকারী জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর ইন্তিকালে আজ জাতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইয়াছে। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে হইবে।

সোহ্‌রাওয়াদীকেই দেওয়া হইলো রাষ্ট্রদ্রোহের অপবাদ!

জনাব হোসেন মনসুর বলেন, এই উপমহাদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কায়েদে আজমের পরেই ছিলো তাঁহার স্থান। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এমন একজন মহান নেতাকে সেদিন রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপবাদ দিয়া গ্রেফতার করা হইয়াছিল। তাঁহার মতো

www.pathagar.com

একজন নিঃস্বার্থ দেশবরেণ্য জননেতার পক্ষে এই আঘাত সহ্য করা কঠিন ছিলো। প্রকৃতপক্ষে, এই অভিযোগ অনিয়মের ফলে তিনি যে তীব্র মানসিক আঘাত পান, তাহাতে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে, আর সেখান হইতেই তাঁহার হৃদরোগের শুরু।

নিঃসঙ্গভাবে জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হইলো

বিরোধীদলীয় সদস্য জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, হজরত মোহাম্মদ-এর (দঃ) পর হজরত ওমর (রাঃ) যেমন রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি কায়েদে আজমের পর জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী একমাত্র ব্যক্তি—যিনি পাকিস্তানে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে আসন লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু তৎপরিবর্তে তাঁহাকে 'এবডো'র অভিশাপ বহন করিয়া বৈরুতের নির্জন কক্ষে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

আমাদের সংগ্রাম চলিতে থাকিবে

বিরোধীদলীয় সদস্য জনাব সাইদুজ্জামান বলেন, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী, জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই দান রাখিয়া গিয়াছেন। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে জাতির এক নূতন সঙ্কট দেখা দিয়াছে। এই সঙ্কট হইতেছে নেতৃত্বের সঙ্কট। সংগ্রামের যে পতাকা আজ অর্ধনমিত-অবনমিত, তাহা আমরা সমুন্নত করিয়া রাখিব। আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে।

ক্ষমতার দাপট ইজ্জত দান করে না

বিরোধী দলের মিয়া আবদুল বারী বলেন, আজাদী এবং গণতন্ত্রের ধারক জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ইন্তিকাল করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ক্ষমতা ইজ্জত দান করে না; দাপট দেখাইয়া জনতার নিকট হইতে ইজ্জত আদায় করা যায় না। যিনি জনসাধারণের সত্যকারের বন্ধু এবং যিনি জনসাধারণের জন্য কোরবানী করেন, তিনিই ইজ্জত লাভ করেন। মৌলিক অধিকার ও ভোটাধিকার লইয়া যে নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, সেই পরিস্থিতিতে ইন্তিকাল করিয়া জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী জাতিকে এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন করিয়াছেন।

'আমরা পিতৃহারা হইয়াছি'

বিরোধী দলের জনাব মসিউর রহমান বলেন যে, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর ইন্তিকালে বস্তুত আমরা পিতাকেই হারাইয়াছি। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী কাহারও বিরুদ্ধে কোনো ঈর্ষা পোষণ করেন নাই।

সকলের নিরাপত্তা বিধান ছিলো তাঁহার ধর্ম

সরকারি সদস্যা বেগম মোহাম্মদ আলী মরহুমের প্রতি শ্রাদ্ধা জ্ঞাপন করিতে উঠিয়া কিছুতেই কান্না থামাইতে পারেন নাই। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী অতি অভিজাত বংশোদ্ভূত হইয়াও নেহাৎ সাধারণ মানুষকেও ভালো বাসিতেন।

বেগম আলী দেশে যেন আরও সোহ্‌রাওয়ার্দী জন্ম নেন, সেইজন্য আল্লাহর দরগায় মোনাজাত করেন।

জীবনে তাঁহার গুণাবলী আদৃত হয় নাই

সরকারি দলের সদস্যা বেগম জারী সরফরাজ বলেন, যতদিন পাকিস্তান থাকিবে, ততদিন আমাদের বংশধররা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর দানের কথা

www.pathagar.com

স্মরণ করিবে। সোহ্‌রাওয়ার্দীর জীবদ্দশায় তাঁহার গুণাবলী যথাযথ আদৃত হয় নাই; আজ মৃত্যুর পর তাঁহার প্রশংসা করা হইতেছে।

দেশবাসী কোনোদিন ভুলিতে পারিবে না

জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব এম. আর. সিদ্দিকী বলেন, 'পাকিস্তান অর্জনের ব্যাপারে ১৯৪৬-৪৭ সালে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী যাহা করিয়াছেন, বিশেষভাবে বাঙলা তাহা কোনোদিন ভুলিতে পারিবে না। জাতি চিরদিনই গভীর সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার অবদানের কথা স্মরণ করিবে।'

ভাগ্যের পরিহাস, তাঁহাকেও জেলে যাইতে হয়

জনাব কামরুল আহসান (সিলেট) বলেন যে, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর অভাবে পাকিস্তান আরও নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। মরহুম প্রধানমন্ত্রী বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি, দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা ও গতিশীল রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। পরাজয় কি জিনিস, তাহা জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী কখনও জানেন নাই, ১৯৪৬ সালে বাংলাদেশে মুসলিম লীগের জয়ের কৃতিত্ব তাঁহারই প্রাপ্য। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, সোহ্‌রাওয়ার্দীর মতো লোককেও কারাবরণ করিতে হয়। দেশের জন্য ইহা অত্যন্ত কলঙ্কজনক অধ্যায়।

জাতীয় সংহতিই ছিলো তাঁর লক্ষ্য

পরিকল্পনা বিভাগীয় পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি মালিক খিজির হায়াত খান বলেন, মরহুম জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীই ছিলেন পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় তাঁহার দান ছিলো অদ্বিতীয়। জাতীয় সংহতিই ছিলো এই মহান নেতার একমাত্র লক্ষ্য এবং এই জাতীয় সংহতির জন্যই তিনি সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন।

আবদুল আজীজ

জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আবদুল আজিজ বলেন, জাতির এই সঙ্কট সময়ে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর ন্যায় একজন প্রতিভাশালী নেতাকে হারানো সত্যই একটি মর্মান্তিক ঘটনা।

সৈয়দ হাবিবুল হক

জাতীয় পরিষদ সদস্য সৈয়দ হাবিবুল হক বলেন, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী একজন মহাপুরুষ ছিলেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁহার অপূর্ব অবদান রহিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে পাকিস্তান উহার অন্যতম প্রধান কৃতী সন্তানকে হারাইল।

আব্বাস আলী খান

জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, পাকিস্তান আরও একজন মহাপুরুষকে হারাইল। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী এক মহান জননেতা, প্রজ্ঞাসম্পন্ন আইনবিশারদ এবং বিশিষ্ট প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন। যদিও গত কিছুদিন তিনি পাকিস্তানের বাহিরে ছিলেন, তথাপি তিনি খাঁটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামকারীদের অনুপ্রেরণাস্বরূপ ছিলেন।

লুৎফর রহমান খান

জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব লুৎফর রহমান খান বলেন, পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য তাঁহার দান অপরিমেয়। তাঁহার মৃত্যুতে দেশ একজন মহান নেতাকে হারাইল এবং আমি আমার পৃষ্ঠপোষককে হারাইলাম।

www.pathagar.com

এরফান রেজা চৌধুরী

জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব এরফান রেজা চৌধুরী বলেন, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী শুধু পাকিস্তানে নন, বরং সমগ্র এশিয়ার প্রথমসারির নেতাদের অন্যতম ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহার দান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ফকরুদ্দীন আহ্‌মদ

জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব ফকরুদ্দীন আহ্‌মদ বলেন, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক প্রতিবাদীরাও তাঁহার অসাধারণ রাষ্ট্রনায়কসুলভ দক্ষতা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং সর্বোপরি পাকিস্তান সৃষ্টিতে তাঁহার অবদানের কথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

আখতারউদ্দীন আহ্‌মদ

'গণতান্ত্রিক দুনিয়া একজন মহান নেতাকে হারাইল। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে একজন বীর-সেনানী ছিলেন।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

‘তাঁর স্মৃতির সুরভি চিরকাল আমাদের আমোদিত রাখিবে’

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ফুলবেঞ্চ পরলোকগত নেতার আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রাজনীতিক এবং আইনজ্ঞ হিসেবে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার উল্লেখ করিয়া সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ. আর. কর্নেলিয়াস এই উপলক্ষে বিচারপতিদের পক্ষ হইতে বলেন, ‘মৃত্যুর হিমশীতল পরশে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ঢলিয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু তাঁহার স্মৃতির সুরভি চিরকাল আমাদের আমোদিত রাখিবে। সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে জনসাধারণের সেবা করিয়া জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে তিনি বাংলার রাজনৈতিক গগনে নিজেকে গৌরবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। কলিকাতা বারে তাঁহার স্থান ছিলো অতি সম্মানিত। কিন্তু জনসেবাই ছিলো তাঁহার লক্ষ্য। আর এই সেবায় তিনি যে ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; তাহা শুধু তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। জীবনে বিপর্যয় আসিয়াছে, দুঃখ আসিয়াছে, কিন্তু যে অম্লান বদনে এবং সাহসিকতার সহিত তিনি তাহা অতিক্রম করেন, তাহা অতুলনীয়।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বিশ্বের অন্যান্য দেশের নায়কেরা উপলব্ধি করেন যে, পাকিস্তান একজন নেতা পাইয়াছে—যাঁর সঙ্গে সমান মর্যাদার ভিত্তিতে তাঁহাদের আলোচনা করিতে হইবে। কারণ তাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন। আর তিনিও জানিতেন তাঁহাদিগকে। ১৯৬২ সালে তাঁহার কারারুদ্ধ হওয়ার পূর্বপর্যন্ত এই আদালতে তাঁহার মামলা পরিচালনা এবং অপূর্ব যুক্তি প্রদর্শন দেখার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। যে অসীম ক্ষমতা, যে অপূর্ব সাহসিকতা এবং যে দক্ষতার সহিত তিনি তখনকারদিনের সবচাইতে জটিল মামলাগুলি পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহা কৃতজ্ঞচিত্তে আমরা স্মরণ করি। কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি আদালতে শুধু তিনি যুক্তিই প্রদর্শন করিতেন না; সমগ্র সত্তা এবং বুদ্ধিমত্তা নিয়োজিত করিয়া ইহার মধ্যে তিনি একটি ‘কারণ’ দাঁড় করাইতেন।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রাণ ছিলো চিরসতেজ, চিরসবুজ। আজ সেই প্রাণের স্পন্দন চিরতরে থামিয়া গিয়াছে। যে নিষ্ঠুর হৃদরোগ তাঁহার বক্ষে বাসা বাঁধে, তা আমাদের নিকট হইতে বহু দূরে, বিদেশে নির্জনে তাঁহার সিংহহৃদয় চিরতরে নিস্তব্ধ করিয়া দিয়াছে।’

প্রতিটি বিষয় তাঁর নখদর্পণে!

এটর্নী জেনারেল জনাব তোফায়েল আলী আব্দুর রহমান আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন যে, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর ইন্তিকালের সংবাদ পাইয়া তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন। মরহুম নেতা ছিলেন বহুমুখী ব্যক্তিত্ব ও দীপ্তিমান বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, মহান রাজনীতিবিদ ও সেরা আইনজ্ঞ। কখন কিভাবে মানুষের জীবনাবসান হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে না—বিধাতার এই বিধান মানুষের কাছে দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর অকাল মৃত্যু হইয়াছে; কারণ জাতি তাঁহাকে এ সময় বিদায় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। আদালতকক্ষে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রভাব এতই প্রবল ছিলো যে, যখনই তিনি কোনো

www.pathagar.com

মামলায় কৌঁসিলীরূপে উপস্থিত থাকিতেন, গোটা আদালত যেন তাঁহার পক্ষে চলিয়া যাইত। একটি মামলায় আমি জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর জুনিয়র হিসাবে কাজ করার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমার আজও মনে আছে, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর কাছে যখন আগের রাত্রে মামলার নথিপত্র পেশ করি এবং উহার খুঁটিনাটি বিষয় তাঁহাকে শুনাইতেছিলাম, তখন মনে হইতেছিলো যেন জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু পরদিন সকালে আদালতকক্ষে দেখা যায় যে, মামলার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর নখদর্পণে।

'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান নিরূপণ দুঃসাধ্য'

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রতি ঢাকা হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চ গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই উপলক্ষে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব ইমাম হোসেন চৌধুরী বলেন, 'জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তানের একজন বিশিষ্ট ও সুযোগ্য সন্তান।'

তিনি বলেন, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর অবদান এত অসীম যে, তাহা নিরূপণ করা প্রায় দুঃসাধ্য। প্রবল বাধা-বিপত্তির মধ্যে সংগ্রাম চালাইয়া তাঁহাকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছিল।'

প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, 'তিনি ছিলেন একজন বিরাট পুরুষ। আইনজীবী হিসাবে তাঁহার যোগ্যতা ছিলো অসাধারণ এবং তিনি অতিসহজেই আইনগত বিষয়ের মূলে প্রবেশ করিতে পারিতেন। আমরা আজ একজন মহাপ্রাণকেই শুধু হারাইলাম না, সেই সঙ্গে একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ও মহান জাতীয় নেতাকেও হারাইলাম। তাঁহার মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অদূর ভবিষ্যতে পূরণ করা যাইবে না।'

তিনি আরও বলেন, 'জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর শিক্ষা ও জ্ঞান ছিলো অনন্যসাধারণ। আইনজীবী ও জাতীয় নেতা হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আইনজীবী বিশেষত, তরুণ আইনজীবীদের নিকট তিনি ছিলেন উৎসাহের উৎসস্থল। তাঁহার মৃত্যু সমগ্র জাতির প্রতি এক মারাত্মক আঘাতস্বরূপ।

যতদিন গণতন্ত্র টিকিয়া থাকিবে ততদিন ....

এডভোকেট জেনারেল জনাব মকসুমুল হাকিম ইতিপূর্বে মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে দেশের অন্যতম মহান আইনজীবী বলিয়া অভিহিত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মরহুমের কার্যাবলী এবং কলিকাতার দাঙ্গাপীড়িত জনসাধারণের সেবার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জাতি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে এবং দেশে যতদিন গণতন্ত্র টিকিয়া থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সোহ্‌রাওয়ার্দীর অবদান কখনও বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া যাইবে না।

www.pathagar.com

পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের শ্রদ্ধা

পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের (করাচী বেঞ্চ) ফুল বেঞ্চ মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সিনিয়র জজ বিচারপতি জনাব ইনামুল্লাহ্ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং উহাতে মোট ৮ জন বিচারপতি উপস্থিত ছিলেন। সিনিয়র জজ বিচারপতি জনাব ইনামুল্লাহ্ খান তাঁহার সহকর্মীদের পক্ষ হইতে মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন যে, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে আদালত একজন মহান এডভোকেট, তাঁহার বন্ধু-বান্ধব একজন অকৃত্রিম বন্ধু, তাঁহার কন্যা একজন সন্তান-বৎসল পিতা এবং পাকিস্তান একজন মহান দেশপ্রেমিককে হারাইল।

তিনি সোহ্‌রাওয়ার্দীর আদর্শ অনুসরণের জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানান।

করাচী হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় মরহুমের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। বিশিষ্ট এডভোকেট জনাব হাসান আলী এ. রহমান. সরকারি উকিল শেখ নাসিরউদ্দিন প্রমুখও মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ঢাকা হাইকোর্ট বারের শ্রদ্ধা

ঢাকা হাইকোর্ট বার সমিতির এক জরুরী সভায় জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে গভীর শোক জ্ঞাপন করা হয়। হাইকোর্ট বার সমিতির সভাপতি জনাব তোফাজ্জল আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় শোক জ্ঞাপন করিয়া বলা হয়, দেশের ইতিহাসের চরম জটিল মুহূর্তে এমন এক ব্যক্তিকে আমরা হারাইয়াছি—যিনি ছিলেন একাধারে যশস্বী আইনবিদ, মহান দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামের নিঃস্বার্থ সৈনিক, পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, গণতন্ত্র ও জনগণের ব্যক্তি-স্বাধীনতার নির্ভীক সংগ্রামী এবং দরিদ্র ও ক্ষুধাতুর ব্যক্তিদের খাঁটি ও অকৃত্রিম দরদী।

জেলা বার সমিতি

জনাব আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে ঢাকা জেলা বার সমিতির এক অতিরিক্ত সাধারণ সভায় পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর দুঃখ ও বেদনা প্রকাশ করিয়া বলা হয় যে, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী গণতন্ত্রের অগ্রনায়ক, জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অপরাজিত বীরপুরুষ এবং দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিরামহীন সৈনিক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পাকিস্তান একজন অপূর্ব ব্যক্তিত্বশালী ও দক্ষ নেতা এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনবিদকে হারাইয়াছে। এই উপমহাদেশে মুসলিম জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ পুনর্জাগরণ এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর অবদান একক ও অনবদ্য। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর ন্যায় জাতীয় নেতার তিরোধানে জাতীয় জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইলো, উহা পূরণ হওয়া কঠিন। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর ঘটনাবহুল জীবন

www.pathagar.com

দেশের গণতন্ত্রমনা জনগণের জন্য আলোকস্তম্ভ হিসাবে কাজ করিবে।

বার সমিতির সভাপতি

পাকিস্তান বার সমিতির সভাপতি জনাব নূরুল হুদা বলেন, 'জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন একজন জ্যোতিষ্মান আইনজ্ঞ, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ অবিসংবাদিত মুক্তিসেনা এবং পাক-ভারত উপমহাদেশের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক মহাপুরুষ।'

তোফাজ্জল আলী

ঢাকা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব তোফাজ্জল আলী এক শোকবাণীতে বলেন, 'জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর আকস্মিক মৃত্যুতে জাতি একজন মহান নেতা ও মহাপুরুষকে হারাইল। তিনিই ১৯৪৭ সালের জুন মাসে দিল্লিতে মুসলিম লীগ সম্মেলনে পাকিস্তান দাবি সমর্থন করিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং ১৯৪৬ সালের অবিভক্ত বাংলার নির্বাচনে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক বিজয়ের তিনিই ছিলেন প্রধান সংগঠক, মহাপণ্ডিত। শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ এবং সাধারণ মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতার মহান যোদ্ধা জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী নির্যাতিত জনগণের আশার প্রতীক ছিলেন। জাতির পক্ষে তিনি ছিলেন মহান পথপ্রদর্শক।'

বিচারপতি আমীন আহমদ

সাবেক প্রধান বিচারপতি আমীন আহমদ বলেন, 'জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যু দেশের রাজনীতি ও আইনের ক্ষেত্রে যে শূন্যস্থান সৃষ্টি করিল তাহা পূরণ করা কষ্টকর হইবে।'

বিচারপতি জনাব ইব্রাহীম

সাবেক বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীমকে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যু সংবাদ জানান হইলে তিনি শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া ফেলেন এবং বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'এ দুঃসহ দুর্বিপাকের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলো না। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন মহাপুরুষ। বর্তমান সঙ্কট মুহূর্তে তাঁহার নেতৃত্বেরই প্রয়োজন ছিলো সর্বাধিক। অপূর্ব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে জাতির যে ক্ষতি হইলো, সে ক্ষতি পূরণ হইবার নয়।'

জনাব আবদুল জব্বার খান

প্রাদেশিক কনভেনশন লীগের প্রেসিডেন্ট ও সাবেক বিচারপতি জনাব আবদুল জব্বার খান বলেন, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন একজন মহান নেতা।

তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বীর সৈনিক। 'মহামানব' ও 'মহান দেশপ্রেমিক' জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর স্থান পূরণ করা বড়ই কঠিন হইবে।'

www.pathagar.com

মনের কোণে হাজারো স্মৃতির ভিড়

জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর তিরোধানে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে মরহুমের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পরিষদে আনুষ্ঠানিক শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর এই দিনের মতো অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

এই উপলক্ষে মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়া পরিষদের স্পীকার জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'গত ৫ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর আকস্মিক ইন্তিকালের সংবাদ পাকিস্তানে পৌঁছার সাথে সাথে সমগ্র জাতির জীবন-প্রবাহ যেন অবরুদ্ধ, মহাকালের চিরন্তন প্রবাহ যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। সেদিন বিকাল পাঁচটা। পরিষদের সেক্রেটারিকে নিয়ে নিজ ডেস্কে বসে আমি তখন কাজে ব্যস্ত।

হঠাৎ খবর পেলাম, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী আর ইহজগতে নেই। সঙ্গে সঙ্গে কাজ বন্ধ করে সেক্রেটারিকে বিদায় দিলাম। শরবিদ্ধ অন্তঃকরণে নীরবে কেবল অশ্রুই বিসর্জন করলাম। রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর সান্ধ্যকালীন যাবতীয় অনুষ্ঠান বাতিল করলেন, প্রাদেশিক গভর্নর তাঁর সাংবাদিক সম্মেলন স্থগিত রাখলেন, সাধারণ মানুষও কাজ-কর্ম ফেলে হতবাক হয়ে রইলো। ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নিচু এক কাতারে দাঁড়িয়ে শোকে-দুঃখে ভেঙ্গে পড়লো। দেশের প্রতিটি মানুষ জাতির এই অপূরণীয় ক্ষতিতে মুষড়ে পড়লো, গণ্ড বেয়ে তাদের অঝোর ধারায় নেমে এলো শোকাশ্রু।

বিমানবন্দরেও সেই একই দৃশ্য, একই একতা। জানাজার নামাজে, সমাধি প্রাঙ্গণেও সেই একই দৃশ্য, একই একতা। জাতীয় ঐক্যের যে আহ্‌বান প্রতিনিয়ত তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হতো, মৃত্যুর পরেও জাতি সে আহ্‌বানে আবার সেই একইভাবে সাড়া দিলো।

সেদিন পরিষদ ও নিজের পক্ষ থেকে অশ্রুভরা চোখে পরলোকগত নেতার কফিনের ওপর যখন পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছিলাম, তখন হাজারো স্মৃতি এসে মনের কোণে ভিড় জমাচ্ছিল। কফিনের দিকে তাকাতেই স্মৃতির অর্গল যেন খুলে গেল। ভারাক্রান্ত মনে কেবল এ কথাই উদিত হতে লাগলো যে, যে কণ্ঠ এতদিন লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবনীশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছে, উৎসাহ যুগিয়েছে, চিরদিনের জন্য সে কণ্ঠ আজ নীরব। মনে পড়লো, পাকিস্তান হাসিলের জন্য ৪০নং থিয়েটার রোডের বারান্দায় বসে দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টা কি অপরিসীম পরিশ্রমই না তিনি করেছেন! মনে পড়লো, কোলকাতার রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা প্রশমিত করার জন্য দিনের পর দিন কিভাবে তিনি লালবাজার পুলিশ কোয়ার্টারের কন্ট্রোল রুমে কাটিয়েছেন। স্মৃতির পর্দায় আরও ভেসে উঠলো, সঙ্গী-সাথী, প্রহরী বর্জিত অবস্থায় কি দুর্বার সাহস নিয়ে তিনি চরম উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে অবস্থা তদারক করেছেন। জাতির জন্য যে প্রাণের মূল্য ছিলো অপরিসীম, নিজের কাছে সে প্রাণের যেন কোনো দামই নেই। সে প্রাণ তিনি উজাড়

www.pathagar.com

করে সঁপে দিয়েছিলেন দেশবাসীর সেবায়। আর সে সেবাব্রত পালন করতে গিয়ে নিজ জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্ন তিনি আমলে আনেননি কখনও। প্রদেশের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে গিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কিভাবে তিনি কাজ করেছেন, আজ আমার চোখের সামনেই তা ভাসছে। মুসলিম লীগের কাজ কেমন চলছে-না চলছে, তার বিস্তারিত খবরাখবর চেয়ে তিনি আমাদের যেসব পত্র লিখতেন, তাও আজ আমার চোখের সামনে ভাসছে। আজ মনে পড়ে, পাকিস্তান দাবির পেছনে সকলকে সামিল করার জন্য নৌকায় চড়ে ফরিদপুরের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সফরকালে সামান্য একটা স্যুটকেসকে টেবিল বানিয়ে মুসলিম লীগ কর্মীদের কাছে কিভাবে তিনি চিঠির পর চিঠি লিখে চলেছেন, তাঁর পাশাপাশি আবার হর্ষোৎফুল্ল জনতায় ঘেরা ৪০নং থিয়েটার রোডের সেই স্মরণীয় দিনটির কথাও আজ মনে পড়ে, যেদিন তিনি স্বনামধন্য পিতার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের জন্য গভর্নমেন্ট হাউসে গিয়েছিলেন।

আল্লাহ তাঁকে দিয়েছিলেন সোনালী হৃদয়, যে হৃদয়ে ছিলো মানুষের জন্যে দুর্লভ কোমলতা, আর সেই সঙ্গে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিপদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দুর্লভ দুর্বার সাহস। গভীর কর্তব্যবোধ আর দেশপ্রেম তাঁকে তার প্রিয় দেশবাসীর জন্যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত কর্মময় করে রেখেছিল।

মহান, উদার আর রাজোচিত গুণের অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি কি রাজা, কি প্রেসিডেন্ট, কি রাষ্ট্রপ্রধান সকলের সাথে তাঁদেরই মতো মর্যাদা বজায় রেখে সহজে ও অবাধে মিশতে পারতেন। আর তার চেয়ে কঠিন যে কাজ, সমান পর্যায়ে সাধারণ লোকের সঙ্গে মেশা, তাও তিনি পারতেন।

মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনকালে মরহুমের সাহচর্যের কথা মনে পড়ায় বারংবার স্পীকারের কণ্ঠ আবেগরুদ্ধ হয়ে পড়ে। নিজেকে সামলাবার জন্য তাঁকে যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয় এবং বারবার থেমে ধীরে ধীরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁকে শোক প্রস্তাবটি পাঠ করতে দেখা যায়। এই সময়ে পরিষদে উপস্থিত সদস্য, দর্শক, সাংবাদিক সকলেই বিশেষ অভিভূত হয়ে পড়েন এবং সমগ্র পরিষদে শোকের ছায়া এবং স্তব্ধতা নেমে আসে। সকলেই শ্বাসরুদ্ধ করে স্পীকারের ভাষণ শুনতে থাকেন এবং বারবার তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। মনে হতে থাকে যেন এখনই তিনি প্রবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন।

মরহুমের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে স্পীকার বলেন, পার্লামেন্টারি ঐতিহ্যের প্রতি বিরাট বিশ্বাসবান বলেই তাঁর মতের বিপরীত অভিমত প্রকাশকারী ব্যক্তির প্রতি তাঁর যুক্তিবাদিতা আর বিবেচনা সকলের অনুকরণীয় ছিলো। তাঁর বক্তৃতা এত নিষ্কলুষ আর উঁচুদরের ছিলো যে, দুনিয়ার যেকোনো দেশের পার্লামেন্ট তাঁকে পেলে তার শক্তি, প্রজ্ঞা আর মর্যাদা বাড়বে বলে মনে করতে পারতো। এই উপমহাদেশে তাঁর পার্লামেন্টারি বিতর্ক শ্রেষ্ঠতম বিতর্কের অন্তর্গত বলে বিবেচিত হতো। তাঁর বক্তৃতার প্রবাহ সবসময় ছিলো সহজ আর যুক্তিপূর্ণ, আর তা তিনি একটার পর একটা পেশ করে যেতেন এবং তা কখনো কারো মর্যাদায় আঘাত করতো না বা কখনো তাঁর কোনো পয়েন্ট হারিয়ে যেতো না। কি পার্লামেন্ট, কি আদালত সর্বত্রই তিনি অতি প্রাঞ্জল ভাষায়, যুক্তিযুক্তভাবে এবং কখনো কখনো ঘন্টার পর ঘণ্টা অন্যের মনে দাগ কাটার মতো করে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে পারতেন।

www.pathagar.com

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন একাধারে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক, রাজনৈতিক চিন্তাবিদ, অনন্যসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন পার্লামেন্টারিয়ান এবং অতুলনীয় প্রতিভাবান আইনজ্ঞ। রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বহুদিন আইনের ক্ষেত্র থেকে তাঁকে দূরে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু ইদানীং তিনি যখন আবার আইনের ব্যবসায়ে ফিরে গেলেন, তখন দেখা গেল যে, সেখানেও তাঁর জুড়ি নেই। বস্তুত, পাকিস্তানের প্রতিটি ঐতিহাসিক মামলার সঙ্গে তিনি আদালতে হাজির হন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত এক বনেদী অভিজাত বংশে সমারোহ আর আরামের মধ্যে তাঁর জন্ম। কিন্তু জনসেবার বেদীমূলে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আরাম ও আনন্দকে কোরবানী দেন। লোকের সুখেই তিনি সুখী হতেন। লোকে আরাম পেলেই তিনি আরাম পেতেন। তাঁর খোলা হাতের দান যেকোন সাহায্য প্রার্থীর কাছে যেয়ে পৌঁছতো। নিজের বলতে তাঁর মহান পরিবারের বনেদী সংস্কৃতি ছাড়া আর কিছু ছিলো না।

উপসংহারে শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী বলেন, 'যাঁর জীবনটাই একটি পরিপূর্ণ ইতিহাস, তাঁর আকস্মিক তিরোধানে গোটা পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষ হৃদয়ে যে-নিদারুণ আঘাত অনুভব করেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা দূরের কথা—ভাষার সাহায্যে তা ব্যক্ত করার কথাও যে আমি চিন্তা করতে পারি না। দেশ ও দেশবাসীর প্রতি তাঁর অবদান এতই বিরাট ও ব্যাপক যে, ভাষার সাহায্যে তার স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। গোটা জাতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁর জীবনব্যাপী ত্যাগ ও আদর্শের কথা স্মরণ করবে।'

পরিষদের নেতার শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্পীকারের প্রস্তাব শেষে পরিষদের নেতা জনাব হাফিজুর রহমান স্পীকারের প্রস্তাবে ঐকমত্য জানিয়ে বলেন যে, মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন বিরাট রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী এবং আমাদের সময়ের অন্যতম মহান রাজনীতিক। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেশ একজন মহান মুক্তিযোদ্ধাকে হারিয়েছে।

মুসলিম বাংলার জন্য মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীর সেবার প্রসঙ্গে পরিষদের নেতা দাঙ্গার সময় মুসলমানদের বাঁচানোর জন্য মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দী কিভাবে কলিকাতার উন্মত্ত জনতার মাঝে ঘুরে বেড়ান, তার উল্লেখ করেন। তাঁর জনপ্রিয়তার উদাহরণ দিতে যেয়ে জনাব হাফিজুর রহমান বলেন যে, ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে একসঙ্গে দুই কেন্দ্র থেকে জয়লাভ তাঁর জনপ্রিয়তার পরিচয় বহন করে।

বিরোধী দলের নেতার শ্রদ্ধার্ঘ্য

মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে বিরোধী দলের নেতা জনাব আফসারউদ্দীন আহমদ বলেন, এই উপমহাদেশের যে কয়জন মহান সন্তান পদদলিত মুসলমানদের জন্য লড়াই করেছেন, মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন, তাঁদেরই একজন। এদেশের মুসলিম জাগরণ তিনিই আনেন। তিনিই তাদের চোখ খুলে দেন।

ধরা গলায় তিনি আরও বলেন, এদেশে গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির জন্য আর ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব মোতাবেক সরকারের ধাঁচ তৈরির জন্য মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দী অবিরাম পরিশ্রম করেন। মানুষের সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনা তাঁর ঈমানের অঙ্গ ছিলো। রুগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও তিনি এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

www.pathagar.com

জনাব আফসারউদ্দীন বলেন, যে মঞ্জিল মকসুদে পৌঁছানোর জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, সেই লক্ষ্য অর্জন করাই হবে এই মহান নেতার প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন।

পরিষদের নেতা ও বিরোধী দলের নেতা ছাড়াও উভয় পক্ষের প্রায় ১০/১২ জন সদস্য জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁরাও জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মহান নেতৃত্ব, বিরাট রাজনৈতিক জ্ঞান, অসীম বাগ্মিতা ও সর্বোপরি মানবতাবোধের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং তাঁকে নেতার নেতা বলে অভিহিত করেন।

আবদুস সালাম

প্রাদেশিক রাজস্বমন্ত্রী জনাব আবদুস সালাম বলেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে অকৃত্রিম অবদানের জন্য জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী অমর হইয়া থাকিবেন। শহীদের ইন্তিকাল একটি জাতীয় ক্ষতি এবং তাঁহার মৃত্যুতে দেশ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্বকে হারাইয়াছে।

জনাব গমিরুদ্দীন প্রধান

পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সিনিয়র ডেপুটি স্পীকার জনাব গমিরউদ্দীন প্রধান বলেন, পাকিস্তানবাসীর অন্তরে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর স্মৃতি চিরকাল জাগরুক থাকিবে। অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার শূন্যস্থান পূরণ হইবে না। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানী ও আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন নেতা।

ভবানী শংকর বিশ্বাস

প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মিস্টার ভবানী শংকর বিশ্বাস বলেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতপার্থক্য সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে আমরা সত্যই দেশ-মাতৃকার খোদাপ্রদত্ত প্রতিভাসম্পন্ন একজন কৃতী সন্তানকে হারাইলাম।

জনাব মফিজউদ্দীন আহমদ

প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব মফিজউদ্দীন আহমদ বলেন, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর ছিলেন একজন মহান নেতা ও বিরাট ব্যক্তিত্বশালী লোক। স্বতন্ত্র আবাসভূমি সৃষ্টির ব্যাপারে মুসলিম লীগের সন্ধিক্ষণে তিনি যে অবদান রাখিয়াছেন, জাতি কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্মরণ করিবে। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর ন্যায় মর্যাদাসম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্বশালী লোকের জন্য যেকোনো জাতিই গৌরব বোধ করিতে পারে। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার শূন্যস্থান পূরণ খুবই কঠিন হইবে।

জনাব ফজলুল কবীর চৌধুরী

প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব ফজলুল কবীর চৌধুরী বলেন, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন আজাদী আন্দোলনের প্রথম কাতারের সৈনিক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন আইনজীবী।

জনাব হাসান আলী

সরকারি সদস্য জনাব হাসান আলী বলেন, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার মৃত্যুতে পাকিস্তান একজন মহান জাতীয় নেতাকে হারাইল।

জনাব হাসান আলী বলেন, সোহ্‌রাওয়ার্দী চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার মতাদর্শ আর

www.pathagar.com

তাঁহার অনুসারীদের নিকট ইহাই হইতেছে প্রধান উপজীব্য।

বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী

বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী (বিরোধী দল) দৃঢ় চরিত্র গঠনের জন্য জাতির প্রতি আহ্বান জানান। তিনি খেদের সঙ্গে বলেন যে, দুর্ভাগ্যবশত জনসাধারণ জাতীয় বীরদের জীবদ্দশায় তাঁহাদের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দান করে না।

জনাব এম. আর. সিদ্দিকী

জনাব এম. আর. সিদ্দিকী (চট্টগ্রাম, বিরোধী দল) জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের উল্লেখ করে বলেন, প্রাক-আজাদী যুগে কলিকাতার দরিদ্র মুসলমানদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী অনেক কিছু করিয়াছেন। তিনি আদর্শবাদী লোক ছিলেন এবং তাঁহার আদর্শের জন্য সংগ্রাম করার মতো সাহস ছিলো।

জনাব আবদুর রশীদ

বিরোধীদলীয় সদস্য জনাব আবদুর রশীদ বলেন, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবেন।

তিনি বলেন যে, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর লন্ডনে অবস্থানকালীন তিনি যখন তাঁহাকে দেখিতে যান, তখন জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী তাহাকে বলিয়াছিলেন, নেতৃবৃন্দ এবং দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিতে বলো এবং যতদিন পর্যন্ত গণতন্ত্র ফিরাইয়া আনা সম্ভব না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবার জন্য বলিও।

ফয়েজ আহমদ

পূর্ব পাকিস্তান শ্রম ফেডারেশনের সভাপতি জনাব ফয়েজ আহমদ বলেন, কলিকাতায় সুদীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত আমি জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সহিত বিবিধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। একজন জননেতা ও অবিভক্ত বাংলার শ্রমমন্ত্রী হিসাবে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী শ্রমিক সংগঠনে যে অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, উহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। পাকিস্তানের শ্রমিক সমাজের পক্ষ হইতে আমি তাঁহার আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

মওলানা আবদুল হাই

ইসলামী উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মওলানা আবদুল হাই এক শোকবাণীতে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে পাক-ভারত উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন, জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন আমাদের সকলেরই মুরুব্বী। তাঁহার মধুর ব্যবহার তাঁহাকে সকলের নিকট প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

মওলানা আবদুল হাই ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সহিত কাজ করেন। তিনি জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মহাপ্রয়াণকে একটি 'অপূরণীয় জাতীয় ক্ষতি' বলিয়া মন্তব্য করেন।

কোরবান আলী

সাবেক পরিষদ সদস্য জনাব কোরবান আলী বলেন, নেতার মৃত্যু-সংবাদে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছি। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর শিষ্যদের নিকট এই ক্ষতি ব্যক্তিগত ক্ষতিও বটে। পাকিস্তানের ইতিহাসে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রয়োজন আজিকার চেয়ে আর কোনো সময়

www.pathagar.com

বেশি ছিলো না। অথচ ঠিক এই সময়েই আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে লইয়া গেলেন। এই ক্ষতি কোনোদিনই পূরণ হইবে না।

জনাব বদরুল হক খান

জনাব বদরুল হক খান (চট্টগ্রাম কনভেনশনপন্থী) বলেন যে, দেশের প্রত্যেকে মরহুম নেতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছে। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, জীবদ্দশায় তিনি যে কাজ করিয়াছেন, আল্লাহ তাহা কবুল করিয়াছেন।

জনাব নূর আহমদ

সাবেক গণপরিষদ সদস্য জনাব নূর আহমদ বলেন, তিনি জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া পড়িয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আজাদী সংগ্রামে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

www.pathagar.com

পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদের শোক

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদের অধিবেশন একদিন মুলতবী রাখা হয়। পরিষদে শোক প্রস্তাব উত্থাপনকালে পরিষদের নেতা শেখ মাসুদ সাদিক মরহুমের অটল চরিত্র এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির উল্লেখ করিয়া বলেন, 'জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী জাতীয় সরকারের কর্ণধার ও জাতীয় পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা—উভয়ভাবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেন।'

বিরোধী দলের নেতা খাজা মোহাম্মদ সফদার মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, 'স্বাধীনতা লাভের পর জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী গণতন্ত্রের রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। সামরিক আইন জারি হওয়ার পর 'এবডো' অনুযায়ী তাঁহার রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করা হয়। পরে তাঁহাকে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং সেখানে আটক থাকাকালেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন।'

পরিষদে গৃহীত শোক-প্রস্তাবে বলা হয়, 'পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও দেশের একজন মহান রাজনীতিক জনাব এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দীর ইন্তিকালে এই পরিষদ গভীর বেদনা ও শোক প্রকাশ করিতেছে।

'মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দী দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে এবং বিরোধী দলে অংশগ্রহণকালে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুসরণের ব্যাপারে তাঁহার তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রহিয়াছে। তিনি ছিলেন একজন সুযোগ্য মন্ত্রী, আইনজ্ঞ এবং নিয়মতন্ত্রবাদী। তিনি যাহা কিছু করিতে যাইতেন, তাহাতেই তিনি তাঁহার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁহার সকল কার্যকলাপে মানবতাবাদের সুমহান আদর্শের নিদর্শন পাওয়া যায়। যে-কেহ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। আল্লাহ তাঁহার আত্মার সদগতি করুন এবং তাঁহার প্রিয়জনকে এই মর্মান্তিক ক্ষতি সহ্য করার মতো মানসিক বল দিন।'

মিয়া জিয়াউদ্দিন

পশ্চিম জার্মানীতে নিযুক্ত সাবেক রাষ্ট্রদূত মিয়া জিয়াউদ্দীন বলেন, 'মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার আদায় এবং পাকিস্তান সৃষ্টির সংগ্রামের সময় আমি নিখিল ভারত মুসলিম লীগে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর সহিত একসঙ্গে কাজ করিয়াছি। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তানের অন্যতম স্থপতি।'

বেগম শাহনওয়াজ

পশ্চিম পাক-পরিষদ সদস্যা ও প্রবীণ পার্লামেন্টারিয়ান বেগম শাহনওয়াজ এক বাণীতে বলেন, 'ইহা এক ভয়াবহ ক্ষতি। মহান নেতার তিরোধানে দেশ দরিদ্রতর হইয়া পড়িলো এবং তাঁহার মৃত্যুর ফলে সৃষ্ট শূন্যস্থান পূরণ করা কঠিন হইবে।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে
জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

'আমাদের সাফল্যই হইবে তাঁহার স্মরণে নির্মিত আমাদের স্মৃতিসৌধ'

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাতা জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে ফ্রন্টের পূর্ব পাকিস্তান কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন ঃ 'জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর আকস্মিক ও দুঃখজনক তিরোধানে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর ও প্রগাঢ় শোক প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার ইন্তিকাল দেশের জন্য বিরাট ক্ষতি। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সংগ্রামের ক্ষেত্রেও তাঁহার তিরোধান কম ক্ষতিজনক নয়।

পাকিস্তান কায়েমে জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর অবদান পাকিস্তানের জনসাধারণ চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে।

এই দেশে গণতন্ত্র ও গণ-অধিকার কায়েমের এত বড় সাহসী যোদ্ধার দ্বিতীয় নজির খুঁজিয়া বাহির করা খুবই দুঃসাধ্য।

আজ তাঁহার নেতৃত্বের প্রয়োজন যখন সর্বাধিক, ঠিক তখনই আজিকার এই সঙ্কট–সন্ধিক্ষণে তাঁহার লোকান্তর স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠুর আঘাত বিশেষ।

তাঁহার অব্যাহত ও সক্রিয় সমর্থনে উজ্জীবিত জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের এই কমিটি পাকিস্তানের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার যোগ্য নেতৃত্বে যে কাজ শুরু হইয়াছে তাহা সফল না হওয়া পর্যন্ত কাজ অব্যাহত রাখার সংকল্প গ্রহণ করিতেছে। আমাদের প্রচেষ্টা ও সাফল্যই হইবে তাঁহার স্মরণে আমাদের নির্মিত স্মৃতিসৌধ।'

প্রাদেশিক কনভেনশন লীগ

পূর্ব পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের কার্যকরী সংসদের সভায় জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। এক প্রস্তাবে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে মহান নেতা, মহান স্বাধীনতা যোদ্ধা, মহান দেশপ্রেমিক এবং গণতন্ত্রের বীর সেনানী বলিয়া অভিহিত করা হয়। সভায় পাকিস্তানের জন্য এই সুবিদিত ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতার ভূমিকা ও ত্যাগের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা হয়।

এইচ. জে. স্টেইনবেক

ঢাকাস্থ পশ্চিম জার্মান দূতাবাস হইতে কন্সাল এইচ. জে. স্টেইনবেক ইত্তেফাক সম্পাদকের নিকট প্রেরিত এক শোকবাণীতে বলেন যে, 'গত শুক্রবার সকালে সংবাদপত্রে জনাব এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দীর মহাপ্রয়াণের সংবাদ পাঠ করিয়া গভীরভাবে ব্যথিত হইয়াছি। সবসময় আমি পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই মহান সৈনিককে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার স্থির বিশ্বাস যে, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে পাকিস্তানের গোটা জাতি মর্মাহত হইয়াছে। আমি এই মহান ব্যক্তিত্বের তিরোধানে আন্তরিক শোক জ্ঞাপন করিতেছি।'

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের শোকবাণী

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর কন্যা বেগম আখতার সোলায়মানের নিকট প্রেরিত শোকবাণীতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বলেন, 'আমি এইমাত্র জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর বৈরুতে ইন্তিকালের সংবাদ শুনিলাম। আপনাদের শোকে আমার আন্তরিক সমবেদনা অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করুন। আল্লাহ্ তাঁহার রুহের মাগফিরাত দিন এবং ধৈর্যের সহিত আপনাকে এই আঘাত সহ্য করিবার শক্তি দান করুন।'

বৃটেনে দুইজন পাকিস্তানী বিশেষ পরিচিত, তন্মধ্যে····

বৃটিশ বিচার বিভাগের অধিকর্তা লর্ড ডেনিং জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে বলেন, বৃটেনবাসীর নিকট পাকিস্তানের দুইজন রাজনীতিক বিশেষভাবে সুপরিচিত এবং তাঁহারা হইলেন জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ও জনাব এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী।

দৈনিক ডন

৬ই ডিসেম্বর তারিখে করাচীর ইংরেজি দৈনিক 'ডন' পত্রিকায় 'সোহ্‌রাওয়ার্দীর তিরোধানে' শীর্ষক শিরোনামায় লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয় ঃ

'হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যু নিশ্চয়ই গোটা দেশবাসীর মনে প্রচণ্ড আঘাত হানিবে। রাজনৈতিক মতবিরোধ যতই থাকুক না কেন, যুগের শেষ সাক্ষ্য এবং বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে এই সিংহপুরুষটির জন্যে পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষ শোকানুভব করিবে। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীর যে হৃদরোগ দেখা দেয়, তাহা হইতে তিনি আর কোনোদিনই মুক্তি পাইলেন না—ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সুদীর্ঘ প্রায় নয়টি মাস দেশের বাহিরে অবস্থান করিয়াও নয়। দুঃখের বিষয়, মরহুমের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তাঁর চিকিৎসক, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গ যতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন, মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীকে ততটা উদ্বিগ্ন হইতে দেখা যায় নাই। তাহার চাইতেও দুঃখের বিষয় যে, যে দেশকে তিনি এত ভালোবাসিতেন, যে দেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁহার অপরিমিত অবদান রহিয়াছে, সে দেশের পরিবর্তে তাঁর মৃত্যু হইলো ভিন্ন দেশে। মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনে বহুবিধ সংগ্রামের পুরাভাগে ছিলেন। আইন ব্যবসায় এবং রাজনীতি—উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, তিনি রাজপ্রাসাদের রাজকীয় পরিবেশে যেমন নিজেকে অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে করিতেন, তেমনি গরীব চাষীর পর্ণ কুটির বা মাটির ঘরেও নিজেকে স্বচ্ছন্দে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেন। জনসাধারণের নিকট হইতে তিনি যে সাড়া লাভ করিয়াছিলেন, রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকের ভাগ্যেই তাহা জুটিয়াছে।

'পাকিস্তান কায়েমের আগে অবিভক্ত বাংলায় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রাদেশিক শাখা গঠন করা বিশেষভাবে মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রচেষ্টার জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের সময় মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীকে দেখা গিয়াছে গ্রাম-বাংলার মাঠে-ঘাটে-বাটে। রাজনৈতিক চারণের বেশে কখনও গ্রাম্য সকটে, কখনও দেশী নৌকায়, আবার কখনওবা কাদা-মাটির রাস্তায় নগ্নপদে মরহুমকে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে গ্রামে-গ্রামে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া নিরলসভাবে ঘুরিতে দেখা গিয়াছে।

'রাজনৈতিক ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইবার পর মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীকে কিছুদিন আটক আইনেও কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তাধারার

www.pathagar.com

মৃত্যু ঘটাইতে পারে নাই। পাকিস্তান এবং বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ রাজনীতিকদের এক বিরাট অংশের কাছে মরহুমের প্রতিটি কথা আইনের শামিল। কাহারো কাহারো মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারে যে, বিগত বৎসরে অথবা এই সময়ে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মতবাদে আরও ঔদার্য ফুটিয়া উঠিতেছিল এবং তাঁহার স্বাস্থ্য গুরুতররূপে ভাঙ্গিয়া না পড়িলে দেশের রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিতে পারিতেন। বিভিন্ন সরকারের প্রধান অথবা সদস্য (তিনি এক বৎসরের অধিককাল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন) হিসাবে সকল সময়েই সক্রিয় ছিলেন। তিনি সকল, এমনকি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন এবং তাঁহার সহকর্মী ও সরকারি কর্মচারিদের সুবিধার জন্য সকল সময়েই মন্তব্যাদি ও স্মারকলিপি লিখিতেন। ইহার অনেকখানি বিশ্রাম গ্রহণকালে বিছানায় বসিয়াই তিনি সম্পন্ন করিতেন। এই সময় তাঁহার বিছানায় ফাইলের স্তূপ ও কাগজপত্র ছড়ানো থাকিত। তিনি ঘরোয়া ও সাধারণ পরিবেশে তাঁহার রাজনৈতিক সমর্থক অথবা কর্মচারিদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হইতেন এবং এমনকি পদস্থ বিদেশীদের পর্যন্ত সাক্ষাৎদান করিতেন। ইহা কিভাবে তাঁহার মনে কাজ করিত এবং ক্ষমতাসীন অথবা ক্ষমতায় না থাকাকালীন কিভাবে তিনি চলিতেন, তাহর পরিচায়ক!

'জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী নানাদিক দিয়া একজন অদ্বিতীয় পুরুষ এবং তিনি যে শূন্যতা রাখিয়া গেলেন, তাহাতে তাঁহার মতো রাজনৈতিক চরিত্রের শূন্যতা পূরণ হইবে না। রাজনীতির আর এক নাম হইতেছে বিতর্ক, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরামহীন বাদানুবাদ। মরহুমের বন্ধু ও বিরোধীরা তাঁহার মহত্ত্বকেই স্মরণ করিবে।

যখন বৈরুত হইতে এই মৃত যোদ্ধাকে স্বদেশে আনা হইবে তখন সকল পাকিস্তানীই তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাইবে। আমরা তাঁহার কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান, পুত্র রশীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, ভ্রাতা জনাব হাসান শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং তাঁহার পরিবারের অপরাপর লোকদের নিকট আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছি।'

গার্ডিয়ান

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুতে লন্ডনের উদারনৈতিক পত্রিকা 'গার্ডিয়ান' এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন, 'পাকিস্তানের প্রতি নিয়তি বিরূপ বলিয়াই মনে হইতেছে। কেননা, ঐ দেশের তিনজন শীর্ষস্থানীয় নেতা—জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান ও সোহ্‌রাওয়ার্দী সবাই অকালে মৃত্যুবরণ করেন।'

উক্ত প্রবন্ধে 'গার্ডিয়ান' আরও বলে, 'জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীই ছিলেন একমাত্র জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন রাজনীতিক যিনি দায়িত্বশীল বিরোধী দল গঠন করেন। গত বৎসর কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি আশ্চর্যজনকভাবে একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অধীনে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপকে ঐক্যবদ্ধ করিতে সক্ষম হন। অবশ্য রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ গ্রহণের ব্যাপারে তাঁহার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।'

টাইম্‌স্‌

লন্ডনের 'টাইম্‌স্‌' পত্রিকায় জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর এক সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়া বলা হয় যে, তিনি একজন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ও অসম সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। স্বাধীনতা-পূর্ব আমলেও পাকিস্তানের রাজনীতিতে তিনি বর্ণাঢ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

সংবাদ

সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় 'চক্ষে আমাদের অশ্রু ঃ বক্ষে আমাদের বাড়বাগ্নির জ্বালা' শিরোনামায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয় ঃ

'প্রতীক্ষা করিতেছিলাম আমরা শহীদ সাহেবের দেশে ফিরিবার ঃ দেশে ফিরিতেছেন শহীদ সাহেব। চক্ষে আমাদের অশ্রু; বক্ষে আমাদের বাড়বাগ্নির জ্বালা। হৃৎপিণ্ড আমাদের যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, হৃদয়ে আমাদের কালবৈশাখীর ঝড়।

'স্বদেশ-স্বজন হইতে বহুদূরে লেবাননের উষর ভূমিতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন আমাদের প্রিয় নেতা; জননী পূর্ব বাংলার শ্যামল-স্নিগ্ধ ক্রোড়ে রচিত হইবে তাঁহার শেষ শয্যা। মৃত্যু জীবনের স্বাভাবিক অনিবার্য পরিণতি; শহীদ সাহেবের স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই।

'আমি যখন কাহারও কাজে লাগিতেছি না, যদি শুধু নিজের জন্যই বাঁচিতে হয়, তখন মরিতে পারিলেই আমি সুখী হই'—সারাটি জীবন যে শহীদ সাহেব উজ্জ্বল উদ্বেল জীবনের আরাধনা করিয়াছেন। সেই শহীদ সাহেব কেন বিদেশে প্রিয়জনহীন পরিবেশে মৃত্যু কামনা করিতেছেন, এ প্রশ্নের জবাব দেশবাসী জানে। ইতিহাসের মানদণ্ডে একদিন এদেশে শহীদ সাহেবের মৃত্যু-পূর্ব পরিস্থিতির নির্ভুল পরিমাপ হইবে; জনতার আদালতে অনেক প্রশ্নেরই একদিন শেষ মীমাংসা হইবে।

'আজ আমরা কাঁদিব না; বুকের ওপর পাথর-চাপা অবস্থায় কান্নাহাসি কোনোটারই কোনো অর্থ হয় না। একদিন আমরা প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারিব; একদিন আমরা প্রাণ খুলিয়া হাসিবার অধিকার অর্জন করিব। শহীদ সাহেবের মৃত্যু ইহারই নিশ্চিত অঙ্গীকার।

'আমরা শহীদ সাহেবকে জানাইবার সুযোগ পাইলাম না—তিনি কাহারও কাজে লাগিতেছেন না কথাটি সত্য নয়। দেশ ও জনতার জন্য অতীতে শহীদ সাহেব কি করিয়াছেন, তাহার পর্যালোচনা এই নিবন্ধে না করিলেও চলে। শহীদ সাহেবের মৃত্যুতে এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্বের ব্যাপারে আজ যে শূন্যতার সৃষ্টি হইলো, তাহা কি করিয়া পূরণ হইবে এ কঠিন সমস্যা আজ দেশের সকল গণতান্ত্রিক কর্মী ও নেতার সম্মুখে।

'আজ শহীদ সাহেবের কর্মময় অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ জীবনের আলোচনা এই নিবন্ধে আমরা করিব না। গত পাঁচ বছরে তাঁহার নেতৃত্ব যে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল, এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসকার তাহা লিপিবদ্ধ করিতে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিবেন। জনতার ঐক্যকে বজ্রদৃঢ় করিয়া তুলিতে, সকল প্রকার দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনতাকে সংঘবদ্ধ করিতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শহীদ সাহেব এদেশের সকল গণতান্ত্রিক নেতা ও কর্মীকে আহ্বান জানাইয়া গিয়াছেন।

'শহীদ সাহেবের মৃত্যুতে এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন মন্থরগতি হইবে বলিয়া কোনো কোনো মহল মনে করিবেন; আমরা অঙ্গীকার করিতেছি, আমরা তাহা হইতে দিব না। ব্যক্তি হিসাবে শহীদ সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে, সকলেরই হইবে। কিন্তু যে জনতাকে শহীদ সাহেব নেতৃত্ব দিতেছিলেন, সেই জনতার মৃত্যু নাই। জনতার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রিয় নেতা ৭০ বৎসর বয়সেও সারাদেশে চারণের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন।

'সকল গণতান্ত্রিক দলের নেতা ও কর্মীদের আমরা আহবান জানাইতেছি আজিকার এই শোককৃষ্ণ দিবসে নূতন করিয়া সংকল্পবদ্ধ হইতে।

www.pathagar.com

'এদেশের মানুষের বুক ভরিয়া নিশ্বাস নিবার অধিকার দাবি করিবার অপরাধে বৃদ্ধ জননেতা জীবনে প্রথম কারারুদ্ধ হন। ইহার ফলেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে।

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যু হইয়াছে, এদেশের সংগ্রামী জনতার মধ্যে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী বাঁচিয়া থাকিবেন।

শহীদ সাহেবের স্মৃতির সম্মানে সকল সরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত হইবে, আমরা জনতার সংগ্রামের পতাকা আরও উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিব।'

দৈনিক জেহাদ

দৈনিক 'জেহাদ' প্রথম পৃষ্ঠার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন :

'পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধান উজির, পাক-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতৃপুরুষ জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বৈরুতে ইন্তিকাল করিয়াছেন। 'ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইয়ে রাজেউন।' জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর ফলে পাকিস্তানে প্রথম শ্রেণীর জননেতা আর কেহ রহিলেন না। কায়েদে আজম জিন্নাহ, কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলী, শেরে বাংলা ফজলুল হকের পরে জনাব সোহরাওয়ার্দীই ছিলেন পাকিস্তানের প্রথমসারির শেষস্তম্ভ। তাঁহার মহাপ্রয়াণে সেই স্তম্ভও ভাঙ্গিয়া পড়িল।

'জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত। দেশবাসী যখন তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাগমনের জন্য সাগ্রহে দিন গুনিতেছিলো, তেমন সময়েই বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো সংবাদ আসিলঃ সোহরাওয়ার্দী আর নাই....আকস্মিকভাবে হৃদয়যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তিনি ইন্তিকাল করিয়াছেন। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ তাঁহার দেশবাসীকে শুধু বিস্ময় বিমূঢ়ই করে নাই, তাহাদের মর্মন্তুদ শোকে মুহ্যমান করিয়াছে। এর চাইতে অমোঘ নিয়তির নির্মম পরিহাস আর কি হইতে পারে?

'কয়েদে আজম, কায়েদে মিল্লাত ও শেরে বাংলার মৃত্যুর পরে পাকিস্তানের অধিবাসীরা জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বের ওপরই নির্ভরতার দৃষ্টি লইয়া তাকাইয়াছিল। কায়েদে আজমের কুশাগ্রবুদ্ধি ও লৌহকঠিন দৃঢ়তা, কায়েদে মিল্লাতের প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতা এবং শেরে বাংলার অসাধারণ জনপ্রিয়তা পাকিস্তানের অস্তিত্বকে অনড় বুনিয়াদের ওপর যেমন প্রতিষ্ঠাদান করিয়াছে, জনাব সোহরাওয়ার্দীর অসাধারণ বাগবিভূতি ও গঠন প্রতিভাও তেমনি এর মূলে কম রসসিঞ্চন করে নাই। কাজেই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যু জাতির হৃদয়ে শেলের তীব্র আঘাত হানিয়াছে—যে আঘাতের জের পাকিস্তানীদের হৃদয় হইতে সহজে মুছিবার নয়। বস্তুত সোহরাওয়ার্দী নেতৃত্বের অভাব কখনো পূরণ হইতে পারিবে কিনা এবং পারিলেও তাহা কোনো সুদূর ভবিষ্যতে তাহা বলা সত্যিই কঠিন।

'শোকে মুহ্যমান জাতির সাথে আমরাও তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং কামনা করিতেছি তাঁর রুহের মাগফেরাত, তাঁর বিয়োগবিধুর আত্মীয়-স্বজন ও পরিজনকে জানাইতেছি আমাদের হৃদয় নিংড়ানো সমবেদনা।'

মাশরিক

লাহোরের দৈনিক 'মাশরিক' পত্রিকায় বলা হয় যে, জনাব হোসেন শহীদ

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দীও নিজ প্রভুর দরবারে চলিয়া গেলেন। ইন্নালিল্লাহে.... রাজেউন। মরহুম ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের প্রথম সারির বিশিষ্ট নেতা এবং এই দেশ যাহা আবাদী ও বিস্তৃতির দিক হইতে পৃথিবীর মধ্যে কতিপয় বৃহত্তম দেশের অন্যতম সেই দেশের গোড়াপত্তন যাঁহাদের হাতে সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

দেশের প্রবীণ নায়কদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র নেতা—অবস্থায় পরিবর্তন ও রদবদল সত্ত্বেও দেশের উভয় অংশে যিনি বিশেষভাবে জনপ্রিয়তার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিলো পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংযোগসূত্র স্বরূপ। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন প্রবীণ দেশনায়কদের মধ্যে একজন বলিষ্ঠ, মজবুত এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহান নেতা।

জনাব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন অনন্যসাধারণ গুণের অধিকারী। তিনি পাকিস্তানে সুসংবদ্ধ বিরোধী দলের বুনিয়াদ তখন কায়েম করেন, যখন এদেশে 'অপোজিশন' সম্পর্কে কল্পনা করাও অসম্ভব ছিলো। তিনি বড়ই নির্ভীক এবং গণশক্তির প্রতি অকুণ্ঠ আস্থাবান। যে সমঝোতার উপরে পাকিস্তান কায়েম হইয়াছিল তাহাতে জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিরাট অবদান রহিয়াছে। সংখ্যাসাম্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রতিষ্ঠায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সম্মত করানো জনাব সোহরাওয়ার্দীর এমন এক কীর্তি যাহা কোনোদিন বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হইবে না।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হইলো তাহা সহজে পূরণ হইবার মতো নহে। এমন প্রতিভাধর জননেতা রোজ রোজ পয়দা হয় না। আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে পরম শান্তি ও রহমত দান করুন এবং তাঁহার শোকার্ত পরিজন তথা ভক্ত অনুরক্তগণকে ধৈর্য দান করুন।

দৈনিক বাশারাত

হায়দরাবাদের দৈনিক 'বাশারাত' পত্রিকায় বলা হয়, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে পাকিস্তান শোকাগারে পরিণত হইয়াছে। পাকিস্তানের জনগণ আজ শোকে বিলাপ করিতেছে। গতকাল পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী সাহেবের রাজনৈতিক দরবারে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো। সরাসরি তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু রাজনৈতিক নেতা এবং দেশবাসী উত্তমরূপে অবগত ছিলো, দেশের রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রভাব কত গভীর ছিলো। কারণ, সোহরাওয়ার্দী সাহেব ছিলেন নিজেই একটি ইতিহাস। তিনি পাকিস্তান সৃষ্টির কাজে কায়েদে আজমের সহকর্মী ছিলেন। আজাদী লাভের পরে সারা ভারতবর্ষে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বলিয়া উঠিল তখন সেই কঠিন মুহূর্তে সোহরাওয়ার্দী সাহেব গান্ধীজীর সহিত সেই দাঙ্গার আগুন নির্বাপনের জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। পরবর্তী অধ্যয়ে তিনি নিজের জীবন পাকিস্তানে গণতন্ত্রের অস্তিত্বে রক্ষা এবং বিকাশের জন্য উৎসর্গ করেন। তিনি বিরোধী দলকে সর্বদা দেশের পরিপূরক নেতৃত্বের অধিকারী হিসাবে পেশ করিয়াছেন। এবং বিরোধী দলের মর্যাদা সমুন্নত করিয়াছেন। রাজনীতি তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের মাধ্যম কখনও ছিলো না। বরং দেশের রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধানের অপর নামই তাঁহার নিকট রাজনীতি ছিলো। তিনি কখনও নীতি বিসর্জন করেন নাই। তাঁহার একটি বিরাট বৈশিষ্ট্য ছিলো, তাহা এই যে,

www.pathagar.com

জনগণকেই তিনি শক্তির মূল কেন্দ্ররূপে বিশ্বাস করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, জনগণকে বাদ দিয়া কোনো উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। বস্তুত এই গণভিত্তিক আন্দোলনই তাঁহাকে এত গৌরবময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী করিয়াছে, দেশের রাজনীতিতে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ আসন দান করিয়াছে।

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের আমলেই তো এক বিরাট সমস্যা অতিক্রম করার পরে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান এতখানি নিকটবর্তী হইয়াছিল। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টার সূচনা হইয়াছে, উভয় প্রদেশের মধ্যে অসাম্য এবং অসংগতি বিলোপের জন্য সক্রিয় চেষ্টা শুরু করা হইয়াছিল। এই সকল কারণেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেবের অপর একটি বিশেষ গুণ ছিলো যে, তিনি ছিলেন সহজাত গণতান্ত্রিক মনোভাবের অধিকারী। তিনি কখনও বিরুদ্ধবাদীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। বরং বিরোধিতাকে তিনি গণতন্ত্রের প্রধান অঙ্গরূপেই গ্রহণ করিতেন। আমাদের স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যখন হায়দরাবাদ আগমন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সহিত স্থানীয় রাজনৈতিক বিরোধী কর্মীগণ যে অশোভন ব্যবহার করিয়াছিল তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে জেলে পাঠাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া বিরোধী দলকে ক্ষমা করিলেন। যে দেশে জনসভায় কর্তাদের নিকট প্রশ্ন করিয়া সাজার আশংকা পোষণ করিতে হয় সেইখানে এইরূপ সৌজন্য শুধু উল্লেখযোগ্য নহে বরং অনুকরণযোগ্য আদর্শও বটে।

জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে পাকিস্তান স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নির্ভীক সিপাহসালারকে হারাইল। গণতন্ত্রের এক বীর সন্তানকে হারাইল। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এমন এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হইলো, তাহা কখনও পুরা হইবে কিনা সন্দেহ। বর্তমান বৎসরটাই যেন আমাদের দুর্ভোগ এবং দুর্ভাগ্যের বৎসর—একে একে পাঁচজন নেতাকে গ্রাস করিল। কিন্তু মাতম করিয়া অশ্রু বহাইয়া আমরা এই শূন্যতা পূরণ করিতে পারিব না। বরং এজন্য দরকার তরুণ নেতৃত্বের অগ্রজদের আসন সামলাইতে তৎপর হওয়া, তাঁহাদের আবদ্ধ কাজ সম্পূর্ণ করিয়া সুযোগ্য সন্তানের পরিচয় দানে সচেষ্ট হওয়া। বস্তুত এই নেতৃত্ব শুধু গণতান্ত্রিক পরিবেশে গণআন্দোলনের মাধ্যমেই বিকাশ লাভে সক্ষম। আমাদের তরুণ সম্প্রদায়ের কর্তব্য জনসেবার আদর্শ গ্রহণ এবং জনাব সোহরাওয়ার্দী মরহুমের আদর্শ অনুসরণ করা, যে আদর্শ এবং বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি এতবড় দেশনেতা রূপে বরিত হইয়াছিলেন।

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দীর তিরোধান সারা পাকিস্তানবাসীকে কতোখানি ব্যথিত করেছে, তা বর্ণনাতীত। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গা থেকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে বহু নরনারী-বালক-কিশোর-বৃদ্ধ-যুবক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাধারণ মানুষ আজো শহীদ সাহেবের মাজার দর্শনে আসেন। জিয়ারত শেষে তারা তাদের অন্তর নিঃসৃত বেদনার ভার লাঘব করে যান মাজারে রক্ষিত খাতায়—বাংলা, উর্দু, আরবী, ইংরেজি, হিন্দী ভাষায়। আমরা এখানে সেইসব অজস্র উক্তির কয়েকটি তুলে দিচ্ছি, যদিও আমরা জানি যে, তাদের হস্তাক্ষরের ভেতর দিয়ে আত্মগত বেদনার যে পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা ছাপার হরফে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। লেখক-লেখিকাদের বানানের হুবহু অনুলিপি থেকে আংশিক অনুমান সম্ভব হতে পারে।

'আমি সহিদ সাহেবের মাজারে এক বোতল গোলাপ জল এবং আগরবার্তি দিয়াছি। আমি মরহুম সহিদ সাহেবকে আন্তরিকভাবে ভাল জানিতাম এবং আমি খোদার নিকট প্রার্থনা করি উনার রুহের ওপর মাগফেরাৎ কামনা করি উনাকে বেহেস্তে নছিব করুন।'

—**আবু তাহের**, ৩৪ নং সেক সাহেব বাজার, ঢাকা।

' ছোরয়াদ্দি তুমি এখন অমার।'

—**মইনুল আবেদিন**, ১২/১২/৬৩

'আমি হতোবাগা তাহার খবর সুনিয়া আসিলাম।'

সিরাজুল ইসলাম। গ্রামঃ বড় কাছলই, পোঃ কাসিন নগর, কুমিল্লা ১৩/১২/৬৩

'আমি দুরুদ পড়িয়া হাজার (২) বার মাগফেরাত কামনা করিতেছি যে আল্লা যেন তাকে স্বর্গবাসী করেন।' —**মোহাঃ আক্রম আলী**। বাঁশগাঁও, পোঃ গজারিয়া, ঢাকা।

'আমি দরুদ আস্তাগফার-সুরা একলাছ-সুরে ফাতেহা ও আহাদনামা পড়িয়া তিনির রুহের মাগফেরাত করিলাম খোদা যেন তিনিকে স্বর্গবাসী করেন।'

—**মুঙ্গল মিয়া**, গ্রামঃ বাড্ডা, পোঃ জীবনগঞ্জ, জিলা কুমিল্লা।

'হে, শহীদ, হে অমর, জীবন্ত তোমায় মেরে রাখলো যারা মরণে স্বীক্রতি দিলে তারা। এ দেখেও যদি জাগে তোমার বাঙ্গালীর চেতনা, তবু স্বার্থক হবে তোমার সারা জনমের সংগ্রাম।'

—**কাজী জব্বার**।

'জীবনে তুমি জয় করেছিল—দশ আর দেশ। মরণে তুমি জয় করেছ কাল তাই তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী শহিদ। তোমার জীবনধর্ম আর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হউক জীবনের বদলায়।'

—**ফজলুল কাদের**, নেত্রকোনা।

'হে বঙ্গবীর—তোমার মৃত্যুতে আমরা আজ "এতিম" হইয়া পড়িলাম। তোমার অকাল মৃত্যুতে জাতির এক মহা ক্ষতি হইলো। তুমি আজ আমাদের মধ্যে নাই। কিন্তু তোমার জীবনাদর্শ আমরা চিরজীবন অনুসরণ করিয়া চলিব। তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী, তোমাকে আজ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।'

—**মোঃ লিয়াকত হোসেন খান**, ১নং আব্দুর রহমান হল, আরমানীটোলা, ঢাকা-১।

'হে অমর শহীদ, তুমি ওপারে আর আমরা এপারে। সেতু হিসাবে বেঁচে থাকুক তোমার আদর্শ—যা দান করবে আমাদের অধিক নৈকট্য আর যোগাবে প্রেরণা।'

—**এল. রহমান খান**, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩/১২/৬৩।

www.pathagar.com

'While Marhum H.S. Suhrawardy was the Chief Minister of Undivided Bengal, and I was in 25, Ganesh Avenue, Calcutta with my family surrounded on all sides by Hindu malicious forces during the great man-killing Calcutta Riot of 1946-47 he posted one whole time armed police picket of about 12 strong for protection of my family till the riot was subsided. It was a great wonder how it was brought to his knowledge & immediately the needfull was done. He was an ideal dinamic leader of strong character & firm principle of the country by deeds and not by mere words. He is therefore, permanently seated in the heart of the people of the country. Humanity was his moto. He had no compromise with his faith and principle. May Allah grant his parting soul eternal peace.'

—**M. D. M. Wajid Ali Khan,** Po. & Ps. Babugonj, Dt. Barisal.

'শহীদ সাহেবের শেষ লক্ষ্য ছিলো পূর্ণ গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটাধিকার, জনগণের ভোটেই পাকিস্তান এসেছে। জনশক্তি দুর্বার। যদি শক্তিশালী বৃটিশ ও ধুরন্ধর কংগ্রেসের সব চক্রান্ত বরবাদ করে এই নিঃসম্বল জনশক্তি পাকিস্তান আনতে সক্ষম হয়েছিল, এ দেশকে গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করা তাদের পক্ষে বোধহয় উহা অপেক্ষা সহজতর কাজ। শহীদ সাহেব সেই কাজের দিশারী, তাঁর লক্ষ্য সফল একদিন হবেই এবং সেদিন শহীদ মাজার পুণ্য তীর্থরূপে পরিগণিত হবে।' **–নঈমা খাতুন, ১৬/১২/৬৩**

'পরলোকবাসী মহান নেতা। তুমি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। যে দেশে তুমি চলে গেছ সেখান থেকে কেউ ফেরে না। তুমি ভালবেসেছো এই পৃথিবীকে, এই দেশের প্রত্যেকটা প্রাণকে। প্রত্যেকের মাঝে তাই তুমি বেঁচে আছ। তোমার মৃত্যু দৈহিক—আত্মিক নয়। তোমার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা রইলো। ভগবান তোমার আত্মার শান্তি দিউন।

–বিজন কুমার দাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও
রতীশ চন্দ্রদাস, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
১৫/১২/৬৩।

'পথিক! ক্রন্দন নয় আর– / আজি যে হেথায় শপথ তোমার
'গণতন্ত্রের মুক্তি চাই' / তাঁহারে যাহারা হত্যা করেছে
তাদের ক্ষমা নাই।' **–হায়াত খান।**

'হে মহান নেতা, তুমি যে আজ আমাদের মধ্যে নেই একথা বিশ্বাস হয় না। তাই তোমায় শেষ দেখা দেখতে এসে রেখে গেলাম দু'ফোঁটা চোখের জল। তোমার আত্মা শান্তি লাভ করুক এই কামনা করি।'

ইডেন কলেজের কতিপয় ছাত্রী, ঢাকা। ১৭/১২/৬৩

The above Pushto verse is from 'Dewan Rahman', the famous religious poet in Pushto. The above verse means that 'A hill is of

www.pathagar.com

stone, but among those is the Diamond, which is the precious, valuable, no doubt it is small in size.

-F. Ahad, Engg, Student, Peshawar.

(পরিদর্শন পুস্তিকায় পুশতু কাব্যাংশটিও লেখা আছে)।

Undaunted champion for the restoration of Democracy in the country who fought for pakistan hand-in-hand with Quaid-e-Azam. It is a pity for the nation that the Sipah-salar breathed his last in a foreign land when he was EBDOED. Let us take a vow to fight for the ideals for which he sacrificed his precious life.

- Ashrafali, LL.B. Pleader, Patuakhall. 19.12.63

হে শহীদ–

মীরজাফরের নিমকহারামীর জন্য গোলামী করিয়াছি দুইশত বৎসর। তাই তোমার পবিত্র কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শপথ করিতেছি—এ বাংলাতে আর মীরজাফরের ভূমিকা নিতে দিব না। তুমি মরেছ সত্য। কিন্তু তোমার আদর্শ ত্যাগ ও বাণী সাত কোটি বাঙ্গালী সন্তান কোনোদিন ভুলতে পারে না। **–এম. এ. হাফিজ।**

হে মহান নেতা,

তোমার মহাপ্রয়াণে জাতি আজ শোকে মুহ্যমান। পৃথিবীর ইতিহাস চিরদিন তোমাকে স্মরণ করিবে যুগস্রষ্টা মহামানব হিসাবে।

–ফিরোজ, সপ্তম শ্রেণী, সিদ্ধেশ্বরী ১৯/১২/৬৩। শিরিন আখতার ১৯/১২/৬৩।

কালেমা তাইয়ব লায়েলাহা ইলালাও মুহাম্মদুর রাসুললা আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে বেহেস্তিতে বাস করেন খোদা হাফেজ। **–আবদুল কুদ্দুস পিয়ন**, গ্রামঃ নুরুল্লাপুর, পোঃ নুরুল্লাপুর জিঃ নোয়াখালী পর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা।

১৬/১২/৬৩ইং আজাদ বক্স নামে একজন শ্রীহট্টবাসী ৮০ বৎসর বয়স্ক লোক বাংলার বীরপুরুষের মাজার জিয়ারত করেন ও তাঁহার আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করেন।

–আজাদ বক্স ১৬/১২/৬৩।

মরহুম শহীদ সাহেবের পবিত্র রুহের মাগফেরাৎ কামনা করি। পরম করুণাময় আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে বেহেস্তিবাসী করুন, তাঁহার আত্মার শান্তি দান করুন, আখেরাতে তাঁহাকে পীরদের সমতুল্য মর্যাদা দান করুণ, আমীন।

- Tahiruddin Ahmed Chowdhury
Chairman U. C. No. 4 (অস্পষ্ট)
Po. Raipura. Dt. Noakhali, 16.12.63

২০/১২ হে বীর সন্তান

আজ ৯০ বৎসর বয়সে সুধুর বীরসান হইতে আসিয়া তোমাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাইলাম।

–আলহাজ মহাম্মদ ফরাজি, গ্রাম জনিসা, জিলা বরিশাল।

And one day we will find every one here.

-Mustansar, Journalism Department of Punjab University, 22.12.63

The end of a life that inspired millions.

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

Head, Journalism Departmen, Punjab University, Lahore, 22.12.63

www.pathagar.com

Peace be upon you.

This nation and country of Pakistan will never forget your services, your soul was very precious for this nation. This flap will not be covered.

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

from W. Wing, LHR, 23. 12. 63

Mr. H.S. Suhrawardy was the leader not only of the Muslims of Indo-Pakistan. He was the leader of the backward scheduled castes of Indo-Pakistan also and leader of the poor & backward people of the world too.

- **Keshablal Roy.** 24.12.63

Headmaster, Ichhanil Jr. High School, P.S Jhalakati, Dist. Barisal

May god bless the soul.

- **Tapash Kanti Dutt,** B.A (Hons) M.A, 67. B. K. Das Rad ,Dacca-1

হে মহান! তোমাকে কোটি নমস্কার। তুমি মানব হৃদয়ে চির অমর। স্বর্গ হইতে আশীর্বাদ কর যেন তোমার মহান আদর্শে আমরা অনুপ্রাণিত হতে পারি। তোমার সেবকাধম **নীরদ বাইন,** গ্রামঃ সীতারামপুর পোঃ সীতারামপুর জিঃ ফরিদপুর।

হে বরণ্যে! লহো মোর অশ্রু অর্ঘ্যমালা। ইতি গুণমুগ্ধ

–হিমাংসু কুমার রায় চৌধুরী, টাঙ্গাইল ২০/১২/৬৩

শহীদ তুমি যে নাই একথা ভাবতে আমার বুক ফেটে যায়। আল্লা তোমাকে সুখে রাখুন এ দোয়াই করি। আমি মূর্খ মানুষ কি লিখে যে তৃপ্তি হব জানা নাই।

–শরিফউদ্দীন আহমদ, ফরিদপুর ১৮/১২/৬৩ইং।

হে মহান নেতা আমি নিঃসন্দেহ যে তুমি না হইলে পাকিস্তান আসিত না।

Md. Khorshed Ali Bhuiya, Po. Bhuiya Bari, Dt. Noakhali, 19. 12. 63

হে শহীদ তোমার মৃত্যুতে আমাদের এই সোনার বাংলা এতিম তাই আমি খুব দুঃখিত হইলাম। ইতি–**মহম্মদ শহিদুল্লা,** তেজগাঁও পলিটেকনিক হাইস্কুল, ৬ষ্ঠ শ্রেণী, ক্রমিক নং ৬।

শহীদ স্মরণে

আজ সন্ধ্যা ঘোড় আঁধার কবে উঠবে আবার আলো দিবার।

–আবু মিয়া সুহৃদুল হক ভুইয়া, ঢাকা ২১/১২/৬৩

May God bless the dedicated soul by which can live in rest in the memory of Pakistan.

- **Phani Bhusan Saha**, 17. 12. 63

তুমি যেদিন এসেছিলে ভবে, কেঁদেছিলে সুদু তুমি, হেসেছিল সবে, আবার তুমি যেদিন চলে গেলে সংসার ছাড়িয়া, কাঁদিতেছে সবে, সুদু তোমার লাগিয়া

– ইয়াজউদ্দিন শেখ।

www.pathagar.com

আমাদের কথা

দেশপ্রিয় নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আর এ জগতে নেই। একথাটি সত্য; কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর স্মৃতি দেশবাসীর অন্তরে কখনো ম্লান হবার নয়—মানুষের মনের মন্দিরে তিনি চিরভাস্বর।

একজন মানুষের পরিচয় তাঁর নাম-মাহাত্ম্যে নয়, তাঁর বংশ-কৌলিন্যে নয়, মানুষের সত্যিকার পরিচয় তাঁর আদর্শে, তাঁর কর্মকীর্তিতে। কেন না, একজন মানুষের দৈহিক সত্তা পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেও তাঁর সুকীর্তি বেঁচে থাকে মানুষের সমাজে। কোটি মানুষের জীবন দ্বারা স্পন্দিত এবং প্রভাবিত হয়। অগণিত জীবনের গভীরে আলোড়ন তুলে অনেক মহৎ জন্মের উৎস হয় সেই এক জীবন।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর আদর্শ ও কর্মকীর্তিকে নির্দ্বিধায় মহামানবোচিত বলা যায়, কেন না, তাঁর আদর্শ ও বিরাট কর্মকীর্তি শুধুমাত্র একজনের জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি তার ব্যাপ্তি ঘটেছিল অগণিত মানুষের আদর্শ, চিন্তায়, কর্মোদ্দীপনায় এবং প্রাণের গভীরে। এর প্রভাব বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি আজো।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর গণতান্ত্রিক আদর্শ যেমন বিশেষভাবে স্মর্তব্য, তেমনি আত্মসমীক্ষার খাতিরে এ কথাও স্বীকার্য যে, তাঁর সেই আদর্শ আজো অংশতও বাস্তবায়িত হয়নি। জাতির এই দুঃসময়ে জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর অন্তর্ধান তাই শুধু বেদনাদায়কই নয়, দেশবাসীর অপূরণীয় ক্ষতির কারণও বটে। তবে যে আদর্শনিষ্ঠা দ্বারা দেশবাসীর মুক্তির পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন, সে আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে পারে একমাত্র দেশবাসীই। সে দায়িত্ব আজ দেশের সকল মানুষেরই ওপর।

'বিশেষ সোহ্‌রাওয়ার্দী সংখ্যা' তাঁর চরিত্র ও জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলো ধরবার সর্বপ্রথম প্রয়াস। যত অসম্পূর্ণই হোক এক অর্থে এ সংখ্যা তাঁর জীবন-ইতিহাস। এ সংখ্যার সার্থকতা তখনি, যখন সারা দেশের মানুষ তাঁর আরব্ধ সাধ-সাধনা ও আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে অজেয় সৈনিক হয়ে উঠবে।

মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীর চেহ্‌লাম অনুষ্ঠিত হয়েছে গত তেরোই জানুয়ারি। ঐ তারিখেই আমাদের বর্তমান বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু কতকগুলো অনিবার্য কারণে এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে বেশ কিছুটা বিলম্ব হয়ে গেল। তজ্জন্য আমরা দুঃখিত।

বিশেষ সোহ্‌রাওয়ার্দী সংখ্যা প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করবার প্রয়াস পেয়েছি। এই মহৎ জীবনের অসংখ্য ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে কোনো ব্যক্তিগত অনুরাগ যেন প্রশ্রয় না পায় তৎপ্রতি আমাদের প্রখর সতর্কতা ছিলো। এই সংখ্যাকে তথ্যগত দিক থেকে যথাসম্ভব নির্ভুল করবার ব্যাপারে সর্বদা আমাদের লক্ষ্য ছিলো। কেন না, শহীদ সাহেবের বিরাট কর্মময় জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে অসত্য কিংবা অতিরঞ্জিত কোনো কিছুর অবতারণার প্রয়োজন করে না। তবু তাঁর জীবনের অসংখ্যার

www.pathagar.com

ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে কোথাও প্রমাদ ঘটেনি—এমন কথা হয়তো জোর করে বলা যায় না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, প্রথমতঃ যথেষ্ট ব্যস্ততার মধ্যে এই সংখ্যা বের করতে হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ একটি জীবনালেখ্য রচনার জন্য গবেষণার যে সুযোগ থাকা দরকার আমাদের তা ছিলো না। অবিভক্ত বাংলার পুরানো পত্র-পত্রিকা বা অন্যান্য কাগজপত্র আমাদের কাছে নেই। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেহাৎ স্মৃতির ওপর আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপঃ ১৯৪৫ সালের রশীদ আলী দিবসের মিছিল মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলের সমবায়ে গঠিত হয়েছিল, না এককভাবে মুসলিম লীগের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, তার কোনো নির্দিষ্ট তথ্য আমাদের নিকট নেই। তবে ঐ আন্দোলনের সময় মুসলমানদের মধ্যে যে প্রবল বৃটিশবিরোধী মনোভাব জাগ্রত হয়েছিল, তা আমাদের জানা আছে। মুসলমানদের সেই বৃটিশ বিরোধী মনোভাবকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যেই ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের দাঙ্গাকালে ইংরেজ গভর্নর সামরিক বাহিনীর তলব করতে বিলম্ব করেছিলেন এবং হিন্দু-মুসলিম বিরোধকে তীব্রতর করে তোলেন। প্রধানত বৃটিশ শাসকদের সেই কারসাজির তথ্যটি তুলে ধরার জন্যই রশীদ আলী দিবস প্রসঙ্গটির উল্লেখ করা হয়েছে।

যাঁদের রচনা সম্ভারে এই বিশেষ সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করছি যে, আরো অনেক রচনা আমাদের নিকট পৌঁছেছিল, কিন্তু স্থানাভাব হেতু তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। শহীদ-জীবনের অনেক মূল্যবান তথ্য ও দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র দিয়ে যারা আমাদের সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতিও আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

www.pathagar.com

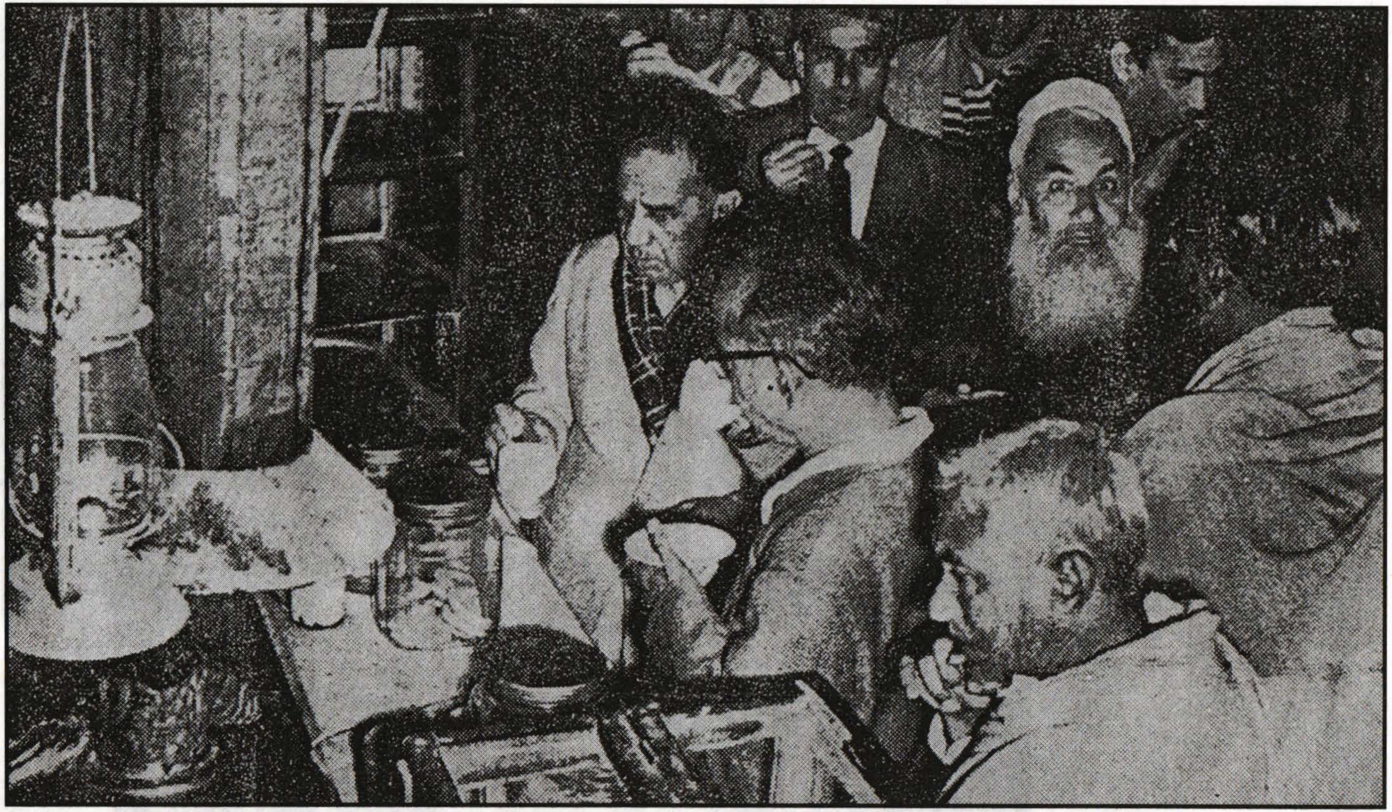

পথ চলতে ঘাসের ফুলকে সাদর-প্রীতিতে গ্রহণ করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য– যে-কোনো সাধারণ ঘরে পা দিতে, সাধারণ দোকানে বসে আহার করতে তাই দ্বিধা ছিল না তাঁর–

www.pathagar.com

উত্তরবঙ্গ সফরকালে রংপুর যাবার পথে পার্বতীপুর জংশনে অপেক্ষারত জনসমুদ্রের একাংশ

www.pathagar.com

অন্তিম শয়ানে

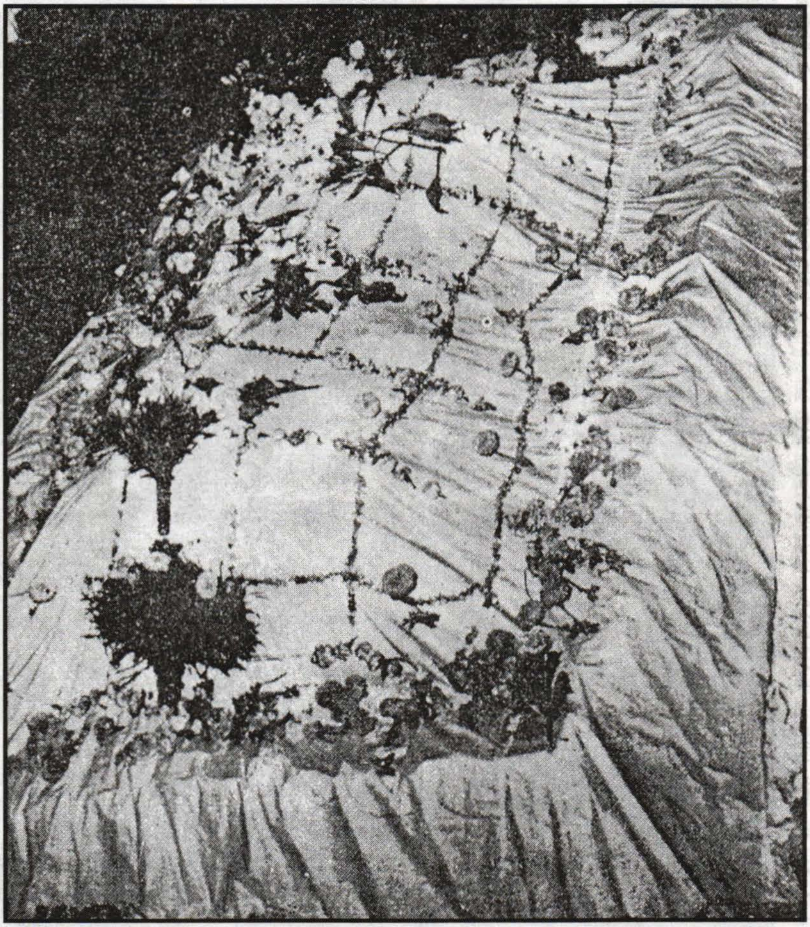

এখানে ঘুমায় সিংহ-হৃদয় সংগ্রামী মহাপ্রাণ,
শৌর্য-সাহসে, অতুলন, শির উন্নত, মহীয়ান,
প্রাণাবেগে যাঁর জেগেছিল কোটি পঙ্গু মুসলমান
গণতন্ত্রের উদগাতা- চির ভাস্বর, অম্লান;
এখানে ঘুমায়..... সেই বীর সন্তান।

—ফররুখ আহ্‌মদ

www.pathagar.com

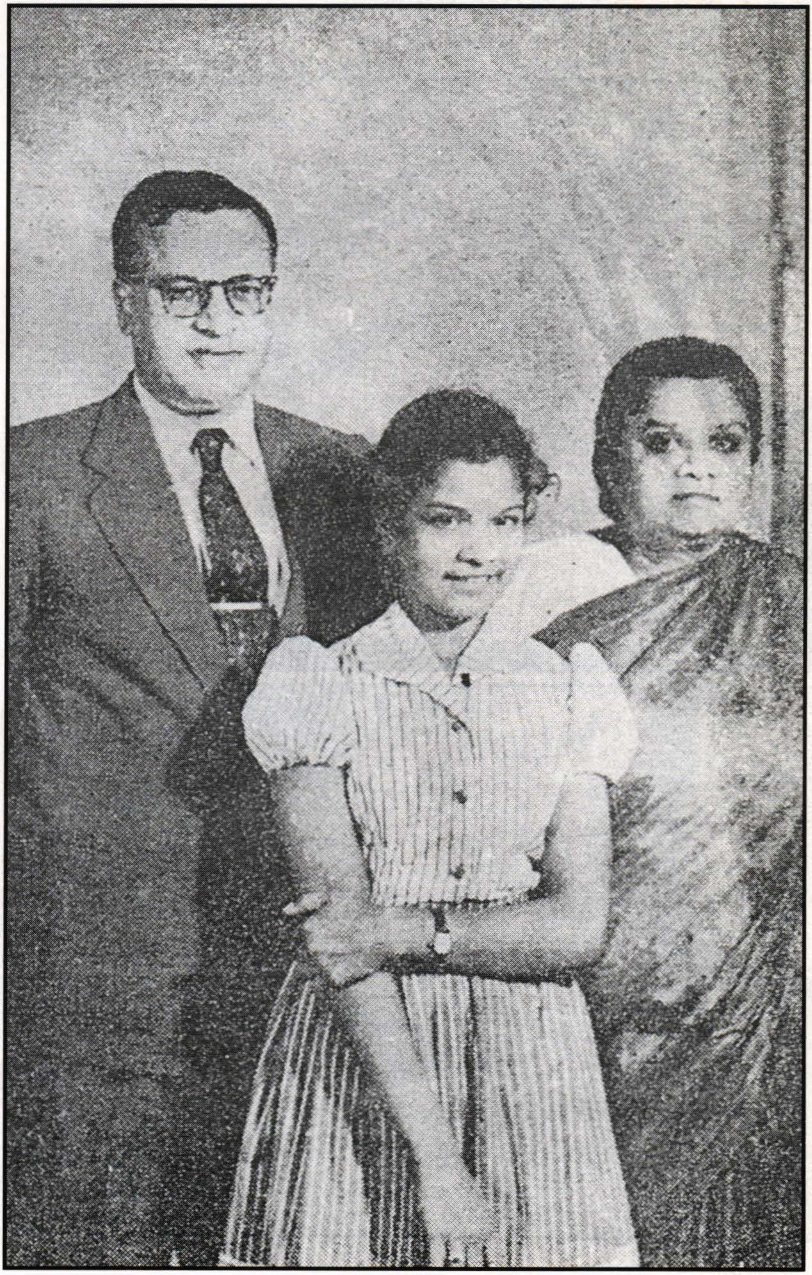

সোহরাওয়ার্দীর একমাত্র কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান, জামাতা জনাব আহমদ সোলায়মান ও দৌহিত্রী মুন্নী

www.pathagar.com

চলার পথে, কাজের ফাঁকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে চিন্তায় নিমগ্ন হওয়া ছিল তাঁর অন্যতম স্বভাব। ক্ষণিকের চিন্তায় তিনি খুঁজে পেতেন অনেক জটিল সমস্যার সমাধান। ট্রেনের কামরায় এমনি একটি মুহূর্তে জনাব সোহরাওয়ার্দী।

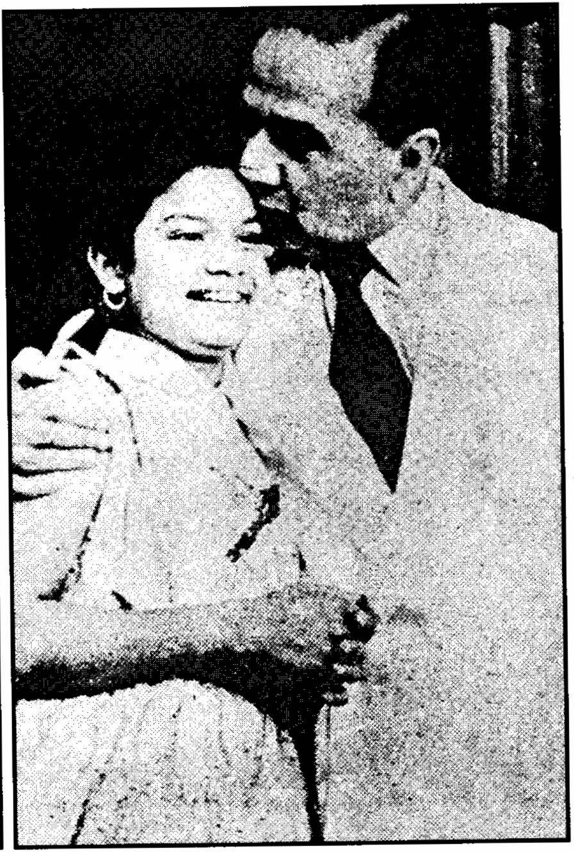

মুন্নীকে স্নেহ করছেন মাতামহ সোহরাওয়ার্দী

www.pathagar.com

পিতা স্যার জাহিদ সোহরাওয়ার্দী (বাম থেকে তৃতীয়), শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক ও শহীদ সাহেব (পেছনে ডান থেকে ২য়)

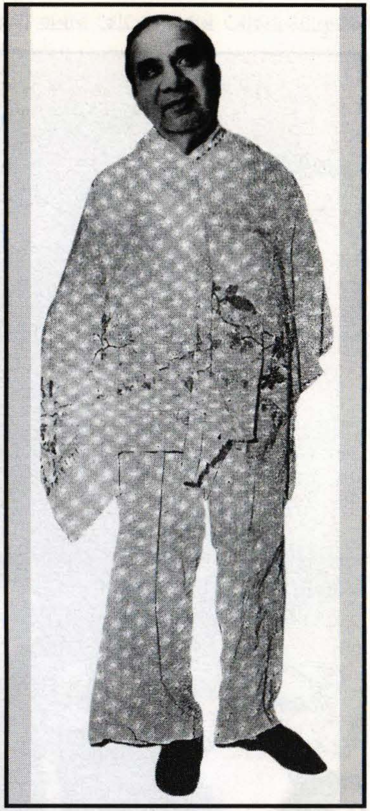

জেলগেটে সদ্য-মুক্ত নেতা ঃ ১৯শে আগষ্ট, ১৯৬২

www.pathagar.com

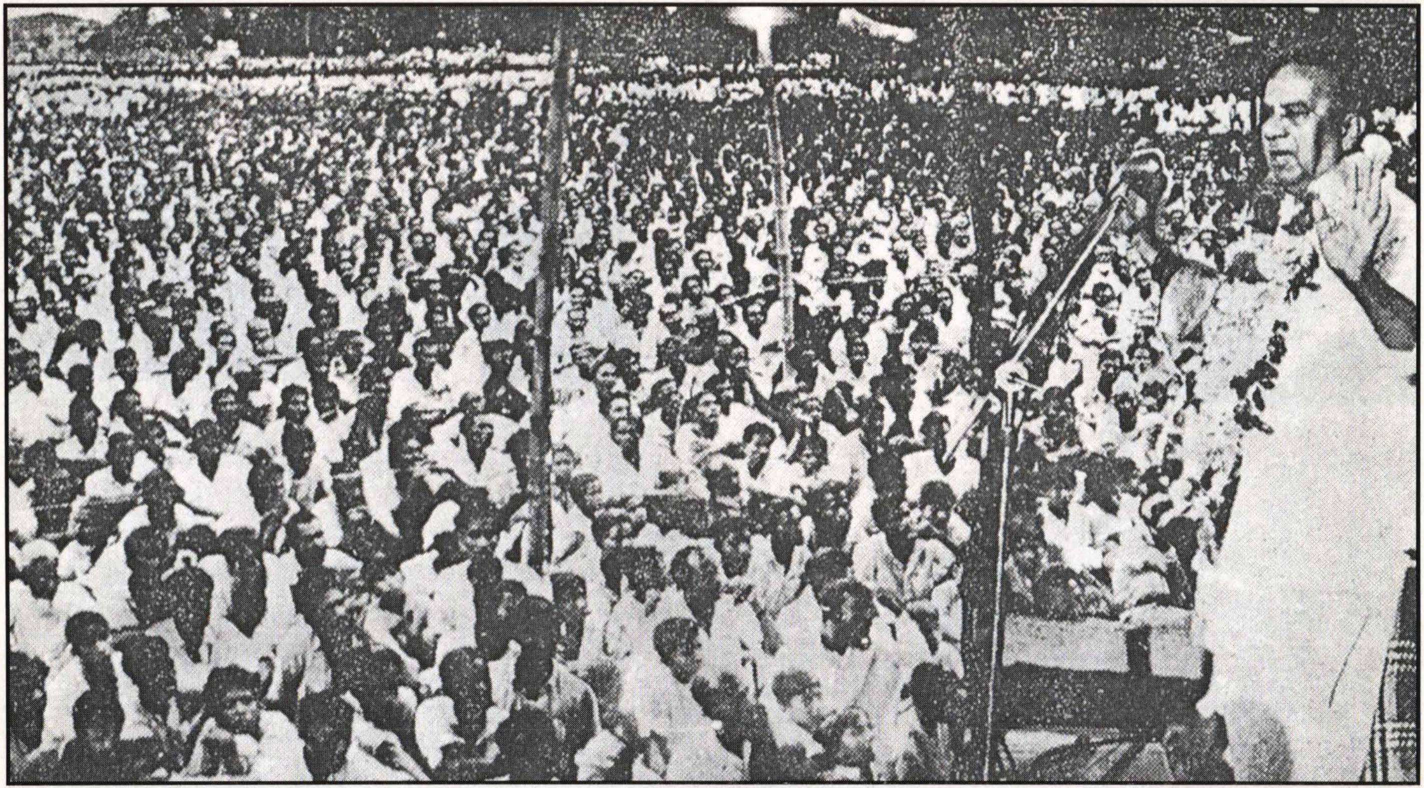

ময়মনসিংহের একটি জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

www.pathagar.com

নাগরিক সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে ঢাকা স্টেডিয়ামে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইকে মাল্যভূষিত করছেন তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

www.pathagar.com

জাপানের নারা পার্কে পৌঁছানোর পর জাপানের ছাত্র-ছাত্রীরা দুই দেশের পতাকা দুলিয়ে সংবর্ধনা জানায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে

www.pathagar.com

আপনারা গণতন্ত্র চান? চলার পথেও এ মৌলিক প্রশ্নের জবাব নিতে তিনি ভোলেননি। হাত তুলে জনসাধারণও রায় জানিয়ে দিয়েছে তাদের

www.pathagar.com

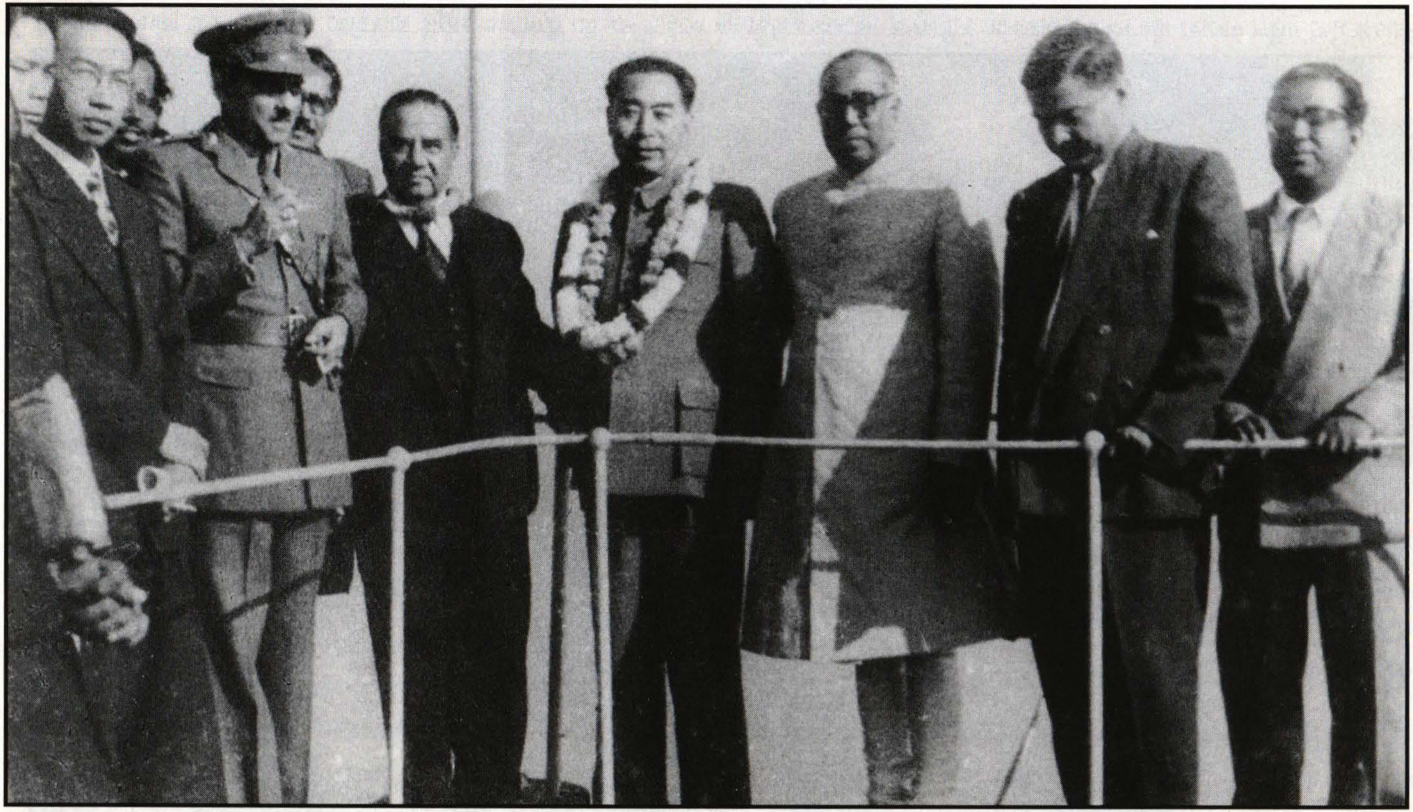

তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে গণচীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই-এর সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান এবং ডঃ কামাল হোসেন .

www.pathagar.com

একটি জনসভায় তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগিশ। বক্তৃতারত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

www.pathagar.com

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আম্মা মরহুমা খুজিস্তার আখতার বানু

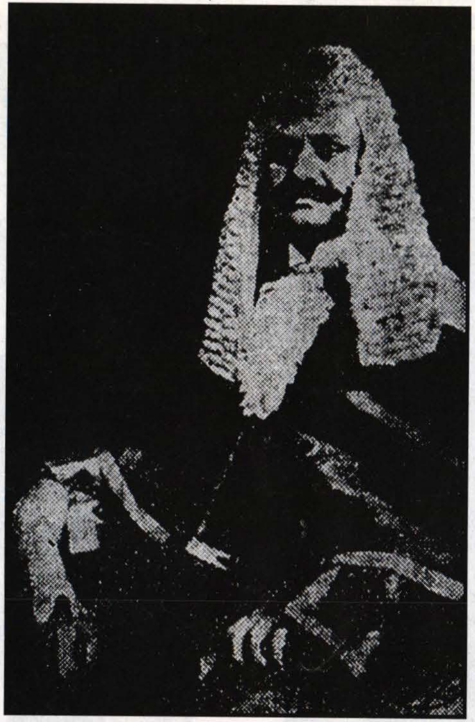

আব্বা মরহুম স্যার জাহিদ সোহরাওয়ার্দী

তরুণ ব্যারিস্টার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

www.pathagar.com

বিরোধী দলের নেতা হিসাবে শাসনতন্ত্র বিলের উপর বক্তৃতারত জনাব সোহরাওয়ার্দী

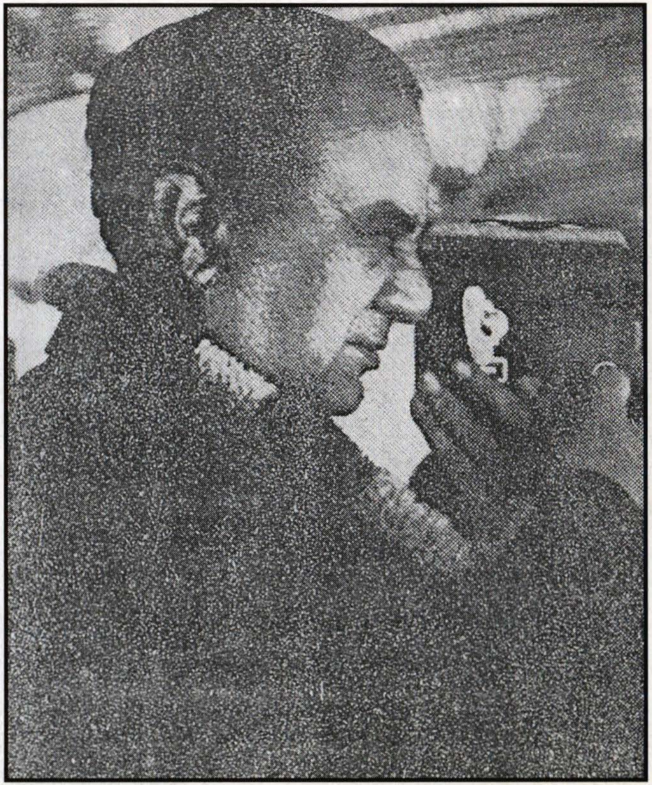

মানুষকে নিয়েই ছিল তাঁর কর্ম, তাঁর জীবন; আর তাই মানুষের চলমান জীবনকে ধরে রাখার জন্য ছবি তোলা ছিলো তাঁর হবি। তেমনি একটি মুহূর্তে শহীদ সোহরাওয়ার্দী

www.pathagar.com

নাগরিক সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে ঢাকা স্টেডিয়ামে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইকে মাল্যভূষিত করছেন তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

www.pathagar.com

'তিনি যা করতেন ও ভাবতেন, তার মধ্যে রাজনৈতিক লুকোচুরি বলতে কিছু ছিল না।.... জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি বরণ করেছিলেন নিঃস্বের মৃত্যু।... তাঁকে চিকিৎসার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য অপরের সাহায্যও নিতে হয়েছে। ....দেশবাসীর কাছ থেকে চির বিদায় গ্রহণ করলেও কার্যত কবরে শুয়েই তিনি দেশ শাসন করবেন। ......যে রাজনৈতিক আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য আজীবন তিনি সংগ্রাম করে গেছেন, তার ক্ষয় নেই......।'

–এ, কে, ব্রোহী

'....মৃত্যু তাঁর শূন্যহস্ত সাধক-ফকিরের মত এবং সমাধিস্থ হলেন সম্রাটের মত। ...মৃত্যুভয় বলে কোন কিছু তাঁর মধ্যে ছিল না। .....পাঁচ ছয় বছরের সরল শিশুরা যেমন দুষ্টুমি-প্রিয়, তিনিও তেমনি দুষ্টুমি-প্রিয় ছিলেন। ....কোলকাতার দাঙ্গায় গাড়ীচালকের জীবন যাতে বিপন্ন না হয়, সেজন্য তিনি নিজেই দিনেরাতে গাড়ী চালিয়েছেন।'

–আবুল হাশিম

'আমরা গলাবাজি ও কলমবাজি করিতাম, তিনি নীরবে কাজ করিয়া যাইতেন। ....জনগণকে তিনি যেমন অন্তর দিয়া ভালবাসিতেন, তেমন আমরা পারি নাই। পূর্ব বাংলার অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজনের নিখুঁত খুঁটিনাটি তিনি যত জানিতেন, আমরা তার শতাংশের একাংশও জানিতাম না।'

–আবুল মনসুর আহমদ

'মানুষ বড় হইলে সাধারণতঃ গরীব আত্মীয়-স্বজনের পরিচয় দেয় না। কিন্তু শহীদ সাহেব ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি গরীব আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজিয়া বাহির করিতেন। তাহাদের ভাঙ্গাচুরা ঘরে গমন করিতে কিংবা তাহাদের সহিত খানাপিনা করিতে তিনি কখনও দ্বিধা করিতেন না।'

–তফাজ্জল হোসেন

'.....যারা তাঁর সাথে প্রথম দেখা করতে গিয়েছে তারা হঠাৎ চমকে উঠেছে এবং ভুল বুঝেছে।'

–আতাউর রহমান খান

'.....ভারতের অসহায় মুসলমানদের রক্ষার চাইতে তিনি কোন উচ্চ পদকেই বড় মনে করেন নাই। ......রাজনৈতিক মঞ্চে সম্ভবতঃ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি– যিনি রাজপ্রাসাদ হইতে গরীবের কুটির পর্যন্ত সর্বত্র নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিতেন।'

–শেখ মুজিবুর রহমান

'....ভাবীকালের মানুষ তাঁর বাগ্মিতার পরিচয় পাবে হয়ত আইন পরিষদের কীটদষ্ট কার্যবিবরণীতে; কিন্তু যে চলন্ত মানুষটি গভীর স্বরে স্তোত্র পাঠের গাম্ভীর্যে গর্জন করে উঠতেন, তাঁকে আর আমরা সামনে পাব না।'

–মোস্তাফা কামাল বার-এট-ল

'...সোহরাওয়ার্দী ছিলেন একজন বিশ্বনেতা। তিনি কোন দেশ বিশেষের নেতা ছিলেন না; সমগ্র বিশ্বই ছিল তাঁর দাবীদার।'

–ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত